অপরাধ-তত্ত্ব

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল

অপরাধ-তত্ত্ব

[অপরাধ-বিজ্ঞান]

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল J. P

I. P.S. [Rtd] M. Sc, D. Phil
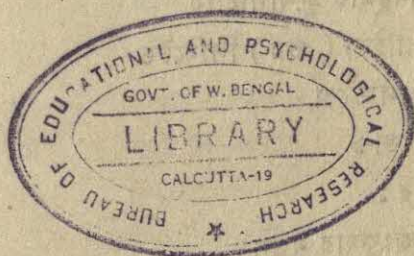
বাক্-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড

৩৩, কলেজ রো ॥ কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ : জুলাই, ১৯৭৬
শ্রাবণ, ১৩৮৩

প্রকাশক :
শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
বাক্-সাহিত্য (প্রাঃ) লিমিটেড
৩৩, কলেজ রো,
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
শ্রীরণজিৎকুমার মণ্ডল
লক্ষ্মীজনার্দন প্রেস
৬, শিবু বিশ্বাস লেন
কলিকাতা—৬

প্রচ্ছদ পট :
শ্রীসুধাময় দাশগুপ্ত

পঁচিশ টাকা

আমার মহান উর্ধ্বতন

সপ্ত পুরুষকে—

রাজা

দোল গোবিন্দ ঘোষাল

|

পণ্ডিত

রঘুদেব ঘোষাল

|

রাজা

রামশঙ্কর ঘোষাল

|

কুমার

রাধাকান্ত ঘোষাল

|

দেওয়ান

নবকৃষ্ণ ঘোষাল

প্রাণকৃষ্ণ ঘোষাল

ত্রিলোকীসুন্দরী দেবী

|

রায় বাহাদুর

কমলাপতি ঘোষাল

[১৮২০-১৯০৮]

জগত্তারিনী দেবী

|

রায় সাহেব

কালিসদয় ঘোষাল

আশুতোষ ঘোষাল

পরিচিতি

১৯৪০ খৃঃ থেকে পর পর আমি স্বল্পকালের মধ্যে আট খণ্ড 'অপরাধ বিজ্ঞান প্রণয়ন করি। কিন্তু পরবর্তী দীর্ঘকালের ব্যবধানে পৃথিবীতে অপরাধ-বিজ্ঞান বিষয়ে বহুবিধ গবেষণা হয়। আমি নিজেও অপরাধ-তত্ত্বের নিজের ক্ষেত্রেও বহু সার্থক গবেষণা করি। তৎদ্বারা পৃথিবীতে অপরাধ-মনস্তত্ত্বের কয়েকটি নূতন থিওরী স্থাপিত হয়। আমার পূর্বতন পুস্তকগুলিতে বহু অসম্পূর্ণ বিষয় ছিল।

উপরোক্ত কারণে বর্তমান অপরাধতত্ত্ব শীর্ষক একটি পৃথক পুস্তক রচনার প্রয়োজন হয়। বর্তমান মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্কিত 'অপরাধ-তত্ত্ব' পুস্তকটিতে সর্বাধুনিক গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে বহু সম্পূর্ণ নূতন তথ্য সংযোজিত হলো। ফলে— ইহার কলেবর পূর্বাপেক্ষা চতুর্গুণ বর্ধিত। বর্তমান পুস্তকটি এজন্য সম্পূর্ণ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত নূতন ধাঁচের নূতন পুস্তক। পূর্বতন কিছু বিষয় এতে বাতিল করে সম্পূর্ণ নূতন বিষয় সংযুক্ত। জুভেনাইল ক্রিমিনাল, যৌনজ অপরাধ সমূহ এবং তাদের জন্মের কারণ ও চিকিৎসা রীতি, রাজনৈতিক ও অন্যান্য অপরাধীদের চিকিৎসার্থে মগজ-ধোলাই সম্পর্কিত জ্ঞান ও তৎসহ আধুনিক গবেষণালব্ধ হেরিডিটি আদি অতি প্রয়োজনীয় বহু বিষয় এতে নূতন সংযোজনা। অভিজাতদের হোয়াইট কলার ক্রাইম সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ এতে প্রথম প্রদত্ত হলো।

তদতিরিক্ত বহু অপরাধ সম্পর্কিত যৌনজ ও অযৌনজ লোমহর্ষ ঘটনার উল্লেখ ইহার বিশেষত্ব। জীবন জিজ্ঞাসার প্রতিটি প্রশ্নের সদুত্তর এতে আছে। এটি পাঠে নাগরিকরা আত্মরক্ষার রীতিনীতি পূর্বাহ্নে বুঝে নিরাপদ হবেন। ভারতীয় ও য়ুরোপীয় ভাষায় এইরূপ দ্বিতীয় পুস্তক নেই। পুস্তকটিতে জনসাধারণের মত নৃতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ের গবেষক ছাত্ররাও উপকৃত হবে। বলা বাহুল্য এটি একটি অপরাধ-মনস্তত্ত্ব ও উহার চিকিৎসা সম্পর্কিত সম্পূর্ণ নূতন গ্রন্থ। এটির বহু বিষয়বস্তু সম্পূর্ণরূপে পৃথক ও ইহা নূতন গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে টেক্সট বুক রূপে প্রণীত।

সূচীপত্র

নৃতাত্বিক ভূমিকা

ডঃ প্রবোধকুমার ভৌমিক Ph.D, D-Sc.

[নৃতত্ব বিভাগের প্রধান] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

"মানুষের সমাজে অপরাধ নতুন নয়। স্থান কাল ও সমাজ-সংস্কৃতির বৈচিত্র্য অনুযায়ী অপরাধের সংজ্ঞা ভিন্ন হয়। কেননা অপরাধকে যাচাই করা বা তাকে পরিমাপ করার মাপকাঠি নির্ভর করে সমাজ অনুশাসন, আ-বিশ্ব-দৃষ্টি [World View] এবং ব্যক্তিত্বস্ফূরণ বা জীবন দর্শন (Philosophy of Life] কে আয়ত্ত করার কুশলতার উপর।

সংশ্লেষ [Interaction] ও সম্পর্কের [Relationship] তারতম্যে মানব গোষ্ঠির অপরাধ প্রবণতা বাড়ে বা কমে এবং প্রতিরোধ করার ধরণ-ধারণ পাল্টে যায়। যাই হোক না কেন? সব কিছুর মধ্যে রয়েছে ব্যষ্টি বা সমষ্টির চেতনাবোধ বা জাগ্রত চিন্তণের পরোক্ষ প্রভাব।

এযুগে বিজ্ঞান ভিত্তিক আধুনিকতা সর্বদেশে স্বীকৃত হওয়ায় এবং চিরাচরিত প্রথায় অপরাধ বিশ্লেষণ বা অপরাধীর দণ্ডাদেশের নূতন রূপ পরিগ্রহণ করায় পৃথিবীতে পূর্বতন রীতির স্বাভাবিক ছেদ লক্ষ্য করা যায়।

বর্তমান পুস্তকের লেখক ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল তাঁর সমগ্র মন ও অন্তরকে উজাড় করে দিয়ে অপরাধ-তত্ত্বের অন্তর্নিহিত ব্যাখ্যা যেমন করেছেন, তেমনি ব্যক্তি হৃদয়ের স্পর্শ দিয়ে অপরাধী মানুষকে ফেরাবার যে এক সুকঠিন চেষ্টা করেছেন তা যে কোনও পাঠকের কাছে অতি সহজে বোঝা যাবে।

ডঃ ঘোষালের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অপরাধ স্পৃহা, অপরাধ চরিত্র, অপ-রাধীদের শ্রেণীবিন্যাস, অপরাধ-বিভাগ, অপরাধী সমাজের চিত্রণ ও বিশ্লেষণ, সাক্ষ্য-প্রমাণ, অপরাধ-সাহিত্য, অপরাধ-গবেষণা ইত্যাদির মাধ্যমে যে শ্রম নির্ভর চিন্তন দেখিয়েছেন তা আমাদের দেশের অপরাধ-বিজ্ঞান বা সমাজ বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক উজ্জল সাক্ষর হয়ে থাকবে।

ব্যক্তি মানুষ হিসাবে [স্বাধীনতা আন্দোলনে] আমার দীর্ঘদিনের কারাবাসের অভিজ্ঞতা ও নানা ধরণের অপরাধীদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয়। অনেক কয়েদীকেই তাদের অপরাধের জন্য বারবার লজ্জিত হতে দেখেছি। সংশোধনের

সুযোগে বঞ্চিত এই ব্যর্থাহত মানুষগুলোর বিবর্ণ করুণ মুখগুলি আমাকে বাস্তবিক সেই দিনে ফিরিয়ে দেয়। আমি বুঝতে পারি যে ব্যথা ও দুঃখ কোথায়।

আমার কর্মজীবনে অপরাধ-প্রবণ গোষ্ঠি লোকদের সঙ্গে শুধু গবেষণার মাধ্যমে নয়, ইতিহাস ও সমাজের বলি হয়ে কেমন করে ওদের বলিষ্ঠ সমাজ আজ গলিত পঙ্গু সমাজে পরিণত হলো, তার উদাহরণ বিদগ্ধ সমাজ ও শাসক গোষ্টির কাছে তুলে ধরার চেষ্টায় ও তাদের সমাজের বন্ধু করে তোলার চেষ্টায় এমন অনেক বন্ধুর সাহায্য ও সাহচর্য পেয়েছি যা আমাকে চিরকাল কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রাখবে।

বর্তমান পুস্তকের লেখকের পাশে দাঁড়িয়ে আমিও সনম্র চিত্তে বহু অপরাধীর মানবতার বহু উদাহরণকে নমস্কার জানাই। বলিষ্ঠ প্রভাবশালী ব্যক্তি বা মানুষ ও অবৈজ্ঞানিক রাজনৈতিক চিন্তাধারা কেমন করে সমাজজীবনকে বীভৎস করে ক্ষত বিক্ষত করে দেয় তার বুঝি আর জুড়ি নাই। লেখক তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্যের মধ্যে বিভিন্ন চরিত্রের বৈচিত্র্য তুলে ধরেছেন। তাঁর লেখার মাধ্যমে সাধারণ পাঠক সাবধানে চলার ইঙ্গিত পাবে। অপরাধ ও অপরাধী সম্পর্কে উদাসীন না থেকে সচেতন হবে, আর শাসক গোষ্ঠি অপরাধ বিচার ও বিশ্লেষণের এক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-ভিত্তিক পদ্ধতি পাবেন। অপরাধী মানুষগুলি পাবে হৃদয়ের এক ছোঁয়াছ।

একই ধরণের ক্রিয়াকাণ্ড বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়। উহা সেখানে অপরাধ রূপে স্বীকৃত হলেও উহা তাদের নিকট লঘু বা গুরুরূপে বিবেচিত। ওই ধরণের কার্য সকল সমাজে নিন্দনীয় না'ও হতে পারে।

আমরা সম্ভবতঃ অপরাধকে সমাজদৃষ্টি ও চেতনার অসমর্থন-যোগ্য গর্হিত কার্য বলে গ্রহণ করি। এজন্য সমাজ প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য ও পরিবেশ পরিমণ্ডলের ধীর প্রভাব যা মনুষ্য চরিত্র এবং সাংস্কৃতিক রূপরেখার দিকবলয়'কে বিস্তৃত করেছে; এবং তৎসহ যে সব বিষয় মানব প্রকৃতির চিন্তন ও মনন'কে প্রভাবিত করেছে তার সব কিছুই সমাজ সমর্থন যোগ্য কি'না তা নিরূপণে সাহায্য করে। এ সবের মিলিত প্রভাবে বিধিনিষেধের কাঠামোর বহিঃরূপ নিরূপিত হয়। ফলে অপরাধ প্রতিরোধের জন্য জনমত, সামগ্রিক চেতনাবোধ, ধর্মকেন্দ্রিক ভয় ও শঙ্কা নানাভাবে এক বলিষ্ঠ অনুশাসন সৃষ্টি করেছে। এই সঙ্গে শাসন-শৃঙ্খলা ও কঠোরতার ধরণ অনুযায়ী অপরাধের ধরণ ও মাত্রা নির্ভর করে। প্রতিবাদ

ও প্রতিরোধের গতিবেগের মধ্যে সামাজিক কঠোরতার অনুসরণ সহজেই বোধগম্য হয়।

বহুধা বিভক্ত অসম মানবসমাজে অর্থনৈতিক জীবনপ্রবাহ যেমন বিচিত্র, গোষ্ঠি বা সম্প্রদায়ের মানস চরিত্র বা মূল্যায়ণের ধারও তেমনি অসঙ্গতিপূর্ণ। বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি জীবনযাত্রার মানের নব রূপায়ন, শিক্ষাবিস্তার পারস্পরিক সম্পর্কের হের ফের করে দিয়েছে এবং মানুষকে স্থান কালের বন্দী দশা হতে মুক্ত করে দিয়েছে।

"আইনাদি ও প্রশাসনের একমাত্র উদ্দেশ্য [লেখকের ভাষায়] জনগণের উপকার করা হলে, অপরাধ বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞানের প্রয়োজন। উহাদের স্বভাব চরিত্র ও বিবিধ শ্রেণী প্রভৃতির জ্ঞানে অপরাধ প্রতিকার সহজ হয়। সমাজ-সেবীদের তাই বিভিন্ন অপরাধীদের বুঝতে ও ভালবাসতে হবে।"

ডঃ ঘোষালের কৃতিত্ব বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষারপটভূমিকায় সরকারী উচ্চপদে আসীন হওয়া আর দীর্ঘদিনের পুলিশিজীবনের উপজীবিকায় সেই শিক্ষাকে অন্তর দিয়ে হৃদয় দিয়ে এক বিশেষ রূপে মণ্ডিত করা। সেইজন্য তাঁর পুস্তকে ঘটনাবলীর বিচিত্র প্রবাহের সঙ্গে প্রাণ স্পর্শের ও সহানুভূতির এক অকৃত্রিম আকুতি।

ডঃ ঘোষাল থানায় কয়টি মিসার আসামীকে ও তাদের পিতামাতাকে কাঁদতে দেখেছিলেন। তাঁর মতে যারা কাঁদে তারা সংশোধনযোগ্য। আমরা এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে একমত। ডঃ ঘোষাল তাঁর দীর্ঘ পুলিশী জীবনের অভিজ্ঞতা বিজ্ঞানসম্মত ভাবে পরিবেশন করাতে ধন্যবাদার্হ। এই পুস্তকের ভূমিকাটি লেখার সুযোগ পাওয়াতে আমি সত্যই আনন্দিত হলাম।

ফোরেন্সিক ভূমিকা

ডঃ প্রণতি ব্যানার্জি M.B.BS, M D.

[অধ্যাপিকা ফিজিওলজী, বিভাগ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়]

এই অপূর্ব পুস্তকটি পাঠার্থে বিশ্ববিদ্যালয়দেরও বাঙলা শিখতে হবে। মেডিকেল শাস্ত্র সম্মত এই পুস্তকটিতে দেহ বিজ্ঞানেরও একটি নূতন দিক উন্মুক্ত হলো। ওইরূপ তথ্যসমৃদ্ধ সুলিখিত পুস্তক ঐ বিষয়ে কোনও বিদেশী ভাষাতেও নেই। এটি ঐ বিষয়ে ভবিষ্যৎ গবেষকদের একমাত্র অবলম্বন হবে।

ডঃ সুরথ চ্যাটার্জি M. B., D. Sc

[ডিরেক্টর অপারেশ্যনাল হাইজিন ইনিষ্টিটিউট, আমেদাবাদ]

"বাঙ্গালা ভাষাতে এরূপ দূরূহ বিজ্ঞান পুস্তক ধারণার বহির্ভূত। এই গবেষণা-লব্ধ পুস্তকের সূত্র মত আমি নিজেও কিছু গবেষণা করবো। এটি চিকিৎসা শাস্ত্রেরও নূতন পথ নির্দেশক। সুসংবদ্ধ ভারতীয় অপরাধ বিজ্ঞান টেক্ট বুক রূপে এই প্রথম লেখা হলো। এটিকে বিভিন্ন শিক্ষা বিভাগে পাঠ্য পুস্তক করা উচিৎ। জন্তুগণ, আদি মানুষ ও অপরাধীদের পারস্পরিক সম্বন্ধ এতে চমৎকার রূপে বিবৃত। এই দিক হতে বিষয়টি ইতিপূর্বে কেউ ভাবেনি।

মনস্তাত্বিক ভূমিকা

ডঃ সরোজেন্দ্রনাথ রায় M. Sc. Ph. D

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়], মনস্তত্ব বিভাগের প্রধান

অপরাধ-তত্ব বিষয়ে ডঃ পঞ্চানন ঘোষালের নাম এতই সুবিদিত যে, আমার কাছ থেকে তাঁর বিষয়ে কোন পরিচয় দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না। ভারতবর্ষের এই বিশেষ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে লেখক এবং গবেষক হিসাবে তিনি অদ্বিতীয় বলা যেতে পারে। অপরাধ-তত্ব সম্বন্ধে তাঁর কিছু কিছু বই ও প্রবন্ধ আমি আগে পড়েছি। বর্তমান বইটিতে কতকগুলি বিশেষ ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে সত্য ঘটনা উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করে সুন্দরভাবে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। অপরাধ কি, কি তার চরিত্র, কত বিচিত্রভাবে এর প্রকাশ ঘটে এবং সেই সব অপরাধের পশ্চাতে মানসিক অর্থাৎ মনস্তাত্বিক কারণগুলি কিভাবে কার্যকরী হয়, সেটা তিনি অতি সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন। অপরাধী কারা, কত বিভিন্ন রকমের অপরাধী হয়, এবং তারা যে সমাজের সব সময় পরিত্যজ্য নয় অর্থাৎ ঠিকমতো বৈজ্ঞানিক অর্থাৎ মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তাদের চিকিৎসা বা পুনর্বাসন করে সুনাগরিক করা সম্ভব সেটা বলা হয়েছে। অপরাধীদের যে একটি আলাদা জগৎ আছে, তাদের গোষ্ঠিগত জীবন যাপনের ফলে যে তাদের একটি বিশেষ সমাজ গড়ে উঠেছে, তাদের চিন্তাধারা, ভাষা কথোপকথন ইত্যাদি আপাতঃ দৃষ্টিতে অর্থহীন মনে হলেও, তাদের মধ্যে যে বিশেষ তাৎপর্য-

পূর্ণ অর্থ নিহিত আছে, ডঃ ঘোষাল তাঁর লেখার মাধ্যমে সেই সব নির্দেশ দিয়েছেন। কিশোর অপরাধী আর একটি বিশেষ ক্ষেত্র, যেখানে তিনি খুব সুচিন্তিতভাবে বিশ্লেষণ করে কতকগুলি মূল্যবান তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন। কেন তারা অপরাধী হয় এবং অপরাধী হবার আগে কি পরিবেশ বা মনোভাব এই অল্প বয়স্কদের অপরাধ ব্যাপারে প্ররোচনা যোগায় সে বিষয়ে পাঠকেরা বিশেষ প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন। মোটামুটি সংক্ষেপে বলতে গেলে বইটি যে কেবল জনসাধারণের কাছে বিশেষ উপভোগ্য হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার মতে যাঁরা অপরাধ-তত্ত্ব বিষয়ে মনস্তাত্ত্বিক অথবা অন্তদিক থেকে পঠন-পাঠন অথবা গবেষণার কাজে নিযুক্ত আছেন, তাঁদের এই অল্প সীমানার মধ্যে, ভারতীয় সভ্যতা, কৃষ্টি ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে এই বইটি 'রেফারেন্স' হিসাবে খুবই কার্যকরী হবে একথা বলা বাহুল্য মাত্র।

বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত-মনোবিদ্যা বিভাগে স্নাতকোত্তর স্তরে অপরাধ বিজ্ঞান পঠিত হয় এবং গবেষণার কার্য চালানো হয়ে থাকে। ডঃ ঘোষাল এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং অপরাধ মনস্তত্ত্ব বিষয়ে গবেষণা করে তিনি 'ডক্টরেট' উপাধি লাভ করেন। আমার খুবই আশা যে এই বইটি যথাযোগ্য জায়গায় সমাদর লাভ করবে এবং বর্তমান সমাজে এই ধরণের অবদান যে খুবই প্রয়োজন সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

সাংস্কৃতিক ভূমিকা

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ., পি-এইচ. ডি.
অধ্যক্ষ বাংলা বিভাগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ডঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ঘোষাল মহাশয়ের বিচিত্র ধরণের লেখার সঙ্গে বাংলা-দেশের কৌতূহলী পাঠকগণ সুপরিচিত। তাঁর কোন গ্রন্থের ভূমিকার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এই বইখানি পড়ে আমি যে আনন্দ পেয়েছি, এইজন্য তাঁকে অভিনন্দিত করতে চাই। তাঁর 'অপরাধ তত্ত্ব' 'অপরাধ বিজ্ঞান' ও সমাজ-বিজ্ঞানের একটি দুর্লভ বিশ্বকোষ। সামাজিক ও নৈতিক অপরাধের ইতিহাস যেমন বক্র ও বিচিত্র, তার প্রয়োগকৌশলও তেমনি বিশেষ বুদ্ধিমত্তার

পরিচায়ক। যা নিষিদ্ধ, অসামাজিক ও নিন্দনীয় তার প্রতি আমাদের একটা স্বভাব কৌতূহল থাকে। মানুষের নানা প্রকার চিত্তপ্রবণতা ও মানষিক বিকার, যা তাকে সাময়িকভাবে অমানুষ করে তোলে, তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক কারণ অনুসন্ধান এবং সেই সমস্ত মানসিক ব্যাধির নিদান নির্দেশ করে ডঃ ঘোষাল একটি মহত্তম সামাজিক কর্তব্যপালন করেছেন। তাঁর নিস্পৃহ বৈজ্ঞানিক মানসের নিরুত্তাপ সন্ধান প্রণালী ও মনোবিশ্লেষণ বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। অপরাধ জগতের পরিভাষাগুলিও খুবই সুচিন্তিত হয়েছে। পরবর্তী-কালের গবেষকগণ তাঁর কাছ থেকে বহু তথ্য-উপাদান পাবেন, যা এতোদিন পর্যন্ত দুর্লভ ছিল। 'অপরাধ-সাহিত্য' নামে পরিচ্ছেদটি নানাদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। ভাষা ও সাহিত্যের ভাণ্ডারে লেখকেরও কিছু দেবার আছে, তা এই পরিচ্ছেদ থেকেই অনুমান করতে পারি। তথ্য-সংগ্রহ, বিচার-বিশ্লেষণ, অপরাধ, অপরাধী এবং সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে তিনি যে গবেষণা করেছেন এখানে তা যথাসম্ভব বস্তুগতভাবে পরিবেশিত হয়েছে, এজন্য তাঁকে অন্তর থেকে সাধুবাদ দিই।

আইনী ভূমিকা

শ্রীযুক্ত শংকর প্রসাদ মিত্র

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি

ডঃ পঞ্চানন ঘোষালের বাংলা ভাষায় লেখা 'অপরাধ-তত্ত্ব' বইটির মুদ্রিত পাণ্ডুলিপি পড়ে দেখলাম। অপরাধ-বিজ্ঞান ও অপরাধী সম্বন্ধে ডঃ ঘোষালের জ্ঞান সুবিদিত। তাঁর নিজস্ব চাকুরী জীবনের অভিজ্ঞতা ও গবেষণাসমৃদ্ধ পূর্বে প্রকাশিত কয়েকটি বই জনসমাজে বিশেষ আদৃত। এই বইখানি তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব বিভাগের জন্য বাংলা টেক্সট বুক হিসাবে লিখেছেন এবং ভারতীয় ভাষায় ক্রিমিনোলজি সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ প্রথম টেক্সট্ বুক রূপে তিনি দাবী করেন। বইটির বিভিন্ন অধ্যায়ে তিনি অপরাধ বিজ্ঞানের সামাজিক, মনস্তাত্বিক, অর্থ নৈতিক, আইনগত ও ফোরেন্সিক দিক থেকে উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করেছেন।

আমি আশাকরি শুধুমাত্র ছাত্র ছাত্রী নয়—যাঁরা ক্রিমিন্যাল সাইকোলজি ও ব্যবহারিক অপরাধ বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা করেন বা জানতে আগ্রহী, তাঁরা এই বই পড়ে বিশেষ উপকৃত হবেন।

২২শে জুলাই, ১৯৭৬

[মহামান্য প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত শংকর প্রসাদ মিত্র মহোদয়ের কিশোর অপরাধী সম্পর্কে পৃথক মন্তব্য। এই বৃহৎ পুস্তকে সন্নিবেশিত ঐ একই 'কিশোর অপরাধী' পরিচ্ছেদ দুইটি দ্রষ্টব্য]

"ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল প্রণীত কিশোর অপরাধী পড়ে বিশেষ প্রীত হলাম। অপরাধ বিজ্ঞান বিষয়ে ডঃ ঘোষালের গভীর গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও কর্মসূত্রে প্রাপ্ত বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা সর্বজনবিদিত। ডঃ ঘোষাল শুধুমাত্র অপরাধ অনুষ্ঠানের কারণগুলি মনস্তাত্ত্বিক বা পারিপার্শ্বিক দিক হতে বিশ্লেষণই করেননি, প্রতিকারের উপায় ও সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশও তিনি করেছেন।

বর্তমানে আমাদের দেশের তথা সারা বিশ্বের কিশোর'রা নানা কারণে অশান্ত, ডঃ ঘোষাল এই বইটিতে ঐ বিষয়ে বিষদ আলোচনা করেছেন এবং সমস্যাগুলি সমাধানের উপায় নির্ধারণে তাঁর সান্বিষ্ট প্রয়াস প্রশংসনীয়।

সকল দিক বিচার করলে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে শুধু মাত্র সাহিত্য ক্ষেত্রে নয়, আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের ক্ষেত্রে এবং আমাদের এই সমস্যা-জর্জ্জরিত সমাজের পক্ষে এই বইখানি একটি অমূল্য সম্পদ।

আমার মনে হয় যে, শুধু মাত্র মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজসেবীর পক্ষে নয়, সরকারী কর্তৃপক্ষ বিশেষতঃ পুলিশ বিভাগের কর্তৃপক্ষের পক্ষে বইখানি অবশ্য পাঠ্য।

পরিশেষে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই ডঃ ঘোষালকে তাঁর এই বইখানি প্রণয়নের জন্য।

১০ই এপ্রিল, ১৯৭৪

ছদ্মবেশে লেখক স্বয়ং

(পূর্ব্বে পুলিশের মধ্যে ছদ্মবেশে শ্বশ্রুগুম্ফ ও ভেক-আদি গ্রহণের রীতি ছিল। কিন্তু লেখক সেখানে প্রথম বিভিন্ন বৃত্তিগত ব্যক্তির স্বাভাবিক পোষাক ও আবরণ অনুকরণের রীতি প্রবর্তন করেন। অপ্রত্যাশিত স্থানে ঐরূপ ছদ্মবেশীদের কেউ চিনেও চিনতে পারে না। খোকা গুণ্ডাকে ধরবার সময় লেখক যে ছদ্মবেশ নেন তারই ছবি উপরে দেওয়া হল।)
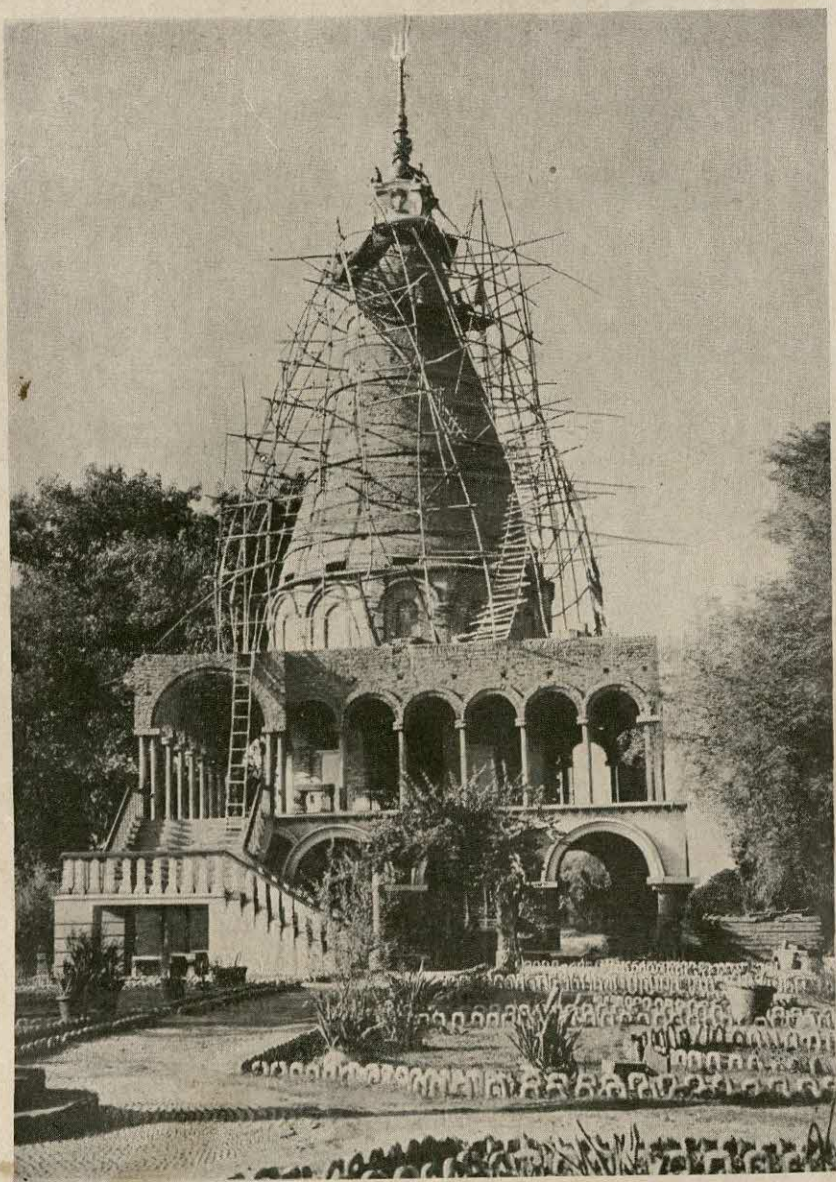
ডাইভারশন্যাল থেরাপী ব্যবস্থা
(নৈহাটী অঞ্চলে লেখক স্থাপিত আবাসিক হাইস্কুল)

আদিম যুগীয় মানুষ
(কঙ্কাল হতে পুণর্গঠিত)

সৎ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ বালক
(মঙ্গোলীয় গোত্রানুক্রম)

মৎ সংগৃহীত ভাঙন যন্ত্র

॥ ১ ॥
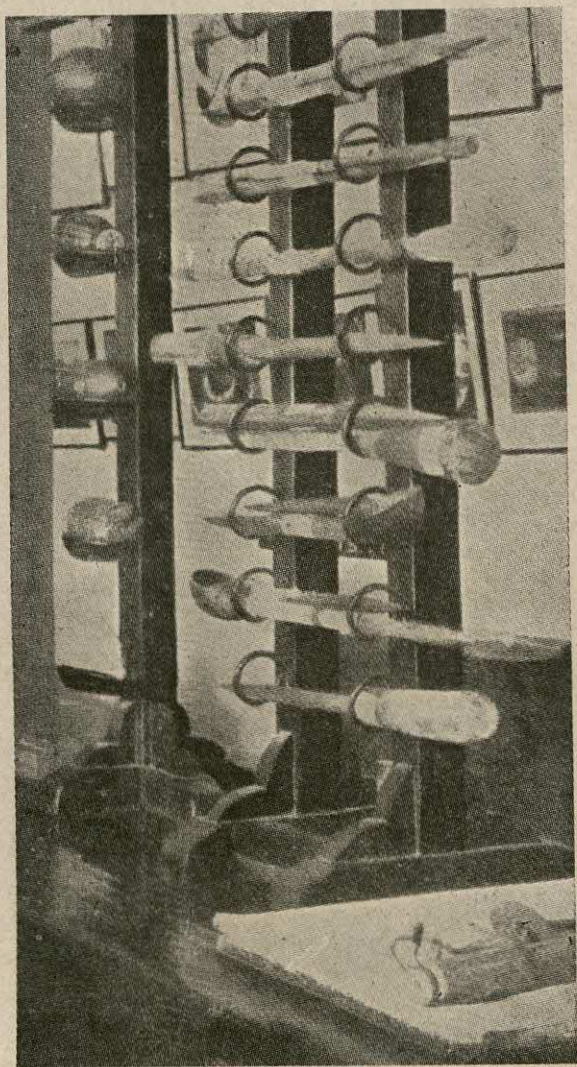
মনস্তাত্ত্বিক অপরাধ

ক্রিমিনোলজি পৃথিবীর সর্বদেশে মূলতঃ একরূপ হলেও দেশভেদে কিছু বিষয়ে তাদের মধ্যে পার্থক্য থাকে। আমাদের অপরাধীরা সামাজিক অবস্থা ও ব্যবস্থার অপফল তথা বাই-প্রোডাক্ট। এজন্য য়ুরোপের পরিপ্রেক্ষিতে য়ুরোপীয়দের দ্বারা রচিত অপরাধ-তত্ত্ব প্রতিটি ক্ষেত্রে এদেশের উপযোগী নয়। মনস্তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক অপরাধতত্ত্বের মত ফোরেনসিক বিদ্যা সম্পর্কেও এই মতবাদ কম-বেশী প্রযোজ্য। এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জল-বায়ুর পৃথক প্রভাবের জন্য এ রকম হয়ে থাকে। এ কারণে আমাদের নিজেদের অপরাধ-বিজ্ঞান নিজেদের গড়ে নিতে হবে। নিম্নোক্ত উদাহরণটি দ্বারা বক্তব্য বিষয়টি বোঝানো যাবে।

কোনও একটি সুন্দরী যোড়শী য়ুরোপীয় তরুণীর সহিত রাজপথে দেখা হলে আপনি তাকে বললেন: 'ওঃ মিস্! হাউ লাভলি ইউ আর। অর্থ—আপনার মুখ সুন্দর। আপনার রূপ খুব মিষ্টি।' এবম্বিধ বাক্য শুনে ঐ তরুণী মনে মনে খুশী হবে এবং বাইরে মুখে সলজ্জ ভাবে আপনাকে বলবে: 'ওঃ নো নো। থ্যাঙ্ক ইউ। আই ডু নট্ ডিজার্ভ ইট্। অর্থাৎ না না। আমি এই প্রশংসার একটুও উপযুক্ত নই।' কিন্তু আপনি ঐ একই বাক্য ঐ বয়সের জনৈকা ভারতীয় তরুণীকে বললে সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে হল্লা সুরু করে দেবে। এখানে পারসন তথা ব্যক্তি একই। অর্থাৎ উভয়েই নারী। ওদের বয়স-কাল তথা এইজ্ গ্রুপিংও এক। অর্থাৎ উভয়েই যোড়শী তরুণী। ওদের উপর প্রযুক্ত ভাষা তথা ষ্টিমিউলাসও একই রূপ। কিন্তু এর এফেক্ট তথা প্রতিক্রিয়া ভিন্ন রূপ হয়েছে।

অপরাধ-বিজ্ঞান তথা ক্রিমিনোলজির বহু দিক আছে; যথা সামাজিক তথা সোশ্যাল, মনস্তাত্ত্বিক তথা সাইকোলজিক্যাল, অর্থনৈতিক তথা ইকোনমিক্যাল, আইনগত তথা লিগ্যাল, ফোরেনসিক দিক, ইত্যাদি। কিন্তু মূলতঃ অপরাধ-বিজ্ঞানকে তিনটি মূল বিভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা (১) মনস্তাত্ত্বিক অপরাধ-তত্ত্ব তথা ক্রিমিন্যাল সাইকোলজি, (২) ব্যবহারিক অপরাধ-বিজ্ঞান তথা এপ্লায়েড্ ক্রিমিনোলজি এবং (৩) ফোরেনসিক সায়েন্স।

অপরাধ-বিজ্ঞান

ফোরেনসিক সায়েন্স	ব্যবহারিক অপরাধ	মনস্তাত্বিক অপরাধ

কতিপয় বিজ্ঞানের আইনী প্রয়োগ তথা লিগ্যাল অ্যাপ্লিকেশনকে ফোরেনসিক বিজ্ঞান বলে। একটি কেশ, মৃত্তিকা কণা, একটি রক্তবিন্দু, একটি তন্তু প্রভৃতির ফোরেনসিক বিশ্লেষণ দ্বারা বহু মামলার মীমাংসা করা সম্ভব। বর্তমান পুস্তকে আমি মাত্র ব্যবহারিক এবং মনস্তাত্বিক অপরাধ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করবো। এই পুস্তকটিতে ফোরেনসিক-বিদ্যা আমার আলোচ্য বিষয় নয়। তবে এইটুকু মাত্র বলবো যে, উহা প্রাচীন ভারতেও অপরাধ-নির্ণয়ের কার্যে ব্যবহৃত হতো। নিম্নের উদাহরণটি দ্বারা ইহা প্রমাণ করা যাবে।

"এক মালিনী ও এক রজকিনীর মধ্যে একটি কার্পাস সূত্রে গ্রথিত স্বর্ণ গুটিহারের দখলী স্বত্ব নিয়ে বিবাদ বাধলো। স্নানের ঘাটে চাতালে ঐ গুটিহারটি রেখে মালিক পুষ্করিণীতে নেমেছিল। স্নানের শেষে উপরে উঠে উভয়ে উহা নিজ সম্পত্তি রূপে দাবী করলো। নগর কোটাল উভয়কে উপ-রাজার নিকট আনলে উনি ফোরেনসিক বিদ্যা প্রয়োগে ঐ মামলার নিষ্পত্তি করে দিলেন। রাজা একটি কাঁচ পাত্রের তিন চতুর্থাংশ জল পূর্ণ করলেন। তারপর উনি ঐ স্বর্ণ গুটিহার হতে কার্পাস সূত্রটি ছিন্ন করে উহা ঐ জলপূর্ণ পাত্রে রাখলেন। এরপর ঐ পাত্রটি ঢাকনা দ্বারা আবৃত করা হলো। জলের উপরিভাগ ও ঢাকনার নিম্নে মধ্যবর্তী কিছুটা ফাঁক [air space] রাখা হয়েছিল। এতে উদকে দ্রবীভূত গন্ধকণা ঐ জল বাষ্প সহ ধীরে ধীরে উঠে ঐ ফাঁকে ঘনীভূত হয়। কিছু পরে ঐ ঢাকনা খুলে ঐ বাষ্প আঘ্রাণ করে রাজা ঐ গুটিহার মালিনীর সম্পত্তি ব'লে রায় দিলেন। মালিনী বৃত্তিগত ভাবে অহরহ ফুল তোলে ও মালা গাঁথে। তাতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গন্ধকণা অলক্ষ্যে গুটিহারের কার্পাস সূত্রে সন্নিবেশিত হয়। উহা জলে সিক্ত হলে গন্ধকণা বাষ্পের সহিত উপরে উঠেছিল। তাই অতো সহজে উপরাজা ঐ হার মালিনীর সম্পত্তি রূপে রায় দিতে পেরেছিলেন।"

বিগত শতাব্দীতে য়ুরোপে ইটালিয়ান পণ্ডিত লম্ব্রোসো এবং জার্মান পণ্ডিত গোরিঙ অপরাধ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা করেছিলেন। লম্ব্রোসো সাহেবের মতে নিম্নের চোয়াল লম্বা হলে এবং কারোর শূকরের মত চক্ষু হলে, শ্মশ্রুর অভাব ঘটলে বা কারোর স্থূল নাক পুরু ঠোঁট হলে সেই ব্যক্তি উৎকট অপরাধী হয়ে থাকে।

প্রাচীন গ্রীসে এইরূপ মতবাদ প্রচলিত ছিল। পণ্ডিত সক্রেটিশের মধ্যে এইরূপ কিছু চিহ্ন ছিল। এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়ে উনি বলেছিলেন ; 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার মধ্যে অপরাধ করার ইচ্ছা হয়। কিন্তু উহা আমি সব সময়ে দমন করে থাকি।' পৃথিবীর আদি যুগের মানুষের মধ্যে এইরূপ বহু বৈশিষ্ট্য ছিল। লম্ব্রোসোর

শিষ্যরা এই বিষয়ে আরও একটু এগিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের মতে এই সকল উঁচু কপাল লম্বা চোয়াল ও কুলো কান ও থ্যাবড়া নাক প্রভৃতি হতে ব্যক্তি বিশেষ কি কি প্রকারের অপরাধী হবে অর্থাৎ সে একজন চোর বা খুনে কিংবা যৌন-অপরাধী তা'ও নাকি জানা যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে জার্মান পণ্ডিত গোরিঙ সাহেব তাদের এই সকল ভুল ধারণা ভেঙে দেন। তিনি য়ুরোপের জেল সমূহে প্রায় তিন হাজার কয়েদীর দেহ পরীক্ষা করে প্রমাণ করেন যে, অপরাধ-স্পৃহার সঙ্গে অপরাধীদের দৈহিক চিহ্নগুলির কোনোও সম্বন্ধ নেই। গোরিঙ সাহেবের মতে চিত্ত-দৌর্বল্যের জন্যই মানুষ অপরাধ করে। এই চিত্ত-দৌর্বল্য তথা ফিবিল মাইণ্ডেড্‌নেসের একটি সংজ্ঞা আছে। একজন পনেরো বৎসর বয়স্ক বালকের যেরূপ বুদ্ধি থাকা উচিত, একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির যদি তাহা অপেক্ষাও দুই বা চার বৎসরের কম বয়স্কের ন্যায় বুদ্ধিশুদ্ধি হয় তো সেইরূপ বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিকে বলা হবে চিত্ত-দুর্বল ব্যক্তি। গোরিঙ সাহেবের মতে এই

সকল চিত্ত-দুর্বল ব্যক্তিরাই উৎকট অপরাধী হয়ে থাকে। তিনি পরীক্ষা দ্বারা এমন বহু চিত্ত-দুর্বল অপরাধীকে খুঁজে পান। কিন্তু ১৯১৪—১৯১৮ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কালে সৈন্যদের মধ্যে এরূপ বহুল পরীক্ষা করা হয়েছিল। এই সব পরীক্ষাতে দেখা যায় যে, প্রায় দশ লক্ষ সৈন্যের বুদ্ধিমত্তা ১৩ বা ১৪ বৎসর বয়স্ক বালকের মত। কিন্তু তাদের মধ্যে কেহ কখনও কোনও অপরাধ করেনি। এইরূপে গোরিঙ সাহেবের মতবাদও পরে ভুল রূপে প্রমাণিত হয়।

গোরিঙ সাহেবের মতবাদকে সম্পূর্ণরূপে বাতিল করা উচিত নয়। কারণ চিত্ত-দুর্বল বালকদের ভুল বুঝিয়ে প্ররোচনা দ্বারা অপরাধ করানো সম্ভব। অন্য রূপে লম্ব্রাসো সাহেবের মতবাদকে আংশিক পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা যায়। ওঁর মানসিক গোত্রানুক্রম সম্বন্ধে কোনও ধারণা ছিল না। উনি ভুল করে কেবলমাত্র দৈহিক গোত্রানুক্রমকে বিবেচনা করেছিলেন। এই সম্পর্কে মূল পুস্তকে আমি প্রমাণ সহ আলোচনা করেছি।

সাম্প্রতিক য়ুরোপীয় পণ্ডিতদেরও অপরাধ-বিজ্ঞানের মতবাদগুলি সম্পর্কে বিতণ্ডার বিরাম নেই। কিন্তু তাঁরা কোনও একটি বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে আজও আসেননি। এজন্য আমার এই থিসিসে সম্পূর্ণ নূতন একটি পথে গবেষণা কার্য করেছি। প্রাচীন ভারতেও অপরাধ-স্পৃহার অবস্থিতি এবং পরিবেশের ও কুসংসর্গের প্রভাব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হয়েছে। আমি উহার উদাহরণ স্বরূপ উপনিষদোক্ত একটি কাহিনী নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

"এক ব্রাহ্মণ পরিব্রাজক এক গৃহস্থের বাটীতে অতিথি হলেন। গৃহস্থ তাঁকে পরিতৃপ্ত আহারে আপ্যায়িত করে রাত্রে দুগ্ধফেননিভ শয্যাতে শয়নের ব্যবস্থা করে দিল। মধ্য রাত্রে ঐ ব্রাহ্মণ সুমধুর ঘণ্টাধ্বনি শুনে গবাক্ষপথে দেখলেন একটা গরুর গলাতে ঐ ঘণ্টা বাঁধা। ব্রাহ্মণের চিত্ত ঐ ঘণ্টার প্রতি তো আকৃষ্ট হলোই, উপরন্তু উহা লাভ করার একটা দুর্দমনীয় ইচ্ছাও তাঁর মনে এলো। ব্রাহ্মণ ঐ ঘণ্টা প্রাপ্তির লোভ দমন করতে প্রায় অপারগ। ঐ ব্রাহ্মণ মনে মনে ভাবলেন যে, তিনি ঐ ঘণ্টা গৃহস্থের নিকট চাইবেন। কিন্তু চাইলে যদি গৃহস্থ তাঁকে উহা না দেয়? ব্রাহ্মণ ঠিক করলেন যে, চৌর্য দ্বারা তিনি ঐ ঘণ্টা আহৃত করবেন। পরক্ষণেই ব্রাহ্মণ ভাবলেন, এ কি পাপ চিন্তা তাঁর মধ্যে আসছে! পরে উনি ভাবলেন যে, উনি ঐ ঘণ্টা তো ঠাকুরের ঘরের জন্য নেবেন। দেবতার জন্য উহা গৃহীত হলে তাঁকে চৌর্য পাপ স্পর্শাবে না। পুনরায় ঐ ব্রাহ্মণ চিন্তা করলেন যে, তা হতে পারে না। চৌর্যদ্বারা আহৃত

ঘণ্টাতে দেবতার পূজা হয় না। সারারাত্রি মনে মনে দগ্ধ হয়ে প্রত্যুষে ব্রাহ্মণ ঐ লোভ দমন করতে পারলেন।

প্রত্যুষে গৃহস্থ ঐ ব্রাহ্মণের কুশল সংবাদ নিতে এলে ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে প্রশ্ন করলেনঃ তুমি সত্য কথা বলো। তোমার পেশা তথা বৃত্তি কি? তোমার বৃত্তি তথা পেশা নিশ্চয়ই চৌর্য কার্য। দুই দিন দুই রাত্রি তোমার সাহচর্যে [এসোসিয়েসন] বসবাস করেছি। তাই অসৎ সঙ্গ দোষে এমন কু-প্রবৃত্তি আমার মনে জাগ্রত হয়েছে। এতে ঐ গৃহস্থ করযোড়ে বিনীত ভাবে উত্তর করলো, হ্যাঁ দেবতা, আপনি ঠিকই বুঝেছেন। আমি চৌর্য ও তস্কর বৃত্তি দ্বারা সংসার প্রতিপালন করি।"

বাক্যের ন্যায় কোনও ঘটনাও যে বাক্-প্রয়োগের তথা সাজেসসনের স্থলা-ভিষিক্ত হয়ে মানুষের সুপ্ত অপরাধস্পৃহাকে জাগ্রত করতে সক্ষম তা প্রাচীন ভারতীয়রা সেই সুদূর অতীতে জ্ঞাত ছিলেন। মহাভারতোক্ত একটি কাহিনী দ্বারা উহা প্রমাণ করা যাবে। নিম্নে ঐ চমৎকার ঘটনাটি উদ্ধৃত করা হলো।

"কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর তিন বীর (১) কৃপবর্মা, (২) ধৃষ্টদ্যুম্ন ও (৩) অশ্বত্থামা গহন বনে আশ্রয় নিলেন। রাত্রে তাঁদের কারোর চক্ষে নিদ্রা নেই। তাঁরা দেখলেন একটি বৃক্ষশাখাতে সাতটি কাক নিদ্রামগ্ন। কাক রাত্রে ঘুমায়। এই সুযোগে রাত্রিচর তিনটি পেচক ঐ সাতটি কাককে ভক্ষণ করলো। এই ঘটনাটি বাক্-প্রয়োগের স্থলাভিষিক্ত হয়ে তাঁদের সুপ্ত অপরাধস্পৃহাকে জাগ্রত করলো। তাঁরা ঐ রাত্রে তিন পেচকের মত জাগ্রত রয়েছেন। কিন্তু দ্রৌপদীর সাতটি পুত্র ঐ সাতটি কাকের মতই নিদ্রামগ্ন। তাঁরা তিনজন তখন গোপনে পাণ্ডবদের শিবিরে ঢুকে দ্রৌপদীর সাত পুত্রকে হত্যা করলেন। হতাশা ও ভয় আদি তাঁদের প্রতিরোধ-শক্তিকে বিনষ্ট করেছিল। তাই ঐ ঘটনাসম্ভূত ষ্টিমিউলাস সহজে তাঁদের অপরাধস্পৃহাকে দ্রুত জাগ্রত করতে পেরেছিল।"

পুনঃপুনঃ বাক্-প্রয়োগ দ্বারা অভিভূত করে প্রতিরোধশক্তি ও বিচার-বুদ্ধির সাময়িক ভাবে বিলোপ করার রীতিনীতি সম্বন্ধেও প্রাচীন ভারতীয়রা অবগত ছিলেন। পঞ্চতন্ত্রে 'ছাগ-ব্রাহ্মণ-প্রবঞ্চক' সম্পর্কিত কাহিনী প্রভৃতি থেকে উহা বুঝা যাবে। আইন ও প্রশাসন বিচার এবং পুলিশ তদন্তরীতি ও উহার সংঘটন আইনী সংজ্ঞা অপরাধ ও অপরাধী প্রভৃতি বিষয়ে ভারতীয়দের অবদান আমি পৃথক পুস্তকে বিবৃত করেছি। অপরাধ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে তাদের জ্ঞান এযুগেও বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

মানুষ মরে কেন বা তারা উন্মাদ হয় কেন এবং তারা অপরাধী হয় কেন? এই কঠিন প্রশ্ন বারে বারে আমাদের মনে উদয় হয়ে আমাদের উত্ত্যক্ত করেছে। এই কঠিন প্রশ্নের সদুত্তর মনস্তাত্ত্বিক অপরাধ বিজ্ঞান পাঠে জানা যায়। অপরাধ ও অপস্পৃহার কারণ সহ উহাদের চিকিৎসা পদ্ধতিও এই বিভাগে বর্ণিত হয়েছে।

ব্যবহারিক অপরাধ বিজ্ঞানে বর্ণিত তথ্যের সাহায্যে পুলিশ কর্মীরা অপরাধ নিরোধ ও নির্ণয় করে থাকে। এই একই ব্যবহারিক অপরাধ বিজ্ঞানের তথ্যাদি-মত অপরাধীরাও সুষ্ঠু ভাবে তাদের অপকর্মসমূহ সমাধা করে। এই খণ্ডে উহাদের মনস্তাত্ত্বিক দিকটি মাত্র আলোচিত হবে। এই বিভাগটি অ্যাপ্লায়েড সাইকোলজির সহিত তুলনীয়। এই শাস্ত্র পাঠে সাতদিন পূর্বে জানা যাবে যে, সাত দিন পরে তাদের বাটীতে একটি দুরূহ সিঁদেল চুরি হতে পারে। এই শাস্ত্র পাঠে পকেটমারীর দুই মিনিট পূর্বে পথচারী অবগত হবে যে, দুই মিনিট পরে তার পকেটের অর্থ খোয়া যেতে পারে। জনগণ এই শাস্ত্র পাঠ করলে তারা যে প্রবঞ্চকদের খপ্পরে পড়েছে তা বুঝে অগ্রিম সাবধানতা অবলম্বন করবে। কোনও নারী এই শাস্ত্র পাঠ করলে বুঝে নেবে কি উদ্দেশ্যে সদালাপী পুরুষটি তার প্রতি এতো আগ্রহ প্রকাশ করছে। অভিভাবকরাও তাদের কন্যাদের হিতার্থে নবাগত ব্যক্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বুঝে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারবেন।

মনস্তাত্ত্বিক অপরাধ-বিজ্ঞান মানুষের আত্ম-বিশ্লেষণের অন্যতম সহায়ক। [আত্মানং বিদ্ধি] উহা মানুষের মনকে চুলচেরা ব্যবচ্ছেদ করে উহার স্বরূপ তাদের নিকট প্রকট করে। এই অবস্থাতে শীঘ্রই সে নিজেই অপরাধী হবে বুঝে সময়ে সাবধান হয়ে নিরাময় হবে। অভিভাবকরা তাঁদের পুত্র-কন্যাদের মধ্যে অপরাধস্পৃহা বা যৌনস্পৃহা কতোটা রয়েছে, কি কারণে উহা কতোটা তাদের মধ্যে এসেছে তা জেনে তাদের নিরাময়ার্থে এই পুস্তকে বর্ণিত পন্থা মত ব্যবস্থা অবলম্বনে সমর্থ হবেন।

বহু নাগরিক বিড্ গ্যাম্বলিং এবং টপকা ঠগীদের কবল হতে আমার অপরাধ পদ্ধতি সম্বলিত পুস্তক পাঠে সময়ে নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছেন। প্রবঞ্চনার প্রচেষ্টা সম্পর্কিত মামলায় আদালতে সাক্ষ্য দিবার কালে তাঁরা বলেছেন যে, ওদের কার্যকরণ ও ভাষা প্রয়োগ আমার পুস্তকটিতে হুবহু বর্ণিত ছিল। আমার পুস্তকে বর্ণিত বিষয়গুলির সহিত উহাদের বাক্য ও কার্যাদির অপূর্ব মিল বুঝা

মাত্র ওঁরা ওদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝে আত্মসংবিৎ ফিরে পেয়ে স্থান ত্যাগ করেছিলেন। নচেৎ তাঁদেরও অন্যদের মত ওদের দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়ে বহু অর্থ অযথা খোয়াতে হতো।

অপরাধ-বিজ্ঞানের জ্ঞান পুলিশ-কর্মী, বিচারক ও প্রশাসকদের মত সাধারণ নাগরকিদেরও প্রয়োজন আছে। পুলিশ কর্মীরা নাগরিকদের অপেক্ষা কোনও বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী নন। গৃহ তল্লাস প্রভৃতি সামান্য কয়েকটি বিষয় ব্যতিরেকে পুলিশের প্রায় সকল ক্ষমতাই প্রয়োগে তারা অধিকারী, কেবল মাত্র অসাধু পুলিশ কর্মীরা নিজেদের জন্য নাগরিকদের অপেক্ষা অতিরিক্ত ক্ষমতার দাবী করে। নাগরিকদের প্রত্যেকের করণীয় কার্য নাগরিকদের পক্ষে পুলিশ সমাধা করে মাত্র। কারণ পুলিশের করণীয় কার্যের জন্য অন্যান্য কার্যের পর তাদের পর্যাপ্ত সময় থাকে না। এজন্যে পুলিশ নামে একদল বেতনভূক ব্যক্তিকে তারা বিশেষ শিক্ষাদান করে য়ুনিফর্ম তথা উর্দীতে ভূষিত করেছে। চক্ষের সম্মুখে কোনও সাংঘাতিক পুলিশ-গ্রাহ্য অপরাধ ঘটতে দেখলে পুলিশের মত জনগণও উহা নিবারণ করতে এবং অপরাধীদের গ্রেপ্তার করতে বাধ্য। অন্যথায় পুলিশ দলের মত তারাও কর্তব্যে অবহেলার জন্য আদালতে সোপর্দিত হতে পারে। প্রভেদ এই যে, ধৃতিকৃত আসামীদের তৎক্ষণাৎ নাগরকিদের থানাতে পৌছতে হবে। অন্যদিকে পুলিশ ধৃতিকৃত আসামীদের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে উপস্থিত করতে বাধ্য। আদালতের করণীয় কার্য স্বহস্তে গ্রহণ করলে নাগরকিদের মত পুলিশরাও দণ্ডিত হয়ে থাকে।

পুলিশ পৃথিবীতে দুই প্রকারের হয়ে থাকে, যথা (১) জনগণ-সৃষ্ট এবং (২) শাসক-আরোপিত। জনগণ-সৃষ্ট পুলিশ নীচে হতে উপরে উঠে। উহা জনগণ দ্বারা জনগণের স্বার্থে সৃষ্ট হয়। কিন্তু শাসক-আরোপিত পুলিশ শাসকদের স্বার্থে উপর হতে শাসকদের দ্বারা আরোপিত হয়।

জনগণ-সৃষ্ট পুলিশ সর্বদাই স্থানীয় ও বিকেন্দ্রিত। স্থানীয় ব্যক্তিদের প্রয়োজনমত উহারা সৃষ্ট হয়। কেবলমাত্র জনগণের স্বার্থে কার্য করে বলে উহারা জনপ্রিয়। আমাদের দেশে চৌকিদার দফাদার প্রভৃতি ভারতের পূর্বতন জনগণ-সৃষ্ট পুলিশকে স্মরণ করায়। পূর্বে ভারতের গ্রামাঞ্চলে জনগণ-সৃষ্ট পুলিশ ছিল এবং রাজধানী ও বৃহৎ নগরসমূহে শাসক-আরোপিত পুলিশ ছিল। য়ুরোপের বিভিন্ন নগরে ও কাউন্টীতে আজও বিকেন্দ্রীত ও স্থানীয় জনগণ-সৃষ্ট পুলিশ দেখা যায়। য়ুরোপ ও আমেরিকাতে অপরাধীরা

এই গতির যুগে ত্বরিত গতিতে স্থানান্তরিত হয়ে প্রশাসনের অসুবিধা ঘটায়। কিন্তু তা সত্বেও দেশের স্থানীয় পুলিশগুলি একত্রিত করার চেষ্টা হলে জনগণ তাতে বাধা দিয়েছে। শাসক-আরোপিত পুলিশ চেষ্টা করলে জনগণের বন্ধুস্থানীয় হলেও কখনও তাদের সন্তানতুল্য হবেন না। স্থানীয় বিকেন্দ্রীত জনগণ-স্বষ্ট পুলিশ জনগণের সন্তানতুল্য হওয়াতে তারা ওদের সকল দোষ ও ত্রুটি সানন্দে ক্ষমা করে। য়ুরোপ ও আমেরিকাতে মিউনিসিপ্যালিটিগুলির প্রায়ই নিজস্ব পুলিশ আছে। পূর্বতন শতাব্দীতে অধিগৃহীত হবার পূর্বে কলিকাতা পুলিশও কলিকাতা করপোরেশনের বেতনভুক ও অধীন ছিল।

শাসক-আরোপিত পুলিশ মাত্র শাসকদের স্বার্থে কার্য করে। উহা অবিকেন্দ্রীত এবং সমগ্র দেশ বা প্রদেশের জন্য এক অধিকর্তার অধীন একটি মাত্র সংগঠন। ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ব্রহ্মদেশ, প্রভৃতি পূর্বতন কলোনিয়ান রাষ্ট্র সমূহে শাসক-আরোপিত পুলিশের প্রাধান্য। কিন্তু চির স্বাধীন রাষ্ট্রগুলিতে বিকেন্দ্রীত স্থানীয় জনগণ-স্বষ্ট পুলিশ আজও দেখা যায়।

পৃথিবীতে ভ্যাকুয়াম বা শূন্যের কোনও স্থান নেই। তাই রাষ্ট্রীয় পুলিশ তার করণীয় কার্য না করলে স্থানে স্থানে বিকেন্দ্রীত প্রাইভেট পুলিশ স্বষ্ট হয়ে থাকে। প্রয়োজনীয় শিক্ষাদীক্ষা ও সংগঠনের অভাবে তাদের কার্য প্রতিটি ক্ষেত্রে সুসংহত হয়নি। এজন্য সর্বক্ষেত্রে কর্তব্যে অপারগ রাষ্ট্রীয় পুলিশকেই দায়ী করা উচিত হবে।

সমগ্র দেশ ও প্রদেশের সহিত সম্পর্করহিত স্থানীয় অপরাধীদের নিরোধ ও নির্ণয় কার্যে পূর্বতন জনগণ-স্বষ্ট স্থানীয় পুলিশ অত্যন্ত দক্ষ ছিল। কারণ এই সব বিষয়ে সমগ্র জনগণ অকজিলিয়ারী পুলিশ রূপে তাদেরকে সাহায্য করেছে। স্থানীয় পুলিশ বিধায় এরা স্থানীয় প্রত্যেকটি ব্যক্তির মেজাজ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে অবহিত থাকাতে এদের কর্তব্য কার্য সহজ ছিল। এদের কার্যাদি মিটমাট-পন্থী হওয়াতে অযথা জনগণ আদালতে হয়রানি হয়নি। উপরন্তু বিপথগামী ব্যক্তিরা ওদের সাহায্যে তাদের চরিত্র সংশোধনে সমর্থ হতো। এজন্য তৎকালে গ্রামীণ পুলিশ নিম্নোক্ত প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করেছে :

সুধারা—শান্তি—সুরক্ষা

তৎকালে নানাভাবে ও নানা উপায়ে মানুষের অপরাধস্পৃহাকে অধোমুখী করার প্রচেষ্টা হয়েছে। কারণ ঐ সময়ে আইনের ভাষা তথা ওয়ার্ডিঙ-এর বদলে উহার উদ্দেশ্য তথা পারপাসের উপর অধিক প্রাধান্য দেওয়ার রীতি ছিল।

কিন্তু বর্তমান বিদেশী পুলিশ সংগঠন ও বিচার ব্যবস্থা নিসঃন্দেহে আমাদের সুপ্ত অপরাধস্পৃহার বহির্বিকাশের অন্যতম সহায়ক। কোনও যন্ত্র তথা মেসিনের মত সংগঠন দ্বারা মানুষের মনকে বিচার করে তাকে নিষ্পাপ করা কখনও সম্ভব নয়। এই জন্য প্রাচীন ভারতের মত বর্তমান ভারতে অপরাধীরা অতো স্বল্প সংখ্যক নয়।

"আমি কিছু 'মিসার' তরুণ আসামী ও-তার অভিভাবকদের থানাতে বসে কাঁদতে দেখেছি। আমার মতে তৎক্ষণাৎ তাদের মুক্তি দিয়ে অভিভাবকদের সাহায্যে তাদের শোধরানো উচিত। এই বিষয়ে ফরিয়াদীদের বোঝালে তারাও এতে সম্মতি ও সাহায্য দেবে। যারা কাঁদে বা অনুতপ্ত হয় তারা নিশ্চয়ই সংশোধনযোগ্য। তরুণদের আত্মসম্মান রক্ষার্থে তাদের তখুনি গ্রেপ্তার না করে তদন্ত করা উচিত। একবার আত্মসম্মান ও লজ্জাবোধ নষ্ট হলে ওদের পুনরায় নিরপরাধী করা কষ্টসাধ্য হবে। জেলে পাঠিয়ে ওদের অসৎ সঙ্গে পাকাপোক্ত অপরাধী করা একটি অপরাধ।"

আইনাদি ও প্রশাসনের একমাত্র উদ্দেশ্য জনগণের উপকার করা হলে অপরাধ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞানের প্রয়োজন। উহাদের স্বভাব-চরিত্র ও বিবিধ শ্রেণী প্রভৃতির জ্ঞানে অপরাধ নির্ণয় ও নিরোধ সহজ হয়। সমাজসেবীদেরও এই একই কারণে বিভিন্ন অপরাধীদের বুঝতে হবে, জানতে হবে এবং তাদের ভালবাসতে হবে। গবেষকদের গবেষণার জন্য প্রথমে আত্মবিশ্লেষণের রীতি-নীতি সম্বন্ধে অবগত না হলে 'পর-বিশ্লেষণ' তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, অর্থাৎ অন্যের ভাবনাকে নিজের মধ্যে প্রথমে খুঁজতে হবে। এই সম্পর্কে একটি উদাহরণ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

'আমি উর্দ্ধতন কর্মী থাকা কালে জনৈক অধীন কর্মীকে কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারতাম না। তাকে পুরস্কার ও প্রমোশন দিতে বা গোপন নথীতে মন্তব্য লিখতে আমার বহু দ্বিধা। অথচ ঐ কর্মীটি সর্ব বিষয়ে নির্দোষ এবং সৎ ও দক্ষ। এর কারণ সম্বন্ধে আমি আত্মবিশ্লেষণ সুরু করি। আমি মনের পথে ক্রমান্বয়ে পিছুতে পিছুতে এক সময় উহার কারণ বুঝে নিজেই অবাক হই। আমার বাল্যকালে হুবহু ঐ অফিসারের মত এক ব্যক্তি আমাকে কটু বাক্য বলেছিল। কিন্তু তৎকালে ঐ জন্য তার উপর আমি প্রতিশোধ নিতে পারিনি। পরবর্তীকালে ঐ ক্ষোভ ভুলে গেলেও উহা অবচেতন মনে রয়ে গিয়েছিল। বহু ক্ষেত্রে এই মূল বিষয়টি স্মরণে না এলেও উহার আনুসঙ্গিক

বিষয় মনে আসে। এ-ক্ষেত্রে উহা ষ্টিমিউলাস রূপে মাত্র ঐ ক্ষোভটি'কে বাহিরে এনেছে। এটা জানা মাত্র আমি লজ্জিত হয়ে তার উপর-সদয় হতে থাকি।'

[বহু ক্ষেত্রে আমাদের মন অশান্ত হয়। কিন্তু কি জন্য তা বোধগম্য হয় না। মানুষের মধ্যে বহুবিধ কমপ্লেক্স তথা 'মনো-জট' থাকে। ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের এজন্য মধ্যে মধ্যে আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত। দৈহিক তথা ফিজিক্যাল এলার্জির মত বহু মানসিক তথা মেণ্টাল এলার্জিও আছে।]

উগ্র সাম্প্রদায়িকতা বংশানুক্রমিক সুপ্ত প্রতিশোধস্পৃহা হতেও সৃষ্ট হয়। সেই ক্ষেত্রে উহার মধ্যে ঐতিহাসিক কারণ নিহিত থাকে। ওদের ঐ বংশগত সুপ্ত ও পরে জাগ্রত ব্যাধির অসারতা নৃতত্ব প্রভৃতি দ্বারা বুঝানো দরকার। ইতিহাসও বাক-প্রয়োগের স্থলাভিষিক্ত হয়ে ঐ ব্যাধির নিষ্ক্রামণ ঘটাতে পারে। ওদের সর্ব প্রথম বোঝাতে হবে যে ধর্মে পৃথক হলেও জাতিতে তারা সকলে এক। পূর্ব-পুরুষদের কতিপয় ব্যক্তির ভুলের জন্য পরবর্তী পুরুষরা দায়ী হবে কেন? সকলে একই দেশের জল-বায়ুতে বর্ধিত। তাদের ব্লাড্ গ্রুপিং ও মুখাবয়ব প্রভৃতি হতে এক জাতিত্ব সুপ্রমাণিত হবে।

[মেটিরিয়াল তথা অন্তর্নিহিত সুপ্ত বীজ প্রস্তুত থাকে। নেতারা ইন্ধন দ্বারা উহা জাগ্রত করেন। সত্য উদ্ঘাটন দ্বারা ঐ বীজ চিরতরে নিষ্ক্রিয় করা যায়। পুনঃ পুনঃ রক্ত মিশ্রণের ফলে কোনও বিশুদ্ধ জাতি অধুনা-কালে নেই।]

॥ ২ ॥

প্রকৃত অপরাধী

প্রকৃত অপরাধীদের সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে হলে উহার একটি পরিসংজ্ঞা তথা ডেফিনেসন সম্বন্ধে ধারণার প্রয়োজন আছে। শেষ পর্যায়ের অপরাধী সম্বন্ধে এইরূপ পরিসংজ্ঞার সবিশেষ প্রয়োজন। মানুষ অভাবের তাড়নাতে কিংবা অবস্থাগতিকে একাধিকবার অপরাধ করলেও তজ্জন্য তার মধ্যে অনুতাপ ও লজ্জাবোধ থাকলে সে প্রকৃত অপরাধী নয়। কিন্তু সেই ব্যক্তি অনুতাপ ও লজ্জাবোধ হারানো মাত্র প্রকৃত অপরাধী হবে। প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে

আটটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যথা (১) গুরুতর, (২) সর্ব-স্বীকৃতি, (৩) পূর্ব-কল্পিত, (৪) আদর্শহীন, (৫) অসামাজিক, (৬) জ্ঞানত, (৭) স্বার্থযুক্ত, (৮) স্বেচ্ছাকৃত।

(১) গুরুতর: অপরাধ মাত্রই গুরুতর হওয়া চাই। সমাজের ধৈর্যের বহির্ভূত অপ্রীতিকর কার্য গুরুতর অপরাধ। সকল প্রকার অপকার্য অপরাধ

Crime Wheel [with ingredients]
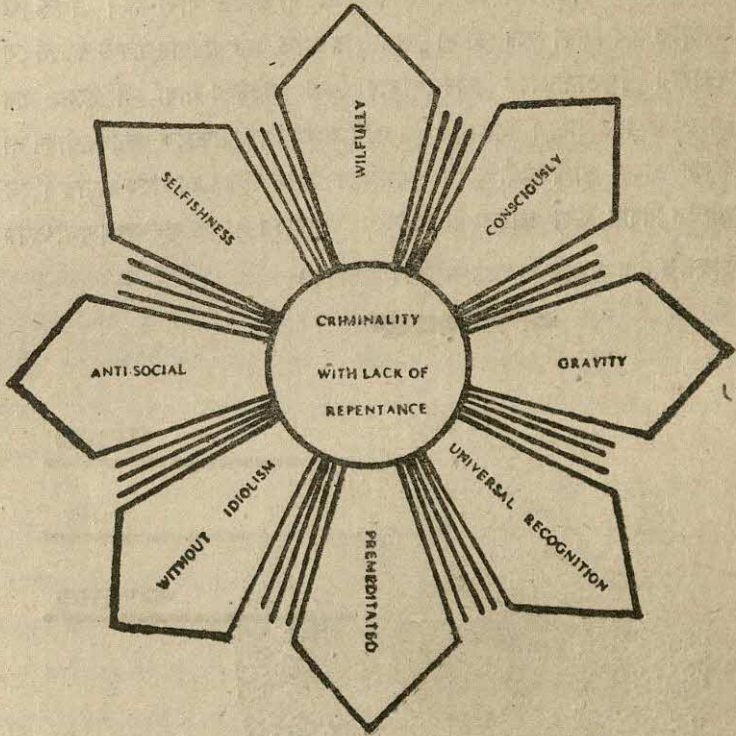
নয়। এজন্যে অপকর্মকে (১) অন্যায়, (২) পাপ ও (৩) অপরাধে বিভক্ত করা হয়েছে। গুরুতর অন্যায় পাপ, গুরুতর পাপ অপরাধ। অন্যায় ও পাপকে অপরাধের প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপ বলা হয়। জীবনের কোনও না কোন সময় বহু ব্যক্তি অন্যায় বা পাপ করেছে। সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তি যা করে তা সমাজকে সহ্য করতে হয়। কিন্তু নির্দিষ্ট মাত্রা বা সীমা অতিক্রম না করলে তারা অপরাধী নয়।

[এদেশে দোলযাত্রায় এক শ্রেণীর হিন্দুর বহু অশালীনতা সহ্য করা হয়।

য়ুরোপে বড়দিনে সমাজ বহু বেলেল্লাপনা ক্ষমা করে। গ্রামাঞ্চলে 'নষ্ট চন্দ্র' তিথিতে বালকদের ফল-পাকুড় চুরি বরদাস্ত করা হয়। এই সকল সামাজিক রীতি তথা 'টাবু' দ্বারা তারা কৃত্রিম উপায়ে অপস্পৃহা নির্গত করে ; কিন্তু এই ভাবে বহির্গত অপস্পৃহা মাত্রা হারালে অপরাধীরও সৃষ্টি হয়। কারণ অপস্পৃহার সাময়িক নির্গমনও ক্ষতিকর। তবে বহু অন্যায়কারী এবং পাপী অপরাধী হয়ওনি।]

ভিখারীকে ভিক্ষা দিতে কেহ আইনতঃ বা ন্যায়তঃ বাধ্য নয়। কিন্তু কি অবস্থাতে সে ভিক্ষা করে তা না জেনে তার প্রতি রুষ্ট ব্যবহার কেউ করলে সে অন্যায়ী। পিতামাতাকে ভরণ-পোষণে কেউ আইনতঃ বাধ্য না হলেও সে ন্যায়তঃ উহাতে বাধ্য। কোনও পুত্র তার অক্ষম পিতামাতাকে ভরণ-পোষণ না করলে তাকে পাপী বলা হবে। অন্যদিকে জাল উইলে ভ্রাতাকে ফাঁকি দিলে গুরুতর বিধায় উহা ন্যায়তঃ ও আইনতঃ অপরাধ। এজন্য খুন জখম বলাৎকার ডাকাতি চুরি প্রভৃতি গুরুতর অপকার্য অপরাধ।

অপরাধ-চক্র
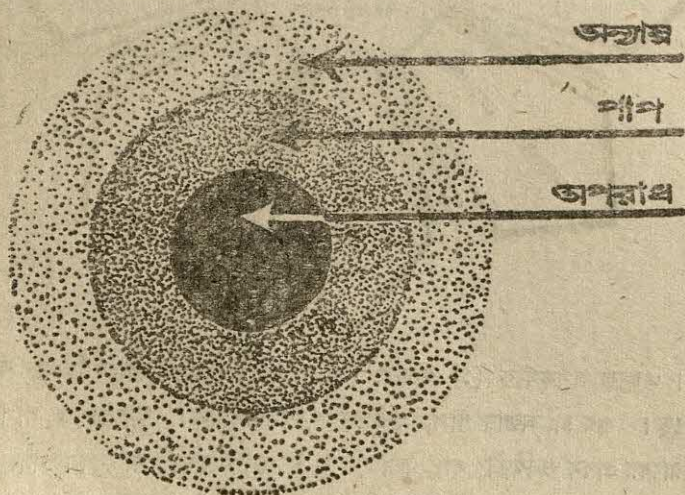
অন্যায় ও পাপ অপরাধের প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপ হওয়াতে এই দুটিকে দমন না করলে অপরাধ দূরীভূত হওয়া অসম্ভব। এজন্যে প্রাচীন ভারতে অপরাধীদের মত অন্যায়ী ও পাপীদেরও দমন করা হতো ; ঐ যুগে অপরাধের স্বল্পতা উহার

অন্যতম কারণ। বিদেশী শাসনকালে অপরাধ দমনের ভার রাষ্ট্রের উপর বর্তায় এবং অন্যায়ী ও পাপীদের শাসনের ভার সমাজ গ্রহণ করে। এজন্য গ্রামীণ সমাজে অপরাধ অত্যন্ত বিরল ছিল। উহা তখন মাত্র শহরাঞ্চলে সমাধা হয়েছে। কিন্তু সমাজ দুর্বল হওয়ার পর অন্যায়ী ও পাপীদের [সামাজিক শাসনের অভাবে] দমন করার কেউই থাকে না। উহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ অপরাধীদের সংখ্যা বেড়ে যায়।

বিঃ দ্রঃ—রাষ্ট্রীয় তথা আইনী অপরাধ এবং বৈজ্ঞানিক অপরাধে প্রভেদ আছে। নিজেদের অক্ষমতা ও দুর্বলতা ঢাকতে রাষ্ট্রকৃত বহু আইন সর্বজনস্বীকৃত অসামাজিক নয়। বরং তজ্জন্য রাষ্ট্রকেই অপরাধী বলা যেতে পারে। কিছু কন্ট্রোল আইন এই পর্যায়ের অপরাধ। উহাদের লঙ্ঘনকারীকে মাত্র অন্যায়ী বা পাপী বলা যেতে পারে। বহু ক্ষেত্রে পরবর্তী গভর্মেন্ট পূর্ববর্তী গভর্মেন্টের ঐরূপ আইন বাতিল করে দেন। তবে খাদ্যে ভেজালকারী এবং নোট বা মুদ্রা জালিয়াতরা চোর-ডাকাতাদির মতই অপরাধী। এইগুলি প্রত্যক্ষ ভাবে সমাজের ক্ষতি করে থাকে। কিন্তু পরোক্ষ ভাবেও সমাজের ক্ষতি করা যায়। তবে উহার ফলাফল সর্বক্ষেত্রে গুরুতর হতে হবে, তাহলে মাত্র উহারা অপরাধী-পদ-বাচ্য হবে।

'একদল দুর্বৃত্ত কোনও পল্লী আক্রমণ করতে উদ্যত, পল্লীর সকলে উহাদের প্রতিরোধ করতে প্রস্তুত। কিন্তু কিছু ভীরু লোক তাদের সঙ্গে যোগ দিল না। এক্ষেত্রে মাত্রা মত তারা অন্যায়ী বা পাপী ; কিন্তু ওরা যদি প্রতিরোধকারীদের আত্মরক্ষার্থে সংগৃহীত অস্ত্রশস্ত্র সহ পলায়ন করে তাহলে তারা অপরাধী।'

স্বামী বা পিতার সহযোগিতায় কন্যাদের সহিত ব্যভিচারী পুরুষদের কর্মকে পাপকর্ম বলা হবে। কারণ উহা অন্যায় অপেক্ষা গুরুতর হওয়াতে পাপ-কার্য। এক্ষেত্রে ঐ পিতা বা স্বামী উভয়েও সেই পাপী পুরুষের মত সমভাবে পাপকার্য করে। ইহা সীমিত ক্ষেত্রে ক্ষতিকর হলেও ব্যাপক ভাবে সমাজের ক্ষতিকর নয়। এই জন্যে ওদের দমনে মাত্র সামাজিক শাসনের ব্যবস্থা আছে। উহার জন্য আইনী শাস্তির কোনোও ব্যবস্থা এদেশে নেই।

সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তি যে সকল অপকার্য মধ্যে মধ্যে করে, তার জন্য নিন্দামুখর হলেও সমাজ তা সহ্য করেছে। কিন্তু উহা মাত্রা অতিক্রম করা মাত্র সমাজ ও রাষ্ট্র সরব ও সক্রিয় হতে বাধ্য হয় ; সে ক্ষেত্রে উহাকে অন্যায় বা পাপ বলে নিশ্চুপ থাকা বিধেয় নয়।

(২) সর্বজন-স্বীকৃতি : প্রকৃত অপরাধ সকল যুগের সকল সভ্য মানুষদের দ্বারা [আদি মানব নহে] অপরাধ রূপে স্বীকৃত হওয়া চাই। এমন বহু লৌকিক অপরাধ আছে যা এক দেশে অপরাধ হলেও অন্য দেশে তা নয়। কিন্তু চুরি প্রভৃতি গুরুতর অপরাধ সকল দেশের সকল যুগের সভ্য মানুষের দ্বারা অপরাধ-রূপে স্বীকৃত। ভারতে আত্মহত্যার চেষ্টা অপরাধ হলেও জাপানে উহা একটি সামাজিক গৌরব। ভ্রূণ নষ্ট মাত্রই কিছুকাল পূর্বেও এদেশে অপরাধ ছিল। কিন্তু সম্প্রতি বিশেষ ক্ষেত্রে উহা আইনানুমোদিত হয়েছে। ইংলণ্ড প্রভৃতি কয়েকটি দেশে আত্মহন্তারকদের সম্পত্তি গভর্মেণ্ট বাজেয়াপ্ত করেন। কিন্তু এই দেশে ঐরূপ কোনও রীতি নেই। এই জন্য পাপ হলেও উহা অপরাধ নয়।

[অন্যায়, পাপ ও অপরাধের মধ্যে যা কিছু প্রভেদ তা গুরুত্বের তথা ডিগ্রির। উহাদের ঐ প্রভেদ বিষয়বস্তুর তথা 'কাইণ্ডের' নয়। এই তিনটির মধ্যে একই অপরাধস্পৃহা কম মাত্রাতে, মধ্য মাত্রাতে এবং বেশী মাত্রাতে থাকে। এজন্যে প্রায়ই অন্যায়ী থেকে পাপী এবং পাপী থেকে অপরাধী হতে দেখা গিয়েছে।]

(৩) পূর্ব-কল্পিত : প্রকৃত অপরাধ সর্বদাই পূর্ব-কল্পিত হয়ে থাকে। এক প্রকারের ব্যভিচার ও বিশ্বাসঘাতকতা কখনও পূর্ব-কল্পিত ভাবে সমাধা হয়নি। কেহ যখন পরস্ত্রীর সহিত প্রথম আলাপ করে তখন তার মনে কোনও অসৎ উদ্দেশ্য নাও থাকতে পারে। পরবর্তীকালে অতি ঘনিষ্ঠতায় কোনও এক দুর্বল মুহূর্তে হঠাৎ তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। অনুরূপভাবে গচ্ছিত দ্রব্য গ্রহণ করার কালে বহু ব্যক্তির ঐ দ্রব্য আত্মসাৎ করার ইচ্ছা থাকে না। পরবর্তীকালে দারুণ অভাবে ও লোভ বশতঃ উহা তারা আত্মসাৎ করে। কিন্তু উহাকে অপরাধ রূপে স্বীকার করলেও উহা দেওয়ানী মামলাতে পড়া উচিত। অপরাধী হলেও এরা দৈব বা আকস্মিক শ্রেণীর অপরাধী।

কিন্তু কেহ ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে একটির পর একটি নারীর সহিত ভাব জমালে কিংবা আত্মসাতের উদ্দেশ্যে কারো বিশ্বাস উৎপাদন করলে, তার ঐ অপকার্যসমূহ গুরুতর অপরাধ। এজন্যে তাদের কঠোর দণ্ড প্রাপ্য হয়ে থাকে, অন্যথায় ওদের যথাক্রমে অন্যায়ী বা পাপী বলা সমীচীন হবে।

(৪) আদর্শ-হীন : প্রকৃত অপরাধীকে সর্ব ক্ষেত্রে আদর্শ-হীন হতে হবে। ওদের মধ্যে কোনও আদর্শ না থাকাতে ওরা আদর্শমুক্ত। রাজনৈতিক অপরাধ সমূহ প্রায়ই আদর্শযুক্ত হয়ে থাকে। ওরা কোনও না কোনও আদর্শ দ্বারা

পরিচালিত হয়। এই জন্য উহাদের কখনও প্রকৃত অপরাধী বলা হয়নি। আজ যে বিদ্রোহী, কাল তাকে লোকে দেশপ্রেমী বলেছে। এই সকল অপরাধ ওরা মাত্র রাষ্ট্রের আইনের তথা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে করেছে। সমাজের ও জাতির বা স্বদেশের বিরুদ্ধে তারা অপরাধ করেনি। এদের বিপথগামী ভেবে রাষ্ট্র তাদের কিছুটা ক্ষমার চক্ষে দেখে ও বিশেষ সুযোগ সুবিধা তাদের দিয়ে থাকে। কিন্তু তারা সেই সঙ্গে সমাজকে বিব্রত করলে তারা নিশ্চয়ই অপরাধী হবে।

মাতার প্রতি সহানুভূতি এবং পিতার প্রতি ক্রোধ ও হিংসা কিছু বিকৃত রাজনৈতিক অপরাধের জন্মের কারণ। এখানে তার মন পিতৃরূপী রাজা হতে মাতৃরূপী পৃথিবীকে তথা ভূমিকে উদ্ধার করতে চায়। এই জন্য শিশুদের গোচরে যৌন-সঙ্গম করা উচিত নয়। মাতাপিতার এই বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত হবে।

(৫) অসামাজিক: এই অপরাধসমূহ দ্বারা পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভাবে সমগ্র সমাজের ক্ষতি হওয়া চাই। কেহ মাতা ভগ্নীর প্রতি যৌন অপকর্মে ক্ষিপ্ত হয়ে ঐ বলাৎকারকারীকে হত্যা করলে তার ঐ অপরাধকে প্রকৃত অপরাধ বলা যায় না। তার ঐ কার্য অসামাজিক তো নয়ই; বরং এতদ্বারা সে সমাজকে রক্ষা করেছে। এক্ষেত্রে সে রাষ্ট্রবিধির বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে। রাষ্ট্র বা সমাজের বিরুদ্ধে সে কোনও অপরাধ করেনি। রাষ্ট্রের করণীয় কার্য সে স্বহস্তে গ্রহণ করার জন্য মাত্র সে অপরাধী। কারণ ফরিয়াদীর উপর শাস্তি দেওয়ার ভার নিরাপদ নয়। তবে ঐ ক্ষেত্রে বিচারের সময় তার কার্য বিবেচনা করে লঘু দণ্ড দেওয়ার রীতি আছে।

নেপাল প্রভৃতি কয়েকটি রাষ্ট্রে পূর্বে এইরূপ ক্ষেত্রে দুই জন সাক্ষী রেখে ঐ দুর্বৃত্তকে হত্যা করা ঐ কালে আইনসিদ্ধ ছিল। এজন্য সেই ব্যক্তি দণ্ডিত না হয়ে প্রশংসিত হয়েছে।

(৬) স্বার্থযুক্ত: প্রকৃত অপরাধ প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বার্থযুক্ত হয়ে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ক্লিপটোম্যানিয়াক অপরাধ রোগীদের সম্বন্ধে বলা যেতে পারে। এই অপরাধীরা তাদের কোনও লাভের বা স্বার্থের জন্য অপরাধ করে না। তাদের অদম্য অপস্পৃহা উপশমের জন্য মাত্র তারা অপকর্ম করে। এরা চুরির পর অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়। দ্রব্যটি মালিককে ফেরৎ না দিতে পারলে উহা তারা বিনষ্ট করে। অনুতপ্ত ও লজ্জিত হলে তারা প্রকৃত অপরাধী নয়। উপরন্তু এদের কোনও অপকর্ম পূর্ব-কল্পিত হয়নি।

(৭) জ্ঞানত : উন্মাদ বা শিশুদের দ্বারা কৃত কোনও অপরাধ অপরাধরূপে বিবেচিত হয় না। উন্মাদদের প্রতিরোধশক্তি বিনষ্ট হওয়াতে এবং শিশুদের প্রতিরোধশক্তি গড়ে না উঠাতে তারা অপরাধী নয়। ভ্রমবশতঃ ঔষধভ্রমে কেউ কাউকে বিষ খাওয়ালে উহাকে অপরাধ বলা হয় না। প্রকৃত অপরাধ সর্বদা বুঝে-সুঝে ও সজ্ঞানে করা হয়ে থাকে।

(৮) স্বেচ্ছাকৃত : প্রকৃত অপরাধ আপন উদ্যোগে স্বেচ্ছাকৃত রূপে করা হয়ে থাকে। প্রাণভয়ে ভীত হয়ে অপরের ইচ্ছাতে ও নির্দেশে অপকর্ম করা অপরাধ নয়; অপরের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কোনও অপরাধ করলে উহা প্রকৃত অপরাধ নয়। স্বার্থান্ধ ক্ষমতালোভী কিছু নেতা ভুল আদর্শ দ্বারা অপরাধ-মুখী লোকদের বহু জঘন্য অপরাধে লিপ্ত করেছেন। এঁরা বহু মুখরোচক বাক্য দ্বারা ওদের সুপ্ত অপস্পৃহাকে বহির্গত করেছেন। যথা, 'ঐ ব্যক্তি বহু দরিদ্রের অর্থ আত্মসাৎ করেছেন। অতএব ওঁদের ধন সম্পত্তি লুঠ করলে উহা পাপ নয়। কিংবা ঐ ব্যক্তি বহু নারীর সর্বনাশ করে থাকেন; ওঁকে হত্যা করলে তোমাদের পুণ্য আছে।' ইত্যাদি। এজেন্ট প্রোপোগেটর দ্বারা প্ররোচিত হয়েও বহু সরল ও সাধু ব্যক্তি অপরাধ করে থাকেন। বাক্-প্রয়োগ তথা সাজেস্‌সনের ক্ষমতা অসীম। গণ-বাক্-প্রয়োগ বা মাস সাজেস্‌সন বহু লোককে একত্রে অপরাধীতে পরিণত করতে সক্ষম। জনসভাতে সাম্প্রদায়িক বক্তৃতা শ্রোতাদের সাম্প্রদায়িক এবং অসাম্প্রদায়িক বক্তৃতা শ্রোতাদের অসাম্প্রদায়িক করে। প্রভাবিত না হলে স্বাভাবিক অবস্থায় এরা কোনও অপরাধ করতো না। প্রভাব দ্বারা একটি বিশেষ মানসিক অবস্থা সৃষ্ট হয়ে থাকে। ইংরাজিতে উহাকে হিপনোটিজম বলা হয়। উহার রীতি-নীতি সম্বন্ধে কিছুটা ব্যাখ্যা করা যাক।

সাধারণতঃ পথে ঘাটে বা প্রেক্ষাগৃহে যে সম্মোহনবিদ্যা প্রদর্শিত হয়ে থাকে তার মধ্যে কারসাজি বা ফ্রড্ থাকে। বৈজ্ঞানিক সম্মোহনের সঙ্গে উহার কোনও সম্পর্ক নেই। বৈজ্ঞানিক সম্মোহনে বিশেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা নিম্নোক্ত তিনটি বিশেষ মানসিক অবস্থা তথা মেনটাল কনডিসন সৃষ্টি করা হয়।

প্রথমতঃ পুনঃ পুনঃ বাক্-প্রয়োগ তথা সাজেস্‌সন দ্বারা ওদের প্রতিরোধ-শক্তি তথা রেজিসটেন্স পাওয়ার কমান হয়। এতদ্বারা তাদের বিচারশক্তির সাময়িক বিলোপ ঘটে। উহাকে ইংরাজিতে টেমপোরারি সাসপেনসন অফ্ জাজমেন্ট বলা হয়। তবে বাক-প্রয়োগগুলি তার বিশ্বাস্য রূপে প্রয়োগ করতে

হবে। এই সঙ্গে তাকে বুঝাতে হবে যে, উপকার করার ক্ষমতা তার আছে এবং সে ঐ লোকের উপকার করবে। কেউ কারোকে কোনও শক্তিতে সম্মোহিত করতে পারে না। সম্মোহিত ব্যক্তিরা আপন স্বার্থে ইচ্ছাকৃত ভাবে তা হয়ে থাকে। উহারা প্রায়ই স্বার্থান্বেষী হয়ে থাকে এবং উহারা কিছু পেতে বা লাভ করতে চায়; যথা, পুত্রের চাকুরী, কন্যার সৎপাত্র, রেস খেলাতে জিত, স্ত্রীর রোগমুক্তি কিংবা নিজের ভগবৎ প্রাপ্তি ইত্যাদি। স্ব-জাতির উপকারও তাদের নিকট এক প্রকার স্বার্থ-সম্ভূত পাওয়ার মত।

গুরু শিষ্যকে নির্দেশ দিল, সে যেন ত্রিতলের ছাদে রৌদ্রে দুই ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে। অতি বিজ্ঞ শিষ্যও গুরুর আদেশ পালন করবে। তার ধারণা হবে উনি শিষ্যের উপকারার্থে ঐ আদেশ দিলেন। এর গুহ্য কারণ শিষ্য না বুঝলেও ঐ গুরু তা অবগত আছেন। এর পর ঐ গুরু শিষ্যকে ছাদের কার্নিশের ধারে দাঁড়াতে বললেও সে তাঁর সেই আদেশ নির্বিচারে পালন করবে। কিন্তু ঐ গুরু ঐ ছাদ থেকে তাকে নিচে লাফিয়ে পড়তে বলা মাত্র সে পিছিয়ে এসে ঐ গুরুকে চপেটাঘাত করবে। কারণ তখন সে বুঝবে যে, ঐ আদেশ তার স্বার্থের পরিপন্থী। উনি তার ক্ষতি তথা তাকে হত্যা করতে চান; ইহা বুঝামাত্র ঐ শিষ্য গুরুর প্রভাব হতে মুক্ত হবে।

এই বিদ্যা দ্বারা লোকের অপকারের মত বহু উপকার করাও সম্ভব। মনোবল রক্ষার্থে ভীতি দূরীকরণার্থে উহা অন্যতম সহায়। 'কিছু ভয় নেই; লাগবে না; ভালো হয়ে যাবেন;' প্রভৃতি বাক্-প্রয়োগ দ্বারা জ্ঞানী ব্যক্তিরা দৈহিক ও মানসিক ব্যাধি নিরাময়ে সক্ষম হন।

"সাধু-মন্ত ব্যক্তিদের শিষ্যরা আড়কাঠি তথা এজেন্ট রূপে নূতন শিষ্য রিক্রুট করতে বহু প্রকার বাক্-বিন্যাস সরলমতিদের বিশ্বাস্য রূপে সৃষ্ট করে; যথা, 'আচ্ছা! ওঁর যদি রোগ সারানোর ক্ষমতা থাকে তো গত বছর ওঁর নিজের নিমোনিয়া হলো কেন?' এর এরূপ উত্তর হবে: 'তা বুঝি জানো না! ঐ রোগ এক ভক্ত শিষ্যের হবার কথা। কিন্তু উনি তা নিজ দেহে নিয়ে এ যাত্রা শিষ্যকে রক্ষা করলেন।' 'এই মাত্র দেখে এলাম গুরুজীর কনিষ্ঠ পুত্র গেটে বসে শিষ্য-কন্যাদের সঙ্গে বেলেল্লাপনা করছে। এর পর আর আমার তোমার গুরু-সন্নিধানে যাবার প্রবৃত্তি হলো না'। এর উত্তর এইরূপ হবে: 'আরে ঐ তো কালভৈরব, ওখানে তোমাকে বাধা দেবার জন্য বসে রয়েছেন। ঐ সকল বাধা তথা বিতৃষ্ণা দূর করে সেখানে পৌছুতে হবে; ইত্যাদি।' এইভাবে

সম্মোহিত করে শিষ্যদের অর্থে বহু সস্ত্রীক গুরুর অট্টালিকা উঠছে ও সেই সঙ্গে ওদেরই অর্থে খোকা মহারাজ বিলাত গিয়েছে।"]

উপরোক্ত আটটি বৈশিষ্ট্যযুক্ত অপরাধকেই প্রকৃত অপরাধ বলা হয়েছে। এই জন্য দৈব অপরাধী, প্রাথমিক অপরাধী, রাজনৈতিক অপরাধী এবং অপরাধ-রোগীদের আমি প্রকৃত অপরাধী বলিনি। এদের মধ্যে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের সব-গুলি সমানহারে থাকেনি। অন্য বৈশিষ্ট্যগুলির উগ্রতাও তুলনাতে ওদের মধ্যে বহু কম দেখা যায়। এই সকল বিষয় বিবেচনা করে প্রকৃত অপরাধীদের জন্য নিম্নোক্ত পরিসংজ্ঞাটি নির্ধারিত করা হয়েছে। অপরাধীমাত্রই স্বেচ্ছাকৃত ও সজ্ঞানে অপরাধ করলেও উহা একশ্রেণীর অপরাধ-রোগী এবং উন্মাদ ও শিশুদের পক্ষে প্রযোজ্য নয়। অন্যদিকে রাজনৈতিক অপরাধী প্রায়ই আদর্শ-যুক্ত হয়ে থাকে। আদিষ্ট ও আবিষ্ট এবং সম্মোহিত ও প্ররোচিত অপরাধীদের সম্পর্কেও কিছুটা ঐরূপ বলা যায়।

"মানুষের সহ্যাতীত গুরুতর জ্ঞানতঃ ও স্বেচ্ছাকৃত ক্ষতিকারক আদর্শহীন স্বার্থযুক্ত অসামাজিক পূর্বকল্পিত ও সর্বজনগ্রাহ্য অকার্য বা কুকার্যকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে অপরাধ বলা হয়।"

আমি আমার সুদীর্ঘ কর্মজীবনে প্রায় ১৮ শত প্রকৃত অপরাধী, অপরাধ-মুখী ব্যক্তি, অপরাধ-রোগী, প্রাথমিক ও দৈব অপরাধী এবং রাজনৈতিক অপরাধীদের স্বভাব চরিত্র কার্যাবলী ও পরিবার সম্পর্কীয় তথ্য সম্বন্ধে অবহিত হয়ে উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি।

[সহযোগীয় অপরাধ তথা কন্ট্রিবিউটিং অফেন্স্ রূপেও একপ্রকার অপরাধ আছে ; এদের কোন শ্রেণীর অপরাধী বলা হবে কিংবা ওরা আদপে অপরাধী কিনা তাও বিবেচ্য। এদের ক্ষেত্রে কে কার বিরুদ্ধে ঐ অপরাধ করলো তা বুঝা দুষ্কর। ওদের অপরাধ কতোটা সমাজের বিরুদ্ধে গেল তাও বুঝতে হবে। এক্ষেত্রে উভয়ের অপরাধ প্রায় সমান সমান থাকে। নরনারীর ব্যভিচার এবং কিছু 'মোটর কলিসন' মামলা এই শ্রেণীর অপরাধ।

যৌনজ ব্যভিচার এবং পলায়ন ও বহিহরণ অপকর্মে নর ও নারীর উভয়ের সম্মতি-ক্রমে ঘটাতে উহাদের দায়িত্ব সমান সমান। কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইনে এজন্য মাত্র পুরুষ লোককে দায়ী করা হয়ে থাকে। এই মামলাতে নারী নাবালিকা হলে উহাকে প্রদর্শনী-দ্রব্য তথা একজিবিট রূপে ধরা হয়। কিন্তু উভয় পক্ষ নাবালিকা ও নাবালক হলে উহাতে মাত্র বালকটিকেই 'কিশোর-অপরাধী'

[জুভেনাইল] রূপে দায়ী করা হয়। এখানে আইন কেবলমাত্র নারীকে সর্বাগ্রে রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়েছে। কোনও এক বয়স্ক নারী এক নাবালক বালকের সহিত যৌন সঙ্গমের চেষ্টাতে ঐ বালকের অপাঙ্গ আহত করেছিল। এক্ষেত্রে মাত্র ঐ নারীকে পুলিশ-অগ্রাহ্ [ননকগ্] অপরাধ 'এ্যাসল্ট তথা স্বল্লাঘাত' অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু ঐ বালক বয়স্ক লোক হলে তাকেই নারীঘটিত অপরাধে অভিযুক্ত করে মেয়াদ দেওয়া হতো।

মোটর সংঘাত তথা কলিসন ঘটনা বস্তুতঃ পক্ষে বহু প্রত্যক্ষদর্শী-মন্য ব্যক্তিরা প্রায়ই দেখে না। দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরে তদন্তকারী পুলিশ ঘটনা-স্থলে গেলে দোকানী সাক্ষীগণ শুধু বলবে যে, হঠাৎ আওয়াজ শুনে তারা মুখ তুলে চায় ও দেখে যে, ঐ গাড়িটা ওখানে এবং এই গাড়িটা এখানে পড়ে রয়েছে। কিন্তু বহু ঘণ্টা বা কয় দিন বাদে তদন্তকারী কর্মীরা তদন্তে গেলে সাক্ষীরা কিছু না দেখেও ঐ ঘটনাটি কিরূপে হয়েছিল বা তা হওয়া সম্ভব সেই সম্বন্ধে মনে মনে কল্পনা করে। বেশ কিছুক্ষণ এইরূপ চিন্তার পর মনস্তাত্ত্বিক কারণে সে কিছু পরে উহা ঐরূপে ঘটেছিল এবং উহা সে ঐরূপই দেখেছিল বলে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করে। এই জন্য দেরীতে পুলিশ উহার তদন্তে এলে সাক্ষীরা সত্য রূপে বিশ্বাস করে তাদের সাক্ষ্যে মিথ্যা কথাই বলে।

এক্ষেত্রে গরীব পথচারীদের যা কিছু ভাবনা তা ধনী মোটরবিহারীদের বিরুদ্ধে গিয়েছে। আহত পথচারীদের প্রতি ওদের স্বাভাবিক সহানুভূতি উহার কারণ। অন্যদিকে মোটরবিহারীদের অভিজ্ঞতা এই যে, এদেশের লোক পথ চলতে জানে না। এজন্য মোটরের মালিক ও ড্রাইভারদের যা কিছু ধারণা তা এই পথচারীদের বিরুদ্ধে যাওয়া স্বাভাবিক। এইজন্য পশ্চাদগামী অন্যান্য মোটর আরোহীরা এই দুর্ঘটনা সম্বন্ধে তাদের বিলম্বিত সাক্ষ্যে তাদের ধারণাকে সত্য বুঝে মিথ্যা বিবৃতি দিয়েছে। এই কারণে পুলিশ কর্মীদের এইরূপ তদন্তে দ্রুতগতিতে ঘটনাস্থলে পৌছনো উচিত হবে।

[বিঃ দ্রঃ—বহু ক্ষেত্রে গৃহপলাতক বালকরা গৃহে প্রত্যাগমনের পর তাদের বয়স্ক নেতাদের পরামর্শে অভিভাবকদের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে বহু মিথ্যা ঘটনার উল্লেখ করে। এইগুলি সাময়িক ঘটনাবলীর সহিত সামঞ্জস্য রেখে রচিত হয়। যথা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকালে তারা বলে যে, বিধর্মীরা হত্যার উদ্দেশ্যে অন্য বালকের সহিত তাকে বস্তিতে বন্দী করে রেখেছিল। অন্য বালকদের ওরা কাটতে আরম্ভ করা মাত্র এক দয়ালু বৃদ্ধার সাহায্যে সে বেড়া টপকে বা তা

ভেঙে পালিয়ে এলো। বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে বাটী ফিরে তারা কৈফিয়ৎ স্বরূপ বলেছে যে, আমেরিকানরা তাকে ট্রাকে তুলে কোহিমার নিকট নিয়ে গিয়ে ভৃত্য করে রেখেছিল। ওদের জনৈক জেনারেল তা জানতে পেরে তাকে মুক্তি দিয়ে ওদের কলিকাতাগামী ট্রাকে এই মাত্র এখানে পৌছোলো। সংবাদপত্রে এইরূপ ঘটনা বেরোলে তাদের এই বিষয়ে আরও সুবিধা হয়েছে। কিন্তু এইরূপ কোনও উত্তেজক ঘটনা শহরে না থাকলে তারা এজন্য যা কিছু দোষ তা সাধু ও সন্ন্যাসীদের উপর আরোপ করেছে। যথা, এক কাপালিক সাধু তাকে মন্ত্রপূত ঔষধে অভিভূত করে বা কোনও তস্কর তাকে দলে নিতে মিষ্টি খাইয়ে অজ্ঞান করে অপহরণ করেছিল। ঐ কাপালিক সাধু গহন অরণ্যে এক কুঠিতে তাকে অন্য বহু বালক সহ বন্দী করে রেখেছিল ; মা কালীর সম্মুখে খাঁড়া দিয়ে উনি প্রতিদিন এক এক জন বালককে বলি দিয়েছেন। কেবল মাত্র সে-ই কৌশলে পলায়ন করে এক রেল ইষ্টিশনে এলে ষ্টেশনমাষ্টার দয়া করে তাকে একটা কলিকাতাগামী ট্রেনে টিকিট কেটে তুলে দিয়ে ছিলেন। তস্কর দল সম্বন্ধে প্রায়ই এরা একটি ভূগর্ভের কক্ষের বিশদ বর্ণনা দিয়েছে। এইগুলিকে প্যাথোলজিক্যাল লাইজ বা মিথ্যা-রোগ বলা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রেও বহু বালক তাদের সম্ভাব্য কৈফিয়ৎ পুনঃ পুনঃ চিন্তা করার পর মনস্তাত্ত্বিক কারণে উহা সত্যই ঐরূপভাবে ঘটেছিল বলে তারা একসময় বিশ্বাস করতে আরম্ভ করে।

এই সকল ক্ষেত্রে অভিভাবকরা স্নেহবশতঃ তাদের পুত্রদের ঐ সব অলীক কাহিনী সত্য রূপে বিশ্বাস করে আতঙ্কিত হয়ে পুলিশে ডাইরী করেছেন। কিন্তু পুলিশ বহু চেষ্টা করেও একটি ক্ষেত্রেও এইরূপ কোনও ঘটনার প্রমাণ খুঁজে পায়নি !]

পাপী ও অন্যায়ীদের সংখ্যাধিক্যের সহিত যে অপরাধীদেরও সংখ্যা বর্ধিত হয় তা ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ইঙ্গস্থানের [England] সমাজ-ব্যবস্থা থেকে প্রমাণ করা যাবে। এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা নামক প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, ঐ সময় ইংল্যাণ্ডে প্রতি ২৪ জন ব্যক্তির মধ্যে একজন ছিল অপরাধী। ঐ গ্রন্থ হতে এও জানা যায় যে, ঐ সময় ইংরাজ সমাজে অধিকাংশ ব্যক্তি ছিল পাপী কিংবা অন্যায়ী। ঐ সময় ইংরাজ সমাজে পাপ ও অন্যায়ের ব্যাপকতা ঐ পুস্তকের নিম্নোক্ত আখ্যান হতে বুঝা যাবে।

'ঐ সময় ইংরাজ বালকদের প্রিয় ক্রীড়া ছিল বয়েল নিধন। এতে বস্তির বালকরা চাঁদা তুলে একটি নিটোল গাভী ক্রয় করতো। ঐ নিরীহ

গাভীটিকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে এনে তার দুই কানে মটরদানা ভরা হতো, গাভীটি যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ছুটাছুটি শুরু করলে সকলে সোল্লাসে ত্যকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নিহত করতো।'

এই থেকে বুঝা যায় যে, তৎকালে ইংল্যাণ্ডের মানুষ কিরূপ অন্যায়ী ও পাপী ছিল। এই অবস্থায় সেখানে অপরাধীর সংখ্যা যে বর্ধিত হবে তাতে বিচিত্র কি ? ঐকালে ইংরাজরা হৃতসর্বস্ব হবার ভয়ে বাটীর বাহির হতে সাহস করতো না। এর থেকে অব্যাহতি পেতে ১৮২২ খৃষ্টাব্দে লর্ড পিল প্রথম পুলিশ বাহিনী সৃষ্টি করে সর্বপ্রথমে বস্তিগুলি অপসারণ করে ওখানকার অন্যায়ী ও পাপীদের প্রথমে দমন করলেন। এই পাপী ও অন্যায়ীদের দমন করার সঙ্গে সঙ্গে অপরাধীদের সংখ্যা এমনিই কমে এসেছিল। এইভাবে একটি অপরাধমুখী জাতিকে নিরপরাধী ও আইনানুরাগী জাতিতে পরিণত করা সম্ভব হয়।

এর বিপরীত চিত্রও ব্রহ্মদেশ আদি দেশে দেখা গিয়েছিল। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ব্রহ্মজাতি একদা সত্যবাদিতা ন্যায়পরায়ণতার জন্য ভারতের মত বিখ্যাত ছিল। কিন্তু ব্রিটিশরা ব্রহ্মদেশ জয় করার সঙ্গে সঙ্গে উহাকে পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন করতে সচেষ্ট হয়। উহার ফলে জনগণের উপর বৌদ্ধ ফুঙ্গিদের প্রভাব ধীরে ধীরে কমে আসে। ওদের সন্তানগণ পূর্বের মত পিতামাতার বাধ্য থাকেনি। কৃষকরা কৃষিকর্ম ছেড়ে পরিবারমুক্ত হয়ে দূর শহরে উদ্যোগশিল্পে শ্রমিক হয়। নাগরিকরা পারিবারিক প্রেম ও জাতীয় সংস্কৃতি হারাতে থাকে। উহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ অন্যায়ী ও পাপী এবং তদ্‌কারণে অপরাধীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। এই ভাবে ব্রহ্মদেশকে উহার দ্রুত উন্নয়নের মূল্য দিতে হয়।

উপরোক্ত তথ্য প্রমাণ করে যে, বস্তি উন্নয়নের বদলে বস্তি উচ্ছেদের প্রয়োজন সর্বাগ্রে। বস্তিগুলিতে ভদ্র গৃহস্থ পরিবারগুলি একই জলের চৌবাচ্চা ও পায়খানা ব্যবহারে বাধ্য হয়। উপরন্তু অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের মন্দ সঙ্গ ও পরিবেশ হতে রক্ষা করতে অক্ষম হন। বহুবিধ স্বভাবের ও চরিত্রের ব্যক্তি এখানে এক একটি কক্ষে বসবাস করে।

ভুলে গেলে চলবে না যে, পারিবারিক প্রাইভেসী-বোধ হতে উন্নত সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছে।* এই সকল বস্তিবাসীদের ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের বৃহৎ

* বাথরুমের প্রাইভেসী-বোধ চিন্তাশীল পণ্ডিতদের সৃষ্টি করে। বহু বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তথ্য প্রাইভেট বাথরুমে ভাবা হয়। বাথরুমের মত অতো প্রাইভেসী কারুর শয়নঘরেও থাকেনি।

অট্টালিকার পৃথক ফ্ল্যাটগুলিতে উঠিয়ে নিলে দেখা গিয়েছে যে, পারিবারিক প্রাইভেসী-বোধের সৃষ্টিতে তাদের সন্তানদের চরিত্রের মান উন্নত হয়েছে। ঐ সকল ফ্ল্যাট সম্বলিত অট্টালিকার সম্মুখে নির্ধারিত খোলা পার্কগুলিতে ক্রীড়ারত বালক ও বালিকাদের ব্যবহার এই মতবাদ সুপ্রমাণ করবে।

মধ্য কলিকাতার বস্তিগুলি ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট সেণ্ট্রাল এভিন্যু তৈরী কালে অপসারণ করলে জোড়াসাঁকো থানার এলাকাতে অবিশ্বাস্য রূপে অপরাধ এবং অপরাধীর সংখ্যা কমে যায়। কলম্বো শহরে পুলিশ ব্যক্তিরা আবাসের অভাবে বস্তিতে মন্দ ব্যক্তিদের সহিত একত্রে বসবাস করতো। ওদের সেখান থেকে নবনির্মিত কোয়ার্টারগুলিতে স্থানান্তরিত করা মাত্র অচিরে ঐ শহরের অপরাধ ও অপরাধীদের সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যায়।

॥ ৩ ॥

অপরাধ-স্পৃহা

আমাদের মধ্যে অপস্পৃহা তথা মন্দ প্রেরণা রূপ একটি বৃত্তি আছে। এই জন্য মানুষ পৃথিবীতে অপরাধ করে থাকে। এই অপরাধ-প্রবণতা মানুষ জৈব কারণে প্রাপ্ত হয়েছে। যুগ যুগ পূর্বে তৎকালীন আদি মনুষ্য সমাজে সভ্যযুগের বহু অপকার্য অপরাধরূপে বিবেচিত হয়নি। ডাকাতি রাহাজানি চুরি বলাৎকার ব্যভিচার প্রভৃতি অপকার্য ঐ কালে বরং বীরত্বের ও ধূর্ততার কার্যরূপে প্রশংসিত হয়েছে। কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতির সহিত সেই প্রাচীন যুগের বহু ধারণা ও স্বভাব অধুনা কালে পরিত্যক্ত হয়েছে। সমাজ গঠনের জন্য পারস্পরিক স্বার্থে তৎকালীন বহু কদাচার ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়।

কিন্তু এই জগতে কোনও কিছু একবার জাত হলে তা কখনও লোপ পায় না। প্রকৃত পক্ষে এ জগতে হারায় না'কো কিছু। উহা মানুষ চেষ্টা দ্বারা কেবল মাত্র প্রদমিত করেছে। কোনও কারণে ঐ স্পৃহা জাগ্রত হলে মানুষ অপরাধ করে থাকে।

উপরোক্ত অপরাধ-স্পৃহা অপেক্ষা প্রাচীন অন্য একটি বৃত্তি জীব সৃষ্টির আদি কালে আমরা অর্জিত করেছিলাম। উহাকে আমরা 'যৌন-স্পৃহা' রূপে অভিহিত

করে থাকি। সভ্য মানুষ তার অপরাধ-স্পৃহার মত এই যৌন-স্পৃহাকে সম্পূর্ণরূপে প্রদমিত করেনি। কারণ পৃথিবীতে বংশ রক্ষার কারণে উহার প্রয়োজন আছে। মানুষ এই যৌন-স্পৃহাকে বিবাহাদির মাধ্যমে শুধু নিয়ন্ত্রিত করেছে। এই জন্য আমরা যৌন-স্পৃহার মত অপরাধ-স্পৃহা অতো তীব্ররূপে অনুভব করি না। অধিকন্তু মনো-জগতে যেটি যতো পুরাতন তার শক্তি ততো বেশি হয়। কিন্তু এই যৌন-স্পৃহা আমাদের অপরাধ-স্পৃহার সমভিব্যাহারে বহির্গত হলে উহা জঘন্য অপরাধ। উহাকে অপহরণ এবং বলাৎকার আদি যৌনজ অপরাধ বলা হয়ে থাকে।

অপরাধ-স্পৃহা আমরা উপরোক্ত ভাবে জৈব কারণে প্রাপ্ত হয়েছি। কিন্তু পৃথিবীর বহু পণ্ডিত এই মতবাদ স্বীকার করেন না। তাঁরা কেউ কেউ বর্তমান কালীন আদি গোষ্ঠির মানুষদের সহিত কিছুকাল বাস করেছেন। তাঁরা ওদের মধ্যে বহু উচ্চ নৈতিক মানের পরিচয় পেয়েছেন। কিন্তু এঁরা ভুলে যান যে একস্থানে কোনও মনুষ্যগোষ্ঠি স্থির হয়ে নেই। মধ্যে মধ্যে তুষ্ণিভাব গ্রহণ করলেও কমবেশি তারাও আগুয়ান; এদের মধ্যে আদি মনুষ্যসুলভ স্বভাব কিছু কিছু আজও দৃষ্ট হয়।

এই পণ্ডিতগণ ভুলে যান যে, বানর হতে মানুষের উদ্ভব হয়নি। বানর ও মানুষ উভয়ই কোনও এক বানরানুরূপ পূর্বতন জীব হতে উদ্ভূত। অনুরূপভাবে অধুনাদৃষ্ট কোনও অনগ্রসর মনুষ্যগোষ্ঠী হতে বর্তমান সভ্য মানুষের জন্ম হয়নি। এই উভয় শ্রেণীর নরগোষ্ঠী কোনও এক প্রাচীন মনুষ্যগোষ্ঠী হতে সৃষ্ট হয়েছে। এখন বিবেচ্য এই যে, ঐ প্রাচীন মনুষ্যগোষ্ঠির স্বভাব চরিত্র কিরূপ থাকা সম্ভব। প্রস্তর যুগে ওদের সর্বদা আত্মরক্ষার জন্য ব্যস্ত থাকতে হতো। তখনও তারা সঙ্ঘবদ্ধ না হয়ে একাচারী। হিংস্র জন্তু এবং অন্য বন্য-মানুষের সঙ্গে তাদের সর্বদা যুদ্ধ করতে হতো। ওরূপ অবস্থায় তারা চতুর ও হিংস্র হতে বাধ্য ছিল। পৃথিবীতে জীবিত থেকে বংশরক্ষার জন্য তাদের অপস্পৃহার সাহায্য অপরিহার্য ছিল। দূর অতীতের ঐ বন্য-মানুষের নরমুণ্ড তথা করোটি হতে তাদের মুখাকৃতি পূনর্গঠিত করে তাদের আমরা ভীষণাকৃতি দেখেছি। এ থেকে স্পষ্টতঃ তাদের হিংস্র ও চতুর-স্বভাব বুঝা যায়।

আমরা জীবজন্তু ও উদ্ভিদাদির মধ্যেও চৌর্য-বৃত্তি ও বল-প্রকাশ দেখে থাকি। এক জীব অন্য জীবের ডিম্ব চুরি করেছে বা বলপূর্বক তা কেড়ে নিয়েছে। কিছু উদ্ভিদকে ও ছোট ছোট কীটাদি'কে রঙের বাহারে ভুলিয়ে এনে

পিষ্ট করতে দেখা গিয়েছে। এইরূপ অপরাধ-প্রবণতা উদ্ভিদ ও জীব জগতে একটি স্বাভাবিক ঘটনা। আমাদের মধ্যে অপরাধ-স্পৃহার অবস্থিতি প্রমাণের জন্য নিম্নোক্ত কয়েকটি উদাহরণের উল্লেখ করা যায়। মনুষ্যকুলের অন্তর্নিহিত জাগ্রত বা সুপ্ত অপরাধ-স্পৃহা এ থেকে সুপ্রমাণিত হবে।

(১) নিরপরাধ মানুষের অন্তর্নিহিত তথা সুপ্ত অপরাধ-স্পৃহাকে কৃত্রিম উপায়ে জাগ্রত করা সম্ভব। টপকা ঠগীগণ ও নওসেরা অপরাধীরা প্রায়ই সৎ নাগরিকদের এই উপায়ে প্রবঞ্চিত করেছে। এই ক্ষেত্রে ফরিয়াদীরা নিজেরাই কিছুটা অপরাধীর পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ে। তদবস্থায় তারা অন্যকে ঠকানোর চেষ্টায় নিজেরাই ঠকে। প্রলুব্ধ ফরিয়াদীরা তখন পিতলের পিণ্ডকে স্বর্ণ বুঝে অর্থের বিনিময়ে উহা ক্রয় করে। স্বাভাবিক মানসিক অবস্থায় ঐ চোরাই দ্রব্য ওরা নিশ্চয়ই ক্রয় করতো না। ভুয়া জুয়া মামলাতেও দেখা গিয়েছে যে, অপরাধীদের প্ররোচনাতে মূর্খ ও বোকা জমিদারদের ঠকাতে গিয়ে তারা নিজেরাই ঠকে গিয়েছে। এক্ষেত্রে নওসেরা অপরাধীরা মুহুর্মুহু বাক্-প্রয়োগ দ্বারা অভিভূত করে সৎ নাগরিকদের প্রদমিত অপরাধ-স্পৃহাকে বহির্গত করতে সমর্থ হয়। নিম্নে এই সম্পর্কিত অন্য একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করা হলো।

"এক ব্যক্তি একটি সোনার গহনা আপনার নিকট বিক্রয় করতে এলো। এতে আপনি ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে পুলিশের হেফাজতে দেবেন। কিন্তু এ ব্যক্তি একটি সুন্দর ফাউণ্টেন-পেন বিক্রয়ার্থে আপনার নিকট আনলে আপনি অতোটা ক্রুদ্ধ হবেন না। ঐ সুন্দর কলমটি হাতে তুলে পরীক্ষা করে আপনি বলবেন : 'বাঃ! বেশ কলমটি তো। বেটা চোর, যা। আমি ওটা নেবো না।' এখানে আপনার অপরাধ প্রতিরোধশক্তি বিলুপ্ত না হলেও দুর্বল হলো। কিন্তু ঐ ব্যক্তি একটা সুপ্রাচীন কিউরিও তথা প্রদর্শনী-দ্রব্য কিংবা একটি দুষ্প্রাপ্য পুস্তক বিক্রয়ার্থে আনলে স্বল্পমূল্যে উহা আপনি হয়তো ক্রয় করবেন। এখানে যে কৃষ্টি ও শিক্ষা আপনার অপস্পৃহাকে এতাবৎ কাল প্রদমিত রেখেছিল সেই একই শিক্ষা ও কৃষ্টি আপনার প্রতিরোধশক্তিকে বিচূর্ণ করে আপনাকে অপরাধী করলো।"

(২) ভেকজীব বেঙাচি অবস্থাতে মৎস্যের ন্যায় জলে সন্তরণ করে। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত হলে উহা ভেক জীবে রূপান্তরিত হয়ে যায়। মৎস্য থেকে উভচর তথা ভেক জীবের উৎপত্তি ইহা প্রমাণ করে। অনুরূপভাবে প্রজাপতি জীবকে শুক-কীট অবস্থায় কেন্নো জীবের মত দেখতে। জীবজগতে এইরূপ শত শত

দৃষ্টান্ত আছে। মানুষের ভ্রূণের মধ্যেও এইরূপ বহু পরিবর্তন দৃষ্ট হয়। মনুষ্য-শিশুর পায়ের চেটো হাতের চেটোর মত সঙ্কোচনে সক্ষম। কারণ তাদের বানরানুরূপ আদিপুরুষ'রা হাতের মত পায়ের দ্বারাও বৃক্ষশাখা ধরতো।

অনুরূপভাবে মনুষ্য-শিশুর মধ্যে আমরা অপরাধ-প্রবণতার আধিক্য দেখে থাকি। এরা দ্রব্য অপসরণ বা তা কেড়ে নিতে সদা ব্যস্ত। এরা স্বার্থপর ও লোভী এবং কলহ ও মারপিট প্রিয়। এরা মিথ্যা-প্রিয় ও চতুর হয়ে থাকে। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত এরা পূর্ব অভ্যাস ধীরে ধীরে ত্যাগ করে। উহা বেঙাচির ভেক হওয়ার মত হয়ে থাকে। এতদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পূর্বতন অপরাধপ্রিয় মনুষ্য-গোষ্ঠী হতে বর্তমান সভ্য মানুষের সৃষ্টি হয়েছে।

['মনুষ্য-শিশু তাদের আদি-পূর্বপুরুষদের চরিত্রের সহিত কিছু সভ্য মানুষ-সুলভ স্বার্থত্যাগ ও দয়া-মায়াও দেখিয়েছে। জীবজন্তুদের মার-ধর করার মত তারা তাদের প্রতি দরদ প্রকাশ করেছে। এইগুলি অবশ্য সাম্প্রতিক সভ্য পূর্বপুরুষ থেকে তারা প্রাপ্ত হয়েছে। শৈশবে উহার পরিমাণ অপস্পৃহার তুলনায় অত্যল্প হয়]

(৩) ক্লিপটো-ম্যানিয়াক অপরাধ-রোগীদের মধ্যে দৃষ্ট অপরাধ-স্পৃহা মানুষ মাত্রের মধ্যে উহার অবস্থিতির অন্য একটি প্রমাণ। সাধারণতঃ ধনী কৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষিত ব্যক্তিরাই উহাতে বেশী ভোগে। এরা লাভের বা লোভের জন্য চৌর্যকার্য করে না। এরা এদের দুর্দমনীয় অপরাধ-স্পৃহাকে চরিতার্থ করার জন্য অপকর্ম করে। এরা সুপরিবেশে লালিত ও বর্ধিত। ইহা প্রমাণ করে যে, পরিবেশ ও অভাব অপরাধী সৃষ্টির একমাত্র কারণ নয়।

উপরোক্ত অপরাধ-স্পৃহা দুইটি পৃথক গুণগত ভাগে বিভক্ত। যথা, (১) দ্রব্য-স্পৃহা এবং (২) শোণিত-স্পৃহা। উহাকে যথাক্রমে সম্পত্তির বিরুদ্ধে এবং ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ বলা হয়। [এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ দুইটি উপবিভাগে বিভক্ত। যথা যৌনজ ও অ-যৌনজ। নিম্নের তালিকাটি হতে বক্তব্য বিষয় বুঝা যাবে। খুন-জখমাদি অযৌনজ এবং বলাৎকার ব্যভিচারাদি যৌনজ অপরাধ।

[সাম্প্রতিক কালে কয়েকটি পেনাল সেটেলমেণ্টে সমীক্ষা ও পরীক্ষা করে মাত্র উৎকট পুরুষ অপরাধীদের মধ্যে একপ্রকার এগ্রেসিভ ক্রোমোসোম-এর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। উহা এখনও পর্যন্ত স্ত্রী-অপরাধীদের মধ্যে পাওয়া যায়নি। এইরূপ তত্ত্ব ও তথ্য এই পুস্তকে বর্ণিত আমার বহু মতবাদ সমর্থন

করবে। এই এগ্রেসিভ ক্রোমোসোম না থাকাতে নারীদের মধ্যে হত্যাকার্য ডাকাতাদি আক্রমণাত্মক অপরাধী কম। তবে কদাচিৎ কোন পুংশ্চলী নারীর মধ্যে উহা থাকতে পারে। বল-প্রয়োগী শোণিতাত্মক অপরাধীর ক্রোমোসমের মত সাম্পত্তিক অপকর্মের অবল-প্রয়োগী দ্রব্য-স্পৃহার ক্রোমোসোমও কালক্রমে আবিষ্কৃত হবে।]
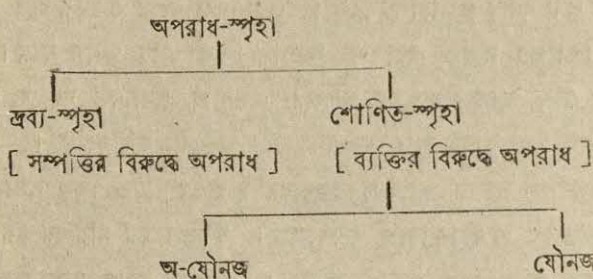
আদি যুগে বলবান ও সাহসী ব্যক্তিরা বংশরক্ষার্থে বলাৎকার ও অপহরণ দ্বারা নারীসঙ্গম করতো। এইরূপ বলপ্রয়োগ দ্বারা তারা খাদ্যাদিও সংগ্রহ করেছে। অন্যদিকে দুর্বল ও ভীরুরা ব্যভিচার দ্বারা বংশরক্ষা এবং চৌর্য দ্বারা খাদ্য সংগ্রহ করেছে। এই ভাবে পৃথিবীতে সর্বপ্রথম যথাক্রমে সম্পত্তি ও ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ সৃষ্ট হয়। মানুষের এই স্বভাবের উদ্ভব পারিবারিক জীবনের সৃষ্টি এবং খাদ্য মজুদের অভ্যাসের ফলে ঘটে। তদ্‌পূর্বে তারা নির্বিচার যৌন-সঙ্গমে ও বন্য খাদ্য সংগ্রহে মত্ত ছিল। পরবর্তী কালে অধিকার বোধের উদ্ভবে উক্তরূপ অপকর্ম দুইটি সৃষ্ট হয়।

[ঐ আদি যুগে কার্যপদ্ধতিরূপে নির্বল ও সবল অপকর্মেরও উদ্ভব হয়। ইংরাজীতে উহাদের অফেন্স উইথ ভায়োলেন্স এবং অফেন্স উইদাউট ভায়োলেন্স বলা হয়। মানুষ এবং বস্তু উভয়ের উপরই এই বলপ্রয়োগ সমভাবে বিবেচ্য। তালা বা দরজা ভাঙা এবং মানুষকে আঘাত করা সবল অপরাধ এবং চৌর্য প্রবঞ্চনাদি ও গালিগালাজ প্রভৃতি নির্বল অপরাধ।]

শোণিত-স্পৃহা

দ্রব্য-স্পৃহাকে ইংরাজীতে ডিজায়ার ফর প্রপারটি এবং শোণিত-স্পৃহাকে 'থার্স্ট ফর ব্লাড' বলা হয়েছে। দ্রব্য-স্পৃহা সম্বন্ধে পূর্ব নিবন্ধে আলোচিত হয়েছে। এক্ষণে মানুষের শোণিত-স্পৃহা সম্বন্ধে আমি বিস্তারিত আলোচনা করবো।

মানুষ বন্য অবস্থায় নিহত জন্তু বা ব্যক্তির শোণিত পান করে তৃপ্ত হতো। কালক্রমে ঐ অভ্যাস পরিত্যক্ত হলেও প্রদমিত অবস্থাতে উহা আমাদের মধ্যে আজও বর্তমান। আজও কোনও কোনও মানুষ শোণিতাত্মক অপরাধীদের মত রক্ত দর্শনে আনন্দ পায়। রক্তপান অধুনা রক্ত দর্শনে পরিবর্তিত হয়েছে। কিছু বলাৎকার অপরাধের সহিত দংশনও পরিদৃষ্ট হয়। বহু অপরাধী আজও রক্ত দর্শনে পরিতৃপ্ত হয়। এই জাগ্রত শোণিত-স্পৃহার জন্য হত্যাকারী বিপদ অগ্রাহ্য করেও বারে বারে হত্যাস্থলে ফিরে এসেছে। সুপ্ত শোণিত-স্পৃহা জাগ্রত হলে এইরূপ প্রায়ই ঘটে থাকে। উহা এইভাবে প্রশমিত না করলে হত্যাকারী শান্তি পায়নি।

[বলাৎকার অপরাধে দুর্বৃত্তরা তাদের চেতন মনে এবং ব্যভিচার অপরাধে তারা অবচেতন মনে রক্ত পান করে। উভয় ক্ষেত্রে'তে সুপ্ত কিংবা জাগ্রত অবস্থায় ওদের শোণিত পান স্পৃহা জড়িত থাকে।]

কোনও দুই ব্যক্তিকে রাজপথে মারপিট করতে দেখলে আমরা দ্রুতগতিতে এসে সেখানে জড়ো হই। মুখে তাদেরকে 'থামো থামো' বললেও মনে মনে আমরা পুলক শিহরণ অনুভব করি। উত্তেজনায় এই কালে আমাদেরও সুপ্ত শোণিত-স্পৃহা কিছুটা জাগ্রত হয়। এই শোণিত-স্পৃহা জাগ্রত হয়ে মনের উপরিভাগে এলে বিপর্যয় ঘটায়। সাম্প্রতিক খুনের রাজনীতিকালে আমরা অনেকে উহা স্বচক্ষে দেখেছি।

যুদ্ধ-প্রত্যাগত সৈনিকরা বলে থাকে যে, তারা প্রথম 'ভলি'গুলি ছোঁড়ার পর অনুতপ্ত হতো। কিন্তু তাদের ঐ গুলি রক্তপান করেছে বুঝা মাত্র তারা নির্দয় পশুতে পরিণত হয়েছে। এই সুপ্ত শোণিত-স্পৃহা জাগ্রত হয়ে বহির্গত হলে উহা সীমাহীন হয়ে থাকে। মানুষ তখন নির্দয় পশুরও অধম হয়ে পশুর মত বধ-যোগ্য হয়ে পড়ে।

একদা জনৈক বালককে আমার পুলিশী কার্যে ইনফরমার তথা গুপ্তচর নিয়োগ করি। সে আমাকে কয়েকটি দুরূহ মামলার কিনারা করতে সাহায্য করে। একদিন সে আমাকে বললে যে, তার এক বাল্যবন্ধুর হেপাজতে একটি বে-আইনী পিস্তল আছে। আমি উৎসাহিত হয়ে তাকে বামাল সমেত ধরাবার জন্য অনুরোধ করি। কিন্তু সে একটু লজ্জিত হয়ে পড়ে আমাকে বললে—'না, স্যার। থাক। ছোট বেলার বন্ধু। তার মা কালকেও আমাকে আদর করে খেতে দিয়েছে। আপনাকে অন্য বহু বড়ো মামলার সংবাদ দেবো।' একদিন সে বহু

লক্ষ টাকা মূল্যের একটি বৃহৎ মামলা আসামী সহ ধরালো। এতে দারুণ উত্তেজিত হয়ে সে আমাকে বলেছিল, 'স্যার! আমার মাথায় আজ খুন চেপেছে। আজ আমি আমার বাপ মা-কেও ধরাতে পারি। চলুন স্যার। আমি আমার সেই বন্ধুকেই বামাল সহ ধরাবো।'

আমি বুঝতে পারি যে উত্তেজনাবশতঃ ঐ বালকের সুপ্ত শোণিত-স্পৃহা জাগ্রত হয়েছে। এই শোণিত-স্পৃহা অ্যাকটিভ এবং প্যাসিভ [সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়] উভয় রূপে প্রকট হয়। অ্যাকটিভ শোণিত-স্পৃহা পর-হত্যার এবং প্যাসিভ শোণিত-স্পৃহা আত্মহত্যার কারণ। বহু ব্যক্তি অন্যকে হত্যা করার পরে নিজে আত্মহত্যা করেছে। জনৈক যুবক তার স্ত্রীকে হত্যা করতে তার শ্বশুরালয়ে যায়। কিন্তু তাতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। আদালত হতে জামিনে ফিরে সে ঐ বাড়ির দুয়ারে আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করে।

বিগত মহাদাঙ্গাকালে এক সম্প্রদায়ের একটি লোক অন্য সম্প্রদায়ের কয়েক জনকে কাতান দ্বারা কাটে। পরে অন্য সম্প্রদায়ের আর কাউকে না পেয়ে সে একটা গরু কাটলো। ততক্ষণে তার মস্তিষ্কে খুনের নেশা চেপেছে; সে তখন স্বসম্প্রদায়ের লোকদের তেড়ে এলো। ঐ অবস্থায় তাকে উপর্যুপরি যষ্টির আঘাতে কাবু করে তারা আত্মরক্ষা করেছিল।

এই সময় আরও লক্ষ্য করি যে, প্রথম প্রথম সম্প্রদায় বিশেষের প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা স্বসম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের কবল থেকে বিধর্মীদের রক্ষা করছিল। পরে অন্যত্র অন্য পক্ষের কৃত অত্যাচারের সংবাদে তারা উত্তেজিত হয়। এই সময় নিজেরা কাউকে প্রহারাদি না করলেও পূর্বের মত তারা তাতে বাধা না দিয়ে নির্বাক দর্শক হয়। পরে আরও কিছু প্রত্যক্ষ সংবাদের পর উত্তেজিত হয়ে তারাও দুর্বৃত্তদের সহিত যোগ দেয়। একটি সমগ্র সমাজ খুনী ডাকাত দলে পরিণত হলো।

এই সময় আমি এও পরিলক্ষ্য করি, কারও খুনের প্রতি এবং কারও দ্রব্য লুঠের প্রতি ঝোঁক বেশী; আমি বুঝি যে শনৈঃ শনৈঃ অপরাধ জাগ্রত হয় এবং ঐ অপস্পৃহা দ্রব্য-স্পৃহা এবং শোণিত-স্পৃহাতে বিভক্ত। অপস্পৃহা যে দ্রব্য-স্পৃহা এবং শোণিত-স্পৃহাতে বিভক্ত তা নিম্নোক্ত উদাহরণ দ্বারা প্রমাণ করা যাবে।

(ক) কোনো দেশে খাদ্যের প্রাচুর্য ঘটলে ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ বাড়ে কিন্তু সেখানে বস্তুর বিরুদ্ধে অপরাধ সেই অনুপাতে কমে। কিন্তু ঐ দেশে খাদ্যের

অভাব ঘটলে সেখানে ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ কমে এবং সেই অনুপাতে বস্তুর বিরুদ্ধে অপরাধ বাড়ে।

বিঃ দ্রঃ—এই মতবাদ সম্পর্কে পরিসংখ্যান সংগ্রহকালে পেশাদার তথা প্রফেশন্যাল অপরাধীদের বাদ দিতে হবে, কারণ অপরাধই তাদের জীবিকা হওয়াতে ওদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধ সমূহের কমা কিংবা বাড়ার প্রশ্ন নেই।

(খ) কোকেনাদি ঔষধ মানুষের দ্রব্যস্পৃহা এবং মদ্যাদি ঔষধ তাদের শোণিত-স্পৃহার বহির্গমনের সহায়ক হয়। প্রথমটি নির্বল অপরাধ [উইদাউট ভায়োলেন্স] এবং দ্বিতীয়টি সবল অপরাধের [উইথ ভায়োলেন্স] কারণ।

কোনও থানার এলাকায় বে-আইনী চোলাই মদ চালু হলে ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ বাড়ে। বহু ব্যক্তি অপরাধের পূর্বে মদ্যপান করে, যা সাদা চোখে করা যায় না, তা রঙিন চোখে সহজে করা যায়। কিন্তু সৎ পুলিশ অফিসাররা উহা বন্ধ করা মাত্র সেখানে ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ কমে যায়। অন্য এক থানার এলাকায় কোকেন স্মাগলিং ও কোকেন ডেন তথা আড্ডা চালু হলে সেখানে সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধ দ্রুতগতিতে বাড়ে। কিন্তু সৎ কর্মীরা এসে ঐগুলি বন্ধ করা মাত্র সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধ বহুল পরিমাণে কমে গিয়েছিল। মূল অপরাধ-স্পৃহার 'দ্রব্য ও শোণিত-স্পৃহাতে' বিভক্তি এই তথ্য প্রমাণ করবে।

বিঃ দ্রঃ—কোকেন পানের সঙ্গে ভক্ষণ করার রীতি। উহা জিহ্বাকে মসীবর্ণ এবং দেহে কষ্টবোধ কমায়। কোনও অপরাধী চোর কিনা তা তার জিহ্বা পরীক্ষা করে জানা যায়। বেশ্যা নারীরাও কোকেনভক্ত হয়। এই ঔষধ পুরুষকে চোর এবং নারীকে বেশ্যা করে। এতদ্বারা যথাক্রমে অপস্পৃহা এবং যৌন-স্পৃহার বৃদ্ধি ঘটে। উহা যৌনসঙ্গমের ক্ষণ বাড়ানোর সহায়ক। ইহা চৌর্যবৃত্তি ও ব্যভিচারের বৃদ্ধি ঘটায়। শহরের সংগ্রহকারীরা গৃহস্থ পরিবারের কন্যাকে গোপনে পানের সঙ্গে কোকেন খাইয়েছে। এতে তাদের দুর্দমনীয় যৌনস্পৃহার উদ্রেক হয়ে থাকে। উপরন্তু ঐ নেশার দ্রব্য প্রাপ্তির জন্য তারা সংগ্রহকারী'র অনুরক্ত থাকে। তদুপরি উহা মানুষের প্রতিরোধ-শক্তি সম্পর্কিত সূক্ষ্ম স্নায়ু মস্তাদির মত ক্ষতিগ্রস্ত করে।

ব্যক্তিদের উপর বলপ্রয়োগের মত বস্তুর উপরও বলপ্রয়োগ হয়ে থাকে। বারগলারী অপরাধ বস্তুর উপর বলপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত। কারণ দুয়ার ভাঙা ও তালা ভাঙার জন্য বল প্রকাশের প্রয়োজন ; বলাৎকার হত্যা ইত্যাদি অপরাধও বল-প্রয়োগজনিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সবল অপরাধ, অন্যদিকে সাধারণ চৌর্য প্রবঞ্চনাদি

অযৌনজ এবং ব্যভিচারাদি যৌনজ অপরাধ নির্বল অপরাধ। কারণ এই সকল অপরাধে বলপ্রয়োগ করা হয়নি।

সাধারণ চৌর্যদল এবং তালাতোড় [বারগলার] প্রভৃতি বস্তুর বিরুদ্ধে অপরাধীরা কোকেনে এবং হত্যাকারী ও রবারাদি ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধীরা মদ্যাদিতে আসক্ত হয়। এই জন্ম প্রতীত হয় যে, সবল বা নির্বল অপকর্ম উহাদের অভ্যাসজাত বহিঃকর্ম পদ্ধতি। কিন্তু দ্রব্য-স্পৃহা ও শোণিত-স্পৃহা মনস্তাত্ত্বিক কারণে ওদের মধ্যে উপগত হয়।

(গ) ভারতের এ্যাণ্ডামান দ্বীপপুঞ্জে পূর্বতন বন্দীনিবাসে নির্ভেজাল বংশানুক্রম তথা 'পিওর লাইন হেরিডিটি' গবেষণার সুযোগ আছে। সাইবেরিয়া এবং অষ্ট্রেলিয়ার বন্দী উপনিবেশে তথা পেনাল সেটেলমেণ্টে অপরাধীদের সহিত নিরাপরাধীদের যৌন মিলন ঘটেছে। কিন্তু ভারতের ঐ বন্দী-উপনিবেশে অপরাধী পুরুষ এবং অপরাধী নারীর সংমিশ্রণে জাত লোকগোষ্ঠী আছে।

এই দ্বীপে বস্তুর বিরুদ্ধে প্রায়ই অপরাধী দেখা যায়নি। উহা সেখানে খুব বিরল ঘটনা। চৌর্য অপরাধ সেখানে সাধারণতঃ ঘটে না। কিন্তু সেখানে ব্যক্তির বিরুদ্ধে যৌনজ ও অযৌনজ অপরাধ বেশী হয়। তদন্তে জানা গিয়েছে যে, পেশাদার খুনেদের মূল ভূখণ্ডে ফাঁসী দেওয়া হতো। চৌর্য অপরাধী ও প্রবঞ্চকদের ভারতের মূল ভূমিতেই কারাগারে রাখা হতো। কেবলমাত্র ক্রোধবশে হত্যাকারী [কালপেবল হোমিসাইড্] এবং বলাৎকারক ও বিষ প্রয়োগকারী পুরুষ ও নারীদের ঐ দ্বীপে পাঠানো হয়েছে। এই কারণে তাদের বংশধরদের মধ্যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধীর আধিক্য এবং বস্তুর বিরুদ্ধে অপরাধ নগণ্য। তবে শিক্ষা-দীক্ষার জন্য প্রতিরোধ শক্তির দৌলতে তারা এখন উহা হতে প্রায়ই মুক্ত।

[বিঃ দ্রঃ—কোনও কোনও ব্যক্তি তাদের জিহ্বা গুটোনোতে সক্ষম। এই ক্ষমতার অধিকারী অন্যরা নহে। উহা এক প্রকার দেহকোষ সম্পর্কিত তথা সোমাটিক ক্ষমতার বহির্বিকাশ। আদি মানুষরা ঐভাবে জিহ্বা গুটিয়ে শব্দ করে পরস্পরকে ডাকাডাকি করতো। ভাষার সৃষ্টির পর পরিত্যক্ত হলেও উহা আমাদের দেহ ও বীজ কোষে রয়ে গিয়েছে। তাই আজও মানুষ ম্যাণ্ডেল'ল অনুযায়ী তাদের আদি পুরুষের জিহ্বা গুটোনোর ঐ ক্ষমতার বা অক্ষমতার অধিকারী হয়। এই দৃষ্টান্তটি প্রমাণ করবে যে উপরোক্ত বৃত্তিদ্বয়ের ঐ ভাবে বংশগত হওয়া সম্ভব।]

(ঘ) ক্লিপটো-ম্যানিয়াক অপরাধ-রোগীরাও উপরোক্ত মতবাদ প্রমাণ করবে। এদের মধ্যে কেবলমাত্র দুর্দমনীয় দ্রব্য-স্পৃহাই শুধু পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু এদের মধ্যে কদাচ শোণিত-স্পৃহা ঐভাবে আগত হয়নি। অন্যদিকে—সাইবেরিয়ার একটি হত্যাকারীদের উপনিবেশে সর্বাপেক্ষা ধনসম্পত্তি নিরাপদ। অপরাধ-স্পৃহার এই দ্রব্য-স্পৃহা এবং শোণিত-স্পৃহাতে বিভক্তি ওদের ঐরূপ ব্যবহার প্রমাণ করবে।*

॥ ৪ ॥

সৎ-প্রেরণা

মানুষ তার সভ্যতার সোপানে ধীরে ধীরে ও ধাপে ধাপে উন্নত হয়েছিল। তারা গোষ্ঠিবদ্ধ হয়ে বাস করে সমাজ সৃষ্টি করে। পারস্পরিক স্বার্থে প্রত্যেকে বহু নীতিবোধ ও নিষেধ মেনে নেয়। রাষ্ট্র সৃষ্টি হলে নেতারা ও রাজারা ঐগুলি বাধ্যতামূলক করেন। তৎজনিত পরবর্তীকালে মানুষ সৎ-প্রেরণা রূপ একটি বৃত্তি লাভ করেছিল। প্রথমে উহার ব্যবহার সগোষ্ঠীদের মধ্যে নিবদ্ধ থাকলেও পরে উহা অন্য গোষ্ঠীদের সম্পর্কেও সম্প্রসারিত হয়েছিল।

স্ত্রী-বীজ তথা ওভা হতে পুং-বীজ সৃষ্টি হয়েছিল। অর্থাৎ একটি অন্যটির সূক্ষ্ম রূপ বিশেষ। পরস্পরের মিলনের সুবিধার্থে উহাদের একটি সূক্ষ্মাকার ধারণ করে। অনুরূপভাবে অপরাধ-স্পৃহা থেকে পরবর্তীকালে বিধি-নিষেধের ফলে সৎ-প্রেরণা জাত হয়। উহাকে অপরাধ-স্পৃহার একটি সূক্ষ্ম প্রতিষেধক বলা যায়।

স্ত্রী-বীজের সহিত অপস্পৃহার এবং পুং-বীজের সহিত সৎ-প্রেরণার তুলনা করা যায়। স্ত্রী-বীজ স্থির তথা অলস বা লেজি। কিন্তু পুং-বীজ গতিশীল তথা অ্যাকটিভ। এই পুং-বীজ দ্রুত সঞ্চারণে স্থির থাকা স্ত্রী-বীজকে নিকেষিত করে। এই তৎপরতা তথা অ্যাকটিভিটি অলসতাকে দূর করে মানুষকে সভ্যতার পথে এগিয়ে দিয়েছে। এইভাবে স্ত্রী-বীজ হতে প্রাপ্ত অলসতা এবং

---

* অষ্ট্রেলিয়া পূর্বতন ব্রিটিশ পেনাল সেটেলমেন্ট হওয়াতে সেখানে কয়েক স্থানে আজও অপরাধ এবং অপরাধী'দের সংখ্যা বেশি।

পুং-বীজ হতে প্রাপ্ত তৎপরতা—এই উভয় প্রকার বৃত্তিই মানুষ স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে উত্তরাধিকারীসূত্রে বিভিন্ন হারে কম বেশী প্রাপ্ত হয়েছে।

[বিঃ দ্রঃ—সুদূর অতীতের বহু বৃত্তি যে উত্তরাধিকারী সূত্রে মানুষ পেয়েছে, উহা প্রমাণ করার মত যথেষ্ট উদাহরণ আছে। অপরাধীদের চিকিৎসা উদ্ভাবনের জন্য ঐ মূল সূত্রগুলি জানার প্রয়োজন। আমাদের গাত্রের স্বেদে নোনতা স্বাদ প্রমাণ করে যে, প্রাণীকুলের জন্ম সমুদ্রে হয়েছিল। আমাদের নাসারন্ধ্রে গন্ধকণা দ্রবীভূত করার জন্য ক্ষুদ্র জলাধার আছে। ইহাও উক্ত মতবাদ সুপ্রমাণিত করে থাকে।]

স্ত্রী-বীজ তথা ওভা ক্ষেপে ক্ষেপে ও নির্দিষ্ট সংখ্যাতে জন্মে থাকে। চল্লিশ বর্ষ উর্ধ্ব নারীর দেহে উহা প্রায় জন্মে না। কিন্তু পুং-বীজ তথা স্পার্ম অনাবিল ভাবে বহুল সংখ্যাতে জন্মে থাকে। শত বর্ষ উর্ধ্ব পুরুষের মধ্যে তরুণদের মত উহা সক্রিয় ও সতেজ। দৈহিক দুর্বলতার কারণে উহা প্রবেশ করানো তথা ইনজেক্ট করার যা কিছু অসুবিধা।

নারীদের 'ওভা' তথা স্ত্রী-বীজের সহিত অপরাধ-স্পৃহা তুলনীয়। স্ত্রী-বীজের মত অপস্পৃহা অপরাধীদের মধ্যে ক্ষেপে ক্ষেপে জাত হয় এবং চল্লিশ উর্ধ্ব মানুষে উহা প্রায়ই থাকে না। পুরাতন প্রকৃত অপরাধীদের সম্বন্ধে উহা বিশেষরূপে প্রযোজ্য। ওদের অপস্পৃহা ক্ষেপে ক্ষেপে জাত হয় বলে পুরানো পাপীদের মধ্যে লুসিড্ ইনটারভেল তথা অপরাধ-বিরাম দেখা যায়। এই মধ্যবর্তী সময়গুলিতে ঐ বৃত্তিগত [প্রফেসন্যাল] অপরাধীরা প্রায়ই কোনও অপরাধ করেনি। ইহা প্রমাণ করে যে অপস্পৃহার আগমনের জন্য মানুষ অপরাধ করে।

[উক্ত তথ্য আমি অপরাধীদের টিপ-পত্র তথা ফিঙ্গারপ্রিন্ট কার্ড এবং অন্যান্য পুলিশী নথিপত্র থেকে অবগত হই। এরা বারে বারে অপরাধ করেছে। কিন্তু মধ্যবর্তী কিছু কাল তারা অপরাধ করেনি। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করলেও তারা উহা সমর্থন করবে। এই লুসিড ইনটারভেল বা বিরতিকাল অভ্যাস-অপরাধীদের মধ্যে বেশী, মধ্যম-অপরাধীদের ক্ষেত্রে কিছু কম এবং স্বভাব-অপরাধীদের মধ্যে নগণ্য থাকে। এই লুসিড ইনটারভেল বা বিরামকাল হতে অপরাধীদের শ্রেণীগত স্বরূপ বুঝা যায়।]

মানুষের সৎ-প্রেরণার সহিত তাদের পুং-বীজ তথা স্পার্ম তুলনীয়। সৎ-প্রেরণা পরিচালিত মানুষ অনাবিল এবং বিরামরহিতভাবে সৎকার্য করতে সক্ষম।

আমি অশীতিবর্ষ ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের প্রধানরূপে দেখলেও ঐ বয়সের একজন ডাকাত সর্দারের সন্ধান কখনও পাইনি। সৎ-প্রেরণা হতে উদ্ভূত সৎকর্মে কোনও লুসিড ইণ্টারভেল বা কর্মবিরতি দেখা যায় না।

বিঃ দ্রঃ—প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে দৃষ্ট তীব্র অলসতা এবং তাদের অপরাধ-বিরামের মধ্যে প্রভেদ আছে। পেশাদার প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে অলসতা দৈনিক ঘটনা কিন্তু অপরাধ-বিরাম তাদের মধ্যে কয় বৎসর বাদে বাদে আগত হয়ে থাকে। ওই সময়ে ওদের মধ্যে অপরাধ-স্পৃহা পরিত্যক্ত না হয়ে মাত্র প্রদমিত হয়।

এই অপরাধ-স্পৃহা এবং সৎ-প্রেরণাকে জীবদিগের-বীজের সহিত তুলনা করা যায়। কু-পরিবেশ অপস্পৃহাকে এবং সু-পরিবেশ সৎ-প্রেরণাকে স্ফুরিত করে। ঐ বীজ সকল অনুকূল পরিবেশে স্ফুরিত এবং প্রতিকুল পরিবেশে বিনষ্ট হয়েছে।

[বিঃ দ্রঃ—জীবদিগের গাত্রবর্ণাদির পরিবর্তন পারিপার্শ্বিক ভূমির পরোক্ষ প্রভাবে জাত বা পরিবর্তিত হয়। কিন্তু তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৃষ্টি উহার ব্যবহার বা অব্যবহার তথা 'ইউজ এণ্ড ডিসইউজ' দ্বারা প্রত্যক্ষ প্রভাবে সৃষ্ট। বর্তমানে ওদের ঐ সংগৃহীত পরিবর্তন বংশগত হয় বলে প্রমাণিত।

জীবদিগের উপরোক্ত রূপ গাত্রবর্ণ পরিবর্তনের মত সু কিংবা কু পরিবেশ মানুষের মনের উপর প্যাসিভ তথা পরোক্ষ প্রভাব প্রয়োগ করে তাদের সৎ-প্রেরণাকে এবং অপরাধ-স্পৃহাকে যথাক্রমে সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয়ভাবে উদ্বেলিত করে তাদেরকে নিরপরাধী কিংবা অপরাধী করতে সক্ষম। অপরাধী সৃষ্টির প্যাসিভ তথা পরোক্ষ কারণ সম্বন্ধে বলা হলো। এইবার প্রচেষ্টা জনিত উহাদের জন্মের প্রত্যক্ষ তথা এ্যাকটিভ কারণ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করবো। ওদের এইরূপ প্রচেষ্টা অভাব ও লোভ আদির কারণে হয়ে থাকে।

এই প্রচেষ্টা দ্বারা যথাক্রমে সৎ প্রেরণাকে এবং অপরাধ-স্পৃহাকে ব্যবহার বা অ-ব্যবহার করে [অপব্যবহার নহে] মানুষের পক্ষে নিরপরাধী কিংবা অপরাধী হওয়া সম্ভব। মানুষের বৃত্তিসমূহ ব্যবহারে বাড়বে এবং অ-ব্যবহারে কমবে। ইহাকে ব্যবহার অব্যবহার তথা ইউজ এণ্ড ডিস-ইউজ থিওরী বলা হয়ে থাকে। কোনও একটি অঙ্গ অতি-ব্যবহারে স্থূল কিন্তু অ-ব্যবহারে ক্ষীণ হয়। মনোবৃত্তিসমূহ সম্বন্ধেও ইহা একান্তরূপে সত্য। এখানে একটি বৃত্তি সবল হলে উহার বিপরীত বৃত্তিটি আপনা হতেই দুর্বল হবে।

আমাদের মস্তিষ্কে রেড গ্রীন প্রসেস এবং ইয়োলো ব্লু প্রসেসরূপ দুই প্রকার

মনো-দণ্ড আছে। কিছুক্ষণ একটি চৌকো লাল কাগজে তাকানোর পর সাদা দ্বিবালে তাকালে সেখানে সবুজ ছাপ ফুটে ওঠে। অনুরূপভাবে সবুজ রঙের দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে সাদা দ্বিবালে তাকালে সেখানে লাল ছোপ দেখা যাবে। ইয়োলো ব্লু তথা নীল হরিদ্রা প্রসেস বা মনো-দণ্ড সম্বন্ধে ঐ একই ফলাফল প্রকট হয়েছে। এর কারণ লালের উল্টো রঙ সবুজ এবং হরিদ্রার উল্টো রঙ নীল।

আমাদের উপরোক্ত সূক্ষ্মবৃত্তি বাহিত সৎ-প্রেরণা এবং স্থূলবৃত্তি বাহিত অপস্পৃহা একই মনো-দণ্ডের দুইটি বিপরীত প্রান্তে রক্ষিত। একটির উদয়ে অন্যটির লয় অবধারিত হয়ে থাকে। কিন্তু এই অপস্পৃহা ও সৎপ্রেরণার পারস্পরিক শক্তি যাই হোক না কেন, উহারা যথাক্রমে উহাদের ধারক ও বাহক স্থূলবৃত্তি এবং সূক্ষ্মবৃত্তির সাহায্য ব্যতিরেকে আপন শক্তিতে পরিচালিত হয় না।

[সৎপ্রেরণা এবং অপরাধ-স্পৃহাকে ইংরাজীতে যথাক্রমে ইভিল এবং গুড্ প্রপেনসিটি বলা হয়; এবং উহাদের ধারক ও বাহক সূক্ষ্ম ও স্থূল বৃত্তিকে যথা-ক্রমে বেসার সেন্টিমেণ্ট এবং ফাইনার সেন্টিমেণ্ট বলা হয়।]

অপরাধ-স্পৃহা এবং সৎপ্রেরণাকে দুইটি স্থির স্পুটনিক এবং উহাদের বাহক ও ধারক স্থূল ও সূক্ষ্ম বৃত্তিদ্বয়কে উহাদের স্ব স্ব রকেট বলা যায়। স্ব স্ব অনুক্রমিক রকেটদ্বয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে উহারা গতিশীল হতে পারে না। অপরাধ-স্পৃহা রূপ স্পুটনিককে উহার স্থূলবৃত্তি রূপ রকেট এবং সৎপ্রেরণা রূপ স্পুটনিককে উহার সূক্ষ্মবৃত্তি রূপ রকেট পরিচালিত করে।

[এইখানে আরও বক্তব্য এই যে, কু-পরিবেশ কিংবা সু-পরিবেশ অপরাধ-স্পৃহা ও সৎপ্রেরণাকে পরোক্ষ ভাবে প্রভাবিত করে সবল বা দুর্বল করে। কিন্তু ব্যবহার ও অ-ব্যবহার প্রত্যক্ষ ভাবে সূক্ষ্ম বৃত্তি কিংবা স্থূল-বৃত্তিকে প্রবল বা দুর্বল করে। শেষোক্ত পরিবর্তনের জন্য মানুষের স্বকীয় প্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে। তজ্জন্য সূক্ষ্ম বৃত্তিকে প্রবল করে এবং স্থূল বৃত্তিকে দুর্বল করে অপরাধী মানুষ পুনরায় নিরপরাধী হয়।]

দয়া-মায়া দেশ-প্রেম সুবিচারিতা কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি দ্বারা সূক্ষ্ম বৃত্তি এবং ক্রোধ লোভ ঘৃণা অহমিকা নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি দ্বারা স্থূলবৃত্তি গঠিত। এই স্থূল ও সূক্ষ্ম বৃত্তি উক্তরূপ বহু ভাগে বিভক্ত। উহাদের বহু ইঞ্জিনযুক্ত রকেটের সহিত তুলনা করা হয়। উহাদের যে কোনও একটি ইঞ্জিন দ্বারা উক্ত রকেটদ্বয় পরি-চালিত হতে পারে। অর্থাৎ উহাদের যে কোনও একটি গুণ বা দোষ উদ্বেলিত

করলে অন্যগুলিও উদ্বেলিত হবে। এজন্য একটি অপরাধে কাউকে প্ররোচিত করলে সে সেটিতে ক্ষান্ত না হয়ে অন্যান্য অপরাধও করবে।

[নেতৃবর্গের নির্দেশে জমি জবর দখল করে সে নিবৃত্ত হবে না। পরবর্তীকালে সে যথাক্রমে ব্যাঙ্ক এবং ট্রেজারী ও পরে ঐ নেতার গৃহও লুঠ করবে। এজন্য জনগণকে জাগাবার নামে তাদের সুপ্ত অপস্পৃহাকে জাগানো উচিত কার্য নয়। মানুষের অপস্পৃহাকে অন্তর্মুখী করতে বহু মহাপুরুষকে যুগ যুগ ধরে বহু বাণী বিতরণ করতে হয়েছে। বহুকাল যাবৎ শাসককুল কঠোর হস্তে বল প্রয়োগে মানুষের এই স্বাভাবিক অপস্পৃহা প্রদমিত করেছেন। অপরাধ-স্পৃহা একবার জাগ্রত হলে উহা সহজে প্রদমিত হয় না। উহা ইন্ধন পেলে শনৈঃ শনৈঃ জাগ্রত হয়ে সমগ্র দেশবাসীকে একটি বিরাট স্বভাবদুর্বৃত্ত জাতিতে পরিণত করবে।]

সূক্ষ্মবৃত্তি পরিচালিত সৎপ্রেরণার শক্তি স্থূলবৃত্তি পরিচালিত অপরাধ-স্পৃহা অপেক্ষা কম। এজন্য যত সহজে স্থূলবৃত্তিগুলিকে উদ্বেলিত করা যায় তত সহজে সূক্ষ্মবৃত্তিগুলিকে উদ্বেলিত করা যায় না। ছাত্রদের পড়তে বললে বা কৃষককে খাজনা দিতে বললে তারা তা শুনে না। কিন্তু কোনও নেতা তাদের পড়ো না বা খাজনা দিও না বললে বহুলোক সেই মত কার্য করতে উৎসুক হয়। মন্দ কাজের মত ভালো কাজ করানো সহজ হয় না। সূক্ষ্ম বৃত্তি বা স্থূল বৃত্তির একটির বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটলে ওদের উল্টো বৃত্তিটির হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটে। উহাদের মনো-দণ্ডের একটি বৃত্তি অন্য বৃত্তিটির উল্টো স্থানে থাকে ব'লে এইরূপ হয়।

অপ-স্পৃহা—সৎ প্রেরণা
স্থূল-বৃত্তি—সূক্ষ্ম-বৃত্তি

মানুষের সভ্যতার প্রথম দিকে উপরোক্ত কারণে সূক্ষ্ম বৃত্তি বাহিত দুর্বল সৎপ্রেরণা তাহার স্থূল-বৃত্তি বাহিত প্রবল অপরাধ-স্পৃহাকে প্রদমিত করতে পারেনি। এই অবস্থা হতে অব্যাহতি পেতে কিছু পরে মানুষ প্রচেষ্টা ও অভ্যাস দ্বারা প্রতিরোধশক্তি রূপ অন্য একটি গুণ লাভ করে। এই প্রতিরোধ-শক্তি সৎপ্রেরণার পক্ষে এবং অপরাধ-স্পৃহার বিপক্ষে কার্যকরী হয়ে ছিল।

প্রতিরোধ-শক্তি

মানুষের প্রতিরোধ-শক্তি তিনটি বিভাগে বিভক্ত। যথা: (১) ভয় ভাবনা, (২) শিক্ষা দীক্ষা এবং (৩) বংশানুক্রম। উহাদের পরিধি ও বিস্তৃতি বিভিন্ন মানুষে বিভিন্ন রূপ থাকে। তদনুযায়ী উহাদের কম বেশী শক্তিরও তারতম্য

ঘটে। কিন্তু উহাদের সম্মিলিত শক্তি তথা রেসালটেন্ট ফোর্স একই রূপ থাকে। এই সম্মিলিত শক্তিকে প্রতিরোধশক্তি তথা রেসিসটেন্স পাওয়ার বলা হয়েছে।

কোনও ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় আইনকে, কোনও ব্যক্তি ঈশ্বরকে ভয় করে। অবিশ্বাসী লোকদের আইনের ভয়ই বেশী। ঈশ্বরকে সর্বজ্ঞ বুঝে মানুষ আজ ভীত নয়। ধর্মের প্রভাবের অভাব ঐ ভয় নষ্ট করে। অন্যদিকে সৎ পরিবেশে মানুষ হওয়া ব্যক্তিরা শিক্ষাদীক্ষার কারণে অপরাধ-বিমুখ হয়ে থাকে। কেহ কেহ বংশানুক্রম তথা হেরিডিটিতে বিশ্বাসী না হলেও বলেন যে, প্রত্যেক মানুষ কিছু বিশেষ প্রবণতা সহ জন্মগ্রহণ করে থাকে। অধুনা বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন যে, স্বকীয় জীবনে সংগৃহীত বৈশিষ্ট্য [একোয়ার্ড ক্যারেকটার] বিশেষ ক্ষেত্রে বংশগত হয়। কোনও কারণে উহা ওদের বীজ-কোষকে প্রভাবিত করলে উহা সম্ভব। নিম্নোক্ত একটি পরীক্ষা এ সম্বন্ধে উদাহরণরূপে উদ্ধৃত করা হলো।

"একজোড়া শ্বেত ইঁদুর দম্পতিকে ঘণ্টাধ্বনি শুনা মাত্র খাদ্য গ্রহণার্থে খাঁচা হতে বার হওয়ার জন্য ৮০ বার শিক্ষা দিতে হলো। এরপর ঐ ইঁদুরগুলির মধ্যে প্রজনন ঘটিয়ে ওদের বংশ বৃদ্ধি ঘটানো হয়। ওদের দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম প্রজন্মতে ঐরূপ ভাবে ঘণ্টাধনি শুনা মাত্র বহির্গত হওয়ার জন্য ওদেরকে যথাক্রমে ৬০ বার, ৪৫ বার, ৩০ বার এবং ১৬ বার শিক্ষা দিতে হয়। কিন্তু ওদের ষষ্ঠ পুরুষে ওরা কোনও শিক্ষা ব্যতিরেকে ঘণ্টাধ্বনি শুনা মাত্র খাঁচা হতে খাদ্য গ্রহণের জন্য বহির্গত হতে থাকে। এই সকল পরীক্ষা স্বকীয় জীবনে সংগৃহীত বৈশিষ্ট্যের বংশানুক্রমিতা প্রমাণ করে। অবশ্য মানুষের ক্ষেত্রে উহার জন্য আরও বেশী পুরুষের প্রয়োজন হয়ে থাকে।

ভয় ভাবনা	
শিক্ষা দীক্ষা	প্রতিরোধ শক্তি
বংশানুক্রম	

জৈব রীতিতে আপন প্রয়োজনে এই অপরাধ-প্রতিরোধ শক্তি আমাদের মস্তিষ্কে সৎ প্রেরণা সম্পর্কিত স্নায়ু এবং অপরাধ স্পৃহা সম্পর্কিত স্নায়ু—এই দুই স্নায়ুস্তরের মধ্যবর্তী স্নায়ুস্তরে স্থান করে নিয়েছে। উপরে সূক্ষ্ম-বৃত্তি বাহিত সৎ

(f) এখানে ভীতি উৎপাদনার্থে পুলিশের বলপ্রয়োগের প্রশ্ন আসে। ভাগবত গীতাতে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনার্থে বলপ্রয়োগ অনুমোদিত।

প্রেরণা ও নিম্নে স্থূল-বৃত্তি বাহিত অপরাধ স্পৃহা রয়েছে এবং উভয়ের মধ্যস্থলে আমাদের 'অপরাধ-প্রতিরোধ শক্তি'র স্থান হয়েছে। বলা বাহুল্য যে আমাদের মস্তিষ্কে এখনও বহু অনাবিষ্কৃত স্থান আছে। আপাততঃ আমরা একটি হাই-পোথ্যাটিক্যাল ব্রেনের অস্তিত্ব কল্পনা করতে পারি। ভুলে গেলে চলবে না যে দেহের মত মনেরও ক্রমবিকাশ ঘটেছে।

[সৎপ্রেরণা অ্যাকটিভ্ কিন্তু অপস্পৃহা স্ট্যাটিক্]
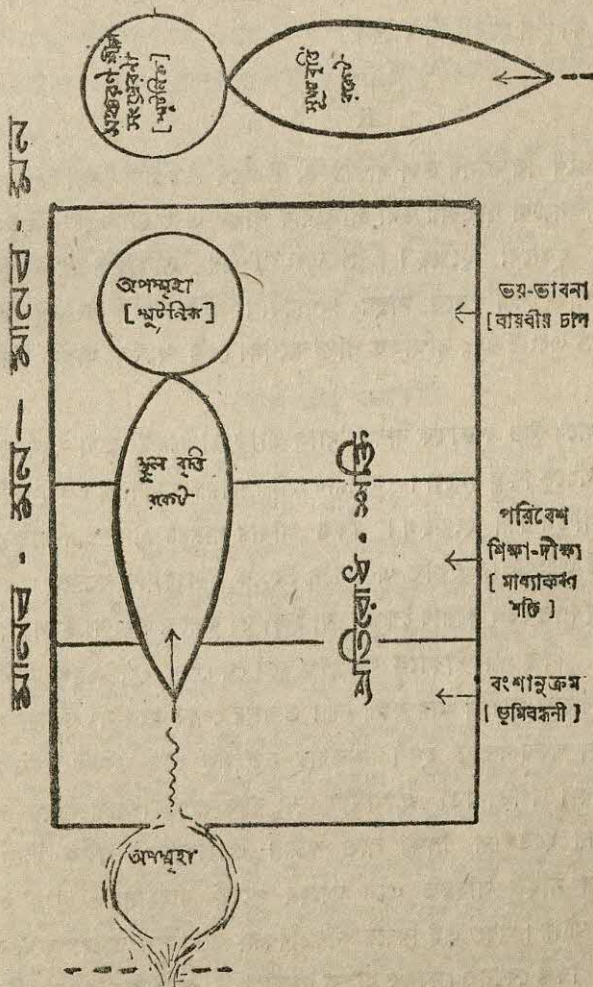
['কু' উঠলে 'সু' নামে]

আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে সৎ প্রেরণা এবং অপরাধ-স্পৃহার মধ্যবর্তী স্থলে 'নবজাত' অপরাধ প্রতিরোধ-শক্তি অবস্থান করাতে নিম্নস্থিত স্থুল-বৃত্তি বাহিত অপরাধস্পৃহা উপরে উঠে উপরিস্থিত সূক্ষ্মবৃত্তি বাহিত সৎ-প্রেরণাকে বিতাড়িত তথা দূরীভূত করে মানুষকে অপরাধী করতে সক্ষম হয় না। এই অপরাধ প্রতিরোধ-শক্তি দূর অতীতে মানুষ প্রাপ্ত হলেও উহা তাদের অভ্যাস এবং প্রচেষ্টা প্রভৃতি দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল। ইহা আমরা বহু পূর্বের আদিম পূর্বপুরুষদের নিকট হতে প্রাপ্ত হইনি। উপরোক্ত গুণাগুণ কয়টির পারস্পরিক শক্তি এবং সম্পর্ক নিম্নোক্ত ফরমূলা হতে বুঝা যাবে।

$$\frac{S+T}{R} = C$$

S অর্থে সিচুয়েসন তথা পরিস্থিতি, T অর্থে টেণ্ডেন্সি তথা প্রবণতা, R অর্থে রেজিসটেন্স পাওয়ার তথা প্রতিরোধ শক্তি এবং C অর্থে ক্রাইম তথা অপরাধ বুঝানো হয়েছে। S এবং T-এর সম্মিলিত শক্তি অপেক্ষা R-এর শক্তি কম হলে মানুষ অপরাধী। এই স্থলে R-এর শক্তিকে বাড়িয়ে S এবং T-এর সম্মিলিত শক্তি অপেক্ষা বেশী করলে মানুষ নিরপরাধী হবে।

এইখানে উচ্চ ধ্বন্যাত্বক বাক্য 'ম্যাল-এ্যাড্‌জাস্টমেণ্ট' তথা সমঝতা-বোধ-হীনতা সম্বন্ধে কিছু বলবো। অপরাধ সৃষ্টির কারণ প্রমাণার্থে এই থিওরি তথা মতবাদ বাতিল করা হয়েছিল। কিন্তু আমার পরিদৃষ্ট প্রতিরোধ-শক্তির শনৈঃ শনৈঃ সৃষ্টি এবং উহার প্রকৃতি এবং গঠন উহাকে পুনঃস্থাপিত করেছে।

মানব শিশু জৈব কারণে শৈশবে যা ইচ্ছা তা করতে এবং যা ইচ্ছা তা পেতে চেয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে বয়ঃপ্রাপ্ত হলে সে দেখে যে, ঐরূপ কার্য করা বা ঐভাবে দ্রব্য পাওয়া আর সম্ভব নয়। দ্রব্যাদি পেতে হলে সৎ উপায়ে পরিশ্রম দ্বারা উহা অর্জন করতে হয়। অন্যথায় চতুর্দিক হতে তজ্জন্য প্রতিবন্ধকতা এসে থাকে। পিতামাতা ও আত্মীয় এবং বয়স্ক প্রতিবেশীদের অনুরূপ কার্যাদি ও ব্যবহার হতে সে শিক্ষা লাভ করে। প্রাপ্তবয়স্ক ঐ বালক ধীরে ধীরে পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য এনে তাদের পূর্বের ব্যবহার ও ধ্যান ধারণার পরিবর্তন ঘটায়। অবশ্য এই বিষয়ে অবিভাবকরা প্রয়োজনে তাদের যথেষ্ট সাহায্য করেন। কিন্তু কোনও কোনও বালক প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ-শক্তি অর্জন করে নিজেকে ঐ নূতন পরিবেশ ও পরিস্থিতির সহিত খাপ খাওয়াতে পারেনি।

এইরূপ ম্যাল-এ্যাডজাস্টমেণ্ট তথা পরিবেশীক অসামঞ্জস্য কিশোর অপরাধী সৃষ্টি করেছে।

বিঃ দ্রঃ—আইনী সংজ্ঞা মাত্র অপরাধীদের বয়স্ক ও কিশোর অপরাধীতে [জুভেনাইল] বিভক্ত করেছে। বিজ্ঞানীদের মতে একই অপস্পৃহা বয়স্ক ও কিশোর—এই উভয় অপরাধীদের পরিচালিত করে। শিশুদের মধ্যে এই স্পৃহা দৃষ্ট হলেও মোটর নার্ভের সমধিক শক্তির অভাবে ওরা অপকর্ম করতে অক্ষম। এই জন্য নিতান্ত শিশুদের কোনও কার্যকে অপকর্ম বলা হয়নি। কিন্তু জুভেনাইল ক্রিমিন্যালরা বয়স্ক তথা এডাল্ট অপরাধীদের মত একই রূপে অপকর্মে সমর্থ হয়। এজন্য জুভেনাইল ক্রিমিন্যালদেরকে অপরাধী বলা হয়ে থাকে।

বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত কোনও শিশুর অপস্পৃহা স্বাভাবিক ভাবে কেন পরিত্যক্ত হচ্ছে না এবং কেন ঐ শিশু অন্যদের মত তার প্রয়োজনীয় প্রতিরোধশক্তি গঠিত করতে সমর্থ হলো না ঃ অপরাধ-বিজ্ঞানীদের সহিত পরামর্শ করে উহার কারণ সমূহ অনুসন্ধান করে যথাশীঘ্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা অভিভাবকদের অবশ্য কর্তব্য।

উহাদের অবস্থান

মানুষের উপরোক্ত তিনটি গুণাগুণ যথা, (১) সৎপ্রেরণা (২) অপরাধ-স্পৃহা এবং (৩) প্রতিরোধ-শক্তি আমাদের মস্তিষ্কের স্ব স্ব [নির্ধারিত] স্থানে সংযুক্ত রয়েছে। একথা স্বীকার্য যে জলাধার ব্যতিরেকে জল রক্ষিত হয় না। উহা ঐ অবস্থাতে কোনও বিশিষ্ট রূপ তথা 'সেপ' প্রাপ্তও হয় না। অনুরূপভাবে আমাদের দোষ বা গুণ রক্ষার জন্য মস্তিষ্কে নির্দিষ্ট স্নায়ুর আধারের প্রয়োজন। দেহ ব্যতিরেকে মনকে কল্পনা করা অসম্ভব কার্য।

আমরা ধীরে ধীরে ক্রমবিকাশের সোপানগুলিতে উঠেছি। তজ্জন্য আমাদের মস্তিষ্কে স্নায়ু স্তরের পর স্নায়ু স্তর [লেয়ার] সংযোজিত হয়েছে। একটি লেমুর একটি বানর প্রভৃতি এবং প্রাচীন এবং আধুনিক মানবগোষ্ঠির মস্তিষ্কের করোটিক তথা খুলি সমূহের ক্রমিক বৃদ্ধি তুলনা করলে উহা বুঝা যাবে। ঐরূপ ক্রমিক বর্ধন স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সর্বোন্নত হওয়ার পর উহা তুষ্ণিভাব গ্রহণ করেছে। মাছ, উভচর সরিসৃপ, পাখী, নিম্ন-স্তন্যপায়ী, লেমুর বাঁদর গরিলা ও মানুষের ব্রেনের নিম্নের চিত্রটি এই সম্পর্কে পরিলক্ষ্য করা যেতে পারে।

অপরাধ-স্পৃহা আমাদের প্রথম প্রাপ্ত বৃত্তি হওয়াতে উহা মস্তিষ্কের স্নায়ু স্তরের নিম্নে এবং উহার পরবর্তীকালে আমরা সৎপ্রেরণা লাভ করাতে উহা মস্তিষ্কের স্নায়ু স্তরের ঊর্ধ্বে সন্নিবেশিত হয়েছে। সর্বশেষে প্রাপ্ত প্রতিরোধশক্তি আপন প্রয়োজনে উভয়ের মধ্যবর্তী স্নায়ুস্তরে স্থান করে নিয়েছে। মস্তিষ্কের স্নায়ু কুণ্ডলীর তথা কনভেলিউসনে'র সৃষ্টির সহিত উহা যথাযথ স্থানে সংযুক্ত হয়েছে।

এই প্রতিরোধ শক্তির হ্রাস ঘটলে বা উহা বিনষ্ট হলে মানুষ পরিবেশ ও পরিস্থিতি সম্ভূত কারণে সহজে অপরাধের শিকার হতে পারে।

প্রতিরোধ শক্তির আধারভূত মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট সূক্ষ্ম স্নায়ু কোনও বীজাণুর আক্রমণে বা বৃদ্ধি 'রুকাব' [Arrested Growth] প্রভৃতি কিংবা কোনও রূপ ক্ষয় ক্ষতিতে বা মানসিক আঘাত প্রভৃতিতে বা অন্যান্য প্রত্যক্ষ কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার জন্য নিম্নের অপরাধ-স্পৃহা উপরে উঠে উপরের সৎ-প্রেরণাকে দূরীভূত করলে মানুষ অপরাধ-রোগী হয়ে থাকে। কিন্তু মানুষ তাদের অভাব ও লোভের কারণে আপন প্রচেষ্টাতে রস ক্ষরণ কিংবা ব্যবহার ও অপব্যবহার প্রভৃতির দ্বারা পরোক্ষ ভাবে তাদের প্রতিরোধ সম্পর্কিত মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট সূক্ষ্মস্নায়ু বিনষ্ট বা দুর্বল করে নিম্নের অপরাধ-স্পৃহাকে ঊর্ধ্বে তুলে উপরের সৎপ্রেরণাকে বিতাড়িত করলে তারা নীরোগ অপরাধী পদবাচ্য হয়। উভয় ক্ষেত্রে নিম্নের প্রদমিত অপস্পৃহা উপরে উঠে সমধিক প্রতিরোধ শক্তির অভাবে সৎপ্রেরণাকে বিতাড়িত করাতে মানুষ অপরাধী হয়েছে।

বিঃ দ্রঃ—প্রশ্ন উঠবে যে, উপরোক্ত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কারণে মস্তিষ্কের সৎপ্রেরণা এবং অপরাধ-স্পৃহা সম্পর্কিত সূক্ষ্ম স্নায়ু বিনষ্ট না হয়ে উহাদের দ্বারা কেবলমাত্র প্রতিরোধ-শক্তির আধারভূত সূক্ষ্ম স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত বা দুর্বল হয় কেন? উহার উত্তর এই যে, নূতনতম এবং অধুনাতম [নিউয়েস্ট এণ্ড লেটেস্ট] সৃষ্ট সূক্ষ্ম স্নায়ু প্রথমে প্রভাবিত [এফেকটেড্] হয়ে থাকে। কারণ পূর্বোক্ত দোষ ও

গুণ দুইটিই বহু প্রাচীন হওয়াতে স্থিতিশীল হয়ে গিয়েছে। উপরন্তু প্রতিরোধ শক্তির পরিবর্তনশীলতার জন্যও ঐরূপ হতে পারে। বলাবাহুল্য যে, আমরা প্রথমে অপরাধ স্পৃহা, তৎপর সৎপ্রেরণা এবং সর্বশেষে প্রতিরোধশক্তি প্রাপ্ত হয়েছি। স্নায়ু বিজ্ঞানের সাহায্যে ইহার বিশদ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

আমাদের দেহে দুই প্রকার স্নায়ু যথা, সাধারণ স্নায়ু তথা ফাংসনাল নার্ভ এবং সূক্ষ্ম স্নায়ু তথা ফাইনার নার্ভ আছে। সূক্ষ্ম স্নায়ুর দ্বারা আমাদের মস্তিষ্ক তথা মগজ গঠিত হয়েছে। আমাদের সাধারণ স্নায়ুর সাহায্যে আমরা অঙ্গাদি সঞ্চালন করে থাকি। আমাদের সাধারণ স্নায়ু তথা ফাংসানাল নার্ভ ক্ষতিগ্রস্ত বা বিনষ্ট হলে উহা পুনর্গঠিত হয় না। কিন্তু মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হলে উহা পুনর্গঠিত হয়ে থাকে। এজন্য উন্মাদরা এবং অপরাধীরা পুনরায় স্বাভাবিক মানুষ ও নিরপরাধী হয়ে থাকে।

বিঃ দ্রঃ—আমাদের হাত পা কর্তিত হলে উহা পুনর্গঠিত হয় না। কিন্তু আমাদের ত্বক অস্থি ও কেশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে উহা পুনর্গঠিত হয়। নিম্নতম প্রাণী অ্যামিবাকে দুইভাগে বিভক্ত করলে উহার প্রতিটি অংশ হতে অন্য অ্যামিবা জন্মায়। কঞ্চুলিকা জীবের দেহ দুই খণ্ড করলে উহাদের প্রতিটি অংশ হতে পূর্ণাঙ্গ কঞ্চুলিকা তথা কেঁচো জীব সৃষ্ট হয়। গৃহগোধিকা তথা টিকটিকির লেজ বিচ্ছিন্ন হলে উহা পুনর্গঠিত হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্থ হলে উহা পুনর্গঠিত হতে পারে। আমাদের মস্তিষ্কের প্রতিরোধ শক্তির আধারভূত সূক্ষ্ম স্নায়ুর ক্ষয়-ক্ষতির ক্রম মত আমাদের প্রতিরোধ শক্তিরও হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে।

(ক) **অপরাধী-রোগী :** অপরাধী-রোগী তথা এ্যাবনরম্যাল ক্রিমিন্যালগণ নিদারুণ স্নায়বিক আঘাত, বীজানুর আক্রমণ ও বুদ্ধিরুকাব তথা এ্যারেষ্টেড গ্রোথ প্রভৃতির কারণে প্রতিরোধ সম্পর্কিত সূক্ষ্মস্নায়ুর প্রত্যক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার জন্য জন্মে। মস্তিষ্কের প্রতিরোধ শক্তি সম্পর্কিত সূক্ষ্ম স্নায়ুর বৃদ্ধি ভ্রূণ অবস্থাতে এবং জন্মের পরেও এক সময় কম বা বেশী রূপে কোনও কারণে রুদ্ধ হতে পারে। এজন্য বালকদের ভয় দেখানো ও প্রহার করা অনুচিত। অপরাধ-রোগীদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন না ঘটাতে অন্য বিষয়ে ওদের স্বভাব চরিত্র স্বাভাবিক মানুষের মত থাকে। কিন্তু প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ শক্তির অভাবে সামান্য কারণ তথা ষ্টিমিউলাস দ্বারা তারা অপরাধী হতে পারে। এই সকল অপরাধ-রোগীরা অপকর্মের জন্য দুর্দমনীয় একটি স্পৃহা অনুভব করে।

উপরোক্ত প্রত্যক্ষ কারণের সহিত আরও কয়েকটি প্রত্যক্ষ কারণ উহাদের

জন্মের জন্য দায়ী। ভেজাল খাদ্য আহার, অতি ঔষধ সেবন, বিষাক্ত জল ও বায়ু ও অতি কোলাহল এবং লাউড স্পিকার ও মাইকের অবিচ্ছিন্ন দুঃসহ শব্দ প্রতিরোধ-শক্তি সম্পর্কিত সূক্ষ্ম স্নায়ু প্রত্যক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে বহুল সংখ্যক অপরাধ-রোগীর জন্ম দেয়। শব্দ ও কম্পন একত্রে ইঁদুরদের প্রাণনাশ ঘটায়। উহা স্বাভাবিক কারণে সভ্য মানুষেরও ক্ষতি করে। এজন্য অধুনা এদেশে অপরাধ-রোগীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বর্ধমান।

অপরাধ-রোগী সৃষ্টিতে এইরূপ স্নায়বিক রোগ এবং বৃদ্ধিরুকার প্রভৃতি স্থায়ী হয়নি। কিছু সময় পরে বৃদ্ধিরুকাব হতে মুক্ত হয়ে পুনরায় উহার গঠন আপনা হতেই সুরু হয়ে সম্পূর্ণ হয়। দৈহিক ও মানসিক চিকিৎসাদি দ্বারা উহাকে পুনর্জীবিত করে উহার গঠন সম্পূর্ণ করা সম্ভব। এইজন্য ঐ বিষয়ে কারোর হতাশ হওয়ার কোনও কারণ নেই।

(খ) **নীরোগ অপরাধী ঃ** নীরোগ অপরাধী তথা নরম্যাল ক্রিমিন্যাল প্রয়োজন এবং লোভ ও অভাব প্রভৃতির কারণে আপ্ত প্রচেষ্টা দ্বারা দেহ-রস ক্ষরণ প্রভৃতি পরোক্ষ কারণে প্রতিরোধ সম্পর্কিত সূক্ষ্মস্নায়ুকে ক্ষতিগ্রস্ত করে নিম্নের অপস্পৃহাকে উপরে এনে সৎ-প্রেরণাকে দূরীভূত করে নিজেদের'কে নীরোগ অপরাধী নামক অপরাধীতে পরিণত করে থাকে। মানুষের এই দেহ-রস ক্ষরণ সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে।

বিঃ দ্রঃ—আমাদের দেহে বহুবিধ জানা ও অজানা রস-পিণ্ড আছে। উহারা কখনও উপকারী কখনও বা অনুপকারী রস তথা হরমোন আদি ক্ষরণ করে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে একই হরমোন তথা দেহ-রস উহার [বেশী বা কম] মাত্রানুযায়ী মানুষের পক্ষে উপকারী বা অনুপকারী হয়ে থাকে। এই বিষয় সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে আসতে গবেষণার একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র আছে।

আমাদের কোনও কার্য বা চিন্তা স্থূল বৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হলে অনুপকারী হরমোন ক্ষরিত হয়ে উহা রক্তবাহী ধমনীর মাধ্যমে মস্তিষ্কে উপনীত হয়ে আমাদের প্রতিরোধশক্তি সম্পর্কিত সূক্ষ্ম স্নায়ু কম বেশী ক্ষতিগ্রস্ত করে। কিন্তু আমাদের প্রতিটি কার্য ও চিন্তা স্থূল বৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হয়নি। আমাদের অন্যান্য কার্য ও চিন্তা সূক্ষ্মবৃত্তি দ্বারাও পরিচালিত হয়েছে। এতদবস্থায় আমাদের মধ্যে তৎক্ষণাৎ উপকারী রস তথা হরমন আদি ক্ষরিত হবে। এই উপকারী হরমোন রক্তবাহী ধমনীর মাধ্যমে অনুরূপভাবে মস্তিষ্কে উপনীত হয়ে আমাদের প্রতিরোধ সম্পর্কিত সূক্ষ্ম স্নায়ু নিমিষে পুনর্গঠিত করেছে।

এই ভাঙাগড়ার কার্য নিয়ত আমাদের মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে ঘটাতে আমাদের মস্তিষ্ককে সৎপ্রেরণা এবং অপরাধ স্পৃহার একটি অনন্ত দ্বন্দ্বস্থল বলা হয়ে থাকে। পৃথিবীতে কোন বিরূপ ক্রিয়া মাত্রেরই প্রতিক্রিয়া থাকা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা।

একটি পরীক্ষার দ্বারা উক্ত ঘটনা সমূহ প্রমাণ করা যায়। কোনও এক ভেককে প্রতিপ্রাতেঃ আট ঘটিকাতে খাদ্য দিলে তার স্যালিভারী জুস নির্গত হয়। কিন্তু কোনও দিন তাকে খাদ্য না দিলেও ঠিক ঐ সকাল আটটাতে তার স্যালিভারী জুস নির্গত হবে। এক্ষেত্রে খাদ্য প্রাপ্তির আশাতে তথা এক্সপেকেটশনে ঐ একই সময়ে সে স্যালিভারী জুস নির্গত করেছে। এক্ষেত্রে উহা একরূপ রিফ্লেক্স এ্যাকসন তথা স্বয়ংক্রিয় শক্তি অর্জন করেছে।

ভালো বা মন্দ বাক্যাদি এবং ক্লিষ্টাক্লিষ্ট বোধ [প্লেজেন্ট ও আনপ্লেজেন্ট] প্রভৃতি দ্বারাও মানুষের মনে ত্বরিত গতিতে ঐরূপ ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া আনা সম্ভব। ভালো বাক্যে মানুষ মাত্রই খুশী ও মন্দ বাক্যে তারা ক্রুদ্ধ হয়েছে।

এই উপকারী ও অনুপকারী হরমোন ক্ষরণের ক্ষমতা অসীম। উহা কেবল মাত্র প্রতিরোধশক্তি সম্পর্কিত সূক্ষ্মস্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত বা পুনর্গঠিত করে ক্ষান্ত হয় না। উহাদের মাত্রাধিক ক্ষরণ মানুষের সূক্ষ্ম ও স্থূল বৃত্তি দুটিকেই যথাক্রমে সবল বা দুর্বল করে থাকে। উপরন্তু অনুপকারী রস চতুষ্পার্শ্বের অন্যান্য বৃত্তি সম্পর্কিত স্নায়ু স্থানকে নষ্ট করে তন্নিম্নের প্রদমিত অন্যান্য আদিম বৃত্তিগুলিকেও উপরিভাগে আনে।

(১) উপকারী ও অনুপকারী হরমোন-ক্ষরণ কমবেশী সম পরিমাণ হলে তারা সাধারণ মানুষ থাকে। অনুপকারী হরমোন কম মাত্রাতে এবং উপকারী হরমোন ক্ষরণ বেশী মাত্রাতে হলে মানুষ একজন সাধক তথা [Saint] সেইন্ট হয়। এদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন না হওয়াতে এদের স্বভাব চরিত্র সাধারণ মানুষের মত। এরা সমাজ সংসার ত্যাগী না হয়ে লোকের উপকারার্থে গার্হস্থ্য জীবন যাপন করে। কিন্তু লেশমাত্র অনুপকারী হরমন ব্যতিরেকে কেহ কেবলমাত্র যদি উপকারী হরমোন ক্ষরণ করে তাহলে উহা তার স্থূল বৃত্তিকে নিষ্ক্রিয় এবং সূক্ষ্ম বৃত্তিকে অতি বর্ধিত ও অমিতবলী করে তাকে মহাপুরুষে পরিণত করবে।

[এমত অবস্থায় এই সকল যোগী পুরুষরা সংসারত্যাগী হয়ে পর্বতবাসী বা অরণ্যচারী হয়ে থাকে। এই অবস্থার উপনীত হলে তারা বহুপ্রকার মানসিক অতিন্দ্রিয়তা তথা মেণ্টাল হাইপারসেনসিবিলিটি প্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু চিন্তাকে

সম্পূর্ণভাবে সংযত করা পুঁথিগত ভাবে তথা থিওরিটিক্যালি সম্ভব হলেও উহা কখনও প্র্যাকটিকালি তথা বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। অতি বড় সাধকদের মনের চিন্তার সামান্য শতাংশও লোকসমাজের গোচরীভূত হলে তারা বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যাবে।]

(২) উপকারী হরমোন এবং অনুপকারী হরমোন ক্ষরণ কমবেশী সমান হলে মানুষ নিরপরাধী মানুষ হয়। এই বিষয়ে আমি ইতিপূর্বে উপরোক্ত অনুচ্ছেদে বলেছি। উপকারী হরমোন কম এবং অনুপকারী হরমোন বেশী হলে মানুষ প্রাথমিক অপরাধী হয়ে থাকে। তাদের ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন না হওয়াতে তাদের স্বভাব চরিত্র স্বাভাবিক মানুষের মত। তারা সভ্য মানুষের সহিত সংসারে একত্রে বসবাস করে। কিন্তু কোনও প্রাথমিক অপরাধীর দেহে উপকারী হরমোন ক্ষরণ নগণ্য এবং অনুপকারী হরমোন ক্ষরণ অতিমাত্রায় হলে উহা প্রকৃত অপরাধী তথা শেষ পর্যায়ের অপরাধীতে রূপান্তরিত হবে। লেশমাত্র সুচিন্তা ব্যতিরেকে মাত্র নিয়ত মনে কুচিন্তা করাতে ইহা হয়ে থাকে।

[এই শেষ পর্যায়ের অপরাধীদের মধ্যে বহু স্নায়বিক তথা সেনসরী অতিন্দ্রিয়িতা তথা হাইপারসেনসিবিলিটি এবংবহু প্রকার আদি মানুষসুলভ ক্ষমতা ও স্বভাবসমূহ পরিদৃষ্ট হয়। এই অবস্থায় উপনীত হলে তারা সভ্য সমাজ ত্যাগ করে নিকৃষ্ট শ্রেণীর বেশ্যাদের সহিত গহন বস্তীবাসী বা স্নামবাসী হবে।]

বিঃ দ্রঃ—অপরাধী সৃষ্টির কারণস্বরূপ হরমোন ক্ষরণ মতবাদ অবিশ্বাস্য বা অবান্তর মনে হলে উপরোক্ত তথ্যসমূহ ব্যবহার ও অব্যবহার তথা ইউজ এণ্ড ডিস্ ইউজ থিওরী দ্বারা প্রমাণ করা যেতে পারে। কামারের ডান হাত অতি ব্যবহারে স্থূল এবং বাম হাত অ-ব্যবহারে ক্ষীণ হয়। এইভাবে জিরাফের ও উষ্ট্রের গলদেশের বৃদ্ধি এবং সর্পের পদ-চতুষ্টয়ের বিলুপ্তি তাদের বাসস্থান পরিবর্তন হেতু ঘটেছে।

মানুষ তাদের সূক্ষ্মবৃত্তি অতিব্যবহার করলে এবং স্থূলবৃত্তি কম ব্যবহার করলে তাদের সূক্ষ্মবৃত্তি বাড়ে এবং অনুক্রমিক ভাবে তাদের স্থূল-বৃত্তি কমে। অনুরূপভাবে মানুষ তাদের স্থূলবৃত্তি অতি ব্যবহার করলে এবং সূক্ষ্মবৃত্তি কম ব্যবহার করলে তাদের স্থূলবৃত্তির শক্তি বাড়ে এবঃ অনুক্রমিক ভাবে তাদের সূক্ষ্ম বৃত্তি কমে। এই উভয় বৃত্তির কোন একটি বৃত্তি বহুকাল অ-ব্যবহৃত থাকলে উহা সর্প জীবের পদলুপ্তির মত ধীরে ধীরে ক্রমে লুপ্ত হওয়াও সম্ভব। ওদের স্থূলবৃত্তি কম ব্যবহার করে বহু উৎকট অপরাধী পুনরায় নিরপরাধী হয়েছে।*

* অ-ব্যবহার তথা ডিস্ ইউজ'কে অপব্যবহার তথা মিস ইউজ রূপে ভুল না করা হয়।

ইমপোটেন্সী তথা যৌন-অক্ষমতা দৈহিক ও মানসিক উভয় প্রকারের হয়ে থাকে। ব্রহ্মচারী মানুষ বহুকাল তার যৌন-অপাঙ্গ অ-ব্যবহৃত রেখে পরে হঠাৎ একদিন বিবাহ করলে যৌন সঙ্গমে অক্ষম হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে অভ্যাস ও ব্যবহার দ্বারা উহার ক্ষমতা বাড়ানো সম্ভব। এ বিষয়ে বধূদের স্ব স্ব স্বামীদের সাহায্য করা উচিত। দ্রুত ধাবিত রেল ইঞ্জিন বন্ধ হওয়ার পরও যেমন বহুক্ষণ লাইনের উপর চলে তেমনি অভ্যাসের জন্য বয়স্ক ব্যক্তিদের যৌন-ক্ষমতা আরও বহুকাল পর্যন্ত পূর্বের মত সক্রিয় থাকে। এই সকল উদাহরণও এতদ-সম্পর্কিত উপরোক্ত মতবাদগুলি সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করবে।
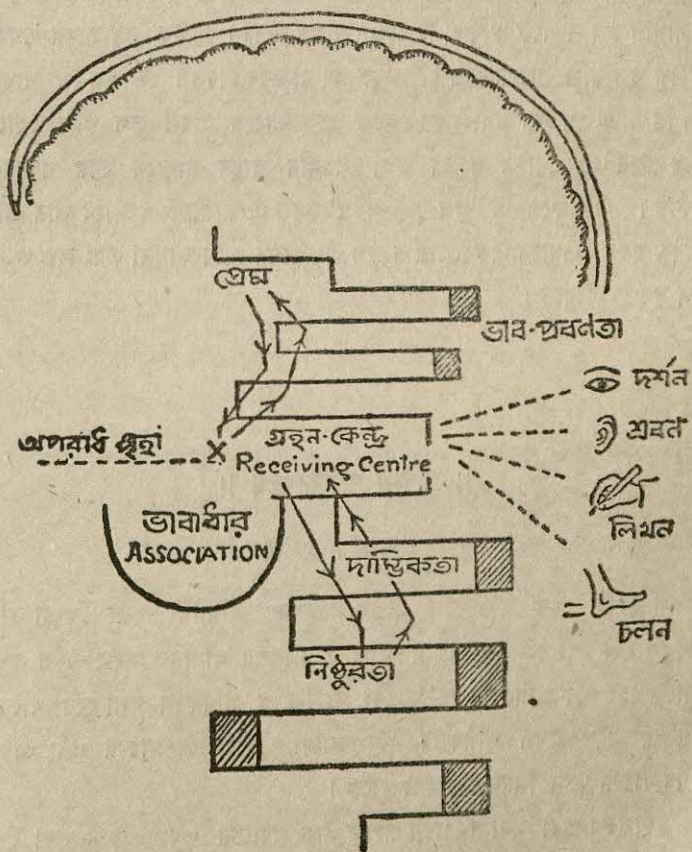
হাইপ্যাথেটিক্যাল ব্রেন

উপরোক্ত তথ্যমূলক চিত্র হতে বক্তব্য বিষয় সুচারুরূপে বুঝা যাবে।

নিরপরাধীদের মধ্যে সূক্ষ্ম বৃত্তি ও স্থূল বৃত্তির শক্তি কম বেশী সমান। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ের অপরাধীদের মধ্যে সূক্ষ্ম বৃত্তির শক্তি তাদের স্থূল বৃত্তির শক্তি অপেক্ষা কম আছে। কিন্তু শেষ পর্যায়ের প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে সূক্ষ্ম বৃত্তি প্রায়ই বিরল এবং তাদের স্থূল বৃত্তি অমিতবলী। তবে উহাদের শক্তির কম বেশী পরিমাণ মত বহু মধ্যবর্তী অপরাধীরও সন্ধান মেলে।

উপরোক্ত চিত্রটিতে একটি সুন্দরী কন্যা জনৈক ব্যক্তির চক্ষের সম্মুখে নৃত্য-গীত করছে। কবির ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম বৃত্তি তার স্থূল বৃত্তি অপেক্ষা প্রবল হওয়াতে ঐ সুন্দরী নারীর রূপ রিসিভিং সেণ্টারে এলে তার সূক্ষ্ম বৃত্তি তাকে উপরে তুলে পরে মোটর নার্ভের মাধ্যমে হস্তে পাঠায়। এর ফলে কবি হস্ত দ্বারা লেখনী তুলে ঐ নারীর রূপ সম্পর্কে কবিতা লিখতে আরম্ভ করে। কিন্তু দুর্বৃত্তদের ক্ষেত্রে তাদের স্থূল বৃত্তি তাদের সূক্ষ্ম বৃত্তি অপেক্ষা বহুগুণে প্রবল। তজ্জন্য ঐ নারীর রূপ রিসিভিং সেণ্টার তথা গ্রহণ-কেন্দ্রে এলে তাদের প্রবল স্থূল বৃত্তি উহাকে নিম্নে টেনে এনে মোটর নার্ভের তথা ক্রীয়মান স্নায়ুর মাধ্যমে তার পদযুগলে পাঠায়। এর ফলে ঐ 'স্থূল বৃত্তি-সর্বস্ব' দুর্বৃত্ত ঐ নারীকে ধর্ষণার্থে তার প্রতি ধাবিত হয়। এখানে একই নারীর রূপ একজনের মনে কামনা এবং অন্য জনের মনে মুগ্ধতা এনেছে।

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥

অপরাধ চরিত্র

পরিবর্তন হেতু স্বাভাবিক মানুষ প্রকৃত অপরাধী হলে কিংবা তারা কোনও মহাপুরুষ হলে উভয়ের স্বভাবের ও চরিত্রের স্নায়বিক অদল বদল হয়। ইহাকে চেঞ্জ অফ পারসোন্যালিটি তথা ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন বলা হয়ে থাকে। চরিত্রের এই আমূল পরিবর্তন মহাপুরুষদের ক্ষেত্রে উচ্চমানের এবং প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে নিম্নমানের হয়ে থাকে।

মহাপুরুষ তথা মহামানবদের ক্ষেত্রে উচ্চ পর্যায়ের এবং প্রকৃত তথা শেষ পর্যায়ের অপরাধীদের মধ্যে নিম্ন পর্যায়ের ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন দেখা যায়। কয়েকজন সাধক তথা সেইণ্ট'এর সন্ধান পেলেও মহাপুরুষদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে

আমি নিজেই সন্দিহান। [তাই ওদের সম্বন্ধে আমি কোনও আলোচনা এই প্রবন্ধে করবো না।]

অপরাধ-রোগী তথা অ্যাবনরম্যাল ক্রিমিন্যালদের মধ্যে সাধারণ নিরপরাধী মানুষের মত কোনও আমূল ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ঘটে না। নীরোগ অপরাধীদের অন্তর্গত প্রথম পর্যায়ের অপরাধীদের ক্ষেত্রেও কোন আমূল ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ঘটেনি। উহাদের সকলের স্বভাব চরিত্র সাধারণ নিরপরাধী মানুষের মত হয়ে থাকে। একমাত্র নীরোগ অপরাধীদের শেষ পর্যায়ের তথা প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে আমূল ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন পরিদৃষ্ট হয়। এক্ষণে আমি মাত্র শেষ পর্যায়ের প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে দৃষ্ট ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন এবং উহার অন্তর্নিহিত কারণসমূহ ব্যাখ্যা সহ বিবৃত করবো।

মানুষের স্থূল-বৃত্তি ও সূক্ষ্ম-বৃত্তির পরিবর্তনের উপর তাদের ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন নির্ভর করে। এইরূপ পরিবর্তনের ফলে বহুবিধ আদিম বৃত্তির পুনরাবির্ভাব ঘটে থাকে। এই মতবাদ সম্বন্ধে বিজ্ঞান ভিত্তিক বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে।

আদিকালে মানুষ বন্য অবস্থায় মাত্র কতিপয় বাক্য দ্বারা পরস্পরের সহিত ভাবের আদান প্রদান করতো। কিন্তু মানব সভ্যতার উন্মেষে ঐ কতিপয় বাক্য হতে আমরা শক্তিশালী ভাষার সৃষ্টি করেছি। এক্ষেত্রে বাক্যের এবং ভাবের সংখ্যা মানুষের মধ্যে ক্রমান্বয়ে বেড়ে গিয়েছে।

নিম্নস্তরের প্রাণীদের মধ্যে আমরা যৌন সঙ্গমে ও পারস্পরিক ইঙ্গিত আদিতে [অ্যানিম্যাল কমিনিউকেসনে] সূক্ষ্ম বৃত্তির সন্ধান পাই। উহারা স্থূল বৃত্তি কলহাদি ও আত্মরক্ষার কার্যে ব্যবহার করেছে। এদের মধ্যে মাত্র এই দুইটি বৃত্তির স্থূল ভাবে প্রকাশ দেখা গিয়েছে। কিন্তু কুকুর আদি জীবের ক্ষেত্রে ঐ বৃত্তি দুটিকে সর্বপ্রথম কিছুটা বিচ্ছিন্ন ও তরলাকৃতি [ডাইলিউটেড] হয়ে 'ভাবপ্রবণতা রূপ একটি সূক্ষ্ম এবং নিষ্ঠুরতা রূপ একটি স্থূল বৃত্তির সৃষ্টি দেখি।' ইহাকে জীবদিগের মনের ক্রমবিকাশ তথা 'ইভোলিউসন্ অফ মাইণ্ড' বলা যায়।

ভাবপ্রবণ অবস্থায় কুকুর লেজ নাড়ে ও গাত্রলেহন করে। কিন্তু উহা 'নিষ্ঠুরতা' অবস্থায় চীৎকার এবং দংশন করে। অন্যান্য জীবদিগের সম্বন্ধেও এইরূপ বলা যেতে পারে। পর পৃষ্ঠার চিত্রটি হতে বক্তব্য বিষয় বুঝা যাবে।

ভাব প্রবণতা
গ্রহণ কেন্দ্র
নিষ্ঠুরতা

আদি বন্য মানুষরা চারিটি বৃত্তি দ্বারা জীবন নির্বাহ করতো। যথা (১) অলসতা (২) ভাবপ্রবণতা (৩) দাম্ভিকতা এবং (৪) নিষ্ঠুরতা। নিষ্ঠুরতার তরলিকৃত অংশ দাম্ভিকতা। অর্থাৎ নিষ্ঠুরতা হতেই দাম্ভিকতার সৃষ্টি। ভাবপ্রবণতার উর্ধ্বের স্থানটি অলসতার দ্বারা অধিকৃত। কর্ম-তৎপরতা তথা অ্যাকটিভিটির দ্বারা এই অলসতা কম বেশী দূরীভূত হওয়াতে সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছে। অলসতা দূরীভূত হলে 'প্রেমবৃত্তি' উহার শূন্য স্থানটি অধিকার করে। কারণ এ জগতে শূন্যের কোনও স্থান নেই। এই সূক্ষ্মতর প্রেমবৃত্তি [সুপার কোয়ালিটি] ভাবপ্রবণতারই একটি তরল রূপ। অর্থাৎ সূক্ষ্মতর 'প্রেমবৃত্তি' ভাবপ্রবণতারই একটি বর্ধিত অংশ।

নং—১

অলসতা
ভাব প্রবণতা
গ্রহণ কেন্দ্র
দাম্ভিকতা
নিষ্ঠুরতা

নং—২

সূক্ষ্মবৃত্তি	প্রেমবৃত্তি
	ভাব প্রবণতা
	গ্রহণ কেন্দ্র
স্থূলবৃত্তি	দাম্ভিকতা
	নিষ্ঠুরতা

বিঃ দ্রঃ—আদি মানুষের করোটি তথা খুলির পশ্চাদংশ স্বল্প পরিমাণ মস্তিষ্ক ধারণ করতো। তজ্জন্য খুলির পশ্চাদংশ ক্ষুদ্র এবং উহার মুখাংশ দীর্ঘ ছিল। কিন্তু সভ্য মানুষের করোটির পশ্চাদংশ অধিক পরিমাণ মস্তিষ্ক ধারণার্থে বৃহৎ। এজন্য ওদের মুখাংশের পরিমাপ কমে গিয়েছে। আদি মানুষের মস্তিষ্কে স্থানাভাবের জন্য মাত্র এই চারিটি বৃত্তি স্থূলভাবে থাকাই স্বাভাবিক। অন্যদিকে—সভ্য মানুষকে বহু সূক্ষ্ম ও স্থূল [তরলাকৃতি] বৃত্তি ধারণ করতে হওয়ায় উহাদের করোটির পশ্চাদংশ বৃহদাকার।

আদি যুগে অরণ্যে যথেষ্ট খাদ্য থাকাতে খাদ্যসংগ্রাহী আদি মানুষ স্বভাব-অলস হতো। বরফ যুগে তথা গ্লেসিয়াল পিরিয়েডে তারা গুহাতে বদ্ধ থেকে অলস থেকেছে। এজন্য এদের মধ্যে স্বল্প কর্ম-তৎপরতা ও অধিক মাত্রাতে অলসতা থাকা স্বাভাবিক। বরফ যুগের পর তারা কর্মতৎপর হয়ে উঠে। বংশবৃদ্ধির সহিত এদের কঠোর জীবনসংগ্রামও সুরু হয়। ধীরে ধীরে তাদের তৎপরতা বাড়ে ও অলসতা কমে। বাহু অপেক্ষা মস্তিষ্ক চালনা বেশী হলে ওদের মস্তিষ্কের বৃদ্ধি ঘটে ও তজ্জন্য তাদের করোটির পশ্চাদংশ বৃহৎ হয়। যাদের মধ্যে এই পরিবর্তন ঘটেনি, তারা ডারোইনী 'ন্যাচারেল সিলেকসন' মতবাদ মত নিশ্চয়ই নিশ্চিহ্ন হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের বংশধরদের মধ্যে তাদের পূর্বপুরুষদের স্বভাব চরিত্র 'ক্রোমজম-স্থিত জিনে'র' [Gene] তথা দব্যাম্বর মাধ্যমে জাগ্রত বা সুপ্তাবস্থাতে কিছু কিছু রয়ে গিয়েছে।

পরবর্তীকালে তৎপরতা দ্বারা অলসতা দূর করে মানুষ সুসভ্য হলে তাদের (১) প্রেমবৃত্তি, (২) ভাবপ্রবণতা, (৩) দাম্ভিকতা এবং (৪) নিষ্ঠুরতা তথা নিষ্ঠুরবৃত্তি ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন ও তরল হয়ে নিম্নের চিত্রে প্রদর্শিত অতোগুলি

উচ্চ
সূক্ষ্ম
দেশ প্রেম
আত্মোৎসর্গ
সুবিচার
লোক হিতৈষতা
অমায়িকতা
ইত্যাদি
প্রেম-বৃত্তি
স্নেহ প্রীতি
দয়ামায়া
দরদ
বাৎসল্য
ইত্যাদি
ভাববৃত্তি
গ্রহণ কেন্দ্র
উচ্চ
স্থূল
আত্মম্ভরিতা
ঘৃণা
নীচতা
অহঙ্কার
অবজ্ঞা
ইত্যাদি
দম্ভোবৃত্তি
জিঘাংসা
ক্রূরতা
আত্মসর্বস্বতা
অত্যাচারিতা
ইত্যাদি
নিষ্ঠুরবৃত্তি

স্থূলবৃত্তি ও সূক্ষ্ম বৃত্তির সৃষ্টি হয়েছে। এই চিত্রটিই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবন করলে বক্তব্য বিষয় ভালো রূপে বুঝা যাবে। সুসভ্য মানুষের মধ্যে আমরা অতোগুলি মনোবৃত্তি পরিলক্ষিত করি। উহাদের আমি বহু ইঞ্জিন যুক্ত রকেটের সঙ্গে তুলনা করেছি।

স্বাভাবিক সুসভ্য নিরপরাধী মানুষদের মত অপরাধ-রোগী এবং নিরোগ-অপরাধীদের অন্তর্গত প্রাথমিক অপরাধীদের মধ্যেও আমরা ঐরূপ কমবেশী বহু তরলীকৃত সূক্ষ্ম ও স্থূল বৃত্তিসমূহ দেখে থাকি। কারণ—এদের মধ্যে প্রকৃত অপরাধীদের মত ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন প্রায়ই ঘটেনি।

[বিঃ দ্রঃ—উপরের উর্দ্ধমুখী সূক্ষ্ম বৃত্তিগুলি সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর হয়। এবং নিম্নমুখী তথা নিম্নের স্থূল বৃত্তিগুলির স্থূলতা কমে যায়। উহাদের একটির স্থূলতা অন্যটি হতে কম হয়। উহারা কম বেশী তরলী-কৃত এবং বিচ্ছিন্ন হওয়াতে ইহা হয়ে থাকে। বেশী সূক্ষ্ম-বৃত্তি কম সূক্ষ্ম-বৃত্তিকে প্রদমিত করতে পারে। বিচারক কয়েদীর প্রতি দয়ার্দ্র হলেও তাকে দণ্ড দিয়ে থাকেন। এখানে তাঁর সুবিচারিতা সূক্ষ্মতর বৃত্তি হওয়াতে দয়ামায়া রূপ কম সূক্ষ্ম বৃত্তির উপর জয়-যুক্ত হলো।]

প্রাথমিক অপরাধীদের কেহ কেহ পরবর্তীকালে প্রকৃত অপরাধী তথা শেষ পর্যায়ের অপরাধী হলে উহাদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের আমূল পরিবর্তন হয়ে থাকে। সেই অবস্থায় ধীরে ধীরে ওদের অতোগুলি সূক্ষ্ম ও স্থূল বৃত্তিসমূহের সংখ্যা কমে যেতে থাকে। উহারা পরস্পরের সহিত ঘন সংলগ্ন তথা 'ইনটার-লকড্' ও পরিমিশ্রণ তথা কমপ্রেসড্ হয়ে পুনরায় পূর্বের মত চারিটি বৃত্তিতে পর্যবসিত হয়। প্রথমে ওদের স্নায়ু আশ্রয়ী ক্ষণভঙ্গুর সূক্ষ্মতম প্রেম বৃত্তিটির বিলোপ ঘটে। প্রেমবৃত্তিটি বিলুপ্ত হলে ঐ শূন্য স্থানটি অলসতা দ্বারা পুনরায় অধিকৃত হয়। এইভাবে পূর্বের মত ওদের মধ্যে চারিটি বৃত্তি যথা (১) অলসতা (২) ভাবপ্রবণতা (৩) দাম্ভিকতা ও (৪) নিষ্ঠুরতা পুনরায় প্রকট হয়। ইহাকে আদিম যুগে পুনঃপ্রবর্তন তথা রিভারসন টু প্রিমিটিভ্ ষ্টেজ বলা হবে। এই সময় এরা বহুপ্রকার দৈহিক ও মানসিক 'আদি-মানব'-সুলভ বৃত্তিও লাভ করে। অবশ্য এইরূপ ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন প্রতিটি ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ না হয়ে আংশিক পরিমাণেও হয়ে থাকে।

ওদের অলসতার কিংবা তৎপরতার কম বেশী অনুশীলন কিংবা উপকারী ও অনুপকারী হরমোন ক্ষরণ কিংবা ব্যবহার ও অব্যবহার আদি যে কোনও একটি

কারণে ঐ সকল স্থূল ও সূক্ষ্ম বৃত্তিগুলির সংখ্যা বাড়ে কিংবা কমে যায়। নিম্নের চিত্রটিতে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হেতু অতোগুলি সূক্ষ্ম ও স্থূল বৃত্তি পুনরায় পরস্পর সংলগ্ন ও একীভূত হয়ে চারিটি আদি বৃত্তিতে পরিণত হয়ে গেছে।

এই চারিটি আদি বৃত্তিই পর্যায়ক্রমে পুরানো পাপীদের মনো-দণ্ডে উঠানামা করে থাকে। এরা বিভিন্ন মাত্রায় পর্যায়ক্রমে অলস, ভাবপ্রবণ, দাম্ভিক ও নিষ্ঠুর হয়েছে। ঐ অপরাধীরা তাদের ঐ বৃত্তি চতুষ্টয়ের কোনটিতে কতক্ষণ অবস্থান করবে তার কোনও স্থিরতা নেই। থানাতে বন্দীকৃত অবস্থায় শেষ পর্যায়ের অপরাধীদের মধ্যে এই বৃত্তিচতুষ্টয়ের উঠা নামা প্রায়ই দেখা যায়।

মস্তিষ্কের ক্ষয় ক্ষতিতে উহাতে নিহিত বৃত্তিগুলির পারস্পরিক ভারসাম্য নষ্ট হলে বহু কিছু উন্টা পান্টা হয়ে যায়। তৎসহ বহু প্রদমিত আদি মানব-সুলভ বৃত্তি উপরে উঠে। উপরোক্ত পরিবর্তনের সহিত দৈহিক অসাড়তাদিও উহারা প্রাপ্ত হয়। ওইগুলি এবং উপরোক্ত বৃত্তি চতুষ্টয় সম্বন্ধে নিম্নে পৃথক পৃথক আলোচনা করবো।

মস্তিষ্কের ক্রমোন্নতি
(স্নায়ুস্তরের পর স্নায়ুস্তর)

উপরোক্ত সূক্ষ্ম ও স্থূল বৃত্তিগুলির বাংলা নামের অনুক্রমিক ইংরাজী নাম-গুলি অপরাধ-তত্ত্ব সম্পর্কিত গবেষক ছাত্রদের সুবিধার্থে নিম্নে পুনঃউদ্ধৃত হলো।

রিভারশন টু প্রিমিটিভ স্টেজ। চেঞ্জ অফ্ পারসোন্যালিটি।
অল্ সেগমেণ্টস্ ইণ্টারলকড্।

N. B.—সুপার কোয়ালিটি রিপ্লেস লেজিনেস। পূর্ব পৃষ্ঠার সপ্লিট্ আপ্ সেগমেণ্টের ইণ্টারলকিঙ-এর পরিমাপের উপর পারসোন্যালিটি চেঞ্জের পরিমাণ নির্ভর করে।

ইভোলিউশন অফ্ মাইণ্ড

ফাইনার সেন্টিমেন্ট্	জাসটিস্	সুপার্ কোয়ালিটি
	পেট্রিয়টিজম্	[স্প্লিট্ আপ]
	সেল্ফ্ স্যাক্রিফাইস	
	ফিলনথ্রফি	
	ডিসেন্সি	
	এসথেটিক সেন্স	
	অ্যাফেকশন্	
	লভ্, পাইটি	
	পিটি, পোলাইটনেস	সেনটিমেনটেলিটি
	অ্যাটাচমেণ্ট্	[স্প্লিট্ আপ]
	কাইণ্ডনেস্, ইত্যাদি	
	রিসিভিঙ সেণ্টার	
বেসার সেন্টিমেন্ট্	ইগোইজম্	
	হেট্রেড্	ভ্যানিটি
	ডেসপাইসিঙ	[স্প্লিট্ আপ]
	এবিউসিভ্নেস্	
	ভালগারিটি, ইত্যাদি	
	উইকেড্নেস্	
	সেল্ফিশনেস্	ক্রুয়েলটি [স্প্লিট্ আপ]
	অ্যাগ্রেসিভনেস্	
	ডেসপারেশন	
	হারমফুলনেস, ইত্যাদি	

দৈহিক অসাড়তা

ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হেতু উপরোক্ত রূপ মানসিক এবং দৈহিক পরিবর্তন প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে আসে। প্রাথমিক অপরাধী এবং অপরাধ রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হয় নি। তাই এরা উক্ত মানসিক পরিবর্তন এবং দেহগত পরিবর্তন হতে মুক্ত। তারা ঐ সকল বিষয়ে স্বাভাবিক নিরপরাধী মানুষের মত থাকে।

প্রাথমিক অপরাধী ও স্বাভাবিক মানুষদের ক্ষেত্রে কষ্ট-বোধ বেশী ও স্পর্শ বোধ কম এবং উষ্ণবোধ বেশী ও শৈত্যবোধ কম। কিন্তু ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হেতু প্রকৃত-অপরাধীদের মধ্যে ঐগুলি বিপরীত অবস্থায় আসে। ওদের দেহে কষ্টবোধ কম ও স্পর্শ-বোধ বেশী এবং উষ্ণবোধ কম ও শৈত্য-বোধ বেশী। মস্তিষ্কের রেড-গ্রীন এবং ইয়োলো-ব্লু মেণ্টাল প্রশেস [মনোদণ্ড] এর মত মানবের দেহে 'কষ্ট-স্পর্শ এবং উষ্ণ-শৈত্য' স্নায়ু দণ্ড আছে। পূর্ব পৃঃ দ্রঃ। একই দণ্ডে ঐগুলি উল্টো উল্টি ভাবে অবস্থিত। তজ্জন্য ওদের একটি কমলে অন্যটি বাড়ে।

কষ্ট—— স্পর্শ

উষ্ণ——শৈত্য

কষ্ট বোধের পর স্পর্শ বোধ এবং উষ্ণ বোধের পর শৈত্য বোধের সৃষ্টি। উষ্ণতা কষ্ট বোধের নামান্তর মাত্র। দেহত্বক তথা টিস্যু দাহিত হলে কষ্ট হয়। কোমল স্পর্শের বদলে অতি চাপেতে কষ্ট বোধ হয়। আদি মানবের মত বৃত্তি লাভে প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে কষ্ট বোধ ও উষ্ণ বোধ কম। উত্তপ্ত আফ্রিকা দেশে যে মানুষের জন্ম তা উহা প্রমাণ করে। এজন্য আদি-স্বভাবে প্রাপ্ত পুরানো পাপীদের কষ্ট ও উষ্ণ বোধ কম।

[পৃথিবী প্রথমে অতি মাত্রায় উত্তপ্ত ছিল। পরে উহা ধীরে ধীরে শীতল হয়। কিছু মানুষ আফ্রিকাতে থেকে যায়। কিছু মানুষ শীত প্রধান দেশে সরে আসে। অবশ্য—এই উভয় গোষ্ঠির মধ্যে সংমিশ্রণ হওয়া সম্ভব। শীত হতে আত্ম-রক্ষার্থে মানুষ কর্ম্ম-তৎপর হয়। তজ্জন্য উষ্ণ প্রধান আফ্রিকাতে মানুষের উদ্ভব হলেও শীত প্রধান ও নাতি উষ্ণ দেশে ওদের সভ্যতার সূচনা হয়।

বলা বাহুল্য যে সূর্য্য তাপ ক্রমেই কমে আসছে। সিপাহী মিউটিনির সময়ের তুলনায় এক্ষণে সূর্য কম তাপ দিচ্ছে। ইহা বর্ত্তমান আফ্রিকা মহাদেশ সম্পর্কেও প্রযোজ্য। উহা বেশী উষ্ণ হতে এখন কম উষ্ণ হয়েছে। গ্লেশিয়াল

পিরিয়েডে তথা বরফ যুগে মানুষ উষ্ণ দেশে গিয়েছে। উহার অবসান হলে তারা শীত প্রধান দেশে ফিরেছে। কিছুক্ষেত্রে মানুষের সহনশীলতাও বংশগত হয়ে থাকে। এই সম্পর্কিত গবেষণায় এই তথ্যগুলি বিবেচনা করতে হবে।

প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে কষ্টবোধ নগণ্য থাকায় বহুকাল পূর্ব্বে সাংঘাতিক রোগাক্রান্ত হলেও তা তারা জানতে পারে না। কষ্ট-বোধ স্বাভাবিক মানুষের মধ্যে সাবধানতা তথা ওয়ার্নিং এর কার্য্য করে। কষ্ট হয় বলে মানুষ বুঝে যে তারা ব্যাধিতে আক্রান্ত এবং তজ্জন্য তাদের ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। সুস্থ-মন্য পুরানো পাপীরা এ-জন্য হঠাৎ একদিন মৃত্যুর কবলে ঢলে পড়ে। কষ্ট-বোধ হীনতার জন্য এরা প্রহারাদি দৈহিক পীড়নে সুখ অনুভব করে। সাংঘাতিক আহত হওয়া সত্বেও তারা দৌড়ে বহু মাইল অতিক্রম করে। এই সকল বিষয়ে তারা জীবজন্তু ও আদি-মানবদের সহিত তুলনীয়। অনুরূপ ভাবে—প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে উষ্ণতা-বোধও অত্যন্ত কম। এদের চোখ বেঁধে আঙ্গুল দগ্ধ করলেও ত্বক তথা টিসু না পুড়া পর্য্যন্ত তা তারা বুঝতে পারে না। দেশলাই কাঠি ও কলকের ছ্যাকা দিলে তারা উহা সহ্য করেছে। আফ্রিকাতে প্রথম জাত হওয়ায় আদি-মানুষদের উষ্ণতাবোধ অভ্যাস দ্বারা সহনীয় হয়ে ছিল। আদি স্বভাবপ্রাপ্ত হওয়ায় প্রকৃত অপরাধীদের ঐরূপ হয়ে থাকে মনে হয়। কষ্টবোধ ও উষ্ণবোধ বৃত্তি দ্বয়ের উল্টো বৃত্তি স্পর্শ বোধ এবং শৈত্য বোধ এদের অত্যন্ত বেশী। উগ্র স্পর্শ-বোধ পিকপকেটাদি পুরানো পাপীদের অপকর্ম্মে অন্যতম সহায়ক। [ব্যবহারিক অপরাধতত্ত্ব দ্রঃ] শৈত্য বোধ বেশী থাকাতে অত্যুগ্র শীত [বরফ জল আদি] এদের অত্যন্ত অপছন্দ।
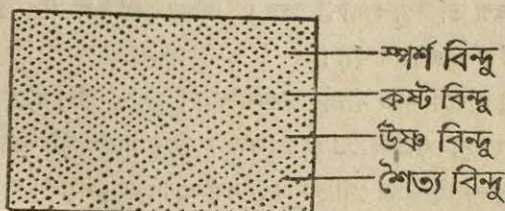
মানুষের দেহ ত্বকের যে কোনও অংশে এক স্কোয়ার পরিমিত স্থানে বিভিন্ন প্রকার যান্ত্রিক পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, ওদের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সংখ্যায় কম বেশী কষ্ট-কেন্দ্র তথা পেইন স্পট্, উষ্ণ কেন্দ্র তথা হিট স্পট্, শৈত্য কেন্দ্র তথা কোল্ড স্পট্ এবং স্পর্শ কেন্দ্র তথা টাচ্ স্পট্ আছে। আমাদের

দেহে' স্পর্শ, কষ্ট, শৈত্য ও উষ্ণ কেন্দ্র আছে বলেই আমরা স্পর্শ, কষ্ট, শীত ও উত্তাপ বোধ করি। ঐ সকল স্নায়বিক কেন্দ্রগুলি বাহিরের ষ্টিমিউলাস দ্বারা উদ্বেলিত হলে ঐরূপ বোধ হয়ে থাকে।

এই সকল স্নায়বিক কেন্দ্রগুলির সংখ্যা দেহের সকল স্থানে সমান হারে থাকে নি। নারী জাতীর বক্ষে স্পর্শ-কেন্দ্র বেশী ও কষ্ট-কেন্দ্র কম। উহাতে স্পর্শ জনিত ওদের অধিক আনন্দ হয়েছে। ঐ স্থানে নিপীড়ন বা দংশন করলে কষ্ট-কেন্দ্র কম থাকায় ওদের বেশী কষ্ট হয় না।

মিষ্টতা চিনিতে থাকে না। উহা মানুষের জিহ্বাতে থাকে। শর্করা কণা জিহ্বার মিষ্টি কোষগুলিকে উদ্বেলিত করে বলে মানুষ মিষ্টি স্বাদ পায়। সাকারীণ কণাও ঐ একই রূপ কার্য্য কিয়ৎ পরিমাণে করে থাকে। অম্ল, তিক্ত, লবণ, ঝাল প্রভৃতি বোধের জন্যও ঐরূপ পৃথক কেন্দ্র সমূহ আছে। উৎকট অপরাধীদের স্নায়বিক পরিবর্তন হেতু ওইগুলি দুর্ব্বল থাকে বলে ওরা ঐ স্বাদ গুলির প্রভেদ সব সময় বুঝে না। ওদের কে কতটা উৎকট হয়েছে তা এই সব পরীক্ষা হতে বুঝা গিয়েছে। ওদের ঝাল ও তিক্ত বোধ-কম এবং মিষ্টি ও অম্ল বোধ-বেশী।]

উপরোক্ত বিষয়গুলিকে উৎকট অপরাধীদের দৈহিক অসাড়তা তথা ফিসিক্যাল ইনসেনসেবিলিটি বলা হয়। ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হেতু ওদের মধ্যে দৈহিক অসাড়তার সহিত নৈতিক অসাড়তাও আসে। তজ্জন্য উৎকট অপরাধীরা অনুতাপ ও লজ্জা-সরমহীন এবং নিষ্ঠুরা ও মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে। এই নৈতিক অসাড়তা সম্বন্ধে এই প্রবন্ধের শেষাংশে বিশদ ব্যাখ্যা করা হবে। উপরন্তু বিবিধ প্রকার অতীন্দ্রিয়তা তথা হাইপার সেনসেবিলিটিও তারা প্রাপ্ত হয়। জন্তু জানোয়ারদের মত এরা আবহাওয়ার পূর্ব্বাভাষ অবগত হতে সক্ষম। বৃষ্টিতে চৌর্য্য কার্য্যের সুবিধা হয়। এরা উহা বহু পূর্ব্বে বুঝে প্রস্তুত হয়। এদের অতীন্দ্রিয়তা সম্বন্ধে ব্যবহারিক অপরাধতত্ত্বে বিশদ ব্যাখ্যা করেছি।

[মহাপুরুষরা মানসিক তথা মেণ্টাল এবং উৎকট অপরাধীরা দৈহিক তথা ফিসিক্যাল অতীন্দ্রিয়তা তথা হাইপার সেনসেবিলিটি লাভ করে। উভয়ের সূক্ষ্ম বৃত্তি এবং স্থূল বৃত্তি যথাক্রমে অতি ব্যবহার বা অব্যবহার জন্য হয়ে থাকে।]

দেহস্থিত চক্ষু এবং কর্ণ দ্বারা দেখা ও শোনার জন্য মস্তিষ্কে অনুক্রমিক বোধ কেন্দ্র আছে। চক্ষু এবং কর্ণ নষ্ট হলে আমরা দেখতে, কিংবা শুনতে পাই না।

অন্য দিকে—মস্তিষ্কের তৎ তৎ সম্পর্কিত স্থান বা এরিয়া তথা বোধ কেন্দ্র গুলি বিনষ্ট বা নিষ্ক্রিয় হলেও দেখা বা শোনা যায় না।

উপরোক্ত রূপে মানুষের ত্বকস্থিত স্পর্শ, উষ্ণ কষ্ট ও শৈত্য কেন্দ্রগুলির জন্য মস্তিষ্কে তৎ তৎ সম্পর্কিত অনুক্রমিক বোধ-কেন্দ্র আছে। এই বোধ কেন্দ্র গুলি বিনষ্ট বা নিষ্ক্রিয় হলেও উপরোক্ত রূপে ত্বকস্থিত কেন্দ্র গুলিও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

উৎকট অপরাধীদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ঘটলে পূর্ব্ব বর্ণিত কারণ সমূহের জন্য মস্তিষ্কের উক্ত বোধ-কেন্দ্রগুলির একটি বা অন্যটি সাময়িকভাবে দুর্ব্বল বা সবল এবং নিষ্ক্রিয় বা সক্রিয় [কম বেশী] হয়। ফলে দেহত্বকের তৎ তৎ সম্পর্কিত অনুক্রমিক স্নায়ু কেন্দ্রগুলিও এফেকটড্ তথা প্রভাবিত হয়। দেহ মনকে এবং মন দেহকে প্রভাবিত করে বলে উহাদের ত্বকস্থিত স্নায়ু-কেন্দ্র বা মস্তিকস্থ বোধকেন্দ্র যে কোনওটিকে বিবিধ মানসিক ও দৈহিক প্রক্রিয়াতে চিকিৎসা করে উহাদের পুনরায় স্বাভাবিক করা সম্ভব। এই সম্বন্ধে অপরাধ-চিকিৎসা শীর্ষক নিবন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা করা হবে।

এইবার উৎকট অপরাধীদের উপরোক্ত দৈহিক এবং নৈতিক অসাড়তা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করবো। প্রবন্ধের পূর্ব্বাংশে ওদের মধ্যে অলসতা, ভাবপ্রবণতা, দাম্ভিকতা এবং নিষ্ঠুরতার মনের পথে উঠা নামা সম্বন্ধে বলেছি। এইবার উহাদের প্রত্যেকটির মূল হেতু সম্বন্ধে পৃথক পৃথক্ আলোচনা করবো।

(ক)—অলসতা

স্ত্রী-বীজ স্থির তথা অলস হয় এবং পুং বীজ ক্ষিপ্র তথা তৎপর থাকে। এই স্ত্রী-বীজ তথা ওভা এবং স্পার্ম তথা পুং বীজের সংমিশ্রণে মানব দেহ সৃষ্ট। তজ্জন্য স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে অলসতা ও তৎপরতা একত্রে বিভিন্ন হারে আছে। স্ত্রী-বীজ জীবদেহে কিংবা উহার বাহিরে (f) স্থির থাকে। পুংবীজ ছুটে উহার সহিত মিলিত হয়।] এইভাবে পৃথিবীতে অলসতা ও তৎপরতার সৃষ্টি হয়। অলসতা তথা লেজিনেস এবং তৎপরতা তথা এ্যাকটিভিটির এবংবিধ ব্যাখ্যা পৃথিবীতে আমিই এই থিসিসে প্রথম দিলাম।

[অতিরিক্ত কোনও কিছু মানুষের দেহে বা মনে এলে উহা অসুবিধার সৃষ্টি করে। অলসতা অত্যধিক হলে উৎকট অপরাধীদের মধ্যে জড়তা এনেছে। সেই ক্ষেত্রে ওরা জড় অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে চলৎশক্তিহীন ভাবে স্থির থেকেছে।

(f) বহু ব্যক্তির মতে মহাপুরুষরা দেহে অলস হলেও তাঁদের মন সব সময় সক্রিয়।

ওদের মধ্যে জাত অত্যধিক অপস্পৃহার প্রবাহ স্নায়ুগুলিকে আড়ষ্ট করাতে ইহা হয়।

[মৎস্যাদি জীব কিন্তু জলে পৃথক পৃথক পুং ও স্ত্রী বীজ ত্যাগ করে। উহাদের পুংবীজ ছুটে স্থির স্ত্রী বীজের সহিত জলে মিলিত হয়।]

অন্যদিকে—অত্যধিক সৎ প্রেরণার অনুশীলন তদ্‌সম্পর্কিত উগ্র প্রবাহ দ্বারা মহাপুরুষদের মধ্যে সেই ক্ষেত্রে ট্রান্স তথা সমাধি অবস্থা এনেছে। সেই সময় মহাপুরুষরা চলৎশক্তি হীন ও আড়ষ্ট হয়ে স্থির ভাবে থেকেছেন। প্রভেদ এই যে মহাপুরুষদের মধ্যে উক্ত 'ট্রান্স' তথা সমাধি ভাব দণ্ডায়মান ও উপবিষ্ট অবস্থায় হয়ে থাকে। কিন্তু উৎকট অপরাধীদের মধ্যে পরিদৃষ্ট 'জড়' ভাব এলে ওরা উপুড় হবে বা চিৎ-হয়ে শুয়ে থাকে। বলা বাহুল্য যে ওরা উভয়েই মনো জগতের অস্বাভাবিক অবস্থার সন্ততি। উৎকট অপরাধীদের মধ্যে আগত জড়তা সম্বন্ধে এই প্রবন্ধের শেষাংশে ব্যাখ্যা করবো। ইহা উভয়ের মধ্যে স্নায়বিক অস্বাভাবিকতার জন্য হয়ে থাকে।

মহাপুরুষরা পৃথিবীর উপকার কিংবা অপকার কোনও কিছু করেন না। তাঁরা নিজেদের ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য ব্যস্ত থাকেন। পৃথিবীর উপকার করলেও তাঁরা হয় তো নীরবে উহা করেছেন। কিন্তু অপরাধীরা প্রত্যক্ষভাবে পৃথিবীর অপকার করে। তাই এই পুস্তকে ওদের সম্বন্ধেই আলোচনা করেছি। এই 'ট্রান্স এবং জড়' ভাবকে কেহ কেহ হিষ্ট্রিয়া রোগের সহিত তুলনা করেন।

তৎপরতা তথা এ্যাক্‌টিভিটি উভয়কে ট্রান্স বা জড় অবস্থা থেকে মুক্ত করে কর্ম্মক্ষম করে। পৃথিবীতে আগত অবতারদের মধ্যে কর্ম্ম-তৎপরতা অতি মাত্রায় থেকেছে। এযুগেও বহু সাধকের মধ্যে সঙ্গটন-শক্তি থাকাতেই তাদের একাধারে প্রশাসক সঙ্গটক ও সাধক রূপে দেখা যায়। এঁরা সাধারণতঃ অলস জীবন যাপন করেন না।

বহু অবতার-মন্য অলস (f) মহাপুরুষের কোনও কোনও শিষ্য দক্ষ সঙ্গটক রূপে কর্ম্ম-তৎপর হওয়াতে তাঁদের গুরুদেবদের নাম ও ধর্ম্ম পৃথিবীতে দ্রুত প্রচারিত হয়েছে। বহু ক্ষেত্রে এঁরাই স্ব স্ব গুরুদেবের মুখস্থত বাণীগুলিকে অর্থ-বোধাত্মক ও সুলিখিত করে ধর্ম্ম রূপে তাঁদের গুরুদেবদের নামে প্রচার করে ছিলেন।]

অলসতা সম্বন্ধে আলোচনায় উহার উল্টা বৃত্তি তৎপরতার প্রশ্ন স্বভাবতঃই উঠবে। এই অলসতার সহিত তৎপরতার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে রয়েছে। অলসতা

কমলে তৎপরতা বাড়বে এবং তৎপরতা কমলে অলসতা বাড়বে। তজ্জন্য—এই অলসতা ও তৎপরতা বৃত্তিদ্বয় একই সঙ্গে বিবেচ্য। উপরন্তু অলসতার সহিত অপরাধ স্পৃহার এবং তৎপরতার সহিত সৎ প্রেরণার সম্পর্ক রয়েছে।

[অত্যধিক সৎপ্রেরণা মানুষকে বেশী ক্ষণ কার্যকরী রাখে। কিন্তু অপরাধ স্পৃহা মানুষকে বেশীক্ষণ কার্য করতে অপারগ করে। এ সম্বন্ধে পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে প্রমাণ সহ আলোচিত হয়েছে। পূর্ব্ব পৃ দ্রঃ। স্বাধীনতাপ্রয়াসী দেশপ্রেমিকরা বৎসরের পর বৎসর অনাহারে জঙ্গলবাসী হয়ে লড়তে পারে। কিন্তু এতো পরিশ্রম অনাবিল ভাবে অপরাধীরা তাদের অপকর্ম্মার্থে করতে অক্ষম হয়েছে।]

বিঃ দ্রঃ—এদেশে কিছু রাজনৈতিক মুভমেণ্ট তথা আন্দোলন আদর্শ-বিহীনভাবে কিংবা ভুল আদর্শে স্থূলবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। মানুষের মধ্যে স্থূলবৃত্তি অধিক এলে অলসতা বাড়ে এবং তৎপরতা কমে। এরূপ ব্যক্তিদের দ্বারা রাজনৈতিক আন্দোলন তিন দিনের বেশী স্থায়ী হয় না। এই বিপথগামী ব্যক্তিদের স্বভাব কম বেশী এক শ্রেণীর অপরাধীদের মত হয়েছে। এরা তাদের ক্ষণস্থায়ী তৎপরতার দ্বারা ভীম বেগে ট্রাম ও বাস পুড়িয়ে জনগণের ক্ষতি করে। কিন্তু তুবড়ীর ফোয়ারার মত স্বল্পক্ষণেই তাদের যা কিছু এনার্জ্জি তা নিঃশেষিত হয়ে যায়। এদের দ্বারা ভিয়েতনামীদের মত বিদ্রোহ কোনও দিনই সম্ভব হবে না। এদের ক্ষুধা পেলে বা বেশী হাঁটলে এরা কাতর হয়ে পড়ে। ক্রিমিন্যালদের মত সুপিরিয়ার ফোর্সের সুমুখে এরা নীরব হয়। এদের মধ্যে কোনও দলগত মর‍্যাল তথা যৌথ আনুগত্য থাকে না। নারীদের মত এরা কি চায় তা তারা নিজেরাই জানে না। তাই এদেরকে ঘন ঘন দল পরিবর্ত্তন করতে দেখা যায়। কারোর কারোর মধ্যে উহা ব্যবসা বা জীবিকা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য এই যে স্থূলবৃত্তি-প্রসূত বিপ্লবের প্রতিবিপ্লব হলেও সূক্ষ্ম বৃত্তি-জাত বিপ্লবের প্রতিবিপ্লব কদাচিৎ হয়ে থাকে।

[আদর্শযুক্ত ও সূক্ষ্মবৃত্তি পরিচালিত রাজনৈতিক আন্দোলনের মহাশক্তি আমরা গান্ধীজির বিগত অহিংস-আন্দোলনে দেখেছি। সৎপ্রেরণা জাত স্বার্থ এবং হিংসা বর্জ্জিত ঐ আন্দোলনে তরুণরা অনাহারে ও অনিদ্রায় বৎসরের পর বৎসর অসহনীয় উৎপীড়ন সহ্য করেও কর্ম্মতৎপর থেকেছিল। রাজশক্তির প্রচণ্ড আঘাতেও তাদেরকে ঐ বিষয়ে নিরস্ত করা সম্ভব হয় নি।

[শ্রমিকরা বেশীক্ষণ পরিশ্রম করলে তাদের দেহে ল্যাকটীক এ্যাসিড্ জাত হয়ে তাদের মধ্যে ক্লান্তি-বোধ তথা ফেটীগ আনে। এতে তাদের পেশীসমূহ দ্রুত

নিস্তেজ হয়ে পড়ে। তজ্জন্য তাদের কর্ম্মকালের মধ্যে রেষ্ট পজ্ বিশ্রাম-ক্ষণ দেওয়া হয়। ভারী কার্যে বেশীক্ষণ এবং হাল্কা কার্যে স্বল্পক্ষণ রেষ্টপজ্ তথা বিশ্রামক্ষণ দেওয়ার রীতি। অন্যথায় উৎকৃষ্ট দ্রব্যোৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটতে এবং বাতিল দ্রব্যের সংখ্যা বেড়ে যাবে। এই ল্যাকটিক এ্যাসিড্ ওদের মধ্যে অলসতা আনে। এই ল্যাকটিক নিউট্রিলাইজ করার ক্ষমতা সকলের মধ্যে সমান নেই।]

প্রতীত হয় যে সৎপ্রেরণার হাল্কা প্রবাহ [ইমপালস] এবং অপরাধ-স্পৃহার ভারী প্রবাহ যথাক্রমে কম বা বেশী ল্যাকটিক এ্যাসিড্ ক্ষরণ করে। প্রাথমিক অপরাধীদের ক্ষেত্রে পরিশ্রমে ঐ এ্যাসিড শ্রমিকদের অপেক্ষা কিছু বেশী ক্ষরিত হয়। কিন্তু প্রকৃত অপরাধীদের [শেষ পর্যায়ে] ঐ ল্যাকটিক এ্যাসিড্ ক্ষরণ সামান্য পরিশ্রমে অত্যন্ত বেশী হয়ে থাকে। ওতে তাদেরকে প্রথমে অলস ও পরে জড় করে দেয়। প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে উহা স্বয়ংক্রিয় ভাবে নির্গত হয়েছে। প্রকৃত [শেষ পর্যায়] অপরাধীদের এই অবস্থা স্নায়বিক ক্ষয় ক্ষতি জনিত পরিবর্ত্তনের জন্য হয় কিনা তাহা বিবেচ্য। উপরোক্ত কারণ সমূহের যে কোনও একটির জন্য উহা হোক না কেন? উহা যে শেষ পর্যায়ের অপরাধীদের মধ্যে হয়ে থাকে তা আমরা স্ব-চক্ষে দেখেছি।

অলসতার এবং তৎপরতার সহিত প্রতিক্রিয়া-কাল তথা রি-এ্যাক্সন টাইমও বিবেচ্য। প্রতিক্রিয়া-কাল দুই প্রকারের হয়ে থাকে, যথা মানসিক ও দৈহিক। মানসিক প্রতিক্রিয়া-কাল দ্রুত নির্ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার সহায়ক। দৈহিক প্রতিক্রিয়া কাল আমাদের দেহগত আত্মরক্ষার্থে সাহায্য করে থাকে। প্রয়োজনীয় প্রতিক্রিয়া-কাল না থাকলে কিছু শ্রমিক দুর্ঘটনা-প্রবণতা তথা এ্যাক্সিডেন্ট প্রোননেস্ রোগে ভুগে।* এরা যন্ত্র এগিয়ে এলে দ্রুত অঙ্গাদি সরাতে অক্ষম। তজ্জন্য তারা বারে বারে দুর্ঘটনায় পড়েছে। এই প্রতিক্রিয়া-কাল সম্বন্ধে 'অপরাধ-চিকিৎসা' এবং ব্যবহারিক অপরাধ নিবন্ধে বিশদ আলোচনা করেছি। অলসতা এবং তৎপরতা ওদের প্রতিক্রিয়া-কাল যথাক্রমে কমায় কিংবা বাড়ায়।

ব্যক্তিত্বের পরিবর্ত্তন হেতু এই প্রতিক্রিয়াকাল শেষ পর্যায়ের প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে অতি উগ্র হয়ে দেখা যায়। তজ্জন্য উৎকট্ পিকপকেট অপ-

---

* প্রোননেস্ টু এক্সিডেন্ট তথা দুর্ঘটনা প্রবণতার কারণ এতকাল অজ্ঞাত ছিল। আমি উহার কারণ এই থিসিসে সর্ব্বপ্রথম বিবৃত করেছি।

রাধীরা বিদ্যুৎ গতিতে অপকর্ম্ম করতে সক্ষম। [ব্যবহারিক অপরাধ পরিচ্ছেদ দ্রঃ] সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী অতি তৎপরতা হতে উহা জাত হয়ে থাকে। উহা ক্ষণস্থায়ী হওয়ায় সুদক্ষ পিকপকেট'রা একই দিনে একাধিক বার পকেট-মারির কার্য করে না।

বিঃ দ্রঃ—এতাবৎ আমি দেহের সহিত মনের নিবিড় সংযোগের বিষয় বলেছি। এই মতবাদ নিশ্চয়ই বহুলাংশে সত্য হয়ে থাকে। কিন্তু উহার সহিত অন্য একটি বিষয়ও বিবেচ্য। জীবদিগের দেহগত ক্রমবিকাশ সভ্য-মানুষে এসে তুষ্ণিম্ভাব তথা স্তব্ধ হয়েছে। ইংরাজীতে ইহাকে প্যানামেক্সিয়া অবস্থা বলা হয়ে থাকে। ঈজিপ্টে প্রাপ্ত মানুষের মমির সহিত বর্ত্তমান মানুষের দেহগত কোনও প্রভেদ নেই। কিন্তু—সকল ক্ষেত্রে মন সম্বন্ধে এই সত্যটি প্রযোজ্য হয় না। বৃদ্ধের দেহ নিশ্চই পুনরায় বালকের মত হবে না। কিন্তু তার মন বালকের মত হতে পারে। মন এগুনোর মত পিছুতেও সক্ষম। মানুষের মন পুনরায় আদি-মানুষের মত হলে উহাকে রেট্রোগেটিভ তথা অবরোহী [আরোহী'র উল্টো] তথা পশ্চাদগামী ক্রমববিকাশ বা ইভোলিউশন বলা হয়। ঐ ভাবে স্থলচর তিমি জীব জলচর হয়ে মৎস্যাকার প্রাপ্ত হয়েছিল। ইহা অবশ্য দৈহিক অবরোহী ক্রম-বিকাশের একটি দৃষ্টান্ত। এখানে বক্তব্য বিষয় এই যে দেহের ক্রমবিকাশ স্তব্ধ হলেও মনের আরোহী তথা অগ্রগামী ক্রমবিকাশ এখনও তৎপর। অর্থাৎ—দেহের পরিবর্ত্তন স্তব্ধ হলেও মন এগিয়ে চলেছে। তজ্জন্য—দেহের সহিত কিছু বিষয়ে মনের সম্পর্ক-হীন থাকা সম্ভব। এইজন্য আমি এই পুস্তকে কেবলমাত্র মনকেই চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছি। এইরূপ বিশ্লেষণ এবং উপরোক্ত রূপে মনের আগু পিছু হওয়ার বিষয় এবং তদজনিত ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন সম্বন্ধে আমার ব্যাখ্যা পৃথিবীতে সম্পূর্ণ নূতন আবিষ্কার। বলা বাহুল্য যে, যে রীতিতে ও কারণে দেহের অগ্রগামী ও পশ্চাদগামী বিবর্ত্তন পূর্ব-কালে হয়েছে সে একই পরিবেশ সম্ভূত এবং অন্যান্য কারণে মনেরও অগ্রগামী ও পশ্চাদগামী বিবর্তন হওয়া এ'যুগেও সম্ভব।

কিছু ক্ষেত্রে মন দেহ থেকে নিশ্চয়ই এগিয়ে থেকেছে। আদি-মানুষের মস্তিষ্ক সুগঠিত হবার পূর্ব্বেই তারা আগুনের ব্যবহার শিখেছে। এমন কি সন্তানদের তারা সযত্নে কবর পর্য্যন্ত দিয়েছে। নিউনেনডেপ্রেল মানুষের দৈহিক গঠন সম্পূর্ণ হলেও তারা তাদের মনের গঠন সম্পূর্ণ করতে পারে নি। অথচ পশুর মত সহনক্ষম পূর্ব্ব জীবনেও তারা ফিরে যেতে পারে নি। দেহের অনু পাতে

মানসিক উন্নতি না হওয়াতে তারা জীবন যুদ্ধে হেরে গিয়েছিল। তজ্জন্য আজ তারা পৃথিবী থেকে দ্রুত গতিতে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

সম্ভবতঃ অধুনা-লুপ্ত নিউনেনডেথেল মানুষের মধ্যে অলসতা অধিক ও দীর্ঘ-স্থায়ী ছিল। অন্য প্রজাতির [হোমিনিডাস] মানুষদের মত তারা অলসতাকে কমিয়ে ক্ষণস্থায়ী করতে এবং তৎপরতাকে বাড়িয়ে দীর্ঘস্থায়ী করতে অক্ষম হয়েছিল। মনের দিক হতে বেশী উন্নত হলে এরা বায়বিক পরিবর্তন এবং সম্ভাব্য বহিরাক্রমণ হতে আত্মরক্ষা করতে পারতো। মনের দিক হতে পূর্ব্বাবস্থাতে প্রত্যাবর্ত্তন তথা রেট্রোগ্রেটীভ ইভোলিউসনও ওদের ধ্বংশের কারণ হতে পারে।

[যে কারণে উৎকট অপরাধী বা স্বভাব অপরাধীদের বহু ব্যক্তি বংশ রক্ষা করতে অপারগ, হয়তো সেই একই কারণে এরাও বংশ রক্ষা করতে পারে নি। অপরাধ স্পৃহার কারণে পরস্পরের মধ্যে নিয়ত হানাহানি হলে অন্যদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করা যায় না। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে দৈহিক বিবর্ত্তনের প্রমাণ পাওয়া গেলেও মানসিক বিবর্ত্তনের প্রমাণ পাওয়া দুষ্কর। এজন্য ভূমির নিম্ন স্তরে ওদের উন্নত মানের অস্ত্র পাওয়া গেলেও উহার উপরি স্তরে ওদের নিকৃষ্ট মানের প্রস্তরাস্ত্র পাওয়া গিয়েছে! প্রতিটি ক্ষেত্রে নৈসর্গিক কারণে ভূমির উলট পালট তথ্যাদির দ্বারা প্রমাণিত হয় নি। পূর্ব্বে প্রাপ্ত উন্নত দেহের সহিত পরবর্তী কালের আনত মনের অসঙ্গতিও ওদের বিলুপ্তির কারণ হতে পারে।]

উপরোক্ত বিতর্কিত বিষয় মুলতুবী রেখে অপরাধীদের মধ্যে পরিদৃষ্ট অলসতা ও তৎপরতা সম্বন্ধে এইবার আরও বিশদরূপে ব্যাখ্যা করা যাক।

বিঃ দ্রঃ—মানুষ মাত্রের মধ্যে এই অলসতা ও তৎপরতা আছে। কিন্তু ঐ দুইটি বৃত্তি নিরপরাধী মানুষদের আয়ত্তাধীন থাকে। স্থুল-বৃত্তির অতি ব্যবহার অপরাধীদের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করে। ফলে, ওদের অত্যধিক অলসতা মধ্যে মধ্যে জড়তার সৃষ্টি করে।

আদি-মানুষ এবং প্রাণীদের মধ্যেও এইরূপ মানসিক অবস্থা পরিলক্ষিত হয়েছে। ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ সিংহের বিষয় বলা যেতে পারে। এই সিংহ সাধারণতঃ অলস জীবন যাপন করে। কিন্তু প্রয়োজন হলে ওরা ঘণ্টায় বিশ মাইলের অধিক পথ অতিক্রম করে। এই সময় ওরা কয়েক টন ওজনের মহিষকে স্কন্ধে করে বহুদূর পর্য্যন্ত বহন করেছে। উৎকট শোণিতাত্বক এবং সাম্পত্তিক অপরাধীদের স্বভাব এই সিংহাদির মত হয়ে থাকে। জীব জগতের বহু স্বভাব উত্তরাধিকারী সূত্রে মানুষ প্রাপ্ত হয়েছে।

অপরাধ স্পৃহার আগমন অপরাধীকে কর্ম্ম-তৎপর করে। অপরাধ স্পৃহার আগমন ও উহার অবস্থিতির মধ্যে প্রভেদ আছে। ওদের মধ্যে অপরাধ স্পৃহা অধিক পরিমাণে থাকলেও সব সময় উহা বহির্গত হয় নি। প্রয়োজন এবং উত্তেজনা সহজে উহাকে বহির্গত করেছে। কিছু ক্ষেত্রে তারা নেশা ভাঙ করে উত্তেজনা এনে অলসতা দূর করে। অলসতা বিদূরিত হওয়া মাত্র অপরাধ স্পৃহা তৎপরতাবাহি হয়।

[তজ্জন্য পাগলাদের চিকিৎসার মত স্বভাব অপরাধী আদি উগ্র প্রকৃতির অপরাধীদের ঘুমের ঔষধ দ্বারা অলস করে নিরাময় করা যায়। তবে সেই সুযোগে ওদের সূক্ষ্ম বৃত্তিকে প্রক্রিয়া দ্বারা উদ্বেলিত করতে হবে। সূক্ষ্ম বৃত্তি উদ্বেলিত হলে উহার উল্টো বৃত্তি স্থূল বৃত্তি আপনা হতেই দুর্ব্বল হবে।]

প্রাথমিক অপরাধীদের মধ্যে অলসতা কম থাকে। ওদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন না হওয়াতে ওরা কখনও জড় হয় নি। প্রাথমিক অপরাধীদের অলসতা তাদের আয়ত্তে থেকেছে। তবে—কখনও ওদের কারোর কারোর মধ্যে উহা বেশী পরিমাণে থাকে। এ অবস্থা চাকুরী করে দিলেও ওরা বেশী দিন চাকুরী করতে পারে নি। বহু ভৃত্য-চৌর চুরির কর্ম্ম পদ্ধতি রূপে কয়েকদিন মাত্র চাকুরী গ্রহণ করে।

শেষ পর্যায়ের তথা প্রকৃতরূপ অপরাধীদের অপকর্ম্মের জন্য অপস্পৃহার আগমনের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। এই অপস্পৃহা ওদের মধ্যে নারীর 'ওভার' মত ক্ষেপে ক্ষেপে জন্মায়। অত্যধিকরূপে জন্মালে উহা তাদের মনের পথে উপচে পড়ে। সেইক্ষেত্রে তারা কর্ম্মতৎপর হয়ে অপকর্ম্মে বহির্গত হয়। কিন্তু ঐ অপস্পৃহা কমলে তারা অলস এবং উহা নিঃশেষ হলে তারা জড় হয়। অপ-স্পৃহা পুনরায় জাত ও নির্গত না হলে তারা কর্ম্মতৎপর হয় না।

কর্ম্মালসতা ও কর্ম্ম তৎপরতা মানুষের উল্টা উল্টি বৃত্তি। ওদের ওই উপচে পড়া অপস্পৃহা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। এজন্য পুরানো পাপীদের দ্রুত কর্ম্ম শেষ করতে হয়। অপরাধ স্পৃহা অত্যধিক জন্মালে উহার বাড়তি অংশ ওদের মনের পথে উপচে পড়ে। কুচিন্তা বা লোভ ও প্রয়োজন এবং উত্তেজনা উহাকে তরান্বিত করে। ইহাকে অপরাধ স্পৃহার আগমন ও প্রত্যাগমন বলা হয়। উৎকট অপরাধীদের মধ্যে এই বাড়তি অপস্পৃহা বারে বারে সৃষ্ট হলে ওদের দুর্ব্বল প্রতিরোধ শক্তি আরও দুর্বল হয়। ঐ সম্পর্কিত সামান্য চিন্তাতেও ওদের কারোর কারোর মধ্যে অপরাধ স্পৃহা উগ্র হয়ে উঠেছে। উহার অত্যধিক

চাপ বা বিদ্যুৎ প্রবাহ স্বভাবতঃই মস্তিষ্কের ক্ষতি করে। তৎজন্য উৎকট অপরাধীদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন দেখা যায়।

[বিঃ দ্রঃ—মানুষের যৌন-সার তথা সিমেন ফোঁটা ফোঁটা করে তৎ সম্পর্কিত আধারে জমা হয়। উহা অত্যধিক হলে প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে বার হয়ে আসে। উহাকে স্বপ্ন দোষ আদি বলা হয়। এই বীজ সারের-মত অপরাধ স্পৃহা এবং সৎ প্রেরণাও বেশী পরিমাণে জাত হলে উহা মনের পথে উপচে পড়ে। সেই ক্ষেত্রে কু-কার্য্য বা সু-কার্য্য করার ইচ্ছা মনে আসে। কিছু ক্ষেত্রে মাত্রাহীন সৎপ্রেরণাও উপকার করার বাতিক সৃষ্টি করেছে। সেই ক্ষেত্রে অপরাধীদের অপকার করার মত এরা উপকার করার সুযোগ খোঁজে।]

অলসতা বা জড়তা অপরাধীদের একপ্রকার রোগ। উহা তাদের জীবন ধারণ পর্য্যন্ত অসম্ভব করে। অলস অবস্থায় তারা না খেয়ে বা মাত্র চা খেয়ে জীবন ধারণে সক্ষম। উহা দূর করতে তারা জুয়া বেশী মদ্যপান প্রভৃতি দ্বারা উত্তেজনা আনে। উৎকট অপরাধীদের মধ্যে জড়তা এবং প্রাথমিক অপরাধীদের মধ্যে অপরাধ-বিরাম বেশী। অপরাধ-বিরাম কিংবা জড় অবস্থায় অপরাধ-স্পৃহা অন্তর্হিত না হয়ে উহা মাত্র সাময়িক ভাবে কম বেশী প্রদমিত থেকেছে। অলসতার জন্যে অপরাধীরা পরগাছা বা পরভুক ভাবে জীবন যাপন করে। এদের অপরাধ বিরামের একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

'দুই ও তিন নং আসামীর প্ররোচনাতে ফরিয়াদীনী স্ত্রীলোকের সহিত আমি দেখা করি। তাঁকে আমি জানাই যে আমার পুত্র ও কন্যার জন্য একজন শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন। আমি মহিলাটিকে মাসিক ৫০ টাকা বেতনে আমার পুত্র কন্যার শিক্ষার ভার নিতে অনুরোধ করি। আমার প্রস্তাবে মহিলাটি সম্মতি জানান এবং পরদিন আমার সঙ্গে গৃহে আসতেও রাজী হন। পরদিন আমি ২নং এবং ৩নং আসামীর সমভিব্যাহারে তাঁকে ট্যাক্সিতে তুলে নি। আমাদেয় আশানুরূপ মহিলাটির গাত্রে অধিক অলঙ্কার ছিল না। মহিলাটির গাত্রে মাত্র একটি চেন হার ছিল। কিন্তু তা সত্বেও আমরা পূর্ব সংকল্প ত্যাগ করি নি। [অপরাধ স্পৃহা জাগ্রত হলে সহজে নিবৃত্ত হয় না।] ট্যাক্সিটি তিস্নজলার নির্জ্জন পুলের উপর উঠা মাত্র আমি মহিলাটির হাতটি চেপে ধরি এবং বন্ধুদ্বয় ছুরি ও পিস্তল হাতে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

কিন্তু ঠিক ঐ সময় আমার মনে ভাবান্তর ও অনুতাপ এলো। হঠাৎ আমি অন্য এক মানুষ হয়ে উঠলাম। আমি এক ধাক্কায় বন্ধুদ্বয়কে সরিয়ে

চেঁচিয়ে উঠলাম। আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো : 'ছিঃ ছিঃ। এ আমরা কি করছি। আমি আত্মার তৃপ্তির জন্য স্ব-ইচ্ছায় এই স্বীকৃতি করলাম।'

বহু অভ্যাস অপরাধী কিছুদিন যাবৎ অপরাধী এবং কিছুদিন যাবৎ নিরপরাধী থাকে। একই দিনের একাংশে নিরাপরাধী এবং উহার অপরাংশে অপরাধী থাকার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। জনৈক উকিল ছয় মাস প্রবঞ্চনা আদিতে লিপ্ত থাকতেন। কিন্তু বাকি ছয় মাস উনি সৎ ভাবে ওকালতি করেছেন। কয় মাস উন্মাদ এবং কয় মাস স্বাভাবিক থাকা মানুষও দেখা গিয়েছে। নিম্নে ওদের ঐরূপ ভাবান্তর এবং জড় হওয়ার দুইটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা হলো।

'কিছু দিন পূর্বে কোনও এক অপরাধী ছাদ ফুটা করে দড়ির সাহায্যে নীচে নেমে দ্রব্যাবি সংগ্রহ করে। কিন্তু হঠাৎ বেশী পরিশ্রমে তার মধ্যে অলসতা এসে যাওয়ায় সে আর উঠতে পারে নি। সকালে ঘরে ঢুকে গৃহস্বামী দেখে সে দড়ি ধরে মাথা নীচু করে মেঝের উপর বসে রয়েছে। "কোনও এক তালা-তোড় চোর সিঁদ কেটে ঘরে ঢুকে দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে। কিন্তু অতি পরিশ্রমে সে জড় হয়ে যায়। সকালে তাকে লেপ মুড়ী দিয়ে খাটের তলায় শুয়ে থাকতে দেখা যায়। খোঁচা খুঁচি করেও তাকে সেখান হতে উঠানো যায় নি।"

"সকাল উঠে দেখি গেষ্ট রুমের তালাটা খুলা। দুয়ারের তালাটাও উধাও হয়েছে। ভিতরে ঢুকে দেখি চোর মশাই মেঝেয় উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছে। লোক জন ডাকা ডাকি করার ও পুলিশ আনার পরও সে উঠলো না। আমরা তাকে খোঁচা দিলে সে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে। এর পর আমরা তাকে থানায় নিয়ে চলি।

পথের মধ্যে এক ভিখারীকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখে সে ভাবপ্রবণ হলো। আমরা লক্ষ্য করলাম যে তার চোখ দুটো ভিজে গিয়েছে। পথেই অপরাধ সম্বন্ধে সে একটি স্বীকারোক্তি করলো। আমরা বুঝলাম যে তার অলসতা এখন অপসারিত এবং সে এখন অত্যন্ত ভাবপ্রবণ। কিছুক্ষণ পূর্বেও সে অতি কষ্টে পথ চলছিল। এখন তাকে বেশ সবল ও চঞ্চল মনে হলো। থানায় এসে সে ভেউ ভেউ করে কাঁদলো। অর্থাৎ—তার ভাব-প্রবণতা চরম সীমায় এসেছে। কিছুক্ষণ পরেই তার ঐ ভাব-প্রবণ, অন্তর্হিত হয় এবং সে চোখা চোখা উত্তর দিতে থাকে। নির্বিকার চিত্তে সে তার পূর্ব

স্বীকৃতি অস্বীকার করে। সে আমাদের জানায় যে, সে মাত্র জল খেতে বাড়িতে ঢুকেছিল। তার আমরা কিছুই করতে পারবো না। এই সময় সে নানারূপ দম্ভোক্তি করতে থাকে। আমরা বুঝি অপরাধীর ভাবপ্রবণতা অন্তর্হিত। সে এখন রীতিমত দাম্ভিক। এরপর তাকে হাজতে দিলে কিছুক্ষণ বাদে সে চেঁচামেচি ও গালি গালাজ সুরু করে। সে হাজতের দরজা বারে বারে নাড়ে ও তাতে মাথা ঠুকতে থাকে। সে নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে থাকে। মাথা খুঁড়ে সে রক্তপাত করে। পুলিশে তাকে মেরেছে বলে মিথ্যা অভিযোগ করে। আমরা বুঝতে পারি যে এতক্ষণে সে নিষ্ঠুরতার রাজ্যে এসেছে। সম্ভবতঃ—উত্তেজনায় দাম্ভিকতা, অলসতা, ভাবপ্রবণতা ও নিষ্ঠুরতা তার মনের পথে দ্রুত উঠা নামা করছিল।”

[নিষ্ঠুর অবস্থায় বাইরে থাকলে অপরাধীরা অপরাধ করতো। শোনিতাত্বক অপরাধীরা ঐ অবস্থায় প্রহরীদের প্রহার পর্য্যন্ত করে থাকে। নিষ্ক্রিয় অপরাধীরা এ অবস্থায় রুদ্ধাক্রোশে ফুলতে থাকে। ওদের কেউ কেউ খাওয়া দাওয়া ত্যাগ করে। হাজত বাস কালে অলসতা এলে তাকে বার করা দুষ্কর হয়। তাকে উত্তেজিত না করা পর্য্যন্ত সে শুয়ে থাকে। ভাবরাজ্যে উপনীত হলে তারা অপরাধ স্বীকার করে ও দ্রব্যাদি উদ্ধারে সাহায্য করে। কিন্তু অপকর্ম্মের জন্য তাদেরকে কিছু মাত্র অনুতপ্ত দেখা যায় না।]

পরদিন পুনরায় ভাব রাজ্যে এলে ঐ অপরাধী সংশ্লিষ্ট অপরাধ সহ পূর্বেকার বহু অপরাধ স্বীকার করে। তদন্তকারী পুলিশ কর্ম্মীকে সে বহু বামাল গ্রাহকদের বাটিতে এনে বহু অপহৃত দ্রব্য উদ্ধারে সাহায্য করে। তাকে কৃত্রিম উপায়ে ঐ অভিজ্ঞ পুলিশ কর্ম্মীটি ভাবপ্রবণ করতে সমর্থ হয়েছিল। মাত্র একটি পোড়া বিড়ি বা মিষ্টি বাক্য ওদেরকে ভাবপ্রবণ করেছে।

বিঃ দ্রঃ—অলসতা সম্বন্ধে উল্লেখ্য এই যে, প্রতিরোধ-শক্তির সহিত ঐ অলসতার মূল হেতু [উপকরণ] ল্যাকটিক এ্যাসিডের সম্পর্ক থাকতে পারে। প্রতিরোধ-শক্তির অভাবে ল্যাকটিক এ্যাসিডের ক্ষরণ দ্রুত বেশী হয়েছে। ব্রেন-ওয়েভ সম্পর্কিত গবেষণা উন্নত হলে উহার প্রকৃত ব্যাখ্যা মিলবে। প্রতিরোধ-শক্তি না থাকা বা উহার কমা বাড়ার সঙ্গে ওদের উপরোক্ত বৃত্তি চতুষ্টয়ের উঠা নামার সম্পর্কও থাকতে পারে।

হিষ্টিরিয়া রোগীনীদের মধ্যে অলসতা, ভাবপ্রবণতা, দাম্ভিকতা ও নিষ্ঠুরতার উঠা নামা দেখা যায়। মস্তিষ্কের সাময়িক ক্ষয় ক্ষতির কারণে উহা হয়ে থাকে।

বহু দুরন্ত শিশুর মধ্যেও স্বল্প পরিমাণে উক্ত বৃত্তি চতুষ্টয়ের উঠা নামা আমরা লক্ষ্য করেছি।

[সাধকদের সূক্ষ্ম বৃত্তির অতি পরিচালনায় তাদের মধ্যে মানসিক ইম্‌পোটেন্সী তথা যৌন অক্ষমতা এবং দুর্বৃত্তদের স্থূল বৃত্তির অতি পরিচালনায় তাদের মধ্যে দৈহিক ইমপোটেন্সী তথা যৌন-অক্ষমতা দেখা যায়।]

(খ)—ভাবপ্রবণতা

শেষ পর্য্যায়ের প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে প্রায়ই স্থূলরূপে অহেতুক ভাবপ্রবণতা দেখা যায়। মানুষের প্রেমবৃত্তি [সুপার কোয়ালিটি] প্রসূত দয়া মায়া সুবিচারিতা প্রভৃতি অতি সূক্ষ্ম বৃত্তিগুলির সহিত উহার কোনও সম্বন্ধ নেই। অপরাধী বিশেষকে সময় সময় দান-ধ্যান করতে দেখি, কিন্তু উহা তারা মাত্র ভাবপ্রবণ অবস্থায় করে। ওদের ভাবপ্রবণতা হতে ওরা সরে আসা মাত্র তাদের অন্তর থেকে সকল দয়া মায়া ও প্রীতি অন্তর্হিত হয়। যে অপরাধী ভাবপ্রবণ অবস্থায় অত্যন্ত দয়ালু থাকে, নিষ্ঠুর অবস্থায় তার সেই দয়ার পাত্রের উপর সে অকথ্য ভাবে নৃশংস হয়ে উঠে।

সহজ মানুষ ও প্রাথমিক অপরাধীদের এবং উৎকট প্রকৃত অপরাধীদের ভাবপ্রবণতার মধ্যে প্রচুর প্রভেদ আছে। সহজ মানুষের ভাবপ্রবণতার মধ্যে অনুতাপ ও আদর্শ প্রভৃতি থাকে। কিন্তু প্রকৃত অপরাধীদের ভাবপ্রবণতার মধ্যে কোনও প্রকার আদর্শ বা অনুতাপ নেই। তদুপরি—সহজ মানুষরা সকল অবস্থায় ও সকল সময়ে দয়া মায়া দেখায়। কিন্তু প্রকৃত অপরাধীরা মাত্র তাদের 'ভাবপ্রবণ' অবস্থায় থাকাকালীন দয়ামায়া দেখিয়ে থাকে। এদের অলসতা, দাম্ভিকতা এবং নিষ্ঠুরতা অবস্থায় তারা কখনও কাউকে দয়া মায়া করে না।

একজন অপরাধীর অন্য অপরাধীর প্রতি অবৈধ যৌন প্রেমের মধ্যেও থাকে এই ভাবপ্রবণতা। এদের আমরা প্রায়ই ভাবপ্রবণতা সূচক উল্কি ধারণ করতে দেখেছি। যথা 'প্রাণের খেঁদা, 'ভালবাসা, 'ভুল না,' ইত্যাদি। অপরাধীরা মধ্যে মধ্যে গান ও কবিতা রচনা করে এবং কিছু চিত্রও তারা এঁকেছে। অপরাধ

সাহিত্য ও চিত্র এবং শিল্প ওদের অন্তর্নিহিত ভাব প্রবণতার জন্য সৃষ্ট হয়। নিম্নে প্রদত্ত উদাহরণগুলি অনুতাপ ও আদর্শবিহীন ভাবপ্রবণতার সাক্ষ্য দিবে।

[অভ্যাস-অপরাধী ও স্বভাব-অপরাধীদের অঙ্কিত চিত্র ও গীত আদি পৃথক হয়। স্বভাব-অপরাধীদের ঐ গুলির মধ্যে আদিম ভাব এবং অভ্যাস-অপরাধীদের ঐ গুলির মধ্যে আধুনিকতা থাকে। প্রাথমিক এবং প্রকৃত অপরাধীদের সৃষ্ট সাহিত্য ও চিত্রকলার মধ্যেও প্রচুর প্রভেদ থাকে। এ সম্বন্ধে অপরাধ সাহিত্য ও অপরাধ-দর্শন শীর্ষক পরিচ্ছেদে আলোচনা করবো।]

"কোন এক জার্মান অপরাধী অতীব নিষ্ঠুরতার সহিত তার প্রিয়তমাকে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডের পর হঠাৎ তার মনে হয় যে তার ঐ প্রিয়তমার পাখীটা প্রিয়তমার বাটিতে অনাহারে রয়েছে। তার এ'ও মনে হয় যে তাকে খেতে না দিলে সে মরে যাবে। অপরাধীটি তখন বিপদ বরণ করেও প্রিয়তমার কুঠিতে ফিরে এসে পাখীটিকে খাওয়াতে থাকে।'

"অপর এক অপরাধী কোনও এক নারীকে নৃশংশ ভাবে হত্যা করার পর লক্ষ্য করে যে নিহত নারীর দুগ্ধ পোষ্য শিশুটি ক্ষুধায় কাঁদতে আরম্ভ করেছে। অপরাধীটি ঐ অবস্থায় শিশুটিকে খাওয়ানোর জন্য ঘটনাস্থলে বিপদ বরণ করেও থেকে গিয়েছিল।'

বিখ্যাত অপরাধী ল্যাসানারী একটি নির্মম হত্যাকাণ্ড সাধিত করে সেইদিনই একটি বিড়াল শিশুর প্রাণ রক্ষা করায় জন্য তার নিজের জীবন তুচ্ছ করে ছিল। "কলকাতায় খাঁদা নামে খুনে গুণ্ডা খুনের পর পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তারের আশঙ্কা থাকা সত্বেও তার রক্ষিতাকে দেখতে বারে বারে তার গৃহে এসেছে।"

উপরোক্ত অদ্ভুত ব্যবহার প্রকৃত অপরাধীদের ভাবপ্রবণ অবস্থায় তাদের মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু হঠাৎ ভাবপ্রবণতা থেকে তারা অলসতা, দাম্ভিকতা বা নিষ্ঠুরতার রাজ্যে এলে তাদের কার্য্যকলাপ সম্পূর্ণ বিভিন্ন হয়।

নিরাপরাধী তথা সহজ মানুষদের মধ্যে ভাবপ্রবণতা আদর্শ যুক্ত সুসঙ্গত যুক্তিপূর্ণ ও বহুক্ষণ স্থায়ী হয়। কিন্তু প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে দৃষ্ট ভাব-প্রবণতায় কোনও রূপ আদর্শ বা অনুতাপ থাকে না। উহা তাদের মধ্যে একটা সাময়িক খেয়াল ও অহেতুক কৌতুকরূপে স্বল্পক্ষণের জন্য প্রকট হয়। নিরপরাধীদের মধ্যে দৃষ্ট ভাবপ্রবণতা কখনও কখনও প্রাথমিক অপরাধীদের মধ্যে দেখা যায় বটে। কিন্তু ঐ প্রকারের ভাবপ্রবণতা প্রকৃত বা উৎকট

অপরাধীদের মধ্যে কদাচ দেখা গিয়েছে। প্রকৃত অপরাধীদের ভাবপ্রবণতা দাম্ভিকতা নিষ্ঠুরতা এবং অলসতা পৃথক ও স্থূলরূপে প্রকাশ পেয়ে থাকে।

এই অপরাধীরা সাময়িক ভাবপ্রবণতাবশতঃ তাদের কুকার্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে। কিন্তু তাদের এইরূপ দুঃখ প্রকাশের মধ্যে তিলমাত্র অনুতাপ থাকে না। তাদের দান ধ্যান ও দয়া মায়ার মধ্যে কোনও আদর্শ থাকে না। এই সম্বন্ধে মৎপ্রণীত ও সম্পাদিত কলিকাতা পুলিশ [জার্ণাল VOL I PART 1] থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত করলাম।

"এইবার আমরা ঐ খুনে গুণ্ডার ব্যক্তিগত চরিত্র সম্বন্ধে কিছুটা অনুসন্ধান করি। অনুসন্ধানে জানা যায়, কোনও এক সময় সে জনৈক বিধবার, অবিবাহিত কন্যার বিবাহের জন্য পাঁচ শত টাকা দান করে। অন্য আর এক সময় সে কোনও এক স্ত্রীলোক'কে বাটি কিনবার জন্যে এক হাজার টাকা দিতে চায়। প্রতিদানে সে স্ত্রীলোকটিকে কেবল মাত্র তার হাতে উল্কী দ্বারা প্রাণের খোঁদা' এই বাক্য দুটি লিখে রাখতে বলে। ঐ ডাকাত গুণ্ডা কুড়িটি খুনের জন্য দায়ী ছিল। তার ঐ ব্যবহারাদির মধ্যে কেবল মাত্র ভাবপ্রবণতা ছিল।

অপরাধীদের আমরা প্রায়ই পশু পক্ষী পুষতে দেখি। বহু অপরাধী তাদের পোষা কুকুরকে প্রাণাপেক্ষাও ভালোবেসেছে। মানুষের পৃথিবীতে বাস করে তারা মানুষকে ভালো না বেসে জীবজন্তুকে ভালোবাসে। তাদের অন্তর্নিহিত স্থূল ও অহেতুক ভাবপ্রবণতার জন্যে এইরূপ হয়ে থাকে। -ইহা স্নায়বিক কারণে সাময়িকভাবে এদের মধ্যে এসে থকে।

কেউ কেউ মনে করেন যে, এদের নিঃসঙ্গ জীবনের জন্য এদের ব্যবহার এইরূপ হয়। অপরাধীদের এ সব আচরণ জেলে থাকাকালীন ঘটলে এরূপ বলা যায়। কিন্তু বহির্জীবনে তাদের সঙ্গীর অভাব না হলেও তারা মাত্র জীব-জন্তুদের ভালোবাসে। আমি মনে করি যে তারা কম বেশী আদিম মানুষের স্বভাব পাওয়ার জন্য ওদের ব্যবহারে এইরূপ তারতম্য ঘটে।

[বিঃ দ্রঃ—ডাকাতাদি প্রাথমিক অপরাধীদের মধ্যে উহা দ্বৈত ব্যক্তিদের তথা ডবল পারস্যনালাটির কারণে ঘটতে পারে। কোনও ডাকাত বাটীতে আদর্শ পিতা বা স্বামী কিংবা আদর্শ নাগরিক থাকে। ঐ অবস্থায় তারা দান ধ্যান করে এবং ঐ দান ধ্যানের মধ্যে আদর্শও দেখা যায়। তৎকালে তাদের পূর্ব দুষ্কার্য্যের জন্য অনুতাপও আসা সম্ভব। কিন্তু গৃহের বা স্বগ্রামের বাহিরে এসে সে'ই একই ব্যক্তি হয়ে উঠে অনুতাপ ও আদর্শবিহীন দুর্ধর্ষ ডাকাত।

অর্থাৎ গৃহে থাকাকালীন তারা 'অপরাধ-বিরাম' অবস্থায় সহজ মানুষরূপে থাকে। এদের কেউ কেউ একদিনের একাংশে থাকে অপরাধ-বিরাম অবস্থায় এবং সেই দিনেরই অপরাংশে এরা হয় দুর্দান্ত অপরাধী।]

অপরাধীদের নিরপরাধ থাকাকালীন ভাবপ্রবণতার সহিত তাদের অপরাধী থাকাকালীন ভাবপ্রবণতার কোনও সম্পর্ক নেই। উৎকট তথা প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে এই ভাবপ্রবণতা স্নায়বিক কারণে এসে থাকে। ওরা ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হেতু সর্বক্ষণ অনুতাপ ও লজ্জাসরম এবং আদর্শহীনভাবে অপরাধী জীবন যাপন করে।

(গ)—দাম্ভিকতা

দাম্ভিকতা তথা দম্ভোবৃত্তি প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে অত্যধিকরূপে দেখা যায়। এদের এই দাম্ভিকতা নানা রূপ দম্ভোক্তির মধ্যে প্রকাশ পায়। এই স্বভাবগত দাম্ভিকতার জন্য বহু অপরাধী তাদের অপকর্ম্মের পরিকল্পনা পূর্ব্বাহ্ণেই জানিয়ে দিয়ে কারাবরণ করে। কেউ কেউ অপকর্ম্মের পরে তার সেই অপকর্ম্মের কাহিনী বিশদভাবে তথা ফলাও করে বর্ণনা করে নিজেদের বিরুদ্ধে নিজেরাই সাক্ষ্য তৈরী করে থাকে। এই দাম্ভিকতার কারণে বহু অপরাধী তাদের অপকর্ম্মের কাহিনী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রোজ নামচা বা ডাইরী বুকে লিখে রাখে।

জন উইল্কীবুথ নামে বিখ্যাত খুনে অপরাধী তার ডায়েরী বুকে খুন সম্বন্ধে একটি বিবরণ লিখে রেখেছিল। পরে ঐ ডায়েরী পুলিশের হস্তগত হলে তারা তা খুনের প্রমাণস্বরূপ আদালতে দাখিল করে খুন প্রমাণিত করে। ডাইরী বইতে এইরূপ লেখা ছিল : 'আমি নির্ভীক চিত্তেই তাকে আঘাত করে ছিলাম। এ সম্বন্ধে সংবাদপত্রের খবর সব মিথ্যা। আমি বীর বিক্রমে তার অগণিত বন্ধুদের বেষ্টনী ভেদ করে বেরিয়ে আসি। উপর থেকে লাফিয়ে পড়ায় আমার পা ভেঙে যায়। কিন্তু এতে আমি বিচলিত না হয়ে প্রহরীদের বাধা এড়িয়ে নির্বিঘ্নে বেরুতে পারি। সেই রাত্রে আমি অশ্বারোহণে যাট মাইল পথ অতিক্রম করি। অশ্বের লম্ফনে আমার ভাঙা পায়ের হাড় থেকে মাংস খসে পড়লেও আমি তাতে ভগ্নচিত্ত হইনি"। ডাইরীর অন্য একটি অংশে লেখা ছিল :

'পুলিশের দল আমাকে জঙ্গল ও বাগীচার মধ্যে দিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে ফিরছে। কাল রাত্রে তারা নৌকাযোগে আমাকে তাড়া করে পলায়নে বাধ্য করে। আমি নিরাপদ স্থানে ফিরতে পারলেও আমার পা বরফের মত হিম হয়ে গেছে। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় আমি তখন কাতর। আজ সভ্য মানুষ মাত্রই আমাদের প্রতি খড়্গ হস্ত। কিন্তু কেন? কি জন্যে? যে কার্যের জন্য ব্রুটাসকে সম্মানিত করা হয়েছিল, যে কার্যের জন্য টেল বীর আখ্যায় ভূষিত হয়েছে, সেইরূপ একটা কাজই তো আমি করেছি। কিন্তু তা সত্বেও এরা কেন আমাকে এমনি করে খেদিয়ে বেড়াবে?"

[গৃহতল্লাসী কালে স্বাক্ষর-অপরাধীদের গৃহে রক্ষিত খাতা পত্র এবং মুদ্রিত পুস্তকের পাতায় এইরূপ অপরাধীদের হস্তাক্ষরে লেখা কিছু লিপিকা খোঁজ করা উচিৎ। পোষ্ট অফিসে খোঁজ করলে পলাতক অপরাধীদের বন্ধুদের নামে পাঠানো পত্রাদি পাওয়া যেতে পারে। এই গুলিতে সাহায্য প্রার্থনার সহিত দম্ভোক্তি ও স্বীকারোক্তিও থাকে। কিন্তু ধরে নেওয়া হয় যে ওরূপ সাক্ষ্য-প্রমাণ তারা রাখবে না। কিন্তু এইরূপ ধারণা করা পুলিশ-কর্মীদের পক্ষে ভুল হবে।]

শোনিতাত্মক অপরাধীদের মধ্যে এই দম্ভোবৃত্তি অধিক মাত্রায় এবং উগ্ররূপে থাকে। সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধীদের মধ্যে এই দম্ভোবৃত্তি সাধারণতঃ তাদের পরিক্রমণে ও হাবভাবে প্রকাশ পায়। কখনও কখনও এরা মাত্র অন্তরঙ্গ সহ-কর্মীদের নিকট তাদের কু-কর্ম সম্বন্ধে দম্ভোক্তি করে। থানার হাজতে কান পাতলে ওদের কে কোথায় কি কাজ করলো, ওই সম্পর্কে পরস্পরের মধ্যে আলোচনা শুনা যাবে। পুলিশের তরফে ইনফরমারগণ ওদের ঐ দম্ভোক্তি নিয়োগকারী'কে জানিয়ে দেয়। শোণিতাত্মক অপরাধীরা তাদের উগ্র দম্ভোবৃত্তির কারণে কুকর্মের বিষয় বেপরোয়াভাবে যাকে তাকে না ব'লে শান্তি পায় না'। এই সম্বন্ধে নিম্নে একটি মামলা সম্পর্কিত ঘটনার বিষয় উল্লেখ করা হলো।

"আমি গো-বাবুর জনৈকা রক্ষিতা নারী। সেদিন গো-বাবু মাতাল অবস্থায় বাড়ী ফেরে। আমি তাকে তখন শুধাই : এত দেরী কেন? গো-বাবু উত্তরে আমাকে ধমকে উঠে বললো : চুপ কর শালী! একটা কাণ্ড হয়ে গিয়েছে। কাল খবরের কাগজে পড়বিখন। সকালে উঠে আমি তার জামা ও কাপড়ে রক্তের দাগ দেখি। এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে সে বললো : বুঝেছিস

এবার কি হয়েছে ? যা টপ করে কাপড়টা কেচে দে। গো-বাবু ওই দিনই হাবড়ার একটি ডেরা'তে এনে তার বীরত্বের কাহিনীটুকু আমাকে বললো। দুই একদিন পরে গো-বাবুকে আমি খুব বিচলিত দেখি। সে কোনও এক গণক ঠাকুরের কাছে গুনিয়ে আসে। গণক ঠাকুরের সেই মতামত লেখা কাগজটা আমার কাছে আছে।'

অপরাধীরা নিজেদের উৎকট অপরাধীরূপে প্রখ্যাত হওয়ার মধ্যে গর্ব অনুভব করে। অখ্যাত অপরাধীরা অপরাধী সমাজে ঘৃণার পাত্র। স্বল্প কালের জন্য কারাবরণ করলে অপরাধী সমাজ তাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে। প্রকৃত অপরাধীদের অন্তর্নিহিত দম্ভোবৃত্তিই এদের এরূপ মনোবৃত্তির কারণ।

পুরাকালে ডাকাতাদি অপরাধীরা দেহের উন্মুক্ত স্থানে বীরত্বসূচক উল্কি ধারণ করতো। ওদের কেউ কেউ রাজার ন্যায় বেশ ভূষায় ভূষিত হতো। এরূপ ব্যবহারও ওদের এই দম্ভোবৃত্তি প্রমাণ করে। রাশিয়ার কোনও এক যুবক একটি সমগ্র পরিবারের সমুদয় ব্যক্তিকে নিহত করে এইরূপ এক উক্তি করে : এইবার আমার সহপাঠিরা বুঝতে পারবে 'আমি প্রখ্যাত হবো না' তাদের এই ধারণা কিরূপ ভুল। বাঙলা দেশে সাম্প্রতিক খুনোখুনী কালে এইরূপ উক্তি রাজনৈতিক নেতারাও করেছেন।

অপরাধীদের মধ্যে আমরা বহু প্রকার ব্রাভাডো তথা বাহাদুরি দেখি। ঐ গুলিও ওদের অন্তর্নিহিত দম্ভোবৃত্তিপ্রসূত হয়ে থাকে। এই ব্রাভাডো তথা বাহাদুরির জন্য অপরাধীরা অকারণে বিপদ বরণ করে। অপরাধ স্পৃহা কমার মুখে দাম্ভোবৃত্তির আবির্ভাব হয়েছে। উত্তর কলকাতার প্রখ্যাত খুনে খাঁদা ওরফে খোকা বাবু এইরূপ বহু ব্রাভাডো বা বাহাদুরী দেখিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করতো। কলিকাতা পুলিশ জার্নাল VOL I PART I পাগলা হত্যা কাণ্ড শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে কিয়দাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হলো।

"এই সময় তাদের ওস্তাদ খাঁদা বাবু অকারণে অতিমাত্রায় বেপরোয়া হয়। তারা প্রায়ই আমাদের থানার আশে পাশে ঘোরাঘুরি করতো। মধ্যে মধ্যে পুলিশের অবর্ত্তমানে তারা কৃপানাথ লেনে খাঁদার বাড়ীতেও আসতো। তারা সেখানকার সাক্ষীদের ভয় দেখিয়ে ও শাসিয়ে এসেছে। একদিন অফিসর-দের নাইট রাউণ্ড তথা রাত্রির রোঁদ কালে খাঁদা রিক্সা পুলর সেজে রিক্সা সমেত থানার সুমুখে এসে দাঁড়ালো। সৌভাগ্য ক্রমে কোনও পুলিশ কর্মী সেদিন তার রিক্সাতে ওঠে নি। জনৈক উকিল বাবু কার্য্য ব্যাপদেশে থানায় এসে

ছিলেন। তিনিই সেদিন ওই রিক্সা খানি ভাড়া করলেন। খাঁদা বিনা বাক্য ব্যয়ে উকিল [গোপাল বাবু] বাবুকে তাঁর বাটিতে পৌছিয়ে বলে ছিল: সৌভাগ্য ক্রমে আপনি উঠেছিলেন। ঘোষাল বাবু ভুল করে এটাতে ওঠেন নি। যাই হোক। ওঁকে বলবেন যে আমি খাঁদা। ভাগ্যক্রমে উনি এ যাত্রায় বেঁচে গেলেন। পরে গুজব রটে যে খাঁদা থানার দ্বিবাল বেয়ে কোয়ার্টাসে উঠে তদন্তকারীকে খুন করবে। এরপর রেইডে বেরুলে আমরা জামার তলায় লৌহ বর্ম্ম পরতাম। বাম হাতে আবক্ষ ঢাল ও ডান হাতে পিস্তল ধরে সম্ভাব্য স্থানে আমরা হানা দিতাম।"

কম বেশী এই দাম্ভিকতা আমরা কোনও কোনও সাহিত্যিক, গায়ক ও শিল্পির মধ্যে দেখে থাকি। এজন্য তাঁদের লেখায় একটি মাত্র বাক্য বাতিল করলে তাঁরা ক্রুদ্ধ হন। তবে—প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁদের দম্ভ স্থূলরূপে প্রকাশ পায় নি। তার মধ্যে কিছুটা যুক্তি ও উদ্দেশ্য থেকেছে। কিন্তু ওদের ঐ দম্ভ অহেতুক হলে বুঝতে হবে ওদের মধ্যে অপস্পৃহা স্থান পেয়েছে।

[দম্ভ তথা ভ্যানিটি এবং গর্ব তথা প্রাইড, কমপ্লেকস তথা মনোজট এবং ম্যানিয়া তথা বাতিক একটা অন্যটির স্থুল বা সূক্ষ্ম রূপ। তাই উহাদের একটির অন্যটিতে রূপান্তরিত হওয়া সম্ভব।]

অন্যের লেখার প্রতি ঈর্ষান্বিত হলে এবং প্রকাশকরা পারিশ্রমিক না দিলে সাহিত্যিকরা ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হন। কোনও এক মল্ল-কবি কবিতা না ছাপানোর জন্য জনৈক সম্পাদককে প্রহার করেছিল। প্রকাশকদের অপস্পৃহা এলে তারা [প্যাসিভ অপরাধী] প্রবঞ্চক হয়েছে। বহু সাহিত্যিক বেনামীতে অশ্লীল সাহিত্য লিখেছেন। কিছু সাহিত্যিক তাদের দাম্ভিকতা পাত্র পাত্রীর মুখে তুলে দেন। তাঁরা নিজেরাও তাঁদের রচনায় দম্ভোক্তি করে থাকেন। প্রত্যেক প্রফেসনের [বৃত্তি তথা পেশা] লোকরা স্বস্ব প্রফেসন সম্পর্কে অত্যন্ত স্পর্শ-কাতর। তাই ডাক্তাররা ডাক্তারী বিষয়ে অন্যদের মতামতে রুষ্ট হয়। বলা বাহুল্য যে এই দাম্ভিকতার পরবর্ত্তী ধাপ ক্রুদ্ধতা ও নিষ্ঠুরতা।

(ঘ)—নিষ্ঠুরতা

আমি প্রবন্ধের প্রথমাংশে বলেছি যে অলসতা, ভাবপ্রবণতা, দাম্ভিকতা ও

নিষ্ঠুরতা অপরাধীদের মধ্যে উঠা নামা করে। অলস অবস্থায় ওদের অপরাধ স্পৃহা প্রদমিত থাকে। ওদের ভাবপ্রবণতা কালে উহা স্বল্প মাত্রায় এবং ওদের দাম্ভিকতা কালে উহা মধ্য মাত্রায় থাকে। কিন্তু ওদের নিষ্ঠুর অবস্থায় অপরাধ-স্পৃহা চরমে পৌছয়। অপরাধীদের মনের পথে এই অলসতা, ভাবপ্রবণতা দাম্ভিকতা এবং নিষ্ঠুরতা যথাক্রমে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ও শেষ ধাপ। অপরাধ স্পৃহার ক্রমাবির্ভাব দ্বারা অপরাধীরা নিষ্ঠুর হওয়ামাত্র তারা অপকর্ম্ম দ্বারা তাদের মধ্যে জাত বাড়তি অপস্পৃহা নিষ্কাশিত করে।

[কারও ক্ষতি করা বা অপকার করা বা কারও মনে কষ্ট দেওয়া ও কারও প্রাণ ও সম্পত্তি নাশ বা উহা অপহরণ করার মধ্যে থাকে নিষ্ঠুরতা। সেই অবস্থায় তাদের মনে তিল মাত্র বিবেক ও দয়া মায়া বা সহানুভূতি থাকে না। তাই নিষ্ঠুর হওয়া মাত্র তারা অপকর্ম শুরু করে।]

মুক্ত অবস্থায় তাদের নিষ্ঠুরতা'র রাজ্যে এলে তারা অপকর্ম্ম করে। কিন্তু বন্দি দশায় তারা নিষ্ঠুরতায় এলে অপরাধ করতে অক্ষম হয়। ফলে— অপকর্ম্মের মধ্যে তারা তাদের বাড়তি অপস্পৃহা নিষ্কাশিত করতে পারে না। ওদের ওই বাড়তি অপস্পৃহা ঐ ভাবে রুদ্ধ হওয়ায় তাদের মধ্যে চিত্ত-বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ইহাকে ইংরাজীতে ইমোসন্যাল ইনষ্টেবেলিটি বলা হয়। এই অবস্থায় তারা পুলিশ হেপাজত থেকে দুর্দ্দমনীয় বেগে পলায়নের চেষ্টা করে। কিন্তু তাতে অপারগ হলে তারা মাটিতে গড়াগড়ি দেয়, গাল পাড়ে বা মাটিতে ও লৌহ গরাদে মাথা খুঁড়ে, মাথার চুল ছিঁড়ে ও দেহ হতে রক্তপাত ঘটায় এবং পুলিশ কর্ম্মীদের বিরুদ্ধে প্রহারের মিথ্যা অভিযোগ করে। কেহ কেহ ঐ অবস্থায় থাকাকালীন আহার নিদ্রাও বন্ধ করেছে।

[অপকর্ম্মের অব্যাবহিত পরে ধরা পড়লে প্রকৃত অপরাধীরা পলায়নের চেষ্টা করে না। বরং উহা তাদের কার্য্যের স্বাভাবিক পরিণতি মনে করেছে। এই সময় তাদেরকে শান্ত ও নিশ্চেষ্ট দেখা গিয়েছে। অপস্পৃহার সাময়িক নিবৃত্তির জন্য এরা সুবিধা সত্ত্বেও পলায় নি।]

কিন্তু—দুই তিন ঘণ্টা হাজত বাসের পর হঠাৎ কোনও এক সময় অপরাধী বিশেষের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত কারণে চিত্ত বিক্ষোভের সৃষ্টি হতে পারে। ঐ সময় পলায়নে সুবিধা না পেলে তারা ক্ষিপ্তের ন্যায় ব্যবহার করে। পুলিশ হেপাজতে অপরাধীদের তদন্তার্থে বাহিরে নেওয়ার কালে শান্তি রক্ষীদের সাবধান হওয়া উচিৎ। কারণ কোন অশুভ মুহূর্তে তাদের ঐ শান্ত শিষ্ট কয়েদীটি

চিত্তবিক্ষোভজনিত কিরূপ দুর্দান্ত হিংস্র বা নিষ্ঠুর হবে তা কেউ বলতে পারে নি। এই চিত্তবিক্ষোভে জেলে থাকাকালীন অপরাধীরা প্রায়ই ভোগে। কোনও কোনও অপরাধী নিজেরাই জানায় যে তাদের এই রোগ আসছে এবং রক্ষীদের ঐ সময়ের জন্য তাদেরকে প্রস্তর নির্ম্মিত কক্ষে নিক্ষেপ করার জন্য নিজেরাই অনুরোধ করে। ইউরোপীয় অপরাধীরা এই চিত্তবিক্ষোভকে ব্রেকিঙ আউট, ভাঙন বা চম্পট বলে। রজস্বলা অবস্থায় নারী অপরাধীদের মধ্যে এই রূপ চিত্ত-বিক্ষোভ দেখা গিয়েছে। ওদের প্রতিরুদ্ধ ভাবাবেগ হতে ইহা সৃষ্ট হয়ে থাকে। মিস্ মেরি কার্পেনটার তাঁর ফিমেল লাইফ ইন প্রিসিন্স গ্রন্থে কোনও এক কয়েদীর সহিত তাঁর নিম্নোক্ত কথোপকথন লিপিবদ্ধ করেছেন।

"হ্যাঁ, মিসজী! আজকেই আমি ভেঙে পালাচ্ছি। হাঁ গো হাঁ, সত্যি বলছি। দেখ তুমি—

কেন? তোমাকে কি কেউ বকেছে? তোমাকে কেউ বকে নি। কেউ তোমাকে দুঃখও দেয় নি। তোমাকে রাগায়'ও নি কেউ, অথচ তুমি—

না না। কেউ কোনও দোষ বা অবিচার আমার উপর করে নি। কিন্তু তবুও আমি ভাঙবো আজই রাত্রে। কয়েদ তথা জেল জীবন আমার অসহ্য হয়েছে। আর আমিও একটুও পারছি না।

আমি বারণ করছি তোমাকে। ওরকম কাজ করলে তোমাকে অন্ধ কূপে [ডার্ক সেল] নিক্ষেপ করা হবে। বুঝলে—

বেশ তো। আপনি তাহলে তাই করবেন। আমি তাতে রাজী। আমি তাহলে ঐ অন্ধ কূপ তথা ডার্কসেলে যাবো।

প্রতিজ্ঞা মত কয়েদীটি সেই রাত্রেই ভাঙতে চেষ্টা করে। জানালার কাচ সে ভেঙে চুরমার করে দেয়। জিনিসপত্র সে তছনছ করে। রক্ষীগণ ছুটে আসে। শেষে রীতিমত একটা লড়াই বেধে যায়। কয়েদীটি রক্ষীদের দেহের স্থানে স্থানে আঁচড়ে ও কামড়ে দেয়। তাকে আয়ত্তে আনতে রক্ষীদের প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠে—

এই চিত্ত-বিক্ষোভের সঙ্গে কিছুটা হিষ্ট্রিয়া রোগের তুলনা করা চলে। ইংরাজীতে একে বলে 'ইমোসন্যাল ইনষ্টেবিলিটি। অসভ্য মানুষ, শিশু বালক এবং নির্ব্বোধ ব্যক্তিদের মধ্যে এরূপ চিত্ত-বিক্ষোভ অধিক দেখি। অপরাধী তার নিষ্ঠুরতার রাজ্যে এসে অপকর্ম্মে অক্ষম হলে এই চিত্ত বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

ওদের প্রচণ্ড অপস্পৃহা প্রতিরুদ্ধ হলে এরূপ হয়ে থাকে। অপস্পৃহার অবস্থিতির প্রমাণ স্বরূপ একটি বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

'মানসিক পরীক্ষা ও চিকিৎসার জন্য অনেকগুলি অপরাধীকে আমি আমার হেপাজতে [কাসটোডি] রাখি। এদের মধ্যে একজনকে আমি পাগলের মত হতে দেখি। তাকে অবিরত চিন্তা-রত দেখা যায়। উপরন্তু দুবার সে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। আমি তার জন্য নির্দিষ্ট স্থান ও আহারের পরিবর্ত্তন ঘটাই। কিন্তু আমার অতো চেষ্টা সত্বেও সে ভালো হয় নি। এ সম্বন্ধে তার সঙ্গে বাদানুবাদ করলে সে এইরূপ বলেছিলঃ পূর্ব্বে আমার এইরূপ অবস্থা হলে আমি অপরাধ করতাম এবং এরূপে আমি নিরাময় হ'তাম। আজ আমি অপকর্ম্মে অক্ষম হয়েছি। তাই আমার মনে হয় যে আমি পাগল হয়ে যাবো।

অপরাধীর উপরোক্ত উক্তিটি হতে নিষ্ঠুরতার রাজ্যই যে অপস্পৃহার শেষ অবস্থিতি বা উহা যে ওদের শেষ ধাপ এবং তা প্রতিরুদ্ধ হলে যে চিত্ত বিক্ষোভের উপস্থিতি বা সৃষ্টি হয়, তা প্রমাণিত করে। আমি নিজ চক্ষে ইহা দেখেছি। তাই এই মতবাদ আমি বিশ্বাস'ও করি।

অপরাধীদের এই নির্দ্দয়তা এবং নিষ্ঠুরতার প্রমাণস্বরূপ নিম্নে আরও কয়েকটি এদেশী ও বিদেশী ঘটনা উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করা হলো।

'কোনও এক স্পেনীয় জলদস্যু সর্দ্দার আমেরিকার এক স্থানে হানা দিয়ে বিপক্ষ দলের এক নেতার বক্ষে আমূল ছুরি বসিয়ে দেয়। কিন্তু তাতেও সে ক্ষান্ত না হয়ে ছুরিকাবিদ্ধ ছিদ্রপথে অঙ্গুলি প্রবেশ করিয়ে হৃদপিণ্ডটা মুচড়ে ছিঁড়ে বাইরে আনে। পরে সে সেটা মুখে-পুরে কচ কচিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ছিল। 'বুনস আয়ারে কোনও এক অপরাধী দ্রব্যাপহরণের উদ্দেশ্যে আপন পিতাকে নিহত করে। কিন্তু এই হত্যার পর প্রয়োজনীয় অর্থ না পেয়ে সে মাতাকে পীড়ন করার উদ্দেশ্যে তাঁর পা দুটো জলন্ত উনানের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। উদ্দেশ্য, মাতার নিকট থেকে একটি স্বীকারোক্তি আদায় করা।

কলকাতায় জনৈক গুণ্ডা ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হলে অন্যের মাথার উপর নিজের নিরেট মাথার টুঁ মেরে তাদের মাথাগুলি ফাটিয়ে দিত। কোনও এক বালক অপরাধী বাল্যকালে পক্ষীশাবকদের ধরে তাদের পালক উপড়ে ফেলে জীবন্ত পুড়িয়ে মারতো। অন্য এক অপরাধী পিতা কর্তৃক প্রহৃত হলে অসহায় জন্তু ও অন্য বালকদের উপর অত্যাচার করে পিতার উপর প্রতিশোধ নিত। বিগত

[১৯৪৭ সন] সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কালে এবং সাম্প্রতিক খুনের রাজনীতি তথা মার-দাঙ্গা কালে এরূপ বহু ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। ঐ সময়ে শোণিত স্পৃহা শনৈঃ শনৈঃ উপজাত ও নিষ্ক্রান্ত হয়ে মানুষকে পশুতে পরিণত করে।

উপরে এ্যাকটিভ তথা সক্রিয় নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে বলা হলো। এ্যাকটিভ তথা সক্রিয় নিষ্ঠুরতার মত প্যাসিভ তথা নিষ্ক্রিয় নিষ্ঠুরতাও উপগত হয়ে থাকে। গোপনে দ্রব্যাপহরণ বা গৃহস্থ'দের ক্ষতি সাধনে তাদের মনে কষ্ট দেওয়ার মধ্যে থাকে এই নিষ্ক্রিয় নিষ্ঠুরতা। অপরাধ স্পৃহার পরিমাণ অনুযায়ী উৎকট অপরাধীদের নিষ্ঠুর হতে দেখা যায়।

[কোনও এক উকিল বাবুকে গড়ের মাঠের নিকট একা পেয়ে জনৈক গুণ্ডা লোক তাঁর বক্ষে ছুরি রেখে বললো : এরে শালা কি আছে লিয়ে আয়। উকীল বাবু ঠক ঠক করে কেঁপে ব্যাগ শুদ্ধ তিনশতা টাকা তার হাতে তুলে দিল। গুণ্ডা লোকটি' ঐ টাকা গুণে উকিলবাবুর কালো পোষাকের দিয়ে চেয়ে বুঝল যে উনি উকিল। এর পর সে ব্যাগ থেকে উকিল বাবুর বাটির ঠিকানা সহ একটি নেম কার্ড নিজের কাছে রেখে ব্যাগ সহ ওই টাকা তাঁকে ফিরত দিয়ে বলেছিল : 'ক্যা ! আপ উকিল বাবু হ্যায় ? আপকো রুপেয়া হাম নেহি লেগী।' এর দুইমাস পরে এক চোয়াড়ে চেহারার ব্যক্তি 'মক্কেল রূপে ঐ উকিল বাবুর চেম্বারে এসে তাঁর সাহায্যপ্রার্থী হলে উকিল বাবু তাকে আশ্বস্ত করে, তাঁর 'ফি' চাইলে সে ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হয়ে ব'লে উঠেছিল : আপকো 'ফি' তো উস্ রোজ ময়দানমে হাম ছোড় দিয়া থে।"

উপরোক্ত ঘটনায় সেই অপরাধীর মধ্যে আমরা (১) দাম্ভিকতা এবং (২) নিষ্ঠুরতার কম বেশী মিশ্রণ দেখেছি। উহার মধ্যে (৩) অলসতা না থাকলেও কিছুটা (৪) ভাবপ্রবণতা রয়েছে।

উপরোক্ত বৃত্তি চতুষ্টয়ের ওরূপ সংমিশ্রন প্রাথমিক-অপরাধী এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে দৃষ্ট হলেও উৎকট অপরাধীদের মনে উহারা অবমিশ্রিত ও স্থূলরূপে পৃথক পৃথক থাকে। তজ্জন্য ঐ বৃত্তি চতুষ্টয়ের মনের পথে উঠা নামা সম্ভব হয়। ওই বৃত্তি চতুষ্টয়ের পৃথক সত্বা স্বভাব, অভ্যাস ও মধ্যম অপরাধী ভেদে কম বা বেশী থাকে। কিন্তু সাধারণ মানুষদের মধ্যে ওগুলি তরলীকৃত থাকায় কম বেশী মিশ্ররূপ প্রাপ্ত হয়েছে। এই বৃত্তি চতুষ্টয় তাদের আয়ত্তাধীন থাকায় উত্তেজিত না হলে মনের পথে ঐগুলি স্বয়ংক্রিয়তা প্রাপ্ত হয়ে উঠা নামা করে না।

উক্ত বৃত্তি চতুষ্টয়ের এইরূপ স্বয়ংক্রিয় উঠা নামা উৎকট অপরাধীদের মত হিষ্টিরিয়া রোগী ও উত্তেজিত শিশুদের মধ্যেও দেখা যায়। ইহাও তাদের 'অপরাধী আদিপুরুষ' সংক্রান্ত মতবাদ প্রভৃতি এবং তৎসহ মস্তিষ্কের ক্ষয়ক্ষতি ও পূনর্গঠনের রীতিনীতি প্রমাণ করবে।

হিষ্টিরিয়া রোগীদের, অসভ্য মানবদের, এবং শিশুদেরও কষ্টবোধ কম। কিন্তু তা সত্বেও এদের কেউ কেউ স্বল্প কারণে অভিযোগমুখর হয়। তজ্জন্য মনে হয় যে তাদের বুঝি সত্যই কষ্ট হলো। অপরাধীদের কষ্টবোধ-হীনতার প্রমাণ স্বরূপ নিয়ে অন্য একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করা হলো।

"ওই দুর্দ্দান্ত দস্যুকে ঘিরে ফেললে সে উলম্ফনে বেষ্টনীর ওপারে পৌছিয়ে একটি পুষ্করণীতে ঝাঁপ দিল। বহুক্ষণ পরে সে জলের উপর মাথা তুললে আমরা সট্ গানের ছটরাতে তাকে ক্ষত বিক্ষত করলাম। যত বার সে জলের উপর মাথা তুলেছে ততবার তার দিকে সটগানের গুলি ছুঁড়েছি। পুষ্করণীর জল রক্তে লাল হয়ে উঠে এবং সে'ও ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। আমরা তার ক্ষত বিক্ষত দেহটা ট্রাকে তুলে ক্যাম্বেল হাসপাতালে এনেছিলাম। দেহ থেকে ছটরাগুলি বার করবার জন্যে তাকে ক্লোরফর্মে অজ্ঞান করতে চাইলে সে বলেছিল: হুজুর। ওসবের কোনও দরকার নেই। কল্কে'তে কড়া তামুক সেজে একটা হুঁকা আমাকে দিন। আমি যতবার ফুড়ুক শব্দে হুঁকোতে টান দেবো ততো বার [সেই মুহূর্তে] আমার দেহে আপনারা ছুরি বসান। আমরা তার জন্যে ওইরূপ ব্যবস্থা করলে তাকে অজ্ঞান না করে অস্ত্রোপচার করা সম্ভব হয়েছিল।"

অপরাধ-স্পৃহা এবং সৎপ্রেরণার মিশ্ররূপ সম্পর্কে একটি উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো। এই ক্ষেত্রে ওদের সৎপ্রেরণাকে বাড়িয়ে কিংবা অপস্পৃহাকে কমিয়ে অপরাধীকে নিরপরাধী করা যায়। উহাদের একটি অন্যটির উল্টা বৃত্তি হওয়ায় একটি বাড়লে অন্যটি কমে যায়। বলা বাহুল্য বহু প্রাথমিক অপরাধীদের মধ্যে উহাদের কম বেশী একত্র সমাবেশ আছে।

"পাইকদের কাবু করে দস্যুদল জমিদার গৃহিনীর বজরাতে উঠে পড়লো। সালঙ্কারা জমিদারগৃহিনী তাঁর দুইটি বয়স্থা কন্যা সহ ভয়ে কাঁপছিলেন। ওদের নেতা 'সর্দ্দার ডাকাত' জমিদার গৃহিনীর সুমুখে এসে বলে উঠলো। 'মা! তোমার ছেলে ভিক্ষা চাইছে। কয়েকটা গহনা আমাদেরকে দাও।' জমিদার গৃহিনী নিজের অলঙ্কার খুলে তার কন্যাদেরও গহনাগুলি খুলতে বললে ঐ

দস্যুনেতা তাতে বারণ করে বলে ছিল। 'না মা। আমি বোনেদের গহনা নেবো না। আমি মাত্র মার গায়ের গহনা নেবো। কিন্তু মাকে আমি একেবারে নিরাভরণ হতে দেবো না।

[অন্যসূত্রে সংবাদ পেয়ে পুলিশ ওই দস্যুদল ও তার ঐ নেতাকে গ্রেপ্তার করে অন্যান্য মামলা সহ আদালতে দলীয় তথা গ্যাঙ্গের মামলায় সোপর্দ করেছিল। কিন্তু—জমিদার গৃহিনীর ঐ এক কথা যে উনি তাঁর ছেলেকে স্বেচ্ছায় ওগুলি উপহার দিয়েছেন। 'সমন' পেয়ে আদালতে আসতে বাধ্য হলেও উনি কথার খেলাপ না করে ঐ একই সাক্ষ্য দিলেন।]

দৈহিক পীড়ন প্রাথমিক অপরাধীদের উতলা করলেও উহা প্রকৃত অপ-রাধীদের কষ্ট হীনতার জন্য আনন্দদায়ক হয়। অন্যদিকে—স্বভাব-অপরাধীরা ধাপ্পাতে ও দৈব ও অভ্যাস-অপরাধীরা মিষ্টি কথায় ভুলে। আশার বাণী দৈব ও প্রাথমিক অপরাধীদের উপর কার্য্যকরী হলেও স্বভাব-অপরাধীদের পক্ষে উহা নিতান্ত মূল্যহীন ও অবান্তর হয়েছে।

উৎকট অপরাধীদের নিকট জেলখানা একটি বিরাট বিদ্যাপীঠ। সেখানে তারা পরস্পরের নিকট নূতন নূতন কায়দা কানুন শিখে পোক্ত হয়। এজন্য ইচ্ছা করে তারা বারে বারে কয়েদ হতে চেয়েছে। সেখানে তারা বিড়ি ও নেশার দ্রব্য কারেন্সী মুদ্রারূপে ব্যবহার করেছে। ওদের জীবন বারেক বেশ্যা-সম্ভোগ ও বারেক কারা গমন ব্যতিরেকে অন্য আর কিছুই নয়।

বিঃ দ্রঃ—পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে প্রেম-বৃত্তি ও ভাব বৃত্তি এবং দম্ভ ও নিষ্ঠু [নিষ্ঠুর] বৃত্তি এবং ঐ গুলির অন্তর্গত বিভিন্ন স্থূল ও সূক্ষ্মবৃত্তি সম্বন্ধে বলেছি। স্থূল বৃত্তি ও সূক্ষ্ম বৃত্তিগুলি পর পর স্থূলতর হতে স্থূলতম এবং সূক্ষ্মতর হতে সূক্ষ্মতম দেখানো হয়েছে। ওখানে বক্তব্য এই বেশী সূক্ষ্ম বৃত্তি কম সূক্ষ্ম বৃত্তিকে এবং কম স্থূল বৃত্তি বেশী স্থূল বৃত্তিকে প্রদমিত রাখে তজ্জন্য, উপরের দম্ভসম্ভূত বৃত্তিগুলি নিম্নের নিষ্ঠুসম্ভূত বৃত্তিগুলিকে প্রদমিত রাখতে সক্ষম। তাই দাম্ভিকতা শেষ হওয়ার পর নিষ্ঠুরতার আবির্ভাব হয়। অর্থাৎ—দাম্ভিকতা নিষ্ঠুরতার সূক্ষ্মরূপ হওয়ায় নিষ্ঠুর কার্য্য করতে অপারগ ব্যক্তিরা নানা রূপ দম্ভোক্তির দ্বারা তাদের অন্তরের নিষ্ঠুরতাকে তৃপ্ত করে নিরাপরাধী থাকে। [নিষ্ঠুরতা রাজ্যে উপনীত হলে মানুষ অপরাধ করে] তাই দাম্ভিকতা নিষ্ঠুরতার প্রথম ধাপ হলেও কিছু ক্ষেত্রে উহা নিষ্ঠুরতার প্রতিষেধকও হয়েছে। অন্যদিকে এই দাম্ভিকতা নিষ্ঠুরতার অগ্রদূতও বটে!

কারণ দাম্ভিক ব্যক্তিরা অপরাধ প্রতিরোধ শক্তির অভাবে অপরাধী হয়। 'হাঁক ডাক মানে কামড়ানো নয়। 'যতোটা গর্জ্জায় ততোটা বর্ষায় না' এই সকল দেশীয় প্রবাদগুলি প্রমাণ করে যে, সাধারণ মানুষেরও এই তথ্যসমূহ বোধগম্য ছিল। তবে প্রতিরোধশক্তি কিছুটা কমলে ঐ দাম্ভিকতা নিষ্ঠুরতার রূপ নিতে পারে।

(৭)—অতীন্দ্রিয়তা

ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হেতু মানবদের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত বৃত্তিগুলির সহিত অতীন্দ্রিয়তা নামক অপর একটি শক্তির সৃষ্টি হয়। এই অতীন্দ্রিয়তাকে ইংরাজীতে হাইপার সেনসিবিলিটি বলা হয়। এই অতীন্দ্রিয়তা দুই প্রকারের হয়ে থাকে, যথা ঐন্দ্রিক তথা ইন্দ্রিয়জাত এবং মস্তিষ্কজাত তথা মানসিক।

'মহাপুরুষ এবং উৎকট [প্রকৃত] অপরাধী—মানব মনের ইহারা বিপরীত ধর্ম্মী সন্ততি। ইহারা উভয়েই একই রূপে পর পর দুইটি বিপরীত ধর্ম্মী স্তরের মধ্যে দিয়ে [উদ্ধ ও নিম্ন মার্গ] অগ্রসর হয়, যথা প্রাথমিক ও শেষ স্তর।

(১) মহাপুরুষ: প্রথম অবস্থায় সাধক'রা গৃহীরূপে [কিংবা গৃহীদের সংস্পর্শে] কাল যাপন করেন। ধর্ম্মাচরণ বা লোক হিতের জন্য এঁরা সম্পত্তি আহরণ করেন। এঁদের অধিকাংশ সাধু প্রাথমিক অপরাধীদের মত প্রাথমিক অবস্থায় [প্রাথমিক সাধু] রয়ে যান। এঁদের কতিপয় জন মাত্র ধাপে ধাপে উন্নত হয়ে উচ্চ মার্গে উঠেন। এঁদের মধ্য মার্গে এঁরা লোকালয় থেকে দূরে আরণ্যক জীবন যাপন করেন। বৃক্ষতলের একটুকু জমি ব্যতীত অন্য বস্তু এঁদের প্রয়োজন নেই। কিন্তু তথাচ সেখানে তাঁরা কয়েকজন একত্রে থেকে ধর্ম্মালাপ করেছেন। এঁরা এই সময় গৃহীদেরও দর্শন দিয়েছেন। কিন্তু শেষ অবস্থায় এঁরা একাচারী আদিম মানুষের মত জীবন যাপন করে জ্যোতিপ্রাপ্ত হন। এই সময় এঁদের সামান্য অঙ্গবস্ত্রও অসহনীয়। [শেষ অবস্থা] ভাগ্যবান ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোনও ব্যক্তি এঁদের সন্ধান পান নি।

(২) উৎকট অপরাধী: সাধুজনদের মত অপরাধীরাও দুইটি পর্য্যায়ে বিভক্ত, যথা প্রাথামিক ও শেষ স্তর। অপরাধীরা নিজেরাও তাদের এই দুই পর্য্যায়

সম্বন্ধে সচেতন। প্রাথমিক অপরাধীদের এরা ঘরিয়ালা, মধ্যবর্ত্তীদের এরা লায়েকি এবং শেষ অবস্থার অপরাধীদের এরা শেয়ানা বলে। প্রাথমিক অপরাধীরা প্রাথমিক সাধুদের মত গৃহী-জীবন যাপন করে। তাদের স্বভাব চরিত্র তখন স্বাভাবিক মানুষের মত থাকে। অধিকাংশ অপরাধী এই প্রাথমিক অবস্থায় থেকে যায়। কিন্তু ধীরে ধীরে অবনত হয়ে এদের কিছু প্রকৃত অপরাধী হয়। এই সময় তাদের স্বভাব চরিত্র আদিম মানুষের মত হয়। তখন তারা গৃহ ত্যাগ করে পঙ্কিল বস্তীবাসী হয়েছে। এরও পরে কেউ কেউ একাচারী মানুষের মত [শেষ অবস্থার সাধু তথা মহাপুরুষদের মত] একক জীবন যাপন করেছে।

[আদি মানুষও প্রথমে হিংস্র ও একাচারী ছিল। পরে তারা দলবদ্ধ হলেও খাদ্য সংগ্রহী অসভ্য মানুষ। এর বহু পরে তারা খাদ্য উৎপাদক সভ্য মানুষ হয়েছিল। উৎকট অপরাধীদের পশ্চাদগামী মানসিক বিবর্ত্তন উহা প্রমাণ করবে।]

সূক্ষ্ম বৃত্তির অতি পরিচালনা কিংবা অতি উপকারী হরমন [কার্য ও চিন্তা দ্বারা] মহাপুরুষ সৃষ্ট করে। তাতে মহাপুরুষরা জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য-বোধ হারিয়ে ফেলে। দেশে দেশে অতি কালচারড্ ব্যক্তির দেহ ও মন প্রায় একই রূপ। ঠিক ওই ভাবে স্থূল বৃত্তির অতি পরিচালন এবং অতি অনুপ-কারী হরমন [চিন্তা ও কর্ম দ্বারা] ক্ষরণ শেষ পর্য্যায়ের অপরাধী সৃষ্টি করে। তাতে প্রতি দেশের উৎকট অপরাধীদের মনোবৃত্তি ও শেষ বেশ চেহারা পর্য্যন্ত একই রূপ দেখা যায়। কৃষ্ণ বা শ্বেতকায় না হলে য়ুরোপীয় এবং অন্য দেশীয় শেষ পর্য্যায়ের অপরাধীদের চেহারা থেকে চেনা দুষ্কর হয়।

অত্যধিক সৎপ্রেরণা মহাপুরুষকে এবং অত্যধিক অপরাধ স্পৃহা উৎকট অপরাধীদের সৃষ্টি করে। এই উভয় প্রকৃতির মানুষের সংখ্যা পৃথিবীতে এত অল্প যে, তারা সাধারণ মানুষের নজরে সচরাচর আসে না। ঐ শেষ পর্য্যায়ের সাধুদের মত শেষ অবস্থার অপরাধীদের মধ্যেও আমরা অতীন্দ্রিয়তা দেখি। কিন্তু মহাপুরুষদের অতীন্দ্রিয়তার এবং উৎকট অপরাধীদের অতীন্দ্রিয়তার মধ্যে প্রভেদ আছে।

আমরা জানি যে আমাদের কর্ণ চক্ষু ও ত্বক দ্বারা আমরা শুনি দেখি ও স্পর্শ বোধ করি। কিন্তু এই সকল ইন্দ্রিয়ের বোধের জন্য আমাদের মস্তিষ্কে অনুক্রমিক [করেসপণ্ডিঙ] বোধ-কেন্দ্রও আছে। মহাপুরুষদের ক্ষেত্রে এই বোধ-কেন্দ্র

গুলি এবং উৎকট অপরাধীদের ক্ষেত্রে বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলি অতীন্দ্রিয়তা লাভ করে। [অবশ্য—উহাদের একটি সবল হলে অন্যটিও সবল হতে পারে] এই মহাপুরুষদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমি অজ্ঞ। আমি মাত্র উৎকট [প্রকৃত] অপরাধীদের অতীন্দ্রিয়তা সম্বন্ধে বলবো।

আমরা উৎকট অপরাধীদের কাহারও মধ্যে স্পর্শ, কাহারও মধ্যে স্বাদ, কাহারও মধ্যে শব্দ, কাহারও মধ্যে ঘ্রাণ ও কাহারও মধ্যে দৃষ্টি সম্পর্কিত অতীন্দ্রিয়তা দেখি। পকেটমার, সিঁদেল চোর, ছিন্নক-চোর, পশ্বব উত্তেলক ও মৎস্য চোর প্রভৃতি এক এক শ্রেণীর অপরাধী এক এক প্রকার অতীন্দ্রিয়তার অধিকারী। কিন্তু প্রত্যেকের মধ্যে প্রতিক্রিয়া-কাল তথা রিএ্যাকসন টাইম অতি প্রখর। উপরন্তু এদের প্রত্যেকে পশুপক্ষী ও আদিম মানুষ সুলভ আবহাওয়া সম্বন্ধে সচেতন। বায়ুর উষ্ণতা ও আদ্রতা থেকে এরা বৃষ্টি হবে কি'না তা বুঝে অপকর্মের সময় নির্ধারণ করে। বর্ষাকালে অপরাধ কার্য্যের জন্য এদের সুবিধা হয়ে থাকে। এখন প্রশ্ন এই যে স্নায়বিক কারণে [ক্ষয় ক্ষতি] বা অভ্যাস দ্বারা উহা অর্জিত হয়।

সম্ভবতঃ বহুল অভ্যাস বা স্নায়বিক পরিবর্ত্তন [ব্যক্তিত্বের পরিবর্ত্তন] ঃ এই উভয় কারণেই মানুষ কম বেশী অতীন্দ্রিয়তা লাভ করে। মূক, বধির ও অন্ধদের মধ্যে দেখা যায় যে ওদের অন্য ইন্দ্রিয়টি পুরিপুরক রূপে অতি সবল হয়ে থাকে। উপরন্তু এ জগতে মানুষ হারায় নাকো কিছু। তাদের প্রতিটি প্রদমিত গুণাগুণ মস্তিষ্কের নিম্নস্তরে আছে। ক্ষয় ক্ষতির [Degeneration] কারণে উপরের স্তর ক্ষতিগ্রস্থ হলে অপস্পৃহার সহিত নিম্নের স্তরে প্রদমিত উহার আনুসঙ্গিক প্রতিটি আদিম বৃত্তি উপরে উঠে।

[প্রতীত হয় যে, উৎকট অপরাধীরা মস্তিষ্কের স্নায়ু স্তরের ক্ষয় ক্ষতির জন্য ইন্দ্রিয়জাত অতীন্দ্রিয়তা লাভ করে। কিন্তু মহাপুরুষরা অনুশীলন দ্বারা মস্তিষ্কে অতিরিক্ত স্নায়ু স্তর সৃষ্টি করাতে মানসিক অতীন্দ্রিয়তা লাভ করে। পূর্ব্বোক্ত রূপে মস্তিষ্কের প্রেম বৃত্তিরও উর্দ্ধে আরও সূক্ষ্মতম স্নায়ু সৃষ্টি করলে এইরূপ মানসিক অতীন্দ্রিয়তা লাভ করা সম্ভব। এই সকল বিতর্কিত বিষয়ে অধিক আলোচনা না করাই উচিৎ হবে।]

উৎকট অপরাধীদের এই সকল ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অতীন্দ্রিয়তা সম্বন্ধে ব্যবহারিক অপরাধ-তত্ত্ব শীর্ষক পরিচ্ছেদে উদাহরণ সহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে বক্তব্য এই যে ব্যক্তিত্বের পরিবর্ত্তনে শেষ পর্য্যায়ের অপরাধীরা দৈহিক

ও নৈতিক ও মানসিক পরিবর্ত্তনের সহিত উপরোক্ত রূপ বহু বাহ্যিক অতীন্দ্রিয়তাও লাভ করে থাকে।

[এই অতীন্দ্রিয়তা অপরাধীদের ক্ষেত্রে যে আদি-মানুষ সুলভ বৃত্তি, তা নিশ্চিতরূপে বলা যায়। এখানে বিবেচ্য এই যে উহা কুচিন্তা ও কুকর্ম-জনিত হরমন জাতীয় কোনও অনুপকারী রস ক্ষরণ দ্বারা মস্তিষ্কের ক্ষয় ক্ষতির জন্য হয়ঃ কিংবা উহা ওদের সূক্ষ্ম বৃত্তির কম ব্যবহার এবং স্থূলবৃত্তির অতি ব্যবহারের জন্য মস্তিষ্কের কোনও বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্য হয়। উহার যে কোনও একটি দ্বারা মস্তিষ্কের উপরি স্তরের ক্ষতি হওয়ায় উহার নিম্নস্তরের বৃত্তিগুলির উপরে উঠা স্বাভাবিক। বলা বাহুল্য যে ঐ সকল মতবাদ এখনো একটি বিতর্কের বিষয়। [এইগুলি আমার নিজস্ব আবিষ্কার হলেও এখনও উহা আরও গবেষণার অপেক্ষা রাখে।]

[সাম্প্রদায়িক মহাদাঙ্গা [১৯৪৬] কালে দেখা গিয়েছে যে অন্য সম্প্রদায়ের পল্লীতে স্ব-সম্প্রদায়ের প্রতি অত্যাচারের সংবাদে মানুষ সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন হয়েছে। কিন্তু অন্য ধর্মীয়দের দ্বারা স্ব-সম্প্রদায়ের রক্ষার কাহিনী শুনা মাত্র তারা অসাম্প্রদায়িক হয়ে উঠেছে।

এখানে তারা স্থূল বা সূক্ষ্ম বৃত্তির ব্যবহারে বা অব্যবহারের পর্য্যাপ্ত সময় পায় নি। সেই ক্ষেত্রে অনুপকারী এবং উপকারী হরমন জাতীয় দেহ রস সিক্রিসন তথা ক্ষরণ সম্বন্ধে বিবেচনা করা যেতে পারে। উহার প্রতিক্রিয়া বিদ্যুৎ গতিতে কার্য্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা অধিক।

উপরোক্ত রূপে সাম্প্রদায়িক হওয়ার ক্ষেত্রে বলা যায় যে উত্তেজনা ও ক্রোধের দ্বারা মস্তিষ্কে সরাসরি তথা প্রত্যক্ষ রূপ আঘাতের জন্য উহা হয়ে থাকে। তাহলে পর মুহূর্তে ওদের অসাম্প্রদায়িক হওয়ার তথা ঐ মনোরোগ হতে মুক্ত হওয়ার ব্যাখ্যায় উপকারী রস ক্ষরণ স্বীকার করতে হবে। এই উভয় পন্থার মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতাও থাকতে পারে। অর্থাৎ—স্থূলবৃত্তির ব্যবহারে অনুপকারী হরমন এবং সূক্ষ্ম বৃত্তির ব্যবহারে উপকারী কোনও দেহ রস সৃষ্টি হতে পারে। মস্তিষ্কের মধ্যে কি হচ্ছে বা না হচ্ছে তা বাহির হতে বুঝা দুষ্কর। বাহিরের ব্যবহারের ও অভিব্যক্তি থেকে উহার কারণ অনুমানে বুঝতে হবে। কোনও একটি বস্তুর তিনটি গুণ জানা থাকলে উহাদের স্বরূপ হতে উহার চতুর্থ গুণটির স্বরূপ অনুমানে জ্ঞাত হওয়া যায়।]

নৈতিক অসাড়তা

উপরোক্ত অনুচ্ছেদগুলিতে আমরা দৈহিক অসাড়তা সম্বন্ধে অধিক বলেছি। কিন্তু ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হেতু ওদের মধ্যে নৈতিক অসাড়তাও এসে থাকে। অতীব নীতিজ্ঞান-হীনতা থেকে উহার উৎপত্তি হয়। এই নৈতিক অসাড়তার জন্য ওদের মধ্যে অনুতাপ এবং লজ্জা সরম থাকে না। অপরাধ করাকে তারা তাদের জন্মগত অধিকার মনে করে। চুরি রূপ একটি সাধারণ ব্যাপারে গৃহস্থরা এতো উতলা হয় কেন? এই সব বুঝতে না পেরে উগ্র প্রকৃতির প্রকৃত অপরাধীরা অবাক হয়।

নৈতিক অসাড়তা অসভ্য মানুষ জন্তু জানোয়ার ও বালকদের মধ্যে প্রায়ই দেখা গিয়েছে। এই সকল ব্যক্তিদের যারা প্রহার বা অপমান করে তাদেরই প্রতি এদের অনুরক্ত হতে দেখা যায়। আমি কুকুর ও অজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে ঐরূপ বহু পরীক্ষা করেছি। ইনফরমার রূপে ব্যবহৃত বহু পুরানো চোরকে অপমান ও তিরস্কারে তাড়িয়ে দিলেও তাদের নির্য্যাতক ঐ অফিসরের প্রতি সে অনুগত থেকেছে। কোনও এক অফিসর এক দস্যুকে প্রহার করার কালে তাঁর আঙটিটা হারিয়ে যায়। ঐ প্রহৃত ব্যক্তিটি সে আঙটি খুঁজে বার করে উহা তার প্রহারকের হাতে তুলে দেয়। অকথ্য অত্যাচার সত্বেও অধীন ডাকাত তার দলপতির অনুগত থাকে। এদের কারও মধ্যে লজ্জা বা অপমান দেখা যায় না। এই সম্বন্ধে নিম্নে একটি ঘটনা উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত হলো।'

"এই গুণ্ডার দল বে পাড়ায় উৎপাত করলেও নিজের পল্লীর লোকদের মদত দিত। তাই আমরা ওদের বিরুদ্ধে পুলিশে সাক্ষ্য পর্য্যন্ত দিতাম না। একদিন ওদের জনৈক ছোকরা সদস্য মত্তাবস্থায় আমাদের গালি দিলে পুলিশ সাহেবের অফিসে একটা অভিযোগ পাঠালাম। পরদিন সন্ধ্যায় ওদের ওই দলপতি আমার পাঠানো দরখাস্তটা হাতে আমার নিকট এসে অনুযোগ করে বললো: বাবু সাব। এহী দরখাস্ত আপ ভেজা থে। ছিঃ ছিঃ। হাম লোক সব আপকো লেড়কার মতো। এর পর সে ওখানে উক্ত ছোকরাটিকে চুলে ধরে এনে নির্দ্দয়ভাবে আমার সমুখে প্রহার শুরু করলো। পরিশেষে বাধ্য

হয়ে আমাকেই তার কবল থেকে তাকে উদ্ধার করতে হয়েছিল। প্রহারান্তে ঐ তরুণ তার সেই ওস্তাদ তথা গুরুর পদধুলি মস্তকে নিয়েছিল।

এই নৈতিক অসাড়তা'কে ইংরেজীতে মর‍্যাল ইন্‌সেন্‌সিবিলিটি বলা হয়। এই নৈতিক অসাড়তা তথা নীতিজ্ঞানহীনতা প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে অধিক দেখা গেলেও সাধারণ মানুষের মধ্যেও উহা কম বেশী আছে। অপস্পৃহার অবস্থিতি বা আগমন হেতু স্নায়বিক পরিবর্তনের জন্য এই আদিস্বভাব মানুষের মনে স্থান পায়। এ জন্য এরা বিকারহীন ধৈর্য্যের সহিত ফাঁসীর আদেশ শুনেছে। এই নৈতিক অসাড়তার জন্য প্রকৃত অপরাধীরা কখনও লজ্জিত বা ব্রীড়ানম্র [ব্লাসড] হয় না। পৃথিবীর যা কিছু অমঙ্গল তা মানুষের এই নৈতিক অসাড়তার মধ্যে নিহিত। এই নৈতিক অসাড়তার জন্যে আমরা মা ও মেয়েকে একত্রে বেশ্যা বৃত্তি করতে দেখি। এই নৈতিক অসাড়তার জন্য লোকে আপন স্ত্রী ও কন্যার দেহ বিক্রয় করে। শ্বশুর তার পুত্রবধুর প্রতি যৌনজ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। ভাই নিজের বোনকে ধনী বন্ধুর নিকট এগিয়ে দেয়! আপন স্ত্রী ও বেশ্যাকে নিয়ে মানুষ প্রকাশ্যে ঘুরা ফিরা করে।

অপরাধীদের অহেতুক আনন্দ উচ্ছাস ও সম্প্রীতি লজ্জা সরম এবং অনুতাপ-হীন ভাব নৈতিক অসাড়তার উপাদান। অধিক অপকর্মে অক্ষম হলে কিংবা বুদ্ধির দোষে ধরা পড়লে অপরাধীরা দুঃখ প্রকাশ করে। ঐ রূপ দুঃখ প্রকাশকে অনুতাপ বলা যায় না। জেলে কোনও অপরাধীকে অনুতপ্ত দেখলে বুঝতে হবে সে ক্রোধবশতঃ কিংবা দৈব দুর্বিপাকে অপরাধ করেছে। প্রাথমিক অপরাধী এবং অপরাধ-রোগীদের মাত্র অনুতপ্ত হতে দেখা গিয়েছে। প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে আমরা নৈতিক অসাড়তার সন্ধান পেয়েছি। য়ুরোপীয় আদালতের নিম্নোক্ত ঘটনাটি উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত হলো।

'এ্যা' তুমি বল কি ? তোমার অপরাধ পূর্ব কল্পিত ছিল'? জজ সাহেব তাকে জিজ্ঞাসা করলেন। 'হাঁ। তাই বটে! আমি গত আটমাস ধরে এ'কথা ভেবেছি।' 'বল কি তুমি? এ্যাঁ! এ যে সর্বনাশের কথা।' 'অপরাধটি আমার এপ্রিলেই শেষ করা উচিত ছিল। কিন্তু হাতে পয়সা না থাকয় আমি তা জানুয়ারিতে করি।'

কোনও এক খুনেকে ফাঁসীর জন্য বধ্য স্থানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পথি-মধ্যে তার এক বন্ধুকে দেখে সে উচ্চ হাস্যে চেঁচিয়ে উঠেছিল: আরে ও ভাই শুনেছ, আমার ফাঁসীর হুকুম হয়েছে'। কোনও এক আলবেনিয়ান অপরাধী

হত্যাকাণ্ডের পর এইরূপ এক উক্তি করে ছিল : হায় রে। আমার গুলির দামও উঠলো না। বেটার পকেটে মাত্র এই কয়টি মুদ্রা ছিল।' জজসাহেব তাকে বললেন : কিন্তু তুমি তো আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলে। তোমার ব্যবহার কি অনুতাপ নির্দেশক নয় ?' 'না না। 'মোটেই তা নয়। পুলিশের হাত এড়াতে মাত্র আমি ঐরূপ চেষ্টা করি।'

অপরাধীদের এই অনুতাপবিহীন ভাব ও স্থূলরূপে দৃষ্ট দাম্ভিকতা নিষ্ঠুরতা ও নৈতিক অসাড়তা উৎকট অপরাধীদের মধ্যে বিকারহীন ধৈর্য্য ও সাহস আনে। এই সাহসিকতা প্রভৃতির মধ্যে কোনও উদ্দেশ্য বা আদর্শ থাকে না। উহাতে শুধু একটি অর্থহীন অভিব্যক্তি থাকে। উত্তর কলকাতার প্রখ্যাত খুনে গুণ্ডার সম্পর্কে মৎস্থাপিত ও সম্পাদিত কলিকাতা পুলিশ জার্নালে [VOL1] নিম্নোক্ত রূপ লিখা আছে।

"৩১ জুলাই ১৯৩৭ ফাঁসীর দিন প্রত্যুষে ছয় ঘটিকায় শয্যা ত্যাগ করে খাঁদাবাবু এক শিশি সুগন্ধি এবং কিছু টাটকা ফুল চাইল। তার শেষ ইচ্ছা পুরণের জন্য ওগুলো তাকে দেওয়া হয়। সে তখন তার শ্মশ্রু ক্ষৌরবৃত করে সিল্কের পাঞ্জাবি ও ফুলের মালা পরে বললো : হাঁ এবার চলুন। আমি প্রস্তুত। খাঁদাবাবু নির্ভিক চিত্তে ও হাস্য মুখে ফাঁসীর মঞ্চে উঠে ছিল'।

এই নৈতিক অসাড়তার স্বরূপ অপরাধীদের বিবিধ উক্তি থেকে বুঝা যাবে। যথা : কোনও এক পিকপকেট জনৈক ভদ্রলোকের পকেট কেটে কিছু না পেয়ে বিরক্তির সঙ্গে বলেছিল : যেতো শালা ভিখ্ মাঙনে'ওলা আছে। পকেটে সে ওনারা কুচ্ছু রাখে না। আরে মশায় অতো কথা কি কন। পকেটে তো হাপনার কুচ্ছু লেই।' কোনও এক অপরাধীকে চাকুরী করতে বললে সে এইরূপ এক উক্তি করেছিল : চাকুরী করবি তু শালারা। হামি লোক শেয়ানা আছি। হামি লোক সে চাকরী করবে ? কোনও এক অপরাধী তার রক্ষিতার শিশু পুত্রকে আদর করে বলেছিল : এ শালে বড়ো হবে তো হামসে ভি বড়ো চোর হোবে। হা হা হা। এ সালে বে-দাগী চোর হবে।

[প্রাথমিক অপরাধীদের এরা ঘরিয়ালা ও প্রকৃত অপরাধীদের এরা শেয়ান' ব'লে। এই উভয় শ্রেণীর মধ্যবর্তী অপরাধীদের এরা লায়েকী বলে। ঘরিয়ালা'রা পরিবারবর্গের সঙ্গে বসবাস করে। শেয়ানারা পরিবারবর্গের সহিত সম্পর্ক রহিত হয়ে গহন বস্তিবাসী হয়। নবাগত'দের ওরা রংরুটিয়া

নামে অবিহিত করে। রংরুটিয়া হতে ঘরিয়ালা, ঘরিয়ালা হতে লায়েকী এবং লায়েকী হতে শেয়ানা হয়]

বিঃ দ্রঃ—দাম্ভিকতা মিশ্রিত নৈতিক অসাড়তা থাকা প্রাথমিক অপরাধীরা বহু স্ব আরোপিত উপাধিও ব্যবহার করেছে। যথা ফাটা মহিষ। মারামারিতে যার মাথা ফাটা। ছিনতাই মাধু। উনি নামি ছিন্নক চোর। টর্পেডো কালী। ইনি টর্পেডোর মত দ্রুত। বোম-বাঁধা রাধুরাম। ইনি ভালো বোমা বাঁধেন। জনৈক গুণ্ডা লাফিয়ে উঠে যুগপৎ মানুষের মাথায় তার নিরেট মাথার ঢুঁ এবং বক্ষে যুগ্ম হাঁটুর গুঁতো দিত। এই গুণের জন্য তাকে সকলে ওস্তাদ ব'লে স্বীকার করে।

কোনও এক বণিক ভদ্রলোককে পাড়ার বেশ্যা বাটি কয়টি উঠাতে সাহায্য করতে বললে উনি বলে ছিলেন: 'উহুঁ। অমন কাযও করবেন না। ছেলে পুলে হারিয়ে গেলে টপ করে খুঁজে পাওয়া যায়। শেষে ভিন্ পাড়াতে গিয়ে ওরা প্রাণ হারাবে'। কোনও এক বনেদী বাটির এক বৃদ্ধা মহিলা আমার নিকট এইরূপ বলেছিল: 'আর বাবা। সেদিন কি আমাদের আছে। আমার দাদা শ্বশুরের দশটি এবং পুজ্যপাদ শ্বশুর মশাই এর চারটি রক্ষিতা ছিল। এখন পড়তি দশায় আমার স্বামী দুজন মাত্র রাখতে পেরেছেন'। অন্য এক স্নেহময়ী বৃদ্ধা মাতাকে তার কনিষ্ঠ পুত্রের নিরাপত্তার জন্য বলতে শুনা গিয়েছিল: 'তুই বাবা ওটাকে বাড়ীর কাছে কোথাও এনে রাখ। তাহলে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরবি। আমাকেও তোর জন্যে অতো ভাবতে হবে না।'

"কোন এক বাটির দ্বিতলে একজন যুবক এবং উহার ত্রিতলে অন্য এক ভদ্রলোক বাস করতেন। এঁরা উভয়েই রাত্রি যোগে স্ব স্ব ফ্ল্যাটে স্ত্রীলোক আমদানি করতেন। ব্যাপারটি পাড়াতে প্রকাশ পেলে পড়শীরা ঈর্ষান্বিত ও ক্রোধান্বিত হয়ে পুলিশে নালিশ জানালো। এই সম্বন্ধে ত্রিতলের ঐ ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসাবাদ করলে উনি কেঁদে ফেলে বলেছিলেন—'ছিঃ ছিঃ। এ কি কথা। আমি পান সিগারেট ও চা'ও ব্যাবহার করি না। স্ত্রীলোক তো দূরের কথা। আমার স্ত্রী জানলে আত্মহত্যা করবেন। পিতা এ'কথা শুনলে আমাকে ত্যাজ্য পুত্র করবেন। [এঁর মধ্যে নৈতিক অসাড়তা আসে নি।] কিন্তু এ' সম্বন্ধে দ্বিতলের ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলে তিনি এইরূপ উক্তি করে ছিলেন: 'এ্যা। তাই না' কি বেশ বেশ। তাহলে দয়া করে এটা সংবাদ-পত্রে ছাপিয়ে দিন। তাহলে কষ্ট করে ওদেরকে আর আমাকে খুঁজে আনতে হয় না। এরূপ

একজন মক্কেল এখানে আছে জানলে ওরা নিজেরাই আমার কক্ষে আসবে।

[ত্নুয়ার বন্ধ করে অন্যের অসাক্ষাতে কে কি করছে বা না করছে তা নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার হওয়ায় ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপে আইনতঃ অপারক পুলিশের এতে কিছু করবার না থাকলেও তারা জেনেছিল যে উভয়েই একই পথের পথিক।]

"কোনও এক অসৎ শ্রমিক ব্ল্যাক মেইলিঙ' এর উদ্দেশ্যে কোনও এক ফ্যাক্টরীর ছোট লেবার অফিসরের নামে মিথ্যা করে অভিযোগ এনেছিল এই বলে যে, একটি চাকুরী পাবার আশায় সে তার স্ত্রী ও ভগ্নীকে তাঁর কোয়াটারে তিন দিন এনেছিল এবং ঐ ছোট লেবার অফিসার তাঁর স্ত্রী ও ভগ্নীকে তিনদিন উপভোগ করেছে। কিন্তু তা সত্বেও উনি তাকে কোনও চাকুরী দেন নি। এই অভিযোগ অবগত হওয়া মাত্র ঐ অকৃতদার ছোট লেবার অফিসর ভয়ে লজ্জায় ও অপমানে হতমান হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ঐ ফ্যাক্টরীর বিপত্নীক বড় লেবার অফিসর ঐ সব কাহিনী শুনে তদন্তকারী অফিসরকে নিঃসঙ্কোচে বলে ছিলেন: 'আজ্ঞে। আপনারা ভুল করেছেন। অপকর্ম্মটি উনি করেন নি। ঐ অপকর্ম্ম আমি করেছি। কিন্তু ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমারও পাল্টা অভিযোগ আছে। আমার নিকট থেকে ত্নুইশত টাকা গ্রহণ করে ঐ ব্যক্তি তাঁর [প্রাপ্ত বয়স্ক] স্ত্রী ও ভগ্নীকে আমার কক্ষে তিনমাস আনতে প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু উনি ওদেরকে মাত্র তিনদিন এনে আর আনেন নি। এই ভাবে উনি পাপ ব্যবসায়ের সহিত প্রবঞ্চনা অপরাধ করেছেন।"

নৈতিক অসাড়তা ত্নুই প্রকারের হয়ে থাকে, যথা যৌনজ ও অ-যৌনজ। উপরে যৌনজ নৈতিক অসাড়তা সম্বন্ধে বলা হয়েছে। এইবার অ-যৌনজ নৈতিক অসাড়তা সম্বন্ধে বলবো। নিম্নের অনুচ্ছেদে এই সম্বন্ধে কয়েকটি উদাহরণ উদ্ধৃত করলাম।

অষ্ট্রেলিয়ার কোন এক কয়েদখানায় জনৈক অপরাধী তার সাথী অপরাধীকে তাম্বুল দিতে অস্বীকৃত হলে অন্য অপরাধীটি অকুস্থলেই তাকে হত্যা করে তার মুখ হতে তাম্বুল নির্গত করে তা সে নিজের মুখে পুরে চিবতে থাকে।"

"ভারতের মধ্য প্রদেশের' জনৈক আদিবাসী আকস্মিক যৌন তাড়নায় উহা চরিতার্থ করতে তার স্ত্রীকে ডাকাডাকি করে। কিন্তু তার স্ত্রী তখুনি তার কাছে না আসাতে সে ক্ষিপ্ত হয়ে তার স্ত্রীর মুণ্ডচ্ছেদ করে। এরপর সে ঐ মুণ্ড

হাতে থানায় এসে আত্মসমর্পণ করে বলেছিল : সার! জরুরত'মে না মিলে তো ইয়ে জেনানে মে ক্যা হোগী।"

"কোনও এক অসভ্য মাওয়ারী নেতা এইরূপ এক উক্তি করেছিল : আমি যদি পথিমধ্যে কোনও এক ব্যক্তিকে বর্শা বিদ্ধ করি তাহলে আমার এই কার্য্যকে বলবো 'হত্যা'। কিন্তু তাকে স্বগৃহে আমন্ত্রণ করে নিহত করলে ঐরূপ 'খুন' হবে অপরাধ। এক্ষেত্রে ঐ অসভ্য লোক প্রকৃত অপরাধীদের মত বিশ্বাসঘাতকতাকে অপরাধ মনে করেছে। তাই আমি বলেছি যে আদি মানবের কিছু মতবাদ আজও অনগ্রসর মানব গোষ্ঠির মধ্যে দেখা গিয়ে থাকে।

[এই বিশেষ ক্ষেত্রে মাওয়ারী নেতাটির মধ্যে নৈতিক অসাড়তা কম মাত্রায় দেখা গিয়েছে। কারণ, এইরূপ উক্তির মধ্যে কিছুটা সৎপ্রেরণা প্রসূত যুক্তি ও আদর্শ আছে। আদিম সমাজ থেকে অসভ্য সমাজ এবং অসভ্য থেকে সভ্য সমাজের উঠতি পথে মানুষ এরূপভাবে চিন্তা করে। তদনুরূপ —যুদ্ধের সময়ে পরদেশ লুণ্ঠন ও পরদেশীয়দের নিহত করার মধ্যে আধুনিক সভ্য জাতিরাও কোনও রূপ অন্যায় বুঝে না। (f) কারণ, সাময়িকভাবে ঐ সময়ে এদের মধ্যে নৈতিক অসাড়তা সৃষ্ট হওয়া অসম্ভব নয়। অন্যায় কার্য্যের মধ্যে আদর্শ মিশ্রিত থাকলে উহাকে দোষ না ব'লে ভুল বলা হয়।

য়ুরোপে বিপক্ষীয় সেনাপতির উপ-পত্নী রূপে বহু দেশ প্রেমিকা নারী গোপন সংবাদ সংগ্রহ করেছে। এদেরকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা নিন্দা না করে সুখ্যাতি করেছে। কিন্তু চোরের স্ত্রী পতির আদেশে ধনীর বাটিতে ঝি'রূপে প্রবেশ করে সেই ধনী ব্যক্তির পুত্রের সহিত ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়ে স্বামীর অপকার্য্যের সহায়তার জন্যে গোপনে তথ্যাদি সংগ্রহ করলে তাকে কেউ সুখ্যাতি করে নি।

বহু ক্ষেত্রে সৎপ্রেরণা ধীরে ধীরে অপকার্য্যের মধ্যে সম্প্রসারিত হয়ে উহাকে পুরাপুরি গ্রাস করেছে। বহু ডাকাত দল তাদের অপহরণের বাড়তি ধন দান-ধ্যানে ব্যয় করেছে। পরবর্ত্তী কালে এদের কেউ কেউ প্রজাপালক জমিদার বা রাজা রূপে সুনাম অর্জ্জনও করেছে।

হাইকোর্টে সাক্ষ্যদান কালে জুরীদের সন্দেহ এড়াতে জনৈক পুলিশ কর্ম্মী সর্ব্বসমক্ষে বলেছিল—'আজ্ঞে। হ্যাঁ। অমুক বাবু তার জবানবন্দী প্রথম

(f) রাষ্ট্রীয় নির্দেশে পরদেশ আক্রমণকারী সৈন্যরা উৎপীড়ক না হলে অপরাধী নয়। কিন্তু ঐ কার্য্যের জন্য রাষ্ট্রীয় নেতারা অন্তর্জাতিক অপরাধী হয়ে থাকে।

নেন। কিন্তু ওই সব কথা তখন ঐ নারী তার বিবৃতিতে বলে নি। কিন্তু আমি পরে তার উপপতি রূপে তার কক্ষে যাওয়ায় সে আমার কাছে ঐ সব বিষয়ে বলেছিল। এই ভাবে লজ্জা সরম হীন সাক্ষ্য দ্বারা ঐ প্রবীণ অফিসর মামলাটি বিশ্বাসযোগ্য করেছিলেন।

উপরোক্ত নৈতিক অসাড়তা হতে উদ্ভূত লজ্জা সরম ও অনুতাপের অভাবে মানুষ যে কোনও দুষ্কার্য্য করতে সক্ষম হয়। কারও আত্মসম্মান জ্ঞান না থাকলে সে অন্যের সম্মান রক্ষা করতে পারে না। বহু উর্দ্ধতন অফিসর অধীনদের আত্মসম্মান জ্ঞান নষ্ট করে তাদেরকে অপরাধীতে পরিণত করেছেন। জনৈক ব্যক্তির নিম্নোক্ত একটি বিবৃতি থেকে বক্তব্য বিষয় বুঝা যাবে।

"বড় সাহেব অন্যায় ভাবে বিনা দোষে তরুণ অফিসারকে সর্বসমক্ষে গালি দিলে ও অপমান করলে উনি ক্ষোভে ও অপমানে একটি ইস্তফাপত্র লিখলেন। তাতে প্রবীণ ইন-চার্জ অফসরগণ তাকে সান্তনা দিতে ও বুঝাতে লাগলেন। 'আরে। এইটুকুতে কেন, এতো উতলা হোয়েন', জনৈক প্রবীণ হিন্দি ভাষী অফিসর তাঁকে বললেন, 'চলিয়ে। থানামে লোটকে দশটো নীচে ওয়ালে আউর বিশটো পাবলিক'কো হাম লোক ভী গালি দেয়েঙ্গী। উসমে নিদভী আয়েঙ্গি আউর দিলভি হাল্কা হোগী। দশটো গালি মিলা। হাম লোক বিশটো গালি দেগা। উসমে দশটো গালি ফাউ ইয়ে নাফা'। "আরে! শব্দ হচ্ছে ব্রহ্ম। ওর কোনও অর্থ নেই। দেশে দেশে একই শব্দর বিভিন্ন অর্থ হয়। এখানে ড্যাম মানে গালাগালি হলেও জাপানে তদর্থে লোকে গোলাপ ফুল বুঝে', জনৈক প্রবীণ বাঙালী ইন-চার্জ বাবু তাকে শান্ত করতে সস্নেহে তার পিঠ চাপড়ে বললেন, 'অতএব ঐ সকল কটু উক্তিকে শব্দ বুঝে যে কোনও একটা মানে করো। বাঘ ডাকে গরু ডাকে ঘোড়া ডাকে। তেমনি বড় সাহেবও ডাকলো। ওটাও একপ্রকার ডাক। ছোট বেলায় বাবা বকলে আমি মনে করতাম যে ষাঁড় ডাকছে,"(*)

এই নৈতিক ও দৈহিক অসাড়তা প্রাথমিক অপরাধীদের মধ্যে কম থাকে। কিন্তু ঐ গুলি প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে বেশী থাকে। পারস্পরিক তুলনায়

(f) ওই ভদ্রলোকের মতে একজনের কটু উক্তি না শুনতে পেরে চাকুরী ছেড়ে বাইরে এলে দেখা যায় যে তাকে বহু ব্যক্তির কটু উক্তি শুনতে হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে মনে হবে একজনের কটু উক্তি শুনাই শ্রেয় ছিল।

ওগুলি অভ্যাস অপরাধীদের মধ্যে কম মাত্রায়, মধ্যম-অপরাধীদের মধ্যে মধ্য মাত্রায় এবং স্বভাব-অপরাধীদের মধ্যে বেশী মাত্রায় থাকে।

দৈহিক অসাড়তা ও নৈতিক অসাড়তা উৎকট অপরাধীদের মধ্যে সমান্তরালে তথা প্যারালাল ভাবে থাকে। এমন বুঝা যায় যে উভয়ের মধ্যে কম বেশী সামঞ্জস্য আছে।

[দেহ অসুস্থ হলে মন অসুস্থ হয়। মন অসুস্থ হলে দেহ অসুস্থ হয়। ভয়ের কারণে দেহে চাঞ্চল্য এলে রক্ত দ্রুত বাহিত হয় ও বক্ষ দুরু দুরু করে। কিন্তু ভয়ের কারণ না থাকলেও দেহে উপরোক্ত চাঞ্চল্য এলে লোকের ভয় ভয় বোধ আসে। একে মনোবিজ্ঞানীরা প্যারালাল থিওরী তথা সমান্তরাল মতবাদ বলে। আমার মতে কোনও প্রদমিত ভয় বা উহার আশঙ্কা মনোপরি এলে ঐ রূপ হয়ে থাকে।]

বিঃ দ্রঃ—কষ্ট বোধ-হীনতা ও কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা এক বস্তু নয়। প্রথমটি অপস্পৃহার এবং দ্বিতীয়টি মনের সৎপ্রেরণার সঙ্গে সংযুক্ত। [সাধকরা কষ্ট সহিষ্ণু হন] কারণ, প্রথমটি দেহের ও দ্বিতীয়টি মনের সহিত সংযুক্ত।

বহু গৃহী ও ভোগী সাধক কৈফিয়ৎ স্বরূপ বলেন যে ভোগের মধ্যেই ত্যাগ। [ত্যক্তেন ভুঞ্জতে] যারা ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ বলেন তাদের কিন্তু ঐ ঋণ শোধ করার ক্ষমতা থাকে না। এই সব শাস্ত্রবাক্যের বিকৃত ব্যাখ্যা নৈতিক অসাড়তার পরিচায়ক।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

॥ অপরাধী ॥

কেউ কেউ মনে করেন যে অপরাধীদের শ্রেণী বিভাগ সম্ভব নয়। এরা ভুলে যান যে একটি মাত্র কারণে প্রত্যেক অপরাধী সৃষ্ট হয় নি। ওদের উদ্ভবের বিভিন্ন কারণ বিবেচনা করে ওদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করতে হবে। এদের চিকিৎসার জন্য উহার প্রয়োজন আছে। কারণ—এক এক অপরাধীদের শ্রেণী ও উপশ্রেণী ভেদে ওদের চিকিৎসা পদ্ধতিও বিভিন্ন হতে বাধ্য।

[সর্পদংশনের নিরাময়ের নিশ্চিৎ ঔষধ এখনও অনাবিষ্কৃত। কারণ এক এক শ্রেণীর সর্পের বিষ এক এক প্রকার হয়েছে। গোখুরার বিষের ঔষধ কেউটের বিষের ঔষধ হতে পৃথক হতে বাধ্য। পৃথিবীতে এমনি বহু প্রকার সর্পের বহু প্রকার বিষ আছে।]

হোরাইজেনটাল তথা আড়াআড়ি বিভাগের মত ওদের লম্বালম্বি তথা ভার্টিক্যাল বিভাগও আছে। 'অভ্যাস অপরাধী, মধ্যম অপরাধী, স্বভাব অপরাধী' ওদের আড়া-আড়ি বিভাগ এবং শোনিতাত্মক, সাম্পত্তিক, শোণিত সাম্পত্তিক প্রভৃতি ওদের লম্বা-লম্বি বিভাগ। অপরাধীদের প্রধান বিভাগগুলি আড়া আড়ি বিভাগ রূপে সৃষ্ট। কিন্তু ওদের উপ-শ্রেণীগুলি লম্বা লম্বি বিভাগ রূপে সৃষ্ট। বর্তমান পরিচ্ছেদে ওদের আড়া-আড়ি বিভাগ এবং পরবর্তী পরিচ্ছেদে ওদের লম্বালম্বি বিভাগ বিবৃত করা হবে।

বিঃ দ্রঃ—অপস্পৃহার উৎপত্তির কারণের উপর অপরাধীদের মূল বিভাগটি করা হয়। ওদের এই উৎপত্তির মূল কারণ ও অপস্পৃহার পরিমাণ মত ওদের ব্যবহারেরও তারতম্য ঘটে। কিন্তু ওদের মূল অপস্পৃহাও দুই ভাগে বিভক্ত। যথা—শোণিত স্পৃহা ও দ্রব্য স্পৃহা। এই দুইটির একটি বা অপরটিকে গ্রহণ করে ওরা বিভিন্ন উপশ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছে। তাই ওদের মূল বিভাগোক্ত স্বভাব, মধ্যম ও অভ্যাস অপরাধীদের প্রত্যেকে শোণিতাত্মক এবং দ্রব্যাত্মক তথা সাম্পত্তিক উপশ্রেণীর অপরাধীতে বিভক্ত। এই সম্বন্ধে ওদের 'উপশ্রেণী' শীর্ষক পরিচ্ছেদে বিশদ ব্যাখ্যা করা হবে।

উপরোক্ত মূল বিভাগীয় এবং তদধীন উপশ্রেণীর অপরাধীদের ব্যবহার ও চরিত্রাদি থেকে ওরা কোন মূল বিভাগের কিংবা ওরা কোন উপশ্রেণীর অপরাধী তা বুঝা যায়। ওদের ব্যবহারাদির বিবরণ পৃথক পৃথক রূপে মূল পুস্তকে বলা হয়েছে। এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ তদসম্পর্কিত কয়েকটি তথ্য-গত বিষয় মাত্র উদ্ধৃত করবো।

"স্বভাব অপরাধীরা আদি মানব মনোভাবাপন্ন হওয়াতে ওদের মধ্যে ঔৎসুক্যের অভাব সুস্পষ্ট। ঋগবেদের সময়কার সিঁদকাটি তাদের আজও পছন্দ। এই সিঁধকাটিকে উহারা পূজা পর্য্যন্ত করে। এরা রক্ষণশীল ও সংস্কারাদিতে বিশ্বাসী হয়। কিন্তু অভ্যাস—অপরাধীরা 'স্বভাব অপরাধীদের' মত সাধারণ তথা সিম্পল ভাঙন যন্ত্রের স্থলে জটিল তথা কমপ্লেকস যন্ত্রপাতি ব্যবহারে অভ্যস্ত। এরা নূতন নূতন ব্যবস্থা তথা কায়দা কানুন অবস্থা ভেদে গ্রহণ করে থাকে।"

ওদের একদল ইনষ্টিঙ্ক্‌ট তথা প্রেরণা দ্বারা পরিচালিত এবং ওদের অন্য শ্রেণী বুদ্ধিবৃত্তি তথা ইনটেলিজেন্সের উপর অধিক নির্ভরশীল।

শোনিতাত্বক অপরাধীরা ডিঙি মেরে তথা পদাগ্রের উপর ভর দিয়ে পরিক্রমণ করে। এরা উল্কা চিহ্নাদি দেহের প্রকাশ্য স্থানে ধারণ করে। কিন্তু সম্পত্তিক অপরাধীরা পায়ের গোড়ালির উপর ভর দিয়ে পরিক্রমণ করে। এরা উল্কাচিহ্নাদি দেহের গোপন স্থলে ধারণ করে। স্বভাব-অপরাধীরা স্বভাব বেশ্যাদের এবং অভ্যাস-অপরাধীরা অভ্যাস বেশ্যাদের সঙ্গে বসবাস করে। অভ্যাস-অপরাধীদের কষ্টরোধ স্বভাব-অপরাধীর তুলনায় কিছুটা বেশী থাকে।

প্রথমে অপরাধীদের মূল বিভাগগুলির বিষয় পৃথক পৃথক রূপে আলোচনা করবো। তৎপর উহাদের উপশ্রেণীগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে। নিম্নে অপরাধীদের মূল বিভাগগুলি সম্বন্ধে বিবৃত করা হলো।

যারা অপরাধ করে তাদেরকে অপরাধী বলা হয়। অপস্পৃহার পরিমাণ ও উহার গুণাগুণ এবং ওদের উৎপত্তির হেতুমত অপরাধীরা বহু শ্রেণী ও উপশ্রেণীতে বিভক্ত। নিম্নোক্ত তালিকাটি থেকে বক্তব্য বিষয় বুঝা যাবে।
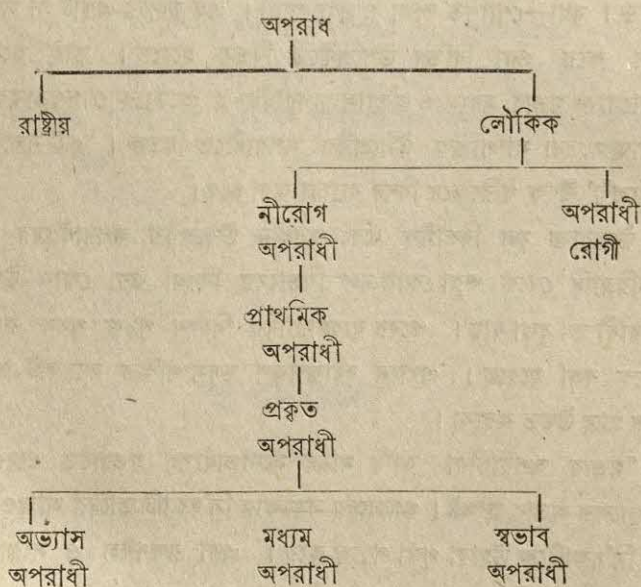
[এখানে রাষ্ট্রীয় অপরাধী এবং দৈব অপরাধীদের এই তালিকা থেকে বাদ দিয়েছি। স্বার্থত্যাগী প্রকৃত রাজনৈতিক অপরাধীদের মধ্যে আদর্শ থাকায়

উহারা বৈজ্ঞানিক অপরাধী নয়। রাষ্ট্র কর্তৃক ফাঁসী আদি বৈধ হত্যাও অপরাধ হয় না।

কণ্ট্রোল আইন আদি বহু রাষ্ট্রীয় আইন তৈরী হয়। নিজেদের অক্ষমতা ও দুর্বলতা ঢাকতে এরূপ বহু আইন শাসকরা তৈরী করেন। ওর দ্বারা রাষ্ট্র নূতন আইন লঙ্ঘনকারী সৃষ্ট করে মানুষের অন্তর্নিহিত অপস্পৃহাকে সঞ্জাত করেছেন। এতে পরবর্ত্তীকালে তারা লৌকিক অপরাধসমূহ করতেও প্ররোচিত হয়েছে। অন্য গভর্মেণ্ট এলে ওইগুলি ভুল বা অন্যায় ব'লে তারা বাতিল করেছেন। এই গুলি আরোপ করে কিছু ক্ষেত্রে গভর্মেণ্ট নিজেই অন্যায়ী বিবেচিত হন। (f) রাষ্ট্রীয় অপরাধ সমূহ প্রতিটি ক্ষেত্রে গুরুতর সহ্যাতীত অসামাজিক ও সর্বজনগ্রাহ্য হয় না। দ্যূত ক্রীড়া এবং আবগারী অপরাধ সমূহও বিজ্ঞান সম্মতরূপে অপরাধ কিনা তা বিবেচ্য। কারণ এই সবে অর্থের প্রয়োজনে ওরা লৌকিক অপরাধও করবে। তবে অতি মুনাফাখোরগণ শুধু রাষ্ট্র বিধির বিরুদ্ধে অপরাধ করে না, উহারা ক্ষেত্র বিশেষে সহ্যাতীতরূপে সমাজের বিরুদ্ধেও অপরাধী। আপন স্বার্থ রক্ষার অধিকার মানুষ মাত্রেরই আছে। কিন্তু তার জন্যে সে অপরের স্বার্থের হানি করতে পারে না। উহাতে অপরের স্বার্থও সমভাবে রক্ষিত না হলে অবশ্য তারা অপরাধী।

দৈব তথা আকস্মিক অর্থাৎ চান্সড তথা অকেশানাল ক্রিমিন্যালদের উক্ত তালিকা থেকে অন্য কারণে বাদ দেওয়া হয়েছে। দৈব দুর্বিপাকে পড়ে বা ক্ষুধার জ্বালায় অতিষ্ট হয়ে দৈবাৎ অপরাধ করলেও তারা তজ্জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত থাকলে তারা বৈজ্ঞানিক অপরাধী নয়। জীবনে হয়তো তারা আর একটিবারও অনুরূপভাবে কোনও অপরাধ করবে না। লোভে ও অভাবে অভ্যাস দ্বারা দৈব-অপরাধীরা অভ্যাস-অপরাধীতে পরিণত হতে পারে। এই দৈব-অপরাধীরা অভ্যাস-অপরাধীদের প্রথম ধাপ। তবু উক্ত তালিকায় ওদের বাদ দিয়ে মাত্র অভ্যাস-অপরাধীদের তালিকায় রাখা হয়েছে।]

(f) চাউল পাচার বন্ধ করতে যত অর্থ খরচ হয় তার চাইতে কম ব্যয়ে চাউল উৎপাদন করা সম্ভব। ঐ ভাবে ঘাটতি নিবারণে পাচারকারী ও পুলিশকে অযথা দূর্নীতিগ্রস্থ হওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়।

উপরোক্ত তালিকাতে পরিদৃষ্ট প্রত্যেক অপরাধী [—গোষ্টি]'কেই যথাক্রমে দুইটি পর্য্যায়ের মধ্য দিয়ে এগুতে হয়েছে। যথা: প্রাথমিক অপরাধী এবং প্রকৃত অপরাধী। ব্যক্তিত্বের পরিবর্ত্তন হলে প্রাথমিক অপরাধীরা প্রকৃত তথা শেষ পর্য্যায়ের অপরাধীতে রূপান্তরিত হয়েছে। অর্থাৎ—ওরা সকলেই প্রথমে প্রাথমিক অপরাধী হয় এবং পরে ওদের কেউ কেউ পূর্ব্বোক্ত কারণে প্রকৃত অপরাধী হয়।

(১) অভ্যাস অপরাধীদের ক্ষেত্রে তাদের প্রাথমিক পর্য্যায় থেকে তাদের শেষ পর্য্যায়ে [প্রকৃত অপরাধী] পৌছুতে হলে যত সময় লাগে তার চাইতে কম সময়ে একজন মধ্যম অপরাধী তার প্রথম পর্য্যায় থেকে তার শেষ পর্য্যায়ে পৌছুবে। এই মধ্যম অপরাধী তার প্রথম পর্য্যায় থেকে শেষ পর্য্যায়ে আসতে যতো সময় নেবে, তার চাইতে বহু কম সময়ে একজন স্বভাব অপরাধী তার প্রথম পর্য্যায় থেকে শেষ পর্য্যায়ে পৌছিয়ে থাকে।

(২) অভ্যাস-অপরাধীদের অপরাধ স্পৃহাকে প্রদমিত করতে যতো প্রতিরোধ শক্তির প্রয়োজন মধ্যম অপরাধীদের অপস্পৃহাকে প্রদমন করতে তার চাইতে বেশী প্রতিরোধ শক্তির প্রয়োজন হয়ে থাকে। মধ্যম অপরাধীদের অপরাধ স্পৃহা প্রদমিত করতে যতো প্রতিরোধ-শক্তির [Resistence power] প্রয়োজন হয়, তার চাইতে বেশী প্রতিরোধ শক্তি স্বভাব-অপরাধীদের অপরাধ স্পৃহাকে প্রদমন করতে প্রয়োজন হবে।

এই ত্রয়ীশ্রেণী অপরাধীদের মধ্যে অপরাধ স্পৃহা পারস্পরিক তুলনায় কম মাত্রায়, মধ্য মাত্রায় এবং বেশী মাত্রাতে থাকায় ওদের অপরাধ স্পৃহা প্রদম-নার্থে কম বেশী প্রতিরোধ শক্তির প্রয়োজন হয়ে থাকে। এই তিন শ্রেণীর অপরাধীদের চিকিৎসা দ্বারা নিরাময়ার্থেও ওইরূপ কম বেশী প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়।

বিঃ দ্রঃ—প্রাথমিক পর্য্যায়ে থাকাকালে এই অপরাধীদের স্বভাব চরিত্র স্বাভাবিক মানুষদের মত থাকে। এ'সময়ে তারা গৃহস্থদের সহিত গার্হস্থ্য জীবনও যাপন করে থাকে। কিন্তু পুনঃ পুনঃ অপরাধ স্পৃহা জাত ও আগত হওয়ায় প্রকৃত অপরাধীদের ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের পরিবর্ত্তন ঘটেছে। সেই অবস্থায় তারা আদিম মানুষ সুলভ স্বভাব চরিত্রের অধিকারী হয়। তখন তারা জনগণের সহিত বসবাস না করে নিম্নশ্রেণীর বেশ্যাদের সহিত পঙ্কিল বস্তীবাসী হয়ে থাকে। এদের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত দৈহিক ও নৈতিক অসাড়তা অত্যধিকরূপে দেখা গিয়েছে।

প্রাথমিক অপরাধীরা বর্ণ চোরা আমের মত সভ্য মানুষদের সহিত বাস করাতে এদের চিনে আত্মরক্ষা করা দুষ্কর হয়। কিন্তু প্রকৃত অপরাধীরা সমাজের মধ্যে পৃথক সমাজ স্থাপন করে গহন বস্তিবাসী হওয়াতে ওদের চিনে আত্মরক্ষা করা সম্ভব। ডাকাতাদি অপরাধী এবং প্রবঞ্চকাদিরা প্রায়ই প্রাথমিক অপরাধী। সিঁদেল চোর ও পকেটমারীদের অধিকাংশ ব্যক্তি প্রকৃত অপরাধী হয়।

বিঃ দ্রঃ—এখানে উল্লেখ্য এই যে, অধিকাংশ অপরাধী সারা জীবন তাদের প্রাথমিক অপরাধীতেই রয়ে গিয়েছে। তাদের স্বভাব চরিত্র কম বেশী সাধারণ নিরপরাধী মানুষদের মত থেকে গিয়েছে। ওরা শেষ পর্য্যায়ের অপরাধীতে কোনও সময়েতে উপনীত হয় নি। কেবল মাত্র ওদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি ব্যক্তিত্বের পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে প্রাথমিক পর্য্যায় হতে শেষ পর্য্যায়ের প্রকৃত অপরাধী হতে পেরেছে।

এই প্রকৃত অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত অভ্যাস-অপরাধীদেরই সংখ্যা বেশী। কিন্তু উহার অন্তর্ভুক্ত স্বভাব-অপরাধীদের সংখ্যা অতি নগণ্য। উগ্র স্বভাব-অপরাধীরা সচরাচর কারও চক্ষে পড়ে না। অবশ্য—ওদের চিনে ওদের বার করাও একটি কঠিন কার্য্য।

অপরাধ স্পৃহার কম বেশী ক্রম মত প্রাথমিক তথা প্রথম পর্য্যায়ের ও শেষ পর্য্যায়ের [তথা প্রকৃত] অপরাধীদের মধ্যবর্ত্তী কিছু প্রকার মধ্যবর্ত্তী অপরাধীও স্বভাবতঃই থাকবে।

বিঃ দ্রঃ—প্রাথমিক অপরাধীদের অপকর্ম সমূহে বহুমুখীতা [ভারসেটাইল] দেখা যায়। তাদের অপকর্মের মধ্যে প্রায়ই বহুপ্রকার বৈচিত্র্য দেখা গিয়েছে। তাই এরা অপকর্মের এক পদ্ধতি ত্যাগ করে অন্য এক পদ্ধতি গ্রহণ করে। এজন্য অনভ্যাসের জন্য তারা প্রায়ই ধরাও পড়ে। নারী ও পুরুষ উভয়েই প্রাথমিক অপরাধী হতে পারে। এরা সুযোগ মত সাম্পত্তিক এবং শোণিতাত্মক উভয় প্রকার অপরাধই করে থাকে। স্বল্প সংখ্যক প্রাথমিক অপরাধী তাদের প্রাথমিক পর্যায় হতে শেষ পর্যায়ের প্রকৃত অপরাধী হয়েছে। এদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন কখনও ঘটে নি।

প্রকৃত অপরাধী তথা শেষ পর্যায়ের অপরাধীরা অপকর্ম্মে একীমুখীতার [স্পেশিয়ালিজেসন] পক্ষপাতী। অপকর্মসমূহে এরা একই প্রকার কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করে থাকে। এদের মধ্যে যারা পকেট মারে, তারা কদাচ তালা ভাঙ্গে না। এদের নৈতিক ও দৈহিক অসাড়তা চরম অবস্থায় পৌছিয়ে থাকে।

এদের মধ্যে স্থকুমার বৃত্তিগুলি বিলুপ্ত হয়। প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে সাম্পতিক এবং শোনিতাত্মক তথা ব্যক্তি ও দ্রব্যের বিরুদ্ধে অপরাধীরা পৃথক হয়। নারীরা সাধারণতঃ প্রকৃত অপরাধী হয় না। সেই স্থলে তারা বেশ্যা হয়েছে।

[প্রাথমিক অপরাধী হতে প্রকৃত অপরাধী হওয়া কালে এরা ধীরে ধীরে ও ধাপে ধাপে এগিয়ে যায়। এই জন্য এই উভয় অপরাধীর মধ্যবর্ত্তী এমন বহু অপরাধী আমরা দেখি, যাদের মধ্যে এই উভয় শ্রেণীর অপরাধীর স্বভাব চরিত্র কম বেশী মিশ্র ভাবে প্রকাশ পায়। প্রথম অবস্থা থেকে এরা শেষ অবস্থায় কতোটা এগুলো তা এদের বিভিন্ন স্বভাব চরিত্র হতে বুঝা যায়।]

অভ্যাস-অপরাধী, মধ্যম-অপরাধী এবং স্বভাব-অপরাধী নির্ব্বিশেষে অপরাধীদের প্রাথমিক পর্যায় থেকে প্রকৃত অপরাধী হওয়া কালে কিরূপ ভাবে ধীরে ধীরে ওদের ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ঘটে তা অনুধাবন করার আমার যথেষ্ট স্থযোগ হয়েছিল।

পাঠ্য অবস্থায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডঃ গিরীন্দ্র শেখর বস্থর নিকট আমি এ্যবনরম্যাল সাইকোলোজীতে গবেষণা রত ছিলাম। তৎপর ১৯৩১ সনে পুলিশ বিভাগে প্রবেশের পর আমি প্রায় চল্লিশ জন জুভেনাইল অপরাধীকে জুভেনাইল কোর্টের আটক-ঘরে পরীক্ষা করি। এই সময় তাদের স্বভাব চরিত্র প্রায় স্বাভাবিক মানুষের মত দেখি। এদের কয়েকজনের আমি স্পর্শ, কষ্ট, উষ্ণতা ও শৈত্য বোধ এবং প্রতিক্রিয়া কাল সম্বন্ধে পরীক্ষা করি। এর পর থেকে বহু কাল আমি লক্ষ্য রাখি যে এদের মধ্যে কতজন অপরাধ জীবন অব্যাহত রেখেছে। এদের মধ্যে কেউ ধরা পড়লে সরকারী টিপ-ঘরে কর্মরত জনৈক বন্ধু তা আমাকে জানাতো।

এদের কয়েক জনের উপর দৈহিক ও মানসিক পরীক্ষা প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর করার আমার স্থযোগ ঘটে। ঐ সময়ের মধ্যে বারে বারে ধরা পড়ে এরা জেল খেটেছে। প্রথম দশ বৎসর যাবৎ তাদেরকে আমি সভ্য সমাজে বসবাস করতে দেখেছি। ঐ সময়ের মধ্যে বহুবার এদেরকে পরীক্ষা করলেও এদের মধ্যে খুব বেশী ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন পরিদৃষ্ট হয় নি। কিন্তু চৌদ্দ বৎসর পরে ওদেরকে আমি সভ্য সমাজ ত্যাগ করে অধম বেশ্যা নারীদের সঙ্গে পঙ্কিল বস্তিতে বাস করতে দেখি। ঐ সময় এদের সহিত কথোপকথনে একটুও স্থকুমার বৃত্তি দেখা যায় না। এদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হেতু

বহু স্নায়বিক ও মানসিক পরিবর্ত্তন দেখা যায়। মনোবিজ্ঞানের বীক্ষণাগারে এনে ওদের ওপর দৈহিক ও মানসিক পরীক্ষা করে বুঝি যে কালক্রমে এরা প্রাথমিক অপরাধী থেকে প্রকৃত [শেষ পর্যায়ের] অপরাধীতে পরিণত হয়েছে।

"জনৈক যুবক চুরির মামলায় আমাদের থানায় ধরা পড়ে। ঐটি তার দ্বিতীয় বারের অপরাধ ছিল। এই সময় ঐ ভদ্র ঘরের যুবক অভাবের তাড়নায় ঐ কার্য করেছে বলে এবং আমার সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করে। এই সময় তাকে আমি দেশের বহু বিষয়ে আগ্রহী দেখি। এর কয় বছর পর এই যুবক পুনরায় ঐ অপরাধে আমার থানাতেই ধরা পড়লো। এই সময় আমাকে তদন্তকারী অফিসর রূপে দেখে সে অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছিল। কিন্তু এরও বারো বছর পরে তাকে অন্য এক থানার হাজতে দেখে ডাকি। তার মলিন পরিচ্ছদ ও কদর্য চেহারা দেখে আমি অবাক হই। সে আমাকে একটুও চিনতে পারল না এবং কদর্য ভঙ্গীতে গালাগালি করলো। তদন্তকারী কর্মীর নিকট থেকে জানা গেল যে ঐ অপরাধী এক্ষণে গৃহত্যাগী ও পঙ্কিল বস্তিবাসী হয়েছে।"

প্রাথমিক অপরাধীদের ইংরাজীতে প্রাইমারী ক্রিমিন্যাল এবং প্রকৃত-অপরাধীদের ইংরাজীতে হার্ডেণ্ড তথা 'লাষ্ট ষ্টেজ' ক্রিমিন্যাল বলা হয়। অপরাধীদের এইরূপ দুইটি শ্রেণীতে বিভাগ আমার নিজস্ব গবেষণা লব্ধ আবিষ্কার।

আমি অপরাধীদের সুদূর প্রসারিত ভাবে শ্রেণী ও উপশ্রেণীতে বিভক্ত করেছি। ওদেরকে এই রূপ শ্রেণীতে ও উপশ্রেণীতে বিভক্ত না করার জন্য ওদের কোনও সুচিন্তিত চিকিৎসাপদ্ধতি আবিষ্কার আজও সম্ভব হয় নি। এই অপরাধ বিভাগের উপর নির্ভর করে আমি ওদের বিভিন্ন রূপ চিকিৎসা পদ্ধতিও নিরূপণ করেছি।

এই অপরাধীদের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমি এখনও বহু বিষয়ে গবেষণা রত আছি। ওদের স্নায়বিক ক্ষয় ক্ষতি [Degeneration] বৃদ্ধি-রুকাব তথা এ্যারেষ্টেড গ্রোথ এবং মস্তিষ্কের লঘু ও গুরু প্রবাহ তথা সর্ট ওয়েভ ও লঙ ওয়েভ, মস্তিষ্কের বিবিধ কেন্দ্রজাত [ইচ্ছাসম্ভূত] বিদ্যুৎ প্রবাহ, আদিও ঐ সম্বন্ধে বিবেচ্য। অনুকূল ও প্রতিকুল পরিবেশ ও ঘটনাসম্ভূত বাকপ্রয়োগ লঘু ও গুরু প্রবাহ সৃষ্টি করে যথাক্রমে সূক্ষ্ম ও স্থূল বৃত্তিকে উদ্বেলিত করে কিনা!

উহা শ্লথ গতিতে মস্তিষ্কের বৃত্তিসমূহকে ক্ষতিগ্রস্থ কিংবা প্রদমিত করে কিনা! সেই সম্পর্কে সকল বিষয় গবেষক ছাত্রদের একটি উল্লেখ্য গবেষণার ক্ষেত্র রয়েছে।

মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্থ হলে উহার চতুস্পার্শ্বের অসংশ্লিষ্ট স্নায়ুকেও আহত করে। তজ্জন্য অপরাধস্পৃহার সহযোগী অন্যান্য বহু আদিম স্বভাবও প্রকৃত অপ্ররাধীদের মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু সূক্ষ্ম স্নায়ু সাময়িকভাবে মাত্র স্তিমিত বা প্রদমিত হলে উহাদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন না হওয়ায় কোনও দৈহিক বা মানসিক অসাড়তা আসে না। প্রতীত হয় যে প্রাথমিক অপরাধীদের মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম স্নায়ু বিধ্বস্ত না হওয়ায় ওদের সূক্ষ্ম বৃত্তিগুলি বিনষ্ট না হয়ে মাত্র কিছুটা প্রদমিত হওয়াতে ওদের স্বভাব চরিত্র সাধারণ নিরাপরাধী মানুষের মত থাকে। এদের অপরাধ স্পৃহার সহিত সৎপ্রেরণার কম বেশী সংমিশ্রণের জন্যও এইরূপ হওয়া সম্ভব।

[ক্রোধ মানুষের শোণিতস্পৃহা সম্পর্কিত সূক্ষ্ম স্নায়ুকে প্রত্যক্ষরূপে এবং লোভ আদি পরোক্ষ ভাবে দ্রব্য স্পৃহা সম্পর্কিত সূক্ষ্ম স্নায়ূকে আহত করে।]

মানুষের দেহে দুই প্রকারের কোষ আছে, যথা, বীজ কোষ এবং দেহ-কোষ। এই দেহ কোষ [Somatic cell] দ্বারা জীবদিগের দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্ট হয়ে থাকে। কিন্তু ভ্রূণের বৃদ্ধির এক কালে জীবদিগের জনন কোষ বা জার্ম সেল তথা বীজ কোষ পরবর্তী বংশের জন্মের জন্য পৃথক বীজাধারে রক্ষিত হয়। জন্মের পূর্ব্বেই দেহকোষ থেকে বীজ কোষ পৃথকীকৃত হওয়ায় স্বকীয় জীবনে সংগৃহীত কোনও দৈহিক বা মানসিক বৈশিষ্ট্য বংশগত হয় না। কিন্তু কোনও ক্রমে উহা বীজ কোষকে প্রবাহিত করলে উহা বংশগত হয়ে থাকে। ইচ্ছা সম্ভূত স্নায়বিক প্রবাহদ্বারা উহা জীবদেহে সম্ভব হতে পারে।

প্রতীত হয় যে মানুষের অপরাধস্পৃহা তাদের বীজ কোষে কমবেশী ½ অংশ এবং উহাদের দেহ কোষে কমবেশী ½ অংশ অপরাধ-স্পৃহা রক্ষিত আছে।

মানুষের বীজকোষের ½ অংশ অপরাধ স্পৃহা কোনও এক শিশুর মধ্যে দৈবক্রমে গোত্রানুক্রম দ্বারা উপজাত হলে উহা দেহ কোষ স্থিত ½ অংশ অপরাধ-স্পৃহার সহিত মিশ্রিত হয়ে ঐ শিশুর মধ্যে কমবেশী প্রবল অপরাধ প্রবণতার সৃষ্টি করে। এইরূপ অবস্থায় প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ শক্তির অভাব হলে কিংবা নিরাময়ার্থে চিকিৎসার ব্যবস্থা না হলে ঐ শিশু স্বভাব অপরাধী হবে।

এ ক্ষেত্রে উক্ত ⅓ অংশ অপরাধ স্পৃহা বহু পুরুষ সুপ্ত তথা রিসেসিভ থেকে দৈবাৎ ঐ শিশুর মধ্যে জাগ্রত হয়েছে। তবে বীজকোষের অপস্পৃহার উক্ত ⅓ অংশের কতটুকু দেহ কোষের ⅓ অংশ অপস্পৃহার সহিত মিশ্রিত হবে তা সংশ্লিষ্ট শিশুটির ভাগ্যের উপর নির্ভর করে।

[মানসিক গোত্রানুক্রম তথা মেণ্টাল আটাভিসিম দ্বারা ঐরূপ হয়ে থাকে। দৈহিক গোত্রানুক্রমের সহিত ইহা সম্পর্কশূন্য। মানসিক গোত্রানুক্রম এবং দৈহিক গোত্রানুক্রম পৃথক পৃথক ভাবে কিংবা একত্রে কোনও উত্তর পুরুষের মধ্যে জাত হয়। কেবল মাত্র মানসিক গোত্রানুক্রম স্বভাব-অপরাধীদের জন্মের কারণ। উহাদের দৈহিক গোত্রানুক্রমের সহিত স্বভাব-অপরাধীদের জন্মের কোনও সম্পর্ক নেই।

পুরাতনকালীন অপরাধ বিজ্ঞানী লম্ব্রোসো সাহের মানসিক গোত্রানুক্রমের অস্তিত্ব না বুঝে মাত্র দৈহিক গোত্রানুক্রমের উপর প্রাধান্য দিয়েছিলেন। উপরন্তু অপরাধীদের মাত্র একটি শ্রেণীর সম্পর্কে এই মানসিক গোত্রানুক্রম প্রয়োজ্য। একটি মাত্র কারণে সকল অপরাধী সৃষ্ট হয় নি। বিভিন্ন অপরাধীদের জন্মের জন্য বিভিন্ন কারণ দায়ী। লম্ব্রোসো সাহেবের এই সকল বিষয়ে কোনও ধারণা ছিল না।]

মানুষের দেহ-কোষ স্থিত ⅓ অংশ অপরাধস্পৃহাকে প্রচেষ্টা ও অভ্যাস দ্বারা [লোভে বা অভাবে] বহির্গত করে ও তৎপরে উহাকে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করে অপরাধী হলে তাদেরকে অভ্যাস-অপরাধী বলা হয়। কিন্তু আগুন সকল ক্ষেত্রেই আগুন। দেশলাই কাঠির ক্ষুদ্রতম আগুন হতেই ইন্ধন দ্বারা মশালের বৃহৎ আগুনের সৃষ্টি হয়। তজ্জন্য মানুষ তার দেহকোষস্থিত ⅓ অংশ অপরাধ-স্পৃহাকে অভ্যাস দ্বারা বহু গুণে বর্ধিত করে প্রায় স্বভাব-অপরাধীদের মত উৎকট অপরাধী হতে পারে। এরা এদের শেষ পর্য্যায়ে উপনীত হলে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ বুঝা দুষ্কর হয়ে উঠে। একমাত্র অপরাধ বিজ্ঞানীরা ওদের স্বরূপ বুঝে ওদেরকে পৃথক রূপে চিনে নিতে সক্ষম হন।

[মানুষের জিহ্বা গুটানোর ক্ষমতা বা অক্ষমতা তথা রোলিঙ ও আনরোলিঙ পাওয়ার মানুষের দেহকোষের সঙ্গে মাত্র সংশ্লিষ্ট। তাদের বীজকোষের সহিত উহার কোনও সম্পর্ক নেই। উহা মেণ্ডেল'ল অনুযায়ী বংশগত হয়ে থাকে। উহা সোমাটিক ক্যারেকটার হওয়ায় ওই বিষয়টি অপরাধ-স্পৃহারও দেহ কোষে'তে অনুরূপ অবস্থিতি ও ক্ষমতা প্রমাণ করে।

আদি মানব হতে আহৃত অপরাধস্পৃহা মানুষমাত্রের মধ্যে আছে। উহার কিছু অংশ বীজকোষে এবং উহার কিছু অংশ তাদের দেহ-কোষে থাকে। ইংরাজীতে এই বীজকোষ ও দেহকোষকে যথাক্রমে জার্ম সেল এবং সোমাটিক সেল বলে। অপরাধ স্পৃহার মত সংপ্রেরণা এবং তৎসহ অন্যান্য বহু সৎ ও অসৎ বৃত্তিও ওরূপভাবে মানুষের দেহ-কোষ ও বীজ কোষে সুপ্ত বা জাগ্রত রূপে রয়েছে।

নারীরা এবং পুরুষরা সমভাবেই অপরাধী হতে পারে। কিন্তু তার মধ্যে যথেষ্ট প্রকার ভেদ আছে। যে রীতিতে পুরুষরা অপরাধী হয় সেই রীতিতে নারীরা অপরাধী হয় না। ঐরূপ হওয়া বিবিধ কারণে তাদের পক্ষে সম্ভবও হয় না।

[পৃথিবীর প্রথম জীব তথা এককোষী প্রাণী স্ত্রী ছিল। পরে উহারা পুনঃ পুনঃ বিভক্ত হয়ে বহুকোষ জীবের সৃষ্টি করে। এই কোষগুলি বিভক্তির পর বিচ্ছিন্ন না হয়ে পরস্পর সংলগ্ন থেকে জীবদেহ সৃষ্টি করতো। পরে আরও উন্নত জীব সৃষ্টির জন্য বাড়তি এনার্জির প্রয়োজন হয়। তাতে একটি গোলাকার স্ত্রী বীজ অন্য গোলাকার স্ত্রী বীজের সহিত মিলিত হয়ে পূর্ব্বের মত বিভক্ত হতো। বংশ রক্ষার্থে জলে ভাসমান হয়ে দৈবাৎ ওদের মিশ্রিত হওয়ার অসুবিধা ছিল। ফলে উহারা গোলাকার স্থূল স্ত্রী-বীজ এবং ক্ষিপ্র সূক্ষ্ম পুংবীজ সৃষ্টি করে। এই সূক্ষ্ম ক্ষিপ্র পুংবীজটি ছুটে স্থির স্ত্রী-বীজকে খুঁজে পরস্পরের সহিত মিলিত হতো। ভ্রূণের জন্য পুষ্টি খাদ্য ধারণে স্ত্রী বীজ স্থূল হওয়াতে ওদের স্থির থাকতে হয়।

পৃথিবী হতে চন্দ্র উপগ্রহ উৎক্ষিপ্ত হওয়ায় আজও পৃথিবী উহাকে আকর্ষণ করে রাখে। চন্দ্রের উৎক্ষেপনে সমুদ্র গর্ভের সৃষ্টি। তাই জোয়ার ভাঁটা আজও চন্দ্রের সাহায্যে হয়। অনুরূপ কারণে—স্ত্রীবীজ হতে পুংবীজের সৃষ্টি হওয়ায় নারী আজও পুরুষকে আকর্ষণ করে। (f) স্বাধারণ জীবজন্তুদের মধ্যে উহা আরও ভালোরূপে দেখা যায়। তাই উভয়ের উভয়কে না হলে চলে না।

যৌনস্পৃহা যে অপরাধ-স্পৃহা অপেক্ষা আরও পুরানো বৃত্তি তাহা ইহা প্রমাণ করে। জীব আরও উন্নত হলে উহাদের আত্মরক্ষার কারণে অপরাধ স্পৃহার সৃষ্টি

(f) সৃষ্টির ধারা ও ক্রম সর্ব্ব বিষয়ে একই রূপ হয়ে থাকে। তাই প্রতিটি ক্ষেত্রে গবেষণার্থে উহাদের মূল সূত্রে [Root Cause] পৌছুতে হবে।

হয়। আত্মরক্ষা বলতে জীবন রক্ষার মত বংশ রক্ষাও বুঝায়। পরে উন্নত মনুষ্যের উদ্ভবের পর সৎ-প্রেরণার সৃষ্টি হয়েছিল।

বীজ ব্যতিরেকে কোনও জীবের সৃষ্টি হয় না। গোময়াৎ বৃশ্চিকা জায়তে অর্থে গোময় হতে ঐ জীবের সৃষ্টি হয় নি। উহাদের ঐ বীজ গোময়ে নিক্ষিপ্ত হলে উহার উত্তাপজনিত ওদের ঐ বীজ স্ফুরিত হয়েছে। উহা অন্যত্র পাতিত হলে ঐ বীজ বিনষ্ট হতো। অনুরূপ কারণে অপস্পৃহা ও সৎপ্রেরণা না থাকলে মানুষ অসৎ কিংবা সৎ হতে পারে না। কুপরিবেশ ও সৎ পরিবেশ যথাক্রমে উহাদের একটিকে স্ফুরিত এবং অন্যটিকে বিনষ্ট বা দুর্ব্বল করে। এখানে এই গোময় পরিবেশের সহিত তুলনীয়।

[এই অপস্পৃহা ও সৎপ্রেরণা যথাক্রমে নারী ও পুরুষের যৌন-বোধকেও নিয়ন্ত্রিত করে। এই যৌন-বোধ অপস্পৃহা-বাহী হলে যৌনজ অপরাধের সৃষ্টি করে।]

এই অপস্পৃহার সঙ্গে যৌন স্পৃহাও মানুষের দেহ ও বীজকোষে নিহিত আছে। মানুষ অভ্যাস [কনভেশন] দ্বারা তাদের এই অপরাধ-স্পৃহা রূপ সহজাত বৃত্তি প্রদমিত করেছে। কিন্তু অপরদিকে মানুষ তাদের এই যৌন স্পৃহা বংশ রক্ষার্থে সম্পূর্ণরূপে প্রদমিত না করে বিবাহ আদি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করেছে। তাই যৌন স্পৃহার ন্যায় অপরাধ স্পৃহা সভ্য মানুষের মধ্যে অতো উগ্রভাবে অনুভূত হয় না। এই যৌন স্পৃহার অবস্থিতির কারণে স্বভাব-অপরাধী, অভ্যাস-অপরাধী, মধ্যম ও দৈব অপরাধীর ন্যায় আমরা পুরুষের মধ্যে স্বভাব-লম্পট, মধ্যম, অভ্যাস ও দৈব লম্পট এবং নারীদের মধ্যে স্বভাব-বেশ্যা, অভ্যাস-বেশ্যা ও দৈব-বেশ্যাও দেখে থাকি।

[বেশ্যারা পুলিশ তাড়িত অপরাধীদের আশ্রয় খাদ্য ও একজন সাময়িক স্ত্রী দিয়েছে। ওরা বেশ্যাগৃহ হতে বার হয়ে চোরাই দ্রব্যসহ-বেশ্যা গৃহে ফিরে এসেছে। কোনও প্রখ্যাত অপরাধী বেশ্যা গৃহে এলে তাতে তারা গর্বিত হয়।]

রাষ্ট্র-বিধিতে মানবের লাম্পট্য অবস্থাভেদে অপরাধের সামিল। কিন্তু নারীর পক্ষে বেশ্যা-বৃত্তি সাধারণতঃ অপরাধ নয়। কিন্তু বেশ্যা-বৃত্তির সঙ্গে চৌর্যবৃত্তি প্রভৃতির একটা বিশেষ সম্বন্ধ আছে। সেইজন্য এই বিশেষ বৃত্তি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা প্রয়োজন। চৌর্য-বৃত্তির ন্যায় এই বেশ্যা-বৃত্তিও পৃথিবীর আদিমতম ব্যবসায়। আদিমকালে চৌর্য-বৃত্তির ন্যায় বেশ্যা-বৃত্তিও দোষণীয় ছিল না। এইজন্য বেশ্যা-বৃত্তির স্পৃহাও বংশানুক্রমে মানবী লাভ করেছে।

বেশ্যা-বৃত্তি স্পৃহায় ½ অংশ থাকে নারীদের দেহ-কোষে ও উহার ½ অংশ থাকে তাদের বীজকোষে। এদের ক্ষেত্রে গোত্রানুক্রম সমভাবে কার্য্যকরী হয়ে থাকে। এই বিশেষ স্পৃহা সুপ্ত অবস্থায় সকল নারীর মধ্যেই কিছু না কিছু বর্তমান আছে।

আমার মতে সাধারণতঃ মেয়েরা চোর হয় না। উহারা চোরদের সঙ্গে বাস করলেও নিজেরা চোর নয়। যৌবনটা মেয়েদের সন্তানাদি ধারণে ও পালনে অতিবাহিত হয়। অপরাধী হওয়ার সুযোগও তাদের কম। উপরন্তু তাদের দৈহিক বলহীনতা ও উহার দুর্ব্বল গঠনের জন্যও ইহা হতে পারে। এ'ছাড়া বেশ্যা-বৃত্তিদ্বারা তারা আরও সহজে বেশী অর্থ উপার্জনে সক্ষম। নারীদের মধ্যে কদাচিৎ প্রাথমিক স্তরের অভ্যাস-অপরাধী দেখা গেলেও উহাদের মধ্যে অপরাধ-রোগী এবং দৈব-অপরাধীর সংখ্যাই বেশি দেখা যায়। মেয়েরা কখনও স্বভাব-অপরাধী হয় না। কদাচিৎ দুই-একটি স্ত্রী-অপরাধীকে স্বভাব বা অভ্যাস-অপরাধীদের ন্যায় দেখা যায় বটে! কিন্তু তাদের মধ্যে নারী-সুলভ লক্ষণ কম থাকে। তাদের হাবভাব ও গঠনাদি প্রায়ই পুরুষোচিত হয় এবং নারীত্ব সম্বন্ধে তারা প্রায়ই অচেতন থাকে। মনের দিক থেকে এই ধরনের মেয়েদের পুরুষরূপেই ধরা উচিত। এইজন্য আমি এদের নামকরণ করেছি 'পুংশ্চলী'। মনের দিক থেকে এরা পুরুষ ছাড়া আর কিছু নয়।

মেয়েদের "কর্টেক্স গ্লাণ্ডের" বৃদ্ধি ও "মেডুলার" হ্রাস ঘটিয়ে যে কোনও মেয়ের মধ্যে পুরুষের ন্যায় ভাব আনা যায়। এ'ছাড়া জীব বিশেষের ওভারি বিনষ্ট হয়ে তৎস্থলে টেসটিস্-এর আবির্ভাব হতেও দেখা গিয়েছে। এই অবস্থায় ঐ স্ত্রী-জীবটির মধ্যে পুরুষোচিত নিদর্শনও দেখা গিয়ে থাকে।

১৪ বৎসরের নিম্নবয়স্কা এবং ৪৫ বৎসরের উর্দ্ধবয়স্কা নারীদের মধ্যে পুরুষের ন্যায় ভাব বর্তমান থাকে। এই কারণে তাদের মধ্যেই অধিক পরিমাণে অপরাধ-স্পৃহা স্থান পায়। প্রকৃত নারীরা সাধারণতঃ স্বভাব-অপরাধী হয় না। সেই স্থলে তারা হয় স্বভাব-বেশ্যা। হয় তাদের মধ্যে অপরাধ-স্পৃহা সমধিক পরিমাণে বর্তায় না, না হয় তাদের দেহ মধ্যে বিশেষ রস-পিণ্ডের রসক্ষরণ হেতু স্নায়বিক কারণে উহা সুপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়। প্রায়ই দেখা যায় যে, ভাই স্বভাব-চোর হ'লে বোন হয় স্বভাব-বেশ্যা। সাধারণতঃ অভ্যাস-চোর বা অভ্যাস-বেশ্যা অবস্থাগতিকে হয়ে থাকে। তাই ভাই অভ্যাস-চোর হলেও বোন সব সময় অভ্যাস-বেশ্যা হয় না। মেয়েরা অপরাধীদের অপরাধ করতে প্ররোচিত করে

বটে! কিন্তু তারা নিজেরা অপরাধ করে খুব কম। মেয়ে চোরদের মধ্যে অপরাধ-রোগী এবং দৈব-অপরাধীর সংখ্যাই বেশী দেখা যায়। অনেক সময় কেবল মাত্র তারা সাময়িক উত্তেজনাবশতঃ অপরাধ করে থাকে। উত্তেজনা অপরাধ-স্পৃহার বহির্গমনের সহায়ক হয়ে থাকে। এজন্য তাদের সেই সকল অপরাধ বৈজ্ঞানিক মতে সঠিক বা প্রকৃত অপরাধের মধ্যে পড়ে না।

রুগ্ন, রজঃস্বলা ও গর্ভাবস্থায় নারীরা এই উত্তেজনা রোগে ভোগে। ফরাসী পণ্ডিত লেগব্যাগুভু ১৫৫টি স্ত্রী-অপরাধ্নীকে কোনও এক ফরাসী কারাগারে পরীক্ষা করেন। ঐ কারাগারে পরীক্ষান্তে তিনি নিম্নোক্তরূপ ফল পান। নিম্নের তালিকাটি এ সম্বন্ধে বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য।

উন্মাদ	...	৪৯
অপরাধ-রোগী	...	৫৬
রজঃস্বলা	...	৩৫
গর্ভবতী	...	৫
রোগী	...	১০
		১৫৫

এই সম্পর্কে আমি ভারতীয় নারী-অপরাধীদের মধ্যে নিজেও বিশেষরূপে অনুসন্ধান চালিয়েছিলাম। এদের মধ্যে অনেকেই নিদারুণ অভাবে পড়ে বা বিশেষ উত্তেজনার কারণে, রুগ্ন অবস্থায় অপরাধ করেছিল। এদের মধ্যে বাকি নারীগুলি ছিল 'পুংশ্চলী' অর্থাৎ মনের দিক হতে তারা ছিল পুরুষ। উহাদের মধ্যে একজনও স্বভাব-অপরাধিনী ছিল না। অভ্যাস-অপরাধিনীদের অধিকাংশ ছিল স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতীয় নারী।

উন্মাদিনী	...	৬
অপরাধ-রোগিণী	...	১৪
দৈব-অপরাধিনী	...	২০
রজঃস্বলা	...	২০
পুংশ্চলী	...	২৫
অভ্যাস-অপরাধিনী	...	১০

বিষ-প্রয়োগাদি কার্যে কখনও কখনও মেয়েদের অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায় বটে! কিন্তু তারা এরূপ অপরাধ করে প্রায়ই প্রতিহিংসা চরিতার্থ বা

আত্মরক্ষার জন্য। যৌন কারণেও তারা এই সব কুকাজে হাত দিয়ে থাকে। কিন্তু বিত্ত লাভের জন্য ঐরূপ অপরাধ তারা করে থাকে কদাচিৎ। এ বিষয়ে সাধারণতঃ তারা তাদের পুরুষের উপরই নির্ভরশীল থাকে। দৈব-চোর ছেলে ও মেয়ে উভয়ই হ'তে পারে এবং তা তারা হয়ও। কেহ কেহ বলেন যে, মেয়েরা স্বভাব-চোর না হলেও কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাদের অভ্যাস-চোর হ'তে দেখা যায়। বোধ হয় তাঁরা কারাগার সমূহে কিছু কিছু মেয়ে-চোরের সংখ্যা দেখে এরূপ ধারণায় উপনীত হয়েছেন। তাঁদের মতে প্রয়োজন ও সুযোগের অভাবের জন্যই মেয়েরা চৌর্য-অভ্যাসে অপারক হয়। পর্দাপ্রথা, গৃহস্থালী কার্য, দৈহিক বলহীনতা এবং সন্তান-পালন ও ধারণ প্রভৃতির জন্য তাদের চোর হওয়া সম্ভব হয় না। এ'ছাড়া বেশ্যা-বৃত্তি দ্বারা তারা আরও সহজে বেশী অর্থ উপার্জনে সক্ষম। আমি কিন্তু এ কথা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করি না। কারণ ওই সব পণ্ডিতেরা মেয়ে-চোরদের মধ্যে পুরুষালী-ভাব কতটা আছে এবং তাদের মধ্যে প্রকৃত মেয়েলী ভাব ও নারীত্বই বা কতটুকু আছে এবং তারা অপরাধী-রোগী বা দৈব-অপরাধী কিনা, সে-সম্বন্ধে কোনরূপ অনুসন্ধান না ক'রেই ওইরকম সিদ্ধান্তে এসেছেন। পৃথিবীতে কোটি কোটি বেশ্যা নারী আছে যারা না মানে পর্দাপ্রথা, না করে সন্তান পালন বা ধারণ। কিন্তু তাদের শতকরা ৯৯ ভাগই কখনও কোনও চৌর্য কার্যে হাত দেয় না। তবে এ সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। আমার মতে মেয়েরা দৈব-অপরাধী হয় বটে! কিন্তু দৈব-অপরাধী হতে অভ্যাস-অপরাধীতে পরিণত হওয়ার মত প্রয়োজনীয় অপরাধ-স্পৃহা তাদের মধ্যে সকল ক্ষেত্রে থাকে না। অবস্থাক্রমে তারা দৈবাৎ কোনও অপরাধ করলেও অবস্থাভেদে তারা সে অপরাধ আর করে না। কোনও কোনও স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতীয় মেয়েদের মধ্যে বহু চোর-মেয়ে দেখা যায়। কিন্তু সেই সব মেয়েদের মধ্যে পুরুষালী ভাবই দেখা যায় বেশী। কিন্তু এদের মধ্যে পুরুষের ন্যায় দশ বারো বারের দাগী মেয়ে চোর আমি দেখি নি।

[প্রবাদ এই যে সতীর জন্ম বেশ্যাতে এবং পুলিশের জন্ম চোরেতে।' কারণ—প্রথমে নারী মাত্রের নিকট বেশ্যা বৃত্তি দোষনীয় ছিল না। পরে সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে কনভেনসন দ্বারা সতীত্বের সৃষ্টি হয়েছে। অনুরূপ ভাবে পৃথিবীতে অপরাধীরা ছিল বলেই তাদের দমনের জন্য পুলিশের সৃষ্টি করা হয়েছে।

নারীদের বিভিন্ন পুরুষের সঙ্গে অহঃরহ যৌন সঙ্গম নারীদের মধ্যে বন্ধ্যতা আনে। অর্থাৎ ওতে ওদের প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট হয়। এইজন্য সাধারণতঃ নির্ব্বিচার যৌন মিলনে বেশ্যাদের প্রায়ই সন্তান হয় না। কিন্তু পুরুষদের সুবিধা এই যে তারা বহু স্ত্রীতে সন্তান একই রূপে উৎপাদনে সক্ষম।]

উপরোক্ত কারণে বেশ্যাদের চাইতে বিবাহিত নারী ও কুমারী কন্যাদের এক-নিষ্ঠার প্রয়োজন। শীত প্রধান দেশ অপেক্ষা গ্রীষ্ম প্রধান দেশে ইহার প্রয়োজন অত্যধিক। তাই যে দেশ যতো গরম সেই দেশে সতীত্বের ততো কড়াকড়ি। এই সঙ্গে বংশের ধারা রক্ষারও প্রয়োজন আছে। নচেৎ উন্নত মনুষ্য গোষ্ঠীর সৃষ্টি সম্ভব হবে না। মানসিক ও দৈহিক গুণাগুণ কয় পুরুষের চেষ্টায় সৃষ্ট হয়। এই কারণে—ব্যভিচার এদেশে কঠোর অপরাধ না হলেও একটি জঘন্য পাপ কার্য্য। মমতাময়ী নারীদের তাদের ভবিষ্যত সন্তানদের মঙ্গলের বিষয় স্মরণে রেখে সংযমী হওয়া উচিৎ হবে।

প্রয়োজনে পৃথিবীতে স্ত্রী বীজ হতে পুং বীজের, স্থূল বৃত্তি হতে সুক্ষ্ম বৃত্তির, অপস্পৃহা হতে সৎপ্রেরণার, অলসতা হতে তৎপরতার, কষ্ট বোধ হতে স্পর্শ বোধের, উষ্ণ বোধ হতে শৈত্য বোধের (f) এবং বেশ্যা বৃত্তি হতে সতীত্বের সৃষ্টি হয়েছে। উহাদের একটি অন্যটির উল্টা বৃত্তি হওয়ায় উহাদের একটি হতে অন্যটিতে মানুষ ফিরতে পারে। এখন বিবেচ্য বিষয় এই যে সুসভ্য হওয়ার পর পুনরায় সেই আদিম যুগে ফিরা উচিৎ হবে কিনা! উহাদের একটির তিরোধান হলে অন্যটির উদয় হয়ে থাকে।

[উল্লেখ্য এই উহাদের যেটি যতো পুরানো তার শক্তি ততো বেশী। এই 'অধিক' শক্তিকে প্রতিহত করতে প্রতিরোধ-শক্তির সৃষ্টি হয়। ইহা স্ত্রীপুরুষের অবৈধ যৌন আকর্ষণেরও প্রতিবন্ধকতা করে। এই ভাবে প্রতিরোধ শক্তির সাহায্যে বেশী শক্তির বিরুদ্ধে 'কম' শক্তি জয়ী হয়।]

সাম্প্রতিক গবেষণায় মাত্র পুরুষ অপরাধীদের মধ্যে আক্রমনাত্মক [এ্যাগ্রেসীভ] ক্রোমজম আবিষ্কৃত হয়েছে। কোনও নারীর মধ্যে এখনও উহার সন্ধান পাওয়াযায় নি। উপরন্তু বহু দৈহিক ও মানসিক গুণাগুণ বংশানুক্রম দ্বারা পুরুষদের মধ্যে জাগ্রত হলেও নারীদের দ্বারা বাহিত হয়েও উহা নারীদের

(*f*) নারী ও শিশুরা সহজে বিদেশী ভাষা শিখে নেয়। এরা উভয়ে জাহাজে সি সিকনেসে তথা সমুদ্র পীড়াতে ভুগে না। নারীরা যেমন বহু কিছু গোপন করতে পারে, তেমনি তারা বহু কিছু অনুভূতির দ্বারা জানতে পারে।

মধ্যে সুপ্তাবস্থায় থেকেছে। গুণাগুণের ধারক ও বাহক ক্রোমজম এবং তৎনিহিত জিন সম্পর্কিত গবেষণাতে উহা জানা গিয়েছে।

নারীরা কদাচিৎ প্রাথমিক কিংবা দৈব অপরাধী হলেও ওরা প্রকৃত অপরাধী প্রায়ই হয় নি। সেই স্থলে তারা সাধারণতঃ বেশ্যা বৃত্তি গ্রহণ করেছে।

উপরোক্ত কারণে বর্তমান প্রবন্ধে আমি মূলতঃ পুরুষ অপরাধীদের সম্বন্ধেই অধিক আলোচনা করলো। নারীদের সম্বন্ধে যৌনজ অপরাধ শীর্ষক নিবন্ধে আলোচনা করা হবে। এখানে মাত্র পুরুষ অপরাধীদেব প্রতিটি বিভাগ সম্বন্ধে পৃথক পৃথক আলোচনা করবো।

[নারীদের পুরুষদের অপেক্ষা প্রতিরোধ শক্তি বেশী। তাই এরা অপরাধ-স্পৃহা এবং যৌন-স্পৃহা প্রদমনে পুরুষদের অপেক্ষা অধিক সক্ষম হয়। উপরন্তু কু পরিবেশ এরা সম্ভব মত এড়িয়ে চলে। এদের অধিকাংশের দায়িত্ব ও কর্তব্য বোধ বেশী থাকে। ওদের শিক্ষাতেই শিশুদের পারিবারিক সংস্কার-বোধ জন্মে। এক মাত্র উৎকট অপরাধীরা এবং মহাপুরুষরাই ওদের সৃষ্ট বদ্ধমূল সংস্কার অতিক্রম করতে সক্ষম হয়। নারীরা বাধ্য না হলে অপরাধিনী কিংবা মহামানবিনী হতে চায় না। নারীরা মধ্যপন্থী হওয়ায় যে কোনও পরিবেশে নিজেদেরকে সহজে খাপ খাওয়াতে সক্ষম হয়। নারীর মন পুরুষাপেক্ষা রূপান্তরক্ষম তথা মেটামরফিক।

সপ্তম অধ্যায়

॥ নীরোগ অপরাধী ॥

অপরাধী মাত্রেই এ্যাবনরম্যাল তথা নৈতিক ক্ষেত্রে উন্মাদের সমগোত্রীয় রুগী। [Moral insane] প্রশ্ন উঠবে তাহলে এদেরকে নীরোগ অপরাধী এবং অপরাধ-রোগীতে বিভক্ত করা হলো কেন? এর উত্তর হবে এই যে স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক এই উভয় রূপে এদের উৎপত্তি হয়। ওদের উৎপত্তির কারণানুযায়ী ওদেরকে ওইরূপ দুইটি মূল বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। অপরাধ রোগীরা প্রত্যক্ষ রূপে স্নায়বিক কারণে এবং নীরোগ অপরাধীরা আপ্ত চেষ্টা দ্বারা পরোক্ষ কারণে সৃষ্ট হয়েছে। পূর্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদগুলিতে উহাদের

জন্মের কারণ সম্বন্ধে বিশদ রূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই নীরোগ অপরাধীরা প্রধানতঃ তিনটি ভাগে বিভক্ত যথা, স্বভাব-অপরাধী, মধ্যম-অপরাধী ও অভ্যাস-অপরাধী। দৈব তথা আকস্মিক অপরাধীদের আমি তালিকা হতে বাদ দিয়েছি। কারণ এই দৈব অপরাধীরাই অভ্যাস-অপরাধীতে রূপান্তরিত হয়। এই সকল অপরাধীদের জন্ম বৃত্তান্ত সম্বন্ধে আমি পৃথক পৃথক আলোচনা করবো।

(ক)—স্বভাব-অপরাধী

গোত্রানুক্রম [Atavism] দুই প্রকারের হয়, যথা দৈহিক ও মানসিক। মানসিক গোত্রানুক্রম সম্বন্ধে বুঝতে হলে প্রথমে বুঝতে হবে যে দৈহিক গোত্রানুক্রম কাকে বলে। বহু ক্ষেত্রে পিতৃকুলে বা মাতৃকুলে তিন পুরুষ কৃষ্ণকায় হলেও দম্পতি বিশেষের শ্বেতকায় পুত্র হয়েছে। এরূপ হলে বুঝতে হবে যে ওদের কয়েক পুরুষ পূর্বেকার কোনও ব্যক্তি শ্বেতকায় ছিল। এই শ্বেত বর্ণ কয়েক পুরুষ ওদের বীজ-কোষে সুপ্ত অবস্থায় থেকে সহসা শিশুটির মধ্যে জাগ্রত হয়েছে। কোনও উত্তর পুরুষের মধ্যে ওদের পূর্ব্ব পুরুষদের কোন গুণাগুণের এইরূপ আকস্মিক বিকাশকে বলা হয় গোত্রানুক্রম। এই বংশ-গোত্রানুক্রমের ন্যায় জাতি-গোত্রানুক্রমও দেখা যায়। বাঙ্গালী জাতির মধ্যে কারও কারও মুখ হুবহু চীনা বা জাপানীদের মত দেখা যায়। ইহা প্রমাণ করে যে, কোনও এক বিস্মৃত যুগে বাঙ্গালীদের মধ্যে কিছু মঙ্গোলীয় রক্ত মিশে ছিল। প্রমাণস্বরূপ একজন উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকের ফটো চিত্র উদ্ধৃত করা হলো। আমাদের অতি দূর পূর্ব্বপুরুষ যে বানরের ন্যায় কোনও লোমশ জীব ছিল তারও প্রমাণ স্বরূপ কদাচিৎ কোনও কোনও মানুষের মুখেও লোম দেখা যায়। প্রমাণস্বরূপ একটি বানর ও একটি আদিম মানুষ এবং রুশ দেশীয় কুকুর মানুষের প্রতিকৃতি উদ্ধৃত করা হলো। এইভাবে গোত্রানুক্রম কখনও কখনও লক্ষ পুরুষ, কখনও সহস্র পুরুষ কখনও বিশ বা ত্রিশ পুরুষ সুপ্ত

অবস্থায় তাদের বীজ কোষে থেকে হঠাৎ কোনও এক বংশধরের দেহ-কোষের মধ্যে আবির্ভূত হয়।

[আদিম মানুষদের মত চিহ্নগুলি দৈহিক অবনতি বা ডিজেনারেশনের কারণেও হতে পারে। মাতৃ জঠরে জরায়ুর ও ভ্রূণ সম্বন্ধীয় ক্ষয় ক্ষতিতেও উহা হয়ে থাকে। সিফিলিস প্রভৃতির রোগের জন্য দেহ বিকৃত হয়। কিন্তু—দৈহিক গোত্রানুক্রমের সহিত এই সকল চিহ্নগুলির যথেষ্ট প্রভেদ থাকে।]

উপরোক্ত দৈহিক গোত্রানুক্রমের মত মানুষের মধ্যে মানসিক গোত্রানুক্রম'ও দেখা যায়। এই মানসিক গোত্রানুক্রমের জন্য অনেক সৎ বংশেও স্বভাব অপরাধীর জন্ম হতে দেখি। সদবংশে জন্মে সদ্‌ভাবে বর্দ্ধিত হয়েও বহুজন অপরাধ-মুখী হয়েছে। [সভ্য মানুষে এই অপরাধ স্পৃহা সুপ্ত থাকে।]

মানুষের বংশানুক্রম তথা হেরিডিটি এবং এই গোত্রানুক্রম তথা আটাভিসিম'এর মধ্যে প্রভেদ এই যে প্রথমোক্তটির মধ্যে ধারাবাহিকতা থাকে কিন্তু শেষোক্তটির মধ্যে উহা হঠাৎ সুপ্ত তথা রিসেসিভ অবস্থা হতে জাগ্রত তথা ডমিনেণ্ট হয়ে থাকে। অর্থাৎ উহা দৈবাৎ গোত্রানুক্রম দ্বারা বীজকোষ হতে দেহ-কোষের তদজাতীয় বৃত্তির সহিত সংযুক্ত হয়। সেই ক্ষেত্রে উহা স্বভাব অপরাধীর জন্ম দিয়ে থাকে।

[এখানে উল্লেখ্য এই যে, বীজ কোষের অপস্পৃহার মত দেহ-কোষস্থিত অপস্পৃহাও সুপ্ত তথা রিসেসিভ এবং জাগ্রত তথা—ডমিনেণ্ট রূপে থেকেছে। তবে উহাদের শক্তি বীজকোষের বৃত্তিসমূহ হতে পূর্ব্বোক্ত কারণে কম। প্রয়োজন মত অভ্যাস ও প্রচেষ্টা দ্বারা উহাকে সুপ্তাবস্থা হতে জাগ্রত করে বর্ধিত করা সম্ভব। বস্তুতঃ পক্ষে এই উপায়ে অভ্যাস-অপরাধীরা সৃষ্ট হয়ে থাকে।]

উগ্র অপরাধ-স্পৃহার কারনে এই স্বভাব অপরাধীদের স্বভাব চরিত্র ঠিক আদি মানুষের মত হয়। ঐ সময় কোনও অপরাধকে ওরা অপরাধ ব'লে বুঝতে চায় না। পরস্বাপহরণ তারা তাদের জন্মগত অধিকার মনে করে। কোনও একটি অপরাধ না করে তারা তৃপ্ত হয় না। প্রতিরোধ শক্তি প্রচণ্ড রূপে না থাকায় উহাদের মধ্যে অভাব ও প্রয়োজন না হলেও তারা অপরাধ করে।

আমি এমন এক বালক স্বভাব-অপরাধীকে জানি যে পিতার নিকট থেকে প্রত্যহ খুচরা ৪০ টাকা পাওয়া সত্বেও সুবিধা পেলেই সে ৫ বা ১০ টাকা চুরি

করেছে। এই সব অপরাধী অতি মাত্রায় বে-পরোয়া হয়ে থাকে। এরা খায় দায় ফুর্তি করে। কিন্তু তারা কদাপি অর্থাদি সঞ্চয় করে না। এদের স্বভাব পুরাপুরি খাদ্য সংগ্রহী আদি মনুষ্য গোষ্ঠির মত হয়ে থাকে। সামান্য কারণে এরা উত্তেজিত হলেও তখুনি আবার হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে যায়। প্যাসিভ তথা নিষ্ক্রিয় উত্তেজনায় এরা চুরি আদি নির্ব্বল অপরাধ করে এবং এ্যাকটিভ তথা সক্রিয় উত্তেজনায় এরা বলপ্রয়োগী অপরাধ করে। এদের দৃষ্টি ক্রূর ও স্বভাব পশুসুলভ, এরা প্রেরণা তথা ইনষ্টিংট্ দ্বারা পরিচালিত হয়। তারা কখনও বুদ্ধি বৃত্তি বা যুক্তি তর্কের প্রয়োজন বুঝে না।

[এক শ্রেণীর উন্মাদ লোকের মত এরা নিশ্চেষ্ট থেকে হঠাৎ উগ্র হয়ে বেগে সক্রিয় হয়ে থাকে। এদের মধ্যে বেশী বুদ্ধিমত্তা তথা ইনটেলিজেন্স না থাকলেও চতুরতা তথা কানিঙনেস সমধিক থাকে। উন্মাদদের মত পাহারা'দের এড়িয়ে হঠাৎ লোক চক্ষুর বাহিরে এসে এরা ইচ্ছামত কার্য্য করতে সক্ষম। এরা পশুর মত খড়া ব'য়ে ছাদে উঠতে পেরেছে। এইরূপ অপরাধীকে ক্যাট বারগ্লার বলা হয়েছে।]

এই অপরাধীদের অন্তস্বভাব তাদের অঙ্গসৌষ্ঠব চলন ও কথন ভঙ্গির মধ্যে কিছু কিছু পরিস্ফুট হয়। এদের এই বৈশিষ্ট্য প্রকৃতিগত, উহা কদাপি আকৃতিগত হয় না। ক্লিপটোম্যানিয়াগ্রস্থ মনো-রোগীরা তাদের ইচ্ছা বৃত্তির উপশমের জন্য চুরি করে। কিন্তু তারা কখনও বিত্ত লাভের জন্য অপকর্ম্ম করে না। কিন্তু এই স্বভাব অপরাধীরা তাদের লাভের ভোগের ও ব্যবহারের জন্য চুরি করে। তারা পূর্ব্বোক্তদের মত অপরাধ মূলক কার্য্যের জন্য অনুতপ্ত হয় না। চৌর্য্যাদি দুষ্কার্য্য তাদের প্রবৃত্তি মূলক জীবিকা ও অধিকার। ওদের পূর্ব্বপুরুষ খাদ্য সংগ্রহী মানুষদের মত এরা খাদ্য বা অর্থ সঞ্চয় করে না। ওদের দ্বারা অপহৃত শেষ কপর্দ্দকটি ব্যয়িত না হলে এরা অপকর্ম্মে বার হবে না।

স্বভাব দুর্ব্বৃত্ত জাতীয় ব্যক্তিদের [ক্রীমীন্যাল ট্রাইব] স্বভাব মধ্য মাত্রায় এদের মত হয়ে থাকে। এই জাতিগণ তাদের আদিম স্বভাব এখনও ত্যাগ করে নি। এখনও পর্য্যন্ত অপরাধ করাই তাদের প্রধান উপজীবিকা। দেহের দিক হতে পরিবর্তিত হলেও মনের দিক হতে তারা প্রায় আদিম যুগের মানুষ। এদের স্বভাব চরিত্র অভ্যাস-অপরাধী এবং স্বভাব-অপরাধীর মধ্যবর্ত্তীরূপ ধারণ করে।

[এই সম্পর্কিত গবেষণায় সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। এই স্বভাব

দুর্ব্বৃত্ত জাতিদের কয়েকটি আদিকাল হতে অপরাধ প্রবণ রয়েছে। কিন্তু ওদের কয়েকটি জাতি পূর্ব্বতন সুসভ্য মানুষের অধঃপতিত বংশধর। ভারতের পূর্ব্বতন নৃপতিদের সৈন্যদল বিদেশী অধিকার কালে বশ্যতা স্বীকার না করে সপরিবারে বনে জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করে পরে অধঃপতিত হয়ে কয়েকটি স্বভাব দুর্ব্বত্ত জাতির সৃষ্টি করেছে। এরা আজও বিকৃত সংস্কৃত ভাষায় কম্যাণ্ড তথা হুকুম দিয়ে থাকে।]

অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই স্বভাব-অপরাধী হয়ে থাকে। পৃথিবীতে অভ্যাস অপরাধীদের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। আমার মতে গোত্রানুক্রমাগত অপরাধীদেরকেই স্বভাব-অপরাধী বলা যেতে পারে। একটি দুর্দমনীয় অপরাধ-স্পৃহা সহ এরা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। এদের চিকিৎসা না হলে মৃত্যুর পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত এই স্পৃহা এদের মধ্যে অবিচলিত থেকেছে। প্রায়ই দেখা যায় যে সাধুর পুত্র চোর এবং চোরের পুত্র সাধু হয়েছে। সদ বংশে জন্মে সৎ পরিবেশে বর্দ্ধিত হয়েও এরা অপরাধী হয়ে থাকে। সেই ক্ষেত্রে উহা জন্মগত বা পরিবেশগত না হয়ে গোত্রানুক্রমগত হয়ে থাকে।

এই স্বভাব অপরাধীদের কোনও অস্তিত্ব পৃথিবীতে আছে কিনা সেই সম্বন্ধে পণ্ডিতদের সন্দেহ আসা খুবই স্বাভাবিক। এর কারণ এই যে ইহারা সংখ্যায় অত্যল্প হওয়ায় সচরাচর সাধারণ লোকের নজরে আসে না। আমি সুদীর্ঘ কর্ম্ম জীবনে মাত্র ৪৭টি স্বভাব-অপরাধীকে পরীক্ষা করার সুযোগ পেয়েছি। বস্তুতঃ পক্ষে এদেরকে প্রথমে আমিও অপরাধ-রোগী মনে করেছিলাম। তৎকালে আমি এদের পৃথক সত্বা স্বীকার করতে চাই নি। কিন্তু পরে আমি উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট চরিত্রগত প্রভেদ লক্ষ্য করি। প্রাথমিক অপরাধী এবং অপরাধ-রোগীদের আমাদের মতই স্বাভাবিক মানুষরূপে দেখতে পাই এবং এরা উভয়েই সমাজবদ্ধ মানুষের সহিত বসবাস করে। উৎকট অভ্যাস এবং স্বভাব অপরাধীরা ব্যক্তিত্বের পরিবর্ত্তন হেতু পঙ্কিল বস্তীতে সভ্য মানুষের সহিত সম্পর্ক শূন্যরূপে বসবাস করে।

আমি কয়েকজন স্বভাব ও অভ্যাস-অপরাধীকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রদের নিকট উপস্থিত করেছিলাম। ঐ সময় স্বভাব অপরাধী-দের এক বিজাতীয় ঘৃণার সহিত দূরে সরে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। একমাত্র অভ্যাস অপরাধীদের মাধ্যমেই ঐ উৎকট অপরাধীদের কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা সম্ভব হয়েছিল।

এই সময়ে উহাদের দেহে স্পর্শবিদ্, শৈত্যবিদ্, উষ্ণবিদ্ ও কষ্ট-বিদ্ যন্ত্রের সাহায্যে যান্ত্রীক পরীক্ষা করে দেখি যে স্বভাব-অপরাধীদের স্পর্শ এবং শৈত্য-বোধ অভ্যাস-অপরাধীদের ঐ সকল বোধ অপেক্ষা অধিক। অন্যদিকে—ঐ সকল স্বভাব-অপরাধীদের কষ্টবোধ ও উষ্ণবোধ অভ্যাস-অপরাধীদের ঐ সকল বোধ অপেক্ষা কম। ওদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া-কাল তথা রি-এ্যাকসন টাইমেরও বহু তারতম্য দেখা গিয়েছিল। কিন্তু সাধারণ নিরপরাধী মানুষের সহিত তুলনা করে দেখা গিয়েছিল যে, স্বাভাবিক মানুষের কষ্টবোধ ও উষ্ণবোধ ওই উভয় অপরাধী হতে বহুগুণ বেশী এবং তাদের শৈত্যবোধ ও স্পর্শ-বোধ ওদের তুলনায় বহুগুণ কম। যান্ত্রীক পরীক্ষাতে স্বাধারণ মানুষের তুলনায় ওদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া—কাল'ও অত্যধিক প্রবল দেখা গিয়েছিল। দৈহিক ও নৈতিক অসাড়তা অভ্যাস-অপরাধীদের তুলনায় স্বভাব-অপরাধীদের মধ্যে বেশী থাকে।

[এই ভাবে স্বভাব-অপরাধীদের অস্থিত্ব স্বীকার করে আমি ওদের উৎপত্তির জৈব কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। এরপর বহু গবেষণা ও বিবেচনার পর আমি উহাদের উপরোক্ত রূপে জন্মের কারণ নির্ণয় করেছি।]

বিঃ দ্রঃ—মানুষের কোনও বৃত্তির কিছু অংশ বীজ কোষে [রিসেসিভভাবে] ও উহার কিছু অংশ দেহ-কোষে [ডমিনেণ্ট ভাবে] রক্ষিত থাকে। দৈবাৎ কোনও বংশধরের মধ্যে বীজকোষের বৃত্তি দেহ কোষের ঐ বৃত্তির সহিত যুক্ত হলে উহা অত্যুগ্র হয়। এই দেহ-কোষ দ্বারা অন্যান্য দেহাংশের মত মস্তিষ্কও গঠিত। দেহ কোষের [সোমাটীক] গুণাগুণ মনের অবচেতন কিংবা চেতন স্তরে থাকতে পারে। উহা অবচেতন মন থেকে চেতন মনে আসে।

বেজী সর্পের স্বাভাবিক শত্রু হওয়ায় সাপকে দেখা মাত্র বেজী তাকে আক্রমণ করে। এই স্বাভাবিক শত্রুতা অন্য জীব সম্পর্কে ওদের নেই। এখানে কোনও কোনও মানুষের জিহ্বা গুটানোর ক্ষমতা ও অক্ষমতার মত প্রত্যেক বেজীর উক্ত স্পৃহা ওদের একটি দেহকোষ জাত বৃত্তি। সম্ভবত বেজীর ক্ষেত্রে বীজকোষের ঐ মনোবৃত্তি তার দেহকোষের ঐরূপ বৃত্তির সহিত মিলিত হওয়ায় উহা অত্যুগ্র। তদোপরি উহা ওদের অবচেতন মনে না থেকে সর্ব্বদা ওদের চেতন মনে আছে। কিন্তু সর্পের ক্ষেত্রে ওরূপ শত্রুতা ওদের মাত্র দেহকোষের বৃত্তি। উহা তাদের মনে সদা জাগ্রত থাকলেও উহা তাদের চেতন মনে না থেকে অবচেতন মনে আছে। তদজন্য মাত্র আক্রান্ত হলে তারা উহা অবচেতন মনে থেকে চেতন মনে এনে আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধরত হয়।

উপরোক্ত দৃষ্টান্ত দুইটি হুবহু মানুষের বীজকোষের ও দেহকোষের অপরাধ স্পৃহার সমগোত্রীয়। ঐ নকুলের ঐরূপ বৃত্তির সহিত স্বভাব-অপরাধীদের অপস্পৃহার এবং সর্পের ঐরূপ মনোবৃত্তির সহিত অভ্যাস-অপরাধীদের অপস্পৃহা তুলনীয়। প্রভেদ এই যে অপরাধী মানুষরা আক্রমণের জন্য নিরপরাধী মানুষদের বেছে নেয়। মানুষের ক্ষেত্রে ইনিষ্টিংটের সহিত ইনটেলিজেন্স মিশ্রিত থেকেছে। উহাদের জীবনযাত্রা প্রণালী বিভিন্ন হয়ে থাকে। এখানে সংশ্লিষ্ট পক্ষ সম জাতীয় ও সর্বোন্নত জীব মানুষ। তাই নিজেদের মধ্যেই ওদের যা কিছু শত্রুতা। [ঐভাবে মানুষও কম বেশী ফেরোসিটি প্রাপ্ত হয়।]

[কোনও পুরুষ একজন নারীর পক্ষে ইমপোটেণ্ট হলেও অন্য নারীর পক্ষে সে ইমপোটেণ্ট হয় না। কারণ দৈহিক ইমপোটেন্সীর মত মানসিক ইমপোটেন্সিও আছে। স্বাভাবিক শত্রুতা সম্বন্ধে জীবদিগের মধ্যে দৃষ্ট পৃথক পৃথক ব্যবহারের সহিত উহা তুলনীয়। বিবিধ শ্রেণীর অপরাধীদের অপকর্মের মধ্যে দ্রব্য স্পৃহা ও শোণিত স্পৃহা এবং রাত্রির চোরদের রাত্রস্পৃহা ও দিনের চোরদের দিবা স্পৃহার ব্যাখ্যা এতে মিলবে। এই সব স্পৃহা অভ্যাস দ্বারা বর্ধিত না হলে বোধগম্য হয় না।

(খ)—অভ্যাস-অপরাধী

ইংরাজীতে অভ্যাস অপরাধীকে হ্যাবিচুয়াল ক্রিমিন্যাল এবং স্বভাব-অপরাধী-কে ইনিসটিঙটীভ্ ক্রিমিন্যাল ও দৈব তথা আকস্মিক অপরাধীকে চান্সড্ বা অকেস্তনাল ক্রিমিনাল বলা হয়।

ক্রমিক অভ্যাস দ্বারা দৈব-অপরাধী হতে অভ্যাস-অপরাধী সৃষ্ট হয়। 'মানুষের নাম মহাশয়। তাকে যা সয়ানো যায় তাই সয়।' মনুষ্য শিশু একটু একটু করে বড়ো হয়ে উচ্চতা প্রাপ্ত হয়েছে। ওরা একদিনেই বয়স্ক ব্যক্তির মত উচ্চতা প্রাপ্ত হলে উপরের বায়ু স্তরের চাপে তারা ভেঙে পড়তো। মানুষ তাদের শিরোপরি ঐ বিপুল চাপ ক্রমিক অভ্যাস দ্বারা সহ্য করে। এই একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দ্বারা অভ্যাসের অসীম ক্ষমতা বুঝা যাবে।

[সাধারণ মানুষও অভ্যাস দ্বারা বহু অপকর্মকে তাদের মধ্যে সহনশীল

করেছে। গোয়ালাদের নিকট থেকে দুধ ক্রয় কালে তারা জানে যে উহাতে জল মিশানো আছে। ওটা তারা এ যুগের একটা স্বাভাবিক পরিণতি বুঝে নীরব থেকেছে। ভেজাল খাদ্য সম্বন্ধেও তারা শুধু উহাতে ভেজালের পরিমাণের বিষয় ভেবেছে।]

বারে বারে মিথ্যাকে সত্যরূপে প্রচার করলে মানুষ তা এক সময় বিশ্বাস করে থাকে। অন্যায়কে কিছুকাল সহ্য করলে উহা আর অন্যায় মনে হয় না। বহু উৎকোচ গ্রহণ'কে কিছুকাল পরে ওদের পাওনা বলে প্রতীত হয়েছে।]

বিঃ দ্রঃ—অভ্যাস দ্বারা মানুষ যে শুধু অপরাধী হয় তা নয়। এই একই অভ্যাস দ্বারা তারা নিরপরাধীও হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে এই অভ্যাস দ্বারা মানুষ স্বয়ং-ক্রিয়তা পর্যন্ত লাভ করেছে। তাই 'প্যাডেল' যুক্ত যন্ত্রে কার্য করতে অভ্যস্ত শ্রমিকরা ক্যান্টিনে বসেও পা নাচায়। গুড্ উইল প্রাপ্ত নাম করা বিপণীর পরবর্তী মালিকরা প্রবঞ্চক হলেও লোকে প্রবঞ্চিত হয়েও বারে বারে তাদের দুয়ারে গিয়েছে।

শৈশবে মানুষ যা ইচ্ছা তা করতে বা যা ইচ্ছা তা পেতে চায়। কিন্তু বয়ঃ প্রাপ্ত হয়ে তারা দেখে যে তাদের কার্য অসামাজিক হলে উহাতে চতুর্দিক হতে বাধা আসে [পৃঃ দ্রঃ] এই প্রতিবন্ধকতায় তারা ক্রমশঃ অভ্যস্থ হয়ে পড়ে। তখন অপরের নিকট হতে আসা বাধা তারা নিজেরাই নিজেদের উপর আরোপ করে। এই বাধা জনগণ বা পুলিশ যাদের নিকট হতেই আসুক না কেন। এই আবশ্যিক প্রতিবন্ধকতা অভ্যাস-অপরাধীদের সংখ্যা কমাতে সক্ষম। মানুষের মধ্যে এই অভ্যাস দ্বারা ঔচিত্য ও অনৌচিত্য বোধের সৃষ্টি হয়েছে। বহুবিধ [TABOO] সামাজিক নিষেধ তথা প্রথা ও নিয়ম এই ভাবে সমাজে সৃষ্ট হয়েছে। (f) অবশ্য—মানুষের বিবেকই মানুষের প্রথম পুলিশ। ওদের এই বিবেক ক্রমিক অভ্যাস দ্বারা অর্জিত হয়েছে। আইনানুরাগ এবং যৌথ আনুগত্য [Morale] তথা কলেকটিভ্ লয়েলটি আদিও এইরূপ অভ্যাস সাপেক্ষ হয়ে থাকে।

ব্যক্তিগত অভ্যাসের মত গণ-অভ্যাসেরও অস্তিত্ব আছে। কোনও প্রাইভেট

(f) 'অমুক বারে বা মাসে উহা কদাচ' করিতে বা খাইতে নাই: এই সকল সামাজিক নিয়ম ও প্রথাদি পূর্বকালে স্বাস্থ্য ও প্রশাসন সম্পর্কিত কঠোর রাজকীয় বিধি হতে উদ্ভূত হলেও আজও বংশ পরম্পরায় উহা অনুসৃত হয়। পূর্ব যুগের বহু উপকারী ব্যবস্থা স্থান কাল ভেদে এ'যুগে অনুপকারী হলেও জনগণ সহজে উহা ত্যাগ করে না।

জমিতে লোক চলাচল কিছুকাল বিনা বাধায় করতে দিলে উহাতে বেষ্টনী দেওয়ার পরও কিছু লোক পূর্ব অভ্যাস মত উহা টপকে বা ভেঙে ঐ কার্য পুনঃ পুনঃ করবে। অধিকার একবার দিলে উহা তুলে নেওয়া দুষ্কর হয়। যা কিছু করবার তা ওদের অধিকার-বোধ জন্মাবার পূর্বে করতে হবে। ঐ বেষ্টনীটি [বেড়া] বারে বারে পুর্ণনির্মিত হলে ও ঐ প্রতিবন্ধকতা কিছু কাল অব্যাহত থাকলে উহা টপকানো বা ভাঙাভাঙি বন্ধ হয়ে যায়।

দলবদ্ধ ভাবে চুরি করা বা লুঠ পাট করা বা না করাও এই অভ্যাস সাপেক্ষ। অন্যকে লোকে [বিনা বাধায়] যা করতে বা পেতে দেখবে তা সে নিজেও পেতে বা করতে চাইবে। রাষ্ট্রিয় বা ব্যক্তিগত প্রতিবন্ধকতা দেরীতে এলে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। কিন্তু তড়িৎ ঘড়িৎ উহা এলে মানুষ বিনা প্রতিবাদে তা মেনে নেয়। ফুটপাতে কিছুকাল হকারদের নির্বিবাদে বসতে দিয়ে পরে তাদের উচ্ছেদ কালে পুনর্বাসনের প্রশ্ন আসে। উপরন্তু এজমালী পথ বে-দখল করা তাদের অত্যাসে পরিণত হয়। কিন্তু প্রতিবন্ধকতার সম্ভাবনা থাকলে তারা ঐ কার্য কখনও করবে না।

মানুষের অভ্যাসের অমোঘ ক্ষমতা সম্বন্ধে উপরে বলা হলো। এইবার প্রাথমিক এবং উৎকট অভ্যাস-অপরাধীদের জন্মের বিষয় বলবো।

কারো কারো মতে একমাত্র অভ্যাস দ্বারাই অপরাধীদের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এঁরা অন্য কোনও প্রকার অপরাধীদের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। এঁদের মতে দৈব-অপরাধীরা এই অভ্যাস-অপরাধীদেরই প্রাথমিক অবস্থার অপরাধী। অর্থাৎ তাঁরা মনে করেন যে, প্রথমে অভাব ও কুসঙ্গের কারণে মানুষ দৈব-অপরাধী হয় এবং পরে এই দৈব-অপরাধীরা ধীরে ধীরে অভ্যাস দ্বারা অভ্যাস-অপরাধীতে পরিণত হয়। এঁরা বলে থাকেন যে, একমাত্র পরিবেশই [Environment] পৃথিবীর যাবতীয় অপরাধীর সৃষ্টির কারণ। অভ্যাস দ্বারা মূলতঃ অপরাধীদের সৃষ্টি হলেও উহাদের সৃষ্টির অন্যান্য কারণও যে আছে তা আমি আমার এই থিসিসে প্রমাণ করেছি।

এক্ষণে আমি মনে করি যে, অভ্যাস-অপরাধীরা পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ—এই দুইটি উপায়ে সৃষ্ট হয় বা তা হ'তে পারে, যথা (১) লোভ ও অভাব প্রভৃতি কারণে স্বীয় চেষ্টাজনিত অভ্যাস দ্বারা এবং (২) কুসঙ্গ প্রভৃতি বা বাসস্থান সম্ভূত কারণে উদ্ভূত কুপরিবেশ দ্বারা। প্রথমোক্ত বিষয়টিকে আমরা প্রত্যক্ষ কারণ এবং দ্বিতীয়োক্ত বিষয়টিকে আমরা পরোক্ষ কারণ বলে থাকি।

[বক্তব্য বিষয়টি জৈব বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রমাণ করা যেতে পারে। লামার্ক প্রভৃতি বিবর্তনবাদী পণ্ডিতদের মতে জীবের অঙ্গাদি যথাক্রমে উহাদের অতি-ব্যবহারের কিংবা অব্যবহারের কারণে সৃষ্ট বা নষ্ট হয়েছে। তাঁদের মতে ঐ ভাবে অঙ্গাদির আমূল পরিবর্তন সম্ভব। তাদের মতে নূতন নূতন জীব সৃষ্টির ইহা প্রত্যক্ষ কারণ। কিন্তু প্রত্যক্ষ কারণে জীবদিগের এই সকল অঙ্গের পরিবর্তনের [হ্রাস-বৃদ্ধি] ন্যায় পরোক্ষ কারণে তাহাদের চর্মের বর্ণ প্রভৃতিরও পরিবর্তন ঘটে থাকে। কোনও জীব শ্বেত বর্ণের, কেহ বা ধূসর বা কৃষ্ণ বর্ণের, কেহ বা ডোরা কাটা, কেহ স্থূল, কেহ ক্ষীণকায় হয় কেন? ইহার কারণ স্বরূপ তাঁরা বলেন যে আহার, জলবায়ু, আলোক প্রভৃতির তারতম্যের পরোক্ষ কারণের জন্যই ইহা ঘটে থাকে। এইখানে জীবদিগের স্বকীয় চেষ্টার কোনও প্রশ্ন ওঠে না। এইখানে স্থান বিশেষের জলবায়ু, আবহাওয়া, খাদ্যের গুণাগুণ ও উহার প্রাচুর্য বা অপ্রাচুর্যের প্রশ্ন উঠে। এই সকল পরিবেশগত অবস্থা ও ব্যবস্থা পরোক্ষরূপে উহাদের চর্মকোষ ও দেহাবয়বকে প্রভাবান্বিত করে তাদের ঐরূপ দৈহিক পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকে। এজন্য আমরা মরুবাসী উষ্ট্রকে ধূসর বর্ণের এবং মেরুবাসী জীবের দেহ শ্বেত বর্ণের হতে দেখে থাকি। আলোক ও অন্ধকার বা আধ-অন্ধকার এই একই কারণে জীবদিগের বর্ণ পরিবর্তনে সক্ষম। অনুরূপ ভাবে কম আহার জীবদিগকে ক্ষীণকায় এবং অতি আহার উহাদের স্থূলকায় করে দিতে পারে।]

এই সকল মতবাদ কিছুকাল আধুনিক পণ্ডিতগণ স্বীকার করতে চান নি। কারণ তাঁদের মতে স্বকীয় জীবনের এই সকল সংগৃহীত বৈশিষ্ট্য বংশগত হতে পারে না। কিন্তু এক্ষণে ঐ সকল পণ্ডিত এই বিশেষ মতবাদ স্বীকার করে নিয়েছেন। এমন কি উহা যে বংশগত হতে পারে তাও আজকাল তাঁরা স্বীকার করেন।

এক্ষণে আমি বলতে চাই যে, দেহের সহিত মনের অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ আছে। এজন্য দৈহিক পরিবর্তন যে রীতিতে সমাধা হয়, মানসিক পরিবর্তনও সেই রীতিতে সমাধা হয়ে থাকে। এই কারণে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, লোভ ও অভাব প্রভৃতির তাড়নে আপন প্রচেষ্টার দ্বারা মানুষ প্রত্যক্ষ কারণে এবং কুসঙ্গ ও কুপরিবেশ দ্বারা তারা পরোক্ষ প্রভাবে অপরাধী হয়ে থাকে বা তা তারা হতে পারে। তবে এই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কারণসমূহ যে পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করে তাহাও অবশ্যস্বীকার্য।

[প্রতীত হয় যে কু বা সু পরিবেশ অপরাধস্পৃহা ও সৎপ্রেরণাকে পরোক্ষ ভাবে যথাক্রমে সরল বা দুর্ব্বল করে এবং স্বকীয় প্রচেষ্টা উহাদের বাহক ও ধারক স্থূল বা সূক্ষ্ম বৃত্তিকে প্রত্যক্ষভাবে যথাক্রমে সবল বা দুর্বল করে।]

প্রথমে অপরাধী সৃষ্টির পরোক্ষ কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্। অসৎ ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব করে পঙ্কিল বস্তিসমূহে যারা বসবাস করে তাদের প্রায়ই আমরা অপরাধী হতে দেখেছি। বলা বাহুল্য যে অসৎ সঙ্গ অপরাধ সম্পর্কিত বাক্-প্রয়োগ তথা সাজেস্‌শন্-এর স্থলাভিষিক্ত হয়ে উঠে। এই অসৎ দৃষ্টান্ত ও সঙ্গ এবং বাসস্থান সম্পর্কীত পরিবেশের শক্তি কত সুদূরপ্রসারী হতে পারে তা নিম্নোক্ত আখ্যানভাগ হতে বুঝা যাবে।

"১৯১৭ সালে কলম্বো শহরের একটি অপরাধবহুল অংশে একটি থানা খোলা হয়। কিন্তু ঐ থানায় মোতায়েন পুলিশ বা রক্ষীদের বাসের জন্য সেখানে কোন বাটী ছিল না। এজন্য ঐ সকল রক্ষী ঐ অপরাধীগণ অধ্যুষিত বস্তিতেই বসবাসের জন্য ঘর ভাড়া নিতে বাধ্য হয়। এর অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ এই সকল রক্ষীর মধ্যে আত্মসম্মানের এবং নিয়মতান্ত্রিকতার বিশেষ অভাব দেখা যায়। এই কারণে এর পরের বৎসরের পরিসংখ্যা হতে দেখা যায় যে পূর্ব বৎসরের অপেক্ষা সেই বৎসরের অপরাধের সংখ্যা ত্রিগুণ হয়ে গিয়েছে। এর দুই বৎসর পর এই সকল পুলিশের লোকদের জন্যে বড় ম্যানশন এবং ব্যারাক বাড়ি তৈরি করে তাদের সকলকেই সেখানে স্থানান্তরিত করা হয়। এইজন্য তৃতীয় বৎসরের পরিসংখ্যাতে দেখা যায় যে সহসা ঐ স্থানের অপরাধের সংখ্যা প্রায় অর্ধেকেরও নীচে নেমে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, অপরাধের কিনারার [Detection] সংখ্যাও অপ্রত্যাশিত ভাবে দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে।"

এই কলম্বো শহরের ন্যায় বোম্বাই ও কলিকাতা শহরের ইতিহাস হতেও এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। কলিকাতার ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের দৌলতে ঐখানকার বড় বড় বস্তিসমূহ নিশ্চিহ্ন হওয়ার পর দেখা যায় যে বাস-ভূমির অভাবে অপরাধীদের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য হয়ে উঠে এবং তৎসহ কদর্য পরিবেশ-দ্বারা নূতন অপরাধীদের সৃষ্টিও আর সম্ভব হয় না।

[দৃষ্টান্ত স্বরূপ কলিকাতার জোড়াসাঁকো থানার বিষয় বলা যাক। এখানে পূর্বে ৩৬৫টি রেজিস্টার্ড পুরানো চোর ছিল এবং উহাদের প্রায় সব কয়টিকেই উপস্থিত দেখানো হতো। কিন্তু ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের বস্তি অপসারণের পর ঐ থানায় মাত্র সে সময় নয়টি রেজিস্টার্ড পুরানো চোর ছিল।]

বিঃ দ্রঃ—এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট ঐ সময় কলিকাতায় বস্তি উন্নয়ন না করে উহার উচ্ছেদ করেছিল। এর ফলে গঙ্গার ওপারে হাওড়া শহরে ঐ সকল লোক নূতন বস্তি তৈরি করে নেয়। তখন কলকাতায় অপরাধীদের কমার সঙ্গে হাওড়ায় অপরাধের সংখ্যা বর্ধিত হয়। অর্থাৎ ঐ সময়ে নদীর এক কুল ভেঙে অন্য কূল গড়ে উঠে। এজন্য এই সমস্যার স্থায়ী [প্রকৃত] সমাধান হয় নি। কারণ, পরে তারা নদীর ওপার হতে এপারে এসে অপকর্ম শুরু করে।

উপরে পরোক্ষ কারণে উদ্ভূত অভ্যাস-অপরাধীদের সম্বন্ধে বলেছি। এইবার প্রত্যক্ষ কারণে উদ্ভূত অভ্যাস-অপরাধীদের সম্বন্ধে বলব। এইস্থলে মানুষ সুপরিবেশে বাস করেও অভাব এবং লোভের কারণে ধীরে ধীরে স্বকীয় প্রচেষ্টায় অভ্যাস অপরাধীতে পরিণত হয়েছে। আমার বক্তব্য বিষয়টি নিম্নের তালিকাটি হতে বুঝা যাবে। প্রায় ১২০টি অপরাধীর জীবনী পর্যালোচনা করে আমি তালিকাটি প্রস্তুত করেছি।

(১)	সৎবংশে জন্মে সৎপরিবেশে মানুষ হয়েছে	...	৫
(২)	অসৎ পরিবারে জন্মে অসৎ পরিবেশে মানুষ	...	৭৫
(৩)	সৎবংশে জন্ম কিন্তু অসৎ পরিবেশে মানুষ	...	৩০
(৪)	অসৎ বংশে জন্ম কিন্তু সৎ পরিবেশে বর্ধিত	...	১০
	অপরাধীদের মোট সংখ্যা		১২০

যে সময় আমি এই তালিকাটি প্রস্তুত করি সেই সময় উহাদের ব্যবহার হতে উহাদের অভ্যাস-অপরাধীরূপে আমি চিনে নিতে পারি। খুব সম্ভবতঃ এদের অধিকাংশই ছিল একান্ত রূপেই অভ্যাস-অপরাধী। এক্ষণে আমি এই অভ্যাস-অপরাধীদের জন্মের মূল কারণ এবং তাদের ধীরে ধীরে প্রাথমিক অপরাধী হতে প্রকৃত অপরাধীতে পরিণত হওয়া সম্বন্ধে বিশদরূপে আলোচনা করব।

দেহকোষের ঊ অংশ অপরাধ স্পৃহা বর্দ্ধিত করে উহার বহিঃপ্রকাশ দ্বারা কোনও নিরপরাধী মানুষ অপরাধীতে পরিণত হলে তাদের আমরা অভ্যাস-অপরাধী বলি। এদের এই অপরাধস্পৃহার বহিঃপ্রকাশ অভ্যাসজনিত হয়ে থাকে। এইজন্যে এদের আমি অভ্যাস-অপরাধী আখ্যা দিয়েছি।

আমি বলেছি যে মানুষের আদিম অপরাধ-স্পৃহা বাহ্যতঃ পরিত্যক্ত হ'লেও

মানব মনের অন্তরপ্রদেশ হ'তে তা আজও সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয় নি। পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে পাপ ও অন্যায় রূপ দুইটি ধর্ম সম্বন্ধে বলা হয়েছে। মনুষ্য সমাজে এই পাপ ও অন্যায়ের প্রাবল্য মানুষের অন্তর্নিহিত অপরাধ-স্পৃহার একটি বিশেষ প্রমাণ। জলপাত্র থেকে মাত্রাধিক্যের কারণে উপচে পড়া জলের সঙ্গে এর তুলনা করা চলে। কোনও ভূমিখণ্ডের উপর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ড দেখে ভূতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ যেমন বলে দিতে পারেন যে সেই ভূমিখণ্ডের তলায় খনি আছে, তেমনি মনুষ্য সমাজে এই অন্যায় ও পাপের প্রাবল্য দেখে আমরাও জানতে পারি যে, মানুষ মাত্রেরই মন অপরাধপ্রবণ। প্রত্যেক স্বাভাবিক মানুষের মনে অপরাধ-স্পৃহা অল্পবিস্তর বিদ্যমান। আদিম মনোবৃত্তি সকল মানুষের মধ্যেই কিছু না কিছু রয়ে গেছে। কারও মধ্যে কম, কারও মধ্যে বেশি! শিষ্টতার প্রাচুর্য ও সাহসের অভাব সহজ মানুষকে এরূপ ইচ্ছা থেকে রক্ষা করে। কখন যে কোন্ দুর্বল মুহূর্তে কার মধ্যে এই ইচ্ছা প্রকাশ পাবে তা কেউ বলতে পারে না। এই সম্পর্কে প্রমাণ স্বরূপ নীচে একটি স্বীকারোক্তি উদ্ধৃত করা হ'ল। উহা হতে এই বিশেষ তথ্যটি প্রতীয়মান হবে।

"আমি বিনা ধুমপানে বহু দূর চলে এলাম। এক জায়গায় দেখলাম, লেখা 'ধুমপান নিষিদ্ধ।' হঠাৎ জেগে উঠলো আমার আদিম অপরাধ-স্পহা; ঐ সময় বহু চেষ্টায়ও আমি ঠিক থাকতে পারি নি। কেন জানি না ঐ জায়গায় দাঁড়িয়েই ধুমপান করবার একটি দুর্দমনীয় ইচ্ছা আমাকে পেয়ে বসল।"

উপরিউক্ত কাহিনী থেকে আমরা বুঝতে পারি যে কোন মানুষই আদিম বৃত্তি একেবারে ভুলে না। সকলের মধ্যেই অপরাধী-সুলভ মনোবৃত্তি সুপ্ত অবস্থায় আছে। যে কোনও দুর্বল মুহূর্তে তা আত্মপ্রকাশ করতে পারে। কুসঙ্গ, লোভ, ক্রোধ, হিংসা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, পারিপার্শিক বা সামাজিক অসমতা ও দুর্বলতা প্রভৃতি দোষ মানুষের এই মনোবৃত্তির আত্মপ্রকাশের সহায়ক হয়। যে কোনও সৎলোক মনের দুর্বলতা জনিত কিংবা কুসঙ্গে পড়ে অপরাধীদের পর্যায়ভুক্ত হ'তে পারে। কি ভাবে তা সম্ভব হয়, তা নীচের এই স্বীকারোক্তি থেকে বুঝা যাবে।

"একটা দোকানে জিনিস কিনতে এসে দোকানীর অজ্ঞাতেই কিছু সুতা তুলে জিনিসটি আমি বেঁধে নিই। তুচ্ছ জিনিস বিশ্বাসে দোকানীর অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি নি। কিন্তু সুতা নেওয়ার ব্যাপার দোকানী লক্ষ্য করতে পারে নি দেখে, কি জানি কেন আমি বেশ একটু আত্মতৃপ্তি লাভ

করলাম। আমার মধ্যেকার সুপ্ত অপরাধ-বৃত্তি যেন জাগ্রত হয়ে উঠেছে। পরদিন দোকানে আসামাত্র আমার মন আবার অপরাধমুখী হয়ে উঠলো। দোকান থেকে একটা জিনিস উঠিয়ে নিয়ে দাম দেবার জন্যে দাঁড়িয়ে থেকেছি। অন্যান্য খরিদ্দার নিয়ে ব্যস্ত থাকায় দোকানী আমায় লক্ষ্য করেনি। হঠাৎ কি মনে হ'ল জানি না, আমি দাম না দিয়েই সরে পড়লাম। এমনি ভাবে আমার লোভ বেড়ে যায়। আমি পরে অন্য দোকানেও গিয়েছি। আমার বহু কুসঙ্গীও জোটে, পরামর্শেরও অভাব নেই। আমি কোকেনও খেতে শিখি। শেষে একদিন আমি ধরা পড়ি। একবার, দুবার, তিনবার, বহুবার জেল খেটেছি। মাত্র কয়েক বৎসরের ব্যবধান। আমি এখন অতি ঘৃণ্য একজন দাগী চোর।"

মানব-মনের সত্যকার অবস্থা হচ্ছে এইরূপ। আইনের ভয়, শিক্ষা ও পুরুষানুক্রমিক সংস্কার প্রভৃতি মানুষের এই স্বভাব-সুলভ অপরাধ-স্পৃহাকে সংযত রাখে মাত্র। ভয় বলতে এখানে শুধু আইনের ভয়ই নয়, উহার দ্বারা ঈশ্বর তথা ধর্মের ভয়ও বুঝায়। কেউ ইহলোকের রাষ্ট্রীয় শাস্তিকে ভয় করে। কারও বা সংস্কারবদ্ধ মন ভয় করে পরলোকের শাস্তিকে। এই উভয়বিধ ভয়ই ইচ্ছা সত্ত্বেও মানুষকে অনেক দুষ্কার্য থেকে বিরত রাখে। এদব্যতিরেকে বহু মানী-গুণী মানুষ সম্মানহানির ভয় করে। এই ভয় ও সংস্কার মানব-মনের চেতন এবং অচেতন উভয় স্তরেই বিদ্যমান। এই ভয়, সংস্কার ও শিক্ষাকে আমরা খনির উপরকার শক্ত মাটির সঙ্গে তুলনা করতে পারি। উপরকার এই কঠিন ভূস্তরের জন্য যেমন আমরা নিম্নের খনির অস্তিত্ব সম্বন্ধে জানতে পারি না, তেমনি শিক্ষা, সংস্কার ও ভয়ের জন্য আমরা আমাদের অন্তর্নিহিত অপরাধ-প্রবণতা সকল সময় অনুভব করি না। এই শিক্ষা, সংস্কার ও ভয়ের গভীরতার তারতম্য অনুসারে মানুষের মন কমবেশি অপরাধ-প্রবণ হয়। এক কথায়, শিক্ষা সংস্কার ও ভয় বেশি থাকলে অপরাধ-স্পৃহা অন্তর্মুখী হয়। অর্থাৎ উহা তখন আমাদের মধ্যে সুপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়। অন্যদিকে শিক্ষা, সংস্কার ও ভয় কম বা বিপরীত শিক্ষা ও সংস্কার প্রবল হ'লে বা ভয় অপসারিত হ'লে এই অপরাধ-স্পৃহা বহির্মুখী হয়। অর্থাৎ উহা তখন আমাদের মনে জাগ্রত হয়ে উঠে। অপরাধ-স্পৃহার বহির্মুখী হওয়ার প্রথম বাধা হচ্ছে মানুষের জন্মগত সংস্কার; পুরুষানুক্রমে সৎ থাকার পর হঠাৎ অসৎ হওয়ার পথে উহা একটা মস্ত বাধা। অপস্পৃহার বহির্গমনের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বাধা হচ্ছে মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা। ব্যক্তিভেদে এই সকল বাধা বা বেরিয়ারের ঘনত্ব কম বা বেশি হয়ে থাকে।

সৎ বংশের ছেলেদের পক্ষে এই দ্বিতীয় বাধা প্রথম বাধাকে আরও শক্ত করে। রাষ্ট্রীয় আইন বা ঈশ্বরের ভয় হচ্ছে উহাদের তৃতীয় বাধা। এই ভয় প্রথম ও দ্বিতীয় বাধাকে আরও শক্ত করে। রাষ্ট্রীয় আইনের সার্থকতা এইখানেই। এই ভয়, শিক্ষা ও সংস্কার স্ব স্ব উপস্থিতি ও ক্ষমতা অনুযায়ী মানুষের এই স্বভাবসুলভ অপরাধ-স্পৃহাকে সংযত করে থাকে।

শিক্ষা বলতে এখানে আমরা নৈতিক শিক্ষাই বুঝব। শিক্ষা তিন প্রকারের হয়ে থাকে,—দৈহিক, নৈতিক ও বুদ্ধিগত। দৈহিক ও বুদ্ধিগত শিক্ষা বরং অনেক সময় অপরাধীদের অপরাধ-প্রণালীর সহায়ক হয়। এক মাত্র নৈতিক শিক্ষাই মানুষের অপরাধ-স্পৃহার হ্রাস ঘটাতে সক্ষম হয়। দৈহিক ও বুদ্ধিগত শিক্ষা এই বিষয়ে একেবারেই কার্যকরী হয় না। যে ব্যক্তির টপ্‌কা ঠগী হবার কথা তাকে যদি নৈতিক শিক্ষা না দিয়ে কেবলমাত্র বুদ্ধিগত শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে সে ব্যাঙ্ক-স্বইণ্ডলার হবে। নৈতিক শিক্ষা ব্যতিরেকে কেবল মাত্র বুদ্ধিগত [ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল] শিক্ষা তাদের দিলে তারা ঐ অবস্থায় কখনও সাধু পদবাচ্য হয়ে উঠবে না।
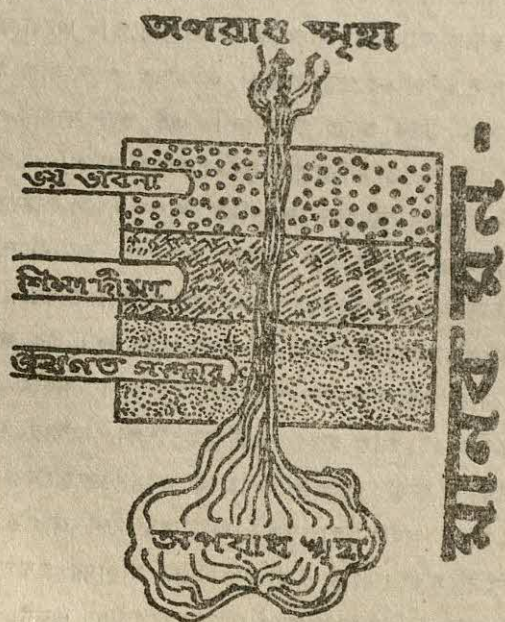
মানুষের অপস্পৃহাকে উপরোক্ত বাধা দ্বারা সংযত করার ক্ষমতাকেই বলা হয় প্রতিরোধ-শক্তি বা পাওয়ার অব রেজিসটেন্স্‌। মানুষের এই অপরাধ-

প্রবণতা 'ভলকানিক' পদার্থের ন্যায় মানুষের শিক্ষা, দীক্ষা ও সংস্কারের পাথর ফুঁড়ে বাইরে আসতে চায়, কিন্তু শিক্ষা ও সংস্কারের প্রাবল্য তখন তাদের এই অপরাধ-স্পৃহাকে দাবিয়ে রাখে। খনির উপরকার মৃত্তিকা-স্তর না সরালে যেমন খনিজ দ্রব্যের অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না, তেমনি শিক্ষা, দীক্ষা, এবং সংস্কারের বাঁধ না ভাঙ্গলে অপরাধ-প্রবণতার স্বরূপ বুঝা যায় না। খনিজ দ্রব্য উত্তোলনের জন্য প্রচুর সময় ও যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়। ঠিক এইরূপেই সদবংশের ধর্ম্মভীরু কোনও ব্যক্তির ভিতরকার অপরাধ-স্পৃহা জাগ্রত করতে হলেও কিছু সময় ও কার্য-করণের প্রয়োজন হয়। মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, লোভ ও অভাব বা প্রয়োজনকে উক্তরূপ যন্ত্রপাতির সঙ্গে, মানুষের সংস্কার, শিক্ষা ও ভয়কে খনির উপরকার মৃত্তিকার স্তরের সঙ্গে এবং খনিগর্ভস্থ খনিজ দ্রব্যের সঙ্গে অপরাধ-স্পৃহার তুলনা করা চলে। যন্ত্রপাতির সাহায্যে যেমন ধীরে ধীরে মৃত্তিকা স্তর অপসরণ করে খনিজ দ্রব্যাদি উত্তোলন করা হয়, ঠিক তেমনি লোভ ও অভাবের সংস্পর্শে এসে মানুষের শিক্ষা সংস্কার ও ভয় দূরীভূত হয় এবং উহার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ ধীরে ধীরে অপরাধ-স্পৃহার আবির্ভাব ঘটে! এই লোভ, অভাব ও কুসঙ্গ তাদের স্ব স্ব ক্ষমতা অনুযায়ী আঘাত হেনে মানুষের শিক্ষা সংস্কার ও ভয়কে অপসারিত করে তার অন্তর্নিহিত অপরাধ-স্পৃহাকে যে কোনও মুহূর্তে বহির্মুখী করতে পারে। এই অপরাধ স্পৃহার বহিবকাশ মানুষের শিক্ষা সংস্কার ও ভয় রূপ প্রস্তরের কাঠিন্যের ও প্রাবল্যের উপর নির্ভর করে।

পূর্বেই বলেছি, এইরূপ বিপর্য্যয় একদিনে সাধিত হয় না। আমরা এমন বহু বিশ্বাসী দ্বারবান দেখেছি যারা লাখ দুই টাকা নিরাপদে গত বিশ ত্রিশ বছর ধরে ব্যাঙ্কে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। সে বিষয়ে কখনও তারা বিশ্বাস ভঙ্গ করে নি। কিন্তু যখন কেউ পালালো তখন হয়তো মাত্র দুই হাজার টাকা নিয়ে পালালো। ব্যাঙ্কের বিশ্বাসী ট্রেজারার—ব্যাঙ্কের উন্নতির জন্য চেষ্টায় তার ত্রুটি নেই। হঠাৎ একদিন শুনা গেল, সে বিশ হাজার টাকার তহবিল তছরূপ করেছে। সাধারণতঃ আমরা এই সব বিশ্বাসী বন্ধুর কাণ্ড কারখানা দেখে অবাক হই। এরূপ ঘটনা কিরূপ অবস্থায় ঘটে, তা নিম্নের বিবৃতি মূলক ঘটনাটি হতে বুঝা যাবে।

"তোমার নিকট ভাই কোনও বিষয়ই গোপন করবো না। তোমরা জানতে যে আমি একজন নামজাদা সওদাগরী অফিসের বড় সাহেবের পেটোয়া ও মোটা মাইনের হেড ক্ল্যার্ক। কিন্তু আমার সংসারের জন্য প্রতি মাসে কত খরচ হতো তার হিসাব তোমরা রাখো নি। চাঁদার খাতা নিয়ে যখনই এসেছো, তোমরা

নিয়ে গিয়েছ একটা মোটা অর্থের অঙ্ক। বন্ধু বান্ধবকে কর্জ দিয়ে ও দান করে আমি ফতুর হয়েছি। কিন্তু ওদের কাউকে আমি কখনও বিমুখ করি নি। পরিচিতদের কাছে মান ও প্রতিপত্তি বজায় রাখার জন্য দেনাও করেছি অনেক। তাগাদার জালায় অস্থির হয়ে একদিন ভাবলাম অফিসের ক্যাশ থেকে কিছু নিয়ে দেনার টাকাটা মিটিয়ে দিই। কথাটা কিন্তু মনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমি চমকে উঠি। আমি ভাবি, তাও কি কখনও হয়! এর চেয়ে আত্মহত্যা করা ভাল। এই রকম একটা কুকাজ করা আদবে উচিত কিনা এবং ধরা না পড়ে কাজ হাসিল করা সম্ভব কিনা, অভাবের তাড়নায় প্রায়ই আমি নিজের মনেই এ বিষয়ে জল্পনা-কল্পনা করতাম। পরক্ষণেই কিন্তু আমার মনে এরূপ চিন্তার জন্য ধিক্কার আসত। কিছুদিন পরে দেখলাম এরূপ কল্পনা আমার কাছে বেশ সহজ হয়ে উঠেছে। এরূপ চিন্তার মধ্যে যেন আর এতটুকুও গ্লানি নেই। প্রায় শুনি ও পড়ি যে অমুক ব্যক্তি অমুক জায়গা থেকে দুলাখ মেরে বেশ আছে। আইন-আদালত তার কিছুই করতে পারি নি। 'এমনি ভাবে এমনি করে কাজ শেষ করা যায়। এই এই করলে ধরা নাও পড়তে পারি। সাহেব কোম্পানির অনেক টাকা আছে। ওতে কি আর এমন তাদের ক্ষতি হবে! ছুৎ, শালারা গরিব মেরে পয়সা করে! আমিও ত একজন গরিব মানুষ। আমাকে ওরা শুধু দিন রাত খাটিয়ে নেয়। আমাকে কতই বা তারা মাইনে দেয়!' এরূপ পরামর্শ পূর্বে কেউ আমাকে দিলে তাকে আমি প্রহার করতাম! পরে কিন্তু এরূপ পরামর্শের জন্যই আমার মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে! একদিন এক ধনী ও সুখী পরিবার সম্বন্ধে আলোচনা চলছিল। তাঁদের পূর্বপুরুষ নাকি তহবিল তছরুপ করে বড়লোক হন। হাজার হাজার লোক তাঁকে সম্মান করত। দান-ধ্যানও ছিল তাঁর বিস্তর।

পূর্ব থেকেই আমার মধ্যে জমি প্রস্তুত ছিল। বহুদিন ধরে এসব আমি কল্পনা করেছি। আমার মন তাকে সেদিন রূপ দিতে চাইল। এদিকে আর্থিক অবস্থা আমার মন্দ থেকে আরও মন্দ হয়ে উঠেছে। একদিন অনটনের চাপও পড়ল খুব বেশি। কিছু টাকা আমার সেদিন চাই-ই। কপাল গুণে সুযোগ হ'ল সেই দিনই সব চেয়ে বেশি। কি ভাবে কাজ হাসিল করতে হবে পূর্ব-হতেই তা আমার ভাবা ছিল। এজন্য ঐ কাজে কিছুমাত্র অসুবিধা হ'ল না। আমার মনের মধ্যে স্তূপীকৃত বারুদ যেন একটা জলন্ত দেশলায়ের কাঠির অপেক্ষায় ছিল। আমি সেইদিন লোভে পড়ে তহবিল তছরুপ করে বসলাম। ঐ টাকা

পরে সুবিধা মত পূর্ব স্থানে আমার ন্যস্ত করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ভাগ্য দোষে সে সুযোগ আমি পাই নি। তুমি নিশ্চয় শুনেছ আমার আট মাস জেল হয়েছে। আমি বউ আর বাচ্ছা ছেলেটাকে গাঁয়ে পাঠিয়েছি। একটু দেখো তুমি তাদের ভাই! ওই নির্দোষী লোকগুলো যেন খুব বেশি কষ্ট না পায়।"

ধর্মঘটজনিত অপরাধ সমূহও এরূপ চিত্ত-প্রস্তুতির প্রত্যক্ষ ফল। ফ্যাক-টরিতে শান্তিপূর্ণভাবে শ্রমিকেরা কাজ করে চলেছে। হঠাৎ তারা একজোটে কর্মত্যাগ করে ম্যানেজারকে নিহত করল। ঘটনাটি বাহ্যতঃ একদিনে সংঘটিত হলেও অপরাধীদের গণ-চিত্ত এর জন্য বহুদিন ধরে প্রস্তুত হয়েছে। অভাব ও অত্যাচার জনিত আক্রোশ বহুদিন ধরে তাদের চিত্তমধ্যে সঞ্চিত হচ্ছিল। এখানে এই বারুদের স্তূপ কেবল মাত্র অগ্নি-সংযোগ চাইছে। এই সময় কোনও নেতা এসে তাদের উত্তেজিত করলে তারা একদিনে অপরাধ-মুখী হয়ে উঠবে।

বিগত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় এইজন্য আমরা উত্তেজনার কারণে এক-দিনেই অনেককে অভ্যাস-অপরাধীতে পরিণত হতে দেখেছি। এর কারণ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বহু দিন বা বহু পুরুষ যাবৎ তাদের মধ্যে তৈরি ছিল। এই ঐতিহাসিক বিষ এবার সুযোগ পেয়ে কেবলমাত্র বার হয়ে এসেছে।

অনেকের বিশ্বাস যারা পুনঃ পুনঃ অপরাধ করে তাদেরই অভ্যাস-অপরাধী বলা হয়। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে তা সত্য নয়। একবার অপরাধ করলেও এই অপরাধটির জন্য চিত্তকে কেউ বহু-দিন থেকে প্রস্তুত করে অপরাধ করলে তাকেও আমি অভ্যাস-অপরাধী বলবো।

উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসমতা প্রভৃতিও অনেক সময় অপরাধ-স্পৃহার বহির্বিকাশের সহায়ক হয়। কোনও কোনও ব্যক্তি অফুরন্ত কর্মশক্তি ও প্রতিভা নিয়ে বেঁচে থাকে, কিন্তু তার সেই কর্ম-শক্তি ও প্রতিভার বিকাশের কোনও উপযুক্ত ক্ষেত্র সে পায় না। সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে সৎ উপায়ে সে বড় হ'তে বা নাম অর্জন করতে না পারলে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রায়ই সে অসৎ উপায়ের সাহায্য নিয়ে থাকে। অনেককে আবার একটা সস্তা ও সাময়িক নামের আকাঙ্ক্ষাও পেয়ে বসে। তারা তখন সুবিধামত রাজ-নৈতিক, সাম্প্রদায়িক বা অর্থ-নৈতিক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত হয়। এদের ভিতর কোনও বিশেষ আদর্শ নেই, আছে শুধু নামের আকাঙ্ক্ষা। এমন অনেক ভাল লোককেও আমি জানি যারা এই সব অপকার্যে কেবলমাত্র খবরের কাগজে

তাদের নাম বার হওয়ার জন্যে লিপ্ত হয়। অনেককে আবার সৎ উপায়ে কার্য আরম্ভ ক'রে পরে অকৃতকার্য হওয়ার জন্যে অসৎ উপায় গ্রহণ করতেও দেখা গেছে। এই একই কারণে দেশের অনেক বরেণ্য ব্যক্তিও রাজনৈতিক মতবাদের অনাবিষ্কৃত বা আন-এক্সপ্লয়টেড্ ক্ষেত্রগুলি বিবেকের বিরুদ্ধেও বেছে নেন্। কেবলমাত্র সহজ উপায়ে নাম অর্জনের জন্য উহা তাঁরা করে থাকেন। কিন্তু সুবিখ্যাত বা কুবিখ্যাত হওয়ার পর সুবিধামত এঁরাই আবার পরে নিজেদের আকাঙ্ক্ষিত মতবাদে ফিরে আসেন। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষার ন্যায় অর্থনৈতিক অসমতাও মানুষকে অপরাধী করে তুলে। যুদ্ধের সময় দেশে অর্থনৈতিক অসমতা প্রকটরূপে দেখা দেয়। পূর্বেকার ধনী লোক হয়ে যায় দীন-দরিদ্র এবং পূর্বেকার দীন-দরিদ্রেরা হয়ে উঠে ধনী। সকলেই লক্ষ্য করে টাকা আকাশে উড়ছে, উহা সুযোগ মত ধরে নিলেই হয়। একজন তার অনেষ্টি বা সাধুতার বোঝা নিয়ে অনাহারে মরে। অন্য জন তারই পাশের টেবিলে উৎকোচ গ্রহণ দ্বারা লাভ করে আর্থিক সচ্ছলতা। যুদ্ধকালীন সুযোগ, সুবিধা ও অর্থ-নৈতিক অসমতা মানুষের সুপ্ত অপরাধ-স্পৃহাকে বহির্মুখী বা জাগ্রত করে অনেক সাধু লোককেও অপরাধীতে পরিণত করে। এইজন্য এই বিশেষ মনোবৃত্তিকে বলা হয় যুদ্ধ-কালীন মনোবৃত্তি। এই জন্য যুদ্ধের সময় সাধারণ আইন বহির্ভূত অনেক নূতন নূতন আইন প্রণীত হয়ে থাকে। এই সব গণ-অপরাধ দমন করার জন্যে ইহার প্রয়োজন হয়।

কুসঙ্গ, লোভ, অভাব, প্রতিশোধ-স্পৃহা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ব্যবস্থা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির ন্যায় ঔষধাদি দ্বারাও মানুষের অন্তর্নিহিত অপরাধ স্পৃহার বিকাশ সাধন হয়। কোকেন একপ্রকার স্নায়ুর উপর কার্যকরী ঔষধ। নিয়মিত কোকেন প্রয়োগ দ্বারা যে কোন সহজ মানুষকে অপরাধীতে পরিণত করা যায়। মানুষের অপরাধ-স্পৃহা তাহার স্নায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কোকেন প্রভৃতি ঔষধ স্নায়ুর উপর ক্রিয়া করে। হতে পারে যে কোকেন দেহাভ্যন্তরস্থ রস-পিণ্ডগুলিকে উত্তেজিত করে। ফলে রস-পিণ্ডগুলি হতে রস নির্গত হয়। এই রস ধমনীর মাধ্যমে স্নায়ুগুলিকে প্রভাবান্বিত করে। কারণ যাই হোক, কোকেন প্রভৃতি ঔষধ মানুষকে অপরাধ-প্রবণ করে। এ সম্বন্ধে আমি বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নিঃসন্দেহ। প্রায় দেখা যায়, পুরানো চোরেরা ছোট ছোট ছেলেদিগকে পানের সঙ্গে কোকেন খাওয়ায়। এই ভাবে তারা তাদের অপরাধ-স্পৃহা জাগ্রত করে দলের জন্য ছেলে সংগ্রহ করে। এতদ্ব্যতীত দুর্দমনীয়

নেশার কারণে বারে বারে এই সকল বালক দলপতিদের সাহচর্য কামনা করে। বে-আইনী কোকেন চালুর সঙ্গে সঙ্গে স্থান বিশেষে চৌর্যাদি অপরাধের সংখ্যা-বৃদ্ধি এর একটি বিশেষ প্রমাণ। এই কোকেন ছেলেদের চোর এবং মেয়েদের বেশ্যায় পরিণত করে। অর্থাৎ এই ঔষধ মানবের অন্তর্নিহিত অপস্পৃহা এবং মানবীর আদিম বহুপতিত্ব-স্পৃহা জাগ্রত করে। (f) এইজন্য আমরা সাধারণতঃ চোরেদের এবং বেশ্যাদের কোকেনখোর হতে দেখেছি। এই ঔষধ দৈহিক অসাড়তা আনয়ন করে। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ নৈতিক অসাড়তা তাদের মধ্যে স্থান পায়। ইহার কারণ এই যে, দেহের সহিত মনের অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ আছে। আমার মতে মানুষের স্নায়বিক ব্যবস্থার একাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে উহার অন্যাংশও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এইজন্য এইরূপ হয় বলে আমি মনে করি। আমার এক সাধুচরিত্র পুলিশ-বন্ধু কোকেন খেয়ে অনুভব করেছিলেন যে তাঁর মধ্যে অপস্পৃহা জাগ্রত হয়ে উঠেছে।

কলকাতায় এমন অনেক মধ্যবয়স্কা [নারী] সংগ্রাহিকা আছে। এরা নানা অছিলায় ভদ্রপরিবারে মেলামেশা করে এবং সেখানকার কোনও এক সুন্দরী কন্যা বিশেষকে বেছে নিয়ে পানের সঙ্গে তাকে কোকেন খাওয়ায়। এই ভাবে ধীরে ধীরে মেয়েদের মনের প্রতিরোধ-শক্তি নষ্ট ক'রে তাদের মধ্যে নির্বিচার যৌন-স্পৃহার আবির্ভাব ঘটিয়ে ঐ সংগ্রাহিকা আপন উদ্দেশ্য হাসিল করে। হঠাৎ মেয়েটিকে সংগ্রাহিকার অনুরক্ত হতে দেখে বাটীর সকলে অবাক হলেও তারা কখনও সেই সম্পর্কে সময়মত সাবধান হয় না।

কোকেন আদি ঔষধ যেমন চৌর্য আদি দ্রব্যাত্মক অপরাধের সহায়ক হয়, তেমনি মাদক আদি ঔষধ সহায়ক হয় খুন, জখম আদি শোণিতাত্মক অপরাধ-সমূহের। প্রথমোক্ত অপরাধসমূহকে বলা হয় দ্রব্যাত্মক অপরাধ ও শেষোক্ত অপরাধ সমূহকে বলা হয় শোণিতাত্মক অপরাধ। ইংরাজিতে এদের যথাক্রমে বলা হয়ে থাকে 'উইদাউট্ ভায়লেন্স' এবং 'উইথ্ ভায়লেন্স' অপরাধ। মাদক দ্রব্যের সমধিক প্রচলনের সঙ্গে শেষোক্ত এবং অবৈধ কোকেন প্রচলনের সঙ্গে প্রথমোক্ত অপরাধের সংখ্যা বর্ধিত হয় বলে মনে হয়। কোকেন আদির ন্যায় মাদক আদি সম্বন্ধেও এই একই কথা জোর করে বলা যেতে পারে। এ সম্বন্ধে

(f) বুঝা যায় যে কোন মানুষের মস্তিষ্কের প্রতিরোধ সম্পর্কিত সূক্ষ্ম স্নায়ু আহত করলে পুরুষের ক্ষেত্রে অপরাধ-স্পৃহা এবং নারীর ক্ষেত্রে বেশ্যাবৃত্তি বহির্গত করে। ইহা প্রমাণ করে যে সাধারণতঃ নারীরা অপরাধী না হয়ে বেশ্যা হয়ে থাকে।

আমি বিশেষ রূপে অনুসন্ধান করেছি। মাদক দ্রব্য মানুষের সহজাত অপরাধ-স্পৃহার দমনেচ্ছার বিলোপ ঘটায় এবং এজন্য অনেক দুর্বৃত্ত হত্যা অপরাধ করবার পূর্বে ইচ্ছা করে মদ খায়।

ঔষধাদির ন্যায় সাজেস্‌শন বা বাক্‌-প্রয়োগ দ্বারাও মানুষকে অপরাধী করে তুলা সহজ। পূর্বেই বলেছি প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কম-বেশি সুপ্ত অপরাধ-স্পৃহা বর্তমান। যার মধ্যে যত বেশি পরিমাণ অপরাধ-স্পৃহা আছে তাকে তত শীঘ্র এবং সহজে অপরাধী করা যায়। এ সম্বন্ধে নিম্নের বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।

"আমি একটি নামজাদা অফিসের স্টোর-কিপার [ভাণ্ডার রক্ষক]। ওপর-ওয়ালাদের আমার উপর অগাধ বিশ্বাস ছিল। সব কিছুই তাঁরা আমার উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। হঠাৎ একদিন এক ভদ্রলোক একটা তাসের মজলিসে আমার সঙ্গে আলাপ জমাল। ধীরে ধীরে সে আমার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে উঠল। ভদ্রলোক বাজারে দালালি করত। সে প্রায়ই ব্ল্যাক-মার্কেট বা চোরা বাজার সম্বন্ধে আমার সঙ্গে আলাপ করত। এই সব চোরা-কারবার থেকে কত গরীব কি ভাবে কত সময়ের মধ্যে ধনী হ'তে পেরেছে, সেই সম্বন্ধে অনেক চমকপ্রদ গল্প প্রতিদিন ঐ ভদ্রলোক ইনিয়ে বিনিয়ে সকল সময়ে আমায় শোনাত। প্রথম প্রথম এই সব ভদ্র-বেশী গৃহস্থ চোরদের উপর আমার ঘৃণাই আসত। একদিন কথায় কথায় আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি,—'আচ্ছা! এই সব মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য জিনিষ চোরা-হাটায় আসে কি করে?' উত্তরে ভদ্রলোক জানালো, 'কেন? আপনার মতই কর্মচারীরা বড় বড় কোম্পানির গুদাম থেকে মাল পাচার করে আমাদের দেয়।' এর পর সে আমায় প্রায়ই বড়লোক হবার লোভ দেখাত। কিন্তু আমি সব সময়ই তার এই সব কু-প্রস্তাব সকল প্রত্যাখ্যান করতাম। বেশ মনে পড়ে এগারো বার আমি তার এই কু-প্রস্তাব সকল প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। কিন্তু বারো বারের বার আমার মনটা যেন কেমন উতলা হয়ে উঠল। ঠিক এই সময় ভদ্রলোক আমায় নানারূপ প্রলোভন দেখাতে লাগল। সে আমায় বোঝালে যে বড়লোকদের সামান্য কয়েকটা জিনিস অপহরণ করলে তাদের কোন ক্ষতি হবে না। এমন কি এতে কোনও দোষও বর্তায় না। ধীরে ধীরে আমি তার কথাগুলি বিশ্বাস করতে শুরু করলাম। একদিন তার কথায় আমি রাজিও হয়ে গেলাম। তখনও পর্যন্ত আমি জানতাম না যে ভদ্রলোক কোম্পানিরই নিযুক্ত একজন গোয়েন্দা বা গুপ্তচর। কোম্পানি

তাকে ফ্যাকটরিতে চুরি বন্ধ করবার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। পুরস্কারের লোভে সে আমাকে দিয়েই জিনিস বার করিয়ে কোম্পানির নিযুক্ত জাল তথা ভূয়া ক্রেতাকে সেই জিনিসগুলি আমাকে দিয়েই বিক্রি করায়। ঐ সময় পূর্ব বন্দোবস্ত মত আমাদের প্রতিষ্ঠানের বড় সাহেব দূরে অপেক্ষা করছিলেন। তা ছাড়া নোটে মার্কা দেওয়াও ছিল। হাঁ, বলি শুনুন। এরপর আমি ধরা পড়ি এবং আমার জেল হয়।"

এইভাবে এজেন্ট প্রভোগেটার বা প্রলুব্ধকারী চর দ্বারা অসুস্থমনা অপরাধ-মুখী মানুষকে ত অপরাধী করা যায়ই, এমন কি সুস্থ সহজ সাধুপ্রকৃতির মানুষকেও এইভাবে অপরাধীতে পরিণত করা সম্ভব। বাক্-প্রয়োগ বা সাজেস্‌শনের ক্ষমতা যে কত অসীম তা মনোবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত মাত্রেরই জানা আছে। পুনঃ পুনঃ সাজেস্‌শন দ্বারা সাধুকেও চোর করা যায়। মানুষের অন্তর্নিহিত সুপ্ত অপরাধ-স্পৃহাই মানুষের এরূপ অবস্থার জন্য দায়ী। উক্তরূপ পরীক্ষা দ্বারা মানুষের অন্তর্নিহিত অপরাধ-স্পৃহার অবস্থিতি প্রমাণিত হয়।

এই সাজেস্‌শন বা বাক্-প্রয়োগ দেশের সাহিত্য ও আলোক-চিত্রের মধ্য দিয়েও প্রকাশ পায় এবং ওগুলো স্ব স্ব ক্ষমতা অনুযায়ী মানুষের অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক অপস্পৃহার বহির্বিকাশের সহায়ক হয়। এইজন্য সৎ-সাহিত্য পাঠে মানুষ সৎ এবং অসৎ-সাহিত্য পাঠে মানুষ অসৎ হয়ে থাকে। আলোক-চিত্র [সিনেমা] হ'তে অনুপ্রেরিত হয়ে চিত্র প্রদর্শিত পন্থা অনুযায়ী বহু বালক ও যুবকের অপরাধীতে পরিণত হওয়ার দৃষ্টান্ত কোনও দেশে বিরল নয়। এ সম্বন্ধে এ দেশের আধুনিক সাহিত্যের নমুনা স্বরূপ কয়েকটি চোখা চোখা বাক্য নিম্নে উদ্ধৃত করলাম, যথা—(১) আচ্ছা ভাই, নারী কি চায়? আমার মতে নারী চায় এই যে পুরুষ তার দেহ ও মনের উপর ডাকাতি করুক। (২) সতীত্ব একটা কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়; তা ছাড়া জানতে পারলেই দোষ, না জানলেই দোষ নেই। (৩) পাপ-পুণ্য মনের বিকার। দেয়ার ইজ নাথিং গুড্ অর ব্যাড্ ইন্ দিস ওয়ার্লড, বাট্ থিংকিং মেকস্ ইট্ সো। (৪) ডেথ্ ইজ্ এ মেকানিকেল স্টপেজ অফ হার্ট। এ পারেও কিছু নেই, ওপারেও না। পরলোক বা পাপের ভয় জুজুর ভয়েরই নামান্তর মাত্র। খাও দাও স্ফূর্তি করো, আত্মাকে কষ্ট দিও না। মন যা চায় তাই তাকে দেওয়া উচিত। (৫) মেয়েদের বুক ফাটে ত মুখ ফুটে না। তুই যেমন বোকা, ও সবই কৃত্রিম ক্রোধ। সাহস করে এগো। ও কোনও আপত্তিই করবে না, চেঁচাবে ত না-ই। (৬)

আমি ভাই লাইফের ইঞ্চি বাই ইঞ্চি ভোগ করেছি, মন যা চেয়েছে তাই তাকে দিয়েছি। মরতে আমি ভয় করি না। কারণ আমার মনে কোনও ক্ষোভ নেই। কিন্তু তুই যখন মরবি, তখন তুই গুমরে গুমরে মরবি। তোর মনে হবে কি'না করতে পারতাম, কিন্তু কিছুই করলাম না। (৭) যে ঘুষ নেয় না সে বোকা লোক। কারণ, সে জানে না কি করে ধরা না পড়ে ঘুষ নিতে হয়—ইত্যাদি।

উপরিউক্ত বাক্য সকল সাজেস্‌শন বা বাক্-প্রয়োগের দ্বারা একদিক থেকে যেমন মানুষের শিষ্টতার প্রাচুর্য নষ্ট করে, অন্যদিক থেকে তেমনি তার স্বাভাবিক ভয় ও ভাবনাকে অপসারিত ক'রে তার অপস্পৃহার বহির্বিকাশের সহায়ক হয়।

এ সম্বন্ধে কিছুদিন পূর্বেকার একটি বিশেষ ঘটনার বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। কোনও এক শিক্ষিত অবাঙ্গালী ভদ্রলোক কোনও এক বাঙ্গালী বধূকে একা পেয়ে হঠাৎ তার উপর একটি নীতি-গর্হিত কার্য করে বসেন। কিন্তু বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি লজ্জিত ও অনুতপ্ত হন। এদিকে বধূটিও মানা সত্ত্বেও চেঁচিয়ে উঠেন এবং আত্মীয়দের কাছে নালিশ জানান। এ সম্বন্ধে আমি সেই অবাঙ্গালী ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস্য করি, 'আচ্ছা! আপনি কি সাহসে এরূপ কাজে এগিয়ে গেলেন?' উত্তরে ভদ্রলোক আমাকে তখন এইরূপ জানান: দেখুন, আমি আমার প্রদেশের বখা ছেলেদের কাছ থেকে ছোটবেলা থেকেই শুনে এসেছি যে বাঙ্গালী মেয়েদের উপর সুবিধামত অসৎ ব্যবহার করলে ভয়ে ও লজ্জায় সেই কথা ইচ্ছা সত্ত্বেও তারা কাউকে বলে না। আজ জেনেছি আমার এ ধারণা একেবারে ভুল।'

এই বিশেষ স্থলে আশৈশব সাজেস্‌শন দ্বারা ভদ্রলোকের স্বাভাবিক ভয় অপসারণের জন্যই ভদ্রলোক উক্তরূপে অপকার্যে অগ্রসর হয়েছিলেন। এই সব বাক্-প্রয়োগের ক্ষমতা যে কত অধিক তা আমরা জনসভা বিশেষে গমন করলেই বুঝতে পারি। আমরা প্রায়ই দেখি সাম্প্রদায়িক বক্তৃতা শ্রোতৃগণকে সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন এবং অসাম্প্রদায়িক বক্তৃতা মানুষকে অসাম্প্রদায়িক করে থাকে। * দেশের সংবাদপত্র সকল ও দেশের সাহিত্য দেশবাসীর চরিত্র গঠন সম্বন্ধে যে বহুলাংশে দায়ী তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই। এই সব সংবাদপত্র,

* অবশ্য এদের এই সব বক্তৃতা কিছুটা যুক্তিপূর্ণ হওয়া চাই। কিন্তু সকলেই জানে যে এই যুক্তি হচ্ছে এক প্রকার উকিল। যাকে আমরা আইনজীবি বলি। এই যুক্তি নিজে কিছু বুঝে না বা বুঝতে চায় না। সে স্বার্থের কারণে অপরকে বোঝাতে চায় মাত্র।

সাহিত্য ও আলোক-চিত্র গণ-বাক্-প্রয়োগের কাজ করে। এজন্য রাষ্ট্র বা স্টেট দেশের সংবাদপত্র, সাহিত্য ও আলোক-চিত্রকে প্রয়োজন-বোধে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন।

গণ-বাক্-প্রয়োগ বা মাস্ সাজেস্‌শন দ্বারা বিপথগামী হওয়া মানুষের অন্তর্নিহিত আদিম স্পৃহার অপর এক প্রমাণ। মানুষের মন সর্বদাই বিশ্বাসী হয়ে থাকে, উহা কখনও অবিশ্বাসী হতে চায় না। মানুষ যা কিছু শোনে, মানুষের মন তা সব সময়ই বিশ্বাস করতে চায়। কিন্তু তা তার অবচেতন মন বিশ্বাস করলেও তার চেতন মন বিচার-বুদ্ধি বা যুক্তি-তর্ক দ্বারা কোনটা অবিশ্বাস করে। জনসভায় বহুলোক একত্রিত হয়ে আলোচনা করার কালে তারা প্রায়ই একজন অন্য জনের কথা শোনামাত্রই বিশ্বাস করে এবং তাদের মনও তখন সেই ভাবে কাজ করতে চায়। তারা পরস্পর পরস্পরকে গণ-বাক্-প্রয়োগ বা মাস্ সাজেস্‌শন দ্বারা প্রভাবিত করে ক্ষিপ্ত ক'রে তুলে এবং তারা তখন পশুর মতই বিচার-বুদ্ধিহীন ও নিষ্ঠুর হয়ে অভাবনীয় ভাবে অপরাধমূলক কার্য করে। ঐ সময় তাদের প্রতিরোধ শক্তি সমূলে বিনষ্ট হওয়ার কারণে প্রদমিত অপস্পৃহা উপরে উঠাতে এইরূপ হয়ে থাকে। এই কারণে সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক উত্তেজনার সময় জনসভা আহ্বান নিষিদ্ধ হয়ে থাকে। গণ-বাক্-প্রয়োগ দ্বারা মানুষের অন্তর্নিহিত অপরাধ-স্পৃহার উন্মেষ যে অতি সহজে ঘটে তা শান্তিরক্ষক মাত্রেই অবগত আছেন। যে অকাজ মানুষ একা বা কয়জনে মিলে করে না বা করতে পারে না, সেই সব জঘন্য কাজ তারা শত জন মিলে সহজেই করে ফেলে। কারণ তখন তারা বিবেক-বিবর্জিত ও পশুসুলভ প্রবৃত্তি প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ তখন মানুষ আর মানুষ থাকে না। মানুষ তখন হয়ে উঠে পশুরও অধম। মানুষের অন্তর্নিহিত পশু-প্রবৃত্তির ইহা একটি বিশেষ প্রমাণ। শত শত লোকের একত্রে কাজ করার কালে তাদের মধ্যে কোনও ব্যক্তিগত কিংবা যৌথ দায়িত্ববোধ স্থান পায় না; এইজন্যে ঐ সময় এদের জন্যে স্বল্প লোকের ব্যষ্টি বা গোষ্ঠী নেতৃত্বের প্রয়োজন হয়ে থাকে।

এমন অনেক ঔষধ বা আরক আছে যা মানুষের স্নায়ু-শক্তির হ্রাস ঘটিয়ে বা মানুষের সুপ্ত অপরাধ-স্পৃহাকে জাগ্রত করে মানুষকে অপরাধী করে তুলে। মনে হয় যে এই সব ঔষধ দেহাভ্যন্তরের বিশেষ বিশেষ রসপিণ্ড বা গ্লাণ্ডকে উত্তেজিত করলে রসপিণ্ডগুলি থেকে এক প্রকার [অনুপকারী হরমোন] রস

নির্গত হয় এবং সেই রস মানুষের প্রতিরোধ-শক্তির বিনাশ ঘটিয়ে তাদের সুপ্ত অপরাধ-স্পৃহাকে জাগ্রত করে। যে ভাবেই হোক, এই সব ঔষধ যে মানুষকে অপরাধমুখী করে তুলে তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। এজন্য অভ্যাস-অপরাধীদের জীবন-বৃত্তান্ত আলোচনা করলে দেখা যায় যে, তাদের অনেকেই প্রথমে নেশাভাঙ করে অলসভাবে ঘোরা-ফেরা করেছে এবং পরে কুসংস্পর্শে এসে তারা চোর হয়েছে। ঔষধাদি দ্বারা মানুষের স্নায়ু [প্রথমে] দুর্বল করার পর বাক্-প্রয়োগ বা সাজেস্শন দিলে মানুষকে আরও সহজে অপরাধী করা যায় বলে আমি বিশ্বাস করি।

প্রাথমিক অবস্থায় অভ্যাস-অপরাধীরা অপরাধকে অপরাধ বলে বুঝতে পারে। মাঝে মাঝে তাদের এজন্য অনুতাপও আসে। কিন্তু তবুও তারা যেন স্বইচ্ছাতেই অপরাধ করে। কারণ, তারা তখন অভ্যাসের দাস হয়ে পড়েছে। অভ্যাস-বেশ্যাদের ন্যায়ই তখন তারা নিরুপায়। এইজন্য প্রাথমিক অবস্থায় অপরাধীদের প্রকৃত অভ্যাস-অপরাধী বলা উচিত নয়। বরং তাদের দৈব-অপরাধীর পর্যায়ভুক্ত করলেও করা যেতে পারে। শেষের দিকে কিন্তু তারা অনেকটা স্বভাব-অপরাধীর মত হয়ে উঠে। তখন আর তাদের অনুতাপ আসে না। তারা তখন হয়ে উঠে মানব-দানব।

এই অভ্যাস-অপরাধীরা সাধারণ মানুষ হতে অস্বাভাবিক মানুষ হয়েছে। এইজন্য মাঝে মাঝে তাদের মধ্যে অপরাধ-বিরাম বা লুসিড্ ইনটারভ্যাল দেখা যায়। অল্প সময়ের জন্য তারা তখন সহজ মানুষ হয় এবং ঐ সময়টুকুতে তাদের জ্ঞান ফিরে আসে। এই অবস্থায় তারা প্রায় ক্ষেত্রে অনুতপ্তও হয়ে থাকে! এই লুসিড্ ইনটারভ্যাল স্বভাব-অপরাধীদের মধ্যে থাকলেও কম থাকে। কিন্তু অভ্যাস-অপরাধীদের এই অপরাধ-বিরাম ওদের কারও কারও মধ্যে বহুক্ষণ, কারও কারও বা কয়েক ঘণ্টা, কারও কারও মধ্যে আবার কিছুদিন পর্যন্ত দেখা যায়। পাগল এবং অপরাধীদের নিকট সম্পর্ক এই লুসিড্ ইনটারভ্যাল থেকে প্রমাণিত হবে। এ সম্বন্ধে নিম্নের বিবৃতিটুকু প্রণিধানযোগ্য।

"শালে আ'কে বোলা, 'চলো চলো আজ একটা জরুরি কাম হায়।' লেকেন উস্-রোজ মেরা কামকো লায়েক দিল্ নেহি থে। মে বোলা, 'নেহি ভাই, মে নেহি যায়গা, মেরি দিল কাম নেহি মাংতা।' হাঁ হুজুর! মাহিনামে দোচার রোজ কভি সপ্তাহ ভর মেরা দিল কেইসেন হো যাতা। মেরি দুখ

ভি বহুত আতা, ডর ভি। লেকেন পিছু এক রোজ হাম ঠিক হাম বন যাতা। উস্‌বখত দিল ভি মেরা হো যাতা কামকো লায়েক। লেকেন শালে মোকে বিলকুল ভুল সমঝা। আঙিনামে একটো লকড়ি থে। উ উঠায়কে শালে মেরা শির পর ডাল দিয়া—গোসা করকে। চোট ভি লাগা আউর খুন ভি নিকলা। লেকেন ই আপশ্‌কা লড়াই হুজুর। আপশ্‌—নেহি নেহি হুজুর, উনকেপর ফরিয়াদি মে নেহি বানেগা।"

কোনও কোন অপরাধীদের মধ্যে আবার এই অপরাধ-বিরাম ছয় মাস বা পুরা এক বছর পর্যন্তও দেখা যায়।

এদেশে প্রত্যেক প্রদেশেই সরকার বাহাদুর একটি করে টিপ্‌ঘর বা ফিঙ্গার প্রিন্ট বুরো মেইনটেন্ করেন। এই সব টিপ ঘরে হাজার হাজার অপরাধীর টিপ্‌-পত্র থেকে অপরাধী-বিশেষ কত বারের দাগী এবং কোন কোন তারিখে ও কিজন্য তার জেল হয়েছিল তা জানা যায়। কোনও কোনও টিপের কাগজ থেকে জানা যায় যে অপরাধী-বিশেষ ৩০ বারের অধিক বারও জেল খেটেছে। এই ধরনের ৪৫টি অপরাধীর টিপের কাগজ পরীক্ষা করে আমি দেখেছি যে অপরাধী-বিশেষ প্রথম বৎসর হয়ত দুমাস, দেড়মাস করে তিনবার জেলে খেটেছে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৎসরও অনুরূপ ভাবেই তার দিন কেটেছে। ঐ ব্যক্তি তার চতুর্থ বৎসরে ও পঞ্চম বৎসরের প্রথমভাগে জেল খাটেনি। কিন্তু পঞ্চম বৎসরের শেষার্ধে ও ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম বৎসরে সে পুনঃ পুনঃ জেল খাটে। এর পর নবম বর্ষে তার আর কোনও সাজা দেখা যায় না, কিন্তু দশম বৎসর থেকে পুনরায় তাকে অপরাধী দেখা যায়। মধ্যেকার এ ব্যবধানকে আমি বলেছি অপরাধ-বিরাম বা অপরাধের ফাঁক। এই সকল অপরাধীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আমি জেনেছি যে, তাদের অপরাধী-জীবনের উক্তরূপ ফাঁকের সময়ে সত্য সত্যই তারা কোনও রকম অপরাধমূলক কাজ করে নি। অপরাধ-বিরামের উপস্থিতির জন্যই এরূপ ঘটে থাকে বলে আমি মনে করি। তবে এ সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। অভ্যাস-অপরাধীদের টিপ-পত্রগুলি বিশেষরূপে বেছে নিয়ে এ সম্বন্ধে আমাদের আরও পরীক্ষা করা উচিত, কারণ অপরাধ-বিরামের আধিক্য অভ্যাস-অপরাধীদের মধ্যেই অধিক দেখা যায়।

[এই সকল টিপ্‌-পত্রগুলি হ'তে আরও জানা যায় যে, অপরাধীরা পঞ্চাশ ও ষাট বৎসর বয়ঃক্রমের পর প্রায়ই আর অপরাধ করে না। দৈহিক ও মানসিক শক্তিহীনতাই এজন্য দায়ী বলে আমি মনে করি। এই বয়সে কখনও কখনও

তারা অপরকে দূর হ'তে পরামর্শ দেয়, কিন্তু পারত পক্ষে সাক্ষাৎভাবে অপকার্যে লিপ্ত থাকে না। এখানেও অনুসন্ধানের এক বিশেষ ক্ষেত্র আছে বলে আমি মনে করি।]

অনেকের মতে এই অভ্যাস-অপরাধীরা আত্ম-বিস্মৃত হয় না। মাঝে মাঝে অর্থাৎ-অপরাধ বিরামের সময় তাদের অনুতাপও আসে। অন্য সময় কিন্তু উৎকট অভ্যাস-অপরাধীদের অনুতাপ আসে না। স্বভাব-অপরাধীদের মতই তারা তখন অনুতাপ-বিহীন হয়ে উঠে। এরা টাকা চেনে ও বোঝে। এরা চালিত হয় বুদ্ধির দ্বারা, প্রেরণা দ্বারা এরা চালিত হয় না। বিশেষ চিন্তা করে এরা কাজ করে। এরা কখনও বেপরোয়া হয় না। কুসঙ্গে পড়ে এরা যেমন অপরাধী হয়ে থাকে, সৎসঙ্গে পড়ে আবার এরা ভালও হয়ে উঠে। প্রাথমিক অবস্থায় অভ্যাস-অপরাধীর ন্যায় অভ্যাস-বেশ্যারাও তাদের কাজের জন্য লজ্জিত থাকে। বিপরীত অবস্থায় পড়লে এরা চোর বা বেশ্যা না হয়ে সৎ বা সতী হ'তে পারত। তাদের বর্তমান অবস্থার জন্য একান্তরূপে তাদের ভাগ্যই দায়ী।

বিপরীত ঔষধাদি ও বাক্-প্রয়োগ দ্বারা বা নূতন পরিবেশের মধ্যে ফেলে অভ্যাস-অপরাধীদের আবার সাধুতে পরিণত করা সম্ভব। আমি একজন বিশিষ্ট ভদ্রচোরকে জানতাম, যে স্ব-বাক্ প্রয়োগ দ্বারা নিজেকে পরবর্তীকালে নিরাপরাধীতে পরিণত করেছিল। এই সম্পর্কে নিম্নের বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।

"আমি সরকারী কর্মে বহাল থাকা কালে প্রচুর ঘুষ নিতাম। এই ভাবে উৎকোচ গ্রহণ দ্বারা আমি প্রভুত সম্পত্তি লাভ করি। নানারূপ প্ররোচনা ও লোভের বশবর্তী হয়েই আমি এরূপ করতাম। শেষের দিকে আমার ভয় বা অনুতাপ কিছুই আসতো না। অবসর গ্রহণের অব্যবহিত পূর্বে কিন্তু আমার মধ্যে এক বিশেষ পরিবর্তন আসে। আমি নিজেকে বোঝাই যে সারা জীবন আমি কি করলাম! সকলেই ত আমাকে চোর মনে করে। আমি ত সকলেরই ঘৃণ্য। কতদিনই আমি বাঁচব, টাকা হবেই বা কি আমার। জীবনটা ত আমি পুরাপুরি ভাবে ভোগ করেছি। এই দিক থেকে আমার কোনও ক্ষোভ বা আত্মগ্লানির কারণ নেই। এমনি সব ভাবনার মধ্যে আমার টাকার উপর ঘৃণা আসে। ফলে, আমি ঘুষ নেওয়া একেবারে বন্ধ করি তো বটে, এমন কি অবসর গ্রহণের পর আমি দান-ধ্যানও আরম্ভ করি। আমি ধীরে ধীরে সাধু, নির্লোভী ও দাতা হয়ে উঠি। উৎকোচের টাকাতে তৈরি বাড়িটাও আমি দান করেছি।"

এমনি ভাবে কেউ কেউ স্ব-বাক্-প্রয়োগে সাধু হয়ে উঠে। কারও কারও

আবার পর-বাক্-প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। আমার মতে স্ব-বাক্-প্রয়োগের সঙ্গে পর-বাক্-প্রয়োগ মিলিত হলে ফল অধিকতর শুভ হয়। এমন বহু ব্যক্তি কর্মরত থাকা কালীন ঘুষ নিলেও অবসর প্রাপ্তির পর তাঁদের কাউকে কাউকে সাধু ও দাতা হ'তে দেখা যায়। তেমনি এমন ব্যক্তিও দেখা গেছে যাঁরা কর্মরত থাকাকালীন অত্যধিক সাধু জীবন যাপন করলেও অবসর প্রাপ্তির পর তাঁরাই আবার লোকের সর্বনাশ সাধন করেছেন। এ সময় তাঁরা অসহায় নির্বোধ দরিদ্র নরনারীদের ঠকিয়েছেন। এরূপ অবস্থার বৈজ্ঞানিক নাম রিঅ্যাকশন বা প্রতিক্রিয়া। সারা কর্মজীবন তাঁরা ভয়ে ও সম্মানহানির আশঙ্কায় জোর করে লোভ দমন করে সাধু জীবন যাপন করলেও কোনও দিন তাঁরা অসাধু হবার ইচ্ছা দমন করতে পারেন নি। আশে-পাশের দশজনের অসাধুতা তাঁদের অন্তরে অপস্পৃহাকে জাগিয়ে রেখেছিল ; কিন্তু সাহসের অভাবে তাঁরা তাকে রূপ দিতে পারেন নি। ফলে তাঁরা অপরাধী না হ'লেও অপরাধীমুখী হয়ে দিন কাটিয়েছেন। তাই অবসরপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের প্রথম প্রয়াস হয়, ভাইকে ও আত্মীয়দের বা বিধবা ভ্রাতৃবধুকে ফাঁকি দিয়ে কিছু টাকা করা। জোর করে চেপে রাখা অপরাধ-স্পৃহা বা অতৃপ্ত বাসনা ফাঁক পেয়ে ভলকানিক পদার্থের ন্যায়ই তখন বেরিয়ে আসে। পেনশনের পর অর্থের ঘাটতি এবং বাড়তি পরিবারও এই সময় তাঁদের উক্তরূপে মনোবৃত্তির সহায়ক হয়ে দাঁড়ায়। এই সব সাধু ব্যক্তি যদি কর্মজীবনে কেবলমাত্র সাধুব্যক্তিরই সন্ধান পেতেন, অসাধু ব্যক্তির সন্ধান একেবারেই না পেতেন, তা হলে অবশ্য এই ব্যক্তি আজীবন সাধুই থেকে যেতেন।

সাধারণতঃ আমরা শিশুদের এরূপ উপদেশ দিই, "খোকা! মিথ্যা কথা বলো না, কখন চুরিও করো না—এই সবের মধ্যে পাপ আছে।" খোকা বড় হয়ে দেখে আশে-পাশের সকলেই এর বিপরীত কাজ করে এবং কেবল মাত্র সেই ঐ সকল দুষ্কার্য করে না। ফলে তার আশৈশব "বাক্-প্রয়োগ" [অভিভাবকের উক্তরূপ সাজেস্‌শন] কার্যকরী হয় না। আমার মতে অভিভবাকদের বাক্-প্রয়োগ হওয়া উচিত এরূপ, "খোকা! বড় হয়ে দেখবে অনেকেই চুরি করছে। তারা যখন তখন মিথ্যা কথাও বলছে। কিন্তু তুমি যেন তাদের দলে ভিড়ো না।" বাক্-প্রয়োগ এরূপ হ'লে কার্যকরী হ'লেও হ'তে পারে। কারণ ইহা মনকে পূর্ব হ'তেই প্রস্তুত রাখে—তবে এর সম্বন্ধেও জোর করে কিছু বলা যায় না।

এই সব কারণে পৃথিবীতে বিশ্বাস কাউকে করা উচিত নয়। অসাধুদের মত সাধুদেরও বিশ্বাস করা উচিত হবে না। কারণ আজ যে ব্যক্তি ভাল আছে অবস্থাগতিকে কাল সে মন্দ হয়। বাপ ভাইও সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত হয় না। অন্য ত পরের কথা। একজনের পক্ষে যে ভালো অন্যজনের পক্ষে সে মন্দ হতে পারে। তবে এমন বহু লোকও পৃথিবীতে দেখা যায়, যাদের কাছে সাধুতা বা অনেষ্টি একটা রোগ বা ডিসইজ। তাদের সাধুতা বা অনেষ্টি ফ্যানাটিজিমের নামান্তর মাত্র। এই সব রোগী সাধারণতঃ একটু বোকা ও রাগী হয়। এদের বুদ্ধিমত্তাও থাকে কম। এরা কাউকে না ঠকালেও এদের অন্য লোকে ঠকিয়ে যেতে পারে। তবে এ কথা ভুলা উচিত হবে না যে কঠিন রোগেরও কখনও কখনও উপশমও হয়। এজন্যে যারা ঠকে, তাদেরই আমি বেশি দোষী মনে করি—কারণ ঠগীদের ঠকাবার তারা সুযোগ করে দেয়।

আরও একটি বিষয় বলে আমি বর্তমানে পরিচ্ছেদ শেষ করব। এই বিশেষ দিকটা আমি প্রত্যেক ব্যক্তিকেই ভেবে দেখতে বলি। প্রত্যেক বিভাগেই কতকগুলি লোক অপরাধী, কতকগুলি নিরপরাধ এবং কতকগুলি অপরাধমুখী থাকে।

এই শেষোক্ত ব্যক্তিদের কেউ কেউ অপরের দৃষ্টান্তে অনুপ্রেরিত হয়ে অপরাধ করে। এদের অন্যেরা ভয়ে ও ইজ্জতহানির আশঙ্কাতে কোনও অপরাধ করে না। এরা বর্ডার লাইন বা ফেন্সিঙ'-এর উপর বসে থাকে।

এই কারণে প্রায়ই দেখা যায় যে ওপরওয়ালা বা বস্ স্ট্রিক্ট ও সাধু হ'লে নিম্নস্থ সকলেই সাধু থাকে এবং ওপরওয়ালা বা বস্ লিনিয়েন্ট বা অসাধু হ'লে ডিপার্টমেন্ট শুদ্ধ অসাধু হয়ে উঠে। কারণ, এই সংখ্যাধিক সাধু কিংবা অসাধুদের চাপে ও ভয়ে সাধু কিংবা অসাধু ব্যক্তিরা যথাক্রমে নিষ্ক্রিয় বা সক্রিয় হয়। একের অপরাধ বা দোষে আমরা প্রায়ই বহুকে অপরাধী হ'তে দেখি।

[অনেক সময় পারিবারিক আদর্শ এবং দৃষ্টান্তও বাক্-প্রয়োগের স্থল অধিকার করে। এইজন্য আমরা যেমন একই পরিবারের বহু সৎ ব্যক্তিদের দেখি তেমনি অন্য পরিবারে শুধু অসৎ ব্যক্তিরই সন্ধান পেয়ে থাকি।]

এই অভ্যাস-অপরাধীদের সংখ্যা সভ্যতা বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বর্ধিত হচ্ছে। মানুষের ক্রমবর্ধমান অভাব ও অভিযোগই এর কারণ। মধ্য-যুগে যে মানুষ একজোড়া খড়ম, একখানা ধুতি ও একখানা চাদরে সন্তুষ্ট থাকত,

তারই এখন নানাবিধ পরিচ্ছেদ, আস্‌বাব, টয়েলেট ও যানের প্রয়োজন হয়। মানুষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে পড়ে নানারূপ আদর্শ জনিত ও অসমতার কারণে আর স্বল্পে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। তাই সৎ উপায়ে অপারক হ'লে অসৎ উপায়ের সাহায্য নিতে তাদের বাধ্য হ'তে হয়। কলকাতা শহরের বহু বালক কেবলমাত্র সিনেমা দেখার প্রয়োজনেই চোর হয়েছে। এই অপ্রিয় সত্যটি শহর-বাসী মাত্রই পরিজ্ঞাত আছেন। এ'ছাড়া পূর্বে মানুষ প্রায় চাষ-বাসে নিযুক্ত থাকত ও পারিবারিক আদর্শের মধ্যে মানুষ হ'ত, কিন্তু আজকের যুগ উদ্যোগ-শিল্পের যুগ। [ইনডাষ্ট্রীয়াল এজ], ইহা পূর্বকালীন কুটীর-শিল্পের যুগ নয়। ক্রমবর্ধমান উদ্যোগ-শিল্প মানুষকে তার মা বোন স্ত্রী ও অন্যান্য পরিবারবর্গ থেকে দূরে টেনে পারিবারিক আদর্শ থেকে বঞ্চিত করে তাকে অপরাধমুখী হ'তে প্রতিদিনই সাহায্য করছে। এইজন্যই প্রতিদিনই নূতন নূতন আইন-কানুনেরও প্রয়োজন হচ্ছে এই সব অভ্যাস-অপরাধীদের দমন করার জন্যে। আজকালকার শহুরে সমাজ অপরাধী-মুখী ব্যক্তিদের দ্বারা তৈরি। এই কারণে কঠোর রাষ্ট্রীয় শাসন না থাকলে মানুষ বহু পূর্বেই আবার তার আদিম বর্বর যুগে ফিরে যেত। সামাজিক শাসনের, ধর্মের ও নীতির ভয় আজকাল স্বল্প লোককেই অভিভূত করে। তাই একমাত্র রাষ্ট্রের ভয় ছাড়া লোকের আর কোনও ভয় নেই। এইজন্য যে সকল অত্যল্প পাপ ও অন্যায়ের জন্য পূর্বে সমাজ, ধর্ম-যাজকেরা ও মাননীয় বৃদ্ধেরা শাস্তিবিধান করত, সেই সব পাপ ও অন্যায়ের শাস্তি দেওয়ার ভারও আজ রাষ্ট্রের হাতে তুলে দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে, যদিও এই পাপ ও অন্যায়কে বিজ্ঞান সম্মত ভাবে প্রকৃত অপরাধ পর্যায়ভুক্ত করা যায় না বা করা উচিত নয়। এই সম্বন্ধে দেশবাসীকে সবিশেষ অবহিত হয়ে ভেবে দেখবার জন্য আমি অনুরোধ করি।

(গ)—মধ্যম অপরাধী

মধ্যম অপরাধীদের স্বভাব চরিত্র প্রায় উৎকট [প্রকৃত] অপরাধীদের মত হয় বটে। কিন্তু উহার উগ্রতা স্বভাব-অপরাধীদের থেকে কম এবং অভ্যাস অপরাধীদের থেকে বেশী হয়।

উহাদের উৎপত্তির কারণ মত ওরা দুইটি পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত। নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা দুইটি থেকে বক্তব্য বিষয় বুঝা যাবে।

বীজ কোষস্থিত অপরাধ-স্পৃহার কম বেশী ½ অংশ দেহ কোষের কম বেশী ½ অংশ অপরাধ-স্পৃহার সহিত মিলিত হয়ে স্বভাব-অপরাধীর জন্ম হয়। কিন্তু বীজকোষের অপরাধ স্পৃহার কতোটা অংশ দেহ-কোষের অপরাধ-স্পৃহার সহিত মিলিত হবে তা দৈবের উপর নির্ভর করে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বীজকোষের অপরাধ-স্পৃহার সবটুকু অংশ দেহ-কোষে বর্ত্তায় না। কখনও কখনও উহা অল্প মাত্রায় বর্ত্তায়। এরূপ অবস্থায় ঐ অপরাধীরা স্বভাব অপরাধীদের ন্যায় এতটা উৎকট হয় না। এই অবস্থায় উপনীত অপরাধীদের মধ্যম অপরাধী বলা হয়। কেউ কেউ এদের উৎকট অভ্যাস অপরাধীও বলে থাকেন।

[অভ্যাস-অপরাধী তাদের দেহ কোষস্থিত কমবেশী ½ অংশ সুপ্ত অপরাধ স্পৃহাকে প্রথমে জাগ্রত করে। তৎপর উহা ব্যবহার তথা অভ্যাস দ্বারা বর্দ্ধিত করে উৎকট তথা প্রকৃত অপরাধী হয়ে থাকে। উপরোক্ত মধ্যম অপরাধীদের মত প্রথম হতেই উপরোক্ত কারনে এই অভ্যাস অপরাধীর ½ অংশের অধিক অপস্পৃহা থাকে নি। তৎজন্য এদের উৎকট তথা প্রকৃত অপরাধী হতে অধিক প্রচেষ্টা ও সময়ের প্রযোজন হয়ে থাকে।]

এইরূপ অপরাধীদের প্রথম শ্রেণীর মধ্যম-অপরাধী বলা হয়। অন্যদিকে স্বভাব দূর্বৃত্ত জাতীয় ব্যক্তিদের দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যম অপরাধী বলা হয়েছে। এই উভয় শ্রেণীর অপরাধীদের মধ্যে চরিত্রগত পার্থক্য কম থাকলেও উহাদের মধ্যে যথেষ্ট প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে।

[স্বভাব দূর্বর্ত্ত জাতির বালকদের সহিত জন্মান্ধদের তুলনা করা চলে! জন্মান্ধদের মত এরা আলোক ও অন্ধকারের মধ্যে প্রভেদ বুঝে না। কারণ এরা শৈশব হতেই শিক্ষাগত ভাবে অপকর্মে অভ্যস্ত। এদের পাপ পুণ্য সম্বন্ধে কোনও ধারণা নেই। এরা জ্ঞান উন্মেষের পূর্ব হতেই সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে অপকর্ম শিখে।

অন্য অপরাধীদের সাধারণ অন্ধদের সহিত তুলনা করা হয়। এরা কিছু কাল আলোকের মধ্যে থেকে পরে ধীরে ধীরে অন্ধ হয়। জন্মের বহু পরে অন্ধ হওয়ায় এদের আলোক সম্বন্ধে ধারণা আছে। তাই এরা পাপ পুণ্য এবং ন্যায় অন্যায়ের মধ্যে প্রভেদ বুঝে। কারণ, কিছু কাল সৎজীবন যাপন করে

পরে তারা অভ্যাস জনিত অপরাধী হয়েছে। তাই সহজ নিরাপরাধ মানুষের সম্বন্ধে এদের ধারণা থেকেছে। এই উভয় প্রকার অপরাধীদের চিকিৎসা করার কালে উহা বিবেচনা করতে হবে।]

স্বভাব দুর্বৃত্ত জাতিগুলির [ক্রিমিন্যাল ট্রাইব] স্বভাব কিছুটা স্বভাব অপরাধীদের মত হয়ে থাকে। এই সব জাতীয় অপস্পৃহা কিছুটা কম উগ্র হলেও তাদের আদিম স্বভাব তারা আজও ত্যাগ করেনি। এ পর্যন্ত অপরাধই তাদের প্রধান উপজীবিকা। দেহের দিক হতে পরিবর্তিত হলেও মনের দিক হতে তারা প্রায় আদিম যুগের মানুষ। কিন্তু অধুনা সভ্যতার সংস্পর্শে বাস করাতে এরা ঠিক স্বভাব অপরাধীর মতও নয়। এদের চরিত্র অভ্যাস-অপরাধী এবং স্বভাব-অপরাধীদের মধ্যবর্তী রূপ ধারণ করে।

সহজ মানুষের শিশুদের দ্বারা কৃত অপরাধের সঙ্গে এই সব স্বভাব-দুর্বৃত্ত বালককৃত অপরাধের [পূর্ব পরিচ্ছেদ দেখুন] তুলনা করলে উভয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ দেখা যাবে। সহজ বালকদের অপরাধসমূহ প্রায়ই সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে সমাধা হয় না। কিন্তু স্বভাব দুর্বৃত্ত বালক কৃত অপরাধসমূহ সব সময়েই সুনিয়ন্ত্রিত ও সুচিন্তিত হয়ে থাকে। শৈশবকাল থেকেই দলগত শিক্ষার ফলে তারা হয়ে উঠে মধ্যম-অপরাধী। এইজন্য স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতিগুলির মধ্যে মধ্যম-অপরাধীর প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

উপরে কেবলমাত্র দুই প্রকারের মধ্যম-অপরাধীর বিষয় বলা হ'ল। কিন্তু নানাপ্রকারের মধ্যম-অপরাধী দেখা যায়। - বহুক্ষেত্রে এই মধ্যম, স্বভাব ও অভ্যাস-অপরাধীদের অন্তর্নিহিত পার্থক্য বোঝাও যায় না। বাঙ্গালীরা বাঙ্গলায় থাকে, বেহারীরা থাকে বেহারে। কিন্তু বাংলা ও বেহারের এমন অনেক লোক আছে, এরা বাঙ্গালীও নয়, বেহারীও নয়। বাঙ্গালী ঘেঁষা বেহারী এবং বেহারী ঘেঁসা বাঙ্গালীরও অভাব নেই। ঠিক অনুরূপ ভাবে মধ্যম-অপরাধীদের নিয়েও গোল বাধে। তাদের শ্রেণী-বিভাগ করা শক্ত হয়ে উঠে। প্রথমোক্ত শ্রেণীর মধ্যম-অপরাধীরা হয় স্বভাব-ঘেঁষা, দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর মধ্যম-অপরাধীরা হয় অভ্যাস ঘেঁষা। বহু মধ্যম-অপরাধীদের মধ্যে জন্মগত ও অভ্যাসগত অপরাধ-স্পৃহা এক সঙ্গে থাকায় তারা একাধারে বুদ্ধি [ইন্টেলিজেন্স] ও প্রেরণা [ইন্‌ষ্টিংক্ট], এই উভয় বৃত্তির দ্বারাই পরিচালিত হয়ে থাকে।

প্রথম শ্রেণীর মধ্যম-অপরাধীরা স্বভাব-অপরাধীদের মত অপরাধীরূপে জন্মায় না বটে, কিন্তু তারা প্রতিটি ক্ষেত্রে অপরাধমুখী হয়ে জন্মিয়ে থাকে।

এইজন্য কুসঙ্গ প্রভৃতি অনুকূল অবস্থা অতি সহজে ও অত্যল্প দিনেই তাদের অপরাধী করে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যম-অপরাধীরা জ্ঞান উন্মেষের পূর্ব হতেই অপকার্যে অভ্যস্ত হয়। সহজ ও নিরপরাধ মানুষ সম্বন্ধে তাদের ধারনা থাকে না। আশৈশব অপরাধী হওয়ায় তাদের মধ্যে নৈতিক অসাড়তা আসে।

এক কথায় সহজতর স্বভাব-অপরাধী ও উৎকট অভ্যাস-অপরাধীরাই মধ্যম-অপরাধী। আমি বহু মধ্যম-অপরাধীকে জানতাম। এই সম্পর্কে নিম্নের বিবৃতিটুকু প্রণিধানযোগ্য। এই লোকটা ছিল প্রথম শ্রেণীর (?) মধ্যম-অপরাধী।

"আমার বয়স তখন ছিল মাত্র পাঁচ বৎসর। তখনকার সব কথাই আমার মনে পড়ে। মা আমার জমিদার বাড়িতে রান্না করত। মনিবের ছেলেরা খেত ভাল। তারা পোশাক আদি পরতও ভাল। তাদের দেখে আমার হিংসে হ'ত। তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বরফি খায়। একটুকু চাইলেও তা তারা আমাকে দেয় না। ইচ্ছা করত এক থাপ্পড়ে তাদের শেষ করে দি। কাছে গেলেই সকলে বলত, দূর হ। প্রাচুর্য দেখতাম কিন্তু ভাগ পেতাম না। হঠাৎ একদিন দেখলাম একটা বেড়াল ঘর থেকে বেরুচ্ছে। মুখে তার এক টুকরা খাবার। বেড়ালের অপকর্ম আমাকে অনুপ্রেরিত করে। পরের দিন আমিও ঠিক ঐ ভাবে খাবার চুরি করি। আমার বয়স তখন মাত্র এগার হবে। ঐ বয়সে চুরির মধ্যে কোনও দোষ আমি দেখি নি। পাপ-পুণ্য সম্বন্ধে তখনও আমি অজ্ঞ। পয়সায় খাবার পাওয়া যায়, তাই পয়সা চুরি করি। মনিবের ছেলেদের স্কুলে যেতে দেখে আব্দার ধরি আমিও স্কুলে যাব ও লেখাপড়া করব। সকলে আমাকে ধমক দিয়ে নিরস্ত করে। আমার মা কাতর নয়নে আমাকে বুঝায়—তুই যে গরিবের ছেলে বাবা, পড়তে গেলে যে পয়সার দরকার।' পয়সার কথা শুনে আমার হাসি আসে। পয়সা ত উড়ছে, ধরে নিলেই হ'ল। সেই দিনই একজন লোকের পকেট মেরে ১০০ টাকা পাই। পাড়ার বিন্দে সর্দার বিদ্যেটা আমায় শিখিয়েছিল। আমার বয়স তখন বার বৎসর হবে। সোজা ইস্কুলে যাই ভর্তি হবার জন্যে, কিন্তু সেখানে গোল বাধায় হেডমাস্টার। আমার ওপর হুকুম হয় বাবাকে আনতে হবে। বাবাকে ত দেখিই নি। এমন কি তাঁর নামও জানি না। আমি ভীষণ ফাঁপরে পড়ি। শেষে নাচার হয়ে পাড়ার এক গরিব প্রৌঢ়কে ২৫ টাকা দিয়ে মামা সাজিয়ে স্কুলে আনি। আমি

আমার বাবার জন্যে একটা মন-গড়া নামও বানাই। এতে আমি কোনও দোষ দেখি না। বাবা ত আমার একটা ছিলই। সাধারণতঃ বাবা ছেলের নাম রাখে, আমি না হয় বাবার নাম রাখলুম। এতে আমি কোনও দোষ দেখি নি। হাঁ, চুরি করেই আমি স্কুলে মাইনে দিতাম। আমার ভর্তির কথা শুনে মনিবেরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন এবং আমি তাঁদের গৃহ হ'তে বিতাড়িত হই। পাড়ার বিন্দে সর্দার আমাকে আশ্রয় দেয়। সেখানে থার্ডক্লাশ পর্যন্ত পড়েছিলাম। আমি বরাবর ফার্স্ট হয়ে ক্লাশে উঠেছি। হঠাৎ একদিন অফিস ঘরে ডাক পড়ল। রুদ্রমূর্তিতে হেডমাস্টার জানালেন আমি বাবার নাম লিখিয়েছি মিথ্যে করে। আমি একজন নাকি কুলটা নারীর সন্তান। আমার নাকি বাবা-টাবা নেই। বাবা নাকি কখনও আমার ছিলও না। তখুনি স্কুল থেকে আমি বিতাড়িত হই। আমার মনের মধ্যে জাগে প্রতিহিংসা। মাত্র সতের বৎসর বয়সে আমি হয়ে উঠি উৎকট-অপরাধী। ঐ স্কুলের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতাম এবং আমার সহপাঠীদের বিপথগামী করতাম। ঐ স্কুলের ছেলেদের নিয়েই আমি দল গড়ি। লোকে বলে যে শহরের মধ্যে আমি একজন দুর্দান্ত গুণ্ডা ও ডাকাত।"

(ঘ)—দৈব-অপরাধী

দৈব-অপরাধীদের আমি বৈজ্ঞানিক অপরাধীদের পর্যায়ভূক্ত করি নি। কিন্তু এদের'কে সময়ে প্রদমিত না করলে এরা বারংবার অপরাধ করবে এবং ধীরে ধীরে অভ্যাস অপরাধীতে পরিণত হবে। এ সম্পর্কে রাষ্ট্র ও সমাজকে সদা সতর্ক থাকতে হবে।

দৈব-দুর্বিপাকে বা ক্ষুধার জ্বালায় কেউ যদি দৈবক্রমে বা বাধ্য হয়ে কোনও অপরাধ করে ত তাকে আমরা দৈব-অপরাধী বলি। আমার মতে এদের অপরাধীর পর্যায়ে না ফেলাই উচিত। দৈব-অপরাধীরা নিজেদের প্রায়ই শুধরে নেয়। অবশ্য এই বিষয়ে তাদেরকে যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া দরকার। অপত্য স্নেহপীড়িত বহু মাতা ক্ষুধার্ত সন্তানের মুখে আহার দিতে চুরি করে দৈব-অপরাধী পদবাচ্য হয়েছে। অভ্যাসজনিত দৈব-অপরাধীদের অভ্যাস-অপরাধীতে

রূপান্তরিত হওয়া আশ্চর্য নয়। এ অবস্থায় দৈব-অপরাধকে অভ্যাস-অপরাধের প্রাথমিক অবস্থা বলা যায়। খাদ্যের অভাব ঘটলে দৈব-অপরাধীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। নিম্নের তথ্য-তালিকা বা পরিসংখ্যাটি [স্ট্যাটিষ্টিকস্] প্রণিধান-যোগ্য। ক্রিমিন্যালিটি অ্যাণ্ড ইকনমিক কনডিশন পুস্তক এই সম্পর্কে দ্রষ্টব্য।

ইংলণ্ড

বৎসর	যবের মূল্য	অপরাধীর সংখ্যা
১৮১৬	৭৮·৬	৯·০৯১
১৮১৭	৯৪·১১	১৩·৯৩১
১৮৪৬	৫৪·৮	২৩·০৭২
১৮৪৭	৬৯·৮	২২·৪৫১
১৮৫১	৪০·০	২৪·৪৪৩
১৮৫৩	৫৩·৩	২৭·১৮৭
১৮৫৪	৭২·৫	২৬·৭৬০
১৮৫৫	৭৪·৮	৪১·৩০৯
১৮৫৬	৬৯·২	২৯·৫৯১
১৮৫৭	৫৬·৪	২৬·৫৪২
১৮৫৮	৪৪·২	২৪·৩০৩

[বিভিন্ন শ্রেণীর অপরাধীদের প্রাথমিক পর্যায়ের অপরাধীদের সঙ্গে এই দৈব অপরাধীদের স্বভাব-চরিত্রের যথেষ্ট প্রভেদ আছে। স্বভাব, মধ্যম ও অভ্যাস অপরাধীদের প্রথম অবস্থার অপরাধীদের প্রাথমিক অপরাধী বলা হয়। এই প্রাথমিক অপরাধীদের শেষ অবস্থায় প্রকৃত অপরাধী না হলে ওদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হয় মা। দৈব অপরাধীরাও অভ্যাস-অপরাধী না হলে ওদের কখনও ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হয় না। প্রাথমিক অপরাধীরা তাদের অপরাধের জন্য মধ্যে মধ্যে বা কদাচিৎ অনুতপ্ত হয় মাত্র। দৈব অপরাধীরা তাদের প্রতিটি অপকার্যের জন্য সদা-সর্বদা অনুতপ্ত থাকে। প্রাথমিক অপরাধীরা নিজেদের শুধরাতে চেষ্টা করে না। তারা ইচ্ছা ক'রে অপরাধকে পেশা রূপে গ্রহণ ক.রে থাকে। দৈব-অপরাধীরা নিজেরা অপরাধ করলেও অপরকে অপরাধী রূপে দেখতে চায় না। তারা অপরাধকে ঘৃণা করে থাকে। তারা তাদের অপরাধ অন্যের নিকট প্রকাশ করে না। এই জন্য তারা কখনও দল গঠন করে নি। কিন্তু

প্রাথমিক অপরাধীরা ইহার ঠিক বিপরীত ব্যবহারের পরিচয় দিয়ে থাকে। এরা অপরকে অপরাধী হতে দেখলে খুশি হয়ে থাকে। কিন্তু এই উভয় প্রকার অপরাধীই সমজের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ ত্যাগ করে না। দৈব-অপরাধীরা অবস্থা গতিকে বাধ্য হয়ে অপকার্য করলেও বিপরীত অবস্থায় ঐরূপ কাজ করার চিন্তা করে না।]

বিগত মহাযুদ্ধের সময় এই দৈব-অপরাধীদের সম্বন্ধে বহু তথ্য আমি জ্ঞাত হতে পেরেছিলাম। এই সময়ে এদেশে অভাব ও প্রাচুর্য পাশাপাশি প্রকট হয়ে উঠে। এ' সময়ে যুদ্ধের প্রয়োজনে উত্তর ও পূর্ব বঙ্গের সীমান্তবর্তী প্রত্যেক জিলার প্রায় প্রতিটি ব্যক্তি ইংরেজ কিংবা আমেরিকানদের সামরিক কাজে নিযুক্ত হয়। চুরি অপেক্ষা সৎ উপায়ে অধিক উপার্জন ঐ সময় সম্ভব ছিল। ঐ সকল স্থানে গরিবদের মধ্যেও একটিও দৈব-অপরাধীদের সন্ধান পাওয়া যায় নি।

[এই সত্য মাত্র দৈব-অপরাধীদের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। কারণ এই সময় কর্মক্ষম ব্যক্তির কাহারও অভাব ছিল না। সাধারণতঃ মানুষ অন্ন সংস্থানের জন্য চাকুরি খোঁজে। কিন্তু এই সময় চাকুরিই তার জন্যে মানুষ খুঁজছিল। এবং তা সত্বেও প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোক পাওয়া যাচ্ছিল না। কিন্তু এত সত্বেও অন্যান্য অপরাধীদের সংখ্যা একটু মাত্রও এদেশে কমে নি। বরং ধনী লোকেরাই অধিকতর ধন লাভের জন্য জঘন্যতম অপরাধ করেছে। এই থেকে প্রমাণিত হয় যে মানুষের অভাবই অপরাধী সৃষ্টির একমাত্র কারণ নয়।]

সুষ্ঠু তদারকীয় অভাব এবং সুযোগ সুবিধা প্রদানের অভাব বহু ভালো লোককেও মন্দ করে তুলে। এই ভাবে বহু দক্ষ ব্যক্তিকে আমরা চিরতরে হারিয়ে ফেলি। বহু ব্যক্তি মনে প্রাণে চায় যে—মালিক এসে স্টোর চেক করে দেখুক যে সে কত ভালো। তারা সব সময় তাদের ভালো কাজের স্বীকৃতি চায়। কিন্তু এর অভাবে তারা দেখে যে চোরদেরও কোনও অসুবিধে নেই। তারাই শুধু সাধুতার বোঝা বয়ে বেড়ায়। এখানে পুরস্কারের ও তিরস্কারের প্রয়োজনও আছে। ভুলে গেলে চলবে না যে অভাব অভিযোগ ও প্রয়োজনের তাগিদ মানুষ মাত্রেরই আছে। বহুদিন নির্বিবাদে বাড়তে দিয়ে হঠাৎ একদিন কাউকে চেপে ধরা নিরর্থক। এইরূপ পরিবেশে দৈব-অপরাধী সৃষ্ট হয়ে থাকে। তড়িৎ ঘড়িৎ বাধা না পাওয়া দৈব-অপরাধীর সৃষ্টির অপর এক কারণ। আজ যদি কেউ বিনা বাধায় কারুর জমি দখল করতে পারে, সে তখন অপর এক জমি দখল করতে চাইবে। এর পর এর ওর ফল-পাকুড় চুরি শুরু হবে। এর পর সে এর

ওর দ্রব্য কেড়ে নিতে থাকবে। তারপর অপর ব্যক্তিরাও ঐ ভাবে তাকে অনুসরণ করে গোটা সমাজকে অপরাধী-সমাজে পরিণত করে দেবে।

স্বভাব এবং অভ্যাস-অপরাধীদের ন্যায় দৈব-অপরাধীদেরও অপরাধ পূর্বকল্পিত, স্বার্থযুক্ত ও আদর্শবিহীন হয়। সেই জন্যই তাদেরকে অপরাধীদের মধ্যে ধরা হয়। তবে তারা তাদের কাজের জন্য সব সময়ই অনুতপ্ত থাকে। শুধু তাই নয়, সুযোগ ও সুবিধে পেলে তারা নিজেদের শুধরে নেয়। আমি একজন দৈব-অপরাধীকে জানি, যে লোভে পড়ে ৫০টি টাকা চুরি করেছিল, কিন্তু সেই দিনই আবার কোনও এক গরিবের অনাহার-ক্লিষ্ট ছেলেমেয়েদের দুঃখে দুঃখিত হয়ে তাদের আহারের যোগাড়ের জন্য সেই চুরির টাকা কটা সে তাদের দিয়ে এসেছে। এই কাজ সে নিজের ও নিজ পরিবারের নানাবিধ অসুবিধা সত্ত্বেও করেছিল। যতক্ষণ অপরাধীর স্বকীয় অপরাধের জন্য অনুতাপ আসে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে দৈব-অপরাধী বলাই উচিত। আমি অপর একটি দৈব-অপরাধীকে জানি, যে নিজের অপকর্মের জন্য অনুতপ্ত ত ছিলই, পরন্তু অপরাধীদের প্রতি সদাসর্বদাই সে একটা ঘৃণা পোষণ করত। এমন কি, সে অপরাধ নিবারণের জন্য পুলিশকে আন্তরিক ভাবে এবং বিনা স্বার্থে অনেক সাহায্যও করে ছিল। নিম্নে কোনও এক দৈব-অপরাধীর একটি উল্লেখযোগ্য বিবৃতি তুলে দেওয়া হ'ল।

"শহরের আজ আমি একজন ধনী ও মানী ব্যক্তি। আজ আমি জন-সাধারণের অপকর্মের বিচার করে থাকি। একদিনের কথা মনে পড়ে। আমি তখন গাঁয়ে থাকতাম। প্রথম যৌবনের দিনে এবং বাল্য অবস্থায় কখনও একা একা, কখনও বা দল বেঁধে আমরা এর ওর ফল চুরি করেছি। আমরা চুরি করে রস পেড়েছি ও ডাব চুরি করেছি, পুকুরের মাছও ধরে নিয়েছি—মাঝে মাঝে আমি অন্যদের সঙ্গে এই কাজে ধরাও পড়েছি। পাড়ার লোকেরা আমাকে ধরে এনেছে বাবার কাছে। বাবা আমাকে মেরেছেন, বকেছেন ও সাবধান করে দিয়েছেন। ওই সব অপকর্ম যদি আমি কোনও শহরে বসে করতাম ত এতদিনে আমি পাঁচ-ছয় বারের দাগী-চোর হতাম। আজ আমি দশজনের একজন ও দেশের প্রয়োজনীয় নাগরিক—আমাদের পল্লীসমাজ ঐরূপ হবার সুযোগ আমাকে দিয়েছিল। তাই আজ আমি সদা ঘৃণ্য কোনও এক চোর নই। আমি এখন এই দেশের একজন ভাল নাগরিক।"

বালক অপরাধীদের যেমন বর্তমান যুগে প্রকৃত অপরাধীর মধ্যে ধরা হয় না,

তেমনি ওই সব দৈব-অপরাধীদেরও প্রকৃত অপরাধী বলা উচিত হবে না। বালক অপরাধীর বিচারের জন্য যেমন পৃথক বিচারালয় আছে, তেমনি তদন্ত দ্বারা কোনও অপরাধীকে দৈব-অপরাধী বলে জানলে বা বুঝলে তারও বিচার-ব্যবস্থা বালক অপরাধীর ন্যায়ই পৃথক বিচারালয়ে হওয়া উচিত। বালকদের যেমন জেলে না পাঠিয়ে সময় সময় অভিভবাকদের হাতে সমর্পণ করে তাদের শুধরোবার সুযোগ দেওয়া হয়, তেমনি ভাবে অনুরূপ সুযোগ ও সুবিধা দৈব-অপরাধীদের দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। এমন কি, দৈব-অপরাধীরা যদি কোনও কারণে দ্বিতীয়বার বা তৃতীয়বার অপরাধও করে এবং সেই অপরাধ সমূহের জন্য তখনও পর্যন্ত যদি তাদের অনুতপ্ত দেখা যায় তো তাদের জেলে না পাঠিয়ে পাঠান উচিত সংশোধনাগারে। সাধারণ কারাগারে পাঠিয়ে তাদের উৎকট অভ্যাস-অপরাধীতে পরিণত হ'তে দেওয়া উচিত হবে না। যতক্ষণ তাদের অনুতাপ আসে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সহানুভূতির সহিতই দেখা উচিত।

[মানুষের মধ্যে অনুতাপ এলে বুঝতে হবে যে তখনও তাদের মধ্যে নৈতিক অসাড়তা পুরাপুরি স্থান পায় নি। অর্থাৎ তাদের মধ্য হতে সৎপ্রেরণা একেবারে দূরীভূত হয় নি। এই সময় পর্যন্ত তাদের মধ্যে অপস্পৃহার সহিত সৎপ্রেরণাও বর্তমান আছে। এইজন্য অপস্পৃহা দ্বারা তাদের সূক্ষ্মবৃত্তি মধ্যে মধ্যে ক্ষতিগ্রস্থ হলেও পরে তাদের সৎপ্রেরণার দ্বারা উহা পুনর্গঠিত হয়ে উঠে।]

এই দৈব-অপরাধী থেকে অভ্যাস-জনিত অভ্যাস অপরাধীতে পরিণত হওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। বরং উহা প্রায়ই পৃথিবীতে হয়ে থাকে। এই সময় তাদের প্রতিটি কার্য সৎপ্রেরণা বিবর্জিত হয়ে অপস্পৃহা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এর ফলে পূর্ব-পরিচ্ছেদে বর্ণিত কারণে এদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হয়। তৎসহ তাদের স্বভাব চরিত্রেরও বহুল পরিবর্তন ঘটে থাকে। বক্তব্য বিষয় বুঝার জন্যে নিম্নের বিবৃতিমূলক দৃষ্টান্তটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

"বিশ বছর আগে কোলকাতায় আমি চাকুরির চেষ্টায় আসি। কিন্তু কোথায়ও আমি চাকুরি পাই না। অগত্যা আমি ফুটপাতে শুয়ে থাকতাম। হঠাৎ একদিন এক-স্যাঙ্গাত জুটে গেলে। শহরে তার একটা জুয়ার আড্ডা ছিল। চাকুরির লোভে দেখিয়ে সে আমাকে তার বাড়ি আনে। আমি তাদের আড্ডার পাহারাদার হই। কিন্তু হুজুর! নিজে কখনও আমি এই জুয়া খেলি নি। একদিন পুলিশ এসে আড্ডায় হানা দেয় এবং অপর সকলের সঙ্গে আমাকেও আড্ডার ভেতর ধরে ফেলে। জুয়া তো সেখানে সেই সময় পুরাদমে

চলছিলই, তা ছাড়া জুয়াড়ীদের মধ্যে কয়েকজন চোরও ছিল। জরিমানা অনাদায়ের জন্য সেবার তিন সপ্তাহ আমার জেল হয়। এইটেই আমার প্রথম সাজা। জেল থেকে বেরিয়ে আমি কিছু দিন এর ওর দোরে ঘুরি। কিন্তু কেউ আমায় দু'-মুঠো অন্নের সংস্থান করে দেয় না। দেশে ফেরবার মত গাড়ি ভাড়াও আমার ছিল না। শেষে নাচার হয়ে আমার এক পুরানো বন্ধুর সন্ধানে বের হই। কোনও এক বেশ্যাগৃহে সেই বন্ধুটির সন্ধান মেলে। বন্ধুবর একটা চোরাই 'হার' আমাকে গছিয়ে দিয়ে সেটা বিক্রি করে টাকা আনতে বলে। আমি আনমনা ভাবে তাতেই রাজি হই বটে! কিন্তু অনভ্যাসের দোষ যাবে কোথা! বিক্রির সময় আমি বামালশুদ্ধ ধরা পড়ি। এই অপরাধের বিচারে আমার চারমাস জেল হয়। এর পর আমার ভীষণ অনুতাপ আসে। জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর পরিচিত চোরেরা আমাকে তাদের দলে ভিড়তে বলে। কিন্তু আমি তাদের সেই কুপ্রস্তাবে রাজি হই না। কোনও এক গৃহস্থের বাড়িতে আমি চাকরের কাজ নিই। একদিন বাড়িতে একটা সোনার গহনা হারিয়ে যায়। বাড়ির কর্তা আমাকে সন্দেহ করে থানায় পাঠান। আমার অঙ্গুলির টিপ্ থেকে প্রমাণিত হয় যে আমি একজন দাগী চোর। এরপর পুলিশ আমাকে জেল হাজতে পাঠায়। জেলে একজন পরিচিত চোরের সঙ্গে দেখা হয়। সে সব কথা শুনে আমায় বলে—'দেখলে ত চাঁদ! বেয়ে চেয়ে ত দেখলে। এখন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসো। ভিড়ে যাও মোদের লগে!' বুঝলাম পূর্ব সমাজে আমার আর স্থান নেই। আমাকে বাঁচবার জন্য নূতন কোনও এক সমাজ বেছে নিতে হবে। আরও দু'চার জায়গায় চাকুরির চেষ্টা করলাম। আমার মত একজন চোরকে কিন্তু কেউ স্থান দিল না। শেষে নাচার হয়ে চোরেদের দলেই ভিড়ে গেলাম। সেই থেকে দল বেঁধে আমরা চুরি করে বেরুতাম। প্রথম প্রথম তারা আমাকে রাস্তার পাহারায় নিযুক্ত রাখত। শেষের দিকে আমি বাড়ির পাঁচিলের উপর উঠে পাহারা দিতাম। সন্দেহজনক লোক নিকটে দেখলে সঙ্কেত দ্বারা [শিষ দিয়ে কিংবা অন্য কোনও উপায়ে] ভিতরের চোরদের সতর্ক করে দিতাম। এর পর আমি পাঁচিল টপকে বাড়ি ঢুকতে শিখি। তারপর আমি তালা ভাঙতেও শিখে নিই। এমনি ভাবে অচিরেই আমি লায়েক হই। জাত-শেয়ানাদের আমি চিনতে শিখি। আপনারা যাদের স্বভাব-অপরাধী বলেন, তাদেরকেই আমরা বলি "জাতশেয়ানা"। এই জাত-শেয়ানাদের আমরা খুঁজে বার করে তাদের অপকর্মে নিযুক্ত করি। এরা

নিঃশব্দে সাপের মত চলে। এদের মধ্যে কোনও ভয়-ডর নেই। তবে এরা বড় বোকা হয় এবং এরা স্বল্পতেই সন্তুষ্ট থাকে। আমাদের মত বাড়ির ঝি-চাকর এবং বকাটে পুস্থিদের কাছ হ'তে পূর্ব থেকে "মাল" সম্বন্ধে খবর নেবার কায়দা কানুন তারা জানে না। আমরা এদের আধুনিক যন্ত্রপাতির কায়দা শেখাই। আমরা চুরি সম্বন্ধে এদেরকে নানারূপ উপদেশ দিই। কিন্তু এত সত্বেও এরা তাদের সনাতন সিঁদ কাটিই বেশি পছন্দ করে। এদের আমরা নির্ধারিত বাটীর ঘরের তুয়ার পর্যন্ত পৌছিয়ে দিই। এমন কি জানালার বাইরে থেকে তাদের আমরা বাক্স বা পেটরা আদি বামালও অনেক সময় দেখিয়ে দিই। চুরির উপযুক্ত সময় ও উহার সুযোগ এবং প্রণালী সম্বন্ধেও এদের আমরা শিক্ষা দিতে থাকি।' শেষের দিকে হুজুর, আমি অনেকটা "জাত শেয়ানাদের" মতই হয়ে উঠি। আমার সব কিছু ভয়-ডরও দূর হয়। কিন্তু মাঝে মাঝে সপ্তাহভোর কখনও কখনও তুই-তিন সপ্তাহ অপকার্যে আমার কেন জানি না মন আসে না। হুজুর! আমি তখন ধার কর্জ করে কিংবা ফিরি করে জীবিকা নির্বাহ করি। এই সময় আমার কু-কার্যের জন্যে প্রায়ই অনুতাপ আসে। মনে হয়, আমি কি ছিলাম আর কি'ই বা হলাম! মনের মধ্যে নানাপ্রকার ভয়েরও উদ্রেক হয়। বন্ধুরা ডাকতে এসে গাল দিয়ে ফিরে যায়, আমি তাদের সঙ্গে যেতে রাজি হই না। কিন্তু কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন আমার মধ্যে অপকর্মের হিক্কা বা হিঙ্গা [ইচ্ছে] ফিরে আসে। ভয়-ডরও আমার মন থেকে বিদূরিত হয়। আমি তখন নিজে থেকেই দলের লোকেদের খুঁজে বার করে অপকর্মে লিপ্ত হই।

হুঁ হুজুর! তাই হবে। আপনারা যাকে অপস্পৃহা বলেন তাকে আমরা বলি "হিক্কা বা হিঙ্গা"। দেশবালী চোরেরা একে 'দিল' বলে। এই "হিক্কা বা হিঙ্গা বা দিল্" আনবার জন্য আমরা মদ খাই। এই হিক্কা বা হিঙ্গা বা দিল না আসা পর্যন্ত আমাদের যেন কেমন ভয় ভয় করে। আমরা মনে যেন এ সময় কোন জোর পাই না। তা ছাড়া কেমন যেন একটা আলিস্যি ভাব আসে। কোথাও আমাদের বেরুতেও ইচ্ছে করে না।

হাঁ, বলি শুনুন। হুজুর! আমার এই "হিক্কা বা হিঙ্গা" কেবল রাত্রিকালেই আসে। আমার মধ্যে উহা কখনও দিবাভাগে আসে নি। আমাদের কেউই দিনের বেলা চুরি করে না বা তা করতে পারেও না। কিন্তু এক শ্রেণীর চোরদের এই হিঙ্গা বা হিক্কা কেবলমাত্র দিবাভাগেই আসে। এইজন্যে দিনের চোর এবং রাত্রের চোরের দলও বিভিন্ন হয়। শুরু থেকেই আমি রাত্রিতে চুরি

করে এসেছি। কারণ, আমার ওস্তাদ ছিল একজন রাত্রের চোর। এইজন্যেই আমার চুরির হিক্কা বা হিপ্সা বোধহয় রাত্রে আসে কিংবা আমার মধ্যে রাত্রের হিক্কা [স্পৃহা] আছে বলে আমি রাত্রে চুরি করি। হুজুর! আমি একজন মুখ্য-সুখ্য মানুষ। তাই এতো কথা ঠিক ভাবে আমি বলতে পারি না। হুজুর! দলে মোদের ছয় বা সাতের বেশি আমরা লোক নিই না। বেশি লোক নিলে আত্মগোপনের অসুবিধা হয়। তা ছাড়া আমাদের হিস্তায় বা ভাগেও কম পড়ে।

বাবু! এর পূর্বেও আমি ছয় বার ধরা পড়েছি। সকলে আমাকে মাত্র এইটুকু জিজ্ঞেস করেছে যে, আমি ঐ চুরি করেছি কিনা ও কি করে আমি চুরি করলাম। কিন্তু আমি কেন এবং কি ভাবে চোর হ'লাম, এ কথা আমায় কেউ জিজ্ঞেস করে নি। আপনার মিষ্টি কথা আজ আমায় মোহিত করে দিচ্ছে। আজ আমার গাঁয়ের কথা ও আমার মা আর বোনের কথা মনে পড়ছে। গত বিশ বছর আমি তাদের কোন খোঁজই নিই নি। আমার ছাতি ফেটে যাচ্চে, হুজুর! এবারের মত আমায় রেহাই দিন। আমি আর কখনও অপকর্ম করব না। আমি হুজুর দেশে চলে যাব। আপনারা আমাকে গাঁয়ে পাঠিয়ে দিন।"

অপরাধীদের অপরাধী হওয়ার কাহিনী সব সময়েই যে এরূপ করুণ হয়ে থাকে তা নয়। আমার মতে প্রতিটি ক্ষেত্রে উহা সত্য মনে করবার কোনও কারণ নেই। বরং অধিক ক্ষেত্রে অপরাধীরা স্ব-ইচ্ছাতেই অপরাধী হয়। তবে এরূপ তারা একদিনে হয় না এবং কার্যগতিকে ও অবস্থাক্রমেই তা তারা হয়ে থাকে।

উপরের বিবৃতিটি যদি সত্য হয় ত আমরা অপরাধ-স্পৃহাকে দিবাস্পৃহা ও রাত্রস্পৃহা এই দুই ভাগে বিভক্ত করতে পারি। আমার মতে বিবৃতিটির মধ্যে কিছুটা সত্য আছে বলে মনে হয়। কারণ আমরা এখনও পর্যন্ত এমন একটিও প্রকৃত বা পেশাদার চোর পাই নি, যে দিন এবং রাত্রি উভয় সময়েই চুরি করেছে। বরং দিনের চোরদের রাত্রে এবং রাত্রের চোরদের দিনে কখনও চুরি করতে দেখা যায় নি। চোরদের সম্বন্ধে এই কথাটি বিশেষরূপে বলা চলে। অপরাধীদের শেষ পর্যায়ের 'প্রকৃত অপরাধীদের সম্বন্ধে ইহা বিশেষরূপে প্রযোজ্য। তবে এমন কতকগুলি চোর থাকলেও থাকতে পারে যারা রাত্রি এবং দিন উভয় কালেই চুরি করতে সক্ষম। যদি এরূপ কোনও চোরদলের

অস্তিত্ব থাকে তো তারা উরোক্ত দিন ও রাত্রি চোর হ'তে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন প্রকৃতিরই অপরাধী হবে। অন্ততঃ আমি এরূপ মনে করি।

আমার মতে এরা প্রত্যেকেই প্রথম পর্যায়ের 'প্রাথমিক অপরাধী' হয়ে থাকে। এখন প্রকৃতপক্ষে দিন ও রাত্রির চোরদের এই "দিন ও রাত্রি স্বভাব" অভ্যাসগত ভাবে আসে, প্রকৃতিগত ভাবে আসে কিংবা বিভিন্ন রকম অপস্পৃহার জন্যে তারা ঐরূপ হয় তা বলা বড় শক্ত। এ সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি।

অপরাধীদের সঙ্গে বেশ্যা নারীদের বহু বিষয়ে নিকট সম্বন্ধ আছে। তারাও স্বভাব, মধ্যম, অভ্যাস ও দৈব এই কয় শ্রেণীর বেশ্যাতে বিভক্ত। তাই দৈব-অপরাধীদের ন্যায় দৈব-বেশ্যাও দেখা যায়। দৈব-বেশ্যাদের মধ্যে অনেকেই আবার অবস্থা বিপর্যয়ে অভ্যাস-বেশ্যা হয়ে উঠে। তবে তা তারা একদিনে হয় না। তা তারা ধীরে ধীরে হয়ে থাকে। অনেকে বাধ্য হয়ে সাধারণ রূপজীবিনীর পর্যায়ে নেমে আসে। ভিন্নরূপ অবস্থায় যারা সৎ ও সতী হ'তে পারত, তারাই বিপর্যয়ের মধ্যে অসৎ ও অসতী হয়। এ বিষয়ে কোনও এক দৈব-বেশ্যার নিম্নের স্বীকারোক্তিটি প্রণিধান-যোগ্য।

"আমার বাস ছিল বাঙ্গলার এক দূর গ্রামে। তের বছর বয়সে এক আটান্ন বছর বয়স্ক লোকের সঙ্গে আমার সাদি হয়। চোদ্দ বছর বয়সে আমি স্বামীর ঘরে আসি। আমার দেবরের বয়স তখন ষোল। বর্ষীয়ান গুরুজনদের সান্নিধ্য এড়িয়ে সমবয়স্ক বিধায় আমার দেবরের সঙ্গই আমি কামনা করতাম। কালক্রমে আমাদের দুজনের মধ্যে একটা নিষ্পাপ বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। একদিন এক চাঁদনি রাতে শানের ঘাটের বকুল গাছটার তলায় দু'জনে বসেছিলাম। হঠাৎ আমার দেবর আমাকে তার বুকের কাছে টেনে নিল। আমি প্রতিবাদ করে উঠে দাঁড়ালাম। এমন সময় পিছন ফিরে দেখি আমার সোয়ামী। চুলে ধরে তিনি আমাকে পদাঘাত করলেন। কত ক্রন্দন ও অনুনয় করলাম, কিন্তু কেউ আমাকে আশ্রয় দিল না। ওদিকে গুণধর দেবরেরও কোথায়ও আর দেখা মিলল না।

'গাঁয়ে-ঠেলা' মানদা মাসী কখনও কখনও গাঁয়ের শেষ সীমানায় এসে থাকত। এইদিন কলকাতা হ'তে সে বুড়ী ঝি-মাকে দেখতে এসেছিল। আদর করে সে আমাকে কলকাতায় নিয়ে আসে। আত্মরক্ষার জন্য অনেক চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার মতো এক অসহায় নারীর পক্ষে তা সম্ভব হলো

না। বাপ মাকে চিঠি লিখলাম, কিন্তু সেখান থেকে কোন উত্তর পেলাম না। প্রথম প্রথম বাড়িওয়ালীর পেটে আমার আয় যেত। শেষে চালাক হলাম ও লোক চিনতে শিখলাম। কিন্তু ততো দিনে আমি সব হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের সমাজ আমায় আশ্রয় দেয় নি। যাকে আশ্রয় করে একনিষ্ঠ হ'তে চেয়েছি, সেই আমাকে ঠকিয়ে দূরে সরে গিয়েছে। আমাকে অবহেলা করে সমাজ তাকে কেড়ে নিয়েছে, কিন্তু আমাকে তারা কোল দিতে রাজি হয় নি। তাই সমাজের ভাল ভাল ছেলেদের নষ্ট করে আমি আনন্দ পাই। তাদের দেখলেই আমার প্রতিশোধ-স্পৃহা জেগে উঠে। এইভাবে আমি সমাজের উপর প্রতিশোধ নি। আমি লেখাপড়াও শিখেছি। এতে আমার ব্যবসায় সুবিধে হয়।"

আমার বিশ্বাস সুযোগ ও সুবিধা দ্বারা এই দৈব ও অভ্যাস-অপরাধী ও বেশ্যাদের আবার সমাজের মধ্যে ফিরিয়ে আনা খুবই সহজ। কিন্তু স্বভাব-অপরাধী ও স্বভাব-বেশ্যাদের সম্বন্ধে সেই কথা বলা যায় কি? পূর্ব পরিচ্ছেদের এক জায়গায় বলেছি যে ঔষধাদি দ্বারা মানবের এই আদিম-বৃত্তি জাগ্রত করা যায়। তাই যদি হয় ত অন্য কোনও বিপরীত ঔষধাদি দ্বারা তাদের এই স্বভাব-বৃত্তির নিবৃত্তি হয় কিনা—এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা উচিত। পূর্বাপর সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করলে এই অপরাধী ও বেশ্যাদের প্রতি আমাদের ঘৃণা আসে না। বরং সেই স্থানে আসে আমাদের সহানুভূতি। তাদের জন্য আমাদের কি কিছুই ভাববার বা করবার নেই?

[অপরাধীদের ন্যায় অনেক নিরপরাধ ব্যক্তিকেও উক্তরূপে চারটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত করা যায়। বহু ব্যক্তি সমশ্রেণীর হওয়ায় কিংবা স্ব স্ব পেশার খাতিরে সচরাচর অপরাধীদের সংস্পর্শে আসে। আমার মতে তাদেরও উক্তরূপে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। পুলিশ ও উকিলগণ কার্যগতিকে প্রত্যহই অপরাধীদের সংস্পর্শে আসে। এইজন্য আমরা যেমন, স্বভাব, মধ্যম, অভ্যাস ও দৈব উকিল দেখতে পাই, তেমনি আমরা স্বভাব, মধ্যম, অভ্যাস ও দৈব পুলিশও [?] দেখি। স্বভাব-উকিলেরা অপরাধীদের 'ডিফেণ্ড' করার [পক্ষ সমর্থনের] মধ্যে বিশেষ উত্তেজনা ও আনন্দ পেয়ে থাকেন। এমন অনেক স্বভাব-উকিল আছেন যাঁরা বিনা পয়সাতেও চোরদের সাহায্য করে থাকেন। আদালতে তাদের মামলাও তাঁরা বিনা পয়সায় লড়েন। অনেক সময় অপরাধীরাও এই সব উকিলদের খুঁজে বার করে তাদের মাসিক মাহিনায়

উপদেষ্টা নিযুক্ত করেছে। তাঁদের তখন কাজ হয়, 'চুরির আগে ও পরে' চোরদের পরামর্শ ও উপদেশ দেওয়া। এই ভাবে এঁরা এদের অপস্পৃহার নিষ্কাশন ঘটিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করেন এবং সেই সঙ্গে নিরপরাধও থেকে যান। ভাগ্যক্রমে এই সকল উকিলরা অপরাধী না হয়ে উকিল হয়েছেন মাত্র। কয়েক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে এক-এক শ্রেণীর অপরাধীরা এক-এক প্রকারের উকিল নিয়োগ করেছে। অর্থাৎ যে উকিল ঠগীদের বা গুণ্ডাদের পক্ষ সমর্থন করেন সেই উকিল চোরদের সঙ্গে কোনও সংস্রব রাখেন না। এই ভাবে আমরা গুণ্ডাদের, প্রবঞ্চকদের, পিকপকেটার ও সিঁদেল চোর প্রভৃতির জন্য আলাদা আলাদা উকিল নিযুক্ত হতে দেখি।

কোনও এক সুদক্ষ উচ্চপদের পুলিশ অফিসারের মুখে শুনেছিলাম যে, বাড়িতে চুরি হওয়ার পর ফরিয়াদি থানায় এসে এজাহার না দিয়ে উকিলের খোঁজে বার হলে এবং উকিল সঙ্গে করে তবে থানায় এলে বুঝতে হবে যে ফরিয়াদির নালিশটি সর্বৈব মিথ্যা ও সাজান। এই বিশেষ বাক্যটি এই ধরণের উকিলদের উপরেই প্রযোজ্য।

সাধারণতঃ স্বভাব ও মধ্যম-উকিলদের আমরা ফৌজদারী কোর্টে এবং অভ্যাস-উকিলদের ফৌজদারী এবং দেওয়ানীতে প্র্যাকটিশ করতে দেখি। দৈব-উকিলেরা প্রায়ই প্র্যাকটিশ করেন না। এঁরা প্র্যাকটিশে অকৃতকার্য হয়ে শেষ বরাবর ফার্ম বা ব্যাঙ্কের ম্যানেজারী বা অনুরূপ কোনও চাকরি গ্রহণ করেণ। তবে এদেশের অধিকাংশ উকিল সৎ ও সাধু চরিত্রেরই হয়ে থাকেন।

অপরাধীদের সহিত বেশ্যাদের সম্বন্ধ চিরন্তন ও শাশ্বত যুগের। প্রকৃত অপরাধীদের বেশ্যা না হ'লে একদিনও চলে না। অনেক সময় বেশ্যা নারীদের জন্যেই বহুবিধ অপরাধ সংঘটিত হয়। অপকার্যের জন্যে বেশ্যাগৃহ থেকে যাত্রা করে তারা লুণ্ঠিত দ্রব্যসহ বেশ্যাগৃহেই ফিরে আসে এবং সকাল না হওয়া পর্যন্ত সেইখানে অপেক্ষা করে। তা ছাড়া বেশ্যা এদের কাছে মাদক দ্রব্যের ন্যায়ই প্রিয়। স্বভাব, অভ্যাস ও দৈব বেশ্যা সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হয়েছে। তাদের বিষয় এখানে পুনরুক্তি করা নিষ্প্রয়োজন।

এই উকিল পুলিশ ও বেশ্যাদের ছাড়া আরও কয়েকটি পেশা বা বৃত্তি আছে যে সকল পেশা ও বৃত্তিতে অপরাধী হবার সুযোগ ও সুবিধা সর্বাপেক্ষা বেশি। উহাদের দৃষ্টান্ত স্বরূপ ব্যবসায়ী এবং সৈনিকদের বিষয় বলা যায়। যুদ্ধের সময়

সৈন্যগণ ও ব্যবসাক্ষেত্রে ব্যবসায়িগণ লোভ বশতঃ যে কোনও মুহূর্তে অপরাধী হ'তে পারে এবং হয়েও থাকে। এই ব্যবসায়িগণ যেমন স্বভাব, অভ্যাস ও দৈব ব্যবসায়ী হয়, সৈনিকরাও তেমনি স্বভাব, অভ্যাস ও দৈব সৈনিক হ'লেও হ'তে পারে। এমন অনেক স্বভাব-ব্যবসায়ী আছে, যারা প্রেরণাগত [ইন্‌ষ্টিংক্ট] ভাবে ব্যবসা করে এবং ব্যবসাক্ষেত্রের বাইরে অন্য কোনও বিষয়ে তাদের বুদ্ধি একেবারেই খোলে না। এমন কি কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাদের নির্বোধের মতই মনে হয়।

আদিম মানুষ, স্বভাব-বেশ্যা ও স্বভাব-সৈন্য অপরাধীদের নিকট আত্মীয় বলা যেতে পারে। এই কারণে এই ত্রিবিধ ব্যক্তিদেরই আমরা উল্কি ধারণ করতে দেখি। অপরাধী, আদিম-মানব ও সৈন্যগণই সাধারণতঃ উল্কি ধারণ করে। এ সম্বন্ধে জোর করে কোনও কথা বলা চলে না। কেন না অনেকে আবার খেয়াল মত বা শখ মেটাবার জন্য উল্কি ধারণ করলেও পরে এজন্য এঁরা অনুতপ্ত হন এবং সেই উল্কি উঠানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। কিন্তু এই উল্কির জন্য গর্ববোধ করেন—এমন মানুষেরও এদেশে অভাব নেই। তাই এ সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি।

[উপরের তথ্য হতে আমরা বুঝতে পারি যে বহু অপরাধমুখী মানুষ তাদের অন্তর্নিহিত অপস্পৃহা কৃত্রিম উপায়ে বহির্গত করে দিয়ে নিজেদের নিরপরাধ করতে সক্ষম হন। মানুষের মধ্যে আদি অপস্পৃহার অবস্থিতির ইহা অপর এক বড় প্রমাণ রূপে বিবেচিত হতে পারে।]

উকিল এবং ব্যবসায়ীদের ন্যায় অনেক সাহিত্যিকও উপরোক্ত রূপে চরিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তাঁদের বাড়তি অপস্পৃহার নিক্রমণ ঘটিয়ে থাকেন এবং এইরূপে কোনও রকমে নিজেদের নিরপরাধ রাখতে সক্ষম হন। এঁরা প্রায়ই এঁদের নায়ক-নায়িকাদের দ্বারা নানারূপ অপরাধমূলক কাজ করিয়ে নিজেদের অপরাধ-স্পৃহার উপশম ঘটান। অপরাধ- সম্বন্ধীয় কথাবার্তা, আলোচনা, লেখা, চিন্তা ও স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে অনেক অপরাধমুখী ও নিরাপরাধ ব্যক্তি প্রতিদিন নিজেদের অপরাধ-স্পৃহার নিষ্কাশন ঘটিয়ে নিজেদের নিরপরাধ রাখতে সক্ষম হন। এইভাবে প্রতিদিন আমরা যে সব অপস্পৃহা বাক্-প্রযোগ, কুসঙ্গ ও প্রলোভন প্রভৃতি দ্বারা সংগ্রহ করি, তা-আমরা উপরোক্তভাবে নিষ্কাশিত করে দিয়ে অপস্পৃহার উপশম ঘটিয়ে নিরাপরাধ থাকি।

এই একই কারণে যে সকল পুরানো চোর পুলিশের "ইন্‌ফরমার" হয়,

তাদের অনেকেই আর চৌর্য কার্যে হাত দেয় না। বহুদিন ইনফরমারি করার পর ইচ্ছা সত্ত্বেও তারা আর অপরাধ করতে পারে না। এদের অপস্পৃহা উক্তরূপ পৃথক ও ভিন্নরূপ প্রণালী দ্বারা নিষ্কাশিত হয়ে যাওয়ায় তারা নিরাপরাধ থাকে।

এই বিশেষ ক্ষেত্রে আমি সত্যকার বিশ্বাসী বা সাচ্চা ইনফরমারের কথা বলেছি। যে সকল ইন্‌ফরমার দুই দিকে কাটে, তারা কখনও সত্যকার ইন্‌ফরমার নয়। তারা ইন্‌ফরমার [প্রাইভেট গোয়েন্দা] হয়, তাদের অপ-কর্মের সুবিধার জন্যে। একদিক দিয়ে যেমন তারা শত্রুমিত্রকে ধরিয়ে দেয়, তেমনি অপর দিকে তারা নিজেরাই আবার অপকর্ম করে। এদের প্রকৃত উদ্দেশ্য থকে পুলিশকে কিছুটা খুশি করে নিজেদের অপকর্মের সুবিধে করে নেওয়া। এরা বিপক্ষ-পক্ষীয়দের ধরিয়ে দিলেও দলের কাউকে এরা কখনও ধরায় না। আসলে এদের অপরাধ-স্পৃহা চিরাচরিত প্রণালী বা চিন্তার মধ্যেই প্রবাহিত হতে থাকে। কিন্তু এই সকল ইন্‌ফরমারদেরও [গুপ্তচর] আবার কিছুদিন ইন্‌ফরমারি করার পর অপকর্মে বিমুখ ও বীতশ্রদ্ধ হ'তে দেখা গেছে।

এই সকল ইনফরমার-চোরদের নিরপরাধ হওয়ার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আমি বহু পুরানো চোরকে ইন্‌ফরমার বানিয়ে উপরোক্তভাবে অপরাধীদের নিরাপরাধ করা যায় কিনা, সে সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আমি বুঝি যে, এই ভাবে কৃত্রিম উপায়ে অপরাধস্পৃহা নিষ্ক্রমণ করে দিয়ে অপরাধমুখী মানুষ নিরপরাধ থাকতে পারে। আমার মতে সকল প্রকার অপরাধীর চিকিৎসা উপরোক্তরূপে করা যায়।

স্বভাব-অপরাধীদের চিকিৎসা স্নায়ুর উপর কার্যকরী বিশেষ ঔষধের সাহায্যে করা উচিত। এ'ছাড়া স্বভাব-অপরাধীদের কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা ও ঘুমের ঔষধের প্রয়োজনও সার্বাপেক্ষা বেশি। স্বভাব অপরাধীদের চিকিৎসা কোনও কোনও বিষয়ে কতকটা পাগলেরই চিকিৎসারই অনুরূপ হয়। অভ্যাস-অপরাধীদের বিপরীত শিক্ষা-দীক্ষা ও পরিবেশেব মধ্যে এনে [সাজেস্‌শন] বাক-প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা করা বিশেষ প্রয়োজন; এমনি ভাবে পর-বাক্‌-প্রয়োগ দ্বারা তাদের স্ব-বাক-প্রয়োগে সক্ষম করে তাদের অতি সহজেই নিরপরাধ করা যায়। অপরাধ-রোগীদের চিত্ত বিশ্লেষণের দ্বারা চিকিৎসা করা উচিত। ঔষধাদির দ্বারাও তাদের চিকিৎসা করা যায়।

অপরাধীমাত্রেরই চিকিৎসার পূর্বে চিকিৎসকের দেখা উচিত যে অপরাধী বিশেষের কোন দৈহিক রোগ আছে কিনা, তাদের কোষ্ঠ কিরূপ পরিষ্কার আছে এবং তাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও দন্তের অবস্থাই বা কিরূপ। তাদের এই সকল দৈহিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করার পর মানসিক চিকিৎসায় হাত দিলে তবেই সুফল ফলবে বলে আমি মনে করি। অপরাধীদের চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধীয় পরিচ্ছেদে এই সকল চিকিৎসা সম্বন্ধে বিশেষরূপে আলোচনা করা যাবে। এ স্থলে অপরাধ-চিকিৎসা সম্বন্ধে কিছুটা আভাষ দেওয়া হ'ল মাত্র।

অন্যায়ী ও পাপীরা অপরাধীদের অগ্রদূত হওয়াতে ওদের মধ্য হতে প্রায়ই দৈব অপরাধীর সৃষ্টি হয়। তবে বিরাট জনসংখ্যার তুলনায় মাত্র স্বল্প কয়েকজন তাদের পাপ বা অন্যায়ের মাত্রা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি ক'রে অন্যায়কারী থেকে পাপী ও পাপী থেকে অপরাধীতে পরিণত হয়েছে। এইজন্য অধুনাযুগের সর্বসমাজের সভ্য মানুষ অন্যায়কারী ও পাপীদের জন্য কোনও পার্থিব শাস্তির ব্যবস্থা করে নি। তবে ক্রমবর্ধমান পাপ বা অন্যায় কার্য অপরাধী হবার পথ প্রশস্ত করে। একজন উৎকট বালক-অপরাধী প্রথমাবস্থায় অত্যাচারী ও পাপী ছিল। কিন্তু সে পরে একজন অপরাধীতে পরিণত হয়। উক্ত বালক অপরাধীর অভিভাবকের তৎকালীন বিবৃতি থেকে কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

"ছেলেটির বাপ-মা হঠাৎ মারা যাওয়ায় পড়শীরা তাকে আমার কাছে গছিয়ে দেয়। ছেলেটি তখন নিতান্ত শিশু। সম্পর্কিত আত্মীয় বিধায় আমি তাকে ফেলতে পারি নে। আমার স্ত্রী কিন্তু তাকে একেবারেই পছন্দ করল না। সে তাকে প্রায়ই মারধর করত। দেখাদেখি আমার পুত্রেরাও তাকে মারত। প্রতিরোধ বা প্রতিশোধের প্রয়াস পেলে আমার স্ত্রী, এমন কি বাড়ির চাকরও তাকে মারধর এবং তিরস্কার করেছে। ফলে সে প্রায়ই বাইরে বাইরে ঘুরতো। পাড়ার বখা ছেলেরাই হ'ত তার সঙ্গী। সে বাচ্চা কুকুর বা ছাগল-ছানা, যাকে পেত তাকেই মারত। ভিখারী দেখলে সে তাদের গায়ে কাদা ছুঁড়ত। অপেক্ষাকৃত দুর্বল শিশুদের সে মারধর করত। দুর্বলের উপর অত্যাচার করা যে একটা সনাতন নীতি, এরূপ একটা ধারণা শৈশব অবস্থাতেই তার মনে শেকড় গাড়ে।

হ্যাঁ! আমি স্বীকার করি যে এইরূপ অবস্থার জন্য আমাদের অবহেলা ও অশ্রদ্ধাই দায়ী। একদিন ভাঁড়ারের জানালা গলে আচার চুরি করার সময় সে ধরা পড়ে। প্রহৃত হওয়ার পর সে বলে ওঠে—'সকলকেই ডেকে আচার

খাওয়ান হয়, আর আমার বেলায় খালি 'বেরো বেরো'। আচার খেতে আমার ইচ্ছে হয় না বুঝি ?' ছেলেটি তখনও শিশু। শিশু-মনের এই সকাতর নালিশ আমাকে অভিভূত করে। কিন্তু আমি আমার স্ত্রীর ভয়ে তার প্রতি কোনও রূপ সুবিচার করতে পারি নি। এ বিষয়ে পূর্বদিনের মত আজও আমি তেমনি অক্ষম। জানি না, আসল অপরাধী কে ? সে, না আমি, না আমার স্ত্রী ?"

উপরোক্ত শ্রেণীর দৈব অপরাধী ব্যতিরেকে নিম্নোক্ত অন্য এক শ্রেণীর দৈব অপরাধী আছে। মধ্যম অপরাধীদের মত দৈব অপরাধীরা দুইটি পৃথক উপশ্রেণীতে বিভক্ত। এই উভয় শ্রেণীর দৈব-অপরাধী হতে প্রাথমিক-অপরাধী সৃষ্টি হতে পারে। উপরে ওদের প্রথম শ্রেণীর দৈব অপরাধীর কার্য্যকরণ উদ্ধৃত করা হয়েছে। এক্ষণে নিম্নে ওদের দ্বিতীয় শ্রেণীর [সাম্প্রতিক কালে সৃষ্ট] অপরাধীদের সম্বন্ধে বলা হবে।

এই শেষোক্ত শ্রেণীর অপরাধী দেশের বহু স্থানকে 'উপদ্রুত এলাকার'ও অধম করে তুলেছে। এই সকল ব্যক্তিরা গ্যাঙ্গষ্টারিসম'এর অতি পক্ষপাতী। এদের নীতি আদর্শ ধর্ম্ম জ্ঞান, সামাজিক-বোধ কোনও কিছুই নেই। প্রচণ্ড বাধা'তে মাত্র এরা পলায়নপর হয়। এদের সৎবাক্যে নিরস্ত করা যায় না। আদর্শ না থাকায় সুপিরিয়র ফোর্স'কে এদের বড়ো ভয়।

[আশ্চর্য—এই যে যারা অন্যের নিকট হতে উৎকোচ নেয় তাদের অন্যকে উৎকোচ দিতে হলে তারা অভিযোগ করে। যারা অন্যের জমি দখল করে তারা নিজেদের জমি অন্যেরা দখল করলে নিন্দামুখর হয়। এজন্য জনগণ কি করে তা না বিবেচনা করে জনগণ মনে প্রাণে কি চায় সেইটেই গণতন্ত্রের দেখা উচিৎ। অধিকাংশ ব্যক্তিদের খুশী করতে প্রয়াসী জনপ্রিয় গভর্মেণ্টের এই-টুকুই দেখতে হবে।]

এই শেষোক্ত দৈব ও প্রাথমিক অপরাধীদের মূল কারণ স্থানীয় বেকারত্ব ও জীবিকার অভাব এবং শিক্ষা দীক্ষার এবং দুর্বল আইন শৃঙ্খলা এবং তৎসহ প্রতিরোধকারীদের সাহস ও সঙ্ঘটনের অভাব। এই ধরনের অপরাধীরা স্থানীয় হয়ে থাকে। অর্থাৎ স্বপল্লীর চতুর্দিকে এরা অপরাধ করে থাকে। সামাজিক বন্ধন মুক্ত হওয়া ইহার অন্যতম কারণ। একই স্থানে 'বহু-পুরুষ' বসবাসী'দের মধ্যে এদের সংখ্যা প্রায় কম থেকেছে। এরা এমন পর্যায়ে এসেছে যে এক্ষণে ইহাকে অন্যায়ী বা পাপী বললে ভূল হবে।

বর্তমান ভারতে শেষোক্ত উপশ্রেণীর দৈব অপরাধীদের সংখ্যা দ্রুত বর্দ্ধমান। কারণ—এরা অপকর্মে বাধা না পাওয়ায় ওদের মনে ভয় নেই। বিনা বাধায় বা বিনা দণ্ডে অপকর্ম করা সম্ভব হলে ধীরে ধীরে বহু ব্যক্তি অপরাধী হবে। না শহর না পল্লী অঞ্চলে এরা দল বেঁধে পাইপ গান সহ গৃহস্থদের দ্রব্যাপহরণ ও নারীদের উৎপীড়ন করেছে। এরা জানে ভয়ে কেউ পুলিশে নালিশ জানাবে না। উপরন্তু পূর্বের মত পুলিশও উহা দমনে তৎপর হবে না। [এ সম্বন্ধে পুলিশদের সংবাদ সংগ্রহ করে নিজেদেরই উদ্যোগী হওয়া উচিৎ] এরা এইভাবে ধীরে ধীরে কিংবা দ্রুত গতিতে প্রাথমিক অপরাধীতে পরিণত হচ্ছে। পূর্বের মত গ্রামীণ মানুষ এদের ঠেঙিয়ে মারতে পারে নি। সেই ক্ষেত্রে তাদের পুলিশের খপ্পরে পড়া বা ফৌজদারি সোপার্দ হওয়ার সম্ভাবনা। নিরীহ পল্লী গ্রাম গুলির প্রবেশ পথে এরা বাস করাতে এদের আরও সুবিধা।

গভর্মেণ্ট এদের রক্ষা করতে অপারক হলে এদের আত্ম রক্ষার্থে আইন স্বহস্তে নেবার অধিকার স্বীকার করুন। একদল বেকার চাকুরী না পেয়ে অর্থ কর্জ করে চাষবাষ করলো। কিন্তু—অন্য বেকার দল তাদের কষ্টার্জিত সম্পদ পর রাত্রেই লুঠ করে নিল। এইরূপ অবস্থায় পূর্বোক্ত দলের মনে হবে যে শেষোক্ত দলের মত এরূপ লুঠ পাট করাই শ্রেয়। রক্ষণ ব্যবস্থার অভাব এই দৈব অপরাধীদের সংখ্যা দ্রুত বর্দ্ধিত করে।

[বিগত মার দাঙ্গা কালে কারও অর্থের প্রয়োজন হলে তারা ব্যাঙ্ক থেকে কর্জ করে নি। তারা কেউ তজ্জন্য পিতামাতার নিকট আব্দার করে নি। পাইপগান হাতে তারা পথিকদের অর্থ কেড়ে নিয়েছে। প্রতিটি ছিনতাইয়ের পরে অনুতাপের বদলে তাদের মধ্যে দেখা গিয়াছে বিজাতীয় উল্লাস। এক পাড়ার তরুণ অন্য পাড়ায় গেলে তার মৃত্যু অবধারিত ছিল। সাম্প্রদায়িক মহাদাঙ্গা কালে রাস্তার এপারে ওপারে যা কিছু মারামারি। কিন্তু তখন একই বাটীর উপর তলার ও নিচের তলার ফ্ল্যাটের লোকেদের মধ্যে বিবাদ ছিল। [কারণ—রাজনৈতিক অলীক মতভেদ।] ছোটরা বড়োদের অনুকরণে বড়ো হতো এবং গুরু পরম্পরায় অপরাধী হতো।

পূর্বে একদল তরুণকে পথে দেখলে লোকের মনে ভরসা আসতো। এক্ষণে তারা ভীত হয়ে ভাবে ধন প্রাণ সহ ঐ স্থানটি অতিক্রম করতে পারবো তো: এরূপ অবস্থায় প্রতিটি দেশে লোকে দুর্বল গভর্মেণ্ট বদল করতে ব্যগ্র হয়।]

স্বভাব অপরাধীরা অন্যান্য উৎকট অপরাধীরা গহন বস্তিসমূহে আশ্রয়

গ্রহণ করে থাকে। তদনুরূপ এই সকল দৈব ও প্রাথমিক অপরাধীরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষপুটে আশ্রয় পায়। সাধারণ অপরাধসমূহকে ওরা রাজনৈতিক বর্ণ আরোপ করে আত্মরক্ষা করে। এই ভাবে তারা সমগ্র দেশকে সভ্য ও নিরাপরাধ মানুষদের বাসের অযোগ্য করে তুলে। ফলে শিক্ষা দীক্ষা গবেষণা চারু কলা ও সৎ উপায়ে জীবিকা অর্জনের স্পৃহা দেশ থেকে অন্তর্হিত হয়।

দেশে বহু পার্টি থাকলে গণতন্ত্রে [মাথা গুনতির দিনে] ভোট সংগ্রহে সার্থক হতে হলে সৎ মানুষকেও বারে বারে অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করতে হয়। এতে তারা নিজেরা বহুবিধ কারসাজী গ্রহণে বাধ্য তো হনই, সহস্র সহস্র তরুণদেরকেও ঐরূপ ভাবে নিযুক্ত করে তাঁরা তাদেরকে পরবিদ্বেষী করেন। ঐ সময় পারস্পরিক বিদ্বেষ ও উত্তেজনা অপস্পৃহার সহায়ক হয়। স্থূল বৃত্তির বেশী এবং সূক্ষ্ম বৃত্তির কম অনুশীলন অপস্পৃহার বহির্গমনের সহায়ক। এ জন্য রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি পার্টি থাকলে পার্টি বিদ্বেষ কম থাকে এবং অন্যায়ের সঙ্গে বারে বারে আপোষ করার প্রয়োজন অনুভূত হয় না। একটি পার্টি থাকলে রেষারেষি ও দলা দলি পার্টির বাইরে আইনানুরাগী জনগণকে বিব্রত করে না।

[বলা বাহুল্য—দেশের অধিকাংশ মানুষ সুশিক্ষিত সৎ ও সাধু এবং আইনানুরাগী না হলে গণতন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকর। এতে একজন শাসকের পরোক্ষ এবং সীমিত অন্যায়াচরণের বদলে সংখ্যাতীত ব্যক্তির ব্যাপক ও প্রত্যক্ষ অনাচার ও উৎপীড়ন সমগ্র জনগণকে সহ্য করতে হয়। ভুলে গেলে চলবে না যে অধিকাংশ মানুষ এদেশে শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে নিস্পৃহ থেকে শান্তিতে বসবাস করার পক্ষপাতী। সুরক্ষণের জন্যই এরা একদিন বিদেশী শাসনকে ভারতে আহ্বান করে এনেছিল। স্বতঃস্ফূর্ত নির্বাচন ভারতীয় গণতন্ত্রের একটি বিশেষত্ব ছিল। এজন্য—রাষ্ট্রীয় দল বা পার্টি-সর্বস্ব নির্বাচন এদেশের স্বাভাবিক শান্তি বিঘ্নিত করেছে। অন্ততঃ পল্লীঅঞ্চলে এ গুলি নূতন করে স্থাপন করার যৌক্তিকতা নেই। দেশ উপযুক্ত না হলে ডেমক্রেসী অকারণে বিদ্বেষ ও দলাদলি সৃষ্টি করে। দেশের স্বার্থের চাইতে তখন পার্টির স্বার্থই তাদের বেশী হয়।

[রাজনৈতিক দল সমূহের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা ক্ষমতাসীন দলকে ওদের দমনে রক্ষীদের [পুলিশ] নিয়োগ করতে বাধ্য করে। এতে স্বভাবতঃই রাষ্ট্রের পুলিশকে কিছুটা আস্কারা দিতে হয়। সেই ক্ষেত্রে পুলিশের মধ্যে দুর্নীতি দমনে স্বভাবতঃই অসুবিধা হবে। পুলিশ দুর্নীতিমুক্ত না হলে অপরাধীদের দমন

করা কঠিন কার্য। গভর্মেণ্টের অন্যান্য বহু বিভাগ সম্পর্কেও এই একই সত্য প্রযোজ্য। তজ্জন্য—জনমত গঠনে প্রচারকার্য সংবাদপত্র ও সভা প্রভৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে সহিংস বিক্ষোভাদি থেকে বিরত থাকা উচিৎ। পুলিশকে নিয়োগ করতে হতে পারে এমন কোনও কার্য দেশের মঙ্গলার্থে না করাই সমীচীন। অন্যথায় জন বিক্ষোভ দমনে সাধারণ পুলিশ নিয়োগ না করে তজ্জন্য পৃথক পুলিশ দল সৃষ্টি করা উচিৎ। এই বিষয়ে অহিংস আন্দোলনসমূহ সর্ব বিষয়ে মঙ্গলকর।]

তজ্জন্য মন্ত্রীগণের পক্ষে সার্ভিস সমূহে অযথা হস্তক্ষেপ করা উচিৎ হবে না। ব্যবস্থাপকসভা সমূহ আইন তৈরী করে কর্মকৃত্যকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও ক্ষমতা দিয়েছেন। ঐগুলি ঠিক মত প্রতিপালিত হচ্ছে কি'না এই টুকই মাত্র তাদের দেখা কর্তব্য। (f)

প্রতিষেধক রূপে এঁরা প্রতিটি পল্লীতে বাছা বাছা সন্দেহাতীত চরিত্রের চ্চ শিক্ষিত ও সম্মানি ব্যক্তিদের একটি করে সংস্থা তৈরি করে তাদের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা দিলে গভর্মেণ্টের পক্ষে তারা জনগণের মধ্যে সততা ও দক্ষতা আনতে সক্ষম হবেন। ভীত সন্ত্রস্ত নাগরিকরা এদের নিকট অকপটে তাদের অভিযোগ ও অসুবিধা জানাবে। এই ভাবে কর্মকৃত্যসমূহকে ওঁরা সৎ করতে সক্ষম হবেন। তবে—সব ক্ষেত্রে এদেরকে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় সরকারী কর্মকর্তার অধীনে রাখতে হবে। কারণ—প্যারালাল গভর্মেণ্ট কোনও কালেই উপকারে আসে না।

ভালো বা মন্দ পারস্পরিক তথা রিলেটিভ্ হয়ে থাকে। একসময়ে যে ভালো অন্য সময়ে সে মন্দ। একজনের পক্ষে যে ভালো অন্য জনের পক্ষে সে তা নয়। এক সময়ে সৎ নারী অন্য সময়ে অসতী। এ জন্য ব্যবসায়িক ভিত্তিতে [দূরদৃষ্টি সহ] মানুষকে গ্রহণ করতে হবে। এক স্থানের সৎ ব্যক্তি অন্য স্থানে অসৎ হয়। স্বদেশে যে যা করে নি বিদেশে সে তা করেছে।

[সময়ে বিবাহ না করা অন্য একটি অপরাধ। এরা দায়িত্ব গ্রহণে অক্ষম ও স্বভাব ভীরু হয়ে থাকে। বিবাহ মানুষের মধ্যে দায়িত্ব-বোধ ও কর্তব্য আনে ও উচ্ছৃঙ্খলতা বিদূরিত করে। উহা সর্বযুগেই অপরাধীর সংখ্যা কমানোর

(f) গণতন্ত্র মেজরটির স্বার্থে মাইনরিটির হ্যায্য স্বার্থ হরণ করে। তাই সংখ্যালঘু'দের বিপ্লবী কিংবা অপরাধী হতে দেখা যায়। তদুপরি ওঁরা জীবিত ব্যক্তিদের স্বার্থ দেখলেও ভবিষ্যত অনাগত বংশীয়দের স্বার্থ দেখে না।

অন্যতম সহায়ক। অবিবাহিতরা প্রায়ই নিউরেটিক কিংবা যৌনজ-রোগী এবং অপরাধ রোগী হয়। এজন্য—ক্ষমতাসীন ব্যক্তি ও রাজকর্মচামীদের অবিবাহিত থাকা সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক। পূর্বে তরুণ-তরুণীদের সময়ে বিবাহ দেওয়ায় অপরাধী কম ছিল। অবিবাহিত স্ত্রী পুরুষদের [চাকুরে নারী সহ] উপর বেশী ট্যাক্স ধার্য করা উচিৎ।

বিশালকায় রণতরী একদিন লৌহস্তূপে পরিণত হবে। কিন্তু একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকা তার বংশের ধারার মধ্যে অনন্তকাল বেঁচে থাকবে। অবিবাহিত তরুণ তরুণীদের ইহা উপলব্ধি করা উচিৎ।

চুরির মামলার এক তরুণ ফরিয়াদী আমাকে বলে ছিল 'আই ক্যান নট্ এফোর্ড এ' ওয়াইফ। বাড়িতে এরা ব্যাচিলার রূপে থাকায় এরূপ চুরি ওখানে হচ্ছে। আমি সমগ্র বৎসরে চুরি হওয়া ও হারানো দ্রব্যাদির একটা হিসাব তৈরী করে দেখাই যে ওতে সে দুজন ওয়াইফ মেনটেন করতে সক্ষম। গৃহিনীরাই একমাত্র ভৃত্যাদি কনট্রোল করতে সক্ষম হন। বিবাহ না করলে খরচ না কমে উহা বহু গুণে বাড়ে। অবিবাহিত'রা নানা ভাবে এক্সপ্লয়েটেড্ হয়ে থাকেন। যে হেতু উনি অবিবাহিত সেই হেতু তাঁকে অযথা অন্যের দায়িত্ব নিতে হয়।

তবে অহেতুক বংশ বৃদ্ধি ও জন বৃদ্ধি অপরাধী সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে। অপরাধীদের সংখ্যা কমাতে হলে জন সংখ্যা কমাতে হবে। অতগুলি পুত্র-কন্যাদের প্রতি সমভাবে লক্ষ্য রাখা সম্ভব নয়। উপরন্তু আর্থিক সমস্যা সকলকে উপযুক্ত শিক্ষা দীক্ষা দেওয়ার প্রতিবন্ধক হয়। পরিবার ভারাক্রান্ত ব্যক্তিদের দ্বারা কোনও জনহিতকর কার্য করা সম্ভব হয় না। খাদ্য সীমিত থাকাতে পূর্বে য়ুরোপীয় রাষ্ট্রগুলি অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের স্ব স্ব কলোনিয়াল দেশগুলিতে তাদের বাড়তি জনগণকে স্থানান্তরিত করে নিজেদের দেশগুলিকে অপরাধী মুক্ত রেখে ছিল। কিন্তু এ যুগে তা সম্ভব না হওয়ায় ওদের দেশগুলিতে জনসংখ্যা কমানোর তাগিদ এসেছে।

বহু সন্তানের জনক জনৈক বন্ধু আমাকে সখেদে বলেছিল : একটি পুত্রকে মনের মত করে মানুষ করে তুলবো। অন্যগুলির হাতে একটা ছুরি ও চার আনা পয়সা তুলে দিয়ে বলবো যে 'যা' লুটপাট করে খেগে যা। প্রকারান্তরে দেশে দেশে ও ঘরে ঘরে আমরা এই দৃশ্য দেখছি ও ভবিষ্যৎ চিন্তা করে মুহুমুহু ভীত ও অতিষ্ঠ হচ্ছি।

॥ অষ্টম অধ্যায় ॥

অপরাধ রোগী

নিরোগ-অপরাধীদের এবং তাদের বিভাগগুলি সম্বন্ধে পূর্ববর্তী প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান পরিচ্ছেদে কেবল মাত্র মন-রোগীদের সমগোত্রীয় অপরাধ-রোগীদের সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হবে। অপরাধ-রোগীরা দুই প্রকারের হয়ে থাকে, যথা সহজ এবং জটিল। এই উভয় প্রকার অপরাধ-রোগীদের সম্বন্ধে এই পরিচ্ছেদটিতে আলোচনা করা হবে।
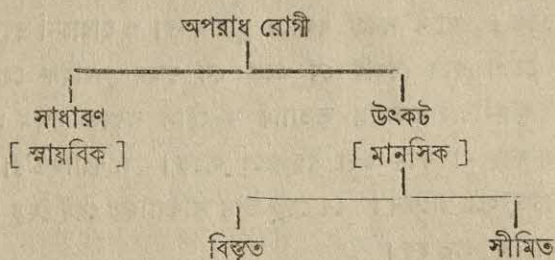
বিভিন্ন প্রকার বিকৃত যৌনস্পৃহা সম্বলিত মানুষের সহিত বিবিধ প্রকার অপরাধ-রোগীদের তুলনা করা চলে। মনোরোগীদের চিকিৎসায় যেমন রোগীদের সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তেমনি অপরাধরোগীদের চিকিৎসার জন্য উহাদের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। নীরোগ-অপরাধীরা নিজেদের নিরাময়ের জন্য কামনা করে না। কিন্তু ঐ অপরাধ-রোগীরা মনোরোগীদের মত নিজেদের নিরাময়ের জন্য উদগ্রীব থাকে। তজ্জন্য ওদের চিকিৎসায় ওদের সাহায্য প্রায়ই পাওয়া যায়। মনোরোগীদের মত অপরাধ-রোগীদেরও চিকিৎসার্থে তাদের রোগ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য ব্যক্ত করাতে হবে। অন্যথায় তাদের নিরাময় করা কঠিন হয়। ওদের ক্ষেত্রে তাদের বংশধারা ও বংশ-গত দৈহিক ও মানসিক রোগ এবং পরিবারাদি ও ঐ রোগীর এবং তার পিতা-মাতার অতীত জীবন সম্বন্ধেও তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। তাদের জীবনের প্রতিটি ঘটনা ও দুর্ঘটনা সম্বন্ধে তথ্যাদিরও এতে প্রয়োজন হয়।

অপরাধ-রোগীদের অপরাধ-রোগ সমূহের বহুবিধ কারণ আছে। নিরোগ-অপরাধীদের মত এদেরও চিকিৎসার্থে এদেরকে বিবিধ শ্রেণী ও উপশ্রেণীতে

বিভক্ত করতে হবে। এদেরও এক এক শ্রেণীর ও উপশ্রেণীর চিকিৎসা এক এক প্রকার হয়ে থাকে। এদের সম্বন্ধে আমি এই পরিচ্ছেদে বহুবিধ ঘটনাসম্ভূত উদাহরণ সহ আলোচনা করেছি।

[অপরাধ চিকিৎসা নিবন্ধে এদের সম্বন্ধে আমি আরও বিস্তৃতরূপে আলোচনা করবো। এই অপরাধ-রোগীরা বিবিধ কারণে এখন ক্রমবর্দ্ধমান। বর্তমান পৃথিবীতে এরা নিরোগ-অপরাধীদের অপেক্ষা বহুগুণে সমস্যা-সঙ্কুল হয়েছে।

অপরাধ-রোগীদের এই অপরাধ-রোগ স্নায়ুর সহিত প্রত্যক্ষরূপে সম্বোধিত থাকায় কয়েক ক্ষেত্রে উহা বংশানুক্রম দ্বারা [হেরিডিটি] বংশগতও হয়েছে। তবে অপত্যের মধ্যে উহা সুপ্ত থাকাতে বা তা না থাকাতে উহা ঐরূপে উপগত না'ও হতে পারে। অন্যদিকে, নীরোগ-অপরাধীদের অপস্পৃহা প্রতি ক্ষেত্রে বংশানুক্রম-জাত না হয়ে অধিকক্ষেত্রে উহা গোত্রানুক্রম-জাত [Atavastic] হয়েছে।

এই বংশানুক্রম তথা হেরিডিটি এবং গোত্রানুক্রমের তথা আটাভিসিমের মধ্যে পার্থক্য আছে। বংশানুক্রম দ্বারা মানুষের মধ্যে বংশ পরম্পরায় পুরুষানুক্রম গুণাগুণের ধারাবাহিকতা থেকেছে। গোত্রানুক্রমে পূর্বতন কোনও পুরুষের কোন সুপ্ত থাকা গুণাগুণ পরবর্তী কোনও এক পুরুষে আকস্মিকভাবে জাগ্রত হয়েছে।

অপরাধ-রোগীকে ইংরেজীতে অ্যাবনরম্যাল ক্রিমিন্যাল বলা হয়। এদের বিবিধ প্রকার উৎপত্তির কারণানুযায়ী এরা বহু শ্রেণী ও উপ-শ্রেণীতে বিভক্ত। এই প্রকার অপরাধীদের একটি বিষয়ে রোগী মনে হলেও অন্যান্য বহু বিষয়ে এরা সাধারণ মানুষ। কোনও অবস্থায় এদের মধ্যে শেষ অবস্থার নীরোগ অপরাধীদের [প্রকৃত অপরাধী] মত ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন দেখা যায় না। এই জন্য কোনও অবস্থায় এদের কারুর মধ্যে আদি মানুষের মত স্বভাব-চরিত্র দেখা যায় না। অন্যান্য বহু বিষয়ে এদের স্বভাব-চরিত্র প্রায় সাধারণ নিরাপরাধ মানুষের মত হয়ে থাকে। এদের অপরাধ সকল ক্ষেত্রে পূর্বকল্পিত হয় না এবং এরা নিজেদের কোন স্বার্থের জন্য অপরাধ করে না। এরা নীরোগ অপ-রাধীদের মত প্রাথমিক ও প্রকৃত অপরাধীতে বিভক্ত নয়। বাহ্যতঃ এদের স্বভাব-চরিত্র বহু বিষয়ে প্রথমাবস্থার নীরোগ অপরাধীদের [প্রাথমিক-অপরাধী]

সঙ্গে তুলনা করা চলে। এই উভয় প্রকার অপরাধী সমাজে নিরপরাধ মানুষের সঙ্গে একত্রে বাস করে। এজন্য এদের পার্থক্য সাধারণ মানুষের বোধগম্য হয় না।

সৎপরিবেশে মানুষ হওয়া সুসভ্য ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে অপরাধ-রোগী যথেষ্ট সংখ্যায় দেখা যায়। এদের কারুর কারুর মধ্যে একটি দুর্দমনীয় অপস্পৃহা আসে এবং মনোনীত অপরাধ না করা পর্যন্ত এরা অস্বস্তি অনুভব করে। এরা মাত্র ওদের মধ্যে আগত অপস্পৃহার উপশমের জন্য অপরাধ করে। এরা কোনও ব্যক্তিগত লাভের জন্য অপরাধ করে না।

ক্লিপটো ম্যানিয়াক প্রভৃতি মানুষ এই ধরনের রোগী অপরাধী হয়। বৃদ্ধিরুকার এবং ক্ষয়ক্ষতি প্রভৃতি কারণে এদের প্রতিরোধ সম্পর্কিত সূক্ষ্মস্নায়ু সরাসরি [প্রত্যক্ষ কারণে] ক্ষতিগ্রস্থ হয়। অধিক ক্ষেত্রে ইহা হঠাৎ এবং সাময়িক ভাবে ঘটে থাকে। নীরোগ অপরাধীদের মত কুচিন্তা জনিত অনুপকারী হরমন ক্ষরণ কিংবা স্থূল বা সূক্ষ্ম বৃত্তির অতি ব্যবহার বা অব্যবহার দ্বারা পরোক্ষভাবে এদের ঐ সূক্ষ্মস্নায়ু ধীরে ধীরে ক্ষতিগ্রস্থ হয় না।

উত্তেজনা, ক্রোধ এবং উন্মাদনা প্রভৃতি তড়িৎ গতিতে—অতি গভীর ভাবে নিমিষে এদের ঐ প্রতিরোধ সম্পর্কিত সূক্ষ্মস্নায়ু ক্ষতিগ্রস্থ করে দেয়। এই ক্ষেত্রে অপস্পৃহা চালক-বিহীন রকেটের মত উৎক্ষিপ্ত হয়ে মুহূর্তে অভাবনীয় ভাবে এদের অপরাধী করে। উত্তেজনার সময় এরা অস্বাভাবিক হয়ে উঠলেও উহার অবসানের পর বহু অপরাধ-রোগী আবার স্বাভাবিক মানুষ হয়। শেষ অবস্থায় নীরোগ অপরাধী [প্রকৃত অপরাধী] সৃষ্ট হতে সময় লাগে। কিন্তু অপরাধ-রোগী একদিনে, কিংবা এক মুহূর্তে প্রত্যক্ষ কারণে সৃষ্ট হতে পারে।

[ক্লিপটো ম্যানিয়াক অপরাধীদের মত নিমপো ম্যানীয়াক অপরাধ-রোগীও আছে। এরা একটি দুঃসহ যৌন তাড়নাতে সদা অস্থির হয়। আশ্চর্য এই যে, এই রোগের পুরুষরা কম সংখ্যায় এবং নারীরা বেশী সংখ্যায় ভোগে।]

ক্রোধ মানুষকে উন্মাদ করে এবং অপরাধের সহায়ক হয়। বিতৃষ্ণা ও ক্রোধ একত্র হলে উন্মাদনার সৃষ্টি করে। এবং এইরূপ মানসিক অবস্থায় মানুষ সহজেই অপরাধমূলক কার্য করে। মুচিখোলা অঞ্চলের চাঞ্চল্যকর মাতৃহত্যা এরূপ মনোবিকারের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সতের বৎসর বয়স্ক পুত্রের দ্বারা এই হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়। হত্যাকারী ছিল নিহত নারীর (৪৫) একমাত্র পুত্র। ধরা পড়ার পর আসামী পুলিশ ও হাকিমের কাছে নিম্নোক্তরূপ বিবৃতি দেয়।

"মাত্র সাতদিন পূর্বে আমি থাকতাম জোড়াসাঁকো অঞ্চলে মামার বাড়িতে। মা ছিল আমার ভারি ঝগড়াটে ও বদরাগী। কারুর সঙ্গে তার বনিবনা হত না। ঝগড়াঝাটি হওয়ায় মাত্র সাতদিন পূর্বে মাকে ও ছোট বোনটিকে (৫) নিয়ে আমি খিদিরপুরে আসি। বাড়িটাতে অপরাপর ভাড়াটিয়ারাও থাকত। সেদিন কর্মক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত দেহে বাড়ি ফিরি। সন্ধ্যা তখন সাতটা। হঠাৎ অকারণে মা আমাকে গাল দেয়। আমার মন আগের থেকেই বিষিয়ে ছিল। প্রতিদিনই মা'র উপর আসতো আমার রাগ ও বিতৃষ্ণা। দিনের পর দিন এই বিতৃষ্ণা ও ক্রোধ আমার মনে পুঞ্জীভূত হয়েছে বারুদের স্তূপের মত। একদিনের ক্রোধ হয়তো আমি দমন করতাম, কিন্তু বহুদিনের সঞ্চিত ক্রোধ দমনে আমি অক্ষম হই। আমার মনে গত কয়েক মাসের ক্রোধ ও বিতৃষ্ণা একসঙ্গে উপগত হওয়ায় আমি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠি। আমার মাথার মধ্যে এই সময় আগুন ঠিক্‌রাতে থাকে। আমার মনে হয়, 'এই আমার মা, যার জন্যে এত কষ্ট, এত লাঞ্ছনা!' আমি ঘর ছেড়ে রাস্তায় বের হই মুক্ত বায়ুর সন্ধানে। এর কিছুক্ষণ পরে ঘরে ফিরে দেখি মা ঘুমুচ্ছে। মা'র সেদিন জ্বর হয়েছিল, শরীর ছিল দুর্বল। আমার কিন্তু সে কথা মনেই এল না। মাকে দেখে শরীরে সমস্ত রক্ত আমার মাথায় উঠে গেল। জানলার উপর ছিল একটা ধারালো দা। সেটা তুলে নিয়ে বসিয়ে দিলাম মা'র গলায়। রাত তখন নটা হবে। ফিন্‌কি দিয়ে বেরুল রক্ত। মা'র মুখটা ধীরে ধীরে ভীষণাকৃতি ধারণ করল। তারপর ধীরে ধীরে তার চোখ দুটি এল বুজে। মা'র মূর্তি ধীরে ধীরে হ'ল শান্ত। আমি দেখলাম, মুখে তার অভয়ের বাণী। ততক্ষণে আমার জ্ঞান ফিরে এসেছে। ক্ষোভে, ভয়ে ও দুশ্চিন্তায় আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। তাড়াতাড়ি ঘরের সব কয়টা জানালা ও দরজা বন্ধ করলাম। আলোটা স্তিমিত ক'রে দিয়ে ভয়ে আমি কাঁপছিলাম। হঠাৎ শুনলাম মা বলছে,—'ভয় কি বাবা! যা হবার তা ত হয়ে গেছে। আমি ত বাবা, আর ফিরব না। ভাবিস্‌নে আর। ওঠ বাঁচবার চেষ্টা কর। লাসটা সরিয়ে দে। তুই আমার একমাত্র পোলা। তোকে যে করে হোক বাঁচতেই হবে।'

মুখে-চোখে মা'র অসীম স্নেহ! আমার জন্য তার উৎকণ্ঠা! হঠাৎ জানলায় আওয়াজ হল—টক্‌ টক্‌। শুনতে পেলাম জনৈকা প্রতিবেশিনীর গলা। সেই প্রতিবেশিনী জিজ্ঞেস করছিলেন, 'কিরে খোকা! তোর মা আছে কেমন?' প্রতিবেশিনীর কণ্ঠস্বর কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি পুনরায় বাস্তবতার মধ্যে ফিরে এলাম। আবার শুরু হ'ল আমার কাঁপুনি। অতি কষ্টে

উত্তর দিলাম, 'ভাল নয়। মার এখন জ্বর বেড়েছে। কাল যা হয় করব।' আবার শুনতে পেলাম মা'র অভয় বাণী—'ওরে! ভয় পাস্‌নি। আমি তোর কাছেই আছি। কিছু হবে না তোর।' সমস্ত রাত বসে রইলাম অন্ধকার ঘরে। ভোর বেলায় ঘুমন্ত বোনটাকে তুলে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। বাইরে থেকে দরজায় দিলাম তালা। সকলের অজ্ঞাতে বোনকে রেখে এলাম মামার বাড়িতে। ফিরে আসতেই প্রতিবেশিনী জিজ্ঞেস করলেন, 'তোর মা কোথায় রে?' উত্তরে আমি জানালাম, 'ভোরের দিকে ভয়ানক জ্বর বাড়ে। আপনাদের আর বিরক্ত করিনি; ট্যাক্সি ডেকে হাসপাতালে দিয়েছি। তাঁর অবস্থা খুব খারাপ।' ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলাম। শুকনা কাপড় ও চাদর দিয়ে মেঝের রক্তটুকু মুছে ফেলে সেগুলা আলমারিতে রাখলাম। তারপর মৃতদেহটা বিছানার মধ্যে জড়িয়ে রেখে আমি বায়স্কোপ দেখে এলাম। ফেরার পথে কিন্‌লাম দুটি থলে। থলে নিয়ে যখন বাড়ি ফিরলাম, সন্ধ্যা তখন প্রায় সাতটা বেজেছে। কিন্তু মুস্কিল হল এই লাস পাচার করার। বেরিয়ে গিয়ে এক অন্তরঙ্গ বন্ধুকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ডেকে আনলাম। কিন্তু ঐ বন্ধু ভিতরের ব্যাপার দেখে ভয় পেয়ে এক দৌড়ে পালিয়ে গেল। এদিকে এই নিদারুণ অবস্থায় আমি তখন মরিয়া হয়ে গিয়েছি। অগত্যা আমি একাই দরজা বন্ধ ক'রে মৃত দেহটার কোমরে কাটারি বসিয়ে দেহটাকে দু-আধখানা করলাম। এবং দেহের দুটি অংশ পুরে দিলাম দুটি থলেতে। তারপর উপরের অংশটি মাথায় নিয়ে রাত্রির অন্ধকারে বেরিয়ে পড়লাম। থলে-সুদ্ধ দেহটা দিলাম ছুড়ে ফেলে গঙ্গার জলে। নিম্নের অংশটি নিয়ে যাবার সময় প্রতিবেশিনী তা দেখে ফেল্‌লেন। পথ আগলে মহিলাটি আমাকে জিজ্ঞেসা করলেন, 'কি নিয়ে যাচ্ছিস রে? বেয়াড়া গন্ধ বেরুচ্ছে যে!' উত্তরে আমি তাঁকে বললাম, 'ও কিছু নয়, ওটা পচা ময়দা।' পরদিন মামার বাড়িতে এসে জানালাম, 'গাড়ি চাপা পড়ে মা মারা গেছেন। হিন্দু-সৎকার সমিতির গাড়িতে ক'রে মাকে শ্মশানে নিয়ে গিয়েছিলাম। এইমাত্র দাহকার্য শেষ ক'রে সেখান হতে ফিরে এলাম।'

শ্রাদ্ধ কার্যাদির পরে ইচ্ছা ছিল কাশী গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করব। কিন্তু তার আর আমি সুযোগ পেলাম কৈ? তার আগেই আমি গঙ্গার ঘাটে শ্রাদ্ধ করার সময় গ্রেপ্তার হই। ফাঁসিই আমার একমাত্র শাস্তি। আমি দোষ কবুল করব। শীঘ্রই এর বন্দোবস্ত করুন। আমি এবার মা'র কাছে যাবো। বাঁচতে আমার সাধ নেই। মা আমায় ডাকছে।"

এই হত্যাকারীকে প্রকৃত অপরাধী বলা যায় না। সাময়িক উন্মাদনাই এই হত্যার জন্য দায়ী। সহজ অবস্থায় এরূপ হত্যা সে কখনই করতো না। প্রকৃত অপরাধীরা অপরাধের পর কখনও অনুতপ্ত হয় না। তারা তাদের অপকার্যের জন্য প্রায়ই গর্ব অনুভব করে। অনুসন্ধানে জানা যায় যে, হত্যাকারী তার মা'কে যত্ন-আত্তিই করত। তদন্তে আরও প্রকাশ পায়, হত্যাকারীর পিতা ছিল উন্মাদ। পিতার উন্মাদ অবস্থাতেই সে জন্মগ্রহণ করে। এই কারণেই সাময়িক উন্মাদনা ছেলেটির মধ্যে স্থান পেয়েছে। এই সম্বন্ধে তদন্তকারী অফিসারের বিবৃতিটুকু প্রণিধানযোগ্য।

"রাত্রি দেড় ঘটিকায় খেয়াল মত হত্যাকারীকে অফিসে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলাম। কথায় কথায় তাকে জিজ্ঞাসা করি,—'রাতভর মৃতদেহটাকে নিয়ে তুই বসে রইলি। তাতে তোর ভয় করছিল না?' আমার প্রশ্নে ছেলেটার মুখটা ক্যাকাসে হয়ে উঠল। ঠক্ ঠক্ ক'রে পা দু'টা তার কাঁপছিল। হঠাৎ সে চেঁচিয়ে উঠল,—'বাবু বাবু! ও'কি! কি দেখছি আমি?' ছেলেটির অবস্থা দেখে আমিও ভয় পেয়েছিলাম। তাকে হাজতে পুরে তাড়াতাড়ি উপরে উঠে গেলাম। কিন্তু সেই রাত্রে আমি ঘুমতে পারলাম না।"

পেশাদার বা প্রকৃত হত্যাকারীদের ভয়ের বালাই নেই। ছেলেটিকে কোনও ক্রমেই প্রকৃত অপরাধীর পর্যায়ে ফেলা যায় না। কিন্তু তবুও তাকে বিচারের জন্য আমাদের চালান দিতে হয়। আমি তখন মনকে এই বলে প্রবোধ দিই,—আইনের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র অপরাধীকে শাস্তি দেওয়াই নয়; শাস্তির দৃষ্টান্ত দ্বারা জনসাধারণকে অনুরূপ অপকার্য হতে বিরত করাও হচ্ছে আইনের অপর উদ্দেশ্য। বৃহত্তর অবিচার রোধ করার জন্য ক্ষুদ্রতর অবিচারে দোষ নেই। পৃথিবীতে বহুর মঙ্গলের জন্যে একের ক্ষতি কোনও ক্ষতিই নয়।

এইখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য এই যে, আসামী পুলিশের নিকট এবং নিম্ন আদালতে খুনীরূপে নিজেকে স্বীকার করলেও ছয়মাস পরে দায়রা কোর্টে সে নিজেকে নিরপরাধ ব'লে জবানী দেয়। এই কয়েক মাস আমি তার হাবভাব বিশেষ রূপে লক্ষ্য করছিলাম। আমি এই সময় বুঝতে পারি যে, বিচারবুদ্ধি সম্পর্কিত যে সূক্ষ্মস্নায়ুকে তার উন্মাদনা এত দিন পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত করে রেখেছিল তা এতদিন পরে পুনর্গঠিত হওয়ায় তার স্বাভাবিক সত্তা বুদ্ধি-

বিবেচনা সহ ধীরে ধীরে ফিরে এসেছে। এই কারণেই নিরাময় হবার পর সে আর কোনও প্রাণঘাতী স্বীকারোক্তি করে নি। (f)

মানুষের মন স্বভাবতঃই অপরাধ-প্রবণ। সভ্যতা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি দ্বারা মানুষ তার এই অপরাধ-স্পৃহা প্রতিরোধ করে। কিন্তু স্নায়বিক রোগ অনেক সময় এই প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। পৈত্রিক উন্মাদনার ন্যায় আরও বহুবিধ অবস্থা মানুষের এই স্বাভাবিক প্রতিরোধ-শক্তির বিনাশ ঘটায়। এই প্রতিরোধ শক্তি বা পাওয়ার অব্ রেজিস্‌টেন্স সম্বন্ধে পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি। উন্মাদনার ন্যায় কর্মালসতা ও অতিরিক্ত মদ্যপানাদির দ্বারাও এই রোগ জন্মে। অতিরিক্ত মদ্যপান মস্তিষ্কের নীতি-স্থানে বিকার আনে। মাদকতা পুরুষানুক্রমে হ'লে এইরূপ বিকার সহজেই ঘটে থাকে। প্রতিরোধ-শক্তির অভাবে মানুষ অপরাধমুখী হয়। কর্মালসতা এই রোগের অপর কারণ। "আন্‌ওয়ার্কড্ ব্রেন ইজ ডেভিলস্ ওয়ার্কশপ।" এই কথাটা খুবই সত্য। কর্মালস ধনীদের মধ্যে যেমন এই রোগের প্রাদুর্ভাব আছে, তেমনি কর্মালস গরীবদেরও মধ্যে এই রোগ বহুল ভাবে বর্তায়। কর্মালসতা ও মাদকতা মানুষের মধ্যে নৈতিক অসাড়তা আনে। শুধু তাই নয়। তাদের মধ্যে উহা অপরাধ-প্রতিরোধ ক্ষমতারও অভাব ঘটায়। জেলে কয়েদীদের কাজ করতে বাধ্য করা হয়। হয়তো সেই কারণে কয়েদখানায় চুরি আদি কম হয়। জন্ম-নির্বোধ ব্যক্তিদের মধ্যে এই কর্মালসতা বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়। স্নায়বিক অসুস্থতার জন্যই এরূপ ঘটে থাকে। ফলে তাদের প্রতিরোধ-শক্তির হ্রাস ঘটে। জন্ম-নির্বোধরা জন্ম থেকে অলস, নিশ্চেষ্ট কিংবা বাক্-প্রয়োগশীল হয়। এইজন্য একমাত্র দায়ী তাদের ভাগ্য। প্রতিভাবান, উন্মাদ ও অপরাধী—এই তিন জনেই মনোজগতের অসাধারণ অবস্থার সন্ততি। ভাগ্যক্রমে কেউ হয়েছে প্রতিভাবান, কেউ বা হয়েছে উন্মাদ বা অপরাধী। এই কারণে কাউকেই ঘৃণা করা উচিত নয়। অপরাধীদের সঙ্গে বন্দীকৃত হিংস্র জন্তুর মত ব্যবহার না করে অপরাধের প্রকৃত কারণ, অপরাধীদের মানসিক অবস্থা ও তার পরিবারবর্গ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা উচিত।

শিশুরাও বুঝে যে উন্মাদ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের দ্বারা সঙ্ঘটিত কোনও অপরাধ অপরাধ নয়। কিন্তু এমন অনেক উন্মাদ আছে যাদের বাহ্যতঃ উন্মাদ-রূপে বুঝা যায় না, বরং তাদের অত্যধিক স্বাভাবিক মানুষ বলেই মনে হয়।

(f) উপরোক্ত ঘটনাটি একটি সাধারণ তথা সহজ অপরাধ-রোগীর দৃষ্টান্ত।

কিন্তু আসলে ঐ সকল ব্যক্তি থাকে উন্মাদ। এই ধরনের উন্মাদদের দ্বারা কৃত কোনও অপরাধকেও অপরাধ বলা উচিত নয়। আমি একজন বিশেষ ভদ্র-মহিলাকে জানি যিনি তাঁর স্বামী তাঁর গৃহে উপস্থিত না থাকলে স্বভাবতঃ একজন স্বাভাবিক মানুষ বলেই বিবেচিত হন। কিন্তু স্বামীকে দেখামাত্রই তিনি একান্তভাবে অস্বাভাবিক হয়ে পড়েন। কারণে ও অকারণে তখন তিনি শুধু স্বামীর উপর যে অত্যাচার করেন তা নয়, পাড়াপড়শীদের উপরেও তিনি অহেতুক অপরাধমূলক অত্যাচার শুরু করেন। পুলিশ থেকে এই ভদ্র মহিলাকে পাগলা হাসপাতালে পাঠান হয়। কিন্তু পাগলা হাসপাতালে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি স্বাভাবিক হয়ে উঠেন এবং ছাড়া পান। বাড়ি ফেরার পরও তাঁকে স্বাভাবিক দেখা যায়। কিন্তু অফিস থেকে তাঁর স্বামীর প্রত্যাবর্তনের সংবাদ কানে যাওয়া মাত্র তিনি পুনরায় পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হন। বস্তুতঃ এগুলি একপ্রকার মানসিক রোগ। কিন্তু পুরাপুরি উন্মাদ না হ'লে মানসিক রোগকে আমরা রোগ বলে স্বীকার করি না। এইজন্য আমরা অবিচারও করি অনেক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করা যাক। বহুদিন পূর্বে বড়বাজার অঞ্চলে জনৈক মাড়োয়ারী তার শিশুপুত্রকে দ্বিতলের জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দেয়। তদন্তের সময় সে নিম্নোক্তরূপ একটি স্বীকারোক্তি করে। তার এই স্বীকারোক্তিটি এই বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য।

"কোনও একটা ঘটনার পর আমার একটা উৎকট-মানসিক রোগ জন্মে। অদ্ভুত অদ্ভুত দুর্দমনীয় ইচ্ছা আমাকে পেয়ে বসে। আমি কিছুতেই নিজেকে ঠিক রাখতে পারি না। এই অভাবনীয় রোগের কথা আমি কাউকে বলি না। বললে হয়তো কেউ বিশ্বাস করত না। তাছাড়া কাউকে বলতেও আমার লজ্জা হ'ত। একদিন আমার ইচ্ছা হ'ল আমি দ্বিতল থেকে লাফিয়ে পড়ি। কিছুতেই নিজেকে সংযত করতে না পেরে শেষে ভিতর থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে চাবিটা বাইরে ফেলে দিই। এর সঙ্গে সঙ্গে আমার এই দুর্দমনীয় ইচ্ছারও উপশম ঘটে। পরের দিন আমার ইচ্ছে হয় যে, আমার পুত্রটিকে উপর থেকে ফেলে দিই। প্রাণপণে মনকে বাধ্য করবার চেষ্টা করি। কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে এই ইচ্ছা আমি দমন করতে পারি না। নাচার হয়ে চাকরকে ডাকি, কিন্তু কেউ আসে না। অবশেষে আমি ছেলেটিকে উপর থেকে ফেলে দিই। ফেলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু আমার চেতনা আসে। আমি তখুনি ছুটে গিয়ে ছেলেটিকে আমার বুকে তুলে নিই।"

মধ্য কলিকাতার চাঞ্চল্যকর শিশু-হত্যা এই জাতীয় অপরাধের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আদালতে মামলাটির বিচার হয়। ঘটনাটির বিবরণ ছিল এইরূপ। ১৯৩৯ সালের এক শীতের রাত্রে একজন গুজরাটি যুবক থানায় এসে এজাহার দেয় যে, সে তার মনিবের শিশুপুত্রকে খুন করেছে। আমাদের সম্মুখে সে এরূপ এক স্বীকারোক্তি করে বটে! কিন্তু তার পরিধেয় বস্ত্রাদিতে কোনও রূপ রক্তের দাগ দেখা হায় না। তার নখের নিম্নদেশ পরীক্ষা করেও আমরা কোনও রক্তকণা পাইনি। আসামী ছিল বহুবাজারের কোনও ভাটিয়া ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার। ডাক্তারকে খবর দেওয়া হয়। ডাক্তার আসামীকে সনাক্ত করেন এবং বলেন যে আসামী তাঁর শিশুপুত্রকে ঠাকুর দেখাবার অছিলায় বেলা তিনটায় বাইরে নিয়ে যায়। ডাক্তার তাদের জন্য অনেক খোঁজাখুঁজি করেন এবং থানায় এই সম্বন্ধে একটি ডায়রিও লিখিয়ে যান। আসামী যে তাঁর শিশুপুত্রকে খুন করেছে সেকথা ডাক্তার কিছুতেই বিশ্বাস করেন না। তাঁর মতে শিশুটি আসামীর খুব প্রিয় ছিল এবং আসামী নিজে ছিল বাড়ির সকলের খুব প্রিয়পাত্র।

আসামী পুলিশ অফিসারদের বারাকপুরের এক মাঠে নিয়ে যায়। ঘটনাস্থলে পুলিশ মাটির উপর খানিকটা রক্ত দেখে। কিছুদূরে কথিত শিশুটির রক্তমাখা পরিধেয় বস্ত্রাদিও আবিষ্কার করে। কিন্তু শিশুটির দেহটির কোনও সন্ধান তারা পায় না। শিশুর জামাটার বোতাম গুলো লাগান ছিল। ফ্রকটির অবস্থাও ছিল অনুরূপ। বোতাম পরা অবস্থায় ঐ জামা থেকে দেহটি বার করে নেওয়া সম্ভব ছিল না। বহুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করার পর আসামী বলে যে ফরিয়াদীর তথা ঐ ডাক্তারের সহিত তার অবৈধ সম্বন্ধ ছিল; তার এই দুরবস্থার জন্য ফরিয়াদী দায়ী, অথচ পূর্বের ন্যায় তার প্রতি সে আর আগ্রহশীল নয়। এইজন্য তার এক ভগ্নীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে সে ডাক্তারের উপর এইরূপ প্রতিশোধ নিয়েছে। পরে কিন্তু আসামী বলে যে, তার এই পূর্ব বিবরণ মিথ্যা; পরে সে নিম্নলিখিতরূপ এক নতুন বিবৃতিও দেয়।

"আমার বাপ-মায়ের আমি অবৈধ সন্তান। পিতা ছিলেন একজন সরকারী অফিসার; মা ছিলেন একজন হিন্দুনারী। মৃত্যুর সময় তিনি আমাকে তাঁর এক মুসলমান বান্ধবীর কাছে গচ্ছিত রাখেন। পালিকা মাতাকেই আমি মা বলে জানতাম। বড় হওয়ার পর বাড়ির সকলে তাদের এক মুসলমান আত্মীয়ের সঙ্গে আমার সাদি দিতে চান। কিন্তু মা আমার এই বিবাহে মত দেন না।

তিনি তখন আমার জন্মবৃত্তান্ত প্রকাশ করেন এবং আমাকে জানান যে আমি একজন হিন্দু। তিনি বলেন যে, তাঁর প্রিয়বান্ধবী আমাকে তাঁর কাছে গচ্ছিত রেখে গেছেন। তাঁর স্বর্গীয়া বান্ধবীর অবমাননা তিনি কিছুতেই সহ্য করবেন না। আমাকে তখন আমার সত্যকার পিতার নিকট পাঠান হয়। পিতা অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি আমাকে তাঁর বাড়িতে স্থান দেন না। তিনি আমাকে একটি বোর্ডিংয়ে রাখেন। সেখানে থেকে আমি পড়াশুনা করি। সেখানে খরচার অধিকাংশই কিন্তু আমার পালিকা মাকেই বহন করতে হয়।

নিহত শিশুটির মা ছিল তখন অবিবাহিতা বালিকা। বোর্ডিংয়ের পরের বাড়িটাতেই সে থাকত। আমাদের মধ্যে এক অকৃত্রিম বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। কিছুদিন পরে লছমীর বিয়ে হয়। লছমী [শিশুটির মাতা] শ্বশুর-বাড়ি চলে যায়। তারপর অনেকদিন তাকে দেখিনি। দু'মাস আগে ট্রেনে তার সঙ্গে দেখা হয়। তারই ইচ্ছায় ও উপদেশে তার স্বামীর কাছে চাকরি নিই।

প্রথম প্রথম লছমী আমাকে খুবই যত্ন করত। কিন্তু সম্প্রতি তার ব্যবহারে আমি বিশেষ ব্যথিত হই। আমার মনে প্রতিশোধ-স্পৃহা জাগে। ছেলেটিকে নিয়ে প্রথমে আমি যাই কাঁচড়াপাড়ায়। সেখানকার একটা দোকান থেকে আমি ছুরি কিনি। তারপর শ্যামনগরে এসে ছেলেটিকে দুধ খাওয়াই। ছেলেটা ক্ষিদেতে কাঁদছিল। সন্ধ্যার পর ছেলেটিকে ব্যারাকপুরের একটা মাঠে আনি। ছেলেটিকে আমি ভালবাসতাম। পিছন ফিরে ছুরিটা ছেলেটির গলদেশে শ্বাস-নালীর মধ্যে সজোরে বসিয়ে দিই। তারপর সেদিকে না তাকিয়ে তার দেহটাকে সেইখানে রেখে আমি চলে আসি। দেহটা কোথায় গেল তা আমি জানি না।"

ফরিয়াদি এবং বাটীর অপরাপর সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে জানা যায় যে, ফরিয়াদির স্ত্রী আসামীকে পূর্বে কখনও দেখেনি। দুই মাস-আগে লছমী তার বাপের দেশ থেকে কোলকাতায় ফেরে। তার দুদিন পরেই আসামী ডাক্তারের কাছে এসে চাকরি নেয়। ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার ছিল তখন একজন বাঙ্গালী। স্বদেশপ্রীতি বশতঃ ঘরিয়া ভাই রূপে ডাক্তার তাকে কার্যে বহাল করেন। দু'দিন পূর্বে লছমীর নাম অঙ্কিত [মিসেস অমুক] কয়েকটি জার্মান সিলভারের বাসন, লছমীর বাক্সে আসামী চুপি চুপি রেখে যায়। লছমী তার এই কাজ দূর থেকে দেখে ও স্বামীকে ঐ ব্যাপার জানায়। আসামীর এই বিসদৃশ ব্যবহারে বাটীর

সকলে আশ্চর্য হয়ে আসামীকে অনুযোগ করেন। কিন্তু এ'জন্য তাকে কেউ ভর্ৎসনা বা অপমান করে নি।

আসামী পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে কাঁচড়াপাড়ার যে দোকান থেকে সে ছুরি কিনেছিল সেই দোকান এবং শ্যামনগরের যে দোকানে শিশুকে সে দুধ খাইয়েছিল সেই দোকানটি দেখিয়ে দেয়। যে ট্যাক্সি এবং রিক্সাতে চড়ে আসামী কিছুটা দূর গিয়েছিল, সেই রিক্সাওয়ালা ও ট্যাক্সিচালককেও পুলিশ খুঁজে বার করে। এমন কি একজন কুলিকেও পাওয়া যায়, যে আসামীকে ব্যারাকপুরের টিকিট কিনতে সাহায্য করেছিল। সব কয়টি সাক্ষীই শিশুর ফটো থেকে শিশুটিকে সনাক্ত করে আসামীর উপরোক্ত বিবরণ সমর্থন করে। কিন্তু বহু চেষ্টার পর পুলিশ শিশুটির মৃতদেহের কোনও সন্ধান পায় না। আশপাশের পুকুরগুলিতে পুলিশ জাল ফেলে এবং গঙ্গার ধারেও অনেক খোঁজা-খুঁজি করে। কিন্তু তারা লাসের কোনও সন্ধান পায় না। বহু চেষ্টার পর কিছু দূরে তারা একটা ছোট কাঁচা মাথা পায় বটে! কিন্তু ডাক্তারী পরীক্ষায় সেটা একটা ১০ বছরের ছেলের মাথা বলে প্রমাণিত হয়। অপহৃত শিশুটির বয়স ছিল মাত্র দু'বৎসর। তার মা'র বয়স ছিল তখন মাত্র আঠার। ওদিকে রক্ত-পরীক্ষকের রিপোর্ট হতে জানা যায়, শিশুটির পরিধেয় বস্ত্রাদিতে মনুষ্যরক্তের সঙ্গে কিছু ছাগ-রক্তও আছে। এ সম্বন্ধে আসামীকে অনেক পীড়াপীড়ি করা হয়। কৈফিয়ৎ স্বরূপ অসামী বলে যে, ছেলেটিকে সে মাদ্রাজে তার বোনের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে এবং দশ মাস পরে সে তাকে ফিরিয়ে দেবে। সে স্বীকার করে যে, সে তার নিজের রক্তের সঙ্গে কিছু ছাগ-রক্ত মিশিয়ে ঐ শিশুর বস্ত্রাদিতে মাখিয়ে দিয়েছে। এদিকে ব্লাড্ গ্রুপিং পরীক্ষান্তে জানা যায় যে ঐ বস্ত্রের উপর প্রাপ্ত মনুষ্য রক্ত এবং ঐ আসামীর দেহের রক্ত একই গ্রুপের রক্ত। অনেক উপরোধ-অনুরোধের পর আসামী গুজরাটি ভাষায় নিম্নলিখিত রূপ একটা চিঠি লিখে পুলিশের হাতে দেয়।

"প্রিয় বহিন! আমি ছেলেটির পিতামাতার কাতর ক্রন্দন ও পুলিশের সনির্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করতে অক্ষম। এদিকে আমার জীবনও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। ক'রাত্রি আমার ঘুম নেই, চিন্তা ও অবসাদে আমি কাতর। আমাদের প্রতিশোধ-স্পৃহা আপাততঃ মুলতুবি থাক। আশা করি খোকা তোমার কাছে ভালই আছে। অফুরন্ত জীবন আমাদের পড়ে রয়েছে। সময় ও সুবিধার অভাব হবে না। আমার মুখ চেয়ে পুলিশের হাতে ছেলেটিকে

তুলে দিও। ভয় নেই। তোমার বা আমার ওতে কোনও ক্ষতি হবে না। তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে। ডিম্বের বর্ণ থেকে যেমন পক্ষীকে চেনা যায়, আশা করি তেমনি আমার চিঠির ভাষা থেকে চিঠির-প্রকৃত স্বরূপ তুমি বুঝতে পারবে। হাঁ, আমি ভালই আছি। ইতি—"

অবশেষে অনেক খোঁজাখুঁজির পর পুলিশ গুজরাটের কোনও এক পল্লীতে আসামীর নিজ বাড়ি খুঁজে বার করে। ছোট একটা খোড়ো বাড়ি। আসামীর এক অন্ধপ্রায় বৃদ্ধা মাতা মাত্র সেখানে বাস করে। পড়শীদের দয়ার উপর নির্ভর করে সে বেঁচে আছে। ক্বচিৎ কখনও আসামী তাকে সামান্য মাত্র সাহায্য পাঠায়। আসামীর এক সম্পর্কীয় ভগ্নী আছে বটে! কিন্তু সে থাকে তার স্বামীর সঙ্গে সিংহলে। তদন্তে প্রকাশ পায়, আসামীর যাবতীয় কাহিনী কল্পিত। বৃদ্ধার বাক্সপত্র তল্লাস করে পুলিশ আসামীর লেখা খানকতক চিঠি উদ্ধার করে। দুখানা চিঠির বাংলা তর্জমা নিম্নে দেওয়া গেল।

"মা, ভাল আছ ত? শুনলে সুখী হবে আমি বিয়ে করেছি। খুব ভাল বউ হয়েছে মা। খুব সুন্দরী, সত্যি বলছি। সে প্রায়ই তোমার কথা বলে, সে তোমাকে দেখতে চায়। কাল দু'জনে বায়স্কোপে গিয়েছিলাম। এর দাদারা খুব ধনী লোক। বিয়েতে আমরা পেয়েছি একটা মোটর গাড়ি, আর চমৎকার একটা বাড়ি। আমি এখানে একটা ব্যবসা ফেঁদেছি। অনেক টাকা লাভ হয়। শোন মা! তোমার বউ লেখাপড়াও জানে, তোমার ছেলের চাইতেও বেশি, বুঝলে! আমরা দু'জনে একত্রে শীঘ্রই তোমাকে প্রণাম করে আসব।"

এর পরের চিঠিখানা প্রায় এক বছর পরের লেখা। অন্ততঃ চিঠির তারিখ থেকে তাই মনে হয়। দু'খানা চিঠিই কোলকাতা থেকে লেখা হয়েছে। কিন্তু ঠিকানা কোনটাতেই দেওয়া নেই। দ্বিতীয় চিঠিখানির কিয়দাংশও নিম্নে তুলে দেওয়া হ'ল।

"মা, আমি মাত্র কয়দিন পূর্বে জাপান থেকে সস্ত্রীক ফিরেছি। চোখের চিকিৎসার জন্যে আমি সেখানে যাই। কিন্তু মা, আমি ভাল হতে পারি নি। আমি অন্ধ হয়ে গিয়েছি। তোমার বউই এখন আমার একমাত্র চক্ষু। সে আমাকে খুব যত্ন করে। আমার কথা তুমি ভেবো না। হাঁ, আমাদের একটা খোকা হয়েছে। ভারি চমৎকার খোকা। ভারি নরম তার দেহ। তুমি ভাল আছ ত মা? ভগবান আমার চক্ষু নিলেও একটা খোকা দিয়েছেন, আর আমাকে

দিয়েছেন একজন সেবাপরায়ণা বউ। না মা, আমার কোন দুঃখ নেই। আমি খুব ভাল আছি।"

উপরোক্ত চিঠি দু'খানির বিবরণ যে সম্পূর্ণ তৈরি মিথ্যা তা সহজেই অনুমেয়। পুলিশ পত্র দুটির বক্তব্য বিষয় পড়ে বিস্মিত ও বিভ্রান্ত হয়।

অপহৃত শিশুটির মাতা আসামীর পায়ে ধরে কান্নাকাটি করে। অসামীকে একটু বিচলিত হতেও দেখা যায়। অবশেষে আসামী লছমী দেবীর সঙ্গে একাকী বদ্ধ-দুয়ার কক্ষে কয়েক মিনিটের জন্য কথা কইতে চায়। এই প্রস্তাবে রাজি হলে সে শিশুটিকে ফিরিয়ে দেবে এরূপ প্রতিশ্রুতি দেয়। সে আরও বলে যে, লছমী দেবীকে সে বরাবরই বহিনের মত দেখেছে এবং ওদিনেও তাকে বহিনের মতই সম্মান দেবে। এরূপ প্রস্তাবে লছমী দেবী রাজি হন, কিন্তু তার স্বামী তাতে রাজি হন না। লছমী দেবী বলেন যে, তিনি একজন ভারতীয় নারী। তাঁর নারীত্বের সম্মান পুত্র বা পতির জীবনাপেক্ষাও মূল্যবান। তাছাড়া আত্মরক্ষা করতে তিনি অপারগ নন। কিন্তু এরূপ এক দুঃসাহসিক ব্যাপারে কেহ মত দেয় না। আসামীর প্রস্তাব বিনা দ্বিধায় প্রত্যাখ্যাত হয়।

এরপর পুলিশ আসামীর চরিত্র সম্বন্ধে কিছু অনুসন্ধান করে। তদন্তে প্রকাশ পায় যে, আসামী মাঝে মাঝে বন্ধুদের সঙ্গে রূপো-জীবিনীদের গৃহে গিয়েছে। রূপোপজীবিনীদের জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে জানা যায় যে, আসামী উচ্ছৃঙ্খল ধরণের যুবকদের সঙ্গে তাদের গৃহে গিয়েছে বটে, কিন্তু সে নিজে তাদের সকল সময় 'বহিন' বলেই সম্বোধন করেছে। লছমী দেবীর প্রতিও সে কখনও কোনও রূপ বিসদৃশ ব্যবহার করেনি। এমন কোনও প্রমাণও পুলিশ পায় না। নারী মাত্রকে, 'বহিন' সম্বোধনটি আসামী বিশেষ পছন্দ করত এবং প্রায়ই তাকে অন্য মনস্ক ও বিষণ্ণ দেখা যেত। সবিশেষ অনুসন্ধানের পরও আসামী সম্বন্ধে আর কোনও তথ্য জানা যায় না।

লছমী দেবীকে বালিকা বললেই চলে। তার উপর ছেলেটি ছিল তাঁর প্রথম সন্তান। লছমী দেবীর কাতর ক্রন্দন-ধ্বনি পুলিশকে বিশেষ অভিভূত করে। কিন্তু প্রাণপণ ক'রেও তাঁরা প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনে অসমর্থ হন। আসামীকে শেষ পর্যন্ত এক সুবিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট নিয়ে যাওয়া হয়।* তিনি সবিশেষ পরীক্ষা ও প্রশ্নোত্তরের পর নিম্নলিখিত মত প্রকাশ

* ইনি আমার পূর্বতন অধ্যাপক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধিকর্তা ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু। এঁর অধীনে কিছুকাল আমি অ্যাবনরমাল সাইকোলজি সম্বন্ধে গবেষণা করেছি।

করেন। তিনি বলেন যে, আসামী একটি বিশেষ রকমের মানসিক রোগে ভুগছে। সে অনেক কিছু কল্পনা করে এবং তার সে কল্পনা সাহিত্যিকদের ন্যায় সাহিত্য-রচনায় আবদ্ধ না রেখে সে তার কল্পনাকে [সত্যকার] রূপ দিতে চায় বাস্তবতার মধ্যে বা বাস্তব জগতে। ডাক্তার সাহেব আরও বলেন যে, সে নিজেকে স্ত্রীরূপে কল্পনা করে এবং সে মা হতে চায় এবং এইজন্যই সে লছমী দেবীর নামাঙ্কিত বাসনগুলি লছমী দেবীর বাক্সের মধ্যে রেখে দেয়। ভাবটা এই যে, ঐ বাক্সটি যেন তারই নিজের সম্পত্তি। আপাততঃ সে ফরিয়াদীর স্ত্রীরূপে নিজেকে কল্পনা করছে। এরূপ অবস্থায় লছমী দেবীকে সতীনরূপে দেখে তার উপর হিংস্থক হয়ে উঠা আসামীর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। এরূপ ক্ষেত্রে হয়তো আসামী লছমী দেবীকেই হত্যা করত। কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্রে সে শুধু মা হতে চায়। কিন্তু সে পুরুষ বিধায় মা হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সে নিজেকে অন্তঃসত্তারূপে কল্পনা করে ছেলেটিকে সরিয়ে দিয়েছে। দশমাস দশদিন পরে হয়তো সে ছেলেটিকে বার করবে। অর্থাৎ ঐ ছেলেটিকে তখন সে তার মা রূপে প্রসব করবে। বৃথা পীড়াপীড়ির ফলে সে মিথ্যার পর মিথ্যা বলবে মাত্র। আসামী যে স্ত্রীরূপে নিজেকে কল্পনা করত, স্ত্রী মাত্রকেই এইরূপ ভগ্নী সম্বোধন তার এক বিশিষ্ট প্রমাণ। এইজন্যই পুরুষরূপে সে মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করে নি। এ'ছাড়া মনিবের স্ত্রীরূপে নিজেকে কল্পনা করে বলে সে মিসেস প্যাটেল নামাঙ্কিত বাসন তার মনিবিনীর বাক্সে রেখেছিল।

উচ্চ আদালতের বিচারে খুন প্রমাণিত না হলেও হত্যার কারণে অপহরণ প্রমাণিত হয়েছিল। এইজন্য ঐ আদালত হতে তার দশ বৎসরের জন্য জেল হয়। এই ঘটনার এক বৎসর পর আসামী জেল হতে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য পুনঃ পুনঃ পত্রও লিখেছিল। সে তাতে জানায় যে ঐ শিশুটিকে ফিরত দেবার জন্য তার [গর্ভ ?] যন্ত্রণা হচ্ছে। কিন্তু জেল থেকে বার করে তাকে তার কথা মত অন্যত্র নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নি।

মানসিক রোগ বহু প্রকারের হয়ে থাকে। একপ্রকার রাজনৈতিক অপরাধী আছে যারা আসলে রাজনৈতিক অপরাধী নয়। এক প্রকার চিত্ত-বিক্ষোভের জন্যই তারা রাজনৈতিক অপরাধী হয়। পিতার প্রতি ক্রোধ ও ঘৃণা এবং মাতার প্রতি প্রভূত সহানুভূতি নানা কারণে তাদের অবচেতন মনে স্থান পায়। নানা প্রকার ঘাত-সংঘাতের মধ্যে পরে এই সুপ্ত অনুভূতির বিকৃতি ঘটে। তখন

(f) ইহা একটি উৎকট তথা জটিল অপরাধ-রোগীর দৃষ্টান্ত।

অকারণে তারা হয়ে উঠে রাজনৈতিক অপরাধী। দেশ বা ভূমিকে তারা মাতৃ-জ্ঞান করে এবং পিতৃরূপী রাজা বা জমিদারকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার প্রচেষ্টায় তারা আনন্দ পায়। তাদের অবচেতন মন মাতা বসুন্ধরাকে ভোগ করতে চায় পিতৃরূপী রাজার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে। মনের সুপ্ত ইচ্ছার বিকৃতি ঘটার জন্যই এই ধরনের রোগ জন্মে। একপ্রকার রাজনৈতিক অপরাধীদের পরীক্ষা ক'রে আমি এই সত্য অবগত হয়েছি। কিন্তু অন্য প্রকার রাজনৈতিক অপরাধীদের সম্বন্ধে এই ব্যাখ্যা প্রযোজ্য নয়।

এ'ছাড়া বিকৃত যৌনবোধও মানুষকে অপরাধী করে। আমি একজন যুবককে জানি যে মেয়েদের শাড়ি, চুলের কাঁটা ও জুতা চুরি করে আনন্দ পেত। যুবকটি এই চুরি লাভের জন্য করত না, সে চুরি করত তার যৌনবোধের তৃপ্তির জন্য। ঐগুলি তার বুকের উপর দু'হাতে চেপে ধরে সে আনন্দ পেতো। কিন্তু পুরুষদের দ্রব্যাদিতে সে কখনও হাত দেয় নি। এরূপ আরও বহুবিধ রোগের অস্তিত্ব আছে। আমি একটি অপরাধীকে জানি যে শুধু প্রহৃত হওয়ার জন্য অপরাধ করত। শুধু প্রহৃত হওয়ার মধ্যে সে পেত প্রচুর আনন্দ। অপর একটি অপরাধী ভালবাসত অত্যাচার-মূলক অপরাধ করতে। বলাবাহুল্য, এরা সকলে এক এক প্রকার অপরাধরোগী। একটা দুর্দমনীয় ইচ্ছা তাদের মনে রোগরূপে আত্মপ্রকাশ করে। স্নায়বিক কারণে মনের অন্তর্নিহিত প্রতিরোধ ক্ষমতার হ্রাস ঘটলে এই সব ইচ্ছা দমন করা কঠিন হয়। কয়েক ক্ষেত্রে বিকৃত যৌনবোধ এই ধরনের রোগের কারণ। দুর্দান্ত পাগলকে নানা কারণে আমরা সহ্য করি। ঠিক সেই কারণে আমাদের এদেরও সহ্য করা উচিত। আর আমাদের উচিত উন্মাদদের মত এদেরও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

এইরূপ আরও বহু প্রকার অপরাধী আছে যারা প্রকারান্তরে উন্মাদ। কিন্তু তাদের সেই উন্মাদ অবস্থা বাস্তব জগতে ধরা পড়ে না। এর ফলে তাদের অপরাধসকল অপরাধরূপেই চালু হয়। এই উন্মাদ অবস্থার ন্যায় উত্তেজনা দ্বারা অভিভূত হয়েও বহু মানুষ অপরাধ করে। কিন্তু ঐ সকল অপরাধ তাদের স্বাভাবিক অবস্থায় তারা করে না। এরূপ একটা অপরাধের দৃষ্টান্ত নিম্নে দেওয়া হ'ল।

বটমের শহরের কোনও এক আদালতে একটি ভদ্রঘরের মহিলাকে বিচারার্থে আনা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল চুরির। দোকান থেকে সিল্কের টুকরো চুরি করার অপরাধে তিনি ধৃত হন। দোকান থেকে বেমালুম

সিল্কের কাটা টুকরা তিনি নিয়েছিলেন। দোকানদার তাঁকে বামালশুদ্ধ ধরে ফেলে। থানায় পুলিশ মহিলাটির দেহ তল্লাস করে। মহিলাটি কিন্তু তাঁর নাম বা ঠিকানা জানাতে চান না। পুলিশ নাচার হয়ে তাঁকে বিচারার্থে চালান দেয়। ঐ সময় মহিলাটিকে বিশেষ উত্তেজিত ও লজ্জিত দেখা যায়। মহিলাটি তিন দিন চোর-স্ত্রীলোক ও গণিকাদের সঙ্গে কারাবাস করেন। তাঁর বড় ছেলে অতিকষ্টে তাঁর সন্ধান পান এবং তাঁকে জামিনে খালাস করে আনেন। এক অভিনব অবস্থা ও বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে মহিলাটি লজ্জায় ও ঘৃণায় অস্থির হয়ে উঠেন এবং কিছুদিন পরে চিন্তায় তাঁর মস্তিষ্কের বিকার ঘটে। কিছু সুস্থ হবার পর তিনি পুলিশকে নিম্নলিখিত রূপ এক বিবৃতি দেন।

"অমার দুটি মাত্র পুত্র। ছোট ছেলেটি ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে। আমি সদা-সর্বদাই তার জন্য চিন্তিত থাকি। একদিন খবর এল আমার পুত্রের রণক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটেছে। আমি তখন শোকে উন্মাদের মত হই। বীর পুত্রের সম্মান রক্ষার জন্য আমার মন উতলা হয়ে উঠে। আমার ইচ্ছে হয় একটা সিল্কের জাতীয় পতাকা কিনে আনি। আমি ছুটে চলে যাই বাজারের দিকে। অনাহার ও অনিদ্রায় আমার মন অস্থির কিন্তু তবু আমি দিক-বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ছুটে চলি। পথের ভিড়ে ধাক্কা খেয়ে দু-দুবার হোঁচট্ খাই। শেষে রাস্তা পার হাওয়ার সময় গাড়ি চাপা পড়ি। ধরাধরি করে কয়জন লোক আমাকে রাস্তার উপর উঠিয়ে দেয়। আমি পূর্ব হ'তেই উত্তেজিত ছিলাম। এর পর আমার উত্তেজনা শেষ সীমায় এসে পৌছায়। আমার টাকা সমেত ব্যাগটা রাস্তায়ই পড়ে থাকে। কিন্তু সেদিকে আমার দৃষ্টি থাকে না। আমি তখুনি আবার নিজের অজ্ঞাতে ছুটে চলি। বোধহয় একটা দোকানের সামনে এসে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। এর পর কি হয়েছিল তা আমার একটু মাত্রও মনে নেই। তবে ক্ষীণভাবে আমার মনে পড়ে যে, কারা যেন আমায় ধরে কোথায় নিয়ে এল। দারুণ উত্তেজনায় আমি ঐ সময় আমার নাম পর্যন্ত ভুলে যাই। যখন আমি আমাতে ফিরে আসি, অর্থাৎ স্মৃতিশক্তি ফিরে পাই তখন আমি জানতে পারি যে আমি একজন চোর। চৌর্য অপরাধে আমার বিচার হবে। আমি এখন মৃত্যুই শ্রেয়ঃ মনে করি। আমাকে এরা মেরে ফেলুক, ফাঁসি দিক কিন্তু ওরা যেন আমাকে জেলে না দেয়।"

মানুষ সাধারণতঃ মস্তিষ্কের দ্বারা চালিত হয়। কিন্তু মস্তিষ্ক ছাড়া মেরুদণ্ডস্থিত [মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরস্থ স্নায়ুদণ্ডের উপর অবস্থিত] স্নায়ু-কেন্দ্রগুলিও মানুষের

কার্যবিশেষের জন্য দায়ী থাকে। নিদ্রা যাওয়ার সময় কেউ যদি ব্যক্তিবিশেষের পায়ে চিমটি কাটে, তা হ'লে ঐ ব্যক্তি অজ্ঞাতসারেই তার পা-টা সরিয়ে নেয়। এই স্নায়ুকেন্দ্রগুলিই মানুষের এরূপ ব্যবহারের জন্য দায়ী। এরূপ ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষের এই চিমটি-কাটাজনিত ব্যথা এবং চিমটি কাটার বা পা সরানোর কথা মনে থাকে না। ইংরেজিতে একে বলে রিফ্লেক্স অ্যাক্‌শন্। সবিশেষ উত্তেজনার মধ্যে পড়লে মানুষের মস্তিষ্ক তার স্নায়ুকেন্দ্রগুলি থেকে পৃথক্ হয়ে পড়ে এবং মস্তিষ্কের আদেশ ব্যতিরেকে বা মস্তিষ্ককে না জানিয়ে এই স্নায়ুকেন্দ্রগুলি স্বাধীনভাবে কাজ করে। ফলে মানুষের অবস্থা তখন হয় হাল-বিহীন নৌকো বা চালক-বিহীন ছুটন্ত শকটের মত। ঠিক এরূপ অবস্থাতেই উপরি-উক্ত অপরাধটি সংঘটিত হয়েছিল। এজন্য চুরির ব্যাপারটি তার মনে ছিল না।

রাত্রে অনেকে উত্তেজিত বা ভীত হয়ে ভূত দেখেন এবং ভয় পেয়ে দৌড় দেন। মাঠ ঘাট পথ খানা বেড়া ডিঙিয়ে তাঁরা ছুটে আসেন। কিন্তু তাঁদের যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে কোন পথ দিয়ে এবং কেমন করে তাঁরা পালিয়ে এলেন—তাঁরা সে সম্বন্ধে কিছু জানাতে পারেন না। ভূত দেখা এবং এই ভূত দেখার পূর্বেকার ঘটনাগুলি ছাড়া তাঁদের আর কিছুই মনে থাকে না। উপরোক্ত কারণেই তাঁদের এরূপ স্মৃতিবিস্মৃতি ঘটে। এই সম্পর্কে নিম্নের স্বীকারোক্তিটি প্রণিধানযোগ্য।

"হঠাৎ দিঘিটার ওপারে দেখলাম একটা হলদে রঙের জন্তু। আমার তাকে বাঘ বলেই মনে হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে আমি ছুট দিলাম। বাড়ি ফিরে দেখলাম আমার সর্বাঙ্গ কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত। আমার জামা কাপড় ভিজে। সর্বাঙ্গ কর্দমাক্ত। মাথায় একটা আঘাত। কপাল দিয়ে রক্ত পড়ছে। কোন্ পথ দিয়ে আমি ফিরে এসেছি তা আমার মনে নেই। কোথাও পড়ে গিয়েছিলাম কিনা তাও মনে পড়ে না। বাগানের মধ্য দিয়ে এসেছি, না পথ বেয়ে এসেছি তাও জানি না।"

উক্তরূপে আরও কয়েক প্রকার বেঠিক অপরাধ আছে, যে সকল অপরাধকে অপরাধ রূপে আদপেই ধরা উচিত নয়। এমন অনেক চুরি আছে যা এক প্রকার রোগ। এই রোগের নাম দেওয়া হয়েছে চৌর্য-বাতিক বা ক্লিপটোম্যানিয়া। এই সব লোকেরা চুরি করে লাভের জন্য নয়। চুরি করবার এক অত্যদ্ভুত ইচ্ছা তাদের পেয়ে বসে। এরূপ ইচ্ছা প্রতিটি ক্ষেত্রে দুর্দমনীয় হয় না বটে, কিন্তু এই ইচ্ছার নিবৃত্তি না ঘটা পর্যন্ত তারা এক দারুণ অস্বস্তি অনুভব করে। তারা

চুরি করে তাদের এই ইচ্ছার নিবৃত্তির বা অস্বস্তির উপশমের জন্য। একদিন চুরি করে পরের দিন তারা চুরির জিনিস ফিরিয়ে দেয়। অন্যথায় এদের অনেকে ঐগুলি নষ্ট করে ফেলে। য়ুরোপে বহু ম্যানিয়াগ্রস্ত ধনকুবের আছেন যাঁরা দোকান থেকে বেমালুম জিনিস সরিয়ে পকেটে পুরেন। দোকানদাররা তা দেখে কিন্তু তাঁকে কিছু বলে না। পরে বড় রকমের একটা বিল পাঠিয়ে তারা মূল্যাদি আদায় করে নেয়। এই সব রোগীরা চুরি করার জন্য দ্রব্যাদি-খুঁজে বেড়ায় না। তালা ভেঙ্গে বা পাঁচিল টপকেও তারা চুরি করে না। কোনও দ্রব্য একেবারে সামনে না পড়লে তাদের এরূপ ইচ্ছার উদয় হয় না। এই ইচ্ছার স্বরূপ ও গতি থাকে মৃদু এবং সদা সর্বদাই এই ইচ্ছার উদ্রেক হয় না। প্রায়শঃ ক্ষেত্রে এটা সাময়িক ভাবে এসেছে। বিশেষ জানাশুনা বাড়ি বা দোকান না হলে রোগীরা এই সব কাজে হাত দেয় না। অনেক সময় এইরূপ ইচ্ছা তারা দমনও করে। এ সম্বন্ধে কয়েকটি এ দেশী উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাক।

আমার এক সম্পাদক-বন্ধু একদা আমার বাড়িতে তাঁর এক সাহিত্যিক বন্ধুকে নিয়ে আসেন। তাঁর এই "অমুকবাবু" বন্ধুটির এই রোগ ছিল। ঘরে বসে গল্প করতে করতে কখন যে তিনি আমার দামী মাফলারটা সরিয়ে ফেলেন তা আমি জানতে পারি না। উঠবার সময় আমার মাফলারটা আমার হাতেই তুলে দিয়ে সেটা আমাকেই তাঁর গলায় বেঁধে দিতে বলেন। আমি মাফলারটি নিঃসন্দেহে তাঁরই মনে করে সযত্নে তাঁর গলায় বেঁধে দি। পরে বন্ধুটি সব কথা আমায় খুলে বলে আমাকে তাঁর সেই বন্ধুটির বাড়ি নিয়ে যান। অমুকবাবুর ঘরের একটা আনলায় আমার মাফলারটা ঝুলান দেখি। সম্পাদক-বন্ধু নির্বিকার চিত্তে মাফলারটা তুলে নিয়ে জানান যে, তিনি দুদিন আগে ওটা ওখানে ফেলে গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ অধোবদন থেকে ভদ্রলোক উত্তর দেন, 'এজন্যে কেন লজ্জা দিচ্ছেন আমাকে? ওটা আমি কালই সকালে ফিরত দিয়ে আসতাম।' আমি বুঝলাম যে অমুকবাবু এরূপ ইচ্ছার নিবৃত্তি বন্ধুবরের উপর দিয়েই সাধারণতঃ করে থাকে।

কিছুদিন আগে এক মহিলা কবির গৃহেও এইরূপ একটি চুরি হয়। এক ভদ্রমহিলা তাঁর বাড়িতে বেড়াতে আসেন এবং একটি মূল্যবান সোনার হার নিয়ে সরে পড়েন। মহিলা কবি সব দেখলেও মহিলাটিকে কিছু বলতে কুণ্ঠিত হন। পরের দিন মহিলাটি তাঁর বাড়িতে পুনরায় বেড়াতে আসেন। কিছুক্ষণ পরে সেই হারটাও পূর্বস্থানে ন্যস্ত দেখা যায়। ঐদিনই আবার মহিলা কবির

একটা ছোটখাটো কম মূল্যের জিনিস খোয়া যায়। কিন্তু পরের দিন তিনি কাশ্মীর রওনা হন। সুতরাং জিনিসটিও তিনি আর ফিরে পান না।

আমি একজন মহামান্য ভারতীয় জজের সুশিক্ষিতা স্ত্রীকে জানি। ইনি নিমন্ত্রণে এসে গৃহস্থের বাড়ি থেকে সুযোগ মত একটি দ্রব্য চুরি করে আনতেন! কিন্তু তাঁর স্বামী তাঁর স্ত্রীর ঐ রোগ সম্বন্ধে অবহিত থাকায় ঐ দ্রব্যটি তিনি যথা সত্বর সংগ্রহ করতেন এবং উহা বেনামী পোস্টাল পার্সেল যোগে উহার প্রকৃত মালিকের নিকট পাঠিয়ে দিতেন।

এই সব অপরাধী ছাড়া শিশু ও অপরিণত বালক দ্বারা কৃত কোনও অপরাধ অপরাধরূপে স্বীকৃত হয় না। মাতাল অবস্থায় লোকে যদি কোনও অপরাধ করে তো তার সেই অপরাধকে অপরাধ বলা হয় না। সেই ব্যক্তি অপরাধ করার উদ্দেশ্যেই মদ্য পান করলে অবশ্য উহা অপরাধ। এই সকল অপরাধ-রোগীকে ভুলক্রমে প্রকৃত অপরাধীর মত শাস্তি দেওয়া উচিত নয়। এই সম্বন্ধে রাষ্ট্র মাত্রেরই লক্ষ্য রাখা উচিত। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পূর্বাপর মানসিক অবস্থা হাবভাব, ব্যবহার, সামাজিক, আর্থিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ব্যবস্থা লক্ষ্য করে সহজেই বুঝে নেওয়া যায় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি একজন সঠিক অপরাধী বা অপরাধ-রোগী। অভিযুক্ত ব্যক্তির মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহের উদ্রেক হওয়া মাত্র তাকে তদন্ত সাপেক্ষে হাজতে রেখে বা জামিনে খালাস দিয়ে অপরাধীর মানসিক ও পারিপার্শ্বিক বিষয় সম্বন্ধে খোঁজ নেওয়া উচিত। তাদের পিতামাতা সহ পিতৃ ও মাতৃকুলের অপরাপর ব্যক্তিদের জীবন বৃত্তান্ত জানতে হবে। এদের বংশ-পরিচয় থেকে অপরাধীর প্রকৃতি সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞাত হয়ে তাদের এই রোগ এবং রোগের কারণ সম্বন্ধেও বহু তথ্য জানা যায়।

বৃটিশ আইনের মূলনীতি হচ্ছে এই যে, পঞ্চাশটা অপরাধী খালাস পাক. ক্ষতি নেই কিন্তু তা সত্বেও ভুলক্রমে একজন নিরপরাধীরও যেন শাস্তি না হয়। ভারতীয় পুলিশ ও ভারতীয় আদালতসমূহের ঐ বিষয়ে সবিশেষে সচেতন থাকা উচিত। ভারতীয় দণ্ডবিধি মাত্র জ্ঞানতঃ দোষী ব্যক্তিদেরই শাস্তি চায়। উপরিউক্ত ক্লিপটোম্যানিয়াক বা চৌর্য-বাতিক রোগের বিষয় বিবেচনা করা যাক। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৯ ধারায় চৌর্য অপরাধের নিম্নোক্ত রূপ সংজ্ঞা দেওয়া আছে।

'কেহ যদি অপরের দখলীভূত কোনও অস্থির বা অস্থাবর দ্রব্য দখলদার

ব্যক্তির বিনা অনুমতিতে আত্মসাতের বা ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে অপসারণ করে তো তার এই কার্যকে চৌর্য কার্য বলা হয়।'

এক্ষেত্রে অপরাধ-রোগীরা উপরোক্ত রূপে দ্রব্যাদি অপসারণ করে বটে, কিন্তু তা তারা করে আত্মসাতের বা ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে নয়। এ কার্য সে করে তার অপরাধ-স্পৃহার নিবৃত্তির জন্য। তার এই কাজের জন্য সে প্রায়ই অনুতপ্ত হয় এবং হৃত দ্রব্য ফেরত দেবার জন্য সর্বদাই সুযোগ ও সুবিধা খোঁজে। অনেক সময় লজ্জার খাতিরে সে হৃত দ্রব্য বিনষ্ট করে, কিন্তু পারতপক্ষে তা ব্যবহার বা আত্মসাৎ করে না। এখানে লাভালাভের [**wrongful gain**] কোনও প্রশ্ন না থাকায় উহাদের এই চৌর্য কার্যকে অপরাধ বলা যায় না।

[মানুষের প্রধানতম রিপু হচ্ছে ক্রোধ এবং লোভ। এই বৃত্তিদ্বয় যে অপরাধ সৃষ্টির অন্যতম কারণ তা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। অবশ্য পরিবেশগত কারণসমূহ ইহাদের কার্যে সর্বদাই ইন্ধন যুগিয়েছে। কিন্তু, যে রীতিতে ক্রোধ মানুষকে অপরাধী করে, সে রীতিতে লোভ তাহাদের অপরাধী করে না। সূক্ষ্মস্নায়ু ক্ষতিগ্রস্থ হওয়াতে প্রতিরোধ-শক্তির হানি হলে যে মানুষ অপরাধ করে, তা পূর্ব প্রবন্ধে বলেছি।

এই ক্রোধ ও লোভ মানুষের মনের আধারভূত সূক্ষ্ম স্নায়ুকে সাময়িক বা স্থায়ীরূপে ক্ষতিগ্রস্থ করতে সক্ষম। আমার মতে ক্রোধ উহার ক্ষণস্থায়ী প্রবাহ দ্বারা সোজাসুজি আঘাত হেনে উহাকে ক্ষতিগ্রস্থ করে থাকে। উহার আশে-পাশে অবস্থিত অন্যান্য বৃত্তি সম্পর্কীত কোনও সূক্ষ্মস্নায়ুকে ক্ষতিগ্রস্থ করে না। এজন্য ক্রোধের উপশম হলে ঐ অপরাধীকে পুনরায় আমরা স্বাভাবিক মানুষ হতে দেখি। অপরদিকে মানুষের লোভ উহার দীর্ঘস্থায়ী প্রবাহ দ্বারা উহার দেহাভ্যন্তরের রসপিণ্ড হতে অবিরত অনুপকারী রস নির্গত করে। এই রস পুনঃ পুনঃ নির্গত হলে উহা ধমনীর মাধ্যমে অপস্পৃহার অনুক্রমিক সূক্ষ্মস্নায়ু সহ উহার আশে-পাশে অবস্থিত অন্যান্য বৃত্তিসমূহের আধারভূত সূক্ষ্ম-স্নায়ুদেরও ক্ষতিগ্রস্থ করে দেয়। এজন্য পুরাতন অপরাধীদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের আমূল পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করে থাকি। এই সময় তারা বহুলাংশে আদিম মানুষের মত হয়ে উঠেছে।

এই সকল বিষয় অনুধাবন করে আমি মনে করি যে, ক্রোধ অপরাধ-রোগীর এবং লোভ নীরোগ অপরাধীর সৃষ্টি করে থাকে! এই উভয় প্রকার অপরাধীর

স্বভাব-চরিত্র অনুধাবন করে আমি এইরূপ এক স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি।

[কয়েক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে ক্রোধ প্রথমে সরাসরি সূক্ষ্মস্নায়ুকে ক্ষতিগ্রস্থ করে এবং পরে উহা দেহের আভ্যন্তরিক রসপিণ্ড হতে সামান্য [নাম মাত্র] রস ক্ষরিত করে। কিন্তু উহার ঐরূপ সরাসরি আঘাত দ্বারা অন্যান্য সূক্ষ্ম স্নায়ু সমূহের বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু লোভ প্রথমে রসপিণ্ড হতে অনুপকারী রস ক্ষরিত করে এবং তারপর ঐ রস-এর ফলে অপস্পৃহার আনুষঙ্গিক 'প্রদমিত অন্যান্য আদিম দোষ' সমূহও উহার সাথে উপরে উঠে আসে। কারণ, ধমনীর মাধ্যমে উহা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে অন্যান্য সূক্ষ্মস্নায়ুকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। এর ফলে শেষ অবস্থায় এদের মধ্যে অন্যান্য বহু আদিম বৃত্তি দেখা যায়।]

উপরোক্ত অপরাধী ব্যতীত এমন বহু দুর্বল মানুষ আছে যারা অপর ব্যক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অপরাধ করে থাকে। এই সকল ব্যক্তিদের প্রতিরোধ-শক্তি স্বভাবতঃ কম থাকে, কিংবা উহা কৃত্রিম উপায়ে কিছু সময়ের জন্য বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়। প্ররোচকগণ বাক্‌প্রয়োগ দ্বারা এদের বুঝিয়ে দেয় যে ক্ষেত্র বিশেষে এই সকল অপরাধ অপরাধ রূপে বিবেচিত হতে পারে না। সাধারণতঃ রাষ্ট্র, ধর্ম, সমাজ, ব্যক্তি ও পরিবারের নামে এই সকল অপরাধীদের ভুল পথে পরিচালিত করা হয়েছে। এই সকল প্ররোচকগণ প্ররোচিতদের বলে যে, তাদের ঐ সকল কার্যের দ্বারা প্রকারান্তরে জন-সমাজ উপকৃত হবে। এ ছাড়া এ কথাও তাদের বলা হয়ে থাকে যে, তারা শুধু ওস্তাদ বা গুরু বা নেতার আদেশ পালন করছে। এতে যদি কারুর পাপ হয় তো তা তাদের হবে না। ঐ পাপ হবে ঐ সকল ওস্তাদ, নেতা, গুরু বা দাদাদের। এছাড়া প্ররোচকগণ প্ররোচিত ব্যক্তিদের প্রায় বুঝিয়েছে যে, এতদ্বারা তাদের ব্যক্তিগত উপকার হবে এবং ঐ উপকার করবার যথেষ্ট ক্ষমতা প্ররোচক ব্যক্তিদের নিশ্চয় আছে।

কৃত্রিম উপায়ে জাত এক অস্বাভাবিক অবস্থায় অপরাধীরা এই অপরাধ করে বলে তাদেরও আমরা অপরাধ-রোগী বলে থাকি। কিরূপ মানসিক অবস্থায় উপনীত হওয়ার জন্য একজন অপর একজনের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে নানাবিধ অপকর্ম করে থাকে তা সংক্ষিপ্তাকারে পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে। সাধারণ ভাষায় ইহাকে সম্মোহন-বিদ্যা [হিপনোটিজিম] বলা হয়। আজকাল বিজ্ঞানীরা উহাকে 'ইনফ্লুয়েনসিয়ারি' বলেন। ইহা মাত্র প্রভাব বিস্তারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

(১) কোনও এক মানুষ অপর এক মানুষকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রভাবিত করে তার দ্বারা কখনও কোনও অপকর্ম করাতে পারে নি। তারা তাদের যা কিছু অপকর্ম ভুল বিশ্বাসের কারণে স্ব-ইচ্ছাতেই সমাধা করেছে। সাধারণতঃ প্ররোচিতদের মিথ্যা বাক্‌জাল দ্বারা মোহিত করে তাদের এমন কাজ করানো হয়েছে যা স্বাভাবিক অবস্থায় তারা কখনও করবার চিন্তাও করেনি।

(২) এই সকল প্রভাবান্বিত ব্যক্তিরা সাধারণতঃ স্বার্থপর বা লোভী হয়ে থাকে। কিংবা বাক্‌প্রয়োগ দ্বারা কিংবা পরিবেশ সৃষ্টি করে তাদের সহসা লোভী ও স্বার্থান্ধ করা হয়। কখনও তাদের বুঝানো হয়েছে যে এতদ্বারা তাদের দেশ, রাষ্ট্র, সমাজ বা পরিবারের সবিশেষ উপকার হবে। কিংবা তাদের বুঝানো হয়েছে যে, এতদ্বারা তাদের ধনলাভ, পুত্রপ্রাপ্তি কিংবা রোগমুক্তি হবে। বলা বাহুল্য যে, এই সকল বিষয়ে তাদের আপন স্বার্থ বিশেষরূপে নিহিত থাকে। যদি তারা বুঝে যে ঐ ব্যক্তির আদেশ মত কাজ করলে তাদের স্বার্থের হানি হবে তা'হলে তারা তাদের আদেশ কখনও প্রতিপালন করবে না।

(৩) স্বার্থ, লোভ ও ভয় সাময়িকভাবে প্রতিরোধ-শক্তির অবসান ঘটানোর জন্য একজন মানুষ অন্যায়ভাবে অপর এক মানুষ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে থাকে। পুনঃ পুনঃ বাক্‌প্রয়োগ দ্বারা মানুষকে স্বার্থান্ধ ও ভীত কিংবা লোভী করে তুলে তাদের প্রতিরোধ-শক্তির অবসান ঘটানো অতীব সহজ। আমার মতে স্বার্থপ্রসূত লোভ মানুষের আভ্যন্তরিক রসপিণ্ড হতে অনুপকারী রস ক্ষরিত করতে থাকে এবং ঐ রস ধমনীর মাধ্যমে উহাদের মনের আধারভূত সূক্ষ্মস্নায়ুকে সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে দেয়। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ উহাদের প্রতিরোধ-শক্তির যে সাময়িক বিলোপ হবে তাতে আর বিচিত্র কি? যদি অন্য কেহ প্ররোচকের প্রতারণা পূর্ণ মিথ্যা ভাষণকে সমর্থন করে, তা'হলে আরও সহজে ও অতি শীঘ্র প্ররোচিত ব্যক্তিদের স্বাভাবিক প্রতিরোধ-শক্তি বিলুপ্ত হয়ে যায়।

(৪) এইভাবে প্ররোচিত ব্যক্তিদের প্রতিরোধ-শক্তির বিলোপ ঘটাতে উহাদের বিচার-বুদ্ধিরও সাময়িক ভাবে বিলোপ ঘটে। প্রথম প্রথম এরা অন্যায় বুঝে কোনও এক অন্যায় বা নীতিবিগর্হিত কার্য প্রায়ই করতে চান না। কিন্তু প্ররোচকগণ পুনঃ পুনঃ বাক্‌-প্রয়োগ বা সাজেস্‌-শন্‌ দ্বারা তাদের প্রতিরোধ -শক্তির হানি ঘটিয়ে তাদের বিচার-বুদ্ধির [সাসপেসশন্‌ অফ্‌ জাজ্‌মেণ্ট] সাময়িকভাবে বিলোপ ঘটায়।

(৫) প্ররোচিত ব্যক্তিদের বিদ্যাবুদ্ধি ও উপকার করার ক্ষমতার উপর বিশ্বাসী হওয়ার জন্যই তারা প্ররোচিত বা প্রভাবান্বিত হয়ে থাকে। প্ররোচকগণ তাদের প্রায়ই বিশ্বাস করাতে পেরেছে যে, তারা নিঃস্বার্থ ও সাধু চরিত্রের ব্যক্তি তো বটেই, অধিকন্তু তারা নানা প্রকার গুণের ও ক্ষমতার অধিকারীও। কালক্রমে প্রভাবান্বিত ব্যক্তিরা বিশ্বাস করতে আরম্ভ করে যে, উহাদের দ্বারা তাদের উপকার ছাড়া কোনও অপকার হতে পারে না।

এই সকল প্ররোচকগণ সাধারণতঃ স্বার্থান্বেষী ও পরভুক বা পরগাছা [প্যারাসাইট] জীবন যাপনে অভ্যস্ত হলেও কয়েকটি বিশেষ গুণেরও অধিকারী হয়ে থাকে। তা' না হলে এতো সহজে অপর এক মানুষকে মুগ্ধ করে তুলতে তারা পারতো না। এই সকল ব্যক্তি মনস্তত্ত্ববিদ্, চতুর ও বুদ্ধিমানও হয়ে থাকে। এজন্য তারা মানুষকে প্রভাবান্বিত করে তাদের অপকারের ন্যায় বহু উপকারও করতে সক্ষম। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে ওদের অপরাধ-প্রবণতা মানুষের অপকারই করে থাকে। এই সম্পর্কে বুঝবার সুবিধার্থে নিম্নের বিবৃতিটি বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য।

"অমুক ব্যক্তি ঐদিন হঠাৎ আমার মোটর সাইকেলটি পরীক্ষা করে সামান্য ক্ষণের মধ্যে উহাকে সচল করে তুললো। আমি তার এবংবিধ কার্যদক্ষতা দেখে মুগ্ধ হয়ে যাই। কারণ ইতিপূর্বে বহু চেষ্টা করেও দুইজন কারিগর ঐ গাড়িকে সচল করতে পারেনি। কয়েকজন কারিগর উহা সারাবার জন্য পঞ্চাশটি মুদ্রাও দাবি করেছিল। কিন্তু ঐ ব্যক্তি এই উপকারটুকুর জন্য একটি পয়সাও দাবি করলো না। তার বক্তব্য এই যে, উহার জন্য তাকে কোনও খরচ-খরচা বা অধিক পরিশ্রম করতে হয় নি। এর পর সে বললে যে, ভিহিকেল আফিসে তার জানাশুনা থাকায় সে মাত্র একঘণ্টার মধ্যেই আমার লাইসেন্স ও ট্যাক্স পারমিটগুলি রি-নিউ করে আনতে পারবে, তখন নির্বিচারে এই অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিটিকে কাগজপত্র সহ সত্তর টাকা ঐ অফিসে জমা দেওয়ার জন্য আমি প্রদান করি। যে ব্যক্তি তার কর্মদক্ষতা দ্বারা মাসে সহস্র মুদ্রা উপায় করতে সক্ষম, সে যে আমার সত্তরটি মুদ্রা নিয়েপালাবে তা আমি কল্পনাও করি নি।"

[বহু গৃহভৃত্য নিজের অর্থে সস্তায় দ্রব্য আনে। পাঁচ টাকার নোট গ্রহণ করে বলে যে তাকে ভুলে দশ টাকার নোট দেওয়া হয়ে ছিল। এইভাবে বিশ্বাস উৎপাদন করে তারা মনিবকে মোটা টাকার চোট দিয়ে পলায়।]

অনেক সময় প্ররোচকগণ প্রভাবান্বিত বক্তিদের বুঝিয়ে থাকে যে, ঐ বস্তু

অপহরণ করলে উহাকে চুরি বলা যায় না। কারণ, উহার উপর তারও ন্যায়তঃ অধিকার আছে। রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক ও অর্থনৈতিক অভাব-অভিযোগের ভুল বাখ্যা করে বহু নেতা জনসাধারণকে স্বার্থান্ধ কিংবা উত্তেজিত করে অতীতে তাদের দ্বারা বহুবিধ অপকর্ম করাতে সক্ষম হয়েছেন। কিরূপ বাক্যবিন্যাস দ্বারা মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করা হয়ে থাকে তার কয়েকটি নিদর্শন নিম্নে উদ্ধৃত করা হল।

"আপনারা কি জানেন যে অমুক ব্যক্তি কত সৎ ও নিরীহ নাগরিকের সর্বনাশ সাধন করেছেন? ওঁর মত লোককে খুন করে এলেও আপনাদের কোনও পাপই হবে না।" কিংবা "আপনারা জানেন না যে কত গরীবকে উনি সর্বহারা করে তাদের পথে বসিয়েছেন। অতএব ওঁর ধনরত্ন লুণ্ঠন করলে আপনাদের কোন অন্যায় হবে না। এ'ছাড়া তিনি বহু সতীর সতীত্ব নাশও করেছেন। বহু ব্যক্তিকে ভিটামাটি ছাড়া করে উনি পথে বসিয়েছেন। আসুন ওঁর বাড়িতে ডাকাতি করে ওঁকে আমরা হত্যা করে আসি।"

এক্ষণে মানুষ যে শুধু মানুষের বাক্-প্রয়োগ দ্বারা প্রভাবিত হয় তা নয়। বহুক্ষেত্রে ঘটনা বিশেষ এবং পরিবেশ মানুষকে প্রভাবান্বিত করে থাকে। এ'ছাড়া প্রভাবান্বিত ব্যক্তিদের মধ্যে সাধারণতঃ কিছুটা অপরাধ-প্রবণতা থাকে। তাদের মনও থাকে দুর্বল। তাই শিশুগণের ন্যায় এরা সহজেই অপরের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে। ইহা হতে অপরাধীদের সহিত শিশুদের নিকট সাদৃশ্যও প্রমাণ করা যায়। এতদ্‌সহ ইহাদের উভয়ের মধ্যেই সবিশেষ অদূরদর্শিতা, বিস্মরণশীলতা এবং বাক্-প্রয়োগে অভিভূত হওয়ার ভাবও দেখা গিয়েছে। সাধারণভাবে, মানুষ প্রতিদিন পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করে থাকে। ইহা অতীব সত্য। কিরূপ উপায়ে তা করা হয় তা উপরে বলা হয়েছে। তবে অতিমাত্রায় উহা ঘটলে অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি হয়। আমার মতে, ক্ষমতায় আসীন ব্যক্তিদের প্রতি ভয় এবং বিশেষজ্ঞ-মন্য ব্যক্তিদের প্রতি মানুষের বিশ্বাসই ইহার অন্যতম কারণ।

এদেশে বহু লোকের এখনও এইরূপ মিথ্যা ধারণা আছে যে সম্মোহিত অবস্থায় একজন অপরের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বহুবিধ অপকর্ম সমাধা করেছে। এই সময় নাকি এরা স্নায়ু-দুর্বল হিষ্টিরিয়া রোগীর ন্যায় হয়ে থাকে। এইজন্য এরা মোহাবিষ্ট অবস্থায় অপর এক ব্যক্তির আদেশ মত কাজ করে। অবশ্য যে ব্যক্তি তাদের মোহাবিষ্ট করে, মাত্র তাদেরই আদেশ

তারা প্রতিপালন করেছে। জ্ঞান হওয়ার পর সুস্থ অবস্থায় উপনীত হয়ে কিন্তু তারা তাদের পূর্বকৃত অপকর্মের কথা প্রায়ই ভুলে যায়। বিজ্ঞ দুর্বৃত্তরা প্রথমে উক্ত প্রকার স্নায়ু-দুর্বল হিষ্টিরিয়া রোগীদের খুঁজে বার ক'রে নিজেদের আয়ত্তে আনে এবং পরে কৃত্রিম উপায়ে তাদের এই বিশেষ স্নায়বিক রোগকে জাগ্রত ক'রে তাদের কিছুক্ষণের জন্য রোগগ্রস্থ বা মোহগ্রস্থ করে। বহুক্ষেত্রে এই সব রোগী আপনা আপনি ভাবগ্রস্থ বা রোগগ্রস্থ হয়েছে। এই সুযোগে দুর্বৃত্তরা রোগীর অবচেতন মনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে এবং বাক্-প্রয়োগ বা সাজেস্‌শন দ্বারা তাদের নানারূপ আদেশ জানায়। এই বিশেষ অবস্থায় রোগীর প্রতিরোধশক্তি সাময়িকভাবে বিনষ্ট হয়। তাদের চেতন মন তখন সুপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং অবচেতন মন কার্যকরী হয়ে উঠে। রোগী তখন জাগ্রত ও সুপ্ত অবস্থার মাঝামাঝি একটি বিশেষ অবস্থায় উপনীত হয়। এরূপ অবস্থায় সে মাত্র আদেশকারীর পরিচিত স্বরই শুনতে পায়।

ঐরূপ অবস্থায় আদেশকারী-দুর্বৃত্ত রোগীকে অপকর্মে নিযুক্ত করে। রোগী তখন অর্ধসুপ্ত ও মোহাবিষ্ট অবস্থায় দাঁড়িয়ে উঠে এবং খুন প্রভৃতি বহুবিধ অপকর্ম আদেশকারীর আদেশ মত করে যায়। সুস্থ অবস্থায় স্বকৃত কর্ম ও অপকর্মের কোনও কথা তার মনে থাকে না। নিদ্রা ও জাগরণের মাঝামাঝি মোহাবিষ্ট ও রোগগ্রস্থ অবস্থায় তাদের দ্বারা এই সব কাজ করান হয়। তাঁদের মতে এই সব পরীক্ষার জন্য এই বিশেষ মনোবিকারগ্রস্থ রোগীদের বেছে নেওয়া হয়। তাঁরা এ'কথাও বলেন যে, এই সকল রোগী মোহাবিষ্ট অবস্থায় আদেশকারীর যুক্তিপূর্ণ কথাগুলি মেনে নিলেও অন্যায় ও অমনোনীত কথাগুলি কখনও মানে না। এরূপ অবস্থায় হঠাৎ তারা অবাধ্য হয় এবং তাদের চেতনা ফিরে আসে। এইজন্য এই সব ব্যাপারে আদেশকারীর কিছুমাত্র বাহাদুরি নাই। তাঁরা স্বীকার করেন যে রোগীর রোগই তাদের এরূপ দুরবস্থার জন্য দায়ী। দুর্বৃত্তরা এই সব রোগীর রোগের সুযোগ নেয় মাত্র। তাঁদের মতে সুস্থমনা নীরোগ ব্যক্তিদের এই ভাবে মোহাবিষ্ট করা যায় না। এরূপ সম্ভব হলে সমাজে বাস করা অসম্ভব হ'ত। তা ছাড়া এই ধরণের রোগীর সংখ্যাও সমাজে কম থাকে এবং যে কয়টি থাকে তারা কদাচিৎ দুর্বৃত্তদের হাতে পড়ে। তারা দুর্বৃত্তদের কবলে পড়লেও সব সময়েই তাদের আয়ত্তে আনা যায় না। কারণ সকল সময়ই তাদের মন ঐরূপ দুর্বল বা রোগগ্রস্থ হয় না।

"কোন লোক রাত্রে পাইপ বেয়ে নেমে অন্যের বাড়ীতে খড়া বেয়ে উঠে খুন

করে পরে ঐ ভাবে নিজ কক্ষে ফিরে এলে তার পূর্ব অপরাধ সে স্মরণ করতে পারে নি। কারও বা মাত্র দিনের দুপুরে ঐরূপ প্রবৃত্তি এসেছে। তখন সে বাটীর তালা ভেঙে অপরাধ করে ফিরে এলে উহা তার মনে থাকে নি।”

বলা বাহুল্য যে, এরূপ মতবাদের কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। মোহাবিষ্ট অবস্থায় অপরের আদেশে অনিচ্ছাকৃত অপরাধ করার যে সব চাঞ্চল্যকর কাহিনী সচরাচর আমরা শুনতে পাই তা প্রায়শঃই অলীক ও মিথ্যা। আমি মনে করি যে, মানুষ এরূপ অবস্থায় কখনও উপনীত হয় না এবং ঐ সম্বন্ধে যে সকল কাহিনী শুনা যায় তার সব কয়টিই জাল-জুয়াচুরি মাত্র। অপরাধীরাও আইনকে ফাঁকি দিবার জন্য এই সব কাহিনীর অবতারণা করে। বহু অনুসন্ধানের পর আমি এই বিশেষ সত্যে উপনীত হয়েছি। তবে উপরোক্ত রূপে সম্মোহিত না করা গেলেও মানুষকে স্বাভাবিক ভাবে যে প্রভাবিত করা সম্ভব তা ইতিপূর্বেই উহার কার্যকারণ সহ আমি বিশদ ব্যাখ্যা করেছি।

এদেশে কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে ঘুমন্ত অবস্থায় নিজের অজ্ঞাতে মানুষ অপরাধ করতে সক্ষম। এঁরা বলেন যে মানুষের চেতন মনেই প্রতিরোধ-শক্তি অধিক থাকে। ঘুমন্ত অবস্থায় অবচেতন মনে উহা অধিক কার্যকরী হয় না। জাগ্রত অবস্থায় মানুষের মনে বহুবিধ কদর্য ইচ্ছা আসে। কিন্তু চেতন মনের প্রতিরোধ-শক্তি এই সব অন্যায় ইচ্ছা দমন করে। ঘুমন্ত অবস্থায় এই সব কু-ইচ্ছা দানা বাঁধলে ঐ সময় স্নায়ুর শক্তি ক্ষীণ থাকায় এই সবইচ্ছা কার্যকরী হয়। এঁদের মতে এমন অনেক রোগ আছে যার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মানুষ ঘুমন্ত অবস্থায় মোহাবিষ্টের ন্যায় চলাফেরা করে। ঐ সময় তারা নানা প্রকার কথা বলে ও অপকার্য করে। মনের সুপ্ত ইচ্ছা অদমনীয় হয়ে কার্যকরী হয়ে উঠলে সুপ্ত ও মোহাবিষ্ট অবস্থায় মানুষ অনেক সময় খুনও করে ফেলে। কেউ কেউ এ কথাও বলে থাকেন যে জাগৃঘুম [ইনসমবেলিস্‌ম্] অবস্থায় বহু মন-রোগী মানুষ অপরাধ সমূহ করে।

এই সকল বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান করে জেনেছি যে, উপরোক্ত মনস্তাত্বিক ব্যাখ্যাসমূহ একান্তরূপেই মিথ্যা, ভুল ও অসৎ উদ্দেশ্যপূর্ণ। দুঃখের বিষয় যে সকল তথ্য ও তত্ব পাশ্চাত্য দেশে শিশুরাও আজ হেসে উড়িয়ে দেয় তা এই সত্যান্বেষী উপনিষদকারের দেশের বহু ব্যক্তি আজও বিশ্বাস করে। অনেকের ধারণা আছে যে এদেশে এমন বহু সাধু-সন্ন্যাসী ঐরূপ এক ঐশ্বরিক

ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু বহু অনুসন্ধান দ্বারা আমি অবগত হয়েছি যে, ইহা একান্ত রূপেই অসৎ উদ্দেশ্যে মিথ্যা মাত্র।

এতদ্ব্যতীত পৃথিবীতে আরও বহু প্রকার অপরাধ-রোগী আছে। এদের অপরাধ-রোগী এবং নীরোগ-অপরাধীদের মধ্যবর্তী অপরাধী বলা যেতে পারে। অর্থাৎ এদের অপরাধ রোগী বলা না গেলেও সঠিকভাবে নীরোগ-অপরাধীও বলা চলে না। এজন্য এদের আমি অপরাধী এবং নিরপরাধীদের মধ্যবর্তী অপরাধী বলেছি। এরা একপ্রকার রঙ্গিলা আবেশের [Romance] মধ্যে পড়ে অপরাধ করেছে। এ সম্পর্কে নিম্নের বিবৃতিটি থেকে বক্তব্য বিষয়টি বুঝা যাবে।

"ধরুন আমি চল্লিশজন ডাকাতের সর্দাররূপে একটি ধনী ব্যক্তির প্রাসাদ-দুর্গ আক্রমণ করেছি। আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণের পর বাধা প্রদানকারীদের পর্যুদস্ত করে ঐ প্রাসাদের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছি। শিশুরা ভীত হয়ে ক্রন্দন শুরু করেছে এবং কুলনারীরা আমাদের ভয়ে কম্পমান। অন্যদিকে পুরুষেরা নতজানু হয়ে আমার সম্মুখে প্রাণভিক্ষার্থী। আমি তাদের মধ্যে উন্নত বক্ষে বিজয়ী বীরের মত দাঁড়িয়ে রয়েছি। এর চেয়ে বড় রোমান্স আপনারা আর কি কল্পনা করতে পারেন! বস্তুতঃপক্ষে এইরূপ এক আনন্দ উপভোগ করার জন্যই আমি সৎ উপায়ে উপার্জিত অর্থ দ্বারা ডাকাত দলের সৃষ্টি করে বারে বারে এই সকল ডাকাতি সূচক অপরাধ করেছি।"

ভুল পথে চিন্তাধারা প্রবাহিত হওয়ার জন্য বহু প্রকার মনোবিকারের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এরূপ অপরাধীর সন্ধান সুদীর্ঘ কর্ম-জীবনে আমি বহু জনের মধ্যেই পেয়েছি। দুঃখের বিষয় এই যে, এদের চিকিৎসার কোনও সুবন্দোবস্ত এদেশে করা হয় নি। এই সকল রোগের প্রতিষেধক সম্বন্ধে আজও কেহ চিন্তা করে না।

কোনও অপরাধীকে অপরাধ-রোগীরূপে বুঝলে পুলিশের উচিত ঐ বিষয়ে মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত এবং চিকিৎসকদের সহিত পরামর্শ করা। য়ুরোপ এবং আমেরিকায় বহু রাষ্ট্র আছে যেখানে য়ুনিভারসিটির প্রফেসাররা পুলিশকে এ বিষয়ে প্রায়ই পরামর্শ দেন। সেই সকল দেশে পুলিশ ঐ বিষয়ে তাঁদের সহিত একান্তরূপে সহযোগিতা করে থাকেন।

[উপরে বলা হয়েছে যে অপস্পৃহার আগমনের কারণেই মানুষ অপরাধ করে। যে সকল মানুষের মধ্যে এই অপস্পৃহা অবস্থান করে তাদের আমরা

অপরাধী বলি। এই অপস্পৃহা কোনও কোনও মানুষ অভ্যাস দ্বারা লাভ করে, কেউ কেউ আবার উহা তাদের জন্মের সঙ্গে লাভ করে থাকে। এই সকল অপরাধীদের আমরা নীরোগ-অপরাধী বলে থাকি। উৎকট নীরোগ-অপরাধীরা তাদের অপরাধের জন্য কখনও অনুতপ্ত হওয়া প্রয়োজন মনে করে না, বরং উহার জন্য তারা প্রায়ই গর্ব অনুভব করে থাকে।

কিন্তু এই নীরোগ-অপরাধীদের ন্যায় অপরাধ-রোগীদের প্রকৃতপক্ষে অপরাধী বলা যায় না। ইহার কারণ নীরোগ-অপরাধীদের ন্যায় তাদের অপরাধসমূহ ইচ্ছাকৃত হয় না। তারা বিভিন্ন প্রকার স্নায়বিক রোগের কারণে অপরাধ করতে বাধ্য হয়। এই সকল অপরাধীকে এজন্য আমরা অপরাধ-রোগী বলে থাকি। অপরাধ রোগীরা তাদের অপরাধ সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া মাত্র অত্যন্ত লজ্জিত এবং অনুতপ্ত হয়ে উঠে। স্নায়বিক এবং মানসিক রোগ ব্যতীত ক্রোধ প্রভৃতি রিপুও মানুষকে অপরাধ-রোগীতে পরিণত করে দিতে পারে। এই ক্রোধোন্মত্ত মানুষ সহজ মানুষের ন্যায় সকল সময় সকলের ক্ষতিও করতে পারে না। কারণ তারা তখন অসহায় বিচার বুদ্ধিবিহীন রোগীতে পরিণত হয়ে পড়ে। এজন্য এ সকল ব্যক্তিকেও আমরা সর্বতোভাবে অপরাধ-রোগী বলে থাকি।

[এই কারণে যার উপর রাগ করা যায়, তার যত ক্ষতি হয় তার চেয়ে বেশি ক্ষতি হয় যে রাগ করে তার। মানুষ ক্রোধোন্মত্ত হওয়া মাত্র তার দেহের রক্ত সমাবেশ সমূহে আমূল পরিবর্তন ঘটে। ফলে সে মৃত্যু পথে আরও কিছুটা অকারণে এগিয়ে আসে। এজন্য পণ্ডিতগণ বলেছেন যে রাগের ভান করো, কিন্তু কদাচ তোমরা রাগ করো না।]

অপরাধ রোগীদের দৃষ্টান্তস্বরূপ বিপ্লবী গোপীনাথের টেগার্ট হত্যার চেষ্টার বিষয় উল্লেখ্য। উনি কলিকাতার পুলিশের কমিশনর চার্লস টের্গাটের পরিবর্তে চৌরঙ্গীর ফুটপাতে জনৈক সাধারণ ইংরাজ ভদ্রলোককে হত্যা করে-ছিলেন। তাঁর তৎকালীন বিবৃতির কিছুটা অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"আমি সারারাত ঐ তারিখে ঘুমাতে পারিনি। টেগার্ট সাহেবকে হত্যা করা আমার তখন একমাত্র চিন্তা। প্রত্যুষে কে যেন আমাকে টেনে বাটীর বার করে দিল। আমি চৌরঙ্গীর ফুটপাত ধরে চলা কালে হঠাৎ ঐ ইংরাজকে দেখে মনে হলো উনি টেগার্ট সাহেব। উহা আমার মনে উদয় হওয়া মাত্র তাকে আমি গুলি করলাম। মোটর বিহারী টেগার্ট সাহেবের অতো ভোরে ফুটপাত ধরে

একাকী চলা নিশ্চয় সম্ভব নয়। তদুপরী আমি স্যার চার্লস টেগার্টকে ইতিপূর্বে বহুবার মোটরে অন্য পথে [কিড্ স্ট্রীট] যেতে দেখেছি। আমার মস্তিষ্ক তখন এমন বিকৃত যে ঐ সব বিষয় আমার মনে এলো না।"

প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, এবং অতি ধর্ম ও জাতিত্ববোধ হতেও বহু মনো-রোগের উদ্ভব হয়েছে। উহার উগ্রতা সূক্ষ্ম স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্থ করে সুকুমার বৃত্তিগুলিকে বিলুপ্ত করে। উহা তখন মানুষকে মনোরোগী বা উন্মাদ করে তুলে। সেই সময় এদেরকে নির্দয় হিংস্র পশুতে পরিণত হতে দেখা যায়। এরা তখন ভুলে যায় যে: 'শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই।' আমার মতে এইগুলিও চিকিৎসা-যোগ্য মনোরোগ বিশেষ। কোনও এক তরুণ কাশীতে মসজিদে বিশ্বনাথ মন্দিরের চিত্রিত প্রস্তর উপাদান দৃষ্টে সাম্প্রদায়িক হলে তার চিকিৎসার্থে আমি বলেছিলাম। উনি এক দেবতার মন্দির ভেঙে ওখানে একই ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। অর্থাৎ ওখানে নাচ ঘর না করে অন্য উপাসনালয় তৈরী করেছেন। কিন্তু—৪০০ বৎসর পর ঔরঙ্গজেবের ব্যক্তিগত ভুলের জন্য অন্য নিরীহ মুস্লীম বন্ধুদের প্রতি বিরূপ হওয়া বাতুলতা হবে।

"উদর-স্ফীতি রোগী জনৈক যন্ত্রণা কাতর সাম্প্রদায়িক কর্মী হাসপাতালে বিকারের ঝোঁকে বলেছিল: শীঘ্র অমূক প্রসাদ বাবুকে খবর দাও। আমি ছয়জন বিধর্মীকে ভক্ষণ করেছি। উনি যেন ওদের মধ্য থেকে দুজনকে বার করে নেন। মৃত্যুকালেও ঐ তরুণ কর্মী সাম্প্রদায়িক বিষের জ্বালায় জ্বলে কষ্ট পেয়েছিল।"

নেতৃবর্গের মধ্যেও বহু বিকৃতমনা কিংবা প্রকৃত উন্মাদ থাকেন। কিন্তু বাইরে থেকে ওদেরকে উন্মাদরূপে বুঝা যায় না। রাজনৈতিক ব্যর্থতা ও হতাশা কারও মধ্যে উন্মাদনা, প্রতিশোধ-স্পৃহা ও অপরাধ স্পৃহা এনেছে। জনগণকে লোভাতুর ও উত্তেজিত করে এরা স্বদেশের প্রভূত ক্ষতি করেছে। এদেরকে জেলে না পাঠিয়ে চিকিৎসার্থে উন্মাদাগারে পাঠানো উচিত। বহুক্ষেত্রে একটা কিছু না করলে এঁরা অনিদ্র রাত্রি যাপন করেন। সাম্প্রদায়িক কিংবা রাজনৈতিক মতবাদে প্রতিক্ষণে এদের মন জর্জ্জরিত ও অশান্ত থাকে।

লণ্ডনের বৃহত্তম মহাদাঙ্গা [১৮২২] লর্ড গর্ডনের নেতৃত্বে সমাধা হয়। এতে কয়েক হাজার লোক খুন বা জখম হয়েছিল। কিন্তু পরে প্রমাণিত হয় যে ঐ সময় উনি পুরাপুরি একজন উন্মাদ ছিলেন। কিন্তু বাইরে থেকে না বুঝে জনগণ তাঁর দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছিল।

[নেতৃবর্গের কাউকে কাউকে মধ্যে মধ্যে ডাক্তারদের দ্বারা পরীক্ষা করানো উচিত। ওদের কারও মধ্যে দাম্ভিকতা সহ নিষ্ঠুরতা দেখলে বুঝা যাবে তাঁরা অপরাধরোগী হবেন এবং অন্যকে অপকর্ম করতে প্ররোচনা দেবেন। এইরূপ ক্ষেত্রে এরা প্রায়ই আত্মধ্বংসী রাজনৈতিক আহবে মত্ত হয়ে থাকেন।]

॥ নবম অধ্যায় ॥

অপরাধ-বিভাগ

অপরাধ'কে বুঝতে হলে ওদেরকে শ্রেণী ও উপশ্রেণীতে বিভক্ত করতে হবে। সুদূর প্রসারিত শ্রেণী বিভাগ পৃথিবীতে আজও অজ্ঞাত। ওদের চিকিৎসার্থে এবং অপরাধ-নির্ণয় ও অপরাধ-নিরোধে' উহার প্রয়োজন সর্বাধিক। অপরাধীদের অপকর্ম্মসমূহ মূলতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়, যথা ঃ ব্যবহারিক ও মনস্তাত্বিক। ব্যবহারিক বিভাগ বাহিরের এবং মনস্তাত্বিক বিভাগ অন্তরের বিষয়। প্রথমটিতে দেহ মনকে এবং দ্বিতীয়টিতে মন দেহকে চালায়। অর্থাৎ— উহাদের একটি ওদের শিক্ষা দীক্ষা ও অভ্যাস দ্বারা বহির্জাত এবং অন্যটি তাদের অন্তর হতে মনস্তাত্বিক কারণে আগত। উহারা ব্যবহারে বা অ-ব্যবহারে বাড়ে বা কমে। অপরাধ তদন্তার্থে ব্যবহারিক বিভাগ এবং ওদের চিকিৎসার্থে মনস্তাত্বিক বিভাজনের প্রয়োজন। প্রথমে মনস্তাত্বিক বিভাগ এবং পরে ওদের ব্যবহারিক বিভাগ বিবৃত করবো।

মনস্তাত্বিক বিভাগ সার্থক জিজ্ঞাসা-বাদের [Interrogation] সহায়ক। ওদের চরিত্র ভেদে ওদের সহিত পৃথক পৃথক অচারণ করা বিধেয়। যাহা এক শ্রেণীর উপর প্রযোজ্য তাহা অন্য শ্রেণীর উপর প্রযোজ্য নয়। উহাতে ফল বিপরীত হয়ে থাকে। শ্রেণী বিভাগ ব্যতীত ওদের নিরাময়ার্থে চিকিৎসাও করা যায় না। এক এক শ্রেণীর অপরাধীদের এক এক প্রকার চিকিৎসার রীতি। এই জন্য আমি ওদেরকে সুদূর প্রসারী শ্রেণী ও উপশ্রেণীতে বিভক্ত করেছি। অপরাধের এইরূপ সুদূর প্রসারী শ্রেণী বিভাগ পৃথিবীতে এই প্রথম।
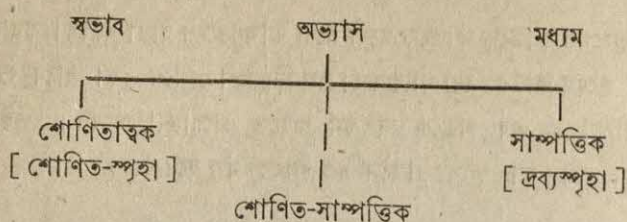
অপরাধীদের প্রথম বিভাগটি ওদের অপস্পৃহার মাত্রা মত করা হয়েছে। স্বভাব, মধ্যম ও অভ্যাস অপরাধীদের মধ্যে অপস্পৃহা যথাক্রমে অতি মাত্রায়, মধ্য মাত্রায় এবং কম মাত্রায় থাকে। উহা তারা ব্যাবহার বা অ-ব্যবহার দ্বারা বাড়াতে বা কমাতে পারে। অন্যদিকে—ওদের উপশ্রেণী ওদের অপঃ-স্পৃহার গুণানুযায়ী করা হয়েছে। অপঃস্পৃহা উহার গুণানুযায়ী দুইটি উপাংশে [Component parts] বিভক্ত। যথা—দ্রব্য-স্পৃহা ও শোনিত-স্পৃহা। [পূর্ব পৃঃ দ্রঃ] স্বভাব, অভ্যাস, মাধ্যম আদি প্রত্যেক অপরাধী ওই দুইটি মূল উপশ্রেণীতে বিভক্ত, যথা ঃ শোনিতাত্বক এবং সাম্পত্তিক।

দ্রব্য স্পৃহা হতে উদ্ভূত অপরাধীকে সাম্পত্তিক অপরাধী এবং শোনিতস্পৃহা হতে উদ্ভূত অপরাধীকে শোনিতাত্বক অপরাধী বলা হয়। অর্থাৎ—প্রথমোক্ত অপরাধীরা সম্পত্তির বিরুদ্ধে এবং দ্বিতীয়োক্ত অপরাধীরা ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপকর্ম করে।

[কিন্তু উভয় অপরাধীর মধ্যবর্তী শোনিত-সাম্পত্তিক অপরাধীরও অস্তিত্ব আছে। ডাকাত অপরাধীরা একই সঙ্গে সম্পত্তি ও ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে। এরা অবশ্য প্রায়ই প্রাথমিক তথা প্রথম পর্যায়ের অপরাধী। প্রকৃত অপরাধী তথা শেষ পর্যায়ের অপরাধীরা প্রায়ই দুইটি পৃথক বিভাগে বিভক্ত, যথা ঃ সাম্পত্তিক ও শোনিতাত্বক অপরাধী। এই স্পৃহাদ্বয় জন্মসূত্রে প্রাপ্ত হলেও অভ্যাস দ্বারা ওদের বাড়ানো বা কমানো কিংবা একত্রিত করা সম্ভব।]

বিঃ দ্রঃ—শোনিতস্পৃহা এবং দ্রব্য-স্পৃহা ঃ এই উভয় স্পৃহা মানুষের মধ্যে জাগ্রত তথা ডমিনেন্ট কিংবা সুপ্ত তথা রিসেসিভ অবস্থায় আছে। কোনও মানুষে উহার একটি বা অন্যটি আগত হলেও প্রতিটি ক্ষেত্রে উহা চেতন মনে না থেকে উহা তাদের অবচেতন মনে থাকে। সেই ক্ষেত্রে ঐ বৃত্তি দ্বয়ের একটি বা অপরটিকে কার্যকরণ বা অভ্যাস দ্বারা অবচেতন মন থেকে চেতন মনে আনা হয়। উহাদের একটি বা অপরটি অবচেতন মন থেকে চেতন

মনে আসার পর মাত্র উহা কার্যকরী হবে। উহারা পরিবেশ বা চেষ্টা দ্বারা চেতন মনে এলে উহাকে ব্যবহার বা অপব্যবহার দ্বারা বাড়ানো বা কমানো হয়েছে।

[উপরোক্ত উপশ্রেণীর প্রত্যেকটি অপরাধীকেই পূর্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত কারণে প্রাথমিক ও শেষ পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। ওদের এই পর্যায় দুইটি প্রত্যেক উপশ্রেণীর অপরাধীর উপর পূর্বোক্ত কারণে সমভাবে প্রযোজ্য। ওদের প্রত্যেকে প্রথমে প্রাথমিক তথা প্রথম পর্যায়ের ও পরে প্রকৃত তথা শেষ পর্যায়ের অপরাধী হয়। অপস্পৃহার পরিমাণ মত প্রথম অবস্থা হতে শেষ অবস্থায় আসতে ওরা কম বা বেশী সময় নেয়]

[ডাকাতি আদি প্রাথমিক অপরাধীদের দ্বারা কৃত অপরাধে স্বাধারণতঃ পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি যুক্ত থাকে। এরা একাধারে বস্তুর ও ব্যক্তির বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ করে। তজ্জন্য এদেরকে শোনিত-সাম্পত্তিক 'সবল অপরাধী' বলা হয়।

এদের কেহ কেবলমাত্র সবল সাম্পত্তিক-অপরাধী রূপে শুধু সম্পত্তি আহরণে অধিক ব্যস্ত। কোনও জন একই সঙ্গে সবল শোণিত-সাম্পত্তিক অপরাধী রূপে আঘাত হানে ও দ্রব্যাদি লুঠ করে। এদের কেহ মাত্র সবল শোণিতাত্বক অপরাধী রূপে খুন জখম করে।

ওদের কেহ কেহ নারীর উপর যৌনজ অপকর্ম করে। যারা নারীর উপর অত্যাচারী, তাদের সম্পত্তির উপর ঝোঁক থাকে না। হিংসা বৃত্তি এবং কাম বৃত্তি ও চৌর্য স্পৃহা প্রায়ই এক সঙ্গে আসে না। কিন্তু এরা অধিকাংশ প্রাথমিক তথা প্রথম পর্যাযের অপরাধী হওয়ায় এর ব্যতিক্রম হয়ে থাকে।

(১) সবল শোণিতাত্বক অপরাধীদের মধ্যে যারা বিনা প্রয়োজনে বল প্রকাশ করে, তারা বলদা অপরাধী এবং ওদের মধ্যে যারা মাত্র প্রয়োজনে বল প্রকাশী তারা ফলদা অপরাধী]

সবল সাম্পত্তিক অপরাধীকেও ওইভাবে দুইটি উপবিভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা: বিঘ্নদা ও অবিঘ্না। যে সকল বারগ্লার তথা সিঁদেল চোর দ্বিবাল ও দুয়ার ভাঙাকালে বিপাকে পড়েও মানুষকে আঘাত হানে না তাদেরকে অপরাধ বিজ্ঞানে সবল সাম্পত্তিক অবিঘ্না অপরাধী বলা হয়ে থাকে। ওদের মধ্যে প্রয়োজনে মানুষকে আঘাতকারীকে বলা হয় বিঘ্নদা সবল সাম্পত্তিক অপরাধী। নিম্নের তালিকা থেকে বক্তব্য বিষয় বুঝা যাবে।

এখানে উল্লেখ্য এই যে উপরোক্ত স্পৃহাদ্বয় [দ্রব্য ও শোণিত] মানুষের

মধ্যে এ্যাকটিভ তথা সক্রিয় কিংবা প্যাসিভ তথা নিষ্ক্রিয়ভাবে উপগত হতে পারে। যৌনজ এবং অা-যৌনজ উভয়বিধ অপরাধ সম্পর্কে এই মতবাদ প্রযোজ্য।

"বলাৎকার দ্বারা মানুষ সক্রিয়ভাবে শোণিত পান করে। এক্ষেত্রে ওদের যৌন প্রবৃত্তি শোণিত স্পৃহার দ্বারা বাহিত। তজ্জন্য বলাৎকার অপরাধে ধর্ষণের সঙ্গে দংশনও দেখা যায়। কিছু ব্যক্তির [নারীকে] বেত্রাঘাত দ্বারা রক্ত দংশন করার পর যৌন স্পৃহা সক্রিয় হয়। উগ্র শোনিতাত্বক অপরাধীরা নারীকে হত্যা করে দেহ উত্তপ্ত থাকতে থাকতে ধর্ষণ করে। নারীদের উপর মধ্য যুগীয় উৎপীড়ন মানুষের শোণিত স্পৃহার জন্য হয়। রেপাইন বারগ্লারগণ দুয়ার ভেঙে ঘরে ঢুকে একাকিনী নারীকে প্রহারে অচৈতন্য করে ধর্ষণ করে"। [খুনীরা বারে বারে এজন্য হত্যাস্থলে ফিরে আসে।]

বলাৎকারাদি সবল অপরাধসমূহ এ্যাকটিভ তথা সক্রিয় ভাবে সমাধা হয়। কিন্তু ঐরূপ এ্যাকটিভ তথা সক্রিয় শোণিতাত্বক অপরাধের মত প্যাসিভ তথা নির্বল নিষ্ক্রিয় শোনিতাত্বক অপরাধীরাও আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্যাভিচারাদি যৌনজ অপরাধ সম্বন্ধে বলা যায়। এ ক্ষেত্রে মানুষ নিষ্ক্রিয় তথা প্যাসিভভাবে শোনিত পান করে।

হত্যা প্রভৃতি বলপ্রযোগী-অপরাধীরা এ্যাকটিভ ভাবে এবং বিষ প্রয়োগ আদি অ-বল প্রয়োগী অপরাধীরা প্যাসিভ তথা নিষ্ক্রিয়ভাবে শোণিত পান করে। প্রত্যেক ক্ষতিকর কার্যের মধ্যে অপরাধীদের এই শোণিত স্পৃহা কার্যকরী হয়। এই জন্য নির্বলভাবে করা হলেও চুরি ও প্রবঞ্চনা দ্বারা অন্যের ক্ষতি করা বা তাকে কষ্ট দেওয়ার মধ্যেও এই প্যাসিভ বা নিষ্ক্রিয় শোণিত পান তথা নিষ্ঠুরতা কম বেশী থাকে।

[প্রতীত হয় যে, দ্রব্য স্পৃহার মধ্যে প্যাসিভ তথা নিষ্ক্রিয় নিষ্ঠুরতা বেশী এবং শোণিত স্পৃহার মধ্যে এ্যাকটিভ তথা সক্রিয় নিষ্ঠুরতা বেশী আছে। মানুষের এই নিষ্ঠুরতা শোণিত পান স্পৃহার তরলীকৃত তথা ডাইলিউটেড্ অংশ। আদি যুগে বলপ্রকাশ ও তৎদ্বারা দ্রব্য ও নারী সংগ্রহের রীতি ছিল। সমাজ গঠনের পর উহাতে সঙ্ঘবদ্ধভাবে বাধা এলে গোপনে বিবিধ অপকর্ম করা হতো।]

বিঃ দ্রঃ—এখানে শোণিত পানের' মত শোণিত দানের বিষয়ও উল্লেখ্য। যুদ্ধে সৈনিকরা শোণিত দান এবং পান উভয়ই করে। ব্যাভিচারে পুরুষ শোণিত পান এবং নারীরা শোণিত দান করে। জুয়াড়ীদের জয়ীরা শোণিত পান এবং উহাতে পরাজিতরা শোণিত দান করে।

এই সকল বিষয় চেতন বা অবচেতন মনের সাথী। উহারা জাগ্রত তথা ডমিনেণ্ট ও সুপ্ত তথা রিসেসিভ কিংবা সক্রিয় তথা এ্যাকটিভ ও নিষ্ক্রিয় তথা প্যাসিভরূপে প্রকাশ পায়।

উপরোক্ত ব্যাখ্যাসমূহ হতে বুঝা যাবে যে, ঐ সকল অপরাধের প্রত্যেকটি 'বলপ্রয়োগী সবল অপরাধীরা' বল প্রয়োগে, এবং অ-বল প্রয়োগী নির্বল অপরাধীরা' বিনা বল প্রয়োগে সমাধা করে। [নির্বল অর্থে দুর্বল নহে] এই সকল বিষয় বিবেচনা করে নিম্নোক্তরূপে ওদের অন্যপ্রকার শ্রেণী ও উপশ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে।

[উপরোক্ত প্রত্যেক অপরাধ বল প্রয়োগে কিংবা বিনা বল-প্রয়োগে সমাধা হয়েছে। এজন্য উহাদের যথাক্রমে বলপ্রয়োগী ও অ-বল প্রয়োগী বলা হয়।]

(১) বলপ্রয়োগী : বলপ্রয়োগী অপরাধীদের সবল অপরাধী বলা হয়। কেহ বস্তুর বিরুদ্ধে যথা, তালা ভাঙা, বগলী সিঁধ প্রভৃতি সাম্পত্তিক অপরাধ করে। কেহ খুন জখম আদি ব্যক্তির বিরুদ্ধে শোনিতাত্মক অপরাধ করে। ব্যক্তি বা বস্তু যারই বিরুদ্ধে হোক না কেন, এখানে উভয় ক্ষেত্রেই বল প্রয়োগের প্রশ্ন থাকে।

শোনিতাত্মক সবল অপরাধীদের দুইটি উপরিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা : যৌনজ ও অযৌনজ [সেক্সুয়েল ও আ-সেক্সুয়েল) যারা খুন জখম করে তাদের 'সবল অযৌনজ শোনিতাত্মক অপরাধী' এবং যারা বলাৎকার তথা ধর্ষণাদি করে তারা সবল যৌনজ শোনিতাত্মক অপরাধী।
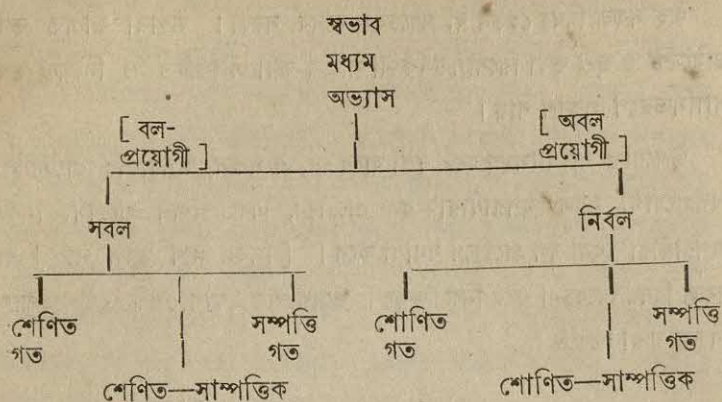
উপরোক্ত তালিকাটি হতে প্রতীয়মান হবে যে, অপরাধী মাত্রেই—তা সে স্বভাব অপরাধী, বা অভ্যাস-অপরাধী, যে কোনও অপরাধীই হোক, তারা প্রধান দুটি উপরিভাগে বিভক্ত। যথাঃ—সবল এবং নির্বল। যে সকল অপরাধ ব্যক্তি বা বস্তুর বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, সেই সকল অপরাধকে [সমভাবে] সবল অপরাধ বলা হয়, যেমন—রাহাজানি, খুন, জখম, বলাৎকার, সিঁদমারী ডাকাতি প্রভৃতি। খুন প্রভৃতি অপকর্মে মাত্র ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধীরা বল প্রকাশ করেছে। যে সকল অপরাধ দরজা ভেঙ্গে বা সিঁদ কেটে বস্তুর বিরুদ্ধে বল-প্রয়োগের দ্বারা সাধিত হয়, সেই সকল অপরাধও খুনের মত সবল অপরাধের পর্যায়ভুক্ত। এখানে অপরাধীরা দ্বিবাল, দরজা, বাক্স প্রভৃতি বস্তুর বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করে। এই কারণে সিঁদেল চুরি, তালা-ভাঙ্গা প্রভৃতি সবল চৌর্য অপরাধও সবল অপরাধ।

কোনও এক অপরাধের জন্য কম-বেশি দৈহিক বলের প্রয়োজন হলে উহাদের সবল অপরাধ বলা হবে। প্রথম ক্ষেত্রে বল প্রয়োগ করা হয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বল প্রয়োগ করা হয় বস্তুর বিরুদ্ধে—উভয় ক্ষেত্রেই বল প্রয়োগ করা হয়। এইজন্য উভয় অপরাধকেই বলা হয় সবল অপরাধ। অন্য দিকে সহজ-চৌর্য, বিষপ্রয়োগ, অগ্নিপ্রদান ও ব্যাভিচার প্রভৃতি দুষ্কার্য, যা ব্যক্তি বা বস্তুর বিরুদ্ধে গোপনে এবং বিনা বলপ্রয়োগে সাধিত, সেই সকল অপরাধকে আমরা নির্বল যৌনজ বা অ-যৌনজ অপরাধ বলি।

[অপরাধের এই সকল বিভাগ এবং উপবিভাগ সম্পর্কে-স্মরণ রাখতে হবে যে এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত উহাদের এই প্রত্যেকটি শ্রেণীর বা উপশ্রেণীর অপরাধীদের তাদের প্রাথমিক এবং শেষ পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। এজন্য এরা পরিশেষে প্রত্যেকে প্রাথমিক ও প্রকৃত অপ-রাধীতে বিভক্ত হয়ে থাকে।]

এই সকল অপরাধীদের বিভিন্ন প্রকারের স্বভাব-চরিত্র অনুধাবন করে আমি এ'ও দেখেছি যে, উহাদের বৃত্তিসমূহের মধ্যে যেগুলি সুপ্রাচীন কালে অর্জিত হয়েছে, তাহাদের স্থায়িত্ব-ক্ষণ বেশি এবং উহাদের মধ্যে যেগুলি কিছুটা সাম্প্রতিক তাহাদের স্থায়িত্ব-ক্ষণ অনেক কম। তদতিরিক্ত—মানুষের যে বৃত্তিটি যত পুরাতন তার শক্তি ওদের পরবর্তীকালে অর্জিত বৃত্তিগুলি অপেক্ষা বেশি হয়। এজন্য অপরাধ স্পৃহা অপেক্ষা যৌন স্পৃহার এবং সৎ প্রেরণার অপেক্ষা অপরাধ স্পৃহার শক্তি বেশি হয়ে থাকে।

অপরাধীদের উপরোক্ত শ্রেণী বিভাগ হতে বুঝা যাবে যে, যারা খুন করে তারা তালাও ভেঙে থাকে এবং যারা তালা ভাঙ্গে তারা কদাচিৎ খুনও করতে পারে। ইহার কারণ এই যে, এরা উভয়েই সক্রিয় সবল [প্রকৃত] অপরাধী। কিন্তু পিকপকেট প্রবঞ্চক প্রভৃতি [প্রকৃত] নির্বল অপরাধীরা কখনও খুন করে না বা দুয়ার ভেঙ্গে চুরি করে না। অনুরূপ কারণে খুনে বা তালা তোড়রা কখনও পিকপকেট বা প্রবঞ্চনার কার্য করে না। অবশ্য এই মতবাদ কেবলমাত্র প্রকৃত তথা শেষ পর্যায়ের অপরাধীদের সম্পর্কে প্রযোজ্য। ইহা প্রাথমিক অপরাধীদের সম্পর্কে কদাপি প্রযোজ্য নয়।

বিঃ দ্রঃ—খুনে আদি সবল শোণিতাত্বক অপরাধীরা সাধারণতঃ গৃহাদিতে প্রবেশ কালে বা নির্গমন কালে বাধা পেলে মানুষকে আঘাত হানে। অন্যদিকে বারগ্লার আদি সবল সাম্পত্তিক অপরাধীরা সাধারণতঃ গৃহ হতে নিষ্ক্রমণ কালে বাধা পেলে মানুষকে আঘাত হানে। এরা গৃহাদিতে প্রবেশকালে বাধা পেলে কাউকে আঘাত না হেনে ঐ স্থান ত্যাগ করে।

(২) অ'বল প্রয়োগী : অবল-প্রয়োগীদের নির্বল অপরাধী বলা হয়। [নির্বল অর্থে দুর্বল বুঝানো হয় নি।] এই নির্বল অপরাধীরাও সবল তথা বলপ্রয়োগী অপরাধীদের মত শোনিতাত্বক ও সাম্পত্তিক এবং শোণিত-সাম্পত্তিক অপরাধে বিভক্ত।

পকেটমারী প্রবঞ্চনা গৃহভৃত্য চৌর্য আদি [খুনে ভৃত্য বাদে] নির্বল

কাউকে দোষী প্রমাণ করার মত তাদেরকে নির্দোষী প্রমাণ করার মধ্যেও পুলিশ কর্মীদের কৃতিত্ব কম নয়।

কেউ ক্ষমতাদীপ্ত হলে উত্তেজনা আসে এবং তজ্জন্য শোণিত স্পৃহার বহি-বিকাশ ঘটে। তাই রাত্রে শয়ন কালে এঁদেরকে বুঝতে হবে সারা দিনের কার্য কলাপে তাদের মধ্যে কতটা শোনিতস্পৃহা জাত হয়েছে। এরপর তাদের উচিৎ হবে স্ব-বাক প্রয়োগ তথা অটো সাজেসসন দ্বারা তাদের ঐ সঞ্চিত শোণিতস্পৃহা নিষ্কাশন করা। উর্দ্ধতন পুলিশ কর্মীদের পরবাক্ প্রয়োগ তথা আউট সাইড্ সাজেসন, তদারকী ও পরিদর্শন দ্বারা অধীনদের ঐ সঞ্চিত স্পৃহাকে সংযত করা উচিৎ।

[বহুক্ষেত্রে মানুষের কর্মগত উন্নতির স্পৃহা ও অর্থলাভের আকাঙ্ক্ষাও মানুষের শোণিতস্পৃহা বহির্গত করে তাদেরকে নিষ্ঠুর করেছে। ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের উপর উর্দ্ধতন কর্মীদের কঠোর তদারকী এবং নিয়ন্ত্রণ না থাকলে ক্ষমতার অপব্যবহার অবশ্যম্ভাবী হয়। এতে রাষ্ট্রের ক্ষতি অত্যন্ত বেশী হবে। কারণ—পুলিশ ও ম্যাজিষ্ট্রেটদের ভালো বা মন্দ কার্য হতে জনগণ গর্ভমেণ্টকে বিচার করে। ওঁদের মধ্যে কোনও প্রকার চিত্ত প্রস্তুতি তথা প্রি-ডিসপোজিসন থাকা উচিৎ নয়। মিটমাটপন্থী প্রশাসন এবং শুধরানোর সুযোগ দান দ্বারা অপরাধীদের সংখ্যা হ্রাস হয়।]

এখানে উল্লেখ্য এই যে, যারা খুনে তারা কদাচিৎ ডাকাতি ও রাহাজানি অপরাধ করতে পারে। কারণ উভয় অপরাধই সবল অপরাধী। কিন্তু তাদের দ্বারা কখনও বিষপ্রয়োগ আদি নির্বল রাহাজানি বা পকেটমারী আদি নির্বল সাম্পত্তিক অপরাধ সঙ্ঘটিত হবে না। অন্যদিকে—পকেটমার ও গৃহচোর ও ও প্রবঞ্চক'দের দ্বারা কোনও সক্রিয় সবল শোণিতাত্মক বা কোনও সবল সাম্পত্তিক অপরাধ [বারগ্লারী] অপরাধ সঙ্ঘটিত হবে না। জনৈক পিকপকেটের বিরুদ্ধে সবল রাহাজানি অপরাধের নালিশ এলে তদন্তকারী অফিসরের সন্ধিহান হওয়া উচিত।

বিঃ দ্রঃ—জনৈক তালাতোড় সিঁদেল চোরকে পকেটমারীর মামলাতে ধরে আনলে সে ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিল : আরে! হাপনার কেতো দিন নকরী হলো? হামরা গামছা মারি [সিঁদকাটি] আউর চাবির কাম [তালা ভাঙা] করি। হামাদের ওহী সব কাম আছে নাকি? অন্য এক অপরাধী আমার নিকট এই

রূপ একটি উক্তি করেছিল : আমি মশাই কেবিন [জাহাজের] চোর। আমরা তো ডকের চোর নই।

[উৎকোচগ্রাহী উৎপীড়ক সরকারী কর্মচারীদের কু-ব্যবহার দেশে অহেতুক বিদ্রোহ ত্বরান্বিত করে। কষ্টার্জিত কপর্দক ট্যাক্সরূপে প্রদান করে ঐ সকল ব্যক্তিকে বেতন দ্বারা কেউই পুষবে না। কিন্তু চোর তাড়াতে ডাকাত আনাও বাঞ্ছনীয় নয়। উৎকোচ গ্রহণ ব্ল্যাক মেইলের পর্যায়ে উঠলে, আদালতে বিচারের বদলে অবিচারের আধিক্য ঘটলে, ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতার অপব্যবহার শেষ সীমাতে পৌঁছুলে মানুষ চাইবে কোনও অবতার শত্রু বা মিত্র রূপে তাদের রক্ষার্থে অবতীর্ণ হউন।

জনগণের মধ্যে এতে সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় শোনিতাত্মক প্রতিশোধ স্পৃহায় সৃষ্টি হয়। ওদের এই মনোভাব অত্যুগ্র হলে দেশে ভয়ঙ্করী ও আত্মঘাতী বিপ্লব ঘটে। সেই ক্ষেত্রে বিদেশী বন্ধু বা শত্রুকেও জনগণ নিজ দেশে ডেকে আনে। জনগণের মধ্যে জাত মাত্রাহীন সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় শোণিত স্পৃহার গুরুভার হতে ঐরূপ প্রবৃত্তির উদ্ভব হয়। দেশপ্রেমী নেতাদের ইহা বুঝে প্রতিকার প্রয়াসী হওয়া উচিৎ।

প্যাসিভ তথা নিষ্ক্রিয় শোনিত স্পৃহা ভোট দ্বারা গভর্মেণ্টকে উল্টাতে চাইবে। কিন্তু এ্যাকটিভ তথা সক্রিয় শোণিত-স্পৃহা ঐ ক্ষেত্রে রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের সৃষ্টি করবে। [প্রতিশোধার্থে]

[প্রাচীন ভারতীয়রা এই মতবাদ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। তাই অত্যাচারীদের পাপের ভরাপূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করতে জনগণকে উপদেশ দিতেন। তাঁরা এ'ও বলেছেন যে জনগণ হতেই অবতাররূপে অস্ত্রধারী উদ্ধারকারীর আবির্ভাব স্বাভাবিকভাবেই হবে।]

উকিল প্রভৃতি কিছু বৃত্তিধারী পুলিশদের মত অহরহঃ অপরাধীদের সংস্পর্শে আসে। তজ্জন্য কিছু উকিলরে মধ্যে অবস্থা ভেদে অপরাধ-স্পৃহার অংশ বিশেষ দ্রব্য বা শোণিতস্পৃহা জাত হয়। ওঁদের মধ্যে শোণিত স্পৃহা জাত হলে তারা মিথ্যা মামলা তৈরী করে তৃপ্ত হন। ওঁদের মধ্যে দ্রব্যস্পৃহা জাত হলে তারা ধাপ্পা দিয়ে বা ভয় দেখিয়ে মক্কেলদের নিকট হতে নিষ্প্রয়োজনে অর্থ আদায় করেন।

[কিছু উকিল অপরাধীদের পক্ষ সমর্থন করে একটা স্যাডিসটিক পুলক অনুভব করেন। বহুক্ষেত্রে বিনা পারিশ্রমিকে তাদের পক্ষ সমর্থন করে তাঁরা তৃপ্ত

হয়েছেন। কারও কারও সঙ্গে পরামর্শ করে অপরাধীরা অপকর্মে বহির্গত হয় এবং অপকর্মের পর ফিরে এসে পুনরায় তাদের পরামর্শ গ্রহণ করে।

অপরাধীদের মত কিছু উকিলও নিজেদেরকে বিভাজন করেছে। কিছু উকিল মাত্র প্রবঞ্চকদের মামলা করেন। কিছু উকিল ছিনতাইদের মামলা পরিচালনে পারদর্শী। ঐভাবে এক এক দল উকিল এক এক শ্রেণীর অপরাধী-দের মামলা পরিচালনে স্বদক্ষ।

বিঃ দ্রঃ—উকিলের ও পুলিশের এবং বেঞ্চের ও বার [B A R] এর যোগসাজস দেশে নরক তৈরী করে। প্রসিকিউসন কিংবা ডিফেন্সের সঙ্গে যুক্ত হলে উহা সোনায় সোহাগা। তাই জুডিসিয়ারী রক্ষা কবচ হতে হাকিম দের মুক্ত করে তাঁদেরকে ও পুলিশকে কঠোর তদারকীতে আনতে হবে। কারণ কিছু ক্ষেত্রে তারাও লোভাতুর বা প্রভাবিত হতে পারে। একমাত্র ভয়ই বর্তমান কালে প্রতিরোধ শক্তির প্রধান অংশ। অন্যথায় একক বিচার প্রথা বাতিল করে পূর্বকালের মত প্রতিটি বিচারে তিনজন হাকিমকে একত্রে বসতে হবে। অন্যায় বা ভুল বিচার মানুষকে আত্মরক্ষার্থে অসামাজিক করে। কিছু ক্ষেত্রে উহা হতে বিধ্বংসী নকশালী মতবাদও সৃষ্ট হয়।

সাক্ষী-নির্ভর বর্তমান বিচার পদ্ধতিতে অবিচারের সম্ভাবনা বেশী। সরজমীন [প্রকাশ্য ও গোপন] তদন্ত ব্যতিরেকে সত্য নির্দ্ধারণ হয় না। শত জন মিলে অধুনা খুন করা সম্ভব হয়। তাহলে দশ জন মিলে মিথ্যা সাক্ষীও লোকে দিতে পারে। [উচ্চপদী সম্মানী সাক্ষীরাও এর ব্যতিক্রম নয়]

এতক্ষণ মনস্তাত্বিক অপরাধ বিভাগ সম্বন্ধে বলা হলো। এইবার ব্যবহারিক অপরাধ বিভাগ সম্বন্ধে বলা হবে। এই উভয় বিভাগের মূল প্রভেদ সম্বন্ধে এই পরিচ্ছেদের প্রথমে বলা হয়েছে। অপরাধীদের ব্যবহারিক বিভাজন সম্পর্কীত নিম্নোক্ত তালিকাটি হতে বক্তব্য বিষয় বুঝা যাবে।
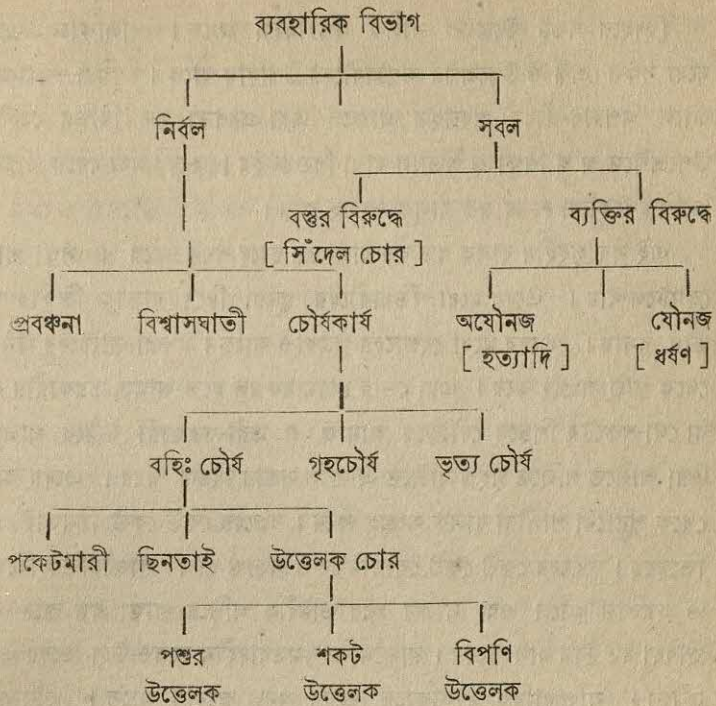
[পশুর, শকট ও বিপণী উত্তেলকদের ইংরাজীতে যথাক্রমে ক্যাটেল, কার্ট ও সপ্ লিফটার বলা হয়।

এখানে মাত্র রক্ষী-গ্রাহ্য তথা কগ্ অফেন্স সমূহের শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে। পুলিশ অগ্রাহ্য [Non Cog) 'স্বল্পাঘাত, গালি দেওয়া, মানহানি, স্বল্প ক্ষতি আদি অপরাধ এখানে বিবেচ্য নয়। ঐগুলি শাস্তিযোগ্য হলেও বিজ্ঞান মতে অন্যায় ও পাপ পদবাচ্য হয়ে থাকে। তবে—উগ্র ক্ষতি যথা গৃহদাহ অপরাধ, ব্যক্তি ও বস্তুর বিরুদ্ধে অপরাধ। উহার দ্বারা বস্তুর ক্ষতি হয় ও ব্যক্তির প্রাণনাশ হয়। তাই উহা নির্বল শোণিত-সাম্পত্তিক-অপরাধ। উপরোক্ত নির্বল অপরাধীদেরও যৌনজ [ব্যাভিচার] ও অযৌনজ অপরাধে বিভক্ত করা যায়। তালিকাতে মাত্র নির্বল অযৌনজ অপরাধ সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

বল প্রয়োগ ব্যক্তির বা বস্তুর বিরুদ্ধে করা হোক না কেন, উভয় ক্ষেত্রে ওদেরকে বলপ্রয়োগী অপরাধী বলা হবে। তাদের কৃত ঐ সকল অপরাধকে সবল-অপরাধ বলা হয়েছে। অন্যদিকে প্রবঞ্চনা চৌর্যকার্য বিশ্বাসঘাতক আদি বিনা বলপ্রয়োগে সমাধা হওয়ায় উহাদেরকে নির্বলী অপরাধী বলা হয়।

[শহরে শকট উত্তোলক বালক অপরাধীরা আছে। বাল্যকালে এদের মধ্যে সকল শ্রেণী ও উপশ্রেণীর অপরাধীদের উপাদান থাকে। কিন্তু—বয়ঃপ্রাপ্ত কালে অপরাধ-জীবন অব্যাহত থাকলে এরা প্রবণতা মত বিভিন্ন শ্রেণী ও উপশ্রেণীতে স্ব স্ব শিক্ষা ও অভ্যাস দ্বারা বিভক্ত হয়। ওদের মধ্য থেকে বারগ্লার ও পিকপকেটরা দলের জন্য বালক সংগ্রহ করে।

এই সব গৃহহীন বালক বড় বড় বাজারের ছাদে শয়ন করে ও সস্তা পাইস হোটেলে খায়। এদের মধ্যে ভিখারীদের পুত্ররা দিনে মাতার ভিক্ষার অন্নে ভাগ বসায়। এদের মধ্যে বেশ্যাদের পুত্ররাও আছে। ওরা মায়েদের নিকট থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। এরা ভোর রাত্রে মফস্বল হতে আগত তরকারীর লরী বা গো-শকটের পিছনে দৌড়িয়ে আনাজ ও তরী-তরকারী উঠিয়ে পালায়। ওরা অলিতে গলিতে গৃহস্থ বাটীতে ঐ গুলি সস্তায় বিক্রয় করে। এদের মধ্যে থেকে পুরানো পাপীরা বালক সংগ্রহ করে। ওদের কেউ কেউ ছিনতাই দলে ভিড়েছে। ওদের কেউ কেউ সোডমি'তেও অভ্যস্ত হয়। রাজনৈতিক বিক্ষোভ ও হরতাল কালে ওরা সক্রিয় হয়ে ডাষ্টবীন গড়িয়ে রাস্তা বন্ধ করে এবং সুবিধা মত ট্রাম বাস পুড়ায়। রাজনৈতিক মতবাদহীন হলেও উহা ওদের একটি ক্রীড়া। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকালে ওদের অনন্য সুযোগ আসে। ওটা ওদের অতিপ্রিয় সাময়িক আনন্দ। কিছু ক্ষেত্রে দল বিশেষ অর্থ দ্বারা ওদেরকে ঐ কার্যে নিয়োগ করে। অর্থাগম হলে ওরা যে কোন মতবাদীদের শোভাযাত্রায় যোগ দেয়।]

উপরোক্ত ব্যবহারিক বিভাগ অতিরিক্ত অপরাধীদের পদ্ধতিমূলক ব্যবহারিক বিভাগ'ও আছে। অপরাধ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে উহার প্রয়োজন সর্বজনস্বীকৃত। পাকাপোক্ত অপরাধীদের বিভিন্ন দল বা ব্যক্তি পৃথক পৃথক রীতিতে অপরাধ করে। ওদের ঐ সকল পদ্ধতি হতে কোন দল বা কোন ব্যক্তি সেই অপরাধ করেছেঃ তাহা পদ্ধতি বিজ্ঞানের সাহায্যে নির্ভুলরূপে অবগত হওয়া সম্ভব। এজন্য পুলিশের পদ্ধতি ভবনে [Modus operendi] অপরাধীদের ঐ সকল পদ্ধতি সহ তাদের নাম ধাম ও ফটো বা অঙ্গুলীর টিপ বা পদচিহ্ন আদি নথীভুক্ত থাকে। নিম্নোক্ত দশটি তথ্যের উপর এই নূতন বিজ্ঞানটি নির্ভরশীল।

[(১) লক্ষ্যস্থল (২) প্রবেশ পথ (৩) উপায় (৪) উদ্দেশ্য (৫) সময় (৬) কায়দা (৭) বচন (৮) বান্ধব (৯) বাহন (১০) ত্যক্তচিহ্ন]

(১) লক্ষ্য-স্থল ঃ কেহ য়ুরোপীয় কেহ ভারতীয় বাটীতে ঢুকে। কেহ মাদ্রাজী

কেহ বাঙ্গালী কেহ মাড়য়াড়ীর বাড়ী বাছে। মানুষের উচ্চ নিম্ন শ্রেণী ও কৃষ্টি ও কম বেশি বুদ্ধিও এদের বিবেচ্য। ইহা বিভিন্ন ব্যক্তির ও সমাজের জীবন ও রীতি নীতি এবং বুদ্ধিমত্তা প্রণালী ও খেয়াল সম্পর্কীয় জ্ঞানের সহিত যুক্ত। কেহ মাত্র বেশ্যাগৃহে বেশ্যাদের বিষপ্রয়োগে দ্রব্যাহরণে অভ্যস্ত। এক একদল বা ব্যক্তি এক এক শ্রেণীর লোককে বাছে। এক এক শ্রেণীর লোকের পৃথক স্বভাব চরিত্রের সহিত ওরা পরিচিত। মেলা মন্দির বিপণী গৃহাদির অপরাধী পৃথক হয়। পকেটমাররা রেল ষ্টেশন, রেশ-কোর্স, বাজার, রাজ-পথ ব্যাঙ্ক আদিকে স্ব স্ব অভিজ্ঞতা ও সুবিধা মত ভাগ করে নিয়েছে।

(২) প্রবেশ-পথ : এক এক দল বা ব্যক্তি মুক্ত দরজা বা জানালা পথে বা উহা ভেঙে গৃহে প্রবেশ করে। কেহ দ্বিবাল বা জলের পাইপ বেয়ে উপরে উঠে। স্কাই লাইট নর্দমা তজ্জন্য কেহ বা ব্যবহার করে। কেহ বা পাঁচিল টপকাতে সুদক্ষ। ওদের দল ও ব্যক্তি ভেদে পৃথক পৃথক অভ্যাস।

[সম্মুখ গতিতে তথা উঠার কালে প্রাচীরে ওদের পদাগ্র ভাগের চিহ্ন এবং পশ্চাদ-গতিতে তথা নামার কালে গোড়ালীর চিহ্ন প্রাচীর গাত্রে সুপষ্ট হয়। তদতিরিক্ত ঘটনা স্থলে দ্রব্যাদিতে টিপচিহ্ন এবং মেঝেয় গালিচায় ও উঠানে পদচিহ্ন পাওয়া যায়। এই সকল চিহ্ন হতে উহাদের প্রবেশ ও নির্গমন পথ আবিষ্কার করা বিধেয়। উপরন্তু ভাঙাভাঙি ও হ্যাচড়ানীর দাগ হতেও উহা বুঝা যায়।]

[৩] উপায় : চাড়-বাজীর দ্বারা ওরা খিল খুললো কিংবা তুরপুন দ্বারা দুয়ার ফুটা করে বাঁকা শিক ঢুকিয়ে তারা খিল খুললো। কিংবা কোন বালককে নর্দমা বা স্কাই লাইটের পথে প্রবেশ করিয়ে দুয়ার খুললো। এই কার্যে ওরা কিরূপ যন্ত্র ব্যবহার করে কত বড়ো গর্ত বা ফুটো তৈরী করলো। কেহ কেহ উকা দিয়ে জানলার গরাদ কাটে। কেহ বা জ্যাক যন্ত্রের সাহায্যে উহা বাঁকায়।

দুয়ার ও দ্বিবাল বা বস্তু আদিতে যন্ত্র চিহ্ন হতে যন্ত্রের স্বরূপ বুঝা যায়। এক এক জনের হাতের কাজ এক এক প্রকার হতে বাধ্য। সিঁদকাটি আদি সরল যন্ত্র এবং তুরপুন আদি জটিল যন্ত্রের ব্যবহার 'টুল মার্ক' হতে লক্ষনীয়। এতে অপরাধীদের প্রকৃতি প্রভৃতি বুঝা যাবে। ওদের কোন যন্ত্রটির ওই দাগ তাও বুঝা যায়।

মুক্ত দরজায় বাটী বা শকটে প্রবেশ করে চুরি করলে উহাকে গৃহচৌর্য বলা

হয়ে থাকে। কিন্তু ভাঙা ভাঙি করে বা অস্বাভাবিক পথে গৃহে প্রবেশ করে উহা করলে উহা বারগ্নারি অপরাধ। বাহির থেকে জানলার গরাদের ফাঁকে আঁকশী ঢুকিয়ে বস্ত্রাদি চুরি এবং ঐরূপে জানলার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে তক্তপোষে ঘুমন্ত নারীর গলার হার খুললেও উহা ঐ একই অপরাধ।

(৪) উদ্দেশ্য : এক এক দল বা ব্যক্তি এক এক প্রকার দ্রব্যাপহরণ করে। যথা কেহ ঘড়ি, কেহ সাইকেল, কেহ ইলেকট্রিক পাখা, কেহ পোষাক কেহ ক্যামেরা আদিতে আগ্রহী। দ্রব্যাপহরণ করে ঐ গুলি যত্র তত্র বিক্রিতে ধরা পড়ার সম্ভাবনা। তজ্জন্য এদের পৃথক পৃথক বামাল গ্রাহক তথা খাউ আছে। এরা স্ব স্ব বামাল গ্রাহকের নির্দেশে তাদের প্রয়োজন মত দ্রব্যাপহরণ করে। প্রবঞ্চনাআদি অপকার্যেও উপরোক্ত কারণে ওদের এক এক দল বা ব্যক্তি এক প্রকার দ্রব্য বেছে নিয়েছে।

(৫) সময় : এক এক দল বা ব্যক্তি অপ-কার্যের জন্য এক এক সময় বেছে নেয়। কেহ দিবা কেহ বা রাত্রে দুপুর ও কেহ সন্ধ্যায় কার্য করে। দুপুর বেলায় পুরুষরা বাড়ী না থাকাতে কারও এ সময়টিই সুবিধাজনক। কেহ লক্ষ্য করে কোন সময় বাটীতে লোক থাকে না।

[বিঃ দ্রঃ দিবা ও রাত্র কালের অপরাধীদের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক কারণও থাকতে পারে। পিক-পকেটদের শিকারগণ তথা ভিকটিম'রা দিবাচারী হওয়ায় তারা দিবাতে অপকর্ম করে থাকে। কারণ পকেটমারী সভ্যতার পর জামা ও পকেট সৃষ্টির পর উদ্ভব হয়েছে। সিঁদমারী'রা আদি মনোভাবী স্বভাব অপরাধী। ওরা সব সুপ্রাচীন অপরাধী। ওদের রাত্রে অপরাধের কারণ গভীর জঙ্গলের বন্য পশুদের আচরণ ও কার্যকরণ হতে বুঝা যায়। কারণ ওদের মনোবৃত্তি হুবহু রাত্রিচারী পশুদের মত থাকে। ঐ সম্বন্ধে জনৈক শিকারীর নিম্নোক্ত বিবৃতি একটি প্রমাণ।

"দিবাতে অরণ্য প্রায়ই নিশ্চুপ ও নিরুপদ্রব থাকে। কিন্তু রাত্রে সেখানে ধ্বংস যজ্ঞ আরম্ভ হয়। বাঘের গর্জনের সঙ্গে হরিণের দাপা দাপি বা আর্তনাদ। বৃক্ষোপরী পক্ষীশিশুর কাতরানি ও অন্যদের পাখা ঝাপটানি শুনা যাবে। কোন এক সর্প জেগে উঠে ঘুমন্ত পক্ষীকে আক্রমণ করেছে। সেখানে দিবাকালের শান্ত পরিবেশ রাত্রিতে নরকে পরিণত হয়।"

পৃথিবীতে দুই প্রকারের প্রাণী আছে, যথা অধুনা-লুপ্ত ও ক্রম-লুপ্ত। প্রথমোক্তগণ ডাইনোসেরাস আদি জীবরা এক্ষণে জীবাশ্মে পরিণত।

শেষোক্ত জীবরা ক্রমিক পরিবর্তনে ক্রমে লুপ্ত হয়ে অন্য জীবে রূপান্তরিত। মানুষ কোনও এক পশুর বংশ জাত হওয়াতে ওদের মধ্যে সেই পূর্বপুরুষদের স্বভাব সুপ্ত বা জাগ্রত রূপে আছে। আদি স্বভাব প্রাপ্ত হলে কোনও কোনও মানুষে উহা মধ্যে মধ্যে প্রকট হয়ে থাকে।]

(৬) কায়দা: কেহ ভিখারী, কেহ পুলিশের লোক, কেহ মিস্ত্রী, কেহ ক্যানভেসর বা ফেরিওয়ালা বা চাঁদাগ্রাহী কেহ বা অনুপস্থিত কর্তার বন্ধু পরিচয়ে ক্ষতিগ্রস্থদের বুঝিয়ে তাদের বাটীতে প্রবেশ করে। এইগুলিকে পদ্ধতি বিজ্ঞানের পারিভাষায় কায়দা বলা হয়।

(৭) বচন: ওরা বহু প্রকার বাক্যালাপ তথা বাক্ বিন্যাসে গৃহের লোককে অভিভূত করে ভুলায় বা তাদের বিশ্বাস উৎপাদন করে। এক এক দল বা ব্যক্তির বাক্ বিন্যাস এক এক প্রকার হয়। যথা ইলেকট্রিক ফ্যানে তেল দিতে বাবু পাঠালেন। কিংবা ওরা বললে যে টেলিফোন সারাতে বা কল সারাতে বা ইলেকট্রিক মিটার দেখতে তারা এসেছে ইত্যাদি।

(৮) বান্ধব: কেহ একাকী কেহ দলবদ্ধ ভাবে কার্য করে। বারগ্লার, পকেটমার প্রবঞ্চক নোট ডবলিঙ টপকা ঠগী ডাকাত আদির দলের লোকের সংখ্যাও প্রয়োজন মত পৃথক হয়। কোথাও দুই চারজন কোথায় আট দশজন বা ততোধিক যুক্ত থাকে। এখানে নারী বালক ও বয়স্ক পুরুষও বিবেচ্য। ওদের দল ভেদে দলীয় ব্যক্তিদের সংখ্যাও পৃথক হয়।

(৯) বাহন: দল ভেদে ওরা যথাক্রমে যাতায়াতে নৌকা, লরী, রিক্সা, মোটরকার বা সাইকেল আদি ব্যবহার করে। ঐ সকল যান বাহনে তারা ঘটনা স্থলে আসে এবং উহাতেই তারা বামাল সহ স্থান ত্যাগ করে। এক এক দলের বা ব্যক্তির যান বাহন এক এক প্রকার হয়ে থাকে।

(১০) ত্যাক্তচিহ্ন: কোনও কোনও ক্ষেত্রে অপরাধের সহিত সবিশেষ সম্পর্কিত কিংবা উহার সহিত সম্পর্কবিহীন দ্রব্যাদি অপরাধীরা ঘটনা স্থলে ত্যাগ করে যায়। কেহ বিষ্ঠা কেহ শিকড়, কেহ সিঁদুর মাখানো ন্যাকড়া প্রভৃতি ঘটনা স্থলে রেখে যায়। তুক তাক আদির মত উহাতে মনস্তাত্বিক এবং দেহতাত্বিক কারণও থাকে। কেহ দরিদ্রের রান্না ঘরে পান্তা ভাত খায় ও কেহ ধনীর প্যানট্রিতে মদ্য পান করে। কেহ নিজের পরিধেয় বস্ত্র ঘটনা স্থলে ত্যাগ করে গৃহস্থদের বস্ত্র পরিধান করেছে।

[ঘটনা স্থলে প্রাপ্ত দ্রব্যাদির মধ্যে কোনটি বাহির হতে আনা বহিঃদ্রব্য এবং

কোনটি ঐ বাটি হতে সংগৃহীত ভিতর-দ্রব্য তদন্তকারীদের তা অবগত হতে হবে।]

প্রবঞ্চনা ও চৌর্য আদি প্রতিটি অপরাধে এই দশটি তথ্য সমভাবে প্রযোজ্য। অপরাধীদের বুঝতে ও খুঁজতে এই তথ্যগুলি রক্ষীকুলের যথেষ্ট সাহায্যে এসেছে। একটি পদ্ধতিতে কৃতকার্য হলে এরা অন্য পদ্ধতি প্রায়ই গ্রহণ করে না। পুনঃ পুনঃ একই রূপ কার্য ওদের দেহে ও মনে স্বয়ংক্রিয়তা ও বিদ্যুৎ গতি আনে। পর পর কি কি করতে হবে এবং কিরূপভাবে এগুতে হবে তা তাদের জানা থাকে। প্রাথমিক অপরাধীরা গুরুর শিক্ষা মত কার্য রপ্ত করলেও মধ্যে মধ্যে এক পদ্ধতি ত্যাগ করে অন্য পদ্ধতি গ্রহণ করে এবং তজ্জন্য অনভ্যাসে তারা সহজে ধরা পড়ে। কিন্তু প্রকৃত [শেষ পর্যায়ের] অপরাধীদের ক্ষেত্রে অপরাধে পদ্ধতি বদল কদাচিৎ হয়ে থাকে।

"বেলা বারোটায় তিনজন বাঙ্গালী পুরুষ সাইকেলে করে বাটিতে এসে বললো যে তারা সারাই মিস্ত্রী। তাদেরকে অনুপস্থিত কর্তা বাবু তাঁর আফিস থেকে পাঠিয়েছে। তারা মুক্ত দরজা দিয়ে ঢুকেছিল এবং তাদের পাখা খুলার প্লাস যন্ত্র ও স্ক্রুড্রাইভার ছিল। গৃহ ভৃত্য তাদেরকে বিশ্বাস করে বহির্কক্ষে এনেছিল। একটু পরে ওদের একজন ঐ ভৃত্যকে খাবার জল আনতে বললে সে উহা আনতে কক্ষান্তরে যায়। ফিরে এসে গৃহভৃত্য দেখলো ঐ তিন ব্যক্তি ও ঘরের ইলেকট্রিক ফ্যান ঐ বহিকক্ষে নেই। ভৃত্য দ্রুত গতিতে রাজ-পথে এসে দেখলো যে ওরা বামাল সহ সাইকেলে পালিয়ে গেল। তারা বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য আনা তাদের দোকানের পরিচায়ক নেম-কার্ড ঐ বাটীতে রেখে গিয়েছে।

এখানে (১) প্রবেশ পথ : মুক্ত সদর দরজা (২) লক্ষ্যস্থল : ভদ্র গৃহস্থ গৃহ (৩) বচন : পাখা সারানোর কথা বলা (৪) বাহন : তিনটি দ্বিচক্রযান তথা সাইকেল (৫) বান্ধব : তিন জন বাঙালী যুবক (৬) উদ্দেশ্য : ইলেট্রিক ফ্যান চুরি (৭) ত্যক্ত চিহ্ন : কল্পিত দোকানের নেম-কার্ড (৮) উপায় : প্লাস যন্ত্র ও স্ক্রুড্রাইভার ব্যবহার (৯) সময় : দিবা বারো ঘটিকা (১০) কায়দা : ইলেকট্রিক মিস্ত্রী পরিচয়ে।

উক্ত দশটি তথ্য, যথা : লক্ষ্যস্থল, উপায়, উদ্দেশ্য, সময়, কায়দা, বান্ধব, বাহন ও ত্যক্ত চিহ্নকে ইংরাজীতে যথাক্রমে ক্লাশ ওয়ার্ড, এনট্রি, মিনস, অবজেকট, টাইম, ষ্টাইল, টেল, পল, ট্রান্সপোর্ট এবং ট্রেডমার্ক বলা হয়।

কোনও এক পুরানো পাপী আমার নিকট এইরূপ এক উক্তি করে ছিল : হাঁ বাবুসাব! কাউর মধ্যে দিবা কালে চুরির হিঙ্গা, দিল বা হিকা আসে এবং কাউর মধ্যে উহা রাত্রেতে আসে। তজ্জন্য দিবাচোর ও রাত্রচোর আলাদা আলাদা হয়। এই দিল তথা হিঙ্গা না এলে আমরা কাম করতে বেরুই না। জনৈক এ্যাঙলো ইণ্ডিয়ান দিবা চোর আমাকে বলেছিল যে দিবস কার্যের [work] এবং রাত্রি ফুর্তির জন্য। প্রতীত হয় এই যে একবার কোনও পদ্ধতিতে সফল হলে অপরাধীরা উহা প্রায়ই ত্যাগ করে না। শেষ পর্যায়ের অপরাধীদের মধ্যে দৃষ্ট একীমুখীতা তথা স্পেশিয়েলিজেসন ইহার সহায়ক। অধিক ক্ষেত্রে গুরু তথা ওস্তাদদের শিক্ষা মত বিশেষ পদ্ধতিতে তারা পাকা-পোক্ত হয়। বহু শিক্ষা দাতা ওস্তাদ তার নির্দিষ্ট পদ্ধতি ত্যাগ না করার জন্য শিষ্যদেরকে পূর্বাহ্নে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেয়।

[বিঃ দ্রঃ—উপরোক্ত অপরাধ সমূহ যৌনজ এবং অ-যৌনজ অপরাধে বিভক্ত হয়। বহু বালিকা কেবল মাত্র চুরি করার উদ্দেশ্যে বয়স্কদের সঙ্গে কিছুটা যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে। লজ্জায় ঐ সকল বয়স্করা চুরির বিষয় চেপে যায়। বহু তরুণী বাহানাতে ভদ্র সন্তানদের বিভ্রান্ত করে অর্থ নেয়। এরা অর্থ গ্রহণের পর প্রতিশ্রুতি মত নির্ধারিত স্থানে ভদ্র সন্তানদের নিকট আসে না। ওদেরকে তারা বৃথা উতলা করে মনের ও দেহের ক্ষতি করেছে। বহু বেশ্যা নারী গৃহস্থ ঘরের কলেজের ছাত্রীরূপে মিথ্যা পরিচয়ে ভদ্র সন্তানদের যৌন রোগগ্রস্থ করেছে। অন্যদিকে বহু ভদ্র দুর্বৃত্ত বিবাহে ইচ্ছুক তরুণীদের বিবাহ করার ছলনায় তাদের নিকট হতে দৈহিক সুবিধা নিয়েছে।]

পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে অযৌনজ ও যৌনজ প্রবঞ্চনা ও চৌর্য আদি অপরাধ সম্বন্ধে বিবৃত করেছি। তবে উল্লেখ্য এই যে, ভদ্র সন্তানদের মধ্যে হিংসা বৃত্তি ও কাম বৃত্তি প্রায়ই একত্রে আসে না।

যৌনজ প্রবঞ্চনা ও চৌর্য কার্যের মত যৌনজ বারগ্লারদেরও অস্তিত্ব আছে। যৌনজ সিঁদমারীর দৃষ্টান্তস্বরূপ রেপাইন বারগ্লারদের বিষয় বলা যায়।

য়ুরোপ ও মার্কিন মুল্লুকের মত ভারতবর্ষে এখনও এই রেপাইন বারগ্লারদের প্রাদুর্ভাব হয়নি। কারণ এদেশে বেশ্যা বৃত্তি এখনও বে-আইনী করা হয়নি। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে বেশ্যা বৃত্তি নিষিদ্ধ হওয়ায় সেইখানেই মাত্র এইরূপ অপরাধ পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নে এই রেপাইন বারগ্লারদের স্বরূপ সম্বন্ধে বিবৃত করা হলো।

"এরা দ্রব্যাপহরণ করার জন্য দেবাল বা দুয়ার ভেঙে গৃহে প্রবেশ করেনা। ওরা মাত্র নারীদের বলাৎকার করার জন্যে ঐ ভাবে গৃহাদিতে ঢুকেছে। পুরুষদের অবর্তমানে একাকীনী নারীকে ঐ অপরাধী প্রথমে প্রহারে প্রহারে রক্তাক্ত ও অচৈতন্য করে। তারপর যথেচ্ছ ভাবে তাকে বলাৎকার করে ঘটনা-স্থল পরিত্যাগ করে।"

উপরোক্ত তথ্য হতে বুঝা যাবে যে সবল বা নির্বল, সাম্পত্তিক বা শোণিতাত্বক অপরাধীরা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ ভাবে কিংবা অবিমিশ্র বা মিশ্র ভাবে যৌনজ ও অযৌনজ উপশ্রেণীতে বিভক্ত হতে পারে।

প্রতিদেশে বেশ্যারা সমাজের সকল বিষ গলধঃকরণ করে ভদ্র সমাজকে রক্ষা করেছে। বেশ্যা বৃত্তি বিলোপ আইন বলবৎ করতে প্রয়াসী সমাজবিদদের এই সম্পর্কে চিন্তা করা উচিৎ। বেশ্যাবৃত্তির বিলোপের সহিত বলাৎকারক সিঁদমারীর প্রাদুর্ভাব হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

[প্রতি বৎসর সমাজ দেহ হতে কিছু কিছু ক্ষয়িত অংশ বার হয়ে যায়। অর্থাৎ তাদের কিছু ব্যক্তি বেশ্যা ও কিছু ব্যক্তি চোর হয়। ওদের সংখ্যা অবশ্য বহুল পরিমাণে কমানো সম্ভব। সমাজে বর্ণ চোরা বেশ্যাদের সংখ্যাধিক্য নিশ্চয়ই কাম্য নয়। বেশ্যাবৃত্তি বে-আইনী করলে এরা সমাজের মধ্যে গোপনে আশ্রয় নেবে।]

॥ দশম অধ্যায় ॥

বংশানুক্রম

বংশানুক্রম তথা হেরিডিটিতে অবিশ্বাসী ব্যক্তিরাও বলেন যে মানুষ কিছু চিত্ত প্রস্তুতি [প্রিডিসপোজিসন] বা বিশেষ প্রবণতা সহ জন্ম গ্রহণ করে। এতে শিক্ষা গ্রহণ কালে এরা অন্যদের অপেক্ষা কিছুটা স্থবিধা ভোগী। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের সব কয়টি সন্তান পিতার মত বুদ্ধিমান হয় না। সেই ক্ষেত্রে বলা

হয় যে, হেরিডিটি, এখানে গোত্রানুক্রম তথা আটাভিজিমের রূপ নিয়েছে। অর্থাৎ—এই স্থলে তারা উর্দ্ধতন কোনও এক পুরুষের গুণাগুণের অধিকারী। মাতা বা পিতার মধ্যে ঐ গুণ কয়টি সুপ্ত ছিল। ঐ সুপ্ত গুণটি ওদের পুত্রতে এসে জাগ্রত হলো। উপরন্তু পিতৃকুলের ও মাতৃকুলের পূর্বপুরুষদের গুণাগুণও বংশগত হয়।

[অনগ্রসর মনুষ্য গোষ্ঠীর সন্তানরাও সুযোগ পেলে গুণাগুণের অধিকারী হয়। ভুলে গেলে চলবে না যে শিক্ষা তিন প্রকারের হয়ে থাকে। যথা বুদ্ধিগত, দৈহিক ও নৈতিক। ওরা বহু বিষয়ে নৈতিক শিক্ষাতে আগুয়ান। স্ব স্ব ক্ষেত্রে বহু বুদ্ধিবৃত্তিরও ওরা অনুশীলন করে।]

পৃথিবীতে একদল পরিবেশের উপর এবং উহার অন্য দল বংশানুক্রমের উপর অধিক প্রাধান্য দেন। কেউ কেউ কুকুর ও অশ্ব প্রভৃতি জীবের পেডিগেরিতে আগ্রহী হলেও মানুষের পেড়িগেরী তথা বংশানুক্রমে আগ্রহী নন।

তবে একটি বিষয় ঠিকই এই যে, পরিবেশ ও শিক্ষা দীক্ষা যথাক্রমে উহাদের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ প্রভাব দ্বারা হেরিডিটির শক্তি অতিক্রম করতে সক্ষম। পরিবেশ ও শিক্ষা দীক্ষা মানুষের আকৃতি ও স্বভাব বদলে দেয়। অন্তর্স্বভাব মানুষের মুখে চোখে পরিস্ফুট হয়। আশৈশব বাক-প্রয়োগ তথা সাজেসসন মানুষের প্রকৃতি বদলাতে সক্ষম।

বিঃ দ্রঃ—কমুনিষ্টপন্থী তথা সাম্যবাদীরা বংশগত ঐতিহ্যে বিশ্বাসী নন। তাঁরা পরিবেশ ও শিক্ষা দীক্ষাতে বেশী বিশ্বাসী। ক্যাপিটেলিষ্ট তথা ধনতান্ত্রিক দেশীয়দের ধারণা এই যে, উপযুক্ত হতে পুরুষানুক্রমে সাধনার প্রয়োজন। সেই কারণে পূর্ব য়ুরোপীয়দের লামার্কি মত এবং পশ্চিমে য়ুরোপে ডারোইনের মত অধিক পছন্দ।

[লামার্ক সাহেব স্বকীয় জীবনের প্রচেষ্টার উপর এবং ডারোইন সাহেব বংশগত পরিবর্তনের উপর তাদের ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত মতবাদে অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন।]

প্রাচীন ভারতেও এই দুই প্রকার মত প্রচলিত ছিল। বেদগ্রন্থে সুস্পষ্ট রূপে বলা হয়েছে যে, মানুষ মাত্রেই প্রথমে শূদ্র রূপে জন্মগ্রহণ করে। পরে স্ব স্ব কর্ম মত কেহ ব্রাহ্মাণ কেহ ক্ষত্রিয় ও কেহ বৈশ্য হয়। তাঁরা এও বলেছেন যে, কর্মদোষে ব্রাহ্মণ শূদ্র হতে পারে। মহাভারতেও সুত পুত্র কর্ণ সদম্ভে বলে ছিলেন যে আমা হতেই আমার বংশ-গরিমা সৃষ্ট হবে।

স্বকীয় জীবনে সংগৃহীত বৈশিষ্ট্য [Acquired character] সাধারণত বংশগত হয় না। স্থূলদেহী পিতামাতার পুত্র কৃশদেহী হতে পারে। কারণ— জীবদিগের ভ্রূণের বর্দ্ধন কালে দেহ কোষ [Somatic cell] হতে বীজ কোষ তথা জার্ম সেল পৃথকীকৃত হয়ে পরবর্তী বংশধরদের জন্মের জন্য পৃথক বীজাধারে সংরক্ষিত হয়। তজ্জন্য জন্মের পর তাদের পিতামাতার সংগৃহীত বৈশিষ্ট্য বংশগত হবে না। কামারের ডান হাত অতি ব্যবহারে স্থূল হলেও তার পুত্র উত্তরাধিকারী সূত্রে স্থূল হস্ত প্রাপ্ত হয় না।

[ব্যবহারে ও অ-ব্যবহারে স্বকীয় জীবনের কোনও অঙ্গ বা বৃত্তির হ্রাস বা বৃদ্ধি হতে পারে। এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ না থাকলেও বিবেচ্য বিষয় এই যে, উহা বংশগত হওয়া সম্ভব কিনা। সাধুর পুত্র সাধু ও চোরের পুত্র চোর হয় না। বরং পৌরাণিক মতে দৈত্য কুলেও প্রহ্লাদের জন্ম হয়েছে।

জনৈক সাধুর অপহৃত পুত্র চোরের বাটীতে মানুষ হলো। পরিবেশ ও শিক্ষা দীক্ষাতে সে চোর হবে। কিন্তু ওদেরকে নিরাময় করা ঐ চোরের ঔরস জাত পুত্র অপেক্ষা সহজ কিনা তাহা বিবেচ্য।

ওইরূপ এক অপহৃত বালক শিক্ষা মত অভ্যাস অপরাধী হয়েছিল। পরীক্ষান্তে আমি দেখেছি যে, ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনের পর তার অপরাধ বিরাম কাল [Lucid Interval] অন্যদের অপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী হতো। তাকে বিপরীত পরিবেশে আনলে তার অপরাধ-বিরাম কাল ক্রমান্বয়ে বেড়ে বেড়ে সে কিছুকাল পর নিরপরাধী হয়েছিল।

[স্বকীয় জীবনে সংগৃহীত দৈহিক বা মানসিক বৈশিষ্ট্য কারও বীজ কোষকে কোনও কারণে প্রভাবিত করলে উহা নিশ্চয়ই বংশগত হবে।

এখানে পারিবারিক আদর্শ ও শিক্ষা দীক্ষা এবং অনুকূল পরিবেশের প্রশ্ন রয়েছে। তৎসহ নূতন আদর্শ গ্রহনের শক্তির প্রশ্নও এতে জড়িত রয়েছে।

এই জন্য অপরাধীদের চিকিৎসা দ্বারা নিরাময় করতে হলে ওদের পিতৃকুল ও মাতৃকুলের পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরিচয় সংগ্রহের সর্বাগ্রে প্রয়োজন। উপরন্তু অপরাধ নির্ণয় ও নিরোধেও উহা সাহায্যে আসে। বহু হত্যাকাণ্ডে মোটিভ তথা উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি। আমার মতে বংশানুক্রম শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হলে উহার সমাধান হবে। তদন্তকারী কর্মীদের এই সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে।

[প্রায়ই দেখা যায় যে তিন পুরুষের পর পারিবারিক প্রতিভা ব্যয়িত হয়ে নিঃশেষিত হয়। বড় বড় নামী পরিবার ও রাজবংশগুলির ইতিহাস উহা প্রমাণ

করে। এই সম্পর্কে অন্য একটি গবেষণার ক্ষেত্র রয়েছে। এই সম্পর্কে মৌর্য ও মোগল রাজবংশ দুটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ রূপে বিবেচ্য।]

বংশানুক্রম বা হেরিডিটি অপরাধ-বিজ্ঞানের একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। অপরাধীদের বংশানুক্রম সম্বন্ধে পৃথিবীতে কমই আলোচনা হয়েছে। পৃথিবীর পণ্ডিতেরা দৈহিক গুণাগুণের বংশানুক্রম সম্বন্ধে আলোচনা করলেও তাদের মানসিক গুণাগুণের বংশানুক্রম সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেন নি। আমি দৈহিক বংশানুক্রমের য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে উহাদের মানসিক বংশানুক্রম সম্পর্কে এখানে আলোচনা করেছি। যে পদ্ধতিতে আমি ইহা আলোচনা করেছি তা নিতান্ত পক্ষেই নূতন বলা যায়।

পুত্র পিতার সম্পত্তির ন্যায় গুণেরও অধিকারী হয় কি না! ইহা সঠিকরূপে আজও নির্ণীত হয় নি : এরূপ ধারণা আজও কেউ কেউ পোষণ করেন। য়ুরোপীয় অ্যারিস্টটল-সাহিত্যে এই সম্বন্ধে একটি বিশেষ উক্তি আছে। কোন এক পুত্র তার পিতার চুল ধরে দরজার চৌকাঠ পর্যন্ত টেনে আনলে পিতা তাঁর সুপুত্রটিকে সম্বোধন করে না'কি বলে উঠেন, "হয়েছে, হয়েছে পুত্র! আর নয়; আমি আমার পিতাকে মাত্র এই পর্যন্তই টেনেএনেছিলাম।" সাধারণভাবে দেখা গেছে যে [স্বকীয় জীবনে] সংগৃহীত বৈশিষ্ট্য বংশগত হয় না। কামারদের ডান হাত অতি ব্যবহারেব কারণে স্থূলতা প্রাপ্ত হ'লে তার পুত্রের ডান হাত জন্মের পর ঐরূপ দেখা যায় না। অপরদিকে পিতা বা মাতার গাত্রবর্ণ উজ্জল হলে পুত্রদের গাত্রবর্ণ উজ্জল হয়। এর কারণ কর্মকারের হস্তের এই স্থূলতা দেহকোষে সন্নিবেশিত হয়ে থাকে। বীজকোষের সহিত তার কোনও সম্বন্ধ নেই। অপর দিকে মানুষের গাত্র বর্ণের কারণ বীজকোষের মধ্যে নিহিত। এই বীজকোষ ও দেহকোষ সম্বন্ধে পুস্তকের পূর্বপরিচ্ছেদে বিশদরূপে আলোচিত হয়েছে। এই স্থলে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আমার মতে মানুষের কোনও দৈহিক বা মানসিক দোষ বা গুণ যদি কোনও রূপে বীজকোষে সন্নিবেশিত হতে পারে তাহ'লে তা অন্ততঃ কয়েক পুরুষ পর্যন্ত বংশগত হতে সক্ষম হয়। তবে এই সব দোষ বা গুণ বংশগত হলেও তা বিপরীত পরিবেশ এবং সাধুসঙ্গ প্রভৃতি কারণে সব সময় জাগ্রত বা অত্যুগ্র না হলেও হতে পারে বলে আমি মনে করি। এ'ছাড়া এই দোষ বা গুণ বংশগত হওয়ার পর উহার ব্যবহার বা অপব্যবহারের কারণে উহাদের হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটে থাকে বলে আমি জেনেছি। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই দোষ বা গুণ বংশগত হলেও তা আবার সুপ্তরূপে থেকে থাকে এবং

অনুকূল অবস্থায় না পড়লে তা জাগ্রত হয় না। এই সব দোষ বা গুণ বংশ-পরম্পরায় "বিপরীত গুণ বা দোষ সম্পন্ন" মাতার এবং পিতার মিলনের ফলে ধীরে ধীরে পাতলা তথা ক্ষীণ হয়ে এসে কয়েক পুরুষ বাদে তা একেবারে অন্তর্হিত হতে পারে। কখনও প্রতিরোধ শক্তি প্রবল হওয়ায় উহা বংশগত হলেও বাহিরে তা প্রকাশ পায় না।

এক্ষণে বিবেচ্য বিষয় এই যে, সংগৃহীত [মানসিক] বৈশিষ্ট্য বংশগত হতে পারে কিনা? এই সম্পর্কে আধুনিক পণ্ডিতগণ কয়েকটি পরীক্ষা করেছেন। ঐ সকল পরীক্ষা হতে প্রতীয়মান হবে যে, সংগৃহীত বৈশিষ্ট্য [Acquired character] সত্যই বংশগত হয়ে থাকে।

য়ুরোপে ডাঃ ক্যামেরার এইসম্পর্কে হরিদ্রাদাগ যুক্ত কৃষ্ণ বর্ণের স্যালেমেণ্ডার নিয়ে উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা করেছেন। এদেরতিনি হরিদ্রাবর্ণের পাত্রেপুরুষানুক্রমে পুষে দেখেছেন যে ধীরে ধীরে তাদের চর্মের হরিদ্রা বর্ণ বর্ধিত হয়ে কয়েক পুরুষ বাদে উহারা পুরাপুরি হরিদ্রা বর্ণের হয়ে গিয়েছে। এরপর ঐরূপে প্রাপ্ত নূতন দেহবর্ণ ভিন্ন পরিবেশে এসেও আর পরিবর্তিত হয় নি।

[এইভাবে স্বল্প অপস্পৃহা বা স্বল্প সৎপ্রেরণাও যথাক্রমে বর্দ্ধিত বা অবলুপ্ত বংশানুক্রমে হতে পারে।]

এই সম্পর্কে য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ মৎস্য সহযোগেও কয়েকটি পরীক্ষা করেছেন। তাঁরা লাল, নীল ও সবুজ আধারের মধ্যে মৎস্যদের [কয়েক পুরুষ] রেখে উহাদের যথাক্রমে লাল, নীল ও সবুজ বর্ণের হতে দেখেছেন। মৎস্যদিগের চক্ষু আবৃত করে দিলে কিন্তু তাদের দেহের বর্ণ-পরিবর্তন আর হয় না। [উহা চিন্তা ও ইচ্ছা দ্বারা স্নায়বিক পরিবর্তন প্রমাণ করে।] এর পর এদের একটি চক্ষু অন্ধকারে রেখে ও অপর চোখটির উপর সাদা আলো ফেলে দেখা গিয়েছে যে, ঐ সকল মৎস্যের বর্ণ ধূসর হয়ে গিয়েছে! এইরূপে একই পরিবেশে মৎস্য-জীবকে রাখলে কয়েক পুরুষ বাদে তাদের এই বর্ণ স্থায়ী হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় ঐরূপ পরিবেশ ব্যতিরেকেই তাদের মধ্যে ঐ নূতন বর্ণ বংশগত হয়ে থাকে।

এক্ষনে আমি দেখাবো যে জীবদিগের ইচ্ছা বা স্পৃহা এবং তৎসহ উহাদের পরিবেশগত অভ্যাসও দৈহিক গুণাগুণের ন্যায় জীবদিগের মধ্যে বংশগত হয়ে থাকে।

প্রোটোজোয়া প্রভৃতি নিম্নতম এককোষী জীব নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা

গিয়েছে যে কোনও এক ফিজিক্যাল বা কেমিক্যাল অ্যাকশনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধশক্তি পুরুষানুক্রমে ওদের মধ্যে ক্রমান্বয়েই বর্ধিত হয়ে থাকে। কয়েক পুরুষ বাদে অনুরূপ পরিবেশ হতে মুক্ত হওয়া সত্বেও তাদের পূর্ব-অর্জিত ঐরূপ বর্ধিত প্রতিরোধ-শক্তি তাদের মধ্যে সমভাবেই বর্তিয়ে থাকে।

য়ুরোপে প্যাভলভ্ সাহেব এই সম্পর্কে ইঁদুর নিয়েও পরীক্ষা করেছেন। ইনি কয়েকটি শ্বেত ইঁদুরকে এমন ভাবে শিক্ষা দেন যাতে করে ঘণ্টাধ্বনি শুনা মাত্র তারা খাদ্যের জন্য খাঁচা হতে বার হয়ে আসবে। এইরূপ অভ্যাস তাদের মধ্যে এনে দিতে তাঁকে ওদের তিনশতবার শিক্ষা দিতে হয়েছিল। এরপর এই সকল ইঁদুর ও ইঁদুরীর মিলন দ্বারা তিনি তাদের সন্তান-সন্ততি সৃষ্টি করতে থাকেন এবং সেই একই সঙ্গে বংশানুক্রমে তাদের ঐ একই শিক্ষায় শিক্ষিতও করে তুলেন। দ্বিতীয় পুরুষে ওদের ঐ কার্যের জন্য আরও কম বার শিক্ষা দিতে হয়েছে। ওদের পঞ্চম পুরুষীয় শ্বেত ইঁদুরদের ঐ একই রূপ অভ্যাসে শিক্ষিত করে তুলতে তাঁকে মাত্র কয়টি বার শিক্ষা দিতে হয়েছিল।

হার্ভাডের মিঃ ডগল ধেড়ে ইঁদুরের সাহায্যে পরীক্ষা করে অনুরূপ সুফলই পেয়েছেন। এই ক্ষেত্রে ঐ সকল ইঁদুরদের বংশানুক্রমে বিদ্যুৎ সংযুক্ত মঞ্চে না অবতরণ করতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। এ'ছাড়া প্রফেসার হ্যারিশন অনুরূপ উপায়ে এক প্রকার মক্ষিকাকে কয়েক পুরুষ বাদে অপর এক প্রকার গাছের পাতার উপর ডিম্ব রক্ষা করতে অভ্যস্ত করাতে পেরেছিলেন।

এই সকল কারণে বংশানুক্রমে যারা শোণিতাত্মক স্বভাব দুর্বৃত্ত জাতীয় ডাকাত তারা প্রায়ই পেশীবহুল মানুষ হয়ে থাকে এবং যারা বংশানুক্রমে স্বভাব দুর্বৃত্ত জাতীয় সাম্পত্তিক অপরাধী, তাদের আমি প্রায়ই পেশীবহুল হতে দেখি নি। [নিম্নোক্ত ভারতীয় যুদ্ধবিদ্ মোরগ ২১৬ পৃঃ দ্রঃ]

বহু অপরাধীর নিরপরাধ মানুষদের সহিত বিবাহাদি কখনও হয় নি। [যথা, স্বভাব দুর্বৃত্ত জাতি।] এইজন্য তারা তাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য আজও অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছে। এছাড়া এদের সূক্ষ্ম বৃত্তির অব্যবহারের সহিত স্থূল বৃত্তির অতি ব্যবহার এদের বংশগত স্পৃহাকে সংযত না করে উহা ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে দিয়ে থাকে। ভারতের স্বভাব দুর্বৃত্ত জাতীয় মানুষদের ইতিহাস সম্বন্ধে আমি এই পুস্তকের অষ্টম খণ্ডে আলোচনা করেছি। বংশানুক্রমের পিওর লাইন ইনভেষ্টিগেশন এইরূপ গবেষণার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কিন্তু তা সত্ত্বেও এদের অপস্পৃহা একমুখী হয়ে বহু দূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারে নি।

বরং উহাকে একটি বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে আমি আবদ্ধ থাকতে দেখেছি। এদের এই অপস্পৃহার [মানসিক ও দৈহিক গুণাগুণ সহ] এইরূপে গণ্ডীভূত হয়ে থাকার মধ্যে একটি বৈজ্ঞানিক সত্য আছে।

উপরোক্ত তথ্য জীব-বিজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণিত করা যায়। কাঁকড়া প্রভৃতি জীবের পিওর লাইন জাত পৌত্র, পুত্র, পিতা ও পিতামহের খোলার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের মাপ নিয়ে বহু বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করেছেন যে, গড়-পড়তা হিসাবে ওদের ঐ খোলার পরিধির মাপ একটি বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ আছে। অর্থাৎ একমুখীভাবে ওদের দৈর্ঘ্য অধিক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারে নি।

তবে অতীতের একমুখীভাবে জীবের অঙ্গ বিশেষের অতিবর্ধন যে ঘটেনি তা'ও নয়। এইরূপ অবস্থা ঘটলে ইহাকে অতিবাড় বলা হয়। এই অতি-বাড়ের [ওভারস্পেশালিজেশন] জন্য অতিবৃহৎ শৃঙ্গধারী সেকেলে হরিণ এবং অতিকায় ডাইনোসেরাস প্রভৃতি জীবেরা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে।

কিন্তু মনের ক্ষেত্রে এইরূপ অতিবাড় প্রায়শঃ ক্ষেত্রে সম্ভব হয় নি। এর কারণ মানুষের সূক্ষ্মস্নায়ু সাধারণতঃ অতিভার সহ্য করতে পারে না। এই সূক্ষ্ম স্নায়ুকে যতটা সওয়ানো যায় তার বেশি সওয়াতে গেলে মানুষ পাগল হয়ে যেতে পারে। (f)

দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি এমন একজন শিক্ষিত ব্যক্তিকে জানি, যে অতিরিক্ত অপস্পৃহার কারণে বৎসরে ছয় মাস উন্মাদ হয়ে যায়। এই অবস্থায় তাকে স্বগৃহে বা চিকিৎসাগারে আবদ্ধ করে রাখতে হয়েছে। কিন্তু বৎসরের অপর ছয়মাস সে সম্পূর্ণ সুস্থ [লুসিড্ ইণ্টারভেল] হয়ে প্রবঞ্চনা প্রভৃতি অপকর্ম সমূহে লিপ্ত হয়ে থাকে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার পূর্বেই সে পাগল হয়ে উন্মাদাগারে চলে যেতো। এই হতে প্রমাণিত হবে যে, প্রকৃত অপরাধীরা একপ্রকার নৈতিক পাগল ছাড়া অপর আর কিছুই নয়।

এইভাবে দেখা যাবে যে, মানুষের অপস্পৃহা বর্ধিত হলেও উহা অধিক দূর বর্ধিত না হয়ে একটি বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে থাকাতে উহা কখনও আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে পারে নি। এইজন্য আমি মনে করি যে স্বভাব দুর্বৃত্ত জাতিদের স্বল্প সূক্ষ্ম বৃত্তির অতি ব্যবহার এবং উহাদের স্থূল বৃত্তির অব্যবহার দ্বারা [প্রতিরোধ-শক্তি বাড়িয়ে] তাদের মনকে পুনরায় স্বাভাবিক স্থিতিতে ফিরিয়ে আনা যায়।

(f) অতি অপস্পৃহা ও অতি সৎ-প্রেরণা সমভাবে মানুষকে উন্মাদ করে।

এইবার আমি সহজেই প্রমাণিত করতে পারবো যে মানুষের ইচ্ছা বা স্পৃহা উহার সহিত সংশ্লিষ্ট দৈহিক গুণাগুণকেও বংশগত করতে পারে। এর কারণ এই যে, এই ইচ্ছা প্রথমে দেহ মধ্যে হরমন জাতীয় রসের সৃষ্টি করে এবং ঐ সব সৃষ্ট রস ধমনীর মাধ্যমে স্নায়ুকে ও তৎসহ বীজসার [Gamate] কে প্রভাবান্বিত করে দেয়। এই ব্যক্তিগত ইচ্ছা বহু ক্ষেত্রে গণ-ইচ্ছায় পর্যবসিত হয়ে খাদ্য ও জলবায়ুকে অতিক্রম করে কয়েক পুরুষের মধ্যে মানুষের মুখের ভাব পর্যন্ত কিঞ্চিৎরূপে পরিবর্তন করতে সক্ষম।

বাঙলাদেশের অভ্যন্তরভাগে পুরুষানুক্রমে বসবাসকারী মাড়য়ারীদের সহিত কলিকাতার পৃথকীকৃত স্থানবিশেষের অধিবাসী মাড়য়ারী এবং তৎসহ এ দেশের বসবাসকারী মাড়োয়ারীদের পিতামহ, পিতা ও পুত্রের ফটোচিত্র দেখলেই তা বুঝা যাবে। আমি এই প্রকার কয়েক পুরুষের ফটোচিত্র সংগ্রহ করে দেখেছি যে [এরা খাদ্য পরিবর্তন না করলেও] এদের মুখাকৃতি ধীরে ধীরে স্থানীয় লোকদের মত হয়ে এসেছে। তবে মানসিক পরিবেশ সহ খাদ্য ও জলবায়ুর জন্যে ইহা কতটা হয় তাও বিবেচনা করতে হবে।

এই সকল ঘটনা যদি সত্য হয় তা হলে মেনে নিতে হবে যে একমাত্র মন ও স্নায়ু দ্বারাই বীজকোষকে প্রভাবান্বিত করা যায়। এই কারণে কেবলমাত্র স্নায়বিক রোগসমূহকেই আমরা বংশগত হতে দেখি। দৃষ্টান্তস্বরূপ পাগলের বংশধরের কথা বলা যেতে পারে। নির্বোধ বা পাগলের বংশধরদের আমরা প্রায়ই পাগল ও নির্বোধ হতে দেখি। পাগলের ন্যায় অপরাধীদের অপস্পৃহাও স্নায়ুর দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই কারণে আমরা পাগলের ন্যায় অপরাধী পরিবারও দেখে থাকি। কিন্তু একজন অপরাধীর বা পাগলের সব কয়টি পুত্রই পাগল বা অপরাধী হয় না। কারণ সকল সময় পাগলের সহিত পাগলিনীর এবং অপরাধীর সহিত অপরাধিনীর যৌন-মিলন ঘটে না। এ'ছাড়া এই প্রকারের দম্পতি-সমূহের নীরোগ ও নিরপরাধী পূর্বপুরুষদেরও প্রভাব তাদের সন্ততির উপর বহুল বা কতক পরিমাণে বর্তিয়ে থাকে। এই কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা এই সব পাগল বা অপরাধীদের সন্ততিদের পাগল বা অপরাধীরূপে জন্মাতে দেখি না। কিন্তু তাদের কেউ কেউ অপরাধমুখী হয়ে জন্মিয়ে থাকে এবং অনুকূল অবস্থায় অত্যল্পকালের মধ্যেই তারা অপরাধী হয়ে ওঠে। এই সকল কারণে পাগল এবং অপরাধীদের বংশবৃদ্ধি সমাজের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর।

[কিছু ক্ষেত্রে (১) অধিক অপস্পৃহা ও কম সৎপ্রেরণা এবং তৎসহ (২) কম

প্রতিরোধ-শক্তি একত্রে বংশগত হয়ে থাকে। কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে উহাদের সব কয়টি এই হারে বংশগত না হওয়ায় নানারূপ ব্যতিক্রমের সৃষ্টি হয়ে থাকে।]

মদ্যপায়ী মানুষের মাদকতা রোগ বিশেষরূপে বংশগত হয়। এই মাদকতা পুরুষানুক্রমে হলে ত আর রক্ষাই নাই। এরূপ অবস্থায় পিতা বা মাতার মাদকতা অপরাধমুখী সন্তানের জন্মের কারণ হয়: অনুসন্ধান দ্বারা এগারটি ক্ষেত্রে আমি স্বয়ং ইহা দেখেছি। বোধ করি পুরুষানুক্রমে অতি সুরা পান ওদের প্রতিরোধ সম্পর্কিত সূক্ষ্ম স্নায়ু কালক্রমে দুর্বল করে।

[কিন্তু স্বল্প মাত্রায় মদ্যপান সম্ভবতঃ ততো বেশী ক্ষতিকর নয়। বরং দারুণ শীতকালে ও বয়েসকালে বাড়তি এনার্জি আনতে ঔষধ রূপে উহার দুই এক ফোঁটার প্রয়োজন হতে পারে।

কেহ কেহ বলেন যে পুরুষানুক্রমে মদ্যপান সূক্ষ্ম স্নায়ুর ক্ষতি করে নীতিস্থানে বিকার আনে। উহা অপরাধ স্পৃহাকে বহির্গত করে পরবর্তী পুরুষের কাউকে কাউকে অপরাধ-প্রবণ করে।]

উক্তরূপ বহু পরীক্ষার বিষয় আমি মৎপ্রণীত 'হিন্দু-প্রাণিবিজ্ঞান' গ্রন্থে উল্লেখ করেছি। এই সকল পরীক্ষা হতে প্রমাণিত হবে যে, জীবের ইচ্ছা প্রসূত অভ্যাস সহজেই বংশগত হতে পারে। এই ইচ্ছাপ্রসূত অভ্যাসের সহিত কোনও অঙ্গ সংশ্লিষ্ট থাকলে উহার হ্রাস বা বৃদ্ধিও বহু পুরুষ পর ঐ জীবের মধ্যে স্থায়ী হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়।

উপরোক্ত মতবাদের প্রমান স্বরূপ ভারতীয় যুদ্ধবিদ্ মোরগদের জন্মের কথা বলা যেতে পারে। মাত্র পাঁচ বা ছয় শতাব্দীর চেষ্টায় সাধারণ মোরগ হতে এরা সৃষ্ট হয়েছে। এরা সাধারণ মোরগদের দেখা মাত্র রাগে ফুলতে ফুলতে তাদের ছিন্ন ভিন্ন করে দেয় এবং নিজেরা নিহত না হওয়া পর্যন্ত স্বজাতীয় মোরগদের সহিত যুদ্ধরত থাকে। যুদ্ধের জন্য এদের পায়ের পশ্চাৎ দেশের কণ্টক সাধারণ মোরগ অপেক্ষা বহুগুণে দৃঢ় ও বৃহৎ হয়ে গিয়েছে। অথচ সাধারণভাবে জীবন ধারনের জন্য উহার প্রয়োজন একেবারেই নেই। কয়েকশত বৎসর পূর্বে এই মোরগদের কয়েকটিকে বেছে নিয়ে পুরুষানুক্রমে তাদের মোরগের লড়াইয়ে নিযুক্ত রাখার ফলে তাদের এই অপাঙ্গটির এইরূপ বর্দ্ধন ঘটেছে। এ'ছাড়া পুরুষানুক্রমে তাদের লড়াই করবার ইচ্ছাও বহুগুণে বর্ধিত হয়ে উহা আজ দুর্দমনীয় হয়ে উঠেছে। এ'স্থলে উল্লেখযোগ্য এই যে, এই সকল মোরগের অপত্য সৃষ্টির কারণে বাছবার সময় তাদের লড়াই করার ইচ্ছারপ্রতিই লক্ষ্য রাখা হয়েছিল। তাদের

কান্নুর পায়ের কণ্টকের আকারের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় নি। অথচ যুদ্ধ ইচ্ছার সহিত উহার উপকরণ ঐ কণ্টকও তারাবংশানুক্রমে বর্ধিত করে নিয়েছে।

[ইহা প্রমাণ করে যে, অপস্পৃহাও অনুরূপভাবে অভ্যাস দ্বারা সম্ভাব্য পরিমাণে বর্দ্ধিত হতে পারে।]

উন্মাদ ও অপরাধী ব্যক্তির সহিত নিরপরাধ ও সহজ মানুষের মিলনের ফলে দুই-এক পুরুষ বাদে তাদের বংশধরগণ পূর্বোক্ত কারণে আর উন্মাদ বা অপরাধী থাকে না। অন্য কয়েকটি ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করে আমি এর প্রমাণ পেয়েছি।

সাধারণভাবে দেখা গিয়েছে একজন অপরাধী ব্যক্তির সহিত একজন নিরপরাধ ব্যক্তির যৌন-মিলনে তাদের কতকগুলি সন্ততি হয় অপরাধী বা অপরাধমুখী এবং কতকগুলি নিরপরাধী থাকে। তবে তাদের এই সকল স্পৃহা জাগ্রত বা সুপ্ত—এই উভয় অবস্থা তাদের মধ্যে বংশগত হয় বা তা হতে পারে। [সুপ্ত থাকলে ইহা বাহিরে প্রকাশ পায় না।]

দৃষ্টান্তস্বরূপ য়ুরোপের রবার্ট পরিবারের কথা বলা যেতে পারে। এই পরিবারের বাপ ছিল অপরাধী, কিন্তু মা নিরপরাধ ছিলেন। এই পরিবারের বড় মেয়েটি বেশ্যা এবং কয়েকটি পুত্র অপরাধী হয়, কিন্তু কনিষ্ঠ পুত্র দুইটি এবং মাতা নিরপরাধ থাকে। শেষ পুত্র দুইটি অপরাধমুখী না থাকায় পিতা শত চেষ্টাতেও তাদের অপরাধী করে তুলতে অক্ষম হয়। ১৮৪৫ সালের নভেম্বর মাসে এই পরিবারের তিন ব্যক্তি অ্যাসাইজ আদালত কর্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

এই দেশেও এইরূপ অনেক অপরাধী পরিবারের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। ওদের মাতা এবং পিতা উভয়েই অপরাধী। শুধু তাই নয়! ওদের পুত্র ও কন্যাগণও পরস্পরের সহিত যৌন-মিলন দ্বারা সন্তান-সন্ততি সৃষ্টি করেছে। অবশ্য এইরূপ পরিবারের সংখ্যা এদেশে অতীব বিরল। আমেরিকায় যুকেশ পরিবার এইরূপ পরিবারের একটি জীবন্ত উদাহরণ। এই বংশের সন্তান-সন্ততিগণ পাঁচ পুরুষ ধরে কেবলমাত্র অপরাধ ও বেশ্যাবৃত্তিই করে এসেছে। পাঁচ-পুরুষে এদের সংখ্যা হয়েছিল স্ত্রী পুরুষে ৭০৯ এবং দুই-একজন ছাড়া এদের সকলেই অপরাধী বা বেশ্যা। আমেরিকার জনসন্ পরিবার অপর আর একটি দৃষ্টান্ত। তিন পুরুষ-ব্যাপী এদের অপরাধ বা বেশ্যাবৃত্তি করতে দেখা গিয়েছে। এই সব পরিবারের সন্তান-সন্ততিগণ জন্ম হতেই অপরাধী বা বেশ্যা ছিল, কিংবা তারা অপরাধমুখী হয়ে জন্মে অনুকূল অবস্থায় অপরাধীতে পরিণত হয়েছে—এই সম্বন্ধে কোনও রূপ অনুসন্ধান হয়েছিল কিনা তা অবশ্য জানা নেই। আমি শহর কলিকাতায়

এইরূপ নয়টি পরিবারের সন্ধান পেয়ে তাদের সম্বন্ধে খোঁজ-খবর করেছিলাম। এদেশে মাদরাল গ্রামের ঘোষাল ও ব্যানার্জি বংশের তুইটি শাখা এই বিষয়ের অন্যতম দৃষ্টান্ত।

আমি ইতিপূর্বে বলেছি যে, অপস্পৃহা কিংবা তার অংশ বা রূপ বিশেষ—দ্রব্য বা শোণিত-স্পৃহা কিংবা এই উভয় স্পৃহাই মানুষ মাত্রের মধ্যে সুপ্ত বা জাগ্রত অবস্থায় বিরাজ করে এবং এই স্পৃহাদ্বয় প্রতিটি ক্ষেত্রে বাহির হতে সংগৃহীত বা আগত হয় না। বলা বাহুল্য যে, বহু যুগ পূর্ব হতেই এই স্পৃহাদ্বয় মানুষের দেহ ও বীজকোষে স্থান পেয়েছে। নিরপরাধ মানুষের মধ্যে এই স্পৃহাদ্বয় থাকে সুপ্ত এবং অপরাধী মানুষের মধ্যে তারা থাকে জাগ্রত। এই উভয় প্রকার মানুষের যৌন-মিলন ঘটলে তাদের কতকগুলি সন্ততি হয় জাগ্রত-অপস্পৃহা সম্পন্ন অপরাধী কিংবা অপরাধমুখী এবং কতকগুলি সন্ততি হয় সুপ্ত-অপস্পৃহা সম্পন্ন নিরপরাধী। উপরের অপরাধী পরিবারের কাহিনীগুলিতে এরূপ যৌন-মিলনের বিষয় বলা হয়েছে।

আদিম যুগে কতকগুলি জীব আঘাত হেনে খাদ্য ও নারী সংগ্রহ করত। শুধু তাই নয়! তারা রক্তপাতেই অধিক অভ্যস্ত ছিল। তাদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত তুর্বল ও ভীরু প্রকৃতির ছিল, তারা অপরের নিহত জীব দেহ বা খাদ্য সামগ্রী চুরি করে আহার সংগ্রহ করত। এ'ছাড়া নারীও এরা সংগ্রহ করত গোপনে ও ভাব করে।

আদিম মানুষদের মধ্যেও এরূপ তুই শ্রেণীর ব্যক্তি দেখা যেত। নির্বিকার যৌনমিলনের ফলে তারা একীভূত হয়ে যায়। ফলে তাদের সন্ততিরা এই উভয় স্পৃহারই [জাগ্রত বা সুপ্ত ভাবে] অধিকারী হয়। আজিকার অপরাধী সমাজেও এরূপ কতকাংশে দৃষ্ট হয়। সক্রিয় [সবল] অপরাধীদের আমরা অতিমাত্রায় সাহসী ও পেশীবহুল দেখি এবং অন্যান্য [নির্বল]* অপরাধীদের আমরা দেখি অপেক্ষাকৃত তুর্বল ও ভীরু প্রকৃতির। অন্তর্স্বভাবের জন্যই তারা এরূপ হয়ে থাকে। এইসব কারণে একই অপস্পৃহার অংশ বা রূপ বিশেষ, —এই দ্রব্য ও শোণিত-স্পৃহা মানুষ মাত্রের মধ্যে সুপ্ত বা জাগ্রত রূপে বিরাজ করে বলে আমি মনে করি। কারণ যা'ই হোক না কেন! অপ-স্পৃহার এই অংশ বা রূপ তুইটি একত্রে বা পৃথক পৃথক ভাবে প্রত্যেক নিরপরাধ মানুষের মধ্যেই জাগ্রত বা সুপ্তভাবে অবস্থান করে। যে মানুষটির মধ্যে তার একটি বা অপরটি বা উভয় স্পৃহাই [প্রতিরোধ-শক্তির অভাবে] জাগ্রত হয় তাকেই

আমরা বলি অপরাধী। স্বভাব-অপরাধীদের মধ্যে উহা জন্মগতভাবে এবং অভ্যাস-অপরাধীদের মধ্যে উহা অভ্যাসগত ভাবে জাগ্রত হয়। আমার মতে এই স্পৃহাদ্বয় একটি বিশেষ পন্থায় বা ধারায় বংশগত হয়। এই কারণে কতকগুলি অপরাধীকে আমরা কেবল মাত্র শোনিতস্পৃহী, কতকগুলিকে কেবলমাত্র দ্রব্য-স্পৃহী এবং কতকগুলিকে আবার এই উভয় স্পৃহাসম্পন্ন দেখে থাকি। এইবার এই শোণিত এবং দ্রব্য-স্পৃহা কিরূপ উপায়ে বা পন্থায় নিরপরাধ মানুষের মধ্যে বংশগত হতে পারে সেই সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করা যাক। বুঝবার সুবিধের জন্য পূর্বোক্ত অধ্যায়ে বর্ণিত তালিকাটি নিম্নে পুনরায় উদ্ধৃত করা হ'ল।
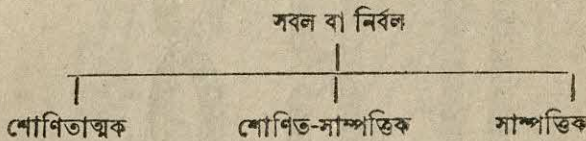
আমরা জানি, স্ত্রী-বীজ ও পুং বীজের মিলনের পর এক সময় উহাদের একটির ক্রোমসম অপরটির আনুক্রমিক ক্রোমসমের সহিত মিলিত হয়ে পুনরায় বিচ্ছিন্ন হবার সময় উহাদের অভ্যন্তরের 'দৈহিক ও মানসিক' গুণাগুণের বাহক ও ধারক জিন্ সমূহের উহাদের মধ্যে বিভিন্ন হারে বিনিময় হয়ে থাকে। নিম্নে [২২০ পৃঃ] উদ্ধৃত চিত্রটি হতে বক্তব্য বিষয়টি সম্যকরূপে বুঝা যাবে।

সাধারণ ভাবে এই সকল গুণাগুণ ম্যাণ্ডেল সাহেব আবিষ্কৃত রীতি-নীতি অনুযায়ী বংশগত হয় বলে আমি মনে করি। আমার মতে যে রীতিতে উহাদের
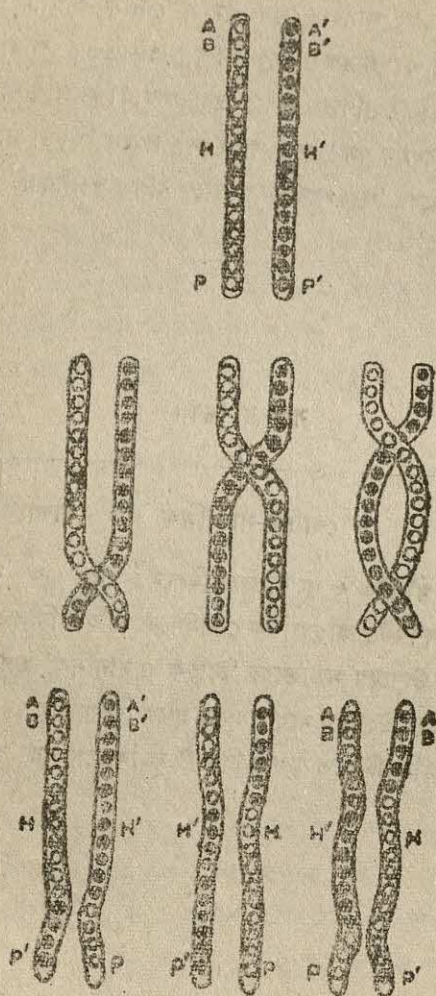
গাত্রবর্ণ প্রভৃতি বিবিধ দৈহিক গুণাগুণ বংশগত হয়, হুবহু সেই রীতিতে তাদের মানসিক গুণাগুণ বংশগত হয়ে থাকে। পার্শ্ববর্তী চিত্রে [২২১ পৃঃ] প্রদর্শিত নক্সাটি বক্তব্য বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে অনুধাবন করলে উহা বুঝা যাবে।

অপরাধ-বিভাগের সাহায্যে অপরাধী-বিশেষ কি প্রকারের অপরাধ করবে তা বলে দেওয়া যায়। কিন্তু তাদের অন্তর্নিহিত শোণিতাত্মক, সাম্পত্তিক বা
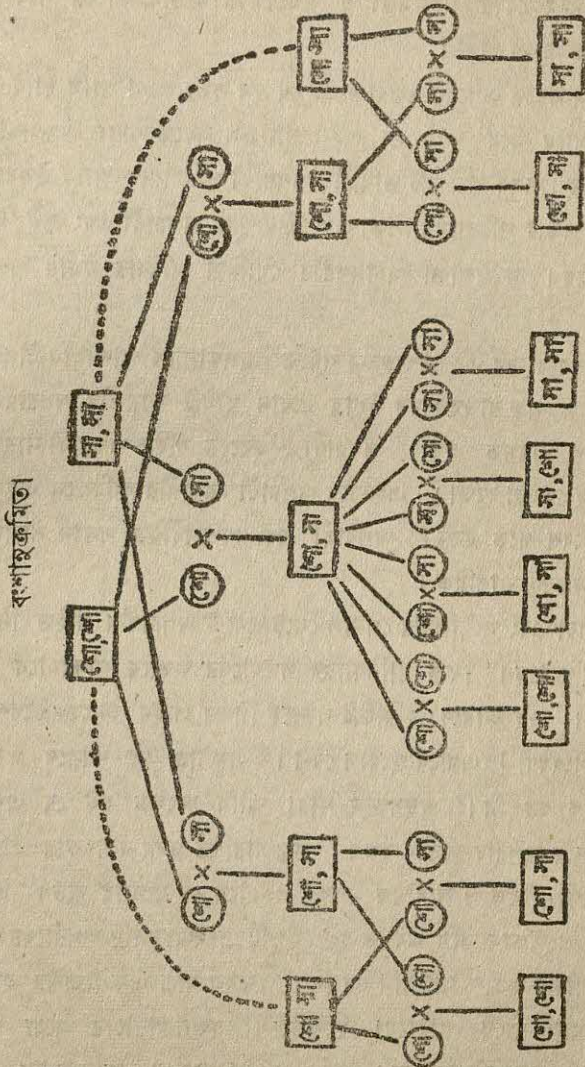
শোণিত-সাম্পত্তিক স্পৃহার সাহায্যে কিরূপে বা কি উপায়ে তারা ঐ অপরাধ সাধিত করবে তা নির্ভর করে তাদের কার্যপদ্ধতি বা মোডাস অপারেণ্ডির উপর। এই কার্য পদ্ধতির সহিত মনস্তত্ত্বের সম্পর্ক অত্যন্ত অল্প। কোনও

অপরাধী বিশেষ এক কার্য পদ্ধতির সাহায্যে যদি একবার সফলতা অর্জন করে তা'হলে তারা সেই বিশেষ কার্যপদ্ধতিটিকেই আঁকড়ে ধরে থাকে। অপরাধীদের কম বে'শী শক্তিমত্তা ও ঔৎসুক্যের অভাব, তাদের সংস্কার ও দলগত শিক্ষাও এজন্য দায়ী।

বংশানুক্রম সম্বন্ধে উপরের মন্তব্যগুলিই যে ধ্রুব সত্য এরূপ আমি দাবি করি না। বরং আমি মনে করি যে এই বংশানুক্রম সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। এমন কয়েকটি ভারতীয় অপরাধী পরিবারকে আমি উত্তমরূপে জানি তাদের একটি পরিবারের পিতা এবং তিন পুত্রই অপরাধী এবং দুই কন্যা বেশ্যা বৃত্তি করে। কলিকাতা মহানগরীর গৌরিয়া পরিবার ইহার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

আমি অপরাধীদের এই বংশানুক্রম সম্বন্ধে অনুসন্ধানার্থে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে গমন করি। ইংরাজ রাজত্বকালে ইহার প্রধান দ্বীপটি ভারতীয় অপরাধীদের উপনিবেশরূপে ব্যবহৃত হত। অপরাধী পুরুষদের সহিত অপরাধী নারীদের এখানে বিবাহ দেওয়া হতো। এইভাবে অপরাধী নরনারীর সংমিশ্রনে এইখানে একটি উপনিবেশ গড়ে উঠে। অপরাধী এবং অপরাধীণীর সন্তান সন্ততিগণ এই দ্বীপের অন্যতম নাগরিক।

সাইবেরিয়া এবং অষ্ট্রেলিয়ার পেনাল সেটেলমেন্টে অপরাধীর সহিত নিরপ-রাধীর বিবাহ ঘটেছে। কিন্তু পারিবারিক সংযোগের অভাবে আন্দামানে উহা সম্ভব হয় নি। এই কারণে হেরিডিটি সম্পর্কে পিওর লাইন ইনভেসটিগেশনের [নির্ভেজাল গবেষণা] এখানে সুযোগ বেশী। একমাত্র এই কারণে আমার উদ্দেশ্য বিফল হয় নি। অনুসন্ধান দ্বারা আমি অবগত হই যে এখানে সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধ অতীব কম। কিন্তু মারপিঠ জখম বলাৎকার প্রভৃতি ব্যক্তির বিরুদ্ধে যৌনজ ও অযৌনজ অপকর্ম এইখানে বহু সংখ্যায় ঘটে। ইহার কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে অবগত হই যে চুরি প্রবঞ্চনা আদি অপরাধের জন্য কাহারও দ্বীপান্তর তথা কালাপানি হয় নি। কেবল মাত্র এক শ্রেণীর হত্যা-কারীদের এই দ্বীপে পাঠানো হয়েছিল। হত্যাকারীদের মধ্যে যারা পেশাদারী খুনে তাদের সাধারণতঃ ফাঁসি দেওয়া হতো। কিন্তু যারা মাত্র ক্রোধের বশবর্তী হয়ে স্বামীকে, স্ত্রীকে, পরস্ত্রীকে বা ভ্রাতাকে হত্যা করেছিল, তাদেরকেই ফাঁসি না দিয়ে [দ্বীপান্তরের সাজা দ্বারা] এই দ্বীপে পাঠানো হতো। যৌনজ কারণে বিষ প্রদানে স্বামী হত্যাকারীণীদেরকে'ও এখানে

পাঠানো হয়েছিল। এই কারণে ঐ দিনকার ক্রোধী অসংযমী নর-নারীর সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে উগ্রপ্রকৃতির মানুষের বাহুল্য এইস্থানে আমরা দেখতে পাই। কিন্তু এই কথা ভুলে গেলে চলবে না যে এদের, অপরাধী পূর্বপুরুষদের পিতামাতা, পিতামহ, প্রপিতামহরা সকলেই অপরাধী ছিলেন না। এইজন্য অধুনাকালে উন্নততর শিক্ষা ও পরিবেশের মধ্যে পড়ে এইখানকার জনগণের মধ্যে যারা শিক্ষিত ও ভদ্র তাদের মধ্যে পূর্বেকার উগ্রস্বভাব-মানুষ কম দেখা যায়। এক্ষণে এখানকার শিক্ষিত জনগণ বর্তমান স্বাধীন ভারতের উন্নততর সাধুপ্রকৃতির নাগরিক।

উপরের এই অনুসন্ধান দ্বারা আমাদের সুপ্ত বা জাগ্রত অপস্পৃহার অংশ বিশেষ শোণিত ও দ্রব্য-স্পৃহা যে পৃথক পৃথক রূপে বংশগত হয় তা প্রমাণিত হয়। এতদ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় যে আমাদের অপস্পৃহা দ্রব্য ও শোণিত—এই উভয় স্পৃহাতে বিভক্ত।

আন্দামান দ্বীপে পরিদৃষ্ট বংশানুক্রম অনুধাবন করলে এইরূপ প্রতীত হবে যে, মানুষের স্বভাব-চরিত্র তাহাদের বংশানুক্রম, পরিবেশ এবং শিক্ষা-দীক্ষা এই তিনটি মূল বস্তুর মধ্যপথ [রেসালটেন্ট] অবলম্বন করে প্রবাহিত হয়ে থাকে।

সাধারণতঃ দেখা গিয়েছে যে জলবায়ু, খাদ্য এবং দৈহিক গঠন প্রভৃতির অপ্রত্যক্ষ পরিবেশের কারণে এক-এক দল অপরাধী এক-এক প্রকারের অপরাধ করে থাকে। অর্থাৎ কে সরল চোর, ডাকাত বা প্রবঞ্চক হবে তা বলে দেওয়া যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে ইহা বংশগত হওয়ার পর ঐ পরিবেশ হতে মুক্ত হওয়ার পরও তাদের স্ব-স্ব শ্রেণী অনুযায়ী তারা ঐ একই প্রকারের স্পৃহা অর্জন করেছে।

এই বিশেষ গবেষণা ক্ষেত্রে গবেষণা করার জন্য কলিকাতার পাঁচমেশালী মহানগরীই সর্বোত্তম স্থান। এইখানে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের এবং সম্প্রদায়ের এবং কৃষ্টির মানুষ বাস করে। সংগৃহীত পরিসংখ্যা হতে আমি দেখেছি যে বাঙালীদের মধ্যবিত্তেরা উড়িয়া ও মাদ্রাজীর ন্যায় অধিক সংখ্যায় দক্ষ প্রবঞ্চক হয়। কিন্তু বাঙালীর নিম্নশ্রেণীরা পাঞ্জাবী ও নেপালী ব্যক্তিদের মত অধিক সংখ্যায় সুদক্ষ ডাকাত হয়ে থাকে। অপর দিকে দেশবালী ও নেপালীরা অধিক সংখ্যায় দক্ষ তালা-তোড় এবং বাঙালী ও দেশবালী মুসলমানরা অধিক সংখ্যায় সুদক্ষ পিকপকেট হয়ে থাকে। এ'ছাড়া এই মুসলমানরা ছুরিকা

ব্যবহারেও বিশেষ ওস্তাদ। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে দেশবালী ও বাঙালী মধ্যবিত্তরা লাঠি ব্যবহার করেছে।

সাধারণভাবে উপরের তথ্যসমূহ সত্য হলেও আধুনিককালে বাঙালী মধ্যবিত্তদের ছুরিকা ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছে। এ'ছাড়া এ'রা আগ্নেয়াস্ত্র সহযোগে ডাকাতিও করছে। এর কারণ সম্বন্ধে অবগত হতে হলে ইতিহাস পর্যালোচনার প্রয়োজন আছে। আমার মতে সম্প্রতিকালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য প্রতিরোধ ও প্রতিশোধ গ্রহণার্থে তারা বাধ্য হয়ে ছুরিকা ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়। অনুরূপভাবে রাজনৈতিক চেতনার কারণে সর্বপ্রথম তারা আগ্নেয়াস্ত্র সহযোগে ডাকাতি শুরু করে। দুই-তিন পুরুষের মধ্যে তাদের এই সংগৃহীত বৈশিষ্ট্য আদর্শ জনিত উগ্র ইচ্ছার কারণে গণবাক্-প্রয়োগে'র [মাস্-সাজেস্শন] স্থলাভিষিক্ত হয়ে সামগ্রিক ভাবে বাঙালী মধ্যবিত্তদের বংশগত হয়ে গিয়েছে। এই কারণে আজও বাঙালীর নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিরা ছুরিকা ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার না করলেও উহার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর [রাজনৈতিক চেতনা যুক্ত] ব্যক্তিরা এই ছুরিকা ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে। এই হতে প্রমাণিত হবে যে, বংশগত স্পৃহা ও ধারণা সর্বদাই জলবায়ু খাদ্য ও দৈহিক গঠন অতিক্রম করে অভ্যাস দ্বারা বিবিধ বৃত্তিকে বাড়িয়ে বা কমিয়ে নিতে পারে। পরে কালক্রমে এই সকল সংগৃহীত বৈশিষ্ট্য তাদের এই উগ্র ইচ্ছাজনিত বীজকোষকে প্রভাবিত করে বংশগত হলেও হতে পারে।

এইবার আধুনিকতম গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে এই বংশানুক্রম সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করবো। অধুনা এই সম্বন্ধে পৃথিবীর অন্যত্র সাম্প্রতিক কালে বহু গবেষণা হয়েছে।

[পৃথিবীর পণ্ডিতরা দৈহিক বংশানুক্রম সম্বন্ধে গবেষণা করেছেন বটে! কিন্তু আমি আমার এই থিসিসে মানসিক বংশানুক্রম সম্বন্ধে প্রথম বিবৃত করেছি।]

উল্লেখ্য এই যে সম্প্রতি কালে কয়েকটি পূর্বতন পেনাল সেটেলমেণ্ট তথা বন্দী উপনিবেশে অপরাধীদের মধ্যে এগ্রেসীভ তথা আক্রমণাত্মক ক্রোমজম পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু উহারা মাত্র ঐ স্থানের পুরুষ অপরাধীদের মধ্যে আবিষ্কৃত হয়েছে। আশ্চর্য এই যে, উহা কোনও নারীদের মধ্যে এতাবৎ কাল পাওয়া যায় নি। অদূর ভবিষ্যতে অ-বল প্রয়োগী সাম্পত্তিক অপরাধ সম্পর্কিত ক্রোমজম আবিষ্কারও সম্ভব। ইহা প্রমাণ করে যে পুরুষদের মত নারীদের

দেহ-কোষে স্বল্প অপরাধ স্পৃহা থাকলেও নারীদের ক্ষেত্রে পুরুষদের মত বীজ কোষে উগ্র অপরাধ স্পৃহা প্রায় নেই। এতে বুঝা যায় যে, তদস্থলে উহাদের বীজ-কোষে বেশ্যাস্পৃহা [পলিগেমেটিক টেণ্ডেন্সী] অধিক। অপরাধ স্পৃহার ন্যায় পুরুষদের লাম্পট্য এবং নারীদের বেশ্যা-স্পৃহা দেহ ও বীজ কোষে কম বেশী আছে।

"অতি দীর্ঘ দেহী এবং অত্যন্ত আক্রমণাত্মক পুরুষদের মধ্যে ৪৮ টি ক্রোমজম এবং একটি X Y Y যৌন ক্রোমজম রয়েছে। উপরোক্ত বন্দী প্রতিষ্ঠানে মাত্র পুরুষ অপরাধীদের মধ্যে উহা পাওয়া গিয়েছে। এদের বহুজনের মধ্যে [তবে সকলে নয়] কিছুটা মানসিক অস্থিরতা এবং মনোবিকার দেখা গিয়েছে। স্বাধারণতঃ Y Y পুরুষরা X X নারীদের অপেক্ষা প্রায়ই দীর্ঘ দেহী এবং অধিক আক্রমণাত্মক হয়ে থাকে। পুরুষদের মধ্যে Y Y Y আবিষ্কার দ্বারা [তৎজনিত ওদের ঐ স্বভাব প্রাপ্তি] বুঝা যায় যে একটি অতিরিক্ত Y ক্রোমজম উহার জন্য দায়ী। এই XYY পুরুষদের দ্বারা জাত কিছু অপত্যদের সম্পর্কে ওইরূপ পরীক্ষা করা হয়ে ছিল। কিন্তু উহাদের ঔরসজাত কোনও X YY পুত্র দৃষ্ট হয় নি। অনুমিত হয় যে এই সকল X Y Y ক্যারিওটাইপ এবং অস্বাভাবিকতার মধ্যে একটি পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে। এমন হতে পারে যে উহা সুপ্ত বা জাগ্রত রূপে থেকেছে। এই X Y Y পুরুষের জন্মের হার [ফ্রিকোয়েন্সী] সম্বন্ধে এখনও কিছুই জানা যায় নি। প্রতীত হয় যে দু'হাজার পুরুষ-শিশুর মধ্যে উহা সাধারণতঃ জাগ্রত রূপে বর্তায়। বীজ কোষের অন্যান্য সঙ্ঘটন ও পরিবেশ X Y Y শিশুদের ফেনোটাইপ অদল বদল করতে সক্ষম।

পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে স্বাভাবিক নারীর × ক্রোমজমের জিনের দ্বিগুণতা [Double Dose] পুরুষদের ঐ সম্পর্কীত একটি পরিমাণ তথা সিঙ্গিল ডোজ অপেক্ষা অধিক কার্যকরী নয়। সম্ভবত উহাদের দুইটির মধ্যে একটি অক্ষম বা নিষ্ক্রিয় থাকে। কিন্তু দৈহিক ও মানসিক বিকৃতির জন্য এক প্রকারের সেক্স-ক্রোমজম দায়ি। অন্যদিকে অধিক এবং স্বল্প বয়স্কা নারীর অপত্যদের মধ্যে গুণগত পার্থক্য দেখা যায়। সম্ভবত যৌন-পিণ্ড [ZYGOTE] সৃষ্টির পর উহার ক্রম-বিভক্তি [Cleavage] কালে অধিক বয়স্কা নারীদের ক্ষেত্রে তাতে তেমন কিছু ঘটেছে। ওভাম ও পরে ভ্রূণের মধ্যেও ওরূপ কিছু হয়ে থাকে। কোনও ক্রোমজমে ক্ষতিপূরক গুণাগুণও

থাকতে পারে। ক্ষতিকারক ক্রোমজমে হয় তো উহা প্রতিষেধক রূপে কার্য করেছে।

দেশীয় ভাষাতে ক্রোমজমকে গুণ-দণ্ড এবং জিনকে দব্যাহ্ন বা গুণ-বিন্দু বলা হয়। ওভা ও স্পার্ম'কে যথাক্রমে স্ত্রীবীজ ও পুংবীজ এবং জাইগোটকে যৌন পিণ্ড ও ক্লিভেজকে ক্রম-বিভক্তি বলা হয়। পলিগেমেটিক টেণ্ডেন্সিকে বহু পতিত্ব-বোধ এবং পুরুষের প্রতি নারীর একনিষ্ঠাকে সতীত্ব বলা হয়। পুরুষের নির্বিকার যৌনক্রিয়াকে লাম্পট্য বলা হয়। বহু পত্নিকতা পুরুষের নূতনত্ব-প্রিয়তা হতে সৃষ্ট।

এদেশে স্বামীদের বধুরা প্রায়ই তাদের স্বামীদের অপেক্ষা বহু বৎসর কম বয়স্কা হন। প্রৌঢ় পুরুষদের শয্যা সঙ্গিনীদের সন্তুষ্ট করার মত মানসিক অবস্থা মুহুর্মুহু থাকে না, কিন্তু সাধ্বী স্ত্রীরা যা কিছু পাবার তা স্বামীর নিকট হতেই পেতে চান। তাঁরা এজন্য বারে বারে তাদের পরিশ্রান্ত নিদ্রাকাঙ্ক্ষী স্বামীদের উত্যক্ত করে তাদের ঘুমতে দেন না।

বউ রাণীদের বুঝা উচিৎ যে, তাঁদের কারও স্বামীর মধ্যে আক্রমণাত্মক তথা এগ্রেসীভ ক্রোমজম থাকতে পারে। সেই ক্ষেত্রে কিছুটা ক্রোধ ও কিছুটা অক্ষমতার গ্লানিতে তাদের মধ্যে উন্মাদনা আসা সম্ভব। সেই অবস্থায় প্রতিরোধ শক্তির হানি ঘটলে তাঁদের দ্বারা পত্নী হত্যা সম্ভব। পর মুহূর্তে অবশ্য এজন্য ঐ স্বামী অনুতাপে জর্জ্জরিত হবেন। কিন্তু তা দেখতে তখন বৌরানী সেখানে উপস্থিত থাকবেন না।

[যৌনবোধ একটি সাংঘাতিক প্রয়োজনীয় বস্তু। ইহার ত্রুটিতে স্বামী স্ত্রীতে খটা খটি বাধে। অতৃপ্ত স্ত্রী অযথা কলহ মুখর হন। অন্যদিকে—বিকৃত যৌন-বোধীদের ঐরূপ কলহ না করলে যৌন বোধ আসে না। তজ্জন্য ইচ্ছা করে স্বামীর দ্বারা প্রহৃত হওয়াই স্ত্রীর পছন্দ।

কিছু ক্রোমজমবাহী পূর্ব পুরুষদের গুণাগুণ [মাথার টাক আদি] নারীদের মধ্যে সুপ্ত ভাবে বাহিত হয়ে তাদের পুত্রদের মধ্যে মাত্র জাগ্রত হয়েছে। অর্থাৎ উহা পুরুষদের মধ্যে জাগ্রত হয় ও নারীদের মধ্যে সুপ্ত থাকে। নারীরা উহা মাত্র পুত্রদের জন্য বহন করে।

আমি পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে বলেছি যে কুচিন্তা ও কুকর্ম এবং সু-চিন্তা ও সু-কর্ম যথাক্রমে অপরাধ-স্পৃহা বা সৎপ্রেরণা জাত ও নির্গত করে। ঐ সম্পর্কিত বহু মতবাদের একটিতে বলেছি যে দেহে উপকারী ও অনুপকারী হরমন

যথাক্রমে সুচিন্তা ও সুকর্ম এবং কুচিন্তা ও কুকর্ম দ্বারা নির্গত হওয়ার জন্য উহা হয়ে থাকে।

এখানে বিবেচ্য বিষয় হবে এই যে, এই বিবিধ অনুপকারী বা উপকারী রস ধমনীর মাধ্যমে স্নায়বিক প্রতিক্রিয়ার দ্বারা বীজ-সারকেও [Gamate] প্রভাবান্বিত করে ঐরূপে উদ্ভূত অপস্পৃহা কিংবা সৎপ্রেরণাকে বংশগত করে দিতে পারে কি ? দুই এক ক্ষেত্রে আমি প্রকৃত অপরাধীদের অপস্পৃহাকে বংশগত [inherited] হতেও দেখেছি। কিন্তু অপরাধী-রোগীদের অপস্পৃহা আমি বংশগত হতে দেখি নি। সম্ভবতঃ মনোরোগ কম মাত্রায় থাকলে স্নায়ুকে প্রভাবিত করে বীজ-সারে সংক্রামিত হয় না। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে কঠিন উন্মাদ রোগকে বংশগত হতে দেখা গিয়েছে। উৎকট অপরাধীদের [Moral insane] সহিত প্রকৃত পাগলদের নিকট সম্পর্ক রয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে মাতা ও পিতা উভয়ে উন্মাদ না হলে উহা উগ্র হয় না। কারণ একজনের স্বাভাবিকতা অন্যজনের অস্বাভাবিকতা প্রতিরোধ করতে সক্ষম। এ ছাড়া মাতৃকুল ও পিতৃকুলের উর্দ্ধতন পূর্ব পুরুষদের প্রভাব এবং স্ব-অর্জিত প্রতিরোধ শক্তির প্রশ্ন উহাতে থাকে।

বংশানুক্রম সম্পর্কিত জীব-সার মতবাদ তথা জার্ম প্লাসাম থিওরী প্রাচীন ভারতে ঋষি লাদায়ন ও ঋষী দলভ্য বিস্ময়করূপে উপলব্ধি করেছিলেন। এই সম্বন্ধে প্রামাণ্য সংস্কৃত শ্লোকগুলি সম্বন্ধে আগ্রহীরা মৎপ্রণীত বৃহৎ গ্রন্থ 'হিন্দু প্রাণী বিজ্ঞান' পাঠ করুন।

বিঃ দ্রঃ—আমি কয়েকটি পরিবারের তিনটি পুরুষ অনুধাবন করেছি। এদের প্রথম পুরুষে প্রায় সকলেই অপরাধী বা অপরাধমুখী। কিন্তু দ্বিতীয় পুরুষে এদের কিছু ব্যক্তি অপরাধী হলেও ওদের কয়েক ব্যক্তিকে সৎ দেখা যায়। কিন্তু ওদের তৃতীয় পুরুষের তরুণদের সকলেই নিরপরাধী।

সম্ভবতঃ সৎ পরিবারগুলি হতে ঐ পরিবারে বধূ সংগৃহীত হওয়াতে ওদের অপরাধ স্পৃহা ধীরে ধীরে নিউট্রেলাইজড্ হয়ে গিয়েছে। কিংবা ওদের স্থূল বৃত্তি কম ব্যবহারে এবং সূক্ষ্ম বৃত্তি বেশী ব্যবহারে ওদের মধ্যে স্থূল বৃত্তি নিষ্ক্রিয় এবং সূক্ষ্মবৃত্তি সক্রিয় হয়েছে।

॥ ১১ ॥

মুল উপকরণ

গবেষক ছাত্রদের অপরাধ-স্বত্ত্ব সম্পর্কিত গবেষণার্থে নিম্নোক্ত কয়টি মূল তথ্য স্মরণে রেখে ওদের একত্রে বিবেচনা করতে হবে।

(১) অপরাধ স্পৃহা কিংবা সৎ প্রেরণা মানুষের যৌন-স্পৃহাকে নিয়ন্ত্রিত করে। যৌন স্পৃহা অপরাধ-স্পৃহা-বাহী হলে উহা যৌনজ অপরাধ। কিন্তু সৎ প্রেরণা-বাহী হলে উহা নিকষিত হেম প্রেম।

মানুষের বীজকোষে রিসেসিভ বা সুপ্ত থাকা 'পূর্ব পুরুষদের দ্বারা অতীত কালে অর্জিত কোনও দৈহিক কিংবা মানসিক গুণাগুণ দৈবাৎ তার কোনও এক উত্তর পুরুষের দেহকোষে কম বেশী উপনীত হয়ে জাগ্রত তথা ডমিনেণ্ট হলে মানসিক গুণাগুণের ক্ষেত্রে উহাকে মানসিক গোত্রানুক্রম এবং দৈহিক গুণাগুণের ক্ষেত্রে উহাকে দৈহিক গোত্রানুক্রম বলা হয়।

[এই উভয় গোত্রানুক্রম একত্রে কিংবা পৃথক পৃথক ভাবে কোনও এক ভবিষ্যত বংশীয় শিশুর মধ্যে উপগত হতে পারে।]

ওই বীজকোষের অপরাধ স্পৃহা দৈবক্রমে মানসিক গোত্রানুক্রম দ্বারা দেহকোষের অপরাধ স্পৃহার সহিত মিলিত হলে মানুষ উহার ক্রম মত কম বেশী স্বভাব অপরাধী হয়। কিন্তু দৈহিক গোত্রানুক্রমের সহিত স্বভাব অপরাধীদের জন্মের কোনও সম্পর্ক নেই। অন্যদিকে—বীজকোষের উক্ত অপরাধ-স্পৃহার সংযোগ ব্যতিরেকে কেবল মাত্র দেহকোষে অবস্থিত অপরাধ-স্পৃহা অভাব লোভ আদির কারণে অবচেতন মন হতে চেতন মনে এনে প্রচেষ্টা দ্বারা উহাকে বর্দ্ধিত করে কেহ অপরাধী হলে, সেই ব্যক্তি অভ্যাস-অপরাধী।
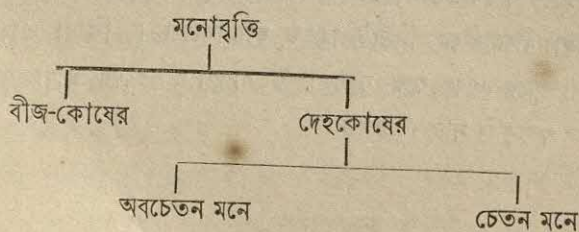
উপরোক্ত তথ্য হতে বুঝা যায় যে, বীজকোষের অপরাধ স্পৃহা দেহকোষের

অপরাধ স্পৃহার সহিত মিলিত হতে পারে। সেই অবস্থায় উহার বীজকোষের সহিত আর সম্পর্ক থাকে না। উহা তখন উভয় অপরাধ স্পৃহার মিশ্রণ হেতু দেহ কোষের অত্যুগ্র অপস্পৃহা। এখানে দেহকোষ অর্থে মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম-স্নায়ুর কোষ বুঝায়। উহা তখন মাত্র মস্তিষ্কের তথা মনের অধিকার-ভুক্ত বিষয়। এইজন্য অপরাধ-স্পৃহা মানুষের দেহকোষের একক অপস্পৃহা কিংবা দেহ ও বীজ কোষের মিশ্র অপ-স্পৃহা হোক না কেন, উভয় ক্ষেত্রেই উহা মানুষের চেতন মনে কিংবা অবচেতন মনে থাকে। অবচেতন মনে থাকলে উহাকে সুপ্ত এবং চেতন মনে এলে উহাকে জাগ্রত বলা হয়।

[বুঝতে হবে দেহকোষে কতোটা অপরাধ-স্পৃহা ছিল এবং বীজকোষের অপস্পৃহা উহাতে কতোটা মিশ্রিত হলো। এর পর বুঝতে হবে যে দেহ-কোষের একক অপ-স্পৃহা কিংবা দেহ ও বীজ কোষের সম্মিলিত অপরাধ-স্পৃহা কতোটা অবচেতন মন হতে চেতন মনেতে এলো। তারপর জানতে হবে যে, চেতন মনের অপরাধ-স্পৃহা কিরূপ পরিমাণে ব্যবহার বা অপব্যবহার দ্বারা কমলো বা বাড়লো। বহুক্ষেত্রে—চেতন মন হতে অপস্পৃহা অবচেতন মনে পুনরায় ফিরানো হয়েছে।

আদিম অপরাধ স্পৃহার মত মানুষের [পরবর্তীকালে অর্জিত] সৎ প্রেরণাও ওদের বীজকোষ ও দেহকোষে স্থান নিয়েছে। অপরাধ স্পৃহার মত সৎ প্রেরণাও মানুষের অবচেতন ও চেতন মনে রয়েছে। উহাকেও অপরাধ-স্পৃহার মত ব্যবহার ও অব্যবহার দ্বারা বাড়ানো বা কমানো যায়। তবে—সৎপ্রেরণা আসা মাত্র উহার ক্রম মত অপরাধ-স্পৃহা কম বা বেশী তিরোহিত হয়েছে। কারণ ওদের একটি অন্যটির উল্টা বৃত্তি হয়ে থাকে।

[একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক অপরাধ-স্পৃহা বা সৎপ্রেরণা সূক্ষ্ম স্নায়ুকে আহত করে মানুষকে সমভাবে ওদের ক্রম মত বিকৃত মনা কিংবা উন্মাদ করে। এজন্য শিশু ভাবাপন্ন কিছু অপরাধীর মত কিছু প্রাথমিক সাধককেও কমবেশী উন্মাদের মত দেখা গিয়েছে। (f)

কিন্তু—এই মতবাদ শেষ অবস্থার সাধক তথা মহাপুরুষ ও শেষ অবস্থার প্রকৃত অপরাধীদের সম্বন্ধে প্রযোয্য নয়। কারণ—ঐরূপ ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে

(f) মানুষকে যা সয়ানো যায় তার চাইতে বেশী সয়ালে তারা ভেঙে পড়ে। য়ুরোপীয়দের ট্রান্সমেনিয়া আদিবাসীকে দ্রুত সভ্য করার চেষ্টায় তাদের বংশ আজ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

দ্রুত ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হেতু ওই দূরবস্থা তারা এড়াতে পেরেছে। স্বভাব-অপরাধীদের ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন মহাপুরুষদের মত দ্রুত হওয়াতে কোনও কোনও অভ্যাস-অপরাধীদের মত তারা বিকৃত মনা হয়নি।

স্নায়ু প্রবাহ তথা ব্রেন ওয়েভ [ইলেকট্রোড] প্রভৃতির সহিত শ্বাস প্রশ্বাস ও রক্তের চাপের সম্পর্ক রয়েছে। ঐগুলির উত্থান ও পতন এবং গতির দ্বারা অপরাধ-স্পৃহার ভারী ও সৎ প্রেরণায় হাল্কা প্রবাহের পরিমাপ করা সম্ভব। ওই গুলির পরিমাপের জন্য ভবিষ্যতে সেনসেটিভ ইলেকট্রনিক যন্ত্রাদি আবিষ্কৃত হতে পারে। সেই ক্ষেত্রে উহা অনুমানভিত্তিক না হয়ে কমপিউটার-ভিত্তিক হবে। সৎ প্রেরণা ও অপরাধ স্পৃহার পরিমাণাঙ্ক বার করতে পারলে ওদের চিকিৎসা কার্য: সহজ হবে। বর্তমানে উহা পরিদর্শন, অনুসন্ধান ও অনুধাবন দ্বারা অবগত হওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—প্রমাণ স্বরূপ বলা যায় যে উত্তেজনা সৎপ্রেরণা বহির্গত না করে মাত্র অপরাধ স্পৃহা বহির্গত করে। উহাদের ভারি ও হাল্কা প্রবাহ ও পৃথক স্বরূপ উহা প্রমাণ করে। ক্রোধ হিংসা আদি স্থূল বৃত্তিতে উত্তেজনা থাকে। কিন্তু দয়া মায়া আদি সূক্ষ্ম বৃত্তিতে উহা না থেকে স্নিগ্ধতা থাকে।

[অপরাধীদের স্থায়ী নিরাময়ের জন্য মনোবিশ্লেষণ দ্বারা অবচেতন মনের অপরাধ স্পৃহাকে চেতন মনে আনতে হবে। তারপর উহার পরিমাণ বুঝে উহাকে নির্মূল করতে বিবিধ চিকিৎসার সাহায্য গ্রহণীয়। সেই সঙ্গে ওদের সৎ প্রেরণাকে ক্রমান্বয়ে বহির্গত ও উদ্বেলিত করে ওদের অপস্পৃহাকে ধীরে ধীরে তরলীকৃত করে উহাকে নিশ্চিহ্ন করা যায়।]

মানুষ প্রথমে অপরাধ স্পৃহা ও তার বহু পরে যে সৎপ্রেরণা প্রাপ্ত হয়েছে তা শিশুদের ক্রমিক মানসিক বিবর্তন প্রমাণ করে। মানসিক ক্ষেত্রেও বলা যেতে পারে অন্টেজনি রিপিটস ফাইলোজনী। [অর্থাৎ—ব্যষ্টি-ক্রম গোষ্ঠি-ক্রমের জৈব পুনরাবৃত্তি]

নিরাপরাধ সভ্য মানবদের শিশুদের মধ্যে অপরাধী আদি মানব হতে প্রাপ্ত কম বেশী ¾ ভাগ অপরাধ স্পৃহা এবং পরবর্তী সভ্য পূর্ব পুরুষ হতে প্রাপ্ত কম বেশী ¼ অংশ সৎভাব [সৎপ্রেরণা] থাকে। কিন্তু কিছুটা বয়ঃ প্রাপ্তির পর তাদের ঐ চরিত্র ঠিক উল্টা হয়ে যায়। অর্থাৎ তখন তাদের মধ্যে ¾ অংশ সৎভাব এবং ¼ অংশ অপরাধ-স্পৃহা দেখা যায়। এই ভাবে বয়ঃ প্রাপ্তির সহিত ওদের মধ্যে ধীরে ধীরে অপস্পৃহার হার কমতে এবং সৎ ভাবের হার বাড়তে

থাকে। পরিবেশ মত উহা কারও মধ্যে দ্রুতগতিতে ও কারও মধ্যে মন্থরগতিতে হয়।

ওই শিশুদের জন্তুদের প্রতি উৎপীড়ন করার মত ওদেরকে তারা যত্নও করে থাকে। উহারও ব্যাখ্যা করার মত কিছু তথ্য উপস্থিত করা যেতে পারে।

'প্রথমে বন্য মানুষ আত্মরক্ষার্থে জন্তুদের সহিত নিষ্ঠুরভাবে যুদ্ধরত ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তারা পশু পালন ও কৃষি কার্য করতে শিখলে তারা তাদের প্রতি দয়ার্দ্র হয়। সেই কারণে শিশুদের মধ্যে জন্তুদের সম্বন্ধে পূর্বাপর উভয়বিধ ব্যবহার দেখি। পশু-নিধনী খাদ্য-সংগ্রহী মানুষ অপরাধ-প্রবণ ছিল। পশু পালন ও কৃষিকর্মে ওরা সৎপ্রেরণার অনুশীলন করে। এই উভয় কালের ক্ষণ ওইরূপ পরিবর্তনে ব্যয়িত ক্ষণ হতে বুঝা যায়। এই ভাবে অপরাধ স্পৃহার কম বেশী পরিত্যাগ এবং সৎপ্রেরণার কম বেশী গ্রহণের ক্ষণ নির্ধারণ সম্ভব।'

[আদি-মানব কম বেশী শান্ত পশু পালন করাতে তারা নিজেরাও কম বেশী শান্ত প্রকৃতির হয়। এই পশুরাই মানুষকে সভ্যতার পথে এগিয়ে দিয়েছে। এই পশুদের সাহায্য মানুষের সভ্যতা অর্জনে অপরিহার্য ছিল।]

মনোদেশে সূক্ষ্মবৃত্তি ও স্থূলবৃত্তির শক্তি কম বেশী সমান থাকলে মানুষ কম বেশী নিরপরাধী থাকে।

সূক্ষ্মবৃত্তির শক্তি কম ও স্থূলবৃত্তির শক্তি বেশী হলে মানুষ প্রথম পর্যায়ের তথা প্রাথমিক অপরাধী। এদের ব্যবহার ও চরিত্র সাধারণ মানুষের মত থাকে। কিন্তু ওদের সূক্ষ্মবৃত্তি বিলুপ্ত প্রায় ও স্থূলবৃত্তি অমিতবলী হলে তারা শেষ পর্যায়ের প্রায় একাচারী প্রকৃত অপরাধী। এদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের অবরোহী তথা নিম্নমুখী পরিবর্তন হওয়াতে এরা বহিঃ ইন্দ্রিয়-জাত দৈহিক [ফিসিক্যাল] অতীন্দ্রিয়তা প্রাপ্ত হয়।

অন্য দিকে—স্থূলবৃত্তির শক্তি কম এবং সূক্ষ্মবৃত্তির শক্তি বেশী হলে মানুষ প্রথম পর্যায়ের সাধক বা সৎলোক। এরা প্রাথমিক অপরাধীদের মত লোক সমাজে বাস করে। এদের স্বভাব চরিত্রও কম বেশী সাধারণ মানুষের মত থাকে। কিন্তু স্থূলবৃত্তি বিলুপ্ত প্রায় ও সূক্ষ্মবৃত্তি অমিতবলী হলে তারা সাধনার শেষ পর্যায়ে উপনীত একাচারী মহাপুরুষ। এরা সম্ভবত অনুশীলন দ্বারা প্রেম-বৃত্তিকে তরলীকৃত করে উহারও উর্ধে অন্য এক বৃত্তি সৃষ্টি করে দিব্যদৃষ্টি লাভ

করে। ওঁদের মধ্যে উচ্চমুখী আরোহী ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হওয়াতে ওঁরা উচ্চমার্গের মস্তিষ্কজাত মানসিক [মেনট্যাল] অতীন্দ্রিয়তা প্রাপ্ত হন।

মহাপুরুষদের মধ্যে অলৌকিক শক্তি উক্তরূপে অর্জন করা সম্ভব কিনা সেই সম্বন্ধে আমি অজ্ঞ হলেও প্রকৃত অপরাধীদের দৈহিক অতীন্দ্রিয়তায় আমি বিশ্বাসী : তবে—পুরানো পাপীরা উহা মস্তিষ্কের ক্ষয়-ক্ষতিতে কিংবা অভ্যাস দ্বারা প্রাপ্ত হয়, তা গবেষক ছাত্রদের বিবেচ্য বিষয় হবে। উৎকট অপরাধীদের সেনসরী হাইপার সেনসেবেলিটি সম্বন্ধে কয়টি তথ্য নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"সিঁদেল চোর'রা দূরাগত রক্ষীদের অন্যের অশ্রুত পদশব্দ শুনতে পায়। একটি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম শব্দের সহিত অনুরূপ একটি সূক্ষ্ম শব্দের প্রভেদ তারা বুঝে। পথচারী ও রক্ষীদের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম পদশব্দের প্রভেদ বুঝে তারা সাবধান হয়। ছিনতাই চোর'রা [স্ন্যাচার] দূর হতে দৃষ্টি দ্বারা মহিলাদের গলার হার সোনার বা গিল্টির বা ক্যারেড সোনার তা উহার বর্ণ হতে বুঝতে সক্ষম। পশু চোর'রা প্রাচীরের এপার হতে গন্ধ দ্বারা পশুর সংখ্যা ও স্বরূপ বুঝতে পারে। মৎস্য-চোর'রা পুষ্করণীর জলে জিহ্বা স্পর্শ করে স্বাদ দ্বারা বলে দিয়েছে সেখানে কি কি ও কতো মৎস্য আছে। পকেট 'মার'রা পকেট স্পর্শ করে জেনেছে যে তাতে মামুলী কাগজ বা নোট রয়েছে।"

বিঃ দ্রঃ—উপরোক্ত তথ্য হতে বুঝা যাবে যে, এক এক শ্রেণীর অপরাধী এক একটি ইন্দ্রিয় বা অঙ্গ বেশী ব্যবহার করে। বিবেচ্য বিষয় এই যে ওই গুলির আধার সংশ্লিষ্ট ইন্দ্রিয় বা অঙ্গগুলি [চক্ষু কর্ণ ত্বক নাসা জিহ্বা] পুনঃ পুনঃ ব্যবহারে পরিবর্তিত হয় কিনা! ইহা সম্ভব হলে ঐ সকল দৈহিক পরিবর্তন হতে কে কোন শ্রেণীর অপরাধী তা বলা যাবে। সে ক্ষেত্রে লম্ব্রোসো-গোষ্ঠির বাতিল মতবাদ আংশিক ভাবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবে। সংগৃহীত বৈশিষ্ট্য বংশগত হোক বা না হোক, ওদের ব্যক্তিগত জীবনে ওগুলির ব্যবহারে বা অ-ব্যবহারে হ্রাস বৃদ্ধি হতে পারে। [একোয়ার্ড ক্যারেকটার সম্বন্ধে উহা বিবেচনা করা যায়।] জনৈক সুদক্ষ পুলিশ কর্মী ওদের কান, নাক, চক্ষু ও অঙ্গুলীর ত্বকের কম বেশী প্রভেদ হতে কে কোন শ্রেণীর অপরাধী তা আমাদের বলে দিতেন। [কিছু প্রভেদ এতো সূক্ষ্ম হয় যে, তা অনুভব করা গেলেও ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।]

ওদের কারও চক্ষুমণি বা জিহ্বা অতি ব্যবহারে বহির্মুখী। একই কারণে

কারও কর্ণ খাড়া, নাসা উচ্চমুখী ও অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দীর্ঘ। স্বকীয় জীবনে ব্যক্তিগত পরিবর্তন হতে কে স্পর্শবিদ পকেটমার, কে দৃষ্টিবিদ ছিনতাই, কে রসবিদ মৎস্য-চোর, কে গন্ধবেদী পশু-চোর, কে শব্দবিদ্ সিঁদেল তা বুঝা যাবে। কয়েক পুরুষের অভ্যাসে এগুলির একটি বা অন্যটি পৃথক পৃথক রূপে বংশগত হয় কিনা তাও বিবেচ্য।]

ঘড়ির মিস্ত্রী, টি [Tea] টেসটার প্রভৃতি ব্যক্তিগত ভাবে একটি বা অন্য ইন্দ্রিয় অতি ব্যবহার করে ওগুলিকে শক্তিশালী করে। কেউ কেউ অবশ্য উহা প্রবণতা সহ জন্মসূত্রে পেতে পারে। ওরা দৈবাৎ চোর হলে ওতে ওদের [অপরাধ ভেদে] সুবিধা। যথা : পেশীবহুল হলে ডাকাতিতে এবং শীর্ণকায় হলে চৌর্য কার্যে সুবিধা।

জন্তুদের মধ্যে পক্ষীরা দৃষ্টিবিদ্ তথা রূপবিদ্। বংশানুক্রমে ওদের চক্ষু অতি ব্যবহারে বৃহৎ। শশকরা শব্দ বুঝতে কর্ণ অতি ব্যবহার করে। তাই ওদের কর্ণ লম্বা ও ঘূর্ণীয়মান। জন্তুদের ক্ষেত্রে কিন্তু ঐগুলি বংশগত হয়। নীরস্থিক জীবদের শুঁয়া আদি দ্বারা স্পর্শ জ্ঞান বেশী। এই সকল বিতর্কিত বিষয় এখনও গবেষণার অপেক্ষা রাখে।

[জন্তুদের মধ্যেও দ্রব্য ও শোণিত-স্পৃহা পৃথক থাকে। যুদ্ধবিদ্ মোরগদের মাত্র শোণিত-স্পৃহা বর্ধিত। বহু জন্তু গোপনে অন্যের খাদ্য বা ডিম্ব চুরি করে। এরা মাত্র দ্রব্যস্পৃহী। কোকিলের কাকের বাসাতে ডিম্ব রক্ষা প্রবঞ্চনা। বাঘ একত্রে শোণিত ও দ্রব্যস্পৃহী। আক্রমণে ওরা শোণিতস্পৃহী এবং খাদ্যার্থে নিহতের দেহ সংগ্রহে ওরা দ্রব্যস্পৃহী।

জীবদিগের বিবর্তনে ক্রোমজমের গুণাগুণবাহী জিনগুলির গতি কখনও সরল কখনও বা বক্র পথে প্রবাহিত। কখনও উহা জীব বংশের একটি ধারাকে এড়িয়ে ওদের অন্য ধারাতে এগোয়। সুপ্ত গুণাগুণের কোনটি কখন কার মধ্যে জাগবে তা বলা কঠিন। জন্তুদের মত মানুষের পক্ষেও উহা সমভাবে প্রযোজ্য। জলধারার রুদ্ধ লুপ্ত বা উগ্রগতি পথের সহিত উহা তুলনীয়। তাই একই জীবগোষ্ঠির বিবর্তন-জাত বংশধর হয়েও ব্যাঘ্রাদি জীব হিংস্র ও গবাদি শান্ত প্রকৃতির হয়। তবে—প্রতিটি গুণাগুণ জাগ্রত বা সুপ্ত রূপে কিছু না কিছু প্রত্যেকের মধ্যে কম বেশী রয়েছে।

বিঃ দ্রঃ—উৎকট প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে কষ্ট ও উষ্ণ বোধ কম এবং স্পর্শ ও শৈত্য বোধ বেশী। আদিস্বভাব প্রাপ্ত হওয়ায় উহাদের মধ্যে এইরূপ দৃষ্ট হয়।

মানুষের কোন গোষ্ঠি কতো পূর্বে বা কতো পরে সভ্য হয়েছে তা তাদের ওই সকল বোধের কম বেশী তারতম্য হতে বুঝা যায়। ওইরূপ পরীক্ষায় জাতিগুলির সভ্য হওয়ার প্রাচীনত্ব নিরুপণ করা সম্ভব। য়ুরোপীয় মার্কিনদের অপেক্ষা রেড ইণ্ডিয়ান মার্কিনীদের কষ্ট ও উষ্ণ বোধ কম এবং স্পর্শ ও শৈত্য বোধ বেশী। বিভিন্ন ভারতীয় জাতি ও উপজাতি ও গোষ্ঠিদের মধ্যেও এইরূপ পরীক্ষা নিরীক্ষার স্বযোগ রয়েছে। [আফ্রিকার এক আদিবাসী য়ুরোপীয় বুট পরতে তার পায়ের আঙুল কেটেছিল] কিন্তু—তাতে সে খুব বেশী কষ্ট অনুভব করে নি।

প্রতিরোধ শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকলে মানুষ মনের দ্বন্দ্বরত অংশ দুটির বিবাদ মীমাংসা-করতে পর্যাপ্ত সময় পায়। এতে মুহুর্মুহু কষ্ট পেলেও তাদের মন ভেঙে পড়ে না।

অপরাধী হওয়া বা না হওয়া মানুষের প্রতিরোধ শক্তির বাড়া বা কমার উপর নির্ভর করে। বেজী ও ব্যাঘ্র মানুষের মত প্রতিরোধ শক্তি পায় নি। তাই বেজী সর্পকে ও ব্যাঘ্র মানুষকে দেখা মাত্র নিষ্প্রয়োজনে নিহত করে। প্রতিরোধ শক্তি না থাকায় ওদের স্পৃহা বুদ্ধিবাহী না হয়ে ইনিষ্টিঙ্কট-বাহী হয়। প্রতিরোধ-শক্তি না থাকায় ওরা হিংসা বৃত্তি দমনে অক্ষম। তাই তারা নিষ্প্রয়োজনে অন্যকে আক্রমণ করে।

মস্তিষ্কের নীতি স্থানের ক্ষয় ক্ষতি অগভীর হলে প্রাথমিক অপরাধীর সৃষ্টি হয়। সেই ক্ষেত্রে নর বা নারী সমভাবে অপরাধী বা বেশ্যা বা লম্পট হয়। উহারা স্ববিধা মত বস্তু ও ব্যক্তি উভয়ের বিরুদ্ধে অপরাধ করে। কিন্তু—মস্তিষ্কের নীতি স্থানের ক্ষয় ক্ষতি গভীর হলে পুরুষ হয় অপরাধী এবং নারী বেশ্যা হয়। উহাতে পুরুষ অপরাধীরা বল-প্রয়োগী ও অবল প্রয়োগীতে বিভক্ত হয়েছে। মস্তিষ্কের গভীর ক্ষতি পুরুষদের অদম্য অপরাধ-স্পৃহা এবং নারীদের অদম্য বেশ্যা স্পৃহা নির্গত করে।

কোকেন ও মাদক আদির কম বেশী প্রয়োগে মস্তিষ্কের নীতি স্থানের ক্ষতি কম বেশী করা যায়। অন্যদিকে—বিপরীত ঔষধ প্রয়োগে মস্তিষ্কের নীতি স্থানকে পূনর্গঠিত করলে তারা নিরাময় হয়েছে। কোকেন বস্তুর বিরুদ্ধে ও মাদক-দ্রব্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপকর্মের সহায়ক। প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে দৃষ্ট এ রূপ বিভাজন ওই গুলির মাত্রাধিক্য দ্বারা মস্তিষ্ক গভীর ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হলে হয়। কিন্তু ওদের দ্বারা স্বল্প ক্ষতি হতে সৃষ্ট প্রাথমিক অপরাধীরা সকল প্রকার

অপরাধ করে। অত্যধিক অনুপকারী ঔষধ মস্তিষ্কের নীতি স্থানের সুগভীর ক্ষতি করলে নারীরা বেশ্যা ও পুরুষরা অপরাধী হয়েছে। প্রকৃত ও প্রাথমিক অপরাধী হওয়া মস্তিষ্কের কম বেশী ক্ষয় ক্ষতির উপর নির্ভর করে। বলাবাহুল্য মনের আধার রূপ দেহকে অতিক্রম করে মনকে কল্পনা করা নিরর্থক।

প্রতিরোধশক্তি দুর্বল হলে মাত্রাধিক অপরাধ-স্পৃহা বা সৎপ্রেরণা সমভাবে উপরে উঠে অপরাধ-রোগী কিংবা উপকার-বাতিক রোগী সৃষ্টি করে। সেই ক্ষেত্রে উপকার বাতিক রোগীরা অপরাধ রোগীদের অপকারের মত লোকের উপকার করতে ব্যস্ত হয়। কারও উপকার না করে ওরা শান্তি পায় নি। সেই উপকার করার জন্যে এরা লোক খোঁজে এবং তজ্জন্য প্রায়শঃ ক্ষেত্রে তাদের উপকার অপাত্রে বর্ষিত হয়! উক্ত তথ্য প্রমাণ করে যে, ব্যবহারিক জীবনে অতি প্রেম ও ভালবাসা যেমন ক্ষতিকর, তেমনি কিছুটা সহনীয় দোষ না থাকলে মানুষ দোষ বুঝতে অক্ষম হয়।

স্বল্পমাত্রায় বিকৃত-মনা ও যৌন বোধি ব্যক্তিরা উত্তম সাহিত্যিক দার্শনিক ও সমাজসেবী হয়। পুরাপুরি যৌনবোধ-হীনতা মানুষকে নিউরেটিক করে তুলে। কিন্তু প্রতিরোধ শক্তির অভাবে উহা আয়ত্তাধীন না হলে বিপর্যয় ঘটে। কিছুটা বিঘ্নের বিরুদ্ধে মানুষের আগ্রহ বাড়ে।

বিঃ দ্রঃ—প্রকৃত [স্বভাব—] অপরাধীরা জন্তু ও আদি মানুষের মত স্বভাব প্রাপ্ত হওয়ায় ওরা প্রায়ই একাচারী। দলবদ্ধ হলে আদি গোষ্ঠিদের মত ছোট ছোট ওদের দল। ওরা কারও নেতৃত্ব গ্রহণ করলে জন্তুদের মত ওরা দৈহিক বলে বলী'দের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু সভ্য মানুষ হতে অপরাধী হওয়াতে অভ্যাস-অপরাধীদের দল বড় হয় এবং ওরা দৈহিক বলের উপর প্রাধান্য না দিয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের নেতা করে।

উৎপীড়কমন্য ব্যক্তির প্রতি লোকের ভয় প্রায়শঃ ঘৃণা ও ক্রোধ মিশ্রিত থাকে। এই ভয় বৃত্তি ঘৃণা ও ক্রোধকে সংযত করে। ঘৃণা ক্রোধকে বাড়ায় ও নিষ্ঠুরতা আনে। ভয়ের উপশম হলে কিংবা উহা সহনশীল হলে ঘৃণা ও ক্রোধ প্রকট হয়। সর্পকে আমরা একাধারে ভয় ও ঘৃণা করি। তাই সুবিধা পেলে আমরা তাকে নিধন করি কিংবা তাকে এড়িয়ে যাই। ভয় থাকা ভালো। কিন্তু তাতে ঘৃণা ও ক্রোধ যেন না থাকে। শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভয়েরও অস্তিত্ব আছে। প্রেম বিবর্জিত অতি ভয় বিপদের কারণ হয়। রাষ্ট্র বিপ্লবে কোনও ব্যক্তি বা পরিবারের নিধনপর্ব ওই তিনটি বৃত্তির একত্রিত হওয়ায় ঘটে। ওদেরকে

ভয় করা হয় বলে ওদের শেষ জড় রাখা হয় না। রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থ ক্রোধ ঘৃণা ও ভয় হতে উদ্ভূত। তবে ওর মধ্যে জাতিগত পশুবৃত্তি ও কৃতঘ্নতা এবং কোনও ক্ষেত্রে মনোবিকৃতি, অন্ধ বিশ্বাস ও ক্ষমতার অপব্যবহার থাকে।

অপরাধসমূহের প্রচলিত পরিসংজ্ঞারও কিছু ক্ষেত্রে অদল বদলের প্রয়োজন। এদেশে মাত্র উৎকোচগ্রাহীদেরই ডিস-অনেষ্ট বলা হয়। কিন্তু যারা মিথ্যা ডাইরী লেখে বা সৎ কার্যের জন্য অসদ উপায় গ্রহণ করে, তাদেরকেও সমভাবে অসাধু বা ডিসঅনেষ্ট বলা উচিৎ হবে। হাকিমদের বিচার কালে কলম চুরি [অর্থাৎ--জবানবন্দীর কিছু অংশ না লেখা] একটি ক্ষতিকর চুরি। অবৈধভাবে নারী উপভোগী ও মদ্য পায়ীদের চরিত্রহীন বলা হয়। কিন্তু মিথ্যা-বাদী পরপীড়ক ও ফাঁকীবাজরাও সমভাবে চরিত্রহীন। এরা ভীরু ব্যক্তি হওয়ায় এদের অপরাধ স্পৃহা এরূপ সহজ পন্থায় ব্যবহৃত হয়।

দশজন ব্যক্তি একটি বাটি লুঠ করলে তাদের ডাকাত বলা হয়। কিন্তু সহস্র ব্যক্তি একত্রে একশত বাটি লুঠ করলে উহাকে বলা হয় জন-বিক্ষোভ। সংবাদ পত্র এদের দাঙ্গাকারী না বলে লিখে থাকেন—'পুলিশের গুলিতে একজন বিক্ষোভকারীর মৃত্যু। ওঁরা ওই ক্ষেত্রে পুলিশ সক্রিয় না হয়ে নিষ্ক্রিয় রইলেও নিন্দা করেন। রাজপথ হকার মুক্ত না করলে ওঁরা লেখেন যে পথিকের পথ চলার অধিকার দিন। অন্যদিকে—রাস্তাবন্দীর অপরাধে ওদের গ্রেপ্তার করলে দরিদ্রের প্রতি ওঁরা উৎপীড়নের বিষয় বলেন। ধর্ম-ব্যবসায়ীদের মত সংবাদ সেবীদেরও ক্ষমা করা হয়।

(ক) ক্লীপটোম্যানিয়া ও নিমপোম্যানিয়া যথাক্রমে অপস্পৃহা [উহার দ্রব্য-স্পৃহাংশ] বা যৌন-স্পৃহা অতিবেশী হলে হয়। এতদ্‌সহ ওদের মধ্যে প্রতিরোধ শক্তি তুলনায় কম থাকাতে উহা উগ্র।

[যৌন-স্পৃহা পুরুষাপেক্ষা নারীদের বেশী থাকে। কিন্তু ওদের প্রতিরোধ শক্তি পুরুষাপেক্ষা বেশী। তাই উহা তারা সহজে দমন করে থাকে।]

বিঃ দ্রঃ অপস্পৃহার মত যৌন-স্পৃহাও কৃত্রিম উপায়ে জাগানো সম্ভব। প্রায়ই আদর করা বা হাত দেখার [হস্ত রেখা পরীক্ষা] অছিলাতে সইয়ে সইয়ে উহা করা হয়েছে। তৎকালে দুর্বৃত্তরা সাবধানে সৎ কন্যাদের দেহ স্পর্শ করে। উহাতে মনে হবে যে উহা তাদের ইচ্ছা-কৃত নয়। ওগুলি অসাবধানতার কারণে ঘটলো। ইচ্ছাকৃত বুঝলে কন্যারা ওতে [প্রায়ই] প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু

শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হলে এক সময়ে সৎ কন্যারও যৌন-বোধ উগ্র ভাবে জাগে।

(খ) বিগত মার দাঙ্গা কালে বহু নেতা নিজেদের পুত্রদের রাজনীতি হতে দূরে রেখে শিক্ষা দীক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু অন্যের পুত্রদের বিরোধীদের বোমা ও পুলিশের গুলির মুখে পাঠাতেন।

এরা নিজেরা স্বনামে ও বেনামে সম্পত্তি আহরণ করে থাকে। কিন্তু অন্যের কৃষি জমি অলাভজনক ভাবে টুকরো টুকরো করে অনুগতদের মধ্যে বিলোয়। এরা ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত না করে বৈধ মালিককে তাড়িয়ে অন্যকে মালিক করে। কিন্তু মুখে এরা ব্যক্তিগত মালিকানার বিরোধী। এরা ছাত্রদের বেতন কমাতে ও শিক্ষকদের বেতন বাড়াতে বলে। করপোরশন'কে ট্যাক্স বাড়াতে বলে বাড়ীওয়ালাকে ভাড়া কমাতে বলে। এরা রাজপথকে পথিকদের জন্য হকার মুক্ত করতে বলে। তা করা হলে এরা বেকার সৃষ্টির কথা তুলে। এরা বেশী মজুরী চায়। কিন্তু ঘাটতি মেটাতে উৎপাদন বাড়ায় না। এদের ধারণা মন্ত্রীদের পকেটে টাকা জন্মায়। জনগণের অর্থ বাঁচলে উহা জনগণেরই থাকে। বাড়তি টাকা জনগণকেই যোগাতে হয়। এই জনদরদীরা তা বুঝবেন না।

এই সকল জ্ঞান পাপীরা প্রকৃত অপরাধী কিংবা তারা অপরাধ-রোগী, তা গবেষকদের বিবেচনা করতে হবে।

(গ) আমাদের পূর্বপুরুষ সরীসৃপ ও আদি-স্তন্যপায়ী জীবদের অশ্রু-গ্রন্থি তাদের চক্ষুর পত্রীকে সতেজ রাখতে ভিজায়। কিন্তু আবেগ প্রকাশের জন্য অশ্রুপাত করতে তারা অক্ষম। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মনুষ্য-শিশুর অশ্রু-গ্রন্থি ওদের মত দুর্বল থাকাতে তারা কাঁদলেও অশ্রুপাত করে না। অশ্রুপাতের জন্য মনুষ্য শিশুদের জন্মের পর প্রায় দেড় মাস অপেক্ষা করতে হয়।

[এখানেও অনটোজনি রিপিটস্ ফাইলোজনি। ইহার অর্থ যে ব্যষ্টি জীবন গোষ্ঠী জীবনের পুনারাবৃত্তি মাত্র। আমাদের পরবর্তী পূর্ব-পুরুষ আদিম মানুষের প্রকৃতিও উক্তরূপ নিশ্চয়ই ছিল]।

অপরাধীরা তাদের অনুপকারী হরমন ক্ষরণে বা উপকারী হরমনের ঘাটতিতে বা অন্য কোনও কারণে কম বেশী আদিম স্বভাব প্রাপ্ত হওয়ায় তাদের স্বভাব ঐ বিষয়ে মনুষ্য শিশুর মত হয়। ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনে স্নায়বিক ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়া উহার অপর কারণ।

প্রবঞ্চকাদি প্রাথমিক অপরাধীরা প্রায়ই [অকারণেও] কাঁদে বটে! কিন্তু তজ্জন্য তাদের চক্ষু হতে অশ্রু ঝরে না। (f) বারগ্লরাদি প্রভৃতি প্রকৃত তথা পাকাপোক্ত অপরাধীদের মধ্যে এটা আরও সত্য। ঠেঙানিতে চেঁচালেও বা কাঁদলেও এদের অশ্রুপাত নেই। তবে দৈহিক ও নৈতিক অসাড়তারজন্য প্রহারে ওদের নিশ্চুপ থাকারই রীতি। কোন অপরাধস্পৃহী বালকের মধ্যে ওই স্বভাব হরমনের তারতম্যের জন্যেও ঘটে। অপরাধ-স্পৃহার ভারি প্রবাহ [ইলেকট্রোড] অশ্রুগ্রন্থিকে নিষ্ক্রিয় এবং সৎ-প্রেরণার হাল্কা প্রবাহ উহাকে সক্রিয় করে কিনা, তাহা গবেষক ছাত্রদের বিবেচ্য বিষয়। কিন্তু দৈব অপরাধী-মন্যরা অনুতপ্ত হলে বা মিথ্যা মামলাতে পড়লে বা উহাতে জেল হলে তাদের চক্ষু অশ্রুবাহী হয়। [দৈব অপরাধীদের ব্যক্তিত্বের একটুও পরিবর্তন হয় না]

[সাত মারে রা নেই : চোরদের সম্পর্কে এটি একটি প্রাচীন প্রবাদ। যারা অশ্রুবিহীন কান্না কাঁদে তারা অপরাধী হতে পারে।]

(ঘ) মানুষের মধ্যে উভয়বিধ ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হয়। যথা অগ্রগামী ও পশ্চাদগামী। ব্যক্তিত্বের পশ্চাদগামী পরিবর্তনে অপরাধীরা আদি-মানবের স্বভাব প্রাপ্ত হয়। এই সম্বন্ধে পরীক্ষা নিরীক্ষার একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র রয়েছে।

নব প্রস্তরযুগের মানুষের দ্বারা গুহাতে অঙ্কিত চিত্রাদি এই বিষয়ে গ্রহনীয়। আদিম মানুষ শুধু কপাল থেকে একটানা নেমে আসা নাক দেখতো। নাকের আকার তারা সঠিক বুঝতে পারে নি। তারা নাককে কপালের সঙ্গে মিলিয়ে চ্যাপ্টা ভাবে দেখেছে। তাদের চোখে 'চক্ষু ও ওর মণি এবং অধোরষ্ঠ ও কেশের স্থান নেই। তাই প্রথম যুগের আদি মানুষের আঁকা চিত্রাদিতে ওগুলি থাকেনি।

অপরাধীদের সম গোত্রীয় উন্মাদদের আঁকা ছবিও ওই রূপ হয়ে থাকে। উহা হতে ওদের উন্মাদনার কম বেশী পরিমাপ বুঝা যায়। উন্মাদদের স্বভাব আদি মানুষ ও শিশুদের মত হয়। উহা উগ্র হলে ওরা জীব জন্তুর মত ব্যবহার করে। অপরাধীদের মত উন্মাদদের মোটর নার্ভ পুরাপুরি সক্রিয় না

(f) বেশী অশ্রু ক্ষরণ সম্ভবতঃ জীবকে গবাদির মত কিছুটা নির্বোধ করে। কিন্তু অপরাধীদের মধ্যে চাতুর্যের সহিত নির্বুদ্ধিতাও দেখা যায়। পার্থিব বিষয়ে নিস্পৃহ মহাপুরুষদের কষ্টে চক্ষে অশ্রু ঝরে না।

থাকায় ওদের ব্যবহার হালহীন নৌকার মত হয়। অপরাধীদের পশ্চাদগামী মানসিক পরিবর্তনেও ঐরূপ হয়।

[চক্ষু দৃষ্টবস্তু সম্পর্কে কতকগুলি 'রূপ' সঙ্কেত মানুষের মস্তিষ্কে পাঠায়। মস্তিষ্ক উহা বিশ্লেষণ করে ঐ বস্তুর একটি নির্দিষ্ট প্রতীক তৈরী করে। মানুষের আদি পুরুষ পশুগুলি ওরূপ বিশ্লেষণে অক্ষম। তাই তারা খড়ের পুতুল দেখে তাকে মানুষ ভাবে। খড়-পুরা বিকৃত বাছুরকে গাভী নিজের বৎস্য মনে করে। ওই বিশ্লেষণ ক্ষমতা আদি মানুষ বহুগুণে উন্নত হওয়ার পর লাভ করেছিল।]

বিঃ দ্রঃ—জন্মের পর মানব শিশুর দৃষ্টিভঙ্গি হুবুহু পশুপক্ষী ও আদি মানুষের মত থাকে। তিন বা চার মাসের একটি শিশু তার মায়ের মুখ খুঁটিয়ে দেখতে অপারগ। তাদের চোখে তার মায়ের মুখ একটি বক্র রেখা ঘেরা কপাল ও নাক। তাই তারা মায়ের সহিত অন্যের প্রভেদ বুঝে না। বহু পরে ধীরে ধীরে বিশ্লেষণ শক্তি এলে তারা লোক চিনতে শিখে। নব্য প্রস্তরযুগের মানুষের মুখোস দেখে দুই হতে চার মাসের শিশু বেশী সাড়া দেয়। তার মায়ের মুখোস অপেক্ষা ওই মুখোস তাদের বেশী প্রিয় ও চেনা। ছয় সাত মাস পরে শিশুর মস্তিষ্ক কিছুটা সুগঠিত হলে তাদের দৃষ্ট বস্তুর বিশ্লেষণ রীতি বদলে যায়। ফলে প্রস্তরযুগের মূর্তির সরল রূপ-রেখা তাদের মধ্যে আর সাড়া আনেনা। তারা তখন কিছুটা সভ্য মানুষের পর্যায়ভুক্ত হয়।

[বিভিন্ন মুখের মানুষের মুখোস শিশুদের সুমুখে ধরলে আদি যুগের মানুষের মুখোস দেখে তার মুখে হাসি ফুটে। কিন্তু অন্যগুলিতে সে একটুও আকৃষ্ট হয় না।]

কোনও স্বভাব-অপরাধী তথা পুরানো পাপীদের'কে একটি মুখের চিত্র আঁকতে বলা যায়। কিন্তু তাকে তুলি কাগজ বা পেনসিল দিলে সে নীরব থাকে। তাকে একটি কয়লার টুকরো দিয়ে মাটিতে তা আঁকতে বললে সে কৌতূহলী হবে। আদি মনোভাবী হওয়ায় ঐ অপরাধী তার আঁকা মুখটির চিত্রে শিশুদের উপলব্ধ বক্ররেখা ঘেরা কপাল ও নাকই প্রথমে আঁকে। এইরূপ পরীক্ষা নিরীক্ষা দ্বারা তাদের ব্যক্তিত্বের পশ্চাৎগামী পরিবর্তনের ক্রম বুঝা গিয়েছে।

[ওইরূপ চিত্র পূর্ণাঙ্গ করতে অভ্যস্ত করালে অপরাধীরা ধৈর্য এনে সূক্ষ্মবৃত্তি সবল করে নিরাময় হয়।]

ইহা প্রমাণ করে যে আদি মানুষের বহু উপাদান সভ্য মানুষের মধ্যে সুপ্ত

আছে। তাই [মনের দিক হতে] গভীর স্নায়বিক ক্ষতিতে তাদের আদি স্বভাবে পুনঃ-প্রবর্তন সম্ভব। প্রতিরোধ-শক্তির হানি ঘটলে অবচেতন মন হতে প্রদমিত আদি স্বভাব ঐভাবে পুরানো পাপীদের চেতন মনে উপগত হয়।

বহুক্ষেত্রে পুরুষরা তেলাপোকাকে ও স্ত্রীলোকরা টিকটিকিকে অবচেতন মনে স্ত্রীযোনীর বা পুংযোনীর প্রতীক বুঝে পছন্দাপছন্দ করে। কেউ ওদেরকে ভীতির দৃষ্টিতে দেখে থাকে। যৌন বিজ্ঞানীরা ওইগুলিকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেন। বিবিধ সিমবল তথা প্রতীক দ্বারা লোকের স্বপ্ন বা জাগ্রত খেয়ান ও প্রবৃত্তি বুঝা যায়।

উপরোক্তরূপে পকেটমারকে রেজার ব্লেড, টপকা ঠগীকে পিতলের পিণ্ড বা বাঁট এবং সিঁদমারীকে সিঁদকাটি দেখালে তাদের মুখে চোখে ঔৎসুক্যও কিছু ক্ষেত্রে ভীতি ফুটে। ডাক্তারকে স্টেটিসস্কোপ এবং মোটর মিস্ত্রীকে আরমেচার দেখিয়েও ঐরূপ ফল পাওয়া যায়। এভাবে কে সিঁদমারী চোর, কে পকেটমার ও কে বা টপকা ঠগী তা বুঝা যাবে। (f)

বালকদের মানুষের মুখ আঁকতে বলে তাদের আঁকা ঐ ছবি হতে তাদের অপস্পৃহার পরিমাপ করা সম্ভব। তাদের আঁকা মুখ কিছু পূর্বোক্তরূপ হলে তাদের ভাইটামিন ও হরমন আদি ঔষধ প্রয়োগে মস্তিষ্কের সূক্ষ্মস্নায়ুকে সবল করলে বা উহার জট ছাড়ালে বা বৃদ্ধিরুকাব হতে উহাকে মুক্ত করলে তারা নিরাময় হবে।

বিঃ দ্রঃ—বিশেষ প্রক্রিয়াতে তামার পাত্রে প্রস্তুত সিদ্ধি কিংবা ভাঙ ও কোকেনাদি ঔষধে মানুষের মন আদিম ভাবে ফিরে যায়। কোনও এক সদবংশীয় সুশিক্ষিত ব্যক্তি সিদ্ধি পানের পর সারা রাত্রি তার মাথাটা তার নাকের উপর বসাতে ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। তৎকালে তার মন ঐ ছোট্ট শিশুর মত হয়ে গিয়েছিল। ঐরূপ ঔষধের নির্যাস বা অন্য কিছু হতে বিপরীত ধর্মী ঔষধ তৈরী করে চিকিৎসা সম্পর্কে পরীক্ষা করা যেতে পারে। নেশাবিষ্ট কালে মোটর নার্ভ নিষ্ক্রিয় থাকায় তাদের দ্বারা [তখুনি] অপকর্ম করার প্রশ্ন নেই। কিন্তু পুনঃপুনঃ ঐ নেশায় মগজ ক্ষতিগ্রস্থ হলে

(f) এইগুলির সহিত শ্বাস প্রশ্বাস ও রক্তের চাপের সম্পর্ক থাকাতে তজ্জনিত বহিঃ পরিবর্তন যান্ত্রিক পরীক্ষায় বুঝা যায়।

প্রদমিত অপরাধ-স্পৃহা বহির্গত হয়। তাতে ওদের বহুজন অপরাধ-রোগী বা অপরাধী হতে পারে।

পৃথিবীতে মন্দ ব্যক্তির তুলনায় সৎ লোকের সংখ্যা কম। এজন্য—কোনও প্রতিষ্ঠানের দ্রুত বর্ধন হলে তাতে ভালো লোকের অভাবে মন্দ লোক ঢুকে পড়ে। এতে প্রতিষ্ঠানটির সুনাম পূর্বের মত অক্ষুণ্ণ থাকেনা। এই কারণে সৎলোক না পেলে কোনও প্রতিষ্ঠানকে বাড়ানো উচিৎ হবে না।

কিছুলোক প্রয়োজনে পায়ে ধরে আবার সুবিধা পেলে গলাতে হাত দেয়। যে গড়ে তাকে তারা তাড়ায়। অপরের গড়া বস্তু এরা ভোগ করে। পরে অন্যেরা এসে এদের তাড়ায়।

এখানে উল্লেখ্য এই যে ডিস-অনেষ্ট ও এফিসিয়েণ্ট ব্যক্তিদের সাহায্যে বড়ো বড়ো যুদ্ধ জয় হয়েছে। কিন্তু অনেষ্ট ও ইন-এফিসিয়েণ্ট লোকরা সেই ক্ষেত্রে বিপর্যয়ের কারণ হয়। সৎ অথচ দক্ষ ব্যক্তিদের সাহায্য লাভ একটি ভাগ্যের বিষয়। সেইরূপ ক্ষেত্রে সর্বস্তরে উন্নতি দ্রুত হয়েছে।

[আপদকালে সৎ ও অসৎ বাছাই করার রীতি নেই। ঐ সময় মাত্র তাদের প্রতি তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখতে হবে। আপতকালের অবসানে ওদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।]

[পর-ভোগী সাপ ইঁদুরের তৈরী গর্তে বাসা বাঁধে। ব্যক্তির মত ঐ স্বভাব গোষ্ঠির মধ্যেও আছে।]

"এ দেশে চেনা লোকের কেউ ভালো চায় না। কিছু প্রত্যাশা থাকলে উহা অবশ্য স্বতন্ত্র বিষয়। উপকার ফিরত পাবার আশায় লোকে উপকার করে। নগদা গুণ্ডাদের মত সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুপকার ফেরত নেয়। নইলে যখন উপকার করেছো তখন তা তুমি করেছো। এখন ঐ সব তাঁবাদি বিষয় তোলা কেন? উপকার বন্ধ হলেই লোকে শত্রু হয়। লোকে ভয়ে অনুপকারীর বাধ্য থাকে। একজন জাগায় ও অন্য জন ভোগ করে। খোসামোদে গ্যাস [ফাঁক] পড়লে পূর্বের গুলি বাতিল। বন্ধুত্ব রাখতে হলে উহার পুনঃ পুনঃ নবীকরণ [Renew] চাই। ভালো ব্যবহারের পশ্চাতে স্বার্থ থাকে। লোকে সৎকর্ম করে শুধু ইনকাম্ ট্যাক্সের রিবেটের জন্য নয়। তাদের বিশ্বাস উহার প্রতিটি কপর্দক পরলোকের ব্যাঙ্কে জমা পড়বে। যাঁরা পুত্রদের শিক্ষাদান ফিরতযোগ্য ইনভেস্টমেণ্ট ভাবেন: তাঁরা ব্যথা পাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকুন।

"লক্ষ্যহীন শিক্ষা নিষ্ক্রিয়তা ও বিরূপতা আনে। অর্থ ব্যয়ের কার্পণ্যের

মত শক্তি ব্যয়েরও কার্পণ্য থাকা উচিত। [পরে—আরও বড়ো কার্যে ওর দরকার হবে।] বেশী জানা মানে বেশী পাওয়া নয়। কর্তৃত্ব ভিতরের ও ক্ষমতা বাহিরের বস্তু। আমরা বারে বারে ভুল করি। পরে ঐ ভুলগুলিকেই বলি অভিজ্ঞতা। উর্ধতন কর্মীদের ব্লাফ দেওয়া সম্ভব। কিন্তু অধীন কর্মীদের ব্লাফ [ধাপ্পা] দেওয়া যায় না। বুঝা অসম্পূর্ণ থাকে বলে লোকে ভুল বুঝে। বেশী ক্ষমতা অপেক্ষা স্বল্প ক্ষমতা অধিক কার্যকরী। (f) মানুষ শিম্পাঞ্জিকে বহু কিছু শিখায়। কিন্তু শিম্পাঞ্জি মানুষকে কিছু শিখাতে পারে না। অযথা ঘটনাতে না জড়িয়ে উহা এড়ানো উচিৎ। বন্ধুকে শত্রু না করে শত্রুকে বন্ধু করতে হবে। অকারণে—শত্রু বৃদ্ধি কদাচ নয়। অতি যোগাযোগ বা চিফ্‌ পপুলারিটি কাম্য নয়। সেরিমনিয়াল ফিয়ারের [পোষাকী ভয়] প্রয়োজন আছে। দূরত্ব শ্রদ্ধা ও নিকটত্ব অবজ্ঞা আনে। কর্তৃত্ব চাইলে দায়িত্ব নিতে হবে। যৌথ দায়িত্ব নিন ও ক্ষমতার ভাগাভাগী করুন। তুচ্ছ ঘটনাকে গুরুত্ব দেওয়া অনুচিৎ।

শাসন কার্য সংশোধনের বদলে ক্রোধ নির্গমনের পন্থা না হয়। সেই ক্ষেত্রে উহা নির্দয় ও কদর্য হবে। [এতে বালকরা ভবিষ্যতে অভদ্র নির্লজ্জ ও উৎপীড়ক হয়।]

[কাউকে শাসন করার পূর্বে তাদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা উচিৎ। তা'হলে দেখা যাবে যে তাদের শাসনের কোনও প্রয়োজন নেই। বরং তাদের সম্পর্কে নিজেদেরই ধারণা বদলানো দরকার।]

বন্ধুত্ব পারস্পরিক স্বার্থের উপর নির্ভরশীল। প্রেম প্রীতি ভালবাসা আসে অনেক পরে। ফলাফল দেখে কর্মধারা সংশোধন করতে হবে। সব কিছুর মধ্যে পাপ পুণ্য ও ন্যায় অন্যায় দেখা একপ্রকার ছুঁচিবাই। কাউকে সুখহীন নিয়মবদ্ধ ভবিষ্যৎ হীন কর্মে আবদ্ধ রাখা ক্ষতিকর। চরম ব্যবস্থা চরম প্রতিক্রিয়া আনে। অনিয়মিত বেতন প্রদান বড়ো বড়ো বিদ্রোহের প্রধান কারণ। ফৌজী ডিসিপ্লিন শ্রম শিল্পে অচল। কিছু ক্ষেত্রে ফলস প্রেসটিজ

(f) যে কার্য পুলিশ বা হাকিম'রা করাতে অক্ষম, তা পিতামাতা সহজে করাতে সক্ষম। যা পিতা মাতা পারেন নি, তা শিক্ষকরা সমাধা করেছে। যা শিক্ষকরা করাতে পারেন নি, তা পড়শীরা বুঝিয়ে করাতে পারেন।

পরিহার্য। আনুগত্যের মত স্বাধীনতারও প্রয়োজন আছে। বিক্ষোভ প্রদর্শন দ্বারা মনকে সুস্থ রাখা ঈশ্বর প্রদত্ত একটা জৈব উপায়। বিকল্প পন্থা খুঁজে নেবার ক্ষমতা রাখতে হবে। রাজনীতিতে ও ব্যবসায়ে ভাব-প্রবণতার স্থান নেই। সর্ট টাইম ও লঙটাইম ভালোলাগা এক বস্তু নয়। দুই টাকা লাভ হলে তবে এক টাকা খরচ করুন। জীবনে যারা বুঝে চলে তারা কষ্ট পায় না। জীবনে ইমিজিয়েট্ সেভিঙ কাম্য হওয়া উচিৎ নয়। শত্রুতা করতে হলে আগে বন্ধুত্ব করতে হবে। [অর্থাৎ—ওদের দুর্বলতা আগে জানুন] দুইটি প্রভাব দু'রকম হলে সজ্মাত হবে। স্কুলে যা গড়ে বাড়িতে তা ভাঙে। [এখন উল্টো] ভয়ের চাইতে আস্থার প্রয়োজন বেশী।

প্রভাব নগ্ন হলে উহা উৎপীড়ন। উহা সুষ্ঠু হলে তা পিতা-মাতার শাসন।

[প্রকৃতি যেখানে প্রভাব বিস্তার করেছে সেখানে জীবদেহ পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতি যেখানে উৎপীড়ন করেছে সেখানে জীবগণ বিলুপ্ত হয়েছে।]

পরিবর্তন ভিতর থেকে আসে। উহা বাইরে থেকে আসে না। উপযুক্ত কার্য উপযুক্ত সময়ে করতে হবে। আগের কার্য আগে। পরের কার্য পরে। আজ যে কার্য করা যায় তা কালকের জন্য রেখো না। শিশু মনে স্বল্প আঁচড়ে [আঘাতে] অধিক দাগ পড়ে। বার্কিঙ [ধমকা ধমকি] করলে 'বাইটিঙ' অনুচিৎ। 'ফরগিভ্' করবে। কিন্তু 'ফরগেট' কদাচ নয়। একই সঙ্গে দুইটি ফ্রণ্ট বর্জনীয়। একটিকে কিছুকাল মুলতুবি রাখতে হবে। যে সয় সে র'য়। যা পুনঃ পুনঃ জয় করতে হয় তা জয় করা নিষ্প্রয়োজন।

[মধ্যযুগে ভয়ের দ্বারা প্রশাসনের রীতি ছিল। এতে বিদ্রোহ কম হতো। কিন্তু সদা ভীত লোক জ্ঞান ও বিজ্ঞান তৈরীতে অক্ষম। তারা স্বদেশকে ভালবাসতে পারে নি। মাত্রাধিক্য ক্ষতিকর।]

বিঃ দ্রঃ—বিবাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য সর্বোৎকৃষ্ট সন্তানোৎপাদন। প্রেম বলতে যা বুঝি তা এসেসরী ফুড্। যথা, চা কফি, তাম্বুল ও সিগারেট আদি। ওগুলো হলেও চলে এবং তা না হলেও চলে। উহা বিবাহের পরবর্তী কালের জন্য মুলতুবি রাখা ভালো। নেগসিয়েটেড বিবাহে ভবিষ্যতে কেউ কাউকে দায়ী করে না। তৎজন্য তারা নিজেদের মধ্যে [এ্যাডজাষ্টমেণ্ট] সামঞ্জস্য আনতে পারে।

উপরোক্ত বিষয়গুলি অনুধাবন করলে ভবিষ্যতে কেউ ব্যথা পায় না। ওতে নিজেকে ও অন্যকে অপরাধী হতে হয় না। উহাতে অপরাধী হওয়ার কোনও সুযোগ নেই। যৌনজ ও অযৌনজ উভয় বিধ অপরাধ সম্বন্ধে এই মত প্রযোজ্য। ওতে জীবনে নিরাপদ হয়ে সুখ সম্ভোগ সম্ভব। বহু ব্যক্তি শুধু আত্মরক্ষার্থে অপরাধী হয়েছে। ফ্যাসট্রেশন তথা নৈরাশ্য ক্রোধের সৃষ্টি করে।

বিঃ দ্রঃ—মানুষকে সন্দেহ করবে। কিন্তু সে তা না জানতে পারে। জগতে অধিকাংশ লোক টাইম সার্ভার। অন্যের অনুগতরা পরে তোমার অধীন হলে ঐরূপ অনুগত থাকবে। পুলিশ ও গুণ্ডারা কারও আপনার হয় না। হায়েষ্ট বিডারদের লোকে ভক্ত হয়। পারিবারিক ঐতিহ্য অপরাধ-নিরোধের অন্যতম সহায়ক।

[আমি ঐ বাড়ির পুত্র। অতএব ঐ কার্য আমি করবো না। এজন্যে শহরে উচ্চপদী ও উচ্চ শিক্ষিত পুত্রটি যে সম্মান পায় না, সেই সম্মান তার 'আন-পড়া' ও নিঃস্ব পুত্রটি ঐ বাটির পুত্ররূপে গ্রামে পায়। তাই এক পরিবারে সকলেই ভালো ও অন্য এক পরিবারে সকলেই মন্দ]

ঝঞ্ঝাট ভোগের ক্ষমতা অর্থ ও লোকবল বিপদ তারণের সহায়ক। ঐ গুলি না থাকলে কলহ এড়িয়ে যাওয়া ভালো। এরূপ ব্যক্তির পক্ষে সম্পত্তি আহরণ না করে ব্যাঙ্কে টাকা রাখা উচিৎ। মন্দ হতে পারে এমন লোককে বাটিতে ঢুকানো কদাচ নয়। মিথ্যাকে মিথ্যা দ্বারাই প্রতিরোধ করা সম্ভব। কারণ সাক্ষী যোগাড় ও তদ্বির বাক্য এই যুগে একটি পরিভাষা। মিথ্যা বলবে নাঃ এমন বন্ধু না রাখা উচিৎ। তারা সত্য বলে বিপদ বাড়াতে পারে। গোঁয়াতুর্মি বীরত্ব নয়। বুদ্ধি ও সাহসের সংমিশ্রণ বীরত্ব।

পুত্র-নির্ভর না হয়ে পিতাকে শেষ দিন পর্যন্ত অর্থ-উপায়ী তথা প্রোডাকটিভ থাকা উচিত। যাত্রা দলের পিতা বা রাজা হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। তাই যৌবনে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ী হতে হবে। এতে শেষ জীবনে কাউকে ফাঁকি দিবার ইচ্ছা মনে আসে না। সব কটি পুত্রকে সমভাবে মানুষ করতে অক্ষম পিতামাতার বহু সন্তানোৎপাদনের কোনও হক নেই। ওতে দেশে অযথা অপরাধীদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়।

ব্যক্তিগত খেয়াল খুশী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বেচ্ছাচারিতা পরিহার্য। নূতন ভাব গ্রহণে অক্ষম গতানুগতিক ব্যক্তিরা সুষ্ঠু ব্যক্তিত্বের অধিকারী নয়। নিজের স্বার্থ নিশ্চয়ই দেখবে। কিন্তু তাতে অন্যের স্বার্থের হানি না হয়।

ভয় একবার ভাঙলে আর ভয় থাকে না। যে মারে সে ভুলে যায়। কিন্তু যে মার খায় সে তা ভুলে না। স্ত্রী পুরুষকে ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তৈরী করেছে। ইহা পৃথিবীর আদি বিভাজন। তাই একের কার্যে অন্যের অনুপ্রবেশ সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট করে। দ্রুত উন্নতি করতে হলে বেশী ঝুঁকি নিতে হয়। হোয়াট ইউ লার্ন দেয়ার। ইউ মাষ্ট আনলার্ন হিয়ার। আজ যেটি সত্য, কাল সেটি মিথ্যা হয়। জনপ্রিয় হওয়া ভালো। কিন্তু সুলভ জনপ্রিয়তা [চিফ্ পপুলারিটি] ক্ষতিকর। জনমত যারা তৈরী করে তারা জনমতের পিছনে দৌড়য় না। মানুষ ঠকে তখনই, যখন সে কাউকে ভালবাসে। নতুবা সকলকে ভালোবাসো। কিন্তু কাউকে বিশ্বাস করো না।

সুখের চাইতে স্বস্তি ভালো। আদালত ও পুলিশ বাড়তি উৎপাত না হয়। [গুণ্ডারা তো আছেই] সুযোগ জীবনে বহুবার আসে না। একস্থানে যা শিখবে, অন্যস্থানে তা ভুলবে। নিষ্প্রয়োজনে কারও সঙ্গে বেশী আলাপ নয়। কারণ—পরদিনই সে টাকা ধার চাইতে পারে। সকলেরই ভালো চায়, শুধু নিজের ভালো ছাড়া ; এমন মনুষ্যগুষ্টিও আছে। [যথা বাঙ্গালি] স্বাধীনতা অর্থে উচ্ছৃঙ্খলতা নয়। 'ঘর জ্বালানো পর ভুলানো' এমন বহু ব্যক্তিও আছে। যাচা কন্যা ও সাজা পান, কেউ ফিরত দেয় না। দোষে কঠোর হলে গুণে স্বীকৃতি দিতে হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারসাম্য রাখুন।

[এদেশের লোকেরা নিজেরা যাচ্ছেতাই হোক না কেন, তারা ক্ষমতা-সীন ব্যক্তিদের সচ্চরিত্র দেখতে চায়। উপরন্তু তারা চায় যে শ্রেণী ও পদ নির্বিশেষে বয়স্কদের সম্মান করা হোক। তরুণ উর্ধতন কর্মীদের এটা উপলব্ধি করতে হবে।]

পিতাদের পুত্রের বার্ডেন না হয়ে এ্যাসেট হওয়া উচিৎ। না হলে পুত্র বলবে বা ভাববে যে নিজের ফ্যামিলির সঙ্গে তাকে তার বাবার ফ্যামিলিও মেইন্টেন করতে হয়। এজন্য সমগ্র জীবন প্রোডাকটিভ তথা উপায়ী থাকতে হবে। প্রোডাকটিভ ব্যক্তিরা কখনও বুড়া হয় না। কর্মের চেয়ারে ব'সে মৃত্যু শ্রেয়ের মৃত্যু। যারা পুত্রদের শিক্ষাদান এক প্রকার ইনভেষ্টমেণ্ট মনে করে ভাবেন যে সুদ শুদ্ধ আসল ফিরত আসবে, তাদের ব্যথা পাবার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিৎ। যাত্রা দলের বাবা বা রাজা হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

কোনও এক গৃহকর্তার বাটিতে তাঁর পিতার বিরাট তৈলচিত্র দেখে তাঁকে ঐ বাটিটি তাঁর পিতার তৈরী বললে তিনি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন

যে আমি তা জানলুম কি করে। প্রত্যুত্তরে আমি তাকে বলেছিলাম যে তা না হলে অতো বড়ো দামি তৈল-চিত্র আপনি তৈরী করাতেন না।

[তবে পুত্রের সংখ্যা একটি না হয়ে বেশী হলে তারা বাটিটি ভাগাভাগিতে ব্যস্ত হলেও পিতৃস্মৃতিতে তারা আগ্রহী হয় না। ভবিষ্যৎ কলহ রুখতে এমন হাল্কা বাড়ি করা উচিৎ, যার স্থায়িত্ব বেশী দিন নয়। বাটি তৈরী মাত্র স্ত্রীর ভবিষ্যতের জন্য করা উচিৎ। পুত্রদের শিক্ষাদান ব্যতিতেকে পিতার অন্য কিছু কর্তব্য নেই।]

পুত্র পিতামাতাকে ভরণপোষণ না করলে উহা অন্যায় বা পাপ। কিন্তু মাতাপিতা নাবালক পুত্র কন্যাকে অবহেলা করলে উহা এদেশে অপরাধ।

যে দুর্ভোগে কেউ নিজে ভুগেছে তা তার অন্যকে ভুগতে দেওয়া উচিৎ নয়। যে ব্যথা কেউ নিজে পেয়েছে সেই ব্যথা অন্য কেউ যেন তার কাছ থেকে না পায়। [প্রায় দেখা যায় যে এর উল্টোটিই হয়ে থাকে।]

পুত্র একদিন পিতা হবেন। বধূ একদিন শাশুড়ী হবেন। নিম্নপদীরা একদিন উচ্চপদী হবেন। সেইদিন পূর্বেকার অসুবিধা স্মরণ করে সেইগুলি দূর করা উচিৎ। আশ্চর্য এই যে—যুবকরা ভাবে তারা কখনও বৃদ্ধ হবে না। রাজপুরুষরা ভাবে যে তারা কখনও রিটায়ার করবে না। নিজেদের প্রতি যে ব্যবহার প্রত্যাশা করা হয় সেইরূপ ব্যবহারই অন্যের প্রতি করা উচিৎ। রাজপুরুষরাও ভুলে যায় যে, যে জনগণ থেকে তারা এসেছে, সেই জনগণের মধ্যে কর্মশেষে তাদের ফিরে যেতে হবে। ক্ষমতাসীনরা ভুলে যান যে জনগণের মধ্যে তাদের আত্মীয় স্বজনরাও রয়েছে। অন্যত্র অন্যক্ষমতাসীনদের দ্বারা তারাও অনুরূপভাবে উৎপীড়িত হতে পারে। মিথ্যা মামলা-দায়েরকারীদের বুঝা উচিত যে তাঁরা নিজেরাও মিথ্যা মামলায় পড়তে পারেন। প্রত্যেকেরই বুঝা উচিত যে অন্যদের মত তার নিজেরও মা বোন ও স্ত্রী কন্যা আছে। মনের এইরূপ চিন্তা অপরাধ স্পৃহার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শক্তি গড়ার সহায়ক হয়ে থাকে।

দ্বাদশ অধ্যায়

॥ অপরাধ চিকিৎসা ॥

অপরাধীদের চিকিৎসার্থে মানসিক ও দৈহিক এই উভয় চিকিৎসারই প্রয়োজন। বহুক্ষেত্রে দৈহিক চিকিৎসার পূর্বে মানসিক চিকিৎসা ফলপ্রদ হয় নি। সাধারণ মানুষের মত অপরাধীরাও স্নায়ু দৌর্বল্য, রক্তের কম চাপ, নারভাস ব্রেক ডাউন প্রভৃতিতে ভুগে। দেহকে সুস্থ না করলে কোন উপদেশাদি বাক্-প্রয়োগ তথা সাজেস্‌সন কার্যকরী হয় না। এজন্য প্রথমে এদের কোষ্ঠ বদ্ধতা, দন্তের ও কণ্ঠের রোগ ও স্নায়ু দৌর্বল্য প্রভৃতি থেকে মুক্ত করতে হবে। প্রয়োজনে পর্যাপ্ত প্রোটীন ফুড্, হরমন ইনজেকসন ও ভাইটামিন ট্যাবলেট দ্বারা তাদের দেহকে সবল করার পর বাক্-প্রয়োগগুলি ক্রিয়াশীল হয়। [এদের ঘুম কম হলে ঘুমের ঔষধ দিতে হবে।]

[এদের কর্মালসতার জন্য দায়ী ল্যাকটিক এ্যাসিড এদের দেহে স্বল্প পরিশ্রমে বেশী ক্ষরিত হয়। ইহা বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় নিউট্রেলাইজিঙ তথা বিপরীত ধর্মী প্রতিষেধক ঔষধের ব্যবস্থার প্রয়োজন। কর্মালস মানুষই অধিক ক্ষেত্রে অপরাধী হয়ে থাকে।]

মানসিক চিকিৎসার পূর্বে ওদের মধ্যে অপরাধ স্পৃহার এবং উহার প্রতিরোধ শক্তির পরিমাপ জানা প্রয়োজন। এই জন্য এই দুইটিকে বিশ্লেষণ করে ওদের প্রত্যেকটির পরিমাণ বুঝতে হবে। এজন্য নিম্নোক্ত ফরমুলাটি পুনরুদ্ধৃত করা হলো। ইকোয়েশন দ্বারা উহাদের অংশগুলির শক্তি অবগত হওয়া সম্ভব। তাহলে ওদের একটির ঘাটতি অন্যটির ধারা পুরণ করা যাবে।

$$\frac{S^3+T^2}{R^6}=C(^{-1})$$

[S অর্থে সিচুয়েসন তথা পরিস্থিতি, T অর্থে টেণ্ডেন্সি তথা প্রবণতা এবং R অর্থে রেজিসটেন্স পাওয়ার তথা প্রতিরোধ-শক্তি এবং C অর্থে ক্রাইম তথা অপরাধ বুঝায়।]

এই S এবং T'র সম্মিলিত শক্তি R'র শক্তির কম হলে মানুষ নিরপরাধী এবং তাহার বেশী হলে মানুষ অপরাধী হবে। উপরের ইকোয়েশন মত S এবং

T এর সম্মিলিত শক্তি [3+2=5] R' এর একক শক্তির [6]র কম হওয়াতে ঐ ব্যক্তি নিরপরাধী। কিন্তু উপরিউক্ত 'R' তিনটি পৃথক শক্তির সমন্বয়ে স্বষ্ট। যথা (১) হেরিডিটি তথা বংশানুক্রম (২) পরিবেশ ও শিক্ষাদীক্ষা (৩) এবং ভয় ও ভাবনা। এই জন্য R' এর শক্তি বাড়াতে হলে উহার ঐ পৃথক তিনটি অংশ সম্পর্কে বিবেচনা করতে হবে।

$$H^2+E^4+F^6=R^{12}$$

[H অর্থে হেরিডিটি তথা বংশানুক্রম, E অর্থে এনভায়রনমেণ্ট তথা পরিবেশ ও শিক্ষা দীক্ষা এবং F অর্থে ফিয়ার অফ্ কনসিকোয়েন্স তথা ভয় এবং ভাবনা আদি এবং R অর্থে রেজিসটেন্স পাওয়ার তথা অপরাধ প্রতিরোধ শক্তি বুঝায়। এইখানে H তথা হেরিডিটির শক্তি কম হলে উহা E তথা পরিবেশ ও শিক্ষা দীক্ষা এবং F তথা ভয় ও ভাবনা অর্থাৎ শাস্তির ভয়াদি দ্বারা পুরণ করতে হবে।]

উপরোক্ত কারণে অপরাধীদের চিকিৎসার্থে অনুসন্ধান ও পরিদর্শন ও জিজ্ঞাসাবাদ দ্বারা উপরোক্ত প্রতিটি [মানসিক] উপকরণগুলির কম বেশী শক্তি বুঝতে হবে। এজন্য ওদের আশৈশব ইতিবৃত্ত পরিবেশ প্রভৃতি এবং মাতৃ ও পিতৃকুলের সম্যক পরিচয় ও ওদের মানসিক গঠন ও অবস্থা এবং ব্যবহারাদি জ্ঞাত হতে হবে।

[মানুষ মাত্রের মধ্যে কম বেশী অপরাধ-স্পৃহা আছে। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অপরাধ-স্পৃহা থাকলে মানুষ অপরাধী হয়। অপস্পৃহা ঐ নির্দিষ্ট মানের কম থাকলে '$-C$' কিংবা '$-C^4$ আদি চিহ্ন দ্বারা এবং উহা ঐ মানের বেশী হলে '$+C$' কিংবা '$+C^4$' আদি চিহ্ন দ্বারা ইকোয়েসন করতে হবে। চিকিৎসার পূর্বে প্রত্যেক অপরাধীর হিষ্টিসিট্ তথা ইতিবৃত্ত পত্রে উপরোক্ত রূপে তদ্‌সম্পর্কিত একটি ফরমূলা যুক্ত রাখতে হবে। অপস্পৃহা অত্যুগ্র হলে ন্যূনতম প্রতিরোধ শক্তি তাকে রুখতে পারে না। সেই ক্ষেত্রে কার্যকরণ দ্বারা ওদের ঐ প্রতিরোধ শক্তি বাড়াতে হবে।

অপরাধীদের কম বেশী কষ্ট বোধ ও উষ্ণবোধ আদি দৈহিক অসাড়তা, ওদের অলসতার ও তৎপরতার উপস্থিতির ক্রম তথা হার, ওদের অবিমিশ্র নিষ্ঠুরতা দাম্ভিকতা প্রভৃতির উঠানামার ক্রম, ওদের স্থূল ও সূক্ষ্ম বৃত্তিগুলির কমবেশী সংমিশ্রণ তথা ইনটার লকিঙ' এর পরিমাপ, ওদের কমবেশী ভালোমন্দ প্রবণতা ও ভাবাবেগ এবং পূর্ব পরিবেশ ও বংশানুক্রম' অবলোকন

অনুসন্ধান ও বিবিধ যান্ত্রিক পরীক্ষা দ্বারা বুঝে ওদের অপস্পৃহার নির্দিষ্ট পরিমাপ করা সম্ভব।

কিছু ক্ষেত্রে কথোপকথন কিংবা বাক্য বা দ্রব্য সম্পর্কিত ষ্টিমিউলাস এবং ভালো বা মন্দ ব্যবহারে তাদের মুখাকৃতির পরিবর্তন এবং অন্যান্য অভিব্যক্তি হ'তে ওদের দ্রব্যস্পৃহা ও শোণিত স্পৃহার পরিমাপ জ্ঞাত হওয়া গিয়েছে।

তাদের পূর্ব নিরাপরাধ জীবন সম্পর্কিত আলোচনা তাদের কম বেশী আগ্রহ বা অনাগ্রহ হতে এবং তাদের মধ্যে অপরাধ সম্পর্কে লজ্জা ও অনুতাপ-হীনতা প্রভৃতি নৈতিক অসাড়তা এবং তাদের পরিস্থিতি বিশেষে ব্যবহার ও পরিক্রমণাদি হতে ওদের অপস্পৃহার পরিমাপ জেনে ওদের শ্রেণী বিভাগ করা সম্ভব।]

বিঃ দ্রঃ—এখানে উল্লেখ্য এই যে, প্রথম পর্যায়ের প্রাথমিক অপরাধীদের এই 'অপরাধ তত্ত্ব' পুস্তকটি পড়তে দিলে তারা নিরাময় হবে। এই পুস্তকটির বিষয়বস্তু তাদের আত্মবিশ্লেষণের সহায়ক হবে। এতে তাদের মনের এই সব দুর্বলতা প্রকট হলে তাদের অপরাধ-প্রতিরোধ শক্তি ফিরে আসবে। এতে তারা ভুল ত্রুটি শুধরোবে এবং ঐ গুলিকে আর বাড়তে দেবে না।

মানুষের অপরাধ-'স্পৃহাঙ্ক [C] নিম্নোক্ত ইকোয়েশন দ্বারা আরও সুচারু-রূপে অবগত হওয়া সম্ভব। অবলোকন অনুধাবন প্রশ্নোত্তর অনুমান অনুসন্ধান মনো-বিশ্লেষণ এবং তৎসহ যান্ত্রিক পরীক্ষা দ্বারা অপস্পৃহাঙ্ক হয়। শিশুরা তাদের অবিভ্যক্তি [ইনট্রসপেকসন] প্রায়ই গোপন করে না।

$$(T^2 + S^3) \div R^4 = C^1$$

বিবেচ্য বিষয় এই যে সকল প্রকার অপরাধীকে পুনরায় চিকিৎসা দ্বারা নিরাময় করা যায় কিনা। আমার সুচিন্তিত অভিমত এই যে, পৃথিবীতে চিকিৎসার অযোগ্য কোনও অপরাধী নেই। আমার বক্তব্য বিষয় নিম্নোক্ত জীব-বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণ করা যাবে। তবে এই বিষয়ও ঠিক এই যে, শ্রেণী ভেদে ওদের চিকিৎসাও বিভিন্ন রূপ হবে।

"গোলা পায়রা তথা রক-পিজিওন থেকে কয়েক পুরুষের মধ্যে বর্তমান রঙিন পারাবতগুলি মনুষ্য কর্তৃক কৃত্রিম নির্বাচন দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু ওদেরকে জঙ্গলে মুক্ত করে দিলে পরবর্তী কয়েক পুরুষ বাদে উহারা পুনরায় গোলা পায়রা তথা রক পিজিওনে রূপান্তরিত হয়।"

ইহা প্রমাণ করে যে, নিরাপরাধী থেকে অপরাধী সৃষ্ট হলেও বিপরীত

পরিবেশে ঐ পারাবতদের মত ওরাও পুনরায় নিরপরাধী হবে। মানুষের ক্ষেত্রে উহা এক পুরুষে স্বল্পকালের মধ্যে সমাধা হয়। কারণ দেহ অপেক্ষা মনের গতি বহু গুণে দ্রুত।

[সাধারণতঃ ধর্ম উপদেশ এবং শাস্তি প্রদান দ্বারা অপরাধীদের নিরাময় করার চেষ্টা করা হয়। এর দ্বারা আজও পর্যন্ত পৃথিবীতে অপরাধীদের নির্মূল করা সম্ভব হয় নি। এই উভয় পন্থা ব্যতিরেকে অন্যান্য পন্থা দ্বারাও তাদের নিরাময় করা সম্ভব। এই সম্বন্ধে এই 'অপরাধ চিকিৎসা নিবন্ধে আমি বলবো।]

বিঃ দ্রঃ—অপরাধীদের অপরাধসকল সাধারণতঃ তুইটি মূল বিভাগে বিভক্ত। যথা: যৌনজ ও অ-যৌনজ। যৌনজ অপরাধীদের মূল হেতু ও উহাদের চিকিৎসা পৃথক খণ্ডে পৃথকরূপে আলোচনা করবো। এই উভয় অপরাধীদের উৎপত্তির কারণ বিভিন্ন হওয়ায় উহাদের চিকিৎসাও বিভিন্ন হয়।

অপরাধীরা [অতি সৎ মানুষও] স্বভাব অলস। অতি সৎ'রা অলস সাধু। নিরপরাধী অলস ব্যক্তি ভিক্ষা করে। কিন্তু অপরাধী অলস ব্যক্তিরা অপরাধ করে। এজন্য ভিখারীদেরও কাউকে কাউকে অপরাধী হতে দেখা যায়। কেউ ভিক্ষা না পেলে কটূউক্তি [পাপ কার্য] পর্যন্ত করেছে। পাপী অপরাধীর সৃষ্টি সম্ভব। অপরাধীরা ভিখারীদের মধ্য থেকে বালক সংগ্রহ করে। ওরা স্বভাব অলস না হলে ওরা সৎভাবে জীবন যাপন করতো।

[ভিখারী ও বেশ্যারা নানাভাবে অপরাধীদের সাহায্য করে। বহু পুরানো পাপী রাত্রে ফুটে শুয়ে থাকা ভিখারীদের মধ্যে আত্মগোপন করে। কোনও ভিখারী অপরাধী হলে ভিখারী সমাজের উহা গর্ব।]

চিকিৎসার পূর্বে বুঝে নিতে হবে যে অপরাধী বিশেষ তার কোন পর্যায়ে আছে। অর্থাৎ তারা প্রাথমিক অপরাধী বা প্রকৃত অপরাধী। প্রকৃত অপরাধীদের মত ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন না হওয়ায় প্রাথমিক অপরাধীদের চিকিৎসা খুবই সহজ। প্রাথমিক অপরাধীদের সুপরিবেশে এনে উপদেশাদি বাক-প্রয়োগের দ্বারা এবং তাদের অভাব ও প্রয়োজন আদি দূর করে তাদের নিরাময় করা সম্ভব। তবে কিছু দিন যাবৎ এদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন আছে। এছাড়া শাস্তির ভয় দ্বারা ও সদুপদেশ এবং অপকর্মের সুযোগ বিদূরিত করেও তাদের নিরপরাধী করা গিয়েছে। অপকর্মে বাধা পেলে এরা প্রায়ই অপকর্ম করে না। এরা সাধারণ মানুষ থেকে বেশী দূর সরে আসে নি।

বিঃ দ্রঃ—দল-নির্ভর স্থানীয় দৈব মস্তানরা স্ব-পল্লীর বাইরে অপকর্মে সাহসা

হয় না। ওদের দল থেকে বার করে দূর স্থানে নিলে ওদের চিকিৎসা সহজ হয়।

[পুনঃ পুনঃ বাক প্রয়োগ ও তদারকী এবং সুদৃষ্টান্ত দ্বারা এদের সূক্ষ্ম বৃত্তি সবল করলে কু দৃষ্টান্ত ও কুসঙ্গের অবর্তমানে এদের স্থূল বৃত্তিগুলি আপনা থেকেই দুর্বল হবে।]

এই ক্ষেত্রে বাক্-প্রয়োগ তথা সাজেসনগুলি চোখা চোখা ও বহুক্ষণ স্থায়ী হওয়া দরকার। উহাদের দৃষ্টান্ত স্বরূপ এইরূপ বলা যেতে পারে: তুমি নিশ্চয়ই ভালো হবে। তোমাকে ভালো হতেই হবে। কত লোক ভালো হলো। আর তুমি তা হবে না। তোমার বংশ গরিমা ভুলো না, ইত্যাদি। একাধিক শব্দ-গুলির বিভিন্ন রূপ বিন্যাস দ্বারা বার বার উচ্চারণ করলে তা মনে স্থায়ীরূপে প্রোথিত হ'য়। মিথ্যাও বারে বারে বললে উহা সত্য রূপে প্রতীত হবে।

অপরাধীদের চিকিৎসা করতে হলে তিনটি পন্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। উহাদের যথাক্রমে আমি বলেছি, পরিবেশিক, ঔষধগত এবং মানসিক চিকিৎসা। আমার মতে উহাদের তিনটির মধ্যে সমন্বয় করে নিতে পারলে অধিকতর সুফল ফলবে। ক্ষয় ক্ষতি দৈহিক ও মানসিক উভয় কারণে হতে পারে। এ জন্য এদের ক্ষেত্রে উভয়বিধ চিকিৎসা প্রয়োজন। এক্ষণে এইরূপ চিকিৎসার পূর্বে অপরাধীদের সঠিকরূপে শ্রেণীবিভাগ করে নেবার প্রয়োজন আছে। যে পদ্ধতিতে অপরাধ-রোগীর চিকিৎসা করা হয় সেই পদ্ধতিতে নীরোগ অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত প্রাথমিক ও প্রকৃত অপরাধীদের চিকিৎসা না করে তাদের চিকিৎসা ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে করতে হবে। দৈহিক চিকিৎসা কিছু অপরাধী রোগীদের উপর কার্যকরী হলেও নীরোগ অপরাধীদের চিকিৎসা ক্ষেত্রে উহা কার্যকরী হয় না। তাই স্বভাব, অভ্যাস, মাধ্যম ও দৈবএবং তৎসহ শোণিতাত্মক ও সম্পত্তিক প্রভৃতি অপরাধীদের চিকিৎসা ভিন্ন ভিন্ন রূপে করা উচিত হবে।]

প্রথমে আমি নীরোগ অপরাধীদের অন্তর্গত প্রাথমিক অপরাধীদের চিকিৎসা সম্বন্ধে আলোচনা করবো। এদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের কোনও পরিবর্তন দেখা যায় না, বরং এদের অপরাধ-রোগীদের এবং দৈব অপরাধীদের ন্যায় স্বাভাবিক মানুষের মত দেখা যায়। এইজন্য এদের চিনে নিতে কোনও অসুবিধা নেই।

আমার মতে যে প্রণালীতে একজনকে নিরপরাধ থেকে আমরা অপরাধীতে পরিণত হতে দেখেছি, উহার উল্টা প্রণালী গ্রহণ করে আমরা পুনরায় তাদের নিরপরাধীতে পরিণত করে দিতে পারি। সাধারণতঃ একজন সৎ মানুষকে

নেশাভাঙ্গ করিয়ে উহাদের সূক্ষ্ম স্নায়ুকে দুর্বল বা ক্ষতিগ্রস্ত করে দিয়ে পরে তাদের পুনঃ পুনঃ বাক্‌প্রয়োগ দ্বারা অপরাধীতে পরিণত করা হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে আমি মনে করি যে বিপরীত গুণসম্পন্ন ঔষধাদি দ্বারা প্রথমে উহাদের মনের আধারভূত ক্ষতিগ্রস্ত সূক্ষ্মস্নায়ুকে পুনর্গঠিত বা সবল করে তার পর উহাদের ধর্মোপদেশ প্রভৃতি বাক্‌প্রয়োগ দ্বারা পুনরায় নিরপরাধ মানুষে পরিণত করা যায়। তবে যে যে কারণে ঐ ব্যক্তি অপরাধীতে পরিণত হয়েছিল সেগুলিকে পূর্বাহ্ণেই দূরীভূত করতে হবে। এইখানে বাসস্থান ও কুসঙ্গ সম্ভূত পরিবৈশিক পরিবর্তনের কথাও ভুলে গেলে চলবে না।

[আমি প্রায় ২২টি প্রাথমিক অপরাধীকে স্নায়ুর উপর কার্যকরী ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করে এবং তৎসহ তাদের খাদ্যাভাব প্রভৃতি দূর করে ও তাদের সুবিধামত সুপরিবেশে এনে পুনরায় নিরপরাধীতে পরিণত করতে পেরেছিলাম।]

এই প্রাথমিক অপরাধীদের চিকিৎসার্থে প্রথমে স্থান নির্বাচনের প্রশ্ন আসে। তৎসহ ওদের অভাব দূরীকরণে কর্মসংস্থানের প্রশ্নও এখানে আছে। নিম্নোক্ত আখ্যান ভাগ হতে উহার মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজন উপলব্ধি করা যাবে।

"কৃষকরা অবচেতন মনে ধরিত্রীর বুক হতে শস্য অপহরণ করে। এইভাবে তারা তাদের অন্তর্নিহিত অপস্পৃহা [দ্রব্য স্পৃহা] কৃত্রিম উপায়ে প্রতিদিনই বহির্গত করে নিজেদেরকে নিরপরাধ রাখে। এরা জমিজমা রক্ষার্থে মারপিঠ [শোণিত স্পৃহা] আদি শোণিতাত্মক অপরাধ করলেও চুরি চামারি অপরাধ তারা সাধারণতঃ করে না। অপরাধ স্পৃহা যে দ্রব্য স্পৃহা এবং শোণিত স্পৃহাতে বিভক্ত উহা তাহা প্রমাণ করে। একমাত্র তাদের মধ্যে যারা ভূমিহীন দিন মজুর, তারাই মধ্যে মধ্যে ডাকাতি আদি অপরাধ অন্য গ্রামে করেছে।"

অন্যদিকে যারা উদ্যোগ শিল্পের শ্রমিক তারা অবচেতন মনে ভাবে যে, তাদের কষ্টার্জিত বা শ্রমার্জিত অর্থ থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে অপরে তাতে ভাগ বসাচ্ছে। এক্ষেত্রে তারা ঐ মিল ও ফ্যাকটরীর মালিক বা অংশীদার না হলে এদের ঐ মানসিক প্রতিক্রিয়া অপরাধী সৃষ্টির সহায়ক হতে পারে।

শ্রমিকরা কার্যস্থলে বাসস্থান ও সহজলব্ধ কুসঙ্গ [নেশা ভাঙ্গ সহ] প্রভৃতির কারণে এবং পারিবারিক আদর্শ হতে দূরে থাকায় অপরাধ সম্পর্কিত প্রতিরোধ

শক্তি স্বভাবতঃই হারিয়ে ফেলে। উপরন্তু শ্রমিক বস্তীগুলিতে পারিবারিক প্রাইভেসী-বোধ বলে কোনও বস্তু নেই। [পূর্ব পৃঃ দ্রঃ]

[শহরে একই বাড়ির অন্য এক ফ্ল্যাটে কারও বেশ্যা নারী সহ বসবাসে অন্যদের মাথা ব্যথা নেই। কিন্তু গ্রামে সেই ক্ষেত্রে প্রচণ্ড সামাজিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। সেখানে বেশ্যা নারী ও বৃত্তিগত অপরাধীদের স্থান নেই। গ্রামে অতি দরিদ্র ব্যক্তিরও মাটির পাঁচিল ঘেরা পর্ণ কুটীরে পারিবারিক প্রাইভেসী সাবধানে রক্ষিত। উপরন্তু পারিবারিক প্রভাব প্রত্যেকের উপর কার্যকরী হয়। এদের আর্থিক বা অন্য প্রয়োজনে কেউ না কেউ তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে।]

উপরোক্ত কারণে আমরা কৃষিপ্রধান স্থানে অপরাধীদের সংখ্যা নগন্য দেখি। কিন্তু উদ্যোগ শিল্পের প্রসার পারিবারিক আদর্শ হতে বিচ্যুত করে মানুষকে তখুনি অপরাধী না করলেও তাদেরকে অপরাধীমুখী করে। গ্রামাঞ্চল ও শিল্পাঞ্চল স্থানের অপরাধের পরিসংখ্যান থেকে এই সত্যটি প্রতীত হবে। নিম্নে এই সম্পর্কে একটি প্রমাণ উদ্ধৃত করা হলো।

"বিগত মহাযুদ্ধের সময় মনুষ্যকৃত দুর্ভিক্ষকালে আমি কলিকাতা মহানগরীতে উপস্থিত ছিলাম। এই মহা মন্বন্তরের সময় আমি বহু নরনারীকে 'হা অন্ন, হা অন্ন করে, দুটি খেতে দেবে গো' বলে খাবারের দোকানেরই নীচে ফুটপাতের উপর শিশু পুত্র সহ দলে দলে মৃত্যুবরণ করতে দেখেছি। কিন্তু তা সত্বেও তারা একাকী কিংবা দলবদ্ধভাবে সেই খাবারের দোকান লুঠ করার চিন্তাও করেনি।

[আমি অনুসন্ধান করে জানি যে এদের প্রত্যেক ব্যক্তিই আশেপাশের গ্রামাঞ্চলের চাষী ছিল। এদের মধ্যে একজনও কোনও শিল্পে নিযুক্ত ছিল না। এই সময় যুদ্ধের প্রয়োজনে শিল্পাঞ্চলে প্রতিটি শ্রমিকের জন্য খাদ্য সম্পর্কিত রেশনের বরাদ্দ করা হয়েছিল। আমার বিশ্বাস এরা শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক হলে তারা এই ভাবে না মরে ঐ সকল দোকান লুঠ করে তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করে নিত।

এই জন্য কোনও এক বালকের মধ্যে অপরাধ-স্পৃহা দেখা গেলে তাকে শিল্পাঞ্চলে এনে শ্রম শিল্পে নিযুক্ত করলে ফল বিপরীত হবে। অন্ন সংস্থানার্থে এদেরকে পারিবারিক আদর্শ ও সংসর্গ থেকে দূরে সরানো উচিত হবে না। আমার মতে তাদেরকে শহর থেকে দূরে গ্রামাঞ্চলে এনে কৃষিকার্যে ও হাল্কা

কুটির শিল্পে নিযুক্ত করেই মাত্র নিরপরাধী করা সম্ভব। ভূমির মালিকানা বোধ গ্রামের লোকদের মধ্যে আত্মসম্মান বোধ আনে।

উপরোক্ত তথ্যগুলি থেকে আরও বুঝা যায় যে, কৃত্রিম উপায়ে মন হতে অপস্পৃহা বহির্গত করে দিয়েও মানুষকে নিরপরাধ করা সম্ভব। আমরা প্রতিদিন নানাভাবে আমাদের সংগৃহীত অপরাধ-স্পৃহা [যৌন স্পৃহাও] কৃত্রিম উপায়ে নির্গত করে দিয়ে নিজেদেরকে সুস্থ রাখি।

গত মহা যুদ্ধের সময় আমি পুলিশে বহাল থাকা কালে এলাকার ১৯টি দাঙ্গাকারী যুবককে চেষ্টা করে সৈনিক বিভাগে ভর্তি করে দিয়েছিলাম। যুদ্ধাবসানে ফিরে এসে তারা ঐরূপ মার-পিঠ বা গুণ্ডামীর অপরাধ করে নি। এদের কয়েক জনকে হিংস্র জন্তু শিকার, দুর্গম পর্বতারোহণ বা বিপজ্জনক স্পোর্টস প্রভৃতিতে নিযুক্ত করেও আমি অনুরূপ ফল পেয়েছি। [লিজার-গ্যাপ পূর্তি দ্বারা] (f)

এইভাবে আমি দেখেছি যে যুদ্ধে গিয়ে অধিক মাত্রায় এবং শিকার প্রভৃতিতে মধ্য রাত্রিতে এবং খেলা-ধুলায় কম মাত্রায় শোণিত-স্পৃহা নিষ্কাশিত করে ওরা নিরাময় হয়েছে। [শোণিতাত্মক অপরাধী] এজন্য এদের শোণিত স্পৃহার পরিমাপ বুঝে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

[সাম্প্রতিক অপরাধী পুরানো চোরদের কিছুকাল ইনফরমার রূপে চোর ধরানোর কার্যে নিযুক্ত রেখে দেখা গিয়েছে যে, কিছুদিন পর তারা নিজেরা আর চুরি করতে পারে নি। চোর ধরার কার্যে কিছুটা সৎ-প্রেরণা থাকে। এই সৎপ্রেরণার আগমন তার উল্টা বৃত্তি অপরাধ স্পৃহাকে ধীরে ধীরে অপসারিত করে তাকে নিরপরাধী করে।]

"কোনও এক বালক অপরাধীকে আমি এইরূপ ভাবে নিরাময় করি। বালকটি সুবিধা পেলেই এর ওর পকেট থেকে পয়সা চুরি করতো। এ'বিষয়ে তাকে নিরস্ত করা অসম্ভব ছিল। আমি তাকে ঐ চুরির পয়সা দিয়ে কাঁচা মাল কিনিয়ে খেলনা তৈরী করতে শেখাই। তার হাতে প্রচুর পয়সা দিয়ে তার দ্বারা নানারূপ জিনিস কিনতাম। ইচ্ছাকৃত ভাবে আমি যত্র তত্র টাকা পয়সা ছড়িয়ে রেখেছি। এতে ঐ বালক সহজেই ঐ পয়সা চুরি করতে পারতো। এই বালকটি মারফৎ বহু দরিদ্র বালককে সাহায্য পাঠাতাম।

(f) সাহিত্য ও নাটকাদি ও দেশভ্রমণ এবং পর্বতারোহণ ও ক্লাবও উপকারী।

ওরা সত্যই অভাবী কিনা তার অনুসন্ধানের ভারও ঐ বালকটির উপর দেওয়া হয়।

সারা রাত্রি সে এ ঘরের দ্রব্য ও ঘরে এবং ও ঘরের দ্রব্য এ ঘরে এনেছে। তাকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করেছি যে ওই দিন সে কি কি চুরি করেছে। উত্তরে সে বলেছে যে সে আমার বাগান থেকে দুটো কাঁঠাল মাত্র চুরি করে তা বিক্রি করে সিনেমা দেখেছে।]

পরে একে দ্রব্যাদি পাহারা ও চোর ধরার কার্যেও নিযুক্ত করেছি। এই ভাবে বালকটির বাড়তি অপস্পৃহা কখনও অসৎ কখনও সৎ পথে নিষ্কাশিত হতে থাকে। কাজ কর্মের মধ্যে তার কর্মালসতার উপশম ঘটে। দান ধ্যান দ্রব্য পাহারা ও শ্রমশিল্পের কারণে তার মধ্যে আদর্শ স্থান পায়। তার মধ্যে ঔৎসুক্যেরও আবির্ভাব ঘটে। ধীরে ধীরে তার নৈতিক অসাড়তা বিদূরিত হয়। সে তার বিগত দিনের অপকর্মের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হতে থাকে। [অবশ্য—তৎপূর্বে এর দৈহিক চিকিৎসা করা হয়েছিল।

উল্লেখ্য এই যে কর্মালস অপরাধীদের কর্মদ্বারা তৎপরতা এনে উহা দূর করা বিধেয়। কিন্তু—এই সকল কর্মে তাদের মানসিক ও দৈহিক গঠন এবং পছন্দা-পছন্দ বিবেচনা করতে হবে। আশ্চর্য এই যে রাষ্ট্রীয় কারাগারসমূহে তদনুযায়ী বিভিন্ন কর্ম ও শিল্পাদির ব্যবস্থা নেই। কারা কর্তৃপক্ষের শ্রমিক বিজ্ঞানের [ইনডাসট্রিয়াল সাইকোলজী] সামান্যতম জ্ঞানও নেই। আমি এই সম্বন্ধে নিম্নে সামান্য একটি ধারণা দেওয়ার প্রয়োজন মনে করছি।

"ওদের কর্মকাল [WORK SPELL] কে প্রয়োজন মত দুই কিংবা চার ভাগে ভাগ করে উহাদের মধ্যবর্তী কালে কম বেশী বিশ্রাম ক্ষণ [Rest Pause] দিতে হবে। এতে ল্যাকটিক এ্যাসিড দ্বারা এরা অবক্লান্ত তথা ফেটিগড হবে না। ভারী কার্যে বেশীক্ষণ এবং হাল্কা কার্যে কম ক্ষণ বিশ্রামকাল দিতে হবে।

[কয়েদীদের শিক্ষাদীক্ষা, অভ্যাস এবং দেহ ও মনের গঠন মত তাদের উৎপাদক তথা প্রোডাকটিভ এবং অনুৎপাদক তথা নন-প্রোডাকটিভ কর্ম দিতে হবে। রাজ মিস্ত্রীরা উৎপাদক কার্য এবং জোগাড়েরা অনুৎপাদক কর্ম করে।]

চুলচেরা কাজে [Accurate] প্রথমে কম গতিতে ও পরে গতি বেশী করা উচিত। কিন্তু ভারী কাজে প্রথমে দ্রুত গতিতে সুরু করে পরে গতি শ্লথ

করতে হবে। এ বিষয়ে তাদের তাড়না করলে এদের দেহ ও মনে ক্ষতি হয়ে থাকে। উপরন্তু উহাতে উৎকৃষ্ট দ্রব্যোৎপাদন ব্যাহত হয়ে বাতিল দ্রব্যাদির সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। যন্ত্রের উৎকর্ষতার অভাবে [উৎকৃষ্ট যন্ত্র না থাকলে] সাধারণ যন্ত্রের ব্যবহার চাতুর্য তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া বিধেয়।

এখানে প্রয়োজন কম সময়ে ও কম পরিশ্রমে অধিক উৎপাদন। ভুলে গেলে চলবে না যে পরিশ্রম লাঘবের জন্যই যন্ত্রের সৃষ্টি। এই জন্য আনুষঙ্গিক ক্ষুদ্র যন্ত্রাদি [Tools] মূল যন্ত্রের নিকটে হাতের নাগালের মধ্যে থাকা চাই। [যন্ত্রসমাবেশ] সম্ভব হলে যন্ত্রের সহিত চালকের উপবেশন স্থান [Seat] সংযুক্ত রাখতে হবে। একটি যন্ত্রে অভ্যস্ত শ্রমিক'কে অন্য যন্ত্রে নিষ্প্রয়োজনে নিযুক্ত করা উচিত হবে না। কারণ—অধিক দিন একটি যন্ত্রে কার্য করলে তারা ঐ যন্ত্রের সহিত প্রায় একাত্মা হয়ে যায়। উপরন্তু ঐ যন্ত্রের প্রতি একটা অধিকার ও মমতা-বোধ তাদের এসে যায়। ঐ যন্ত্র কখন খারাপ হবে তা তারা শব্দ শুনে বলে দিতে পারে। এতে ঐ যন্ত্রে তাদের কোনও দুর্ঘটনা ঘটে না। উৎপাদিত দ্রব্যাদির প্রতি একটা মালিকানা বোধ আসাতে বাজারে উহার কাটতির জন্য গর্ব করে ওরা বলেছে : ঐ দ্রব্যাদি আমাদের ফ্যাকটারীর তৈরী বলে এতো মজবুত ও সুন্দর। ওদের ওই মনোভাব ওদের প্রতি অসদ ব্যবহার দ্বারা নষ্ট করা উচিত নয়।

কোনও ভারী দ্রব্য একত্রে টানতে হলে লম্বা ও বেঁটে লোকদের উচ্চতা মত পর পর সাজাতে হবে। লম্বাদের সুমুখে এবং বেঁটেদের পিছনে রাখতে হবে। ঐ দ্রব্য সোজা না টেনে আঁকা বাঁকা টানলে ঐ যৌথ পরিশ্রম কম হবে।'

[এখানে কারখানাসমূহে সুষ্ঠু আলোর ব্যবস্থা ও গরম বা ঠাণ্ডা বায়ু চলাচলের বিষয়'ও অবশ্য প্রয়োজনীয়। বাইরের তাদের পরিবারবর্গের সংবাদাদি ও তাদের সুস্থতা সম্বন্ধেও তাদের প্রয়োজন মত জানাতে হবে।]

উপরোক্ত রূপ বিজ্ঞানসম্মত ভাবে পরিশ্রমে অপরাধীদের অভ্যস্ত করে বহু উৎকট অপরাধীদের নিরাময় করা গিয়েছে। কল-কারখানার সাধারণ শ্রমিকদের সম্বন্ধেও উহা সমভাবে প্রযোজ্য। এতে শ্রমিকরা কখনও কোনও অপরাধমূলক কার্য করবে না। বাটী থেকে কারখানাতে আসতে তাদের বাড়তি পরিশ্রম হয়। পরে পুনরায় কারখানায় এসে তাদের পরিশ্রম শুরু হয়। এই জন্য কর্মস্থলের নিকট ওদের আবাসস্থল থাকা উচিত। নিম্নবিত্ত

ও উচ্চবিত্তদের মধ্যে কর্ম বিভাজন সাবধানে করা উচিৎ। বক্তব্য বিষয়টি নিম্নোক্ত আখ্যান হতে বুঝা যাবে।

"মধ্যবিত্ত তরুণদের মধ্যে অর্থনৈতিক এ্যারিষ্ট্রোক্রেসীর বদলে একটা মানসিক এ্যারিষ্ট্রোক্রেসী তথা অভিজাত্য বোধ এসে গেছে। এদের অনেকের অর্থ প্রাপ্তিতে বেশী আগ্রহ নেই। এরাযা চায় তা হচ্ছেইউনিফর্ম, এসোসিয়েসন, ষ্টেটাস ও বিহেভিয়ার [এরা চায় উর্দ্দী, পদ, সঙ্গ ও সৎ ব্যবহার] এমনিতে এরা কোনও ড্রেন পরিষ্কারে রাজী হবে না। কিন্তু নীল পোষাক, গ্যাস মাস্ক ও হাতে দস্তানা ও গাম বুট পরে তা করতে তারা রাজী। কিন্তু তাদের সঙ্গে অন্য সমপর্যায়ী ব্যক্তিদেরও যোগ দিতে হবে। [এসোসিয়েসন] এরা একত্রে যে কোনও নীচু কর্ম করতে ইচ্ছুক। সোলা হ্যাট ও নীল 'গগলস' ও হাফ প্যাণ্ট পরে গলায় চায়ের ফ্ল্যাস্ক ঝুলিয়ে বহু ঘণ্টা ট্রাকটার চালাতে এদের আপত্তি নেই।

কোনও এক জুট মিলে এদের কয়জনের জন্য পৃথক ঘরে ভদ্র ট্রেনারের অধীনে পৃথক তাঁতের ব্যবস্থা করি। ওরা উপরোক্ত ভাবে একত্রে কয়জনে পাটের ফেঁসো মাখতে অরাজী হয় নি। সন্ধ্যায় সাবান দ্বারা গা ধুয়ে এরা পরিষ্কার প্যাণ্ট কোট পরে সিনেমা দেখতে যেতো।

[বহির্বঙ্গের মত ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি মধ্যবিত্তরা বাঙ্গলা দেশে নিম্ন শ্রেণীদের সঙ্গে পাশাপাশি জমিতে হাল চাষ না করে পরভূক তথা পরগাছা জীবন যাপন করাতে পল্লী অঞ্চলে শ্রেণীগত অসমতা বেশী উগ্র।]

কিছুটা অলস হওয়ায় কোনও কোনও ব্যক্তির রি-এ্যাকসন টাইম তথা প্রতিক্রিয়া-কাল কম। এজন্য যন্ত্র এগিয়ে এলে এরা দ্রুত হাত না সরাতে পেরে দুর্ঘটনাতে পড়ে। এদের দেহ তাল [Body Rhythm] কম থাকাতে যন্ত্রের গতির সহিত সমতা রাখতে পারে না। এজন্য সহজেই তারা পরিশ্রান্ত হয়। [এদের দুর্ঘটনা-প্রবণতাকে প্রোণনেস্ টু এক্সিডেন্ট বলা হয়।] উপরন্তু এদের কেউ কেউ ক্ষণস্থায়ী তৎপরতা এবং দীর্ঘস্থায়ী অলসতায় ভুগে। অধিকক্ষণ এক টানা পরিশ্রম করতে এদের কেউ কেউ অক্ষম।

উপরোক্ত কারণে প্রতিদিন একটু একটু করে এদের কর্মকাল বাড়াতে হবে। প্রথম সপ্তাহে দশ মিনিট দ্বিতীয় সপ্তাহে অর্ধ ঘণ্টা ও ঐভাবে এক মাসে আট ঘণ্টা কর্মকাল তোলা যাবে। এদের স্বাভাবিক দেহ-তালের সহিত সমতা রেখে যন্ত্রের গতিও প্রথমে কমাতে হবে। তারপর ধীরে ধীরে যন্ত্রের

গতি বাড়ালে অভ্যাস দ্বারা ওদের দেহ-তালও তদনুযায়ী বেড়ে যাবে। যন্ত্রের সাহায্যে অভ্যাস দ্বারা এদের প্রতিক্রিয়া-কাল'ও সবল করা সম্ভব। রোগীদের হাসপাতালের মত অলস ব্যক্তিদের চিকিৎসার্থেও ইনডাসট্রি যুক্ত হসপিটল তৈরি করা উচিৎ।

মানুষ সাধারণতঃ অলস জীব। বাধ্য না হলে কেউ কাজ করে না। উহা মানুষের আদি স্বভাব। প্রকৃতি ওদের সক্রিয় হতে বাধ্য করাতে মানুষ আজ সভ্য। প্রকৃতি উৎপীড়ন করলে জীব-বংশ ধ্বংস হয়। [যথা : ডাইনোসেরাস] প্রকৃতি প্রভাব বিস্তার করলে ওরা অভ্যাস বদলায়। ওতে ওরা দেহ মন বদলে নূতন জীব হয়ে থাকে। [তাই—সংশোধনার্থে দণ্ড দানের বদলে প্রভাব বিস্তারের বেশী প্রয়োজন।] পরিবর্তন অর্থে আমরা অভ্যাসের বদল বুঝি। উহা ভিতর ও বাহির উভয় স্থান হতেই আসে। কিন্তু জোর করে উপর হতে উহা চাপানো ক্ষতিকর হয়। [তাই রিভেলিউসন অপেক্ষা ইভলিউসন বাঞ্ছনীয়।]

বিঃ দ্রঃ—পুরানো পাপীদের দেহে বেশী ল্যাকটীক এ্যাসিড ক্ষরণে তাদের মধ্যে কর্মালসতা আসে। উহা পেশীকে আক্রান্ত করে মাসকুলার ফেটীগের সহিত [কিছুক্ষেত্রে] নারভাস ফেটীগেরও সৃষ্টি করে। ওই ল্যাকটীক এ্যাসিড্ পেশীতে যুক্ত উপস্নায়ুর স্নায়ু-মুখিতা তথা নার্ভ-প্লেট ক্ষতিগ্রস্থ তথা এ্যাফেকেটড্ করে। তাতে কেন্দ্রীয় স্নায়ু-সংস্থা হতে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ প্রবাহ পেশীগুলি আহরণে অক্ষম হয়। ফলে অপরাধী মানুষ স্বল্পশ্রমে অলস কিংবা জড় হয়ে পড়ে।

নিরানন্দ ও ভয়াতুর ভাব হতে উদ্ভূত মানসিক ফেটীগ এই দৈহিক এবং স্নায়বিক ফেটীগের সঙ্গে যুক্ত হলে ওই ক্ষতি আরও দ্রুত ঘটে।

উপরোক্ত ক্ষতি হতে রক্ষা পেতে মনুষ্য দেহ ওই ল্যাকটীক্ এ্যাসিডকে অক্সিডাইজড করে মাইকোজন নামক রস তৈরী করে উহাকে নিউট্রেলাইজড্ করে। কিন্তু সাধারণ মানুষের মত উৎকট অপরাধীরা ব্যক্তিত্বের পশ্চাদগামী পরিবর্তন হেতু স্নায়বিক দোষে ওই ক্ষতিকর বেশী ল্যাকৃটীক এ্যাসিড্ ধারণ করতে বা উহা মাইকোজন রসে রূপান্তরিত করতে অক্ষম হয়। সেই ক্ষেত্রে ওদের দেহে প্রতিষেধক বিপরীত ধর্মী ঔষধ প্রয়োগে ওদের ওই ল্যাকটিক এ্যাসিড্ নিউট্রেলাইজড্ [সমীকরণ) করতে হবে। এই ক্ষমতা ওদের মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে বাড়ালে উহা তাদের জড়তা সহ কর্মালসতা বিদূরিত করে। ওই ভাবে উহা তাদের কর্মকুশল করে নিরপরাধী করতে সাহায্য করবে।

এইজন্য অপরাধীদিগকে কর্মে নিযুক্ত করলে উপরোক্ত তিন প্রকার ফেটীগ তথা কর্ম-ক্লান্তি, স্টেইপজ্ তথা বিরতি-কাল, বোরডম তথা একঘেয়েমি, ইনসেনটিভ, কর্মলিপ্সা, ডিপ্রেসন তথা মনোবনমন, ভাবালুতা, এ্যাটিচিউড্ তথা দৃষ্টিভঙ্গী, ইনহিবিনেস, অবক্লান্তি, দৈহিক ভারসাম্য, স্বয়ং-ক্রিয়তা, পৌনঃপুনিকতা, দ্বিরাঙ্গীতা তথা বাই-ম্যানুয়েল, প্রভৃতি বিবেচনা করতে হবে। [মৎপ্রণীত শ্রমিক-বিজ্ঞান দ্রঃ] (f)

বিঃ দ্রঃ—উল্লেখ্য এই যে মাছের মত মানুষের দেহেও বিদ্যুৎ-শক্তি জাত ও প্রবাহিত হয়। [ইলেকট্রোডিও-গ্রাফ্ ও ইলেকট্রো থেরাপি দ্রঃ] প্রত্যেক মানুষের দেহে বার্তা বহনার্থে বৈদ্যুতিক যোগাযোগের ব্যবস্থা আছে। মোটা ও রোগা এবং পেশীবহুল ও চর্বিযুক্ত ব্যক্তির বৈদ্যুতিক প্রতিরোধ-শক্তিও বিভিন্ন। প্রটোপ্লাজম তথা জীব সারের সূক্ষ্ম নলগুলির বৈদ্যুতিক রোধের পরিমাণ প্রতি মিটারে ১০১২ ওহমের মত।

বিভিন্ন প্রকারের ভোল্টের তড়িত প্রবাহে ও কম্পমানে মানুষের দেহের বিভিন্নাংশে বিভিন্ন রূপ প্রতিক্রিয়া হয়। মানুষের ত্বক ব্যতীত হস্ত ও পদে বৈদ্যুতিক বোধ ২৫০ ওহম এবং স্কন্ধের মধ্যবর্তী স্থানে উহার পরিমাণ ১০০ হতে ৫০০ ওহমের মত। মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্থানে তদসম্পর্কীত বিভিন্ন রূপ প্রতিরোধ শক্তি ও প্রতিক্রিয়া বিবেচ্য। অন্ত ও বহিঃ ষ্টিমিউলাস সমূহও [স্ব ও পর-বাক্ প্রয়োগে] কিছু প্রতিকূল বা অনুকূল বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি করে।

বুঝা যায় যে সুচিন্তা ও সুকর্ম প্রসূত সৎপ্রেরণার হাল্কা বিদ্যুৎ প্রবাহ মস্তিষ্কের প্রতিরোধ-সম্পর্কীত ক্ষেত্র তথা এরিয়া সুগঠিত এবং কু-চিন্তা ও কু-কর্ম প্রসূত অপরাধ-স্পৃহার ভারি বিদ্যুৎ প্রবাহ উহাকে ক্ষতিগ্রস্থ করে।

উপদেশ আদি সৎবাক্ প্রয়োগ সমূহ মস্তিষ্কের বিভিন্ন বোধ-সম্পর্কীত ক্ষেত্র সুগঠিত করার জন্যে বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি না করতে পারলে বার থেকে কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ প্রবাহ মস্তিষ্কে প্রয়োগ করে উহার তদ্-সম্পর্কীত স্থানটি সবল করা সম্ভব। অপরাধীদের সমগোত্রীয় মনোরোগীদের চিকিৎসাও এই রূপে করা হয়। বিবিধ প্রকার এক্স-রে আলোক রশ্মি দ্বারাও এরূপ পরীক্ষা নিরীক্ষা সম্ভব। [তবে ওগুলি এখনও গবেষণা সাপেক্ষ।]

(f) একটি ঘোড়াকে চাবুক মেরে বা মদ্যপান করিয়ে বেশী দূর দৌড় করানো যায়। কিন্তু তাতে তার দেহ মন অচিরে ভেঙ্গে পড়ে। মানুষকে ইনসেনটিভ দ্বারা কার্য করালেও তার অবস্থা ওইরূপ হবে।

কিন্তু সেই সঙ্গে দেখতে হবে যে অপরাধ স্পৃহার ভারি বিদ্যুৎ প্রবাহের পুনঃ প্রবেশ দ্বারা ঐ গড়া স্থানটি পুনরায় না ভাঙ্গে।

উল্লেখ্য এই যে, কম পরিমাণে যা উপকারী বেশী পরিমাণে তা অপকারী। তাই হাল্কা বিদ্যুৎ প্রবাহ উপকার এবং ভারি বিদ্যুৎ প্রবাহ অপকার করে। [তড়িৎ প্রবাহ দ্বারা মানুষের কিছু রোগ নিরাময় করা যায়।]

মনের সহিত মস্তিষ্কের সম্পর্ক সম্বন্ধে গবেষণা আজও সাধনা স্তরে রয়েছে। বলা বাহুল্য যে মনের আধার মস্তিষ্ক'কে বাদ দিয়ে মনকে কল্পনা করা যায় না।

[মানুষ মাত্রই স্বভাব অলস হওয়ায় পরিশ্রম লাঘবে যন্ত্রের সৃষ্টি। তাতে সভ্যতার উন্নতি। অপরাধীদের কর্মালসতা তুলনায় বেশী। এজন্য কয়েদখানায় যান্ত্রিক পরিশ্রমের প্রচলনের প্রয়োজন আছে।]

সর্বশ্রেণীর প্রাথমিক অপরাধীদের চিকিৎসা উপরোক্তরূপে করা সম্ভব হলেও ঐরূপ চিকিৎসা প্রকৃত অপরাধীদের প্রতিজনের ক্ষেত্রে কার্যকরী নয়, কারণ প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হেতু তারা ভিন্ন প্রকৃতির হয়। অপকর্ম তারা তাদের জন্মগত অধিকার তথা বৃত্তিগত ব্যবসায় মনে করে।

এদের অপরাধ জীবনের মধ্যে অপরাধ বিরাম দেখা যায়। অপরাধ বিরাম কালে তারা প্রায় নিরপরাধী মানুষের মতন হয়ে যায়। এই সময়টুকুতে তাদের উপদেশাদি দ্বারা ওদের ঐ অপরাধ বিরাম-কাল পর্যায়ক্রমে বাড়িয়ে তাদের নিরাময় করা সম্ভব। অন্য সময়ে তাদের কোনওরূপ সৎ উপদেশ দান নিরর্থক হবে। একটু লক্ষ্য করলেই এদের অপরাধ-বিরামকাল এলো কিনা তা বুঝা যায়। এই সময়ে তাদের অধিক পরিশ্রমেও অভ্যস্ত করা যেতে পারে। এই সময়ে বাক-প্রয়োগ ও ঔষধাধি প্রয়োগে তাদের এই অপরাধ বিরামকাল বাড়ানো সম্ভব।

বিঃ দ্রঃ—অপরাধীরা সাধারণ মানুষের মত ব্যাধি আদিতে ভুগে। তাদের দৈহিক ব্যাধির নিরাময়ের জন্যও ঔষধের প্রয়োজন হয়। উৎকট অপরাধীদের স্বভাব বন্য মানুষ ও পশুদের মত হয়। সাধারণ মানুষও ক্রমান্বয়ে অপরাধ-প্রবণ হচ্ছে। তাই পূর্বের মত কম ডোজ ঔষধ সেবনে উপকার হয় না। পশুদের মত ওদেরকে একই ঔষধ বেশী ডোজে দিতে হবে। সৎ ব্যক্তিদের অবশ্য মাত্রাধিক ঔষধ সেবন নিষ্প্রয়োজন। কারণ ওদের মধ্যে সর্ব বিষয়ে প্রতিরোধ

শক্তি বেশী থাকে। [পুরুষদের অপেক্ষা নারীদের প্রতিরোধ-শক্তি বেশী] অপরাধীদের রোগ মুক্তিতে কম বেশী ডোজের ঔষধ সেবনের ফলাফল লক্ষ্য করে ওদের মধ্যে কম বেশী অপস্পৃহার পরিমাপ করা যায়।

[কোনও এক পুরাতন পাপী হাজত ঘরে মস্তিষ্কের যন্ত্রণায় কাতর হয়। স্বাভাবিক মানুষের ক্ষেত্রে একটি টেবলেট সেবনে ঐ রোগের উপশম হয়েছে। কিন্তু ঐ অপরাধীর নিরাময়ার্থে ঐ একই ঔষধের তিনটি টাবলেট সেবনের প্রয়োজন হয়েছিল। তবে ওদের অপরাধ বিরাম কালে ঐরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই।]

কিন্তু এই বিষয়ও সত্য এই যে মহাপুরুষরা মনোবলে ও প্রকৃত অপরাধীরা অন্য কারণে বিনা ঔষধে নিরাময় হয়। পুরুষদের অপেক্ষা নারীদের রোগ প্রতিরোধ শক্তি বেশী থাকে। প্রকৃত অপরাধীদের জন্তুদের মত বন হতে ঔষধ সংগ্রহ করতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু উৎকট অপরাধীরা তাদের কষ্টহীনতার জন্য তাদের রোগ সম্বন্ধে সচেতন নয়। ওদের আশ্রয়দাত্রী ,বেশ্যারাও ওই বিষয়ে ওদের সচেতন করতে অক্ষম।

দৈহিক চিকিৎসার পর অপরাধীদের মানসিক চিকিৎসা করা উচিৎ। নচেৎ স্নায়ু দুর্বল থাকাতে বাক-প্রয়োগ ও উপদেশাদি কার্যকরী হয় না। ওদের পারগেটিভ দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার করতে হবে। দাঁত ঠোঁট ও উদর রোগ ও স্নায়ু দৌর্বল্য ও রক্তের চাপ হতে ওদের মুক্ত করতে হবে। তারপর ওদের প্রতি মানসিক চিকিৎসা প্রযোজ্য হবে। [অপরাধ-রোগীদের ক্ষেত্রে উহা অবশ্য প্রয়োজনীয়।]

আরও উল্লেখ্য এই যে, প্রকৃত অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত স্বভাব, মধ্যম ও অভ্যাস অপরাধীদের রোগ মুক্তিতে যথাক্রমে বেশীমাত্রায় মধ্যমাত্রায় এবং স্বল্প মাত্রায় ঔষধসমূহ সেব্য হয়ে থাকে। কিন্তু দৈব অপরাধী, প্রাথমিক অপরাধী ও অপরাধী রোগীরা সাধারণ মানুষের মত হওয়ায় ওদের প্রায়ই সাধারণ মানুষের মত চিকিৎসা করতে হয়।]

বিবিধ গ্রুপের হরমন ইনজেকসন ভাইটামিন ডিফিসিয়েন্সীর ঔষধ এবং অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগ অপরাধীদের সম্পর্কে বহুবিধ পরীক্ষা নিরীক্ষার সুযোগ আছে। উপরন্তু একই ঔষধ পুরুষ ওনারীদের সমভাবেকার্যকরীনাও হতে পারে। ইহা দেখা যায় যে কোকেন ঔষধ নারীকে বেশ্যা ও পুরুষকে চোর করে। [অযৌনজ এবং যৌনজ বিভক্তি ইহা প্রমাণ করে।] ঔষধ নিশ্চয়ই অপরাধ

প্রতিরোধ শক্তি সম্পর্কিত স্থক্ষ স্নায়ু যথাক্রমে ক্ষতিগ্রস্থ ও পুনর্গঠিত করতে সক্ষম। স্থ কিংবা কু উপদেশ আদি বাক-প্রয়োগ দ্বারা দেহজাত বিপরীত ধর্মী হরমন ওই কারণে ভালো বা মন্দ ঔষধের কার্য করে। তাহলে বার থেকে ওইরূপ বিভিন্নধর্মী ঔষধ প্রয়োগে মানুষকে ভালো বা মন্দ করা নিশ্চয়ই সম্ভব।

[সমধর্মী ঔষধে বেশি ডোজে যে রোগ হয়, উহার কম ডোজে মানুষের সেই রোগ সারে। বিপরীতধর্মী ঔষধে এক ঔষধে যে রোগ হয় তার বিপরীত ঔষধে ঐ রোগ সারে। এই উভয়বিধ ঔষধ দ্বারা ওইরূপ পরীক্ষা নিরীক্ষা করা যেতে পারে।

অধিকাংশ অপরাধীদের ক্ষেত্রে উপরোক্ত বিবিধ চিকিৎসা কার্যকরী হলেও শেষ পর্যায়ভুক্ত উৎকট প্রকৃত অপরাধীদের চিকিৎসা সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে করতে হবে। নিম্নের আখ্যান ভাগ থেকে বক্তব্য বিষয় বুঝা যাবে।

এই সকল শেষ পর্যায়ভুক্ত উৎকট অপরাধীদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন অত্যন্ত উৎকট। ওইজন্য ওদের মানসিক ও দৈহিক ভারসাম্য বিপরীত রূপ দৃষ্ট হয়ে থাকে।

এদের কষ্টবোধ কম ও স্পর্শবোধ বেশী এবং উষ্ণবোধ কম ও শৈত্যবোধ বেশি। ওদের ঐ সকল বোধ স্বাভাবিক মানুষদের ঐ সকল বোধের ঠিক উল্টা। ওদের মধ্যে ক্ষণস্থায়ী তৎপরতা ও দীর্ঘস্থায়ী অলসতা দেখা যায়। ওই অপরাধীদের সূক্ষ্মবৃত্তি দুর্বল এবং স্থূল বৃত্তি প্রবল। ওদের মধ্যে আত্ম-সম্মান জ্ঞান লজ্জা সরম এবং অনুতাপ-বোধ অনুপস্থিত।

উপরোক্ত কারণে ওদের চিকিৎসা কার্য সামগ্রিক ভাবে করা সম্ভব নয়। ওদের উপরোক্ত প্রতিটি বৈশিষ্ট্য তথা সিম্পটমের জন্য পৃথক পৃথক চিকিৎসার প্রয়োজন হয়ে থাকে। অর্থাৎ ওদের উপরোক্ত প্রতিটি সিম্পটমের পৃথক চিকিৎসার প্রয়োজন।

Criminal Treatment
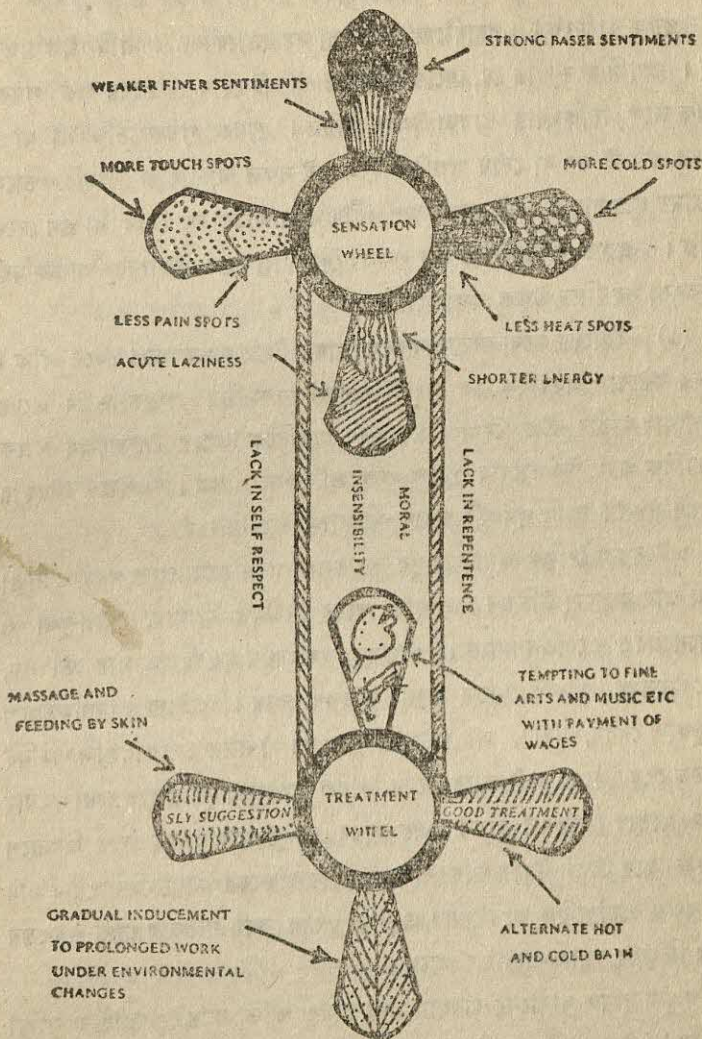
Each Symptoms Treated Separately

উপরোক্ত চিত্রটি [প্লেট] লক্ষ্য করলে বক্তব্য বিষয় এক লহমায় বুঝা

যাবে। উহাদের মধ্যে উল্টো হয়ে যাওয়া বোধ তথা বৃত্তিসমূহ পুনরায় পূর্বানুরূপ করে ওদের চিকিৎসা করতে হবে।

প্রকৃত বা উৎকট অপরাধীদের চিকিৎসা সমগ্রভাবে করার আমি পক্ষপাতী নই। আমি মনে করি যে, এদের মধ্যে দৃষ্ট প্রতিটি দোষ বা গুণের জন্য পৃথক পৃথক রূপে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। পৃথক পৃথক চিকিৎসা দ্বারা এদের প্রতিটি গুণ বা দোষ অন্তর্হিত হলে এই সকল অপরাধীও সামগ্রিকভাবে নিরাময় হয়ে যায়। এই সকল অপরাধীর মধ্যে আমরা বহু দোষ বা গুণ দেখে থাকি। প্রকৃত অপরাধীদের এই সকল দোষ বা গুণ উহাদের আনুক্রমিক চিকিৎসা সহ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

(১) ইহাদের মধ্যে অত্যধিকরূপে আমরা দৈহিক অসাড়তা দেখে থাকি। এদের কষ্টবোধ অত্যধিক কম তা ইতিপূর্বেই বলেছি। অনুরূপভাবে এদের স্পর্শবোধ অতীব উগ্র দেখা গিয়েছে। অন্যদিকে এদের শৈত্যবোধ থাকে অত্যধিক এবং উষ্ণতাবোধ থাকে অস্বাভাবিকরূপে কম। এইরূপ অবস্থার কারণ সম্পর্কে আমি পূর্ববর্তী প্রবন্ধে আলোচনা করেছি।

এই সকল দৈহিক অসাড়তা দূর করার জন্য পর্যায়ক্রমে এদের গরম ও ঠাণ্ডা জলে স্নান করানো উচিত। এ'ছাড়া এদের নিয়মিত ব্যায়াম, খেলা-ধূলা ও ম্যাসেজেরও প্রয়োজন আছে। খাদ্যসমূহ যে মানুষ মুখ দিয়েই খায় তা নয়, চর্মকোষসমূহ দ্বারাও মানুষ খাদ্য আহরণ করে। এইজন্য নিয়মিতরূপে কিছুকাল বেসম, বাদাম, সর বাটা বা কাঁচা দুধ মাখলেও চর্মকোষগুলি এমনিই সতেজ হয়ে উঠবে। এই ভাবে এদের দৈহিক অসাড়তা দূর করলে এরা পুনরায় সহজ মানুষে পরিণত হবে। এর কারণ এই দেহকোষসমূহ অত্যধিকরূপে সতেজ হয়ে উঠলে উহার তড়িৎবার্তা উহাদের মস্তিষ্কের আনুক্রমিক বোধ স্থান সমূহকেও প্রভাবান্বিত করে দেয়। এ'ছাড়া এদের কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা ও দন্তের দোষ নিবারণ করাও প্রয়োজন আছে।

অধুনা দূষিত সাবানের ব্যবহার দেহ-চর্মের ক্ষতি করে অপরাধীর সংখ্যা বাড়ায়। উহা নারীদের যৌন স্পৃহা বর্ধিত করে তাদের ব্যাভিচারিণীর সংখ্যা বাড়ায়।

(২) এদের মধ্যে ক্ষণস্থায়ী তৎপরতা এবং দীর্ঘস্থায়ী অলসতা থাকে। দৈহিক অসাড়তার কারণে এদের মধ্যে কর্মালসতাও দেখা গিয়ে থাকে। এইজন্য কাঠুরে, ছুতার মিস্ত্রি প্রভৃতি শ্রমিকদের ন্যায় এরা অধিকক্ষণ স্থায়ী একটানা

কাজ করতে পারে না। সারা দিন ধরে কাজকর্ম করতে অভ্যস্ত হলে এরা কখনও চুরি প্রভৃতি অপকার্যে নিযুক্ত হয়ে বিপদের ঝুঁকি নিত না। এদের যা কিছু তৎপরতা তুবড়ির ফোয়ারার ন্যায় নিমেষের মধ্যে নিঃশেষিত হয়ে যায়। এইজন্য এককালীন বিশ-পঁচিশ মিনিটের অধিকক্ষণ সময়ের জন্য তারা প্রায়ই কর্মতৎপর হতে পারে না। এদের এই বিশেষ দোষ সম্বন্ধে আমি ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি।

এই কারণে এদের দিয়ে একদিনে অধিকক্ষণ কাজ করানো উচিত হবে না। প্রথম দিনে এদের মাত্র কুড়ি মিনিটের জন্য কাজ করালেই চলবে। এইভাবে প্রতি সপ্তাহে ধীরে ধীরে দশ মিনিট করে এদের কার্যকাল বাড়িয়ে এদের বহুক্ষণ যাবৎ একটানা কাজে অভ্যস্ত করাতে পারলেই এদের কর্মালসতা দূর হবে। তাতে তারা সৎকর্মাদি করে সৎজীবন যাপনে অভ্যস্ত হবে। তাদের দ্বারা আর অপরের কোনও দ্রব্যাপহরণ করা সম্ভব হবে না। এইভাবে সহজেই ধীরে ধীরে এদের নিরপরাধ মানুষে পরিণত করা সম্ভব হবে।

(৩) ইহাদের মনের সূক্ষ্ম বৃত্তিসমূহ দুর্বল এবং স্থূল বৃত্তিসমূহ সেই অনুপাতে সবল থাকে। এইজন্য এদের মধ্যে নৈতিক অসাড়তার আধিক্য দেখা যায়। এই নৈতিক অসাড়তার কারণে এদের মধ্যে অনুতাপ, লজ্জাসরম এবং আত্মসম্মানের আমরা অভাব দেখে থাকি। এ'ছাড়া এদের কর্মসমূহ সদাই স্থূল বৃত্তিপ্রসূত হয়ে থাকে। সূক্ষ্ম বৃত্তিপ্রসূত কোনও কাজকর্মে এরা কখনও লিপ্ত হয় না।

এদের সহিত সৎ ব্যবহার করলে ও এদের সুপরিবেশে রাখলে এবং তৎসহ জেলে বেগার না খাটিয়ে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিলে স্বাভাবিক-ভাবেই এদের আত্মসম্মান বোধ ফিরে আসবে। এদের অজ্ঞাতে এদের উপর কৌশলে কড়া নজর রেখে মুক্ত অবস্থায় এদের হাল্কা কুটির-শিল্প ও চাষবাসের কার্যে নিযুক্ত করারই আমি পক্ষপাতী। সদুপদেশ এবং সৎ পরিবেশও এদের মধ্যে অনুতাপ এনে দিতে পারে।

গীতবাদ্য, শিল্পকলা প্রভৃতি মানুষের সূক্ষ্ম বৃত্তিপ্রসূত হয়ে থাকে। কিন্তু মানুষের অপকর্মসমূহ উহাদের স্থূল বৃত্তিপ্রসূত হয়ে থাকে। শিল্পকলা ও গীতবাদ্যের প্রতি এদের মন আকৃষ্ট করতে পারলে তাদের সূক্ষ্মবৃত্তিসমূহ অত্যধিক পরিচালনার দ্বারা সতেজ ও সবল হয়ে উঠতে বাধ্য। এইভাবে এদের সূক্ষ্ম বৃত্তিসমূহ সবল হয়ে উঠা মাত্র তাদের ঐ সূক্ষ্ম বৃত্তির বিপরীত স্থূল বৃত্তিসমূহ

সেই অনুপাতে আপনা হতেই দুর্বল বা নিষ্ক্রিয় হয়ে যেতে বাধ্য। এদের দিয়ে মধ্যে মধ্যে দানধ্যান করালেও এদের মধ্যে নৈতিক আদর্শের মান বেড়ে যেতে পারে। এদের বিবিধ সংগঠন-কার্যে নিযুক্ত করলেও সুফল ফলে থাকে। এইভাবে ধীরে ধীরে যে তাদের নিরাময় করা সম্ভব তা পরীক্ষার দ্বারা আমি অবগত হয়েছি।

[এই চিকিৎসা পরোক্ষভাবে করতে হবে। ভগবানকে ভক্তি করো—এ কথা বলার দরকার নেই। তাদের আবাস-সংলগ্ন মন্দির রাখো। অপরকে সেখানে বারে বারে ভক্তি জানাতে দেখলে উহা তাদেরও মন স্পর্শ করবে। দেওয়ালে আঁকা ছবি দেখেও দূর হ'তে গীত শুনে উহার পরোক্ষ প্রভাবে তাদের সূক্ষ্মবৃত্তি সবল হবে। একটি সূক্ষ্মবৃত্তি সবল হলে ওদের অন্য সূক্ষ্মবৃত্তিও সবল হবে। ধর্ম উপদেশ প্রথমে তারা শুনে না। বদ হবার সুযোগ শুধু নষ্ট করে দিতে হবে। তাই নেশার দ্রব্য না পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।]

(৪) এদের মধ্যে অলসতা, ভাবপ্রবণতা, দাম্ভিকতা ও নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি বৃত্তি স্থূলভাবে স্থান পেয়ে পর্যায়ক্রমে উহারা তাদের মনের মধ্যে উঠানামা করে থাকে। এই সম্বন্ধ ইতিপূর্বেই আমি ব্যাখ্যা সহ আলোচনা করেছি।

উপরোক্ত চিকিৎসা দ্বারা এই বিশেষ অবস্থা হতে তারা মুক্তি পেতে পারে। এদের অনুকূল বাক্-প্রয়োগ [সাজেস্‌শন] দ্বারা পূর্ব-জীবন সম্বন্ধে এদের অবহিত করলেও সুফল ফলবে। তবে বিশেষ চাতুর্যের সহিত এদের উপর বাক্-প্রয়োগ সমূহ এমন ভাবে কার্যকরীরূপে প্রয়োগ করা দরকার যাতে এরা আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত না হতে পারে। তবে, নিরাময়ের পথে অগ্রসর হওয়া মাত্র, এরা যে অপরাধী ছিল—সে সব পুরানো কথা তাদের বারে বারে মনে না করিয়ে দেওয়াই ভালো।

[আমাদের পূর্বতন জমিদারী মাদরাল গ্রামে প্রায় ৬০ বিঘার উপর অবস্থিত একটি দীর্ঘাকার পাড় এইরূপ পরীক্ষার জন্য আমি বেছে নিয়েছি। এই পাড়টির আয়তন প্রায় ২৫ বিঘা এবং উহা উচ্চতায় একতলার সমান হবে। ঐ পাড়ের উপরের উঁচু-নীচু জমিতে উঠলে মনে হয় উহা বাংলার বাহিরের কোনও এক স্থান। আমি কয়েকটি প্রকৃত অপরাধীকে সংগ্রহ করে নিরপরাধ ব্যক্তিদের সহিত তাদেরও ঐখানে চাষ-বাসের কার্যে নিযুক্ত করে অনুরূপ চিকিৎসার দ্বারা বিশেষ সুফল পেয়েছি। ঐখানে এসে এরা একটা স্থান সম্পর্কীয় আকস্মিক পরিবর্তন অনুভব করেছিল। [ডাইভারস্যানাল থেরাপী]

অথচ এই পরিবর্তনের জন্য সমতল বাঙলার বাহিরে নীত হবার কোনও গ্লানি এরা অনুভব করে নি। এই পাড়ে দুইটি বড়ো দেবমন্দির এক্ষণে নির্মিত হয়েছে। কারণ ভারতীয় অপরাধীরাও ধর্মের প্রভাব হতে মুক্ত নয়। এইজন্য সামান্য প্রচেষ্টার দ্বারা এদের মধ্যে ধর্মভাব আনা সম্ভব। এদের মধ্যে আদর্শ আনবার জন্য এই মন্দির দুইটির প্রয়োজনও ছিল। এই স্থানের কার্যাবলী সম্বন্ধে আমি যে ফিলিম তুলেছি তা এইরূপ চিকিৎসার সাফল্যের প্রমাণরূপে ব্যবহার করা যেতে পারে। এইখানে অপকর্ম করার সুযোগগুলি প্রথমে নষ্ট করা হতো।

এই বিস্তীর্ণ পাড়ের বিভিন্ন স্থানে আমি ছাপরার ঘর, মেটে বাড়ি, সুদৃশ্য অট্টালিকা—এই ত্রিবিধ ভবনই নির্মিত করিয়ে রেখেছি। প্রারম্ভে এই সকল অপরাধীরা সুদৃশ্য অট্টালিকা পছন্দ করে নি। এইজন্য কদর্য ছাপরার ঘরে আমি প্রথমে তাদের থাকার ব্যবস্থা করি। কারণ, এদের স্নায়ু তথা মন যতটা সইতে পারে তার বেশি সওয়ালে তারা এমনিই ভেঙে পড়বে। পরে অবশ্য সইয়ে সইয়ে তাদের আমি যথাক্রমে ভালো মেটে বাড়ি এবং সুদৃশ্য অট্টালিকায় স্থানান্তরিত করি।

প্রথম প্রথম এরা দুই-একটি ফল পাকড় চুরি করে যে বিক্রয় না করেছে তাও নয়। কিন্তু এতে বাধা না পেয়ে তারা শীঘ্র বুঝেছিল যে এই সব তাদেরই সম্পত্তি। [মালিকানা-বোধ] তখন তারা ঐ সকল ফসল উৎপাদন করে বিক্রয় করতে থাকে। আমি তখন এদের বেশি করে পারিশ্রমিক দিতে থাকি। অথচ তাদের উৎপাদিত ফসলের উপর কোনও দাবি করি না। কিন্তু পরে এ'জন্য এরা লজ্জিত হয়ে উঠে নিজেরাই আমার গাড়িতে বহু ফল ও ফসল তুলে দিয়েছে। এই লজ্জাভাব তাদের মধ্যে দেখা মাত্র আমি বুঝি যে এরা নিরাময়ের পথে এগিয়ে চলেছে।]

সাধারণভাবে প্রকৃত [hardened] অপরাধীদের চিকিৎসা সম্বন্ধে উপরে বলা হলো। এইবার উহাদের মধ্যকার স্বভাব, উৎকট অভ্যাস এবং মধ্যম-অপরাধী ভেদে উহাদের পৃথক পৃথক চিকিৎসা সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। ইহাদের মধ্যে যা কিছু তফাৎ তা অপস্পৃহার পরিমাণের।

স্বভাব-অপরাধীরা অত্যধিক অপস্পৃহা জন্মগতভাবে প্রাপ্ত হয় ব'লে উপরোক্ত চিকিৎসা সহ এদের জন্য স্নায়ুর উপর কার্যকরী ঔষধ নির্ধারণের প্রয়োজন আছে। এমন কয়েকটি ঔষধ ও খাদ্য আছে যা অপরাধ সম্পর্কীয়

স্নায়ুকে স্তিমিত করে দিতে পারে। সম্ভবতঃ ইহারা কোনও উপকারী রস-পিণ্ডের রস নির্গত করলে উহা ধমনীর মাধ্যমে স্নায়ুকে প্রভাবান্বিত করে অপরাধীদের নিরাময় করে। এতদ্ব্যতীত কৃত্রিম উপায়ে সৎ প্রেরণার আধিক্য এদের মধ্যে এনে উহার প্রবাহ দ্বারা ঐ সকল উপকারী হরমন জাতীয় রস নির্গত করা যায়। এই অবস্থায় সেই উপকারী রস ধমনীর মাধ্যমে পূর্ব বর্ণিত উপায়ে স্থূল স্নায়ুকে দুর্বল এবং সূক্ষ্ম স্নায়ুকে প্রবল করে।]

বিঃ দ্রঃ অপরাধীর বিভাগ ও উপবিভাগ সম্পর্কে পূর্ববর্তী নিবন্ধসমূহে আমি বহু শ্রেণীবাচক তালিকা উদ্ধৃত করেছি। সেই সকল তালিকা থেকে বুঝা যাবে যে, অপরাধিগণ মূলতঃ অপরাধ-রোগী ও নীরোগ-অপরাধীতে বিভক্ত। এই নীরোগ-অপরাধীরাও আবার দুই ভাগে বিভক্ত, যথা—প্রাথমিক ও প্রকৃত। এই প্রকৃত অপরাধীরাও যথাক্রমে স্বভাব, অভ্যাস, মধ্যম প্রভৃতি উপশ্রেণীতে বিভক্ত। এছাড়া এই স্বভাব, অভ্যাস, মধ্যম প্রভৃতি অপরাধীদের প্রতিটিই উহাদের দ্রব্য ও শোণিতস্পৃহা অনুযায়ী সাম্পত্তিক, শোণিত-সাম্পত্তিক ও শোণিতাত্মক উপশ্রেণীতে বিভক্ত। এই সকল কারণে অপরাধ-চিকিৎসা পদ্ধতিসমূহ জটিল হতে জটিলতর হতে বাধ্য।

কিছুকাল পূর্বে পর্যন্ত সভ্য জগতের ধারণা ছিল যে দৈহিক পীড়নই অপরাধীদের অন্যতম ঔষধ। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এরূপ ধারণা বর্তমান শতাব্দীতে পরিত্যক্ত হয়েছে। দৈহিক পীড়ন যে মানুষের আত্মসম্মানেরও হানিকর একথা সকলেই জানেন। আত্মসম্মান জ্ঞান ও চক্ষুলজ্জাই মানুষকে বহুবিধ অপকর্ম হতে বিরত রাখে এবং এই দুটির অভাবে মানুষ আর মানুষ থাকে না। তবে ভয়ের ও বাধার প্রয়োজনও সর্ব ক্ষেত্রেই আছে।]

মনের সহিত দেহের চিরন্তন সম্বন্ধ থাকায় দৈহিক অসাড়তা বিদূরিত হ'লে নৈতিক অসাড়তাও দূর হয়। এই দৈহিক ও নৈতিক অসাড়তা ছাড়া কর্মালসতা অপরাধীদের আর একটা দোষ। বহুক্ষণ স্থায়ী একটানা কাজকর্ম করতে যে অপরাধীরা অক্ষম এ কথা পূর্বপরিচ্ছেদে বলা হয়েছে। চিকিৎসা হিসাবে অপরাধীদের প্রথমেই একটানা কাজ করতে বাধ্য করা উচিত হবে না। আমার মতে কঠোর বাধ্যবাধকতার মধ্যে আত্মসম্মান নেই। তাতে আছে শুধু লজ্জা ও গ্লানি। মানুষ যখন এই লজ্জা ও গ্লানির বাইরে এসে পড়ে তখনই তাদের মধ্যে স্থান পায় নৈতিক অসাড়তা। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ প্রাথমিক অপরাধীরা কারাগারে এসে উৎকট অপরাধীতে পরিণত

হয়। এ বিষয়ে অবশ্য কুসঙ্গাদিও এদের সাহায্য করে। কারাগারের মধ্যে অভ্যাস অপরাধীদের চিকিৎসা নিম্নোক্তরূপে করা যেতে পারে। এদের চিকিৎসায় নিম্নোক্ত ব্যবস্থাটি প্রণিধান-যোগ্য। [সর্বশ্রেণীর প্রাথমিক ও প্রকৃত অপরাধীদের প্রারম্ভিক চিকিৎসা এইরূপে সমাধা করা উচিত।]

'খাদ্য নিরূপণ, নিয়মিত স্নান, মেসাজ, ব্যায়াম ইত্যাদি অপরাধীদের চিকিৎসার প্রধান অঙ্গ হওয়া উচিত। এর দ্বারা তাদের স্নায়বিক দৌর্বল্য বিদূরিত হয় এবং মনের প্রতিরোধ-শক্তির বৃদ্ধি ঘটে। এই সকল বিষয়ের সহিত এদের শিক্ষার জন্য স্কুল প্রভৃতির এবং কুটীরশিল্পের ব্যবস্থারও প্রয়োজন। এই সব কারখানায় খাটিয়ে নিয়ে এদের মাসিক বা সাপ্তাহিক পারিশ্রমিক দেওয়া উচিত। কাজকর্মের জন্য পারিশ্রমিক পেলে এদের আত্মসম্মানের হানি হয় না। উহা তখন তারা শর্তাধীন চাকুরি মনে করে। শ্রমশিল্পের মধ্যে তারা জীবিকার সন্ধান পায় এবং একটু একটু করে কর্মকাল বাড়িয়ে বহুক্ষণ একটানা কাজকর্মেও অভ্যস্ত হয়।

পাগলদের হাসপাতালের ন্যায় অপরাধীদের মধ্যে যারা 'স্বভাব-অলস' ব্যক্তি তাদের অলসতা দূরীকরণার্থে ওয়ার্কশপ-কাম-হসপিটাল স্থাপন করা উচিত। এখানে প্রতি সপ্তাহে একটু একটু করে এদের কর্মকাল বাড়াতে হবে। সেই সঙ্গে প্রথমে এদের দেহের রিথিম তথা কর্ম তালের সঙ্গে সামঞ্জস্য আনতে ধীরে ধীরে মেসিনের গতি বাড়াতে হবে। এর ফলে তাদের কর্মালসতা দূর হয় এবং তারা নিরপরাধীদের মত সহজ মানুষ হয়ে উঠে। হাল্কা হোম ইন্‌ডাষ্ট্রির মাধ্যমে এই স্বল্পকাল কার্য তাদের দিতে হবে। প্রতি সপ্তাহে কয় মিনিট করে কর্মকাল বাড়িয়ে এদের বৎসরান্তে আট ঘণ্টা দ্রুত কর্মে অভ্যস্ত করাতে হবে। খেলাধুলা এবং আমোদ-প্রমোদ দ্বারা এদের ভুলিয়ে রাখাও প্রয়োজন। এ'ছাড়া "ভেপার বাথ্"—পর্যায়ক্রমে গরম ও ঠাণ্ডা জলে স্নান ও নিয়মিত ব্যায়াম অপরাধীদের রক্ত চলাচলের সহায়ক হয়। উহা চর্মকোষগুলিকে সতেজ করে তাদের দৈহিক অসাড়তা বিদূরিত করে। দেহের সঙ্গে মনের অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ থাকার ফলে সঙ্গে সঙ্গে তাদের নৈতিক অসাড়তাও বিদূরিত হয়। এভাবে আমরা অপরাধীদের অন্যতম দোষসকল, যথা—নৈতিক ও দৈহিক অসাড়তা, কর্মালসতা প্রভৃতি দোষ দূর করতে পারি। এরূপ চিকিৎসার সঙ্গে সদ্ব্যবহার, সৎসঙ্গ ও উপদেশাদির দ্বারা অভ্যাস-অপরাধীদের সহজেই নিরাময় করা যায়।

এই সব অপরাধী সমাজের কাছ থেকে বিসদৃশ ব্যবহার পেয়ে থাকে। এর

ফলে তারা সভ্যসমাজ থেকে দূরে চলে যায় এবং নিজেদের জন্য পৃথক একটি সমাজ তৈয়ারি করে। সদ্ব্যবহার এবং উপদেশাদি অপরাধীদের পূর্বসমাজ সম্বন্ধে সচেতন করে তাদের মধ্যে অনুতাপের সৃষ্টি করে। অনুতাপের হেতু এদের মধ্যে আত্মসম্মান ও লজ্জাবোধ ফিরে আসে। ফলে, ধীরে ধীরে উহা এদেরকে নিরপরাধী করে তুলে। এরূপ চিকিৎসা দ্বারা অপরাধীদের আকৃতি পর্যন্ত [বিপরীত হরমন ক্ষরণে] যে, বদলে যায় নানারূপ পরীক্ষা দ্বারা এরূপও দেখা গেছে।

অভ্যাস-অপরাধীদের চিকিৎসা সম্বন্ধে বলা হলো। এইবার মধ্যম-অপরাধী ও উৎকট অপরাধীদের চিকিৎসা সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। এই বিশেষ চিকিৎসা-পদ্ধতি সম্বন্ধে পূর্বপরিচ্ছেদে বিশেষরূপে আলোচিত হয়েছে। পূর্ব-পরিচ্ছেদে বাড়্‌তি অপস্পৃহা ভিন্ন প্রণালীতে নিষ্কাশিত করে অপরাধী-বিশেষকে কিরূপে পুনরায় নিরপরাধী করা যায় সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে। পুরানো চোরদের ইনফরমার বানিয়ে আমি এরূপ অনেক পরীক্ষা করি। চোর ধরার কাজে যেমন কিছুটা অপস্পৃহা থাকলে ভাল হয়, তেমন এই সব কাজের মধ্যে কিছুটা আদর্শ বা সৎপ্রেরণারও প্রয়োজন। এই কাজে এক দিক দিয়ে যেমন বাড়্‌তি অপস্পৃহার নিষ্কাশন ঘটে, অন্যদিক দিয়ে তা সৎপ্রণালীতে প্রবাহিত হওয়ায় কিছুটা আদর্শ ও সৎপ্রেরণাও আনয়ন করে।

অভ্যাস, মধ্যম এবং উৎকট অপরাধীদের চিকিৎসা-পদ্ধতি সম্বন্ধে বলা হ'ল। এইবার স্বভাব-অপরাধীদের চিকিৎসা সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। এই স্বভাব-অপরাধীদের চিকিৎসা অতি কঠিন ব্যাপার। পুরাকালে মানব-দানব বিধায় এদের মেরে ফেলার রীতিই প্রচলিত ছিল। ঔষধাদি দ্বারা এদের বহুক্ষণ পর্যন্ত ঘুম পাড়িয়ে রাখলে সুফল পাওয়া যেতে পারে। এদের চিকিৎসার জন্য স্নায়ুর উপর কার্যকরী ঔষধের প্রয়োজন। অ্যাসিড পিকরিক, ইগ্‌নেশিয়া, জেলসেমিয়াম প্রভৃতি হোমিওপ্যাথিক ঔষধাদি দ্বারা এবং তৎসহ বিভিন্ন গ্রুপের হরমন ইন্‌জেকশন দিয়ে এদের নিরাময় করা গেছে। এ'ছাড়া এদের দেহাভ্যন্তরস্থ আনুক্রমিক রস-পিণ্ড (গ্লাণ্ড) গুলির রসের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়ে এদের অপস্পৃহা নিম্নগামী করা যায় বলে আমি মনে করি। অ্যালোপ্যাথির মধ্যে ভাইটামিন এবং হরমন প্রয়োগ রোগী অপরাধীদের অব্যর্থ ঔষধ। কিন্তু দক্ষ ডাক্তারদের পরামর্শ মত এইগুলি ব্যবহার করতে হবে।

নারী-অপরাধীরা কখনও স্বভাব অপরাধী হয় না ; এস্থলে তারা যে স্বভাব-

বেশ্যা হয় এ কথা পূর্বে বলা হয়েছে। স্বভাব-অপরাধী না হলেও এদের মধ্যে অনেক অভ্যাস-অপরাধী এবং অপরাধ-রোগীর সন্ধান মিলে। নারী অভ্যাস-অপরাধীদের অনেকের মধ্যেই কিছুটা পুরুষালী ভাব দেখা যায়। পুরুষ হ'তে নারী এবং নারী হ'তে পুরুষ হওয়ার কাহিনী পৃথিবীতে বিরল নয়। কারণ নারী এবং পুরুষের যৌন ব্যবস্থার মূল ব্যবস্থা একই। এই কারণে নারী-অপরাধীদের মধ্যে নারী-স্থলভ ভাব ফিরিয়ে এনে তাদের মানসিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করলে স্থফল ফলবে বলে আমি মনে করি। গ্লাণ্ড বিশেষের হ্রাস-বৃদ্ধি ও হরমনের তারতম্য নারী অপরাধীর [মনোরোগ] সৃষ্টি করতে পারে।

প্রকৃত অপরাধীদের চিকিৎসা-পদ্ধতি সম্বন্ধে বলা হ'ল। এবার অপরাধ-রোগীদের চিকিৎসা সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। প্রথমেই নির্ণয় করা উচিত এদের এই রোগের মূল কারণ। এই রোগ ব্যক্তিগত কিংবা বংশগত তাও জানা দরকার। অনেক সময় বংশগত মাদকতা ও উন্মাদনাও এই রোগের সৃষ্টি করে। কিছু ক্ষেত্রে মানসিক কারণেও ইহা উপগত হয়। মনোবিশ্লেষণের পর বাক্-প্রয়োগ এবং ঔষধাদি দ্বারা মানসিক রোগের প্রকারভেদে মানসিক রোগ সারান যায়। পূর্বপরিচ্ছেদে মানসিক রোগ সম্বন্ধে অনেক উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। কয়েক ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বরত বিচ্ছিন্ন মন রোগীর মানস পটে থেকে তাকে যন্ত্রণা দেয়। এর বিষয়বস্তু জানা থাকালে তাকে বাক্‌প্রয়োগ দ্বারা সারানো সহজ। [ইহার চিকিৎসা পরে বলা হবে।] কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে মনোরোগের মূল কারণ মানুষ ভুলে যায়। সেই ক্ষেত্রে মনোবিশ্লেষণ দ্বারা সেই কারণ জেনে [বাক্-প্রয়োগ দ্বারা] তাকে নিরাময় করতে হবে। মনোবিশ্লেষণ দ্বারা এই সব রোগের মূল কারণ নির্ণয় করা যায়। এই মনোবিশ্লেষণের রীতি সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। এ সম্বন্ধে নিম্নের চিত্তাকর্ষক বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।

"কোনও এক যুবক মরা বা মড়ার কথা শুনলেই মার-মুখী হয়ে উঠত। চিকিৎসার জন্য যুবকটি আমার কাছে নীত হয়। এই একটি বিষয় ছাড়া অন্য বিষয়ে তাকে সহজ মানুষের মতই দেখা যায়। আমি অভিভাবকদের জিজ্ঞাসা করি, যুবকটির শিশুকালে কোনও আত্মীয়ের মৃত্যু ঘটেছিল কিনা। উত্তরে তাঁরা বলেন, না। আমি তখন যুবকটির মনোবিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হই। যুবকটিকে একটি নিরালা ঘরে আরামে (রিল্যাক্স) বসিয়ে আমি প্রশ্ন শুরু করি। তার প্রতি আমি বাৎসল্যের ভাব দেখাই এবং আমাকে তার বড় ভাই বা পিতার ন্যায় জ্ঞান করতে বলি। আমি তার একজন বিশেষ শুভাকাঙ্ক্ষী এবং আমার জ্ঞান

ও ক্ষমতা আমি তার উপকারার্থে নিয়োগ করছিঃ তার নিকট আমি এরূপ ভাব দেখাই। আমি তাকে জীবনের এক একটি ঘটনা সম্বন্ধে মনে করতে বলি। সে মনের পথে পিছুতে পিছুতে এক-একটি বিশেষ ঘটনার কথা বলে। আমি তখন এরও পরের একটা ঘটনা মনে করতে বলি। যে যে ঘটনা তার জীবনের পথে স্থায়ী চিহ্ন রেখেছে তার সব কয়টিই সে বলে যেতে থাকে। এই মনে করার রীতি সম্বন্ধে আমি তাকে বিজ্ঞান-সম্মতভাবে নির্দেশ দিই। তাকে এই ব্যাপারে আমি সাহায্যও করতে থাকি। বিগত দিনের একটির পর একটি ঘটনার কথা স্মরণ করে মনের পথে সে পিছিয়ে আসতে থাকে এবং পরিশেষে তার এগার বৎসর বয়সের একটা ঘটনার কথা হঠাৎ তার মনে পড়ে যায়। নানা আলোচনার মধ্যে আমি জেনে নিই যে তার এক গ্রাম সম্পর্কীয়া বৃদ্ধা ঐ সময় তাদের বাড়ী আসেন এবং মারা যান। ছেলেটি অন্যান্য সকলের সঙ্গে শ্মশান-ঘাটে গিয়েছিল এবং শ্মশানগামী নরনারীর মধ্যে একজন নবম বর্ষীয়া বালিকাও ছিল। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত এই বালিকাটি তার অজ্ঞাতেই তার মনের পথে হানা দিয়ে আসছে। যৌবনপ্রাপ্তির পর এই সুপ্ত যৌনবোধ অত্যন্ত উগ্র হয়ে উঠে মানসিক রোগের সৃষ্টি করে। আমার মতে ঐ যুবকের রিপ্রেসড্ বা প্রদমিত ইচ্ছাই এর কারণ। অবচেতন মনের এই ইচ্ছা জানতে পারা মাত্র যুবকটি বহুলাংশে সুস্থ হয়ে উঠে। কয়েক মিনিট সুতীক্ষ্ণ বাক্-প্রয়োগ [সাজেস্শন] ও কারণ নিদর্শনের পর ছেলেটি সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হয়। আমার উপদেশমত যুবকটি কথিত বালিকাটির শ্বশুরালয়ে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে আসে। এর পর যুবকটির মরা বা মড়া সম্বন্ধে ভীত হওয়া ত দূরের কথা মড়া পোড়াতেও তার দ্বিধা হত না।"

আমাদের বহু মানসিক রোগ দৈহিক রোগ রূপে চালু হয়ে যায়। ঐ জন্য তারা বিনা চিকিৎসায় অনর্থক কষ্ট পায়। এরূপ মানসিক রোগীদের নীরোগ করার জন্য আর একটি পন্থা সম্বন্ধে বলবো। নিম্নের বিবৃতিটি থেকে বিষয়টি উত্তমরূপে বুঝা যাবে।

"কোনও একটি শিশু লাল মাছ দেখা মাত্র অভ্যন্ত ভীত হয়ে চীৎকার করে উঠতো। আরও শিশুকালে লাল মাছ বা লাল দ্রব্য ধরতে গিয়ে সে আঘাত পেয়েছিল। হয়তো এই জন্যেই সে এইরূপ ভয় পেতো। আমি তাকে এই মনোরোগ হতে মুক্ত করবার জন্যে সচেষ্ট হই। আমি তা না করলে বয়ঃ-প্রাপ্তির সঙ্গে এই ভীতির কারণটি তার অবচেতন মনে থেকে যেতো এবং প্রাপ্ত-

বয়সে এই বিস্মৃত কারণ তার মনে অহেতুক ভয়ের এবং তজ্জনিত নানারূপ বিসদৃশ ব্যবহারের কারণ হয়ে থাকতো। আমি এই শিশুটিকে লম্বা টেবিলের এক মুখে বসিয়ে খেতে দিতাম এবং লাল মাছের ভাস্‌টি রাখতাম ঐ টেবিলের অপর মুখে। এরপর প্রতিদিন ঐ মাছের ভাস্ একটু একটু করে শিশুটির দিকে এগিয়ে আনতাম। কিন্তু তা আমি করতাম ধীরে ধীরে এবং সইয়ে সইয়ে। পরিশেষে এই ভীতির বস্তুটিই একদিন এই শিশুটির খাবার টেবিলের এক উপাদেয় এবং মনোরম বস্তুতে পরিণত হয়ে যায়।" *

আমরা যতগুলি রোগ হতে ভুগে থাকি, তার অধিকাংশই থাকে মানসিক রোগ। কিন্তু সেটা দৈহিক রোগ বলে চালু হয়ে যাওয়ায় আমরা উহার প্রকৃত কারণ বুঝেও বুঝতে চাই না। এবং ঐ রোগের জন্য মানসিক চিকিৎসা না করে আমরা করি দৈহিক চিকিৎসা।

আমাদের অবচেতন মন যখন বলে—না, আমাদের চেতন মন তখন বলে—হাঁ। চেতন মনের দুইটি বিভিন্ন বিষয়বস্তু অনেক সময় দ্বন্দ্বরত অবস্থায় দ্বন্দ্বের সমাধানের পূর্বেই বিস্মৃতির অতলে ডুবে যায়। মানুষ তখন ঐ মূল বিষয়বস্তুটি ভুলে গিয়েও ভুলে না। প্রাণপণে সে তা মনে করতে চেষ্টা করেও তা মনে আনতে পারে না। এই অবস্থায় আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর বদলে আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর আনুষঙ্গিক, অনুরূপ বা সমসাময়িক অন্য আর একটি ঘটনা মনে পড়ে। কিন্তু তা তাকে সান্ত্বনা না দিয়ে তা তাকে ভয় দেখায় বা দুঃখ দেয় মাত্র। এরূপ অবস্থায় নানারূপ মানসিক রোগের সৃষ্টি হতে পারে। আমার মতে রিপ্রেসড ইচ্ছা, রিপ্রেসড্ ভয় প্রভৃতি বহুবিধ মানসিক রোগের কারণ।

বিঃ দ্রঃ ভাত খাব বা রুটি খাব, থিয়েটার বা সিনেমা দেখবো। এগুলি মনেতে কোনও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে না। কারণ ওই দুটিই তার কাছে সমান প্রিয় হতে পারে। কিন্তু কলেজে ঢুকবো বা পাটকলে ঢুকব তা মানসিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে।

মনোরোগ সম্পর্কে আরও একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। কোনও এক

---

*[শিশুদের যারা কারণে বা অকারণে ভয় দেখায় তারা তাদের শত্রুতা সাধনই করে থাকে। কারণ বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে শিশুদের এই ভয় প্রদমিত হয়ে তাদের মধ্যে নানারূপ মানসিক রোগের বা বিসদৃশ ব্যবহারের সৃষ্টি করে দেয়। তারা এতে বয়সকালে অপদার্থ জীবে পরিণত হয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অভিভাবকরাই এই দুষ্কার্য করে থাকেন। এই ভাবে এদের প্রতিরোধ-শক্তি দুর্বল থাকলে অপস্পৃহার আগমন সহজ হয়।]

ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে যে তার শোবার ঘরের উত্তর দিককার দেওয়ালটা পড়ে গেল। তার শোবার ঘরের উত্তর দিককার ঘর তার খুল্লতাত ব্যবহার করতেন। মনো-বিশ্লেষণের পর ভদ্রলোক স্বীকার করেন যে তিনি তাঁর খুল্লতাতের মৃত্যু চান। অবচেতন মন হ'তে এই অন্যায় ইচ্ছা চেতন মনে এনে বাক্-প্রয়োগ বা উপদেশাদি দ্বারা আমরা বিদূরিত করে দিই। ভদ্রলোকের এই সুপ্ত ইচ্ছা এভাবে বিদূরিত না হলে হঠাৎ একদিন তা হয়ত সামান্য কারণে জাগ্রত হয়ে পিতৃব্য হত্যার কারণ হ'ত।

মানসিক রোগ নানাবিধ কারণে হয়ে থাকে। দমিত বা রিপ্রেসড্ যৌন-বোধও নানাবিধ রোগসমূহের প্রধান কারণ বলে আমি মনে করি। দমিত বা রিপ্রেসড্ ভয় এই মানসিক রোগের অন্য আর এক কারণ। শিশু ও বালকদের মধ্যে এই রোগ বিশেষরূপে দেখা যায়। বালকদের মধ্যে কোনও রিপ্রেসড্ ভয়ের কারণ ঘটলে তা অবিলম্বে চেতন মনে ফিরিয়ে আনা উচিত। উহাকে দূরে না ঠেলে দিয়ে তাকে নিকট হতে আরও নিকটে এনে বালকটির নিকট ভয়ের ব্যক্তি বা বস্তুকে অতি সহজ করে তোলা উচিত। ভয়ের বিষয় বস্তুটির অসারতা এইরূপে প্রমাণিত করে আমরা রোগীকে নিরাময় করতে পারি। দেহের সুস্থতা অপেক্ষা মানুষের মনের সুস্থতার প্রয়োজন অনেক বেশি।

রিপ্রেসড্ ভয়, ইচ্ছা ও যৌনবোধের ন্যায় ক্রোধ, বংশগত মাদকতা, উন্মাদনা, উত্তেজনা এবং স্নায়বিক ক্ষয়ক্ষতি প্রভৃতির কারণেও মানসিক রোগের সৃষ্টি হয়। উন্মাদনা, উত্তেজনা, ক্রোধ প্রভৃতি রোগ মানুষের সূক্ষ্ম বৃত্তিগুলিকে দুর্বল ও তাদের স্থূল বৃত্তিগুলিকে প্রবল করে দেয়। এরূপ অবস্থায় মানুষ নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধে অপরাধ করে। কিন্তু পরক্ষণেই এই অপকর্মের জন্য সে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়। প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে লজ্জাবোধ বা অনুতাপ থাকে না। একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। অপরাধ-রোগীদের অপকর্মে অপস্পৃহা অন্য উপায়ে আসে। এই কারণে তাদের মধ্যে আমরা অধিক অনুতাপ ও লজ্জা দেখি।

মানুষের চিন্তারোগ অপর আর এক প্রকারের মানসিক রোগ। চিন্তারোগ দুই প্রকারের হয়। প্রথম ক্ষেত্রে, কোনও একটি বিশেষ চিন্তা মানুষের অপরাপর চিন্তার উর্ধ্বে উঠে মানুষকে নিয়ত আঘাত হানে। এটি অতি যন্ত্রণা যুক্ত ও বেশী ক্ষতিকর রোগ। এটিতে মানুষ উন্মাদের মত হয়। কিন্তু মোটর নার্ভ ঠিক থাকাতে উন্মাদ হয় না। সে বিনিদ্র রজনী যাপন করে। উন্মাদ হলে বরং সে শান্তি পেতো। এতে রোগীরা বেশী সংখ্যায় আত্মহত্যা করে।

[f] দ্বিতীয় রোগের ক্ষেত্রে মানুষের মন কোনও একটি বিশেষ চিন্তা অধিকক্ষণ ধরে রাখতে অক্ষম হয়। এক্ষেত্রে একটির পর একটি চিন্তা তার মনে এসে অসুবিধার সৃষ্টি করে।

উৎকট চিন্তা রোগে একটি চিন্তা মনে এসে মুহুর্মুহুঃ তাকে বিরক্ত করে। এরূপ অবস্থায় মানুষ পাগলের মত হয়ে উঠে। এই সময় সামান্য মাত্র বিরক্তির কারণ ঘটলে নিরপরাধী মানুষও অপকর্ম করে বসে।* অথচ তারা অপরাধরোগী বা নীরোগ অপরাধীদের কেউ নয়। মনোবিশ্লেষণ, বাক্‌-প্রয়োগ ও ঔষধাদির দ্বারা এই সকল রোগ সহজেই নিরাময় হয়। এই জন্য এইরূপ রোগীদের চিকিৎসার বিষয়ও কিছু বলা যাউক।

এই চিন্তা-রোগের কারণ রোগীর নিকট হাস্যাস্পদ ও লজ্জাকর মনে হয়। পাছে কেহ তাকে বোকা, মূর্খ বা পাগল ভাবে—এই ভয়ে [কিছুটা লজ্জাতে] সে এ বিষয় কারুর কাছে প্রকাশ করে না। সে উহা করলে আলোচনা দ্বারা সে তখুনি নিরাময় হতে পারতো। বহু ক্ষেত্রে এই রোগকে ন্যাকামি বা বজ্জাতি মনে করা হয়েছে। সহানুভূতির সঙ্গে উহাকে বিচার করা হয় নি। তার সদা আকাঙ্ক্ষিত এতটুকু সান্ত্বনার বাণীও তাকে কেহ শুনায় নি। কিন্তু এতে কি দুঃসহ যন্ত্রণা তা সুস্থ ব্যক্তি বুঝে না। এদের সঙ্গে একটা পোক [শিক] ভাঙা সাইকেলের চাকার তুলনা করা চলে। সাইকেল ঠিকই চলে। কিন্তু ভাঙা শিক্‌ নিয়ত খট্‌খট্‌ ও খচখচ করে। এরা কষ্টে দৈনন্দিন কাজ করে। তারা নানাভাবে ভুলে থাকতে চেষ্টা করে। অথচ এই মনোরোগীরা কেউ পাগল নয়। একটি বিষয়ে তারা পাগল হলেও অন্যান্য বিষয়ে এরা বিজ্ঞ মানুষ। একটা কিছু অপছন্দকর বিষয় এদের মাথায় ঢুকলে কিছুতেই তা বার হয় না। কিন্তু আশ্চর্য এই, ত্রিশ বৎসরের [ভোগা]

(f) দ্বিতীয় রোগ অত মারাত্মক না হলেও উহা বিরক্তিকর। এতে একাগ্রচিত্ত হতে না পারাতে কাজকর্মে অসুবিধা হয়।

---

* [অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক চিন্তা ভুলবার উত্তেজক ঔষধরূপে অনেকে মদ খায়, কেহ বা একই কারণে না বুঝে বেশ্যাসক্ত হয়, কিংবা পরনারী গমন করে। কেউ কেউ ছোট-বড় অপরাধও করে থাকে। কেউ আবার বুড়ো বয়সে বিবাহও করে। কিন্তু সবই বৃথা হয়। যন্ত্রণা অসহ্য হলে কেহ বিনিদ্র রজনী যাপন করে। কেহ বা আত্মহত্যা করে। এই চিন্তারোগ মুহুর্মুহু তাদের মনে আঘাত হানে।]

এই রোগীকেও মাত্র তিন মিনিটে আরোগ্য করা সম্ভব। কি ও কেন—এই প্রশ্ন এদের মধ্যে দ্বন্দ্বরত হয়। এদের ব্যক্তিত্বকে বিচ্ছিন্ন করে। কিন্তু অন্য ব্যক্তি যা তুচ্ছ করে তা এদের ব্যাকুল করে কেন? দৈহিক কারণে প্রতিরোধ-শক্তির হানি হলে ইহা ঘটে। বহু ক্ষেত্রে এরা স্ব-বাক্‌প্রয়োগ দ্বারা নিরাময় হয়। অন্য ক্ষেত্রে উহার সমর্থনসূচক পরবাক্-প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। সর্বক্ষেত্রে পরবাক্-প্রয়োগ অনুকূল হওয়া উচিত। [প্রতিকূল কদাচ নয়।] এইজন্য রোগী কি বুঝতে বা জানতে চায় তা কৌশলে পূর্বাহ্ণে জানা দরকার। [এক মূর্খ ব্যক্তিকে যা বলে বুঝানো যায় তা বলে বিজ্ঞ লোককে বুঝানো যায় না।] বার কয় শার্প সাজেস্‌শন এবং এক্সপ্ল্যানেটরি নোট এদের ক্ষণিকে' নিরাময় করে। কখনও এদের মনোমত ব্যাখ্যা ভুল হলেও প্রথমে তাই তাকে বুঝিয়ে এদের মনকে শান্ত করা ভালো। পরে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক সত্য বার বার বলে তা তাকে বিশ্বাস করানো যেতে পারে। এক্ষেত্রে ধাপে ধাপে উঠে সইয়ে সইয়ে তাকে বুঝাতে হবে। কিন্তু ইহা বিশ্বাসযোগ্য রূপে বলা চাই। না হলে অবচেতন মন হুঙ্কার দিয়ে উঠে বলবে,—না না, তা নয়। এই সময় চেতন মনের অনুকূল বিশ্বাসের হাঁ হাঁ রব চাপা পড়ে যায়। কিন্তু তা কখনও নীরবে বিলীন হয় না। এজন্যে মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি ও কৃষ্টি অনুযায়ী সাজেস্‌শন দিতে হবে। পরস্পর বিরোধী দু'রকম বিষয় ভুলেও বলা চলবে না।

ধরা যাক, একজনের মাথায় ঢুকলো, অতো নৌকোর বোঝা ওরা রাখবে কোথা? এখানে বলা যেতে পারে যে, নৌকো তো দরিয়াতে ডুবে গেলো। এরূপ বাক্-প্রয়োগ দুই-এক ক্ষেত্রে কার্যকরী হলেও অধিক ক্ষেত্রে তা ফলপ্রদ হয় না। তবে বিজ্ঞ মনের মধ্যেও মূর্খ অংশ আছে এবং উহা পৃথক ভাবে বুঝতে চায়।

কোনও এক জৈনধর্মীর মাথায় ঢুকলো: পৃথিবীর একশ কোটি মানুষ আজ হাজার কোটি, তা হলে জৈনধর্মের পুনর্জন্ম মতবাদ কি সত্য নয়? একটি মানুষের বদলে একটি মানুষ জন্মালো না কেন? এখানে তার আজন্ম সংস্কার যুক্তিতর্কের কষ্টি পাথরে আছাড় খেয়ে তার মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম স্নায়ুকে ক্ষতিগ্রস্ত করে দেওয়ায় তার প্রতিরোধ শক্তির হানি ঘটিয়েছে। ফলে তার এই বিশ্বাস-ভঙ্গ-জনিত ক্ষোভ সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না। উহা তার কাছে এক আন্‌প্লেসেন্ট তথা দুঃখদায়ক চিন্তা—যা প্রতি নিয়ত তার মনে আঘাত করে তাকে উত্ত্যক্ত করে তুলে। এখানে তাকে বুঝাতে হবে যে, পৃথিবী বিরাট বিশ্বে

একটি মাত্র গ্রহ নয়। পূর্বজন্মবাদ মত এক গ্রহের আত্মা অন্য গ্রহে জন্ম নেয়। ফলে এক গ্রহে লোক কমে ও অন্য গ্রহে জীব বাড়ে। এ ছাড়া বহু জীব-জন্তুও মরে মানুষের সংখ্যা বাড়াতে পারে। [পূর্ব যুগের বহু জীববংশ দিনে দিনে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।] এইরূপ বাক্-প্রয়োগ দ্বারা আমি জনৈক ধর্মপ্রাণ জৈন ব্যবসায়ীর এতদ্-সম্পর্কিত মনোরোগ সারাতে পেরেছি। এই ভাবে চিকিৎসা দ্বারা আমি তার এই দুঃখদায়ক চিন্তাকে সুখকর চিন্তাতে পরিণত করে তাকে নিরাময় করি।

বহুক্ষেত্রে মিথ্যা করে ভয় দেখিয়ে বা অবিশ্বাস্য বিষয় [ম্যাজিক বা ধাপ্পা দ্বারা] বিশ্বাস করিয়ে মানুষের সূক্ষ্ম স্নায়ু গভীর ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করা হয়েছে। কেন ও কি—এই দ্বন্দ্বরত চিন্তা তাকে উতলা করে। তার ব্যক্তিত্ব বিচ্ছিন্ন হয় ও তাকে চিন্তাগ্রস্ত করে। প্রায়ই এদের মনমরা ভাবে থাকতে দেখা যায়। এই ক্ষত গভীর হলে অনুকূল সাজেস্‌শনগুলি ঠিক ধরে না। কিছুতেই প্রকৃত বিষয় তাকে বিশ্বাস করানো যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে দৈহিক ও স্নায়বিক চিকিৎসা করে তার ক্ষতিগ্রস্ত স্নায়ু পুনর্গঠিত করার পর তার মানসিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। এখানে তাকে মাংস বা ছানা আদি পর্যাপ্ত প্রটিন ফুড খাওয়াতে হবে। অনুকূল হরমন ইনজেকশন দেওয়া দরকার। তাকে উপযুক্ত ভাইটামিন খেতে দিতে হবে। এইরূপে মন সবল হলে তবে তার উপর বাক্-প্রয়োগ কার্যকরী থাকে। আমি খাওয়ার পর রোগীকে ডায়নাফিল ট্যাবলেট খাইয়ে এই বিষয়ে আশু সুফল পেয়েছি। এর পর সামান্য বাক্-প্রয়োগের পর রোগী সম্পূর্ণ নিরাময় হয়েছে। কয়েক ক্ষেত্রে জোরালো ভাবে 'ও কিছু নয়। ও হতে পারে না। এ বিষয়ে আমি অভিজ্ঞ।' এইরূপ কয়টা বাক্য মাত্র বলে রোগীকে রোগ মুক্ত করা গেছে। একজনের ধারণা হয়েছিল যে, সে পাগল হয়ে যাবে। তাকে বলা হয়েছিল যে, যে বুঝতে পারে যে সে পাগল হচ্ছে, সেই ব্যক্তি [সেই কারণে] কখনও পাগল হয় না। অন্য কয় ব্যক্তির মনে ভয় হয়েছিল, অমুকে বলেছে যে সে শীঘ্র ক্যানসার বা থাইসিস রোগগ্রস্ত হবে। অথচ সে এই রোগগুলিকে ভীষণ ভয় করে। আজন্ম সংস্কার ও বিশ্বাস সুযুক্তি ব্যতিরেকে হঠাৎ ভঙ্গ হলে এই রোগ আসতে পারে। [কিন্তু এর মূলে থাকে সর্বদা ভয়।] ভূত নামানো, বশীকরণ, ঈশ্বর দর্শন প্রভৃতি অবিশ্বাস্য বিষয়ে [প্রবঞ্চনা দ্বারা] বিশ্বাস জন্মিয়ে পণ্ডিত ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে এই রোগ আনা গিয়াছে। কিন্তু উহা অজ্ঞ ও মূর্খ বিশ্বাস-প্রবণ ব্যক্তিদের নিকট

আনন্দদায়ক হয়ে উঠেছে। [উহা দ্বন্দ্ব আনে নি।] রোগ, শোক, আশাভঙ্গ প্রভৃতি কারণসম্ভূত বিকার ততো ক্ষতিকর নয়। কিন্তু অকারণ মনোবিকার মানুষের অসহ্য হয়ে উঠে। কিন্তু তা একেবারে তাকে পাগল করে তুলে না।

মানুষের ডিপ্রেশনের মুখে [লো ব্লাড প্রেসার বা নারভাস্ ব্রেকডাউন] প্রতিকূল অপছন্দকর বিষয় ঢুকলে এই রোগ হঠাৎ আসে। মনে হয় যে উহা বুঝি সারবে না। কারণ, অন্য কিছু মন বুঝি বুঝবে না। কিন্তু চিকিৎসা মনের ছাঁচ বদলে দেওয়া মাত্র উহার ত্বরিত অপসরণ ঘটে। তখন রোগী নিজের পাগলামির বিষয় ভেবে নিজেই হেসে উঠে। কোনও এক ডাক্তার এই রোগে আক্রান্ত হয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। অপারেশনের সময় ছুরি হাতে নিবিষ্ট-মনা হওয়া মাত্র—সে সময়টুকুর জন্য তিনি চিন্তা হতে অব্যাহতি পেতেন। কিন্তু ছুরি নামানো মাত্র কিলবিল করে উহা তাঁর মনে আসতো। [শুধু প্রশ্ন—কেন? কেন? কি করে এ হলো?] গোপনে তিনি মনো-বিজ্ঞানীদের দ্বারস্থ হন। কিন্তু অর্থলোভী বিজ্ঞানীরা তাঁকে হাতে রাখার জন্য বারে বারে তাঁর সিটিঙ্ নেন। কেহ বা মনোবিশ্লেষণের জন্য তাঁকে সাবজেক্ট রূপে ব্যবহার করতে থাকেন। মনের জট ছাড়াতে তাঁরা আরও জট পাকান। [দুর্জ্ঞেয় মনকে জানতে এখানে চেষ্টা করা নিরর্থক।] কয়েকটা সুতীক্ষ্ণ বাক্-প্রয়োগ ও বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ দ্বারা তাঁর রোগ সারাতে আমার মাত্র পাঁচ মিনিট লেগেছিল। এঁদেরকে বুঝাতে মিথ্যা গল্প [বিশেষজ্ঞদের অনুকূল উক্তি সহ] অবতারণা করাও ভালো। পূর্ব ব্যবস্থা মত যোগসাজসে পণ্ডিতমন্য কেউ উহা সমর্থন করলে ফল আরও উত্তম হয়। যাতে ঐ রোগ পরে আর না রিল্যাপ্স হয় সেজন্য পরে সইয়ে সইয়ে তাঁকে সঠিক বিষয় বুঝানো ভালো।

মানসিক চিকিৎসার জন্য অনেকে 'ডাইভারশন' থেরাপির বিষয় বলে থাকেন। কেহ কেহ বহুক্ষণ দৈহিক পরিশ্রম করে উহা তাদেরকে ভুলতে চেষ্টা করতে বলেন। অন্যদিকে [বিষয়ে] মন চলে যাওয়ায় রোগী সাময়িকভাবে নিরাময় হয়, কিন্তু কেউ ঐ বিষয় তাকে মনে করিয়ে দেওয়া মাত্র তার ঐ রোগ ফিরে আসে। এমন কি ঐ সম্পর্কিত কোনও এক শব্দ শুনা মাত্র রোগ ফিরে আসিতে পারে। যার ভুলে,বা ঠাট্টাতে এই রোগ এসে যায়ঃ রোগী কখনও কখনও রাগে তাকে খুন করে ফেলে। প্রায়ই এরা আত্মীয় বা বন্ধু হয়ে থাকে। এজন্য এই খুনের মোটিভ্ খুঁজে পাওয়া যায় না। অনুতপ্ত রোগী প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করে না। এমনও হয়েছে যে কেউ উহা তাকে মনে

করিয়ে ঐ রোগ এনে দিলে। ফলে, যন্ত্রণায় অধীর হয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে তার পক্ষে তাকে খুন করা সম্ভব।

বহুক্ষেত্রে সুগন্ধি গন্ধ শুঁকিয়ে ওর ডিপ্রেশন কমিয়ে ওকে সুখবর দিয়ে বা সুখকর অন্য চিন্তাতে এনে কিংবা উগ্র স্মেলিঙ সল্ট শুঁকিয়ে স্নায়ুকে চাঙ্গা করে পরে স্ব-বাক ও পর-বাক্ প্রয়োগ দ্বারা তখনকার মত তাকে নিরাময় করা যায়। অবশ্য যন্ত্রণা নিবারক টেম্পরারি রিলিফের প্রয়োজন আছে। এমন কি, ক্ষেত্র বিশেষে উহা কিছুকাল পর্যন্ত স্থায়ী হতেও পারে। তবুও ঐ চিন্তার অসারতা প্রমাণ করে রোগের মূল জড় নষ্ট করা দরকার। সেই ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে ঐ সম্পর্কে সে সানন্দে আলোচনা করতে পারবে। কিন্তু দুর্বল স্নায়ুকে সবল না করলে একটি রোগ [চিন্তা] অপসারিত হওয়ার পর [ঐ জাতীয় বা ঐ সম্পর্কিত] অপর রোগ সেখানে এসে যেতে পারে।

কোনও ব্যক্তি ভয়ে ভয়ে বা অধীর হয়ে কোনও প্রশ্ন করলে আত্মীয় বন্ধুদের উহার স্বরূপ ও বিষয় হতে বুঝে নেওয়া উচিত যে তার মনে কষ্টদায়ক অন্তর্দ্বন্দ্ব উপস্থিত। এক্ষেত্রে কৌশলে তার প্রয়োজন বুঝে তাকে অভয় দিয়ে বলতে হবে—হ্যাঁ। তাই তো! ঠিকই বুঝেছো। অন্য কিছু বা ঐ সব হতে পারে না। ওরা তোমাকে ভুল বুঝিয়েছে, ইত্যাদি। সে ক্ষেত্রে তাদেরকে তখুনি বিশ্বাসযোগ্যভাবে অনুকূল সাজেশন দিতে হবে। কাউকে মনমরা ও বিমর্ষ ও নিয়ত চিন্তারত দেখলে তাকে তার মনের চিন্তা খুলে বলার জন্য পীড়াপীড়ি করে তা জেনে তাকে ঐ ভাবে সত্বর নিরাময় করতে হবে।

[বাক্-প্রয়োগ দেহের সঞ্চিত হরমন নির্গত করে। ফলে বিকৃত সূক্ষ্ম-স্নায়ু সুস্থ হয়ে মনের জোর আনে। কিন্তু দেহে পর্যাপ্ত হরমন না থাকলে তা হয় না। এজন্য অধিক হরমন জাত করতে পুষ্টিকর খাদ্য ও ঔষধাদি দরকার। দেহ উহা খাদ্য দ্বারা তৈরি করতে না পারলে উপকারী হরমন এই উদ্দেশ্যে দেহে প্রবেশ করাতে হবে।]

অনেক সময় অপরাধ-রোগীরা ভুলক্রমে আসল অপরাধীরূপে চালু হয়ে যায়। আমার মতে এই সব অপরাধীদের কোনওরূপ শাস্তির ব্যবস্থা না করে বরং এদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। এই অপরাধ-রোগীদের স্বরূপ জানতে হ'লে কিরূপ পন্থায় অনুসন্ধান করা উচিত তা পূর্বপরিচ্ছেদে বলা হয়েছে। এদেশের ন্যায় য়ুরোপেও অপরাধ-রোগীদের জন্য কোনওরূপ পৃথক ব্যবস্থা পূর্ব-কালে ছিল না। ইংল্যাণ্ডের কোনও এক আদালতে আসামী পক্ষ থেকে

ক্লিপটোম্যানিয়ার অজুহাতে আসামীর মুক্তি প্রার্থনা করা হলে জজ সাহেব আসামী পক্ষের সওয়ালের জবাবে এইরূপ উক্তি করেন। 'এদের এই রোগ সারাবার জন্যেই আমাকে এখানে পাঠান হয়েছে'। কলিকাতার কোনও এক হাকিমের কাছে এইরূপ এক রোগের কথা বলা হলে তিনিও এইরূপ বলেছিলেন, 'আমি এক কলমের খোঁচায় এখুনি তার এই রোগ সারিয়ে দেবো'। কিন্তু অধুনাকালে সকল সভ্য দেশই এই সব রোগ সম্বন্ধে সচেতন।

অনেক সময় অতৃপ্ত বাসনা এবং জাগ্রত যৌনবোধও নানারূপ অপকর্মের কারণ হয়। দুর্দমনীয় অপস্পৃহার হঠাৎ তড়িৎ প্রবাহ [অনুপকারী হরমন সৃষ্টি হওয়াতে] ঝটিতে মানুষের প্রতিরোধ-শক্তিকে বিলুপ্ত করে। ওই কালে হঠাৎ অত্যধিক জাত অপস্পৃহা [ষ্টিমিউলাসের দ্বারা] অত্যুগ্র হয়ে উৎক্ষিপ্ত হলে মানুষ অপকর্ম করে। এই সম্বন্ধে একটি বিশেষ ঘটনার কথা বলা যেতে পারে। বিবরণটি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো।

"কলিকাতার বটতলা অঞ্চলে কোনও এক মন্দিরে ৬০ বৎসর বয়স্ক এক পুরোহিত বাস করতেন। পাড়ার বহু বালক-বালিকা ওই দেবালয়ে যাতায়াত করত, কারণ পুরোহিতমশাই তাদের বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখতেন। কিন্তু আজন্ম ব্রহ্মচারী সাধু-চরিত্র পুরোহিতমশাই-ই একদিন এক দশম বৎসর বয়স্কা বালিকার প্রতি পাশবিক অত্যাচার করে বসলেন। বৃদ্ধকে থানায় ধরে এনে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'এ কেয়া কিয়া আপ্ ?' 'কেয়া বলে বাবু সাব,' বৃদ্ধ উত্তরে বলেছিল, 'যব হোতা তব এইসাই হোতা'। বৃদ্ধ ঠক ঠক করে কাঁপতে ও কাঁদতে থাকে। অনুশোচনায় তার হৃদয় দগ্ধ হচ্ছিল। বৃদ্ধ এতদিন ব্রহ্মচর্য পালন করে এসেছিল, কিন্তু তা সে করে আসছিল তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। বার্ধক্যের দুয়ারে এসে এজন্য তার অনুতাপ আসে। কিন্তু যে যৌবন মনের দুয়ারে বার বার মাথা খুঁড়ে ফিরে গেছে তাকে সে আর ফেরাতে পারে না। হঠাৎ সে আবিষ্কার করে যে, আর একদিনও তার সময় নেই। তার তখন মনে হয়, ওই দিনটাই বুঝি তার শক্তি-সামর্থ্যের শেষ দিন। অনাস্বাদিত ফলটির আস্বাদনের জন্য তার মন আকুল হয়ে উঠে। মৃত্যুর পূর্বে আর একবার। হাঁ হাঁ আর একবার। এর পর হঠাৎ সে ক্ষেপে উঠে ক্ষমার অযোগ্য এই অপরাধটি করে বসে। কিন্তু পরক্ষণেই তার জ্ঞান ফিরে আসে। [উত্তেজনা উপশমের পর] প্রতিরোধ-শক্তি সে ফিরে পায়। কিন্তু তার সেই ক্ষণিকের ভুল শুধরোবার সে আর কোনও পথই পায় নি। ফলে তাকে জেলে যেতে হয়।'

এই সব কারণে অসাধুর ন্যায় সাধুকেও বিশ্বাস করা উচিত নয়। আমরা পরস্পর পরস্পরের অন্তর্নিহিত অপস্পৃহাকে দমন করে পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে [ব্যক্তিগত বা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে] আত্মরক্ষা করি মাত্র। মানুষ সমাজ এবং রাষ্ট্রগঠন একমাত্র এই কারণেই করে থাকে। মনের শয়তানই মানুষের সর্ব-প্রধান শত্রু। নিউরেটিক অবস্থায় ও ব্লাডপ্রেসার রোগের কারণেও অনেকে অপকর্ম করে। যৌনস্পৃহার প্রতিরুদ্ধতার কারণেও এই সব রোগ জন্মে থাকে। এই কারণে অবিবাহিত ব্যক্তিদের উপর নির্বিচারে কোনও দায়িত্বপূর্ণ কার্যের ভার দেওয়া ঠিক নয়।

এমন অনেক ব্যক্তি আছে যারা অপকর্ম করে মাত্র একটা উত্তেজনা উপভোগ করতে। তারা ডাকাতি করে কেবলমাত্র এই রোম্যান্স ও উত্তেজনা উপভোগের জন্যে। উহা তারা অর্থের কারণে করে না। এরূপ মনোবৃত্তি এক-প্রকার রোগ এবং এরও চিকিৎসার প্রয়োজন আছে। অন্য আর একপ্রকার অপরাধী আছে, যারা মনে করে একটি বড় অন্যায় প্রতিরোধ করবার জন্যে একটি ছোট অন্যায় করা যেতে পারে। এই ক্ষেত্রে ভুল পথে চিন্তাধারা প্রবাহিত হওয়ার জন্যেই তারা অপরাধ করে। আমি এমন একটি অপরাধীকে জানি যে বন্ধুর গচ্ছিত অর্থ কড়ায় গণ্ডায় ফেরত দেবার অভিপ্রায়ে অন্য আর একটি অপরাধ করে বসে। এই সকল অপরাধীকে বাক্-প্রয়োগ এবং উপদেশাদির দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে, একটি অন্যায় দিয়ে অন্য একটি অন্যায় কোনও অবস্থাতেই চাপা দেওয়া যায় না।

[এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, ক্ষেত্র বিশেষে দেহের চিকিৎসার পর মানসিক চিকিৎসা করা উচিত। দৈহিক চিকিৎসার দ্বারা প্রকৃত অপরাধীদের সূক্ষ্ম স্নায়ু সবল হলে [তাদের প্রতিরোধ-শক্তি ফিরিয়ে আনলে] তাদের মনে কারুর উপদেশ আদি বাক্-প্রয়োগ ফলপ্রদ হয়। তাই স্নায়ুদৌর্বল্য, লো বা হাই প্রেসার,গ্ল্যাণ্ডের ক্ষয়ক্ষতি, উপকারী হরমন ও ভাইটামিনের অভাব আদি উপেক্ষণীয় নয়। আমি নিরীহ খরগোস জীব দ্বারা ইহার কিছুটা পরীক্ষা করেছি। অনুপকারী হরমন ইন্‌জেকশন উহাকে ক্ষিপ্ত তথা র‍্যাবিট করেছে। কিন্তু পরক্ষণে উপকারী হরমন প্রাপ্তি তার মধ্যে শান্ত ভাব ফিরিয়ে এনেছে। বিভিন্ন গ্রুপের হরমন দ্বারা এইরূপ পরীক্ষা করা যেতে পারে।

এইখানে আরও উল্লেখযোগ্য এই যে, মানুষের মনে ভ্যাকুয়াম বা শূন্যতার স্থান নেই। উহার সূক্ষ্মবৃত্তি দুর্বল হলে স্থূলবৃত্তি সবল হয়। স্থূলবৃত্তি চলে

গেলে সূক্ষ্ম বৃত্তি ফিরে আসে। অপস্পৃহা ও সৎপ্রেরণা সম্বন্ধেও সেই একই কথা বলা চলে। কারণ, একই মনোদণ্ডে উল্টোউভিন্টভাবে এই পরস্পর বিরোধী বৃত্তিগুলি অবস্থান করে।]

"কোনও নারীর প্রেমাস্পদ দশ বৎসর তার সঙ্গে প্রেম করার পর অন্যত্র বিবাহ করলে ঐ নারী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। এক্ষেত্রে ঐ ঘটনাটির উপর সে গুরুত্ব দেয় নি। তার দ্বন্দ্ব এই যে সে বুদ্ধিমতী হয়েও এতোদিন ওর প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পারে নি কেন? আমি ঐ নারীকে বুঝাই যে ওর মধ্যে দ্বৈত ব্যক্তিত্ব ছিল। যে ব্যক্তিত্বটি তাকে ভালোবাসতো সেটির বদলে অন্য একটি ব্যক্তিত্ব ওর মধ্যে এখন এসেছে। উভয় ব্যক্তিত্ব একই দেহে থাকাতে ঐ লোকের কোনও ক্ষতি করা তার উচিৎ নয়। ঐ নারীর এখন উচিৎ এই যে ওর মত তার বিবাহ করা। এইভাবে তার উপর ওর প্রতিশোধ নেওয়া উচিত হবে।

মনস্তাত্বিক উপায়ে বা ঔষধ প্রয়োগে এবং উভয়বিধ উপায়ে অপরাধীদের চিকিৎসা করা যায়। তবে—শক্তিবর্দ্ধক ঔষধগুলির মত কিছু প্রত্যক্ষ ঔষধ আবিষ্কার করা সম্ভব।

"হলদে রঙের কিছু খুদে চোর পিঁপড়ে আছে। বড় পিঁপড়েরা অসতর্ক হলে তাদের সুড়ঙ্গে ঢুকে ওরা খাদ্যকণা চুরি করে। বড় পিঁপড়েরা তাড়া করে ওদের ছোট সুড়ঙ্গে ঢুকতে পারে না। আমেরিকার উত্তরাঞ্চলে লাল বড় পিঁপড়েরা ছোট পিঁপড়েদের বাসাতে হানা দিয়ে বাচ্চাদের ধরে এনে চাকর বানায়। ওই লাল বড় পিঁপড়েরা কর্মঠ হলেও ফরমাস খাটার জন্য ওইরূপে স্লেভ রাখে। কোনও পিঁপড়ে খাদ্য ও বাচ্চা সংগ্রহে দলীয় ডাকাতিতে অভ্যস্ত।

[পিঁপড়েদের অন্যায় বা ন্যায়বোধ নেই। এখানে শুধু বৃত্তি তথা স্পৃহার বা ইনিষ্টিক্টের প্রশ্ন। ওদের মধ্যে ওই স্পৃহা দমনার্থে প্রতিরোধ-শক্তি নেই। এইখানেই জন্তুদের ও মানুষের মধ্যে যা কিছু প্রভেদ।

বলপ্রয়োগী ও অবল প্রয়োগী—অপরাধী পিঁপড়েদের বাছাই করে ওদের শ্রেণীমত পৃথক শিশিতে পুরে কাঁচের রড্ দ্বারা উত্যক্ত করলে ওরা ওই রড্ বা কাটি কামড়ে বিষ ঢালে। সেই মুহূর্তে কিছু স্প্রিট ওতে ঢাললে ওই বিষ দ্রবীভূত হয়। ওই ঔষধে চৌর্যবৃত্তি ও দস্যু বৃত্তি সারানোর ঔষধ তৈরী সম্ভব। পিঁপড়েদের পেশী ও স্নায়ুর প্রভেদ কম। তাই ওই বিষ স্নায়ুর উপর কার্যকরী হবে।

ওই সব বিষের নির্যাস হতে হোমিও পদ্ধতিতে [বিষে বিষ ক্ষয়] সমধর্মা ও এ্যালোপ্যাথি পদ্ধতিতে বিপরীতগুণী কিংবা কবিরাজী বা হেকিমী পদ্ধতিতে উভতো-গুণী ঔষধ তৈরী করা যায়। তবে—এই সকল বিতর্কিত বিষয় গবেষণার অপেক্ষা রাখে। (f)

অপরাধ-স্পৃহার কৃত্রিম নিষ্কাশন সর্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসা। ভেকেসন তথা লিজার গ্যাপ পুতি পদ্ধতি সম্বন্ধে ইতিপূর্বে বলেছি। কিন্তু অপরাধীদের-শ্রেণী ভেদে পর্বতারোহণ শীকার স্পোর্টস সাহিত্য ও শিল্প চর্চা আদি নির্ধারিত করতে হবে। নিম্নে উহার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত উধৃত করা হলো।

অপস্পৃহা নিষ্কাশনার্থে চোরদের ফুল তোলা, ফল পাড়া প্রভৃতিতে, বারগ্লার-দের মাটি খুঁড়ে চিনে বাদম তুলা বা গাছে উঠে ফল পাড়ার কার্যে এবং ছিনতাই দের জলে ছিপে মাছ ধরার কার্যে ও ডাকাতদের জঙ্গলে পশু শিকারের কাজে নিযুক্ত করা উত্তম। যৌন-স্পৃহীদের সাহিত্য ও শিল্পে এবং প্রবঞ্চকদের কেনা বেচার কাজে নিযুক্ত রাখুন।

বিচার ও পুলিশ এবং জেলের যুপোপোযোগী পরিবর্তন দ্বারাও অপরাধ-নিরোধ ও উহার চিকিৎসা করতে হবে। এগুলিতে আশু মননিবেশ করা উচিৎ।

[জেলে অপরাধীদের প্রকার এবং শ্রেণী ও উপশ্রেণী ভেদে পৃথক পৃথক স্থানে রাখতে হবে। দণ্ডপ্রাপ্ত ও বিচারাধীন ব্যক্তিদের সম্পূর্ণ পৃথক স্থানে ও গৃহে রাখা উচিৎ।]

উৎকট [প্রকৃত] অপরাধীদের জেলে না পাঠিয়ে নিরালা দ্বীপে বা জনহীন স্থানে পৃথকীকৃত করুন। [সুন্দর বনের নিকট ও আরব সাগরে বহু বসতি হীন দ্বীপ আছে।] সেখানে তারা মুক্ত অবস্থায় পরস্পরকে সংযত করে পারস্পরিক সামঞ্জস্য আনবে। পুরাকালে এই পদ্ধতিতে অপরাধী সমাজ নিরাপরাধী হয়ে-ছিল। ঐ সব স্থানে তারা পুনর্বার অপরাধ করতে অক্ষম হয়ে থাকে। ওইক্ষেত্রে ওরা আত্মরক্ষার্থে স্বজনধর্মী হতে সৎ প্রেরণা আনে। ওই ক্ষেত্রে ওদের পূর্ব স্থানকে কুপরিবেশ মুক্ত করে নূতন অপরাধী সৃষ্টি বন্ধ হবে। তবে ও'জন্য এক এক দ্বীপে এক এক শ্রেণীর অপরাধী রাখতে হবে।

পূর্বে ইংল্যাণ্ড থেকে অষ্ট্রেলিয়ায় অপরাধীদের পাঠানো হত। উপরোক্ত পন্থায় ইংলেণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়া উভয় স্থানই নিরপরাধীবহুল হয়। তবে অষ্ট্রেলিয়ায় অপরীদের শ্রেণী উপশ্রেণী ভেদে পৃথক স্থানে পৃথকীকৃত না করায় অসুবিধা ঘটে।

আকস্মিক [প্রাথমিক—] অপরাধীদের ক্ষেত্রে দণ্ড দান নিষ্প্রয়োজন। বহু দেশে প্রথম প্রথম বিচারে ওদেরকে দোষী সাব্যস্ত করে রায় দান'ই যথেষ্ট বিবেচিত। তজ্জন্য তাদের দণ্ডদানের নিয়ম নেই। ওতে ওই ব্যক্তি সাবধান হবার প্রচুর সুযোগ পায়।

অপরাধ'কে বিচার না করে অপরাধীকে বিচার করতে হবে। তাদের পূর্বাপর ব্যবহার ও প্রকৃতি, তাদের জন-স্বীকৃতি [পাবলিক রেপিউটেশন] তথা তাদের সমগ্র জীবন এখানে বিচার্য। ঐরূপ ব্যক্তির পক্ষে ওরূপ-অপরাধ করা সম্ভব কিনা! কিরূপ মানসিক পরিস্থিতিতে বা কার প্ররোচনায় সে ওই অপরাধ করলো। ঐরূপ পরিস্থিতিতে বিচারক নিজেই ওই অপরাধ করতো। তাহলে এখানে সংশ্লিষ্ট সকলকেই অপরাধী করতে হবে।

সাক্ষী-নির্ভর বিচার এযুগে বাতিলযোগ্য। বিচারের উদ্দেশ্য অপরাধ বন্ধ করা : সরকারের আয় বা অপরাধ বাড়ানো নয়। এখানে প্রতিশোধ (f) গ্রহণের প্রশ্ন অবান্তর। কারণ নির্ণয় [ফ্যাকট ফাইণ্ডিঙ] সর্বাগ্রে প্রয়োজন। উভয় পক্ষের সাক্ষীদের বিবৃতি লিপিবদ্ধ করা বিচার নয়। এখন এক'শ জন একত্রে মানুষ খুন করা সম্ভব। তাহলে দশজন মিলে মিথ্যা সাক্ষী দেবে না কেন? [ওটা আরও সহজ] পুলিশ ও কোর্টের মাধ্যমে মানিগুণীকে বৈধ ব্ল্যাকমেইলিঙ সহজ-কার্য। মিথ্যাবাদীতার যুগে আদালতগুলিকে পারিবৈশিক সাক্ষ্য-নির্ভর হতে হবে।

পর্দাঘেরা স্থায়ী কোর্টকে ঘটনাস্থলে আনতে হবে। মুভিঙ কোর্ট দ্বারা বিচার জনগণের দুয়ারে পৌছনো চাই। সত্য সাক্ষীরা দূর স্থানে স্থায়ী কোর্টে যায় না। [নন্-কগ্ মামলাতে ওদের খুঁজে বের করার কেউ নেই] ঘটনাস্থলে রবাহুত সাক্ষীরা নিজেরাই এসে সত্য বলে। অপরাধীমন্য'র গৃহে বা কর্মস্থলে কোর্ট বসাতে হবে। ফরিয়াদী ও অপরাধীকে জানে সেইরূপ ব্যক্তিকে সেখানে পাওয়া যায়। উকীলের বাড়ীতে রিহারসেল প্রাপ্ত মিথ্যা সাক্ষীকে ভাঙা যায় না। ক্লীকের জগতে বর্তমান বিচার পদ্ধতিতে দোষীদের মুক্তি ও নির্দোষীদের দণ্ড হয়।

উপরোক্ত প্রাচীন ভারতীয় 'অন্ দি স্পট্' বিচার পদ্ধতি এখন চীন, রুশ ও ফ্রান্সে গৃহীত। এবিষয়ে ভারত শুধু ঘুমায়ে রয় ও অপরাধীর সংখ্যা বাড়ায়। অজুহাত—সময়ের ও লোকের অভাব। সে ক্ষেত্রে স্থানীয় সংস্থা গড়ে [এরা সহানুভূতিশীল] তাদের মিটমাট-পন্থী বিচারের ভার দিতে হবে। অন্যথায়

দুই বা তিনজনের [পূর্বের মত] বেঞ্চ কোর্ট তৈরী হোক। দুর্নীতি-আজ পুলিশের একচেটিয়া নয়। (f) আদালত ও পুলিশের মধ্যবর্তী একটি সংস্থার প্রয়োজন আছে। [কলিকাতার পূর্বতন রিপোর্ট সিষ্টেমের মত] ওনরা মামলা কোর্টে পাঠাবার পূর্বে সত্য মিথ্যা যাচাই করতে পারবে।

[উভয় পক্ষের সাক্ষীগণের ও সমর্থকদের মুহূর্মুহূ বিদ্বেষ ও উত্তেজনা অপরাধ স্পৃহার বহির্গমনের সহায়ক। এজন্য মিটমাটপন্থী বিচার ব্যবস্থার প্রয়োজন। লেবার কোর্টে বর্তমানে উহা কিছুটা অনুসৃত হয়। আমার মতে মামুলি মামলা মিটমাট করতে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে বাধ্য করা উচিৎ।]

বিঃ দ্রঃ—সৎ কয়েদীরা জেলের বাইরে গভর্মেণ্ট বা প্রাইভেট ফ্যাকটরীতে কাজ করে কাজের শেষে জেলে ফিরলে ফল ভালো হয়। এতে তারা মুক্তির পরের পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত থাকতে পারে। জেলের ভিতরে প্রাইভেট কোম্পানি-গুলি ব্রাঞ্চ ওয়ার্কসপ খুলতে পারেন। ওদের বেতন তখুনি না দিয়ে একত্রে মুক্তির কালে দিলে উহা তাদের ভবিষ্যতের পুঁজি হবে। তবে—ওই বেতনের অর্ধেক রেখে জেলের খরচা তোলা হোক।

অ-যৌনজ অপরাধের মত যৌনজ অপরাধও আছে। ক্লীপটোম্যানিয়াক নর নারীর মত নিমপো-ম্যানিয়াক নর নারীও আছে। এই নিম্পোম্যানিয়ক'রা যৌন তাড়না প্রতিরোধ করতে অক্ষম হয়। ক্লীপটোম্যানিয়া হতে পুরুষরা অধিক এবং নিম্পোম্যানিয়া হতে নারীরা অধিক ভুগে। এই জন্য যৌন অপরাধীদেরও চিকিৎসারও প্রয়োজন আছে।

[এদেশে মানুষের মনোবৃত্তি এইরূপ যে তারা নিজেরা যাচ্ছেতাই হলেও ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের তারা চরিত্রবান দেখতে চায়। এর ব্যতিক্রম হলে তারা অসন্তুষ্ট ও নিন্দা মুখর হয়ে থাকে। এজন্য যৌনজ অপরাধ ও তার উৎপত্তির এবং ওদের চিকিৎসা সম্বন্ধে আলোচনা করবো। অধুনা এদেশেও যৌনজ দুর্ঘটনার প্রাবল্য দেখা যায়। দুর্ঘটনা ঘটে বলে পথ চলা কিংবা নারী প্রগতি বন্ধের প্রশ্ন উঠে না। এখানে আত্ম বিশ্লেষণ দ্বারা সাবধানতা অবলম্বনের বিষয় বলা হবে।

(f) মিথ্যা মামলা করেছে ও মিথ্যা মামলায় পড়েছে এমন বহু ব্যক্তিকে আমি জানি। [উৎকোচ গ্রাহী] কিছু পুলিস ও হাকিমের নিখুঁত কার্যরীতিও আমার জানা। মিথ্যা মামলায় মুক্তি পেলেও পাঁচ বছর বিচার শেষ হতে লাগে। এখানে অর্থনষ্ট ও মনোকষ্ট প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়।

যৌনজ-অপরাধ নারীর ইচ্ছায় এবং নারীর অনিচ্ছায় সঙ্ঘটিত হয়। দ্বিতোয়ক্ত অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অসাবধানতা এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ও উহার প্রশাশনিক দুর্বলতা দায়ী। এইখানে নারীর সহযোগীতায় সঙ্ঘটিত অপরাধসমূহের চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধে বলা হবে। কিন্তু চিকিৎসার পূর্বে নারীদের মনকে বিশ্লেষণ করে বুঝতে হবে।

যৌন বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনার এই প্রবন্ধে উদ্দেশ্য নয়। নর নারীর বিবিধ যৌনজ অপরাধের কারণ এবং উহার বিবিধ কার্যপদ্ধতি ও উৎপত্তির কারণ এবং গতিবিধি সমূহ এবং উহা হতে সাবধানতা অবলম্বনের উপায় এবং উহার দায় দায়িত্ব ও কার্য্যকরণ সম্বন্ধে এই পুস্তকের অন্য খণ্ডে বিশদরূপে মনস্তাত্বিক ব্যাখ্যা সহ বর্ণিত হবে। এই প্রবন্ধে মাত্র চিকিৎসার জন্যে প্রয়োজনীয় মনস্তাত্বিক বিষয় বলা হলো।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

যৌনজ অপরাধ

যৌনজ অপরাধ দুই প্রকারের হয়। যথা: (১) নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে (২) এবং নারীর সহযোগিতায়। [সহযোগীয় অপরাধ তথা কন্ট্রিবিউটিভ অফেন্স] একশ্রেণীর মোটর কলিশন মামলা এই জাতীয় অপরাধ। এখানে নারী ও পুরুষের দোষ কম বেশী সমান।

নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট নারীর ও তার অবিভাবকদের অসাবধানতা ও তৎসহ রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থা ও অক্ষমতা দায়ী। কিন্তু নারীর সহযোগিতায় কৃত অপরাধে নারী নিজেও কিছুটা দায়ী। সুভদ্রা হরণ ও সীতা হরণ এক বস্তু নয়। এর মধ্যে প্রেম ঘটিত ও ব্যাভিচার এই উভয় অপরাধই আছে।

[কেউ যদি সুন্দর বনের বাঘকে ডেকে বলে: বাবা বাঘ! তুমি বাঘ আছো। বেশ আছো। আমি এধার দিয়ে যাচ্ছি। তুমি ওধার দিয়ে যাও? তুমি আমাকে খাবে কেন? তাহলে বাঘ কি স্বধর্ম ত্যাগ করে মানুষ খাবে না। তেমনি কোনও স্বামী স্ত্রী যদি নিরালা গড়ের মাঠে রাত্রে ভ্রমনে বেরোয়।

সেখানে ওৎপেতে থাকা দুর্বৃত্তরা স্ত্রীর ওপর অত্যাচার করলে ওটা তাদের অবিবেচনতাপ্রসূত কার্যের এক স্বাভাবিক পরিণতি।]

নারীর সহযোগিয়তায় কৃত অপরাধের জন্য মাত্র পুরুষকেই দায়ী করা হয়। [আইনে অবশ্য নারীকে নাবালিকা হতে হবে] কারণ—এখানে সামগ্রিক কল্যাণের জন্য নারীকে রক্ষা করাই উদ্দেশ্য। কোনও নাবালক বালকও নাবালিকা স্ত্রীকে বহিষ্করণ [ইলোপ] করলে ওই বালকই দায়ী হবে। নারীরাই জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। পোষাকে পরিচ্ছদে পুরুষরা একদিন এক হবে। সেই দিন মাত্র নারীর পরিচ্ছদ থেকে জাতিগুলি চেনা যাবে। পারিবারিক বিষয় ও বংশের ধারা রক্ষার প্রশ্নও এতে আছে। এর মূলে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও দেহগত কারণও থাকে।

একটি পুরুষের বহুনারী বিবাহে সন্তানোৎপাদন ব্যাহত হয় না। কিন্তু—একটি নারী বহুপতি গ্রহণ করলে বন্ধ্যাত্ব আনে। নারীর দৈহিক ও মানসিক দুর্বলতার সুযোগগ্রাহী পুরুষরা অপরাধী। প্রকৃতির দ্বারা নারী পুরুষাপেক্ষা দায়িত্বশীল রূপে সৃষ্ট। আইন চায় যে নারীরা [অবৈধ ভাবে] এগুলেও পুরুষদের পিছুতে হবে। সমাজ পুরুষকে ক্ষমা করলেও ব্যাভিচারিনী নারীকে ক্ষমা করে না। বৌরাণী ও দিদিমণিদের একটু কষ্ট করে সংযত হতে হবে।

কিছু তরুণ উতলা হয়ে বলপ্রয়োগে যৌনজ অপরাধ করে। কিন্তু তাদের জীবজন্তুর ব্যবহার হতে শিক্ষা লাভ করতে হবে। সেখানেও বলপ্রয়োগের রীতি নেই। পুংময়ূরের পেখম [নৃত্যাদি] স্ত্রী ময়ূরীর মনোরঞ্জনের জন্য সৃষ্ট। কোকিলের মধুর কণ্ঠ স্বর স্ত্রী কোকিলকে গুণে আকৃষ্ট করার জন্যে আছে। এখানে গুণে বা প্রেমে জয় করতে হবে। [নাবালিকা ও পরস্ত্রী পরিহার্য] অন্যথাতে আইনের কবলে তাদের দণ্ডিত হতে হবে। তাই জন্তুদের মত মানুষকেও ওই বিষয়ে ধৈর্য ধরতে হবে। [জন্তুদের সৎগুণ না নিয়ে লোকে ওদের মন্দ গুণগুলি নিয়ে থাকে] [f]

[যৌনস্পৃহা প্রদামিত না করে ওটাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। সৃষ্টি রক্ষার জন্য উহাকে বিবাহের পথে প্রবাহিত করা হয়। মানসিক ও দৈহিক সুস্থতার

(f) কোনও নারীর জন্য দু'জন তরুণের মারামারি'ও ওই জন্তুদেরই মন্দ গুণপ্রাপ্তি। তবে—জন্তুদের ক্ষেত্রে স্ত্রী-জন্তুকে বীরত্বে মুগ্ধ করা হয়। আদি মানবী'দের ক্ষেত্রেও উহা সমভাবে প্রযোয্য হতো তাহলে বুঝা যায় যে জন্তুদের মধ্যে পাখীরা বেশী সভ্য ও সৎভাবী।

জন্য উহা নির্মূল করা উচিৎ নয়। তবে প্রতিরোধ-শক্তি সেই সঙ্গে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।

কোনও এক তরুণের পিতা তার পুত্র সম্বন্ধে গর্ব করে আমাকে বলেছিল : আমার পুত্রের বাইশ বছর বয়স হলো। কিন্তু সে এত ভাল ও সৎ যে কোনও কন্যার দিকে চেয়েও দেখে না। এর প্রত্যুত্তরে আমি ওই কন্যার পিতাকে বলে ছিলাম : উহুঁ। এ ভাল কথা নয়। আপনার পুত্রের চিকিৎসার দরকার।

আত্মরক্ষা মূলক অতীন্দ্রিয়তা [প্রোটেকটিভ ইনিষ্টিঙ্কট] নারীদের মধ্যে বেশী আছে। তারা যেমন বহু কিছু গোপন করতে পারে। তেমনি বহু কিছু তারা জানতে পারে। এরা কোনও তরুণ কি উদ্দেশ্যে তার সঙ্গে আলাপরত তা তারা তাদের মুখ চোখ দেখে বুঝতে পারে। এতে তারা তাদের প্রবৃত্তি মত এগোয় কিংবা পিছোয়। নারী'রা এ' থেকে সময়ে সাবধান হতে পারে।

[ডাক্তাররা দূর হতে রোগী দেখে বলে দেয় যে তার কি রোগ। পরে যান্ত্রীক ও রসায়ন পরীক্ষায় তাদের অনুমান সত্যরূপে প্রমাণিত হয়। বহু দোকানী খদ্দের দেখে বুঝে যে, সে দ্রব্য কিনবে কি'না। তারা তা কিনলেও কতো দাম দেবে। এইগুলিকে প্রোফেসন্যাল ইনিষ্টিঙ্কট বলা হয়। উকিল শিক্ষক ব্যাপারী প্রভৃতিরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে এই ক্ষমতার অধিকারী হয়। পুলিশ কর্মীরা পুলিশি কার্যকে চাকুরী রূপে গ্রহণ না করে বৃত্তি তথা প্রফেসন বুঝলে তারাও ঐ ক্ষমতার অধিকারী হয়। দশজন ভৃত্যকে দেখলে কোন জন ঐ চুরি করেছে, তা তারা তার মুখ চোখ দেখে বলতে পেরেছে।

এর মধ্যে আশ্চর্যজনক কিছুই নেই। মানুষের মনোভাব মুখে চোখে স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠে। এই পরিবর্তন এত সূক্ষ্ম যে উহা মাত্র অনুভব করা যায়। কিন্তু উহার সূক্ষ্মতার জন্য ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। অভিজ্ঞ লোকদের দৃষ্টিতে ওগুলি সহজে ধরা পড়েছে। তবে সেজন্য ওই সংশ্লিষ্ট কথাবার্তা তথা ষ্টিমিউলাস প্রয়োগের প্রয়োজন হয়।]

বিঃ দ্রঃ—বহু প্রাচীন গৃহে পুরুষানুক্রমে বাস্তু সাপ গৃহস্থদের সঙ্গে বাস করে। সেখানে পরস্পরের কেউ কোনও ক্ষতি করে না। এই কারণে পক্ষীকুল বৌদ্ধ মঠে নির্ভয়ে মানুষের নাগালে আসে। বানর'রা প্রাণ ভয়ে জগন্নাথের মন্দিরে আশ্রয় নেয়। শূকর'রা পাকিস্থানের ও নীল গাই'রা ভারতের অরণ্যে সরে আসে।

দেবীপ্রতিম মাতা, স্নেহপ্রবণ ভগ্নী বা প্রেমময়ী স্ত্রী সকল মমতা ও বন্ধন ছিন্ন করে কেন বিপথগামিনী হয় : সেই সম্বন্ধে গবেষণালব্ধ বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি কারণ সহ এবার বিবৃত করা হবে। উহার কারণগুলি বুঝলে এই সকল অঘটন সমূহ সময়ে নিবারণ করে সংসারকে রক্ষা করা সম্ভব হবে।

প্রবন্ধের পূর্বার্ধে অ-যৌনজ [আ-সেক্সুয়াল] অপরাধ সম্বন্ধে বলা হলো। কিন্তু অ-যৌনজ অপরাধের মত যৌনজ অপরাধও আছে। যৌনজ অপকর্ম যৌন-স্পৃহার কারণে ঘটে থাকে। এই যৌনস্পৃহা অপ-স্পৃহার মত মানুষের এক আদি স্পৃহা। নারীর বেশ্যাবৃত্তি ও পুরুষের লাম্পট্য এই আদিম যৌন-স্পৃহা হতে উদ্ভূত। এই জন্য আমরা স্বভাব অভ্যাস ও দৈব অপরাধীর ন্যায় স্বভাব-অভ্যাস ও 'দৈব বেশ্যা এবং লম্পট' দেখে থাকি। সভ্য মানুষ অভ্যাস দ্বারা তাদের অপস্পৃহাকে প্রদমিত করেছে। কিন্তু বংশ রক্ষার্থে তারা তাদের যৌন-স্পৃহাকে সম্পূর্ণ প্রদমিত না করে বিবাহের পথে নিয়ন্ত্রিত করেছে। এজন্য অপস্পৃহা অপেক্ষা যৌন-স্পৃহা [পূর্ণ প্রদমিত না হওয়াতে] সভ্য মানুষ অধিক অনুভব করে। ইহা সৎপ্রেরণা ও উহার বাহক সূক্ষ্মবৃত্তির সহযোগে সহজ [প্রেমজ] পথে নির্গত হলে অপরাধ হয় না। কিন্তু এই যৌন-স্পৃহা অপস্পৃহা ও উহার বাহক স্থূলবৃত্তির সহযোগে নির্গত হলে উহা সাঙ্ঘাতিক অপরাধ হয়।

[অপস্পৃহা দুই ভাগে বিভক্ত। যথা :—দ্রব্য-স্পৃহা ও শোণিত-স্পৃহা। এই শোণিত-স্পৃহাও দুই ভাগে বিভক্ত, যথা, যৌনজ ও অ-যৌনজ। যৌনজ শোণিত-স্পৃহা মানুষের যৌন-স্পৃহার সহযোগে সৃষ্ট। ইহা বলাৎকার আদি অ্যাকৃটিভ্ এবং ব্যাভিচার আদি প্যাসিভ্ রূপে প্রকট হয়ে থাকে।]

বিঃ দ্রঃ—বহু হত্যার পর উগ্র শোণিতস্পৃহীরা খুনের পর নিহতের যৌন দেশও কাটে। উপরন্তু যৌন সার [cemen] রক্ত সারেরই রূপান্তরিত অংশ। তাই বলাৎকারের সহিত দংশনাদিও দৃষ্ট হয়। কিছু ক্ষেত্রে বলাৎকার ও খুন একত্রে সমাধা হয়ে থাকে। ইহা একই শোণিতস্পৃহার যৌনজ ও অ-যৌনজ বিভক্তি প্রমাণ করে।

যৌনজ অপরাধ দুই প্রকারের হয়ে থাকে, যথা—(২) নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং (২) নারীর সহযোগিতায়। নারীর সহযোগিতায় সঙ্ঘটিত অপকর্ম সকলকে অপরাধ না বলে উহার গুরুত্ব অনুযায়ী উহাকে অন্যায় কিংবা পাপ বলা উচিত। ইহাকে সহযোগীয় অপরাধ বা 'কনট্রিবিউটিং অফেন্স' বলা যায়। যৌন-স্পৃহা

অপস্পৃহার [অর্থাৎ উহার অংশ বিশেষ শোণিত-স্পৃহার] সহযোগে নির্গত হলে উহার আগমন ও তিরোধান এবং তজ্জনিত উহার ফলাফল একই রীতিতে নিয়ন্ত্রিত হয়। এইখানে মাত্র নারীর সহযোগিতায় সজ্ঘটিত অপকর্ম সম্বন্ধে কয়েকটি মূল বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করবো। [কারণ, উহার মধ্যে যৌন-সম্পর্কিত জটিল মনস্তত্ত্ব আছে।]

আমাদের প্রদমিত যৌন-স্পৃহাকে স্থগার-কোটেড্ কুইনাইন-এর সঙ্গে তুলনা করা চলে। ভিতরে কুইনাইন তথা যৌন-স্পৃহা থাকলেও উহার বহির্দেশে স্থগারের [সভ্যতার] কোটিং থাকাতে উহা অনুভূত হয় না। এই স্থগারের স্তরসমূহ এক-একটি করে অপসারিত হলে ভিতরের যৌন-স্পৃহা [সেক্স এপিটাইট] বাহির হয়ে আসে। কোনও সৎ-নারীর ক্ষেত্রে উহা একদিনে সজ্ঘটিত হয় না। তার পক্ষে বিপথ-গামিনী হতে কিছু সময় ও কার্য-করণের প্রয়োজন হয়। নিম্নোক্ত তালিকা থেকে বক্তব্য বিষয় বুঝা যাবে।

ইহা যেমন উপর থেকে নীচে নেমে আসে, তেমনি উহা নীচে থেকে উপরে উঠে। উপরন্তু উহা ডাইন ও বাম—এই উভয় দিক থেকে এসে কেন্দ্রে মিলিত হয়। বক্তব্য বিষয়টি একটু বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন আছে।

[নারীর দুর্জ্ঞেয় মনের গুহ্যতত্ত্ব না জানলে তাদের চিকিৎসা করা যায় না।

বিপথ- গামিনী নারীকে উদ্ধার করে আনার সঙ্গে আমাদের সকল কর্তব্য শেষ হয় না। উহার দেহ উদ্ধারের সঙ্গে উহার মনকেও উদ্ধার করতে হবে। এই

Evolution of Sexual Love
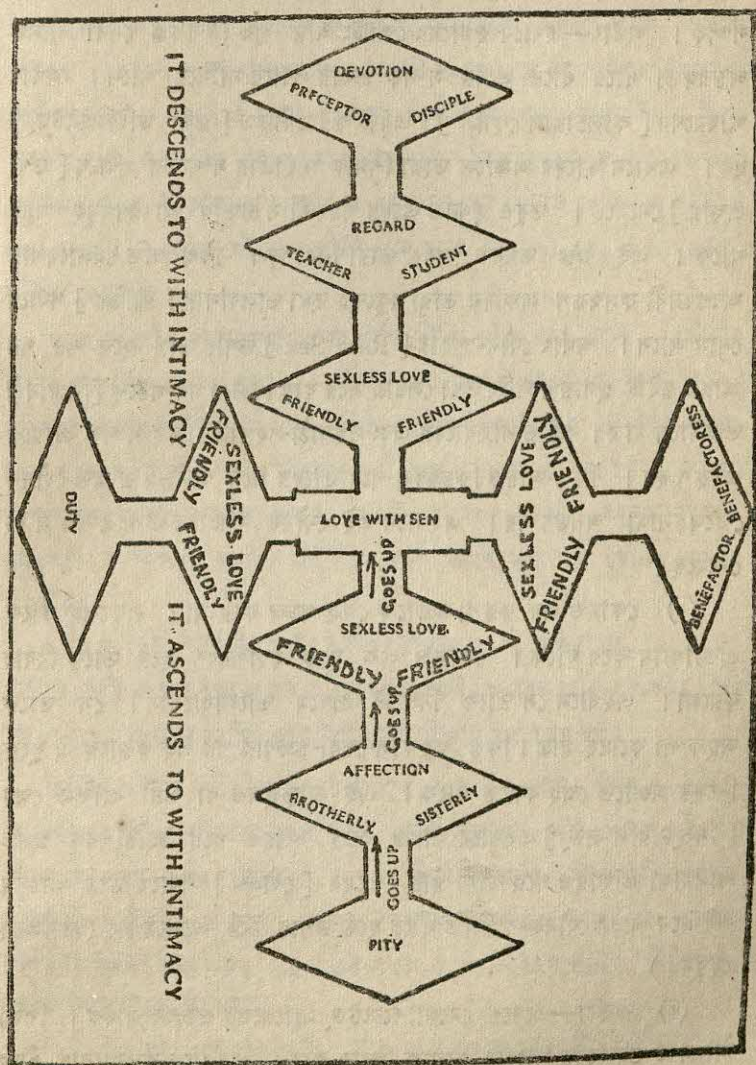
সব বিপত্তির মূল কারণ জানা থাকলে বাক্ প্রয়োগের দ্বারা এদের নিরাময় করে তাদের মুখ হতে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য আদায় করা যাবে।]

নারীকে উদ্ধার করে এনে অপহারকের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করতে তার প্রেমমন্ত্র আকর্ষণের উৎপত্তির মূল কারণ প্রথমে বুঝতে হবে। উপরে উদ্ধৃত চিত্র তথা প্লেট থেকে বক্তব্য বিষয় বুঝা যাবে।

(১) শিষ্যা তার গুরুকে ভক্তি করে থাকে। উহাদের মধ্যে থাকে ভক্তির সম্পর্ক। অর্থাৎ—এখানে সুগারের কোটিং অতি পুরু। কিন্তু সেবা জনিত অন্তরঙ্গতা ধীরে ধীরে এদের সম্পর্ক শ্রদ্ধার পর্যায়ে নামিয়ে আনে। অর্থাৎ আবরণের [কালচারাল কোটিং] একটি স্তর দ্রবীভূত [তথা ডাইলিউটেড্] হয়। এখানে তাদের অজ্ঞাতে তারা শিক্ষক ও ছাত্রীর সম্পর্কের পর্যায়ে [তথা শ্রদ্ধায়] নেমেছে। তবুও তখনও এদের পরবর্তী সভ্যতার আবরণসমূহ অটুট থাকে। এই জন্য তখনও পর্যন্ত তারা নিরাপদ। কিন্তু অতি মেলামেশার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ একদিন তারা বন্ধুত্বের তথা ভালবাসার [প্রীতির] পর্যায়ে নেমে আসে। অর্থাৎ যৌন-স্পৃহার [Raw Sex] উপরি ভাগ হতে পর পর আরও দুইটি সুগার কোটিং তথা লেয়ার সরে যায়। তারা পরস্পরকে [নির্দোষ] ভালবাসে মাত্র। বন্ধু ও বান্ধবীদের এবং সহপাঠী-সহপাঠিনীদের সম্পর্ক প্রারম্ভে এইরূপ হয়। কিন্তু আরও কিছুকাল পরে তাদের পক্ষে স্বামী-স্ত্রীর মত যৌনজ প্রেমে নামা অসম্ভব নয়। এইখানে এই যৌনজ সম্প্রীতি উপর থেকে নীচে নেমেছে।

(২) কোনও এক কুরূপা কন্যাকে কেহ পছন্দ করে না। সকলেই তাকে প্রত্যাখ্যান করে থাকে। কোনও এক যুবক দয়াপরবশ হয়ে তাকে বিবাহ করলো। এইখানে সে তাকে নিশ্চয়ই প্রথমে ভালোবাসেনি। সে তাকে অনুকম্পা করেছে মাত্র। কিন্তু কিছুকাল সেবা-শুশ্রূষার পর এই কন্যাকে ঐ যুবক নিজের অজ্ঞাতে স্নেহ করতে থাকে। এই ভ্রাতৃসুলভ বা ভগ্নী প্রতিম স্নেহ [সিস্টারলি লভ্] এইখানে আরম্ভ হয়। আরও পরে উহারা বন্ধু সুলভ ভালবাসা ও আরও পরে স্বামী-স্ত্রীর প্রেমের [যৌনজ] পর্যায়ে উঠে আসে। এইখানে এদের যৌনজ-সম্প্রীতি নীচে হতে উপরে উঠে এসেছে। (তালিকা দেখুন।)

(৩) কর্তব্য—এদেশে নেগোশিয়েটেড্ ম্যারেজের প্রচলন অধিক। পিতা মাতা ও গুরুজনের আদেশে অনেকে বিবাহ করে। এইখানে কর্তব্যবোধ ধীরে ধীরে তাদেরকে পরস্পরের প্রতি প্রথমে স্নেহপ্রবণ করে ও পরে ভালবাসা আনে। আরও কিছু পরে উহা তাদের যৌনজ প্রেমে ঠেলে দেয়। একত্রে

বসবাস জনিত বাধ্য বাধ্যকতা ও সুযোগের জন্য উহা দ্রুত গতিতে হয়। এখানে তাদের মধ্যে কোনও অল্টারনেটিভ তথা বিকল্পের স্থান নেই। এখানে যৌনজ সম্প্রীতি বাম হতে মধ্যবর্তী কেন্দ্রে এলো [চিত্র দেখুন]।

(৪) কৃতজ্ঞতা—পারিবারিক উপকারী বন্ধুদের প্রতি কন্যাদের একটি দুর্বলতা থাকে। এজন্য তাদেব বহু যৌনজ কু-ব্যবহার পর্যন্ত তারা বরদাস্ত করেছে। কোনও পড়শী যুবক ভ্রাতার চাকুরি সংগ্রহ করে দিলে কিংবা পিতাকে আর্থিক সাহায্য করলে ঐ বাটীর কন্যাদের পক্ষে কৃতজ্ঞ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু উহাকে স্নেহ, ভালবাসা বা প্রেম বলা যায় না। কিন্তু তা সত্বেও এই কৃতজ্ঞতা যথাক্রমে স্নেহে, নির্দোষ ভালবাসায় ও এর কিছু পরে যৌনজ প্রেমে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। এখানে যৌনজ সম্প্রীতি ডান হতে মধ্যবর্তী কেন্দ্রে এসে গেল। [চিত্র দেখুন]

মানুষের যৌন-স্পৃহার আগমনের রীতি-নীতি সম্বন্ধে বলা হলো। এইবার উহার স্বরূপ সম্বন্ধে বলা যাক। এই সকল নারীকে উদ্ধারের পর তারা তাদের দয়িতের বিরুদ্ধে বিবৃতি দেয় না। কিন্তু নারীর অন্তর্নিহিত প্রবণতা সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলে উহাদের সহজে নিরাময় করা সম্ভব। নিরাময়ের পর তারা তাদের অপহারকদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। চিত্রটি পর্যবেক্ষণ করলে বক্তব্য বিষয়টি বুঝা যাবে। কারণ, নারীর সম্প্রীতি নানা ভাবে মধ্যবর্তী যৌনজ কেন্দ্রে আসে।

প্রেম ও যৌনবোধে উৎপত্তির কারণ বোঝার পর ঐ প্রেমবোধ বা যৌন-বোধের শ্রেণী ও রূপ বুঝতে হবে। নিম্নোক্ত চিত্রটি অনুধাবন করিলে বক্তব্য বিষয় বুঝা যায়। এখানে সংশ্লিষ্ট কন্যাটিরই শ্রেণী বিভাগ প্রয়োজন হয়।

ক্রমিক যৌনজ সম্প্রীতির উপরোক্ত মূল তত্ত্বগুলি জানা থাকলে বিপথ-গামিনীদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি আসা উচিত। এই প্রেমজ তত্ত্বগুলি অনুধাবন করার পর নারীদের বিপথগামিনী হওয়ার কারণগুলি সম্বন্ধে আমাদের অবহিত হতে হবে। কারণ, রোগের উৎপত্তির কারণ না জানলে উহার চিকিৎসা করা সম্ভব নয়। এই সকল কারণ ও তৎসম্পর্কিত চিকিৎসা-পদ্ধতি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

(১) উন্মাদনা—কতক কন্যা আছে যারা কেবল মাত্র উগ্র যৌনবোধের কারণে বিপথগামিনী হয়। এই উগ্র যৌনবোধ বহু ক্ষেত্রে তাদের পাগলিনী করে তুলেছে। ঝোঁকের মাথায় বেরিয়ে এসে তারা আর ফিরবার পথ পায়

নি। হঠাৎ প্রতিরোধ-শক্তির হানি ঘটলে এইরূপ হয়ে থাকে। এদের মধ্যে কেহ কেহ যৌনজ রুগিণীতে পর্যবসিত হয়। এই রোগের তাড়নায় নারীরা
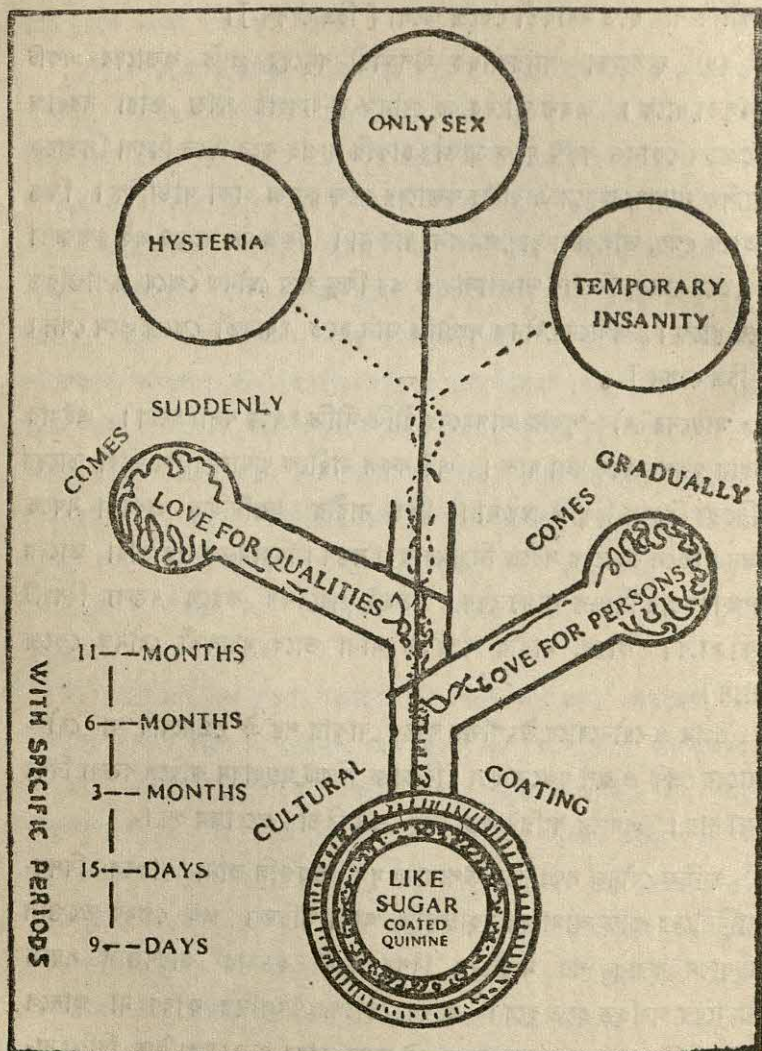
পুং এবং পুরুষরা স্ত্রী সংসর্গের জন্য লালায়িত হয়। কিন্তু ঘটনা ঘটার পর তারা অনুতপ্ত হয় এবং কৃষ্টিগত অসমতা তথা কালচারাল কণ্ট্রাস্ট অনুভব করে। তখন তাদের একে অন্যকে একটুও পছন্দ করে না।

নারীদের যদি বুঝানো যায় যে এই সব বিষয় কাউকে না জানিয়ে তাদের

দূর স্থানে সৎপাত্রস্থ করাহবে, তাহলে এরা তাদের অপহারককে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করে অভিভাবকদের অনুগত হয়ে তাদের ইচ্ছা মত বিবাহাদি করে। সাময়িক উন্মাদনাও বহু নারীর গৃহত্যাগের কারণ হয়েছে। কিন্তু এই যৌন উন্মাদনার উপশম হওয়া মাত্র তারা অনুতাপে জর্জরিত হয়েছে। এমন কি এজন্য তারা অনুশোচনায় আত্মহত্যা পর্যন্ত করেছে। এই সকল নারী তাদের কৃতকর্মের জন্য সদা সর্বদা অনুতপ্ত থাকে। তারা সুযোগ-সুবিধা ও অভয় পাওয়া মাত্র আপন ঘরে ফিরে যেতে ব্যস্ত হয়। এতে এদের যা কিছু বাধা তা লোকলজ্জা এবং ভয় হতে উদ্ভূত। এখানে তাদের ভয় ও লজ্জার উপশম ঘটাতে হবে। তাদের বুঝাতে হবে যে তাদের সসম্মানে পূর্ব সমাজে ফেরা সম্ভব।

বিঃ দ্রঃ—যৌনবোধ অত্যুগ্র হলে এইরূপ উন্মাদনার সৃষ্টি হয়। এজন্য নারীরা রাজ্য পর্যন্ত ত্যাগ করে। সূক্ষ্ম স্নায়ু খুব ক্ষতিগ্রস্ত না হলে এরা হিষ্টিরিয়া রোগীদের মত এদের সুকুমার বৃত্তিগুলি পুরাপুরি হারায় না। [তবে, এই উগ্র যৌন-বোধ ওদের প্রতিরোধ শক্তির কম-বেশি হানি ঘটাতে পারে।] সৎগুণাদির আধারভূত সূক্ষ্ম স্নায়ুর অতি ক্ষতি না হলে এদের মধ্যে লজ্জা-সরম থাকে। এই-জন্য এরা যৌনজ অপকর্মে গোপনতা রক্ষা করে। গোপনীয়তা রক্ষার্থে এরা [পুং বা স্ত্রী] আত্মীয়-স্বজন ও দাস-দাসী নির্বিশেষে নির্বিচারে যৌনজ অপকর্ম করেছে। বহুক্ষেত্রে এরা মিথ্যা-অপবাদের আশ্রয় নিয়েছে। কোনও এক দাসী-মেয়ে সন্তান-সম্ভবা হলে সে মিথ্যা করে বাড়ির ছোট কর্তার নাম বলে দিয়েছিল। উদ্দেশ্য এই যে, 'আমি তো গেছিই। এখন প্রেমাস্পদকে এই ভাবে রক্ষা করি।'

[প্রতিরোধ-শক্তি অপসরণ দ্বারা] আমাদের প্রদমিত আদিম যৌন-স্পৃহা তথা বোধের ক্রমিক কিংবা হঠাৎ উন্মেষের কারণে আমরা স্বভাব, অভ্যাস, মধ্যম ও দৈব-অপরাধীর মত স্বভাব, অভ্যাস, মধ্যম ও দৈব 'বেশ্যা' নারী এবং [পুং] দেখে থাকি। ঠিক সাধারণ অপরাধীদের মত এরাও প্রাথমিক ও [ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন জনিত] প্রকৃত পর্যায়ে বিভক্ত হয়ে থাকে। শুধু তাই নয়। এরা অপরাধীদের মত [যৌন] অপরাধ রোগী এবং [যৌন] নীরোগ অপরাধীতেও বিভক্ত। প্রতিরোধ-শক্তি নির্মূল হলে কিংবা উহার হানি ঘটলে এই উগ্র যৌন-বোধ পুরুষের ক্রিপটোম্যানিয়ার মত নারীর নিমপো-ম্যানিয়া রোগের সৃষ্টি করে। এই রোগগ্রস্তা নারী নির্বিচারে নিয়ত পুরুষ কামনা করে। এরা হিষ্টিরিক হয়ে উঠলে গোপনতা পরিহার করে নির্লজ্জতার

সঙ্গে যে কোনও পুরুষের পিছনে ধাবিত হয়। এদের তখন বলা হয়ে থাকে—পুংশ্চলী নারী। এদের কেউ কেউ কামনা করে যে অমুক পুরুষ তাদের প্রতি অসদ্-ব্যবহার কিংবা কু-অঙ্গ-ভঙ্গি করুক। কিন্তু সেই বিষয়ে প্রত্যাখ্যাত হলে তারা এ বিষয়ে নির্দোষ পুরুষের বিরুদ্ধে যত্র তত্র এই বলে মিথ্যা অভিযোগ করে যে—সেইরূপ কু-ব্যবহার অমুক ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে করেছে। মেয়েদের মধ্যে প্যাসিভ্ ভাব এবং পুরুষদের মধ্যে অ্যাকটিভ ভাব থাকে। এজন্য পুরুষদের এই রোগ এলে তাদের ব্যবহারে বল-প্রয়োগ দেখা যায়। যৌন-স্পৃহার সহিত অপস্পৃহার [শোণিত-স্পৃহার] সংমিশ্রণ হেতু বিবিধ যৌনজ অপরাধের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

(২) হিষ্টিরিয়া—কতক কন্যা আছে যারা এক প্রকার যৌনজ হিষ্টিরিয়া রোগে ভোগে। প্রতিরোধ-শক্তির আধারভূতসূক্ষ্ম স্নায়ু রোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে নিম্নের প্রদমিত যৌন-স্পৃহা তীব্রতর হয়ে বিবিধ চাপা থাকা আদিম বৃত্তির সহিত উপরে উঠে। অন্যান্য হিষ্টিরিয়া রোগীদের কোনও বস্তু বিশেষের উপর ঝোঁক আসে। কিন্তু এদের একটি পুরুষের উপর অহেতুক ঝোঁক পড়ে। কিন্তু ইহাতে ভালবাসা, স্নেহ বা প্রেমের লেশ মাত্র থাকে না। সাধারণতঃ স্বল্প বয়স্ক সৎ কন্যারা স্নায়বিক কারণে এই রোগে অধিক ভোগে। মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম স্নায়ু সাময়িক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এরা প্রায়শঃ [অচেতন মনে] আদিম মানবী সুলভ স্বভাব প্রাপ্ত হয়েছে। ইহারা যে হিষ্টিরিয়া রোগিণী তা নিম্নের কয়টি সিম্পটম্ থেকে বুঝা যায়। এই সময় এরা [আদি মানব সুলভ] অতীন্দ্রিয়তা পর্যন্ত লাভ করে।

(ক) পুরানো চোরদের মত এরা যথাক্রমে অলস, ভাবপ্রবণ, দাম্ভিক এবং নিষ্ঠুর থাকে। কারণ, মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় নিম্নের চাপা-থাকা কিছু আদিম স্বভাব উপরে উঠে। অলস অবস্থায় তারা নেতিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। বহুদিন পর্যন্ত এরা এই অলস অবস্থায় থাকে। আবার পরক্ষণেই ভাবপ্রবণ হয়ে তারা ক্রমাগত কাঁদতে ও বলতে থাকে—'ওগো! তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও। তোমরা আমার কেউ নও' ইত্যাদি। এদের এই সকরুণ অবস্থা দেখে মনে হয় যে এদের ছেড়ে দেওয়াই ভালো। পরক্ষণেই আবার এরা দাম্ভিক হয়ে উঠে নানারূপ দম্ভোক্তি করতে থাকে, যথা : 'আমি বেশ করেছি। আমি তাকে চেয়েছি। তোমরা আমার কিছু করতেপারো না', ইত্যাদি। কখনও আবার তারা তাদের নিষ্ঠুর অবস্থায় উপনীত

হয়। এই সময় তারা অশ্লীল গালিগালাজ করতে থাকে। মাটিতে মাথা ঠুকে রক্তপাত করে। নিজের চুল ছিঁড়ে প্রহাররত হয়। এ সময়ে সুবিধে পেলে এরা বেগে পলায়ন করেছে।

(খ) নৈতিক ও দৈহিক অসাড়তা এদের মধ্যে দেখা যায়। এ সময় এরা নির্লজ্জ ও কষ্টসহিষ্ণু হয়ে উঠে। যে কন্যা কয়দিন পূর্বে কারুর মুখের দিকে চেয়ে কথা বলে নি, সেই কন্যার মুখে গুরুজনদের প্রতি জঘন্য কটু কথা বলতে বাধে না। এরা প্রায় যার তার বিরুদ্ধে কদর্য মিথ্যা অভিযোগ করে থাকে, যথা—'মা আমার ভ্রূণ নষ্ট করেছে। পিতা আমার দ্বারা পাপ ব্যবসা করাতে চান। ভ্রাতা আমাকে তার বন্ধুর লালসাগ্নিতে আহুতি দিতে চায়। আমার দেহের প্রতি মামার লোলুপ দৃষ্টি আছে', ইত্যাদি। যে কেহ তার বিরুদ্ধে যাবে তারই বিরুদ্ধে সে অভিযোগমুখর হবে।

(গ) এদের মন সদা-সর্বদা নিম্নগামী হয়। এরা প্রায়ই সৎ ব্যক্তির প্রতি তাদের প্রেম নিবেদন করে না। প্রায়ই তাদের পান-বিক্রেতা, অসৎ ব্যক্তি ও নিরক্ষরদের প্রতি প্রীতি দেখা যায়। মানুষের আদি বৃত্তি এদের মধ্যে ফিরে আসার জন্যে এইরূপ হয়। মস্তিষ্কের সূক্ষ্মস্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া উহার কারণ।

এই বিশেষ রোগের এক একটি বিশেষ পিরিয়ড আছে। যথা, তিন দিন, নয় দিন, পনেরো দিন, তিন মাস, নয় মাস ইত্যাদি। স্নায়ুর উপর কার্যকরী ঔষধ প্রয়োগে এই পিরিয়ড বা ক্ষণের কাল কমানো সম্ভব। এই নির্ধারিত কাল অতিবাহিত হওয়া মাত্র এরা পুনরায় আত্মস্থ হয়ে উঠে। নিরাময় হওয়া মাত্র তাদেরকে সলজ্জ ও ব্রীড়ানম্র হতে দেখা যায়। এ সময় তারা পরিচিত ব্যক্তিদের মুখের দিকে লজ্জায় চাইতে পারে না। তারা তাদের অপহারকের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠে। এই রূপ রোগিণীকে কিছুকাল [বাপ-মার হেপাজতে কিংবা কোনও উদ্ধার আশ্রমে] আটকে রাখলে সুফল হবে। এই জন্য উদ্ধারের পরেই এদের আদালতে উপস্থিত করা উচিত হবে না। এদের এই ঝোঁক অজানা অচেনা লোকের উপরও আসতে পারে। এই রোগের রিল্যাপ্স্ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই জন্য সংশ্লিষ্ট যুবকের সঙ্গে তার [কিছু কাল] পুনরায় দেখা না হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ, ঐরূপ সন্দর্শন ষ্টিমিউলাস-এর কাজ করে রোগকে ফিরিয়ে আনতে পারে।

(৩) প্রেম—প্রেমজ অপহরণ বা বহিষ্করণ প্রভৃতির তদন্তে প্রথমে এই প্রেমের স্বরূপ বুঝা দরকার। বহু কন্যা মাত্র প্রেম [লভ্]-এর কারণে বিপথ-

গামিনী হয়ে থাকে। উহার উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রবন্ধের প্রথমাংশে বলা হয়েছে। এই প্রেম দুই প্রকারের হয়ে থাকে, যথা—(ক) গুণগত, (খ) ব্যক্তিগত।

(ক) গুণগত—এমন বহু কন্যা দেখা যায় যারা কোনও ব্যক্তিকে ভালোবাসে নি। তারা শুধু তার কয়েকটি গুণকে পছন্দ করেছে। ঐ কন্যা মনে ভেবেছে যে, স্বামী এম্. এ, পাশ, রঙ ফর্সা, দীর্ঘদেহী, বাড়ি ও গাড়ির মালিক, উচ্চ বেতনভোগী ইত্যাদি হবে। মনে মনে সে তার ভবিষ্যৎ দয়িতের দশটি বা বারোটি গুণের বিষয় ভেবে রাখে। এখন কারুর মধ্যে সে উহার ছয়টি গুণ আছে বুঝলে তার দিকে আকৃষ্ট হবে। ইতিমধ্যে অন্য কারুর মধ্যে আরও দুইটি গুণ অধিক আছে বুঝলে সে এই পূর্বের মানুষকে পরিত্যাগ করে পরেরটির জন্য ব্যাকুল হবে। এই ধরনের প্রেম হঠাৎ আসে ও হঠাৎ চলে যায়।

চিকিৎসার্থে এইরূপ কন্যাকে বুঝানো চাই যে, ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা আরও অধিক গুণ-সম্পন্ন ব্যক্তি তাকে বিবাহ করতে ব্যাকুল। কিংবা তাকে বিশ্বাস করাতে হবে যে, ঐ ব্যক্তি ঐ সকল গুণের অধিকারী নয়। সে মিথ্যা বলে তাকে প্রবঞ্চনা করেছে।

বিঃ দ্রঃ—বহু নব-বিবাহিতা স্ত্রীকে তার স্বামীকে বলতে শুনেছি: 'বাঃ তরুণটিতো খুব স্মার্ট। বেশ সুন্দর উনি দেখতো তো। এখানে ওই নববধু তার স্বামীর অপেক্ষা কিছু বেশীগুণ ওর মধ্যে দেখাতে সে ওর প্রশংসামুখর। কিন্তু ওই বধুর মধ্যে প্রতিরোধ-শক্তি [সংজ্ঞা দ্রঃ] থাকাতে নিশ্চয়ই সেই বধু তার স্বামীকে ওর জন্য বাতিল করবে না। কিন্তু তার সঙ্গে অবাধ মেলা-মেশা ও সুযোগ সুবিধা যদি সে পায়, কিংবা মুহুর্মুহু স্বামীর দুর্ব্যবহারে তার মন বিষিয়ে উঠে। সেই ক্ষেত্রে ওই তরুণের সামান্য সহানুভূতি ও সাহায্যে তার পক্ষে স্বামীত্যাগিনী হওয়া সম্ভব। ওই সময় অত্যাচারিতা নারী একটু সহানুভূতির জন্য কাঙ্গাল হয়ে উঠে। ঐ সময় কেউ আশার বাণী শুনালে সে সহজেই অভিভূত হয়ে প্রতিরোধ শক্তি হারায়।

[এই সম্পর্কে 'শালী কমপ্লেক্স' সম্বন্ধে বলা যেতে পারে। বহু বিবাহিত তরুণ বিবাহের পরে ভেবেছে যে এটিকে বিয়ে না করে এর পরের ভগ্নীটিকে বিয়ে করলে ভালো হতো। এখানেও ওই তরুণ তার স্ত্রীর অপেক্ষা আরও বেশী কিছু গুণ তার ওই শালীর মধ্যে দেখে। এই মনস্তত্ত্ব প্রাচীনাদের জানা থাকাতে পিটু পিটি ভগ্নীকে নূতন জামতার সুমুখে প্রথম কয়দিন আসতে দিত না।

(খ) ব্যক্তিগত—ব্যক্তিগত প্রেমে কন্যারা কখনও গুণাগুণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে না। কারণ সে মানুষটাকে ভালবাসে। তার গুণকে সে ভালবাসে না। বহুকাল একত্রে একই গৃহে বসবাস করলে বা পাশাপাশি বাটীতে বর্ধিত হলে ইহার উদ্ভব হয়। এই ব্যক্তিগত প্রেম জাত হতে বহু সময় লাগে এবং ইহা পূর্বোক্ত গুণগত প্রেমের ন্যায় সহজে অপসারিত হয় না।

চিকিৎসার্থে বাক্‌প্রয়োগ দ্বারা ঐ কন্যার মনে হিংসা ও ক্রোধের উদ্রেক করাতে হবে। তাকে বুঝাতে হবে যে, ঐ ব্যক্তি এখন অন্য কন্যাতে অনুরক্ত। এতাবৎ সে তাকে অভিনয় দ্বারা ঠকিয়েছে মাত্র।

এতদ্‌ব্যতিরেকে বালক-বালিকাদের চৌদ্দ হইতে বাইশ [ততোধিক] পর্যন্ত বয়সে যে-কেহ তাদের মনে প্রথম দাগ কাটে [ফার্স্ট ইমপ্রেশন] তার জিত হয়। এই ক্ষেত্রে এক বৃদ্ধের সহিতও যুবকেরা প্রতিযোগিতা করতে অক্ষম হয়। এই বয়স কালে উহারা প্রেমে পড়ে কিংবা রাজনৈতিক অপরাধ করে। অভিজ্ঞতার অভাব এবং ভাবপ্রবণতার আধিক্য এজন্য দায়ী।

কেহ কেহ দ্বৈত ব্যক্তিত্বের কারণে এক সময় একজনকে এবং অন্য সময় অন্য জনকে পছন্দ করে তার প্রতি অনুরক্ত হয়। এই যৌনজ অপরাধ ও উহার চিকিৎসা সম্বন্ধে এই পুস্তকের একটি পৃথক খণ্ডে লিখিত হবে। বর্তমান পরিচ্ছেদে ইহার যৎসামান্য উল্লেখ করা হলো। সৎপ্রেরণা এবং অপরাধ-স্পৃহা কিভাবে এই যৌন-স্পৃহাকে যথাক্রমে নিয়ন্ত্রিত করে এবং কিভাবে এই অপরাধীনীদের চিকিৎসা করা যায়, সেই সকল বিষয় বুঝাবার জন্যে মাত্র এইটুকু বর্তমান পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হলো। এইখানে আমার বক্তব্য এই যে, বিপথগামিনী নারীকে উদ্ধার করে এনে প্রথমে তাদের উপরোক্ত ভাবে শ্রেণী-বিভাগ করা উচিত। কারণ উহাদের রোগের শ্রেণী ও উপশ্রেণী অনুযায়ী তাদের উপর বাক্-প্রয়োগ করে তাদের চিকিৎসার দ্বারা নিরাময় করতে হবে।

উপরোক্ত নিবন্ধে কেবল মাত্র অ-যৌনজ এবং যৌনজ অপকর্মের চিকিৎসা সম্বন্ধে বলা হলো। বয়স্ক পুং ও নারী অপরাধীদের মত কিশোর [জুভেনাইল] অপরাধীদের এবং রাজনৈতিক অপরাধীদের চিকিৎসাও পৃথক পদ্ধতিতে করতে হবে।

কিশোর-অপরাধী শীর্ষক প্রবন্ধে কিশোর অপরাধীদের চিকিৎসা পদ্ধতি এবং অপরাধ-গবেষণা শীর্ষক নিবন্ধে মগজ ধোলাই ও পূর্ণ ধোলাই বিষয় আলোচনাতে রাজনৈতিক অপরাধীদের চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধে বলবো।

প্রেম ব্যক্তিগত বুঝলে সংশ্লিষ্ট কন্যাটির মধ্যে হিংসা আনতে হবে। তাকে বুঝাতে হবে যে ঐ ব্যক্তি অন্য এক বা বহু কন্যার প্রতি আসক্ত। অন্যের সমর্থন দ্বারা বা অলীক পত্রাদি থেকে তা প্রমাণ করতে হবে।

নারীদের মধ্যে হিংসাবোধ অত্যন্ত বেশী। মৃত্যুর পরও তাদের চিতা ভস্মতেও উহা থাকে। নিজেরা তারা কেউ যা ইচ্ছা তা করুক না কেন, তারা কিছুতেই স্বামীর ভাগ অন্য কাউকে দেবে না। এই হিংসা আসা মাত্র সহিংস্র [ফেরোসাস] হয়ে ঐ ব্যক্তির ভীষণ ক্ষতি করতেও তখন তারা প্রস্তুত।

[কোনও এক স্ত্রী গৃহত্যাগ করলে তার স্বামী বহু মকর্দ্দমা করেও তাকে আনতে পারেন নি। বার বৎসর পর উনি ষাট বৎসর বয়সে এক চতুর্দশীকে বিবাহ করে গৃহে আনেন। ওই সংবাদ পাওয়া মাত্র ওই স্ত্রী পতিগৃহে হঠাৎ উদয় হলেন। এক্ষেত্রে জিজ্ঞাসিত হলে ঐ নারী বলেছিল: এতোদিন উনি আমাকে চেয়েছিলেন বলে আমি আসি নি। কিন্তু এখন উনি আমাকে চান না বলে আমি এসেছি।

ওদিকে ওই বালিকাকে ওই প্রৌঢ়কে বিবাহের কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলেছিল: গৌরী কি শিবকে বিয়ে করে ছিল তার বাঘছাল, বৃদ্ধ বয়স বা জটাজুট দেখে। তিনি মহাযোগী জ্ঞান তপস্বী বলে তাকে উনি বিয়ে করে ছিলেন। এটি একটি ধর্মীয় সংস্কার ও বিশ্বাস-উদ্ভুত মগজ ধোলাই-এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।]

প্রেম গুণগত বুঝলে সংশ্লিষ্ট কন্যাকে বুঝাতে হবে যে ওর চাইতে বেশী গুণসম্পন্ন পাত্রের সহিত তার বিবাহ দেওয়া হবে। কিংবা কার্যকারণ অলীক প্রমাণ দ্বারা তাকে বিশ্বাস করাতে হবে যে সে তাকে ঠকিয়েছে। ওই সকল বড় বড় গুণের একটিও তার মধ্যে নেই।

উপরোক্ত চিকিৎসা তাকে উদর পূর্তি করে খাওয়ানোর [রসগোল্লাদি] পর করা উচিৎ। জিজ্ঞাসাবাদ দ্বারা অপরাধীদের স্বীকারোক্তিও ঐভাবে খাওয়ানোর পর করাহয়ে থাকে। উদর পূর্তি হলে মস্তিষ্ক হতে রক্ত নেমে উদরকে পরিচালিত করে। সেই অবস্থায় মস্তিষ্ক বাক্ প্রয়োগশীল ও উহা অত্যন্ত হাল্কা থাকে। সেই অবস্থায় পুনঃপুনঃ সাজেসসন দ্বারা তাকে স্বমতে আনা সম্ভব। কারণ তখন সে যা কিছু শোনে তা সে বিশ্বাস করে থাকে। বিবাহিত নারীরা সহজাত বৃত্তিদ্বারা এই পন্থা সম্পর্কে বুঝে। তাই তারা স্বামীর নিকট কিছু বাগাতে হলে বা আব্দার করতে হলে তা খাওয়ানোর পরে তারা তা করে।

বিঃ দ্রঃ রতিকালে মাত্র পুরুষের সুখ ও তৃপ্তি। কিন্তু নারীকে উহার স্মৃতিও তৃপ্ত করে। অনুরূপ ভাবে—বহু বৎসর পরও ভুরি ভোজের বিষয় লোকের মনে থাকে। অতীতে বহু দুরূহ কার্যোদ্ধার ও পলিশি নির্ধারণ ডিনার টেবিলে সমাধা হয়েছে।

হিষ্টিরিয়া রোগিনীদের অবশ্য ওই ক্ষেত্রে রোগের পিরিয়ড তথা ক্ষণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আটক রাখার রীতি। ঔষধ প্রয়োগে বা বাক প্রয়োগে ওই পিরিয়ড্ কমানো সম্ভব হয়। এই রোগে স্বল্প বয়স্কা অজ্ঞ বালিকারাই বেশী ভোগে। তাই কলেজের মেয়ে অপেক্ষা স্কুলের মেয়েরা এর বেশী শিকার হয়।

উগ্রযৌনবোধের কারণে উহা ঘটলে উদ্ধারের পর তাকে বুঝাতে হবে যে তাকে সসম্মানে পূর্ব সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা হবে। কাউকে কিছু না বলে দূর স্থানে বিবাহ দেওয়া হবে। এখানে 'কেউ জানবে না' এইটেই মুখ্য বিষয়। ঐ সম্পর্কীত ভীতি দূর করলেই এরা নিরাময় হয়। ঝোঁকের বশে বাইরে বেরিয়েই এরা কৃষ্টিগত অসমতা [কালচারাল কন্ট্রাক্ট] অনুভব করে কষ্ট পায়। ফিরতে ব্যগ্র হলেও ভয়ে তারা তা পারে না।

বিভিন্ন শ্রেণীর বিপথগামিনীদের চিকিৎসা বিভিন্ন প্রকারের হয়। এজন্য প্রথমে তদন্তাদি ও প্রশ্নোত্তর দ্বারা তাদের শ্রেণী বিভাগ বুঝতে হবে। তৎসহ তাদের সম্পর্কের ও আকর্ষণের স্বরূপ প্রভৃতিও বুঝতে হবে। তৎপূর্বে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট হতে তাকে সরিয়ে তাদের সাক্ষাৎ বন্ধ করতে হবে। উহা ষ্টিউমিলাস রূপে ওই রোগের পুনরাবির্ভাব [রিল্যাপ্স] ঘটাতে পারে।

দৈহিক ও মানসিক যৌন প্রেম ও রোগ ও হিষ্টিয়ার চিকিৎসার ব্যবহারিক পদ্ধতি দৃষ্টান্ত সহ পুস্তকের পরবর্তী খণ্ডে বিস্তারিত রূপে বিবৃত করা হয়েছে।

যৌন-বোধের ও প্রেম বোধের ঘনত্ব স্থায়িত্ব-ক্ষণ, কম বেশী উগ্রতা এবং পরিমাণ ও পরিমাপ আছে। [টাইম-স্পেশ ও ইন্‌টেনসিটি]

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর প্রেম-বোধ [ভালবাসা] ও যৌন-বোধ পরিমাপে বেশী হলেও উহা মনোদেশে ছড়িয়ে থাকায় তীব্র হয় না। তাই উহার গভীরতা ঠিকভাবে বুঝা যায় না। অন্যদিকে—উপপতির প্রতি আকর্ষণ যৎসামান্য হলেও উহা একীভূত তথা কনসেনট্রেটেড্ হওয়ায় উহা সাময়িক ক্ষণে তীব্র অনুভূত হয়। তাই উপপতির মৃত্যুতে সংশ্লিষ্ট নারীর বেদনা নেই। কিন্তু স্বামীর সামান্য ব্যাধিতে তারা উতলা হয়। পতি ও উপপতির মধ্যে বিরোধে তারা

তাই স্বামীর পক্ষে থাকে। বিবাহের পরদিনই তারা পূর্ব সম্পর্ক ভুলে পতি গৃহের পক্ষে পিতৃগৃহের সহিত কলহে লিপ্ত হয়।

বিঃ দ্রঃ—তবে দিদিমণি ও মা-মণিদের বুঝা উচিৎ যে স্বামীর বংশের ধারার প্রতি তাদের অঢেল কর্তব্য রয়েছে। কুমারীদের বিবাহের পর প্রথম মধু রাত্রির আনন্দ ও উচ্ছাস হতে বঞ্চিত হওয়া অনুচিত। তাদের দেহ মন একমাত্র ভবিষ্যৎ স্বামীদেরই প্রাপ্য।

[যৌন পরিতৃপ্তি তথা স্যাটিস-ফ্যাকসন এবং যৌন উপশম তথা সাবলি-মেশন এক বস্তু নয়। পাশ্চাত্য দেশে বান্ধবীদের সহিত সংলাপ ও বল-ডান্স প্রভৃতি দ্বারা এবং এদেশে শ্যালিকা, বৌদি ও ঠাকুমার সহিত ঠাট্টার সম্পর্ক অবচেতন মনে নির্দোষ কৃত্রিম যৌন-উপশম ঘটিয়ে মানুষকে নিউরেটিক না করে সুস্থ মনা ও স্বাভাবিক রাখে। মানুষ প্রথমটিতে শেষ বেশ গ্লানি ও পরেরটিতে বিমলানন্দ পায়। যৌন পরিতৃপ্তি তীব্র হলেও অত্যন্ত ক্ষণিক ও সাময়িক। তাই ওই সঙ্গে প্রেম না থাকলে নর নারীর আকর্ষণ জন্তুদের মত অস্থায়ী হতো।

বালক বালিকার যৌন সম্পর্ক হঠাৎ দেখলে বা বুঝলে নির্বাক ধ্বনিতে [গলা-খাঁকরানী] তাদের সংযত করুন। কিন্তু আপনি যে তা জেনেছেন তা তাদেরকে বুঝতে দেবেন না। ওতে তারা বেপেরোয়া বা ফেরোসাস হতে পারে। তারা তাতে মন মরা হবে বা আত্মহত্যা করবে। ওই সাময়িক ঘটনাতে তারা অন্য বিষয়ে উৎসাহ হারাবে। আপনাদের পারস্পরিক সম্পর্কও বহুকাল স্বাভাবিক থাকবে না।

ওই ক্ষেত্রে কৌশলে উহার পুনরাবৃত্তি বন্ধ করুন। বহিরাগত জনকে কোল্ড রিশেপসন দিন। ওদের একজনকে কৌশলে অন্যত্র সরিয়ে দিন।

[এরা অপকর্ম সমূহে লজ্জা পায়। পরে তারা ওরূপ কাজ করবে না। বাধা পাওয়া মাত্র নিজেদেরকে সংযত করবে। তজ্জন্য তারা অনুতপ্ত হচ্ছে।]

বহু কিশোর কিশোরী যৌন সম্পর্কটিকে একটা ক্রীড়ার মত মনে করে। ওর বিষময় ফলাফল ও বিপদ সম্বন্ধে ওরা অজ্ঞ থাকে। এজন্য কিছুটা যৌন জ্ঞান ওদের প্রদান বিধেয় কিনা বিবেচ্য। যা ওরা এর ওর কাছে শিখবেই তার ফলাফল সম্বন্ধে তাদের সামান্য জ্ঞান থাকা ভালো।

বিঃ দ্রঃ—কন্যাদের চৌদ্দ হতে বিশ বৎসর পর্যন্ত একটি বিপজ্জনক বয়স। ওই বয়সে যে তার মনে প্রথম দাগ কাটবে সেই ব্যক্তি প্রৌঢ় হলেও তাদের

জিত হয়। বহু প্রৌঢ় বয়সের সুযোগে অভিভাবকদের দৃষ্টি এড়িয়ে ওদের মনে প্রথম দাগ কেটে ওদের বিপথে এনেছে। কৃত্রিম উপায়েও যৌনস্পৃহা জাগানো সম্ভব। [পৃঃ ২৩৬ শেষাংশ দ্রঃ]

রজস্বলা কালে কন্যারা উত্তেজিত থাকায় মিথ্যা বলে ও অপরাধ করে। অনুরূপ ভাবে মস্তকে আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তি নিজের বিরুদ্ধেও মিথ্যা বিবৃতি দিয়েছে। যৌন কারণে বিপদে পড়লে কোনও নারী তার প্রেমাস্পদের লজ্জা ঢাকতে নির্দোষী ব্যক্তিদের দায়ী করেছে। কিন্তু এটি ব্ল্যাকমেলিঙ নয়। কোনও মনোরোগী নারী কোনও পুরুষের নিকট যা কামনা করে ওইরূপ ব্যবহার ওই পুরুষ তার প্রতি না করলে সে অপমানিতা মনে করে। সেই ক্ষেত্রে বহু মনোরোগী নারী মিথ্যা করে বলে যে ওই পুরুষই তার প্রতি ওই ব্যবহার করেছে। [এটি অবশ্য এক প্রকার মনোরোগ] ঐ সম্পর্কে দুইটি দৃষ্টান্ত নিম্নে উদ্ধৃত করা হল।

"কোনও এক তরুণ তার বাটির বিপরীত দিকের বাটির একটি কক্ষে জনৈকা নারীকে তার প্রতি বিশৃঙ্খল আচরণ করতে দেখে বিরক্ত হয়ে তার ঘরের জানলাটির কপাট বন্ধ করে দেয়। এতে ঐ নারী অপমানিত বোধ করে; তার স্বামী বাটি ফিরলে ওই তরুণই তার প্রতি ওইরূপ আচরণ করেছে বলে মিথ্যা অভিযোগ করেছিল।"

"জনৈক তরুণ এক পড়শী রুগ্না বালিকার প্রতি স্নেহবশতঃ তার স্বাস্থ্য উদ্ধারে তাকে কয়েক সন্ধ্যায় গঙ্গার ধারে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিল। কয় দিন পর হঠাৎ ঐ বালিকা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলেছিল: হুঁম। আপনি আমাকে কি করেছেন [যাদু ?] এতে ভীত হয়ে ঐ তরুণ আর একদিনও ওই বালিকার বাটিতে যায় নি।"

এই সব ক্ষেত্রে চিকিৎসার্থে প্রথমে বুঝতে হবে যে উহা মাত্র যৌন তাড়না কিংবা প্রেমজ বিষয়। সেই সঙ্গে ওই বালিকা স্বাভাবিক কিংবা রোগিনী তা'ও বুঝতে হবে।

[আইন যৌনজ অপরাধে মাত্র নারীকে রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছে। সহযোগীর অপরাধে নারীও সমান দায়ী হলেও তাতে মাত্র এ্যাকটিভ এজেণ্ট পুরুষটিকেই দায়ী করা হয়। সেক্ষেত্রে নারী প্যাসিভ এজেণ্ট রূপে মামলার মাত্র এক্সিবিট তথা প্রদর্শনী দ্রব্য। কোনও নাবালিকা বালিকার সহিত সম্পর্ক স্থাপন পুরুষ মাত্রকে পরিহার করতে হবে।]

পুরুষের বহু পত্নীত্ব ক্ষতিকর নয়। কিন্তু নারীর বহু পতিত্ব [গ্রীষ্মপ্রধান দেশে] বন্ধ্যাত্ব আনে। তাই শীতপ্রধান দেশঅপেক্ষা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সতীত্বের বেশী কড়াকড়ি। উপরন্তু নারীরা জাতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক]।

যৌনজ অপরাধ দুই প্রকারের হয়ে থাকে, যথা (১) নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে (২) নারীর সহযোগিতায়। প্রথমটির জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষের অসাবধানতা ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও প্রশাসন দায়ী। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় বহির্গত নারীকে উদ্ধার করে তার মনকেও উদ্ধার করতে হবে। উপরোক্ত পন্থায় চিকিৎসা দ্বারা তা করা সম্ভব।

কোনও কন্যার পূর্ব অভ্যাস হঠাৎ বদলালে অভিভাবকদের তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। নিম্নোক্ত আচরণগুলি ওদের মধ্যে দেখা গেলে সাবধান হতে হবে।

(১) পদশব্দ শোনা মাত্র উদগ্রীবতা (২) জানালা ও ছাদে [পুনঃ পুনঃ] গমন (২) রাত্রে স্বল্পাহার বা অনাহার (৪) বেপরোয়া ভাব ও মধ্যে মধ্যে কান্না (৫) বিদায়ের পর বারান্দায় ছুটা (৬) ছুটে টেলিফোন ধরা। হাঁ হুঁ ও আচ্ছা বলা। কেউ এলে চুপ করা (৭) অরুচি উদাস দৃষ্টি চিন্তা উদ্বিগ্নতা ও অনিদ্রা (৮) ঝি এর সহিত গোপন পরামর্শ (৯) কোনও কিছু লুকানোর চেষ্টা (১০) হঠাৎ ব্যস্তভাবে বাইরে যাওয়া (১১) বিশেষ দিনে অতি প্রসাধন (১২) কাউকে [সর্ব সমক্ষে] এড়ানোর চেষ্টা কিন্তু তাকে দেখলে খুশী হওয়া। (১৩) বাইরে থেকে উপহারাদি আনা (১৪) তার বিপর্যস্ত পরিধেয় বস্ত্রাদি। (১৫) হঠাৎ উৎফুল্ল ভাব এবং স্থূল বা শীর্ণ হওয়া। (১৬) বাইরে পড়তে যাওয়া [একাকী] ও বেশী রাত্রে বাড়ী ফেরা।

উপরোক্ত লক্ষণের সহিত পূর্ব রাগের প্রভেদ আছে। পূর্ব রাগের মধ্যে তাড়াহুড়া থাকে না। ওতে সম্মান, নীতিবোধ ও পবিত্রতা থাকে। ওখানে প্রতিরোধ শক্তির বিলুপ্তির প্রশ্ন নেই।

[পুত্র কন্যাদের যৌনবোধ পুরাপুরি নির্মূল করা উচিত নয়। অন্য খাতে তারা বিবাহিত জীবনে সুখী হবে না।]

কোনও বিপদ ঘটে গেলে ভর্ৎসনা না করে সান্ত্বনা দেওয়া উচিত। একটি জীবন গেলে ক্ষতি নেই। ভবিষ্যতে বহু জীবন আসবে। মূত্র পরীক্ষায় পজিটিভ বা নেগেটিভ বুঝা যায়। পারিবারিক সম্মান সর্বাগ্রে। তাই গোপনীয়তার প্রয়োজন আছে। ওদের দত্তকও বহু লোক নেয়। সম্ভব হলে

ওদের বিবাহ দেওয়াই ভালো। অধুনা জাতি শ্রেণীর প্রশ্ন অবান্তর। ওরা অসুখী হয় তো হোক। ওদের কর্মফল ওরাই ভোগ করবে। নয়ত তার অন্যত্র বিবাহ দিন।

গবেষক ছাত্রদের উল্টাউল্টি প্রবৃত্তিগুলির একটি তালিকা করা উচিত। বাপ কন্যাকে ও মা পুত্রকে বেশী ভালবাসে। প্রতিরোধ শক্তি ও বাস্তববোধ এর ব্যতিক্রম ঘটায়। যৌনজ ক্ষেত্রে—কালো লোকদের [স্ত্রী বা পুরুষ] ফর্সা লোকদের প্রতি এবং যারা ফর্সা তাদের কালোর প্রতি ঝোঁক থাকে। [কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে তা নয়।] তবে বৃদ্ধরা কিছুটা শিশু মনোভাবী হওয়ায় শিশুদের মত তাদের এ বিষয়ে ভেদাভেদ নেই।

কিছু মনোভাবী ব্যক্তির রূপবতী ও গুণবতী পত্নীদের প্রতি মাতৃভাব আসাতে কামনা থাকে না। এতে তারা কুরূপা নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষাহীন নারীদের প্রতি আসক্ত হয়। কিন্তু বিবাহিত পত্নী মলিন বেশী হয়ে ও শিক্ষাভিমান বর্জিত হয়ে পতির নিকট এলে তার প্রতি তার পতির যৌনজঝোঁক ফেরে। [ভালবাসা ও কামনা এক বস্তু নয়] কটুউক্তিকারী ও কলহপ্রিয় স্ত্রীর প্রতি কেউ কেউ বেশী যৌনাগ্রহী। মারামারি ও কলহের পর ওদের পারস্পরিক যৌনাগ্রহ বাড়ে। (f) সভ্য মনোভাবী পতিরা অবশ্য স্ত্রীর সাজগোজ ও রূপে মুগ্ধ হয়। বহুজন শুধু গান শুনতে পতিতালয়ে যায়। ওরূপ মনোভাবী পতিদের চতুর স্ত্রীরা গুণে ও সেবায় বশ করে। [যৌনবোধ অচেতন মন হতে উপরে আসে।]

[দৈহিক ইমপোটেন্সীর মত মানসিক ইমপোটেন্সিও আছে। এক নারীর পক্ষে যে ইমপোটেণ্ট অন্য নারীর পক্ষে সে তা নয়।]

পতিদের প্রকৃতি বুঝে পত্নীদের তাদেরকে বশ করতে বা বাগে আনতে হবে। এখানে অভিমান নিরর্থক। কিছু পেতে হলে তাকে জয় করে নিতে হয়। ক্ষেত্র মত উপযুক্ত ব্যবস্থা দ্বারা পত্নীরা পতিদের নিরাময় করে। আগ্রহ বাড়াতে মধ্যে মধ্যে অনীহাও দরকার। এজন্য পূর্বে এদেশে বধূদের বৎসরে কিছু কাল পিত্রালয়ে গমনের রীতি ছিল। ঐ সময় তারা পূর্বের সহজ জীবন ও স্বাধীনতা ফিরে পেতো।

[উপরোক্ত তথ্যগুলি অবচেতন মনে কার্যকরী। কারণ—অবেচতন মনে প্রতিরোধ শক্তি 'আদি মানুষদের' ও শিশুদের মত কম থাকে। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্তদের চেতন মনে প্রতিরোধ শক্তি বেশী থাকায় ওই রূপ ভাব প্রশ্রয়

পায় না। কিন্তু চেতন মনে প্রতিরোধ শক্তি কম হলে ওইগুলি প্রকট হয়। তবে স্বাভাবিক রীতিতে ব্যক্তিত্বের অদল বদলে পরে ওগুলি হতে মানুষ বিনা চিকিৎসায়ও মুক্ত হয়।]

বিঃ দ্রঃ—কোনও আদি মনোভাবী কৃষক বধূ আমার নিকট এইরূপ এক উক্তি করেছিল : তা বাবু! সোয়ামী আমাকে মারুক। না মারলে উনি আমাকে ভালবাসেন কিনা তা আমি বুঝবো কি করে? ইহা আদি মানবের বলে নারী সংগ্রহের স্মৃতিবহ। সেইদিনকার পীড়ন সওয়া'র অভ্যাস কারও কারও মধ্যে থাকে। কষ্ট-কেন্দ্র ত্বকে কম থাকায় এদের কষ্টবোধ কম। তাই দৈহিক পীড়ন এদের মধ্যে পুলক আনে। 'আমার স্বামী আমাকে মেরেছে : তা তোরা এতে আসিস কেন? এরূপ বাক্যও ওদের কেউ কেউ বলে থাকে। দেহের সহিত মনের নিকট সম্বন্ধ ও উহাদের সমান্তরালে থাকা উহা প্রমাণ করে। অবশ্য কিছু ক্ষেত্রে মন দেহ হতে এগিয়ে বা পিছিয়ে থাকতে পারে।

বিবাহিত নর-নারীর দৈহিক অসুবিধা থাকলে চিকিৎসা করানো উচিত। সামান্য ঔষধ প্রয়োগ ও সার্জ্জারী দ্বারা বহু যৌনজ অসুবিধা দূর হয়। এই ক্ষেত্রে কোনও সমীহ বা লজ্জা করা অবান্তর। ওতে স্ত্রী পুরুষের পারস্পরিক সাহায্যেরও প্রয়োজন আছে। [যৌন বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু এই পুস্তকের আলোচ্য নয়।] দুঃখ কষ্ট ভুলতে বা অন্য সুখ শান্তি পেতেও বহু ব্যক্তি যৌনজ ও অ-যৌনজ অপরাধ করে।

অপস্পৃহার মত যৌনস্পৃহাও নিষ্কাশন করে সুস্থ থাকা যায়। য়ুরোপে বলড্যান্স ও স্ত্রী পুরুষের মেলামেশা ও ভারতে বৌদি শালী আদির সহিত ঠাট্টার সম্পর্ক উহার সহায়।

যৌন সম্ভোগ [সেক্স স্যাটিশফ্যাকশন] ও যৌন-উপসম [সেক্স সাবলিমেশন] পৃথক বস্তু। উত্তেজনা শেষে প্রথমটিতে গ্লানি, কিন্তু দ্বিতীয়টিতে শান্তি থাকে। এখানে যৌনস্পৃহা নির্দোষ পথে বার হয়। প্রেম যৌন সঙ্গমের মধ্যবর্তী ক্ষণগুলি পূর্ণ রাখে। তাই পরবর্তী ক্ষণগুলিতে আকর্ষণ ক্ষুণ্ণ হয় না।

শক্যদোষ [Incest] সকল দেশেই ঘৃণ্য কার্য। পরিবারের আত্মজ স্ত্রী-পুরুষের কিংবা ভ্রাতা-ভগ্নীর যৌন মিলন শক্য দোষ। পৃথিবীর সকল সমাজে উহা অপরাধ অপেক্ষা গর্হিত।

বিঃ দ্র—পৃথিবীতে তিনটি বস্তুর অস্তিত্ব নেই, যথা ভূত ভগবান ভালবাসা। অন্ততঃ প্রমাণের অভাবে অজও এগুলি প্রহেলিকা। সাধ্বী স্ত্রী স্বামীকে অন্য

নারীর প্রতি অনুরক্ত দেখলে ক্ষিপ্ত হয়। এখানে সে স্বামীর সুখে সুখী নয়। তাহলে স্বার্থহীন প্রেমের অস্তিত্ব কোথায়। (f)

[বিবাহভীরু ব্যক্তিরা সমভাবে যৌনজ ও অযৌনজ অপরাধী কিংবা হিষ্টিক বা নিউরিটিক হতে পারে। কোনও এক জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী সারা দুপুর গৃহে পদচরণ করতো ও মধ্যে মধ্যে কুঁজোর জল মাথায় ঢালতো। কোনও এক যৌনস্পৃহী ধর্মভীরু কন্যা স্বীকার করেছিল : যে সে চায় যে কেউ তাকে হরণ করে বিবাহ করুক। এরূপ ক্ষেত্রে নিরাময়ার্থে প্রতিরোধ শক্তি বাড়ানো প্রয়োজন। উহার হানি ঘটলে বহু অঘটন ঘটা সম্ভব।

॥ চতুর্দশ অধ্যায় ॥

কিশোর-অপরাধী

কিছু অপরাধী কিশোর বয়সে অপরাধী হয়ে বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত বয়স্ক অপরাধী হয়। কিছু অপরাধী কিশোর বয়সে নিরপরাধী থেকেছে। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্তির পর বিবিধ কারণে তারা বয়স্ক অপরাধী হয়েছে।

কিশোর অপরাধীদের ইংরাজীতে বলা হয় জুভেনাইল ক্রিমিন্যাল। কৈশোর কদাচারকে জুভেনাইল ডেলিঙ্কোয়েন্সী বলা হয়। কিশোর অপরাধীদের সহিত বয়স্ক-অপরাধীদের কোনও মৌলিক প্রভেদ নেই। একই অপরাধ-স্পৃহা দ্বারা উভয়েই পরিচালিত। উহাদের যা কিছু প্রভেদ তা আইনগত ব্যাখ্যার উপর। আইনতঃ অপরাধীদের তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, যথা— (১) শিশু-অপরাধী। (২) কিশোর-অপরাধী। এবং (৩) বয়স্ক-অপরাধী।

কিশোর এবং শিশু-অপরাধীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পৃথিবীব্যাপী এক সমস্যা সৃষ্টি করেছে। এজন্য প্রতিটি দেশে রাষ্ট্রীয় গবেষণাগারে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ বিষয়ে গবেষণা হচ্ছে। কিশোর ও শিশু-অপরাধী সম্পর্কিত জ্ঞান চর্চার বৃদ্ধি হেতু উহা এক্ষণে ডেলিঙ্কোয়েন্ট সায়েন্স নামে মূল অপরাধ-বিজ্ঞান বহির্ভূত একটি পৃথক বিজ্ঞানে পরিণত।

(f) ভালবাসা মাতা, ভগ্নী, বান্ধবী ও স্ত্রীর বা যার প্রতি থাক না কেন, উহাতে বিষয়বস্তু থাকে একই। প্রভেদ যা কিছু তা উহার গুরুত্বে [degree] রয়েছে।

পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত অপরাধী 'শিশু অপরাধী'। পাঁচ হতে আঠারো বৎসর বয়স্ক বালক 'কিশোর অপরাধী'; এবং তদূর্ধ বয়স্ক অপরাধী 'বয়স্ক-অপরাধী'। কিন্তু, শিশু-অপরাধী থেকে কিশোর-অপরাধী—এবং কিশোর-অপরাধী থেকে বয়স্ক-অপরাধী হওয়া সম্ভব। কারণ, ওদের পরস্পরের মধ্যে অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ আছে। শিশুদের মস্তিষ্ক অপরিণত থাকে। ওদের প্রয়োজনীয় দৈহিক শক্তি নেই। ওদের অঙ্গাদির মোটর নার্ভ সুগঠিত নয়। এ জন্য তারা সুষ্ঠুরূপে অপকর্ম করতে অক্ষম। [বিকৃত মস্তিষ্ক উন্মাদকেও অপরাধী বলা হয় না।] শিশুদের ভালো মন্দ, উচিত অনুচিত সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান নেই। কিন্তু, কিশোর-অপরাধীরা বিচার-বুদ্ধি হীন নয়। এজন্য ওরা আইনতঃ অপরাধী। স্বল্প বয়সের জন্য শুধরোবার সময় ও সুযোগ ওদের দেওয়া উচিত। আঠারো বৎসর বয়ঃক্রমের পর মস্তিষ্ক সুগঠিত হয়। রাষ্ট্রীয় আইন প্রণেতাদের সম্ভবতঃ ইহাই বিশ্বাস। তাঁদের মতে আঠারো বৎসরের পরবর্তী বয়স্ক ব্যক্তি বয়স্ক-অপরাধী।

[সমাজ শিশুকৃত অপরাধের জন্য তাদের অভিভাবকদের দায়ী করলেও রাষ্ট্রীয় বিধিতে তজ্জন্য তাঁদের কোনও শাস্তির ব্যবস্থা নেই। মাত্র রেলওয়ে অ্যাক্টে কোনও শিশু চলন্ত বাষ্পীয় শকটে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করলে তজ্জন্য ওদের পিতামাতা দণ্ডিত হন।]

কিশোর-অপরাধী এবং শিশু অপরাধীদের আইনী সংজ্ঞার সহিত ওদের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞার যথেষ্ট প্রভেদ আছে। আইনতঃ বাৎসরিক বয়স অনুযায়ী কেহ কিশোর-অপরাধী কি না তা স্থিরীকৃত হয়। তাদের মানসিক অবস্থা, চিত্তচাঞ্চল্যের ক্রম, জৈব ও যৌন বোধ, দৈহিক বর্ধন, আভ্যন্তরিক পুষ্টি প্রভৃতি সম্বন্ধে আইন উদাসীন। কোনও কিশোর অপরাধী আইনের চক্ষে বালক বা বালিকা হতে পারে, কিন্তু তাদের বুদ্ধিমত্তা, দৈহিক বর্ধন, আভ্যন্তরিক পুষ্টি ও ব্যবহারাদিতে তারা প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি। বহু অষ্টাদশ বর্ষীয় কিশোর অত্যন্ত বলবান ও দুর্দান্ত হয়। অন্য দিকে—ঐ বয়সের বহু বালিকা, বালকদের অপেক্ষা সমস্যাসঙ্কুল হয়েছে। কিশোর-অপরাধী বলতে অবশ্য কিশোরীদেরও বুঝায়। বালক ও বালিকা উভয়েই আইনের চক্ষে সমান।

[চিকিৎসকগণ এক্স-রে দ্বারা অস্থি পরীক্ষা করে কিশোর-অপরাধীদের বয়ঃসীমা নির্ধারণ করেন। পুলিশ ওদের বগল ও যৌন দেশের কেশ পরীক্ষা করে বোঝেন যে ওরা সাবালক কি না। বার্থ সার্টিফিকেট হরস্কোপ ইত্যাদি থেকেও কিশোর-অপরাধীদের বয়স নিরূপিত হয়।]

বালক ও বালিকাদের আকৃতি প্রকৃতির মধ্যে যেমন পার্থক্য, তেমনি তাদের অপরাধী হওয়ার রীতি-নীতিতেও প্রভেদ বহু। কিশোররা একত্রে দলবদ্ধ হয়ে অপরাধ কদাচিৎ করেছে। সাধারণতঃ তারা একাকী অপরাধ করে। দলবদ্ধ হয়ে কাজ করলেও বালক ও বালিকাদের দলগুলি পৃথক হয়। কিশোর-কিশোরীদের মিশ্রদল কদাচিৎ দেখা গিয়েছে। বালিকা অপরাধীদের সংখ্যা সকল দেশেই কম। সাধারণতঃ ছয় জন অপরাধীদের মধ্যে অনুক্রমিক ক্রম মত পাঁচ জন বালক ও একজন বালিকা থাকে। বালক অপরাধীদের গ্যাঙ্গের অস্তিত্ব সকল দেশেই আছে। বস্তিবাসী [slum] বালকদের সহিত সঙ্গতি সম্পন্ন পরিবারের বালকরাও এতে যোগ দেয়। কয়েকজন বালিকা [য়ুরোপীয় দেশগুলিতে] এদের সঙ্গে থাকে বটে। কিন্তু তারা বালকদের তাঁবেদার রূপে সেখানে কাজ করে। বহু বালকের সঙ্গে তাদের যৌন সম্পর্কও থাকে। ওদেশে অবশ্য বালিকাদের নিজস্ব অপদল আছে। কিন্তু সেখানেও তারা বালকদের দলের পরিপূরক দলরূপে কাজ করে। বালিকারা পথিক ও ভদ্র ব্যক্তিদের ভুলিয়ে পথভ্রষ্ট করলে বালকরা তাদের অর্থশূন্য করে। য়ুরোপে বালিকারা তাদের কেশের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখে। এরা সাধারণতঃ অস্ত্রশস্ত্রের বাহকরূপে বালকদের সাহায্য করে। বালিকারা ওদের জন্য গুপ্তচরের কার্য করে। য়ুরোপে ওরা বালকদের পক্ষে 'এ্যালিবাই' সাক্ষ্য প্রদান করে। তারা সাক্ষ্যে বলে ঐ বালক তার সঙ্গে অমুক স্থানে অমুক সময়ে রাত্রিযাপন করেছে। অতএব সে ঐ স্থানে ঐ সময়ে অপরাধ করতে পারে না। মার-পিটের সময় তারা বালকদের যথেষ্ট সাহায্য করে থাকে। পুলিশকে প্রতিরোধ করতেও এরা পরস্পরকে সাহায্য করে। বালক অপদলের সদস্যদের মধ্যে প্রখর দলীয় আনুগত্য দেখা যায়।

এগারো বৎসর বয়সের নিম্ন বয়স্ক বালকদের মধ্যে অসামাজিক ব্যবহার প্রকাশ পায়। এগারো বৎসর বয়সের উর্ধ্বতন বয়স্ক বালকগণ অপদল সৃষ্টি করে। দলভুক্ত হওয়া বালক অপরাধীদের একটি বিশেষ প্রবণতা। ওদের দলভুক্তির বয়স [Gang age] ১২ বৎসরের পরের বয়স বলা যেতে পারে।

[এদেশে শহরাঞ্চলে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের বালিকা সহ কয়েকটি ব্ল্যাক-মেইলিঙের দল আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ রেড হট্ স্করপীয়ন দল সম্বন্ধে বলা যায়। এ দেশীয় ব্যক্তিদের নওসেরা ঠগী দলেও দুই একজন বালিকাকে বয়স্ক

নারীদের সহিত দেখা গিয়েছে। ভারতীয় শহরে বয়স্ক পুরানো পাপীরা তাদের অপকর্মে বালক এমন কি শিশুদেরও সাহায্য নেয়। বালকরা ঘুলঘুলি ও নর্দমার পথে প্রবেশ করে বড়োদের জন্য বহির্দরজা খুলে দেয়। ওয়াগন ভাঙিয়েরা বহু বালককে ঐ কাজে নিয়োগ করে। পকেটমাররা দ্রব্যপাচারে বালকদের সাহায্য নেয়। সপলিফটার ও কার্টলিফটার বালকরা তরকারীর গাড়ী ও দোকান প্রভৃতি থেকে নিয়মিত দ্রব্য চুরি করে। এরা ভবঘুরে নিরাশ্রয় ও স্বাবলম্বী হয়।]

বালকরা পরস্পরকে কম ক্ষেত্রেই মন্দ করেছে। ওদের মধ্যে বড়দের প্রবেশই সকল অনর্থের মূল। কোনও যুবকের প্রতি ওদের অনুরক্তি সন্দেহ-জনক। অভিভাবকরা সময়ে সাবধান হলে অঘটন এড়ানো যায়। অজ্ঞাত কুলশীল যুবকদের সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেওয়া বিধেয়।

বালিকা অপরাধীদের সংখ্যা এদেশে স্বভাবতঃ খুব কম। এখানে বালক-দের অপেক্ষা বালিকাদের প্রতি অভিভাবকদের সতর্ক দৃষ্টি থাকে। অধিকন্তু এদেশে বারো বৎসর বয়সে কন্যারা পিউবারটি প্রাপ্ত হয়। পর্দা প্রথা; বংশগত সংস্কার এবং তৎসহ বাল্যবিবাহ উহার প্রতিবন্ধক। অপকর্মের জন্য ওদের সুযোগ-সুবিধাও কম। সন্তান ধারণ ও সন্তান পালনে এদের অধিক সময় ব্যয়িত হয়। অপরাধ করা অপেক্ষা বহুচারিণী হওয়াতে উপার্জন অধিক। ১৪ বৎসরের নিম্নে এবং ৪০ ঊর্দ্ধ বয়সে বরং কেউ কেউ অপরাধ করেছে। অনুপাতে সর্বদেশে বালক অপরাধীদের সংখ্যা অত্যধিক বেশি। উহাদের সংখ্যাও অধুনা ক্রমবর্দ্ধমান। এ জন্য এখানে বালক অপরাধীদের সম্বন্ধে অধিক আলোচনা করব। বালিকারা সাধারণতঃ যৌনজ অপরাধে সংশ্লিষ্ট থাকে। কিন্তু—ঐজন্য [আইনে] বালিকাদের দায়ী না করে বালকদেরই দায়ী করা হয়।

বিঃ দ্রঃ—পনেরো বৎসর বয়স্ক একজন বালিকা ঐ বয়সের এক বালক অপেক্ষা অধিক বেশী পরিপক্ব [matured] হয়। কোন বালক যে পূর্ণ বয়স্ক হয়েছে তা ঐ বালকদের বুঝতে দেরী হয়। কিন্তু বালিকারা বোঝে যে তারা পূর্ণ বয়স্কা ও পরিপক্ব হয়েছে। বালিকাদের অপেক্ষা বালকদের সহজে অধীন করা যায়। কিন্তু বালিকাদের নিকট কোনও ধাপ্পাবাজি কার্যকরী হয় না। বালককৃত যৌনজ অপরাধে ইহা বিবেচনা করা উচিত।

বালক অপরাধীরা দুই প্রকারের হয়ে থাকে। যথা, একটোমরফাস এবং

মেসোমরফাস। প্রথম দল হাল্কা দেহী, কৃশ, গোপনতা-প্রিয় ও ভীরু, কিন্তু চতুর। এরা ভেবে চিন্তে কাজ করে। শেষোক্ত দল বলবান, সাহসী, বেপরোয়া, নিষ্ঠুর ও আনুগত্যহীন।

কিশোর-অপরাধীদের মধ্যে নিম্নোক্ত কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়েছে।

(১) দৈহিক স্বাস্থ্য : নিরেট-দেহী, সুসংবদ্ধ, পেশী বহুল। (২) মানসিক প্রবণতা : অস্থির, ধৈর্যহীন, ভাবুকতা। (৩) কর্মশক্তি : মাত্রাহীনতা, আক্রমণাত্মক, নাশকতা-প্রিয়। (৪) আচরণ : শত্রুতা, বেপরোয়া, বিঘ্ন-সৃষ্টিকারী, সন্দিগ্ধ, জেদী, অধিকার-বিলাসী, দুঃসাহসিক, সংস্কার বিহীন মন ও আনুগত্যহীন। (৫) মনস্তাত্ত্বিক : জবরদস্তি স্বভাব, নেতৃত্ববিলাসী, সফলতার জন্য অন্যায় পন্থা গ্রহণ, নিষ্ঠুরতা, নির্দয়ভাব, স্বার্থপরতা।

কিশোরদের মধ্যে পরিদৃষ্ট উপরোক্ত দোষগুলি ওদের অপরাধী হওয়ার অগ্রদূত। ঐগুলি কিশোরদের মধ্যে দেখা গেলে অভিভাবকদের সাবধান হওয়া উচিত। বাক্-প্রয়োগ [সাজেস্শন] ও কার্যকরণ দ্বারা ঐগুলি দূরীভূত করা সম্ভব। স্নেহহীন পিতামাতার স্নেহের অভাব, অপূরিত আকাঙ্ক্ষা, তদারকীর অভাব, দুঃখ দারিদ্র্য, অবিচার, আশৈশব কু-ব্যবহার প্রাপ্তি, দ্বন্দ্বরত মন ও বিবিধ প্রদমিত মনোজট [complex] হতে ঐগুলির উদ্ভব হয়। ঐগুলি বালকদিগের প্রথম জীবনে চরিত্র গঠনের প্রতিবন্ধক। এতদ্-ব্যতিরেকে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয় কিশোর অপরাধী হওয়ার অন্যতম কারণ রূপে বিবেচিত।

(১) মানসিক সংঘাত [কন্‌ফ্লিক্‌ট], (২) কু-সংস্কার ও কুসঙ্গ, (৩) প্রাক্ যৌন-অস্থিরতা, (৪) গণ-বাক্ প্রয়োগশীল [Mass-suggestion], (৫) প্রাক্-যৌন অভিজ্ঞতা, (৬) দুঃসাহসিকতা, (৭) এ্যাডভেনচার-প্রিয়তা, (৮) অতি ছায়াচিত্র প্রিয়তা, (৯) স্কুলের সমস্যা : বড়দের সঙ্গে পঠন, (১০) প্রমোদাভাব : সৎ আমোদ প্রমোদের অভাব, (১১) অতিরিক্ত পথজীবন, (১২) অপছন্দকর কর্মস্থান, (১৩) চিত্তবিক্ষোভ [ইমোসন্থাল ইনষ্টেবেলিটি] বদ অভ্যাস ও অতি আদর ভোগ, (১৪) বাতিকগ্রস্ত মন, (১৫) দুর্বল দেহ, মন্দ স্বাস্থ্য, অনিদ্রা ও দারিদ্র্য, (১৬) অসময়ে পিউবারটি, (১৭) যৌন পরিপক্কতা, (১৮) পরাশ্রয় : সৎমার বা দূর আত্মীয়ের গলগ্রহ হওয়া, মাতা বা পিতার মনিবের গৃহে বসবাস, মনিব পুত্রদের দ্বারা নিগ্রহ ও অবজ্ঞা, (১৯) অপুষ্টি, ভেজাল আহার ও স্নেহের অভাব, (২০) বুদ্ধি অনুযায়ী ক্লাশে ভর্তি না হওয়া, সহপাঠীদের র‍্যাগীঙ, উপেক্ষা

ও উপহাস এবং পাঠ্যপুস্তকের অতি ভার [ইহা কিশোরদের উন্মাদ, নির্বোধ কিংবা অপরাধী করে]।

সমকামী বালকরা প্যাসিভ এজেণ্ট রূপে অন্য বালককে সংগ্রহ করে তৃপ্ত হয়। এ্যাকটিভ বালক এজেণ্টরা জুয়াতে ওদের প্যাসিভ এজেণ্টদের বাজী ধরে। কয়েকটি সরকারী কয়েদ স্কুলে ইহা দেখা গিয়েছে। জুয়া, সিনেমাও নেশাভাঙের মত সমকামীতাও ওদের প্রিয় বস্তু। অর্থের জন্যও কিছু বালক ঐরূপ কুকার্যে রাজী হয়। বয়স্ক নারীরাও ঐ জন্য বালক সংগ্রহ করেছে। পরে অবহেলিত হলে [যা তারা প্রায়ই হয়] ওরা বিশেষ ধরণের কিশোর অপরাধী হয়েছে।

বহু বালক বালিকার যৌন সম্পর্কিত জ্ঞান নেই। যৌন সঙ্গমের কুফল সম্বন্ধে তারা বোঝে না। উহাকে তারা এক প্রকার ক্রীড়া মনে করে। এজন্য ওদেরকে কিছুটা যৌন বিদ্যা শেখানো ভালো। যা তারা এর-ওর কাছে শিখবেই তা তাদের পূর্বাহ্নেই শিক্ষা দেওয়া উচিত।

বহু স্কুল পলাতক বালকদের অপরাধী হতে দেখা গিয়েছে। ঐরূপ বহু স্কুল পলাতকরা আবার অপরাধী হয়ও নি। বিদ্যালয়গুলিতে দুই প্রকারের অনুপস্থিতি দেখা যায়, যথা—বৈধ ও অবৈধ। পিতামাতা ও অভিভাবকদের বিনানুমতিতে অনুপস্থিত থাকলে তাকে পলায়নী-দোষ বলা হয়। ঐরূপ ক্ষেত্রে ওদের শুধু শাসন না করে ওদের ঐ পলায়নী স্বভাবের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। উহা বারে বারে ঘটলে বুঝতে হবে যে ঐ বালক শীঘ্রই কিশোর অপরাধী হবে।

বহু ক্ষেত্রে শুধু রোমান্স ও তামাসা উপভোগ করার জন্যে বালক দল অপরাধ করে। সভ্যসমাজে অপরাধ প্রদমিত। উহাকে উৎসাহ দেওয়ার রীতি নেই। কিন্তু, বিশেষ দিন ক্ষণে সমাজ উহাকে প্রশ্রয় দেয়। কিন্তু—অপরাধস্পৃহা এক বার বহির্গত হলে উহার পুনরায়অন্তর্মুখী হওয়া কঠিন। পল্লী অঞ্চলে নষ্টচন্দ্র-দিন উহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ঐ রাত্রে অভিভাবকদের জ্ঞাতসারেই বালকেরা প্রতিবেশির ফল পাকোড় চুরি করতে বেরোয়। দোল পর্বে এক শ্রেণীর হিন্দুদের অশালীনতা ক্ষমা করা হয়। বড়দিন উৎসবে য়ুরোপে বহু বেলেল্লাপনা সহ্য করা হয়েছে।

বহু বালককে আশ্রম মঠ ও চার্চ প্রভৃতি স্থানে সংশোধনের জন্য পাঠানো হয়। সেখানে ধর্ম শিক্ষা ও সৎ শিক্ষা দেওয়া হয় বটে, কিন্তু ঐ সঙ্গে তাদের অন্য ধর্মের বিরোধী করে পরধর্ম বিদ্বেষীও করে তোলা হয়। এতে কিন্তু ফল হয় বিপরীত। তাই চার্চ ফেরৎ বহু বালককে কিশোর-অপরাধী হতে দেখা গিয়েছে।

পরধর্ম বিদ্বেষী সমাজে প্রায়ই অপরাধীদের প্রাবল্য দেখা যায়। ধর্মমতের মত রাজনৈতিক মতবাদের ক্ষেত্রেও ইহা সমভাবে প্রযোজ্য।

স্থূল বৃত্তির অতি অনুশীলন হলে ঐরূপ অবস্থা হবেই। মানুষের মনোদণ্ডে উল্টো উল্টিভাবে স্থূলবৃত্তির ও সূক্ষ্ম-বৃত্তির অবস্থান। উহাদের একটির বৃদ্ধি অন্যটির হ্রাস ঘটাবেই। ইহা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের চিন্তনীয় হওয়া উচিত। কারণ —স্থূল বা সূক্ষ্মবৃত্তির একটি অংশ উদ্বেলিত হলে উহার অন্য অংশগুলিও সক্রিয় হয়ে ওঠে। ঐরূপে ওদের স্থূলবৃত্তি প্রবলীকৃত হলে উহা সহজে প্রদমিত অপস্পৃহার বহির্বিকাশ ঘটায়।

বিঃ দ্রঃ—সংশোধনাগারে বালক-অপরাধীদিগকে তাদের প্রবণতা [কম-বেশী] নির্বিশেষে একত্রে রাখা হয়। এদের মধ্যে কিঞ্চিৎ উৎকৃষ্ট বালকদের পৃথকীকৃত করে পৃথক স্থানে রাখা উচিত। পরে শেষোক্তদিগের মধ্য থেকে ব্যবহারের তারতম্য অনুযায়ী কয়েকজনকে বেছে স্থানান্তরিত করা ভালো। এইভাবে ধাপে ধাপে পৃথকীকৃত করলে এরা অন্যদের সঙ্গে মিশে পুনরায় অধোমুখী হতে পারে না। ভালো বালকদের পৃথকীকরণ ও ভালো হওয়ার বিষয় অবগত হলে ঈর্ষান্বিত হয়ে মন্দেরাও ভালো হবার জন্য চেষ্টা করবে। ঈর্ষা ও জেদ [স্থূলবৃত্তি] ওদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়। এই মন্দ দোষগুলিকে ঐভাবে কাজে লাগানো সম্ভব। (f)

[অলস ও কর্মবিমুখ দরিদ্র ব্যক্তিরা সচ্ছল মধ্যবিত্ত ও ধনীদের ঈর্ষা করলে ওদের স্থূল বৃত্তিসমূহ কুপিত হয়। ঐরূপ বালকদের পক্ষে অপরাধী হওয়া সম্ভব। প্রাসাদোপম অট্টালিকার পার্শ্বে বস্তী থাকলে অর্থ নৈতিক অসমতা শিশুদের মধ্যে হিংসা ও ক্রোধ আনে। কিন্তু দরিদ্রদের বস্তী অন্যত্র থাকলে উহা ক্ষতিকর হয় না। এ জন্য দক্ষিণ কলিকাতা অপেক্ষা উত্তর কলিকাতায় অধিক কিশোর ও শিশু অপরাধী দেখা গিয়েছে। গ্রামাঞ্চলে দরিদ্রদের পৃথক এলাকাতে এরূপ কোনও সমস্যা না থাকাতে সেখানে ওদের আবির্ভাব নেই। গ্রাম্য সমাজে প্রতিবেশিদের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রতিটি কিশোর ও শিশুদের প্রতি সমভাবে দৃষ্টি রাখেন। ওখানে ধনী ও মধ্যবিত্তদের অট্টালিকাতে দরিদ্রদের অবাধ যাতায়াত। ওদের পরিচ্ছন্ন পর্ণ-কুটিরেও মধ্যবিত্ত বালকদের আনাগোনা

(f) পর পর বিভিন্ন শক্তির এ্যালকোহলের সাহায্যে বীক্ষণাগারে কাঁচের স্লাইড্ থেকে উদক নির্মূল করার মত পর্যায়ক্রমে কিশোরদের নিরাময় করতে হবে।

আছে। উভয় শ্রেণীর পরিবারদের পোশাক, খাদ্য ও আচার-বিচারে প্রভৃত সামঞ্জস্য দেখা যায়। এ জন্যে গ্রামে কিশোর অপরাধীর প্রাবল্য নেই। শহরের মত বস্তী-জীবনের দুর্ভোগ গ্রামের লোক ভোগে না। সেখানে প্রত্যেকের পৃথক পৃথক নিজস্ব বাস-গৃহ আছে।

কিশোর বয়স একটি বিপজ্জনক বয়স। ঐ সময় ওরা অত্যধিক রূপে ভাব প্রবণ, আদর্শবাদী ও বাক-প্রয়োগশীল [সাজেসসিভ] হয়। ঐ বয়সে ওরা স্বার্থত্যাগী ও জীবন-মরণ সম্বন্ধে বেপরোয়া হয়। ঐ সময় ওরা বিচার-বিবেচনা না করে মনের আবেগে কাজ করে। সামান্য একটু অবহেলায় কটু উক্তি ও অপমানে ওরা আত্মহত্যাও করে। ঐ সময় ওদের সঙ্গে সাবধানে কথাবার্তা ও ব্যবহারাদি করা উচিত। ঐ বয়সে ওরা প্রেমে পড়ে। ওরা গুপ্ত সমিতিতে প্রবেশ করে ও রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেয়। অভিভাবকদের বিনা অনুমতিতে দেশের জন্য যুদ্ধে যায়। ভুল আদর্শ-প্রণোদিত হয়ে ওরা রাজনৈতিক অপরাধ করে।

ক্ষমতালোভী বহু নেতা ওদের উক্ত-রূপ প্রবণতার সুযোগ প্রায়ই নিয়ে থাকেন। জনতাকে জাগাবার নামে তাদের অপস্পৃহাকে জাগানো অনুচিত। কিশোরগণ প্রায় এদের শিকার হয়ে নিজেদের ও পরিবারের সর্বনাশ এনেছে।

কিশোরদের প্রতিরোধযোগ্য দোষগুলি সময় মত না শুধরে অবহেলায় তাদের কিশোর-অপরাধী হতে দিলে উহারা বহু ক্ষেত্রে ভীষণ আকৃতির ও প্রকৃতির হয়ে ওঠে। তখন তারা অভিভাবকদের সম্পূর্ণ আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। এমন কি—তাদের ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হেতু তারা গৃহত্যাগী হয়ে বস্তীবাসীও হয়েছে। নেশা ভাঙ ও অন্যান্য কু-অভ্যাস তাদের প্রতিরোধ সম্পর্কিত সূক্ষ্ম স্নায়ুর বিলুপ্তি তো ঘটায়ই; উপরন্তু তারা মনের সুকুমার বৃত্তিগুলিও হারিয়ে মানব-দানবেও পরিণত হতে পারে। ঐরূপ অবস্থায় তাদের মধ্যে নিম্নোক্ত রূপ কয়েকটি দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তন দেখা যাবে।

'সজল চক্ষু, অস্থিরতা, দ্রুত হণ্টন, উদর রোগ, অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক ধ্যান ধারণা, অসৎসংসর্গ; কর্মবিমুখতা, নৈতিক ও দৈহিক অসাড়তা, কষ্টহীনতা, স্পর্শকাতরভাব, লজ্জা সরমের অভাব, অত্যধিক অর্থাকাঙ্ক্ষা, ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন, চক্ষুমণির বৃদ্ধি [কোকেন খোর] নিম্নগামী মন, রক্ত চক্ষু, মারবেলের মত স্থির চক্ষু [মদ্যপ ও খুনী] নিদ্রাহীনতা, নিষ্ঠুরতা, অস্থির চক্ষুপত্র ও পদাগ্র দ্বারা হণ্টন [খুনী] রাত্রে ঐ স্বভাবের বর্ধন ইত্যাদি।'

উপরোক্ত স্বভাব হতে ওদের কোন দল ব্যক্তির বিরুদ্ধে এবং কোন দল বস্তুর বিরুদ্ধে অপরাধ করবে তা কিছুটা বোঝা যায়।

মাতৃ সান্নিধ্য ও পিতৃ সান্নিধ্যের মধ্যে প্রভেদ বুঝতে হবে। শিশুদের মাতৃ-সান্নিধ্য বেশী ও কিশোরদের পিতৃ সান্নিধ্য বেশী প্রয়োজন। প্রথম জীবনে পিতৃ সাহচার্য কম পেলে ওরা মাতার সঙ্গে একীভূত হয়। এতে বয়ঃপ্রাপ্তির পর পুরুষাধিগত জগতে তারা মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বে ভোগে।

'ফাদার-ফিগার' [পিতৃ-সংসর্গ] বিহীন কিশোররা বয়সকালে চোর গহিত কর্মী মারপিঠ বলাৎকারক আদি অপরাধী হতে পারে। সংগৃহীত পরিসংখ্যান দ্বারা ইহা সুপ্রমাণিত।

[প্রায় দেখা যায় যে এক পরিবারে স্বামী স্ত্রী উভয়ে উপায়ী। কিন্তু অন্য এক পরিবারে স্বামী স্ত্রী উভয়ে উপোষী। কারণ—উপায়ী পাত্রী উপায়ী স্বামীকে বিবাহ করে। নার্সিং, শিক্ষিকা আদি ব্যতিরেকে অন্য চাকুরী নারী'রা বেশী নিলে সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট হয়। অন্যদিকে—শিশুরা সারাদিন মাতৃ স্নেহ কামনা করে। শৈশবে স্নেহের অভাব মানুষকে অপরাধী করে। পরিশ্রান্ত স্বামীরা ঘরে ফিরে অপেক্ষমান স্ত্রী দেখতে চায়। তাদের অপরাধী না হওয়ার এটি একটি প্রতিষেধক। য়ুরোপে লোকসংখ্যা কম। তাই সেখানে নারীরা চাকুরী করে]

ব্যক্তি স্বাধীনতা সঙ্কুচিত তথা সীমিত করার মধ্যে যৌক্তিকতা আছে। রুশ দেশে ব্যক্তি স্বাধীনতার পুনঃ প্রবর্তনের হার মত সেখানে অপরাধের সংখ্যা বেড়ে গেছে। গোষ্ঠি অপরাধ [কমিউনিটি] এবং ব্যষ্টি-অপরাধের [ইনডিভিজুয়াল] প্রভেদ বুঝতে হবে। প্রথমটিতে সমগ্র সম্প্রদায় এবং দ্বিতীয়টিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা পরিবার শাস্তি দেয়। ব্যষ্টি অপরাধের [TORT] ধারণা যন্ত্রনির্ভর উন্নত সমাজে কম। গোষ্টি অপরাধ বলতে ক্রাইম [অপরাধ] এবং ব্যষ্টি অপরাধ বলতে প্রথাদি [TABOO] বুঝায়। (*)

নৈরাশ্য [ফ্রাসট্রেসন] হতে আক্রমণী স্বভাবের উদ্ভব হয়। আক্রমনোন্মুখ উত্তেজনা বা চাঞ্চল্য [Tension] ক্ষতিকর। উহার প্রতিষেধক ও প্রতিকারের বিষয় ভাবতে হবে।

বিঃ দ্রঃ—এরূপ দেখা গেছে যে একবীজ তথা ওয়ান এগড্ [One egged]

(*) এস্কিমিকো'দের ফুড টাবু কিন্তু সমগ্র সমাজের প্রদেয় শাস্তিযোগ্য। অন্যদিকে 'ইনসেষ্ট' পাপ হলেও উহা সর্বদেশে ঘৃণ্য। ঐ গুলি ওই সব ক্ষেত্রে নিয়ম বহির্ভূত ব্যতিক্রম।

যমজ শিশুদের শতকরা ৫০% ভাগ ক্রাইম করে। কিন্তু দ্বি-বীজ তথা টুইন এগড [Twin egged] যমজ শিশুরা প্রায়ই অপরাধী হয় না। এজন্য ওয়ান এগড্ টুইনদের অপরাধ স্পৃহা দমনে বেশী প্রতিরোধ শক্তি প্রয়োজন। তাই তাদের প্রতি বেশী লক্ষ্য রাখতে হবে। [ইহা জন্মসূত্রে কম বেশী অপস্পৃহা প্রাপ্তি প্রমাণ করে।]

বিঃ দ্রঃ—একবীজ যমজদের চরিত্র কমবেশী একই রূপ হয়। কিন্তু—দ্বিবীজ যমজদের প্রকৃতি ভিন্ন রূপ হয়। ইহা মনোবৃত্তির জন্মসূত্রে প্রাপ্তি প্রমাণ করে। তবে উভয় ক্ষেত্রে তারা কম বেশী একই আকৃতির হয়।

পরিবেশ ও দারিদ্র্য, কিন্তু কিশোর অপরাধী সৃষ্টির একমাত্র কারণ নয়। বস্তুতঃ পক্ষে একটি মাত্র কারণ দ্বারা অপরাধী সৃষ্টি হয় নি। কেবল মাত্র বাসভূমি অপরাধী সৃষ্টির জন্য নিশ্চয়ই দায়ী নয়। কারণ একই পরিবেশে বসবাসকারী বহু বালক অপরাধী হয় নি। বয়ঃ বৃদ্ধির সহিত অসামাজিক ব্যবহার থেকে তারা নিজেদের মুক্ত করেছে। দারিদ্র্যও কারও একচেটিয়া অধিকার নয়। মধ্যবিত্ত ও ধনীদেরও বহু ক্ষেত্রে অর্থাভাব ঘটেছে। মধ্যবিত্তরা সন্তানদের চরিত্র গঠনে যতটা যত্ন নেন, বস্তীবাসী ও নিম্নশ্রেণীরা ঐ সম্পর্কে ততটা যত্নবান হন নি। সোসিও-একনমিক অবস্থার ও ব্যবস্থার ভুল ব্যাখ্যা করা অনুচিত। সংখ্যালঘুদের প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলা ও অস্পৃশ্যতা কিশোর অপরাধী সৃষ্টির কারণ বটে। কারণ, যে কোনও বিরূপ প্রতিক্রিয়া মস্তিষ্কের অপরাধ-নিরোধ সম্পর্কিত সূক্ষ্মস্নায়ুর পক্ষে ক্ষতিকর হয়। এতে অপস্পৃহার বহির্গমন ও তজ্জনিত অপরাধী সৃষ্টি হওয়া খুবই সম্ভব। কিন্তু তবুও বলব যে ঐ সম্বন্ধে এদেশে বহু ভ্রান্ত ধারণা অযথা সৃষ্টি করা হয়। উহা মূল সমস্যার সমাধানে বিঘ্নতা সৃষ্টি করে। বেকার জীবনও অপরাধী সৃষ্টির একমাত্র কারণ নয়। সু-পালিস বয়, সংবাদপত্র বিক্রেতা ও হকার বালকরাও অপরাধী হয়। তুলনামূলক ভাবে নন্ ওয়ার্কিং বেকার বালকদের মধ্যে অপরাধী বরং কম। উপরন্তু কিশোর বয়সে [age group] পিতামাতার দ্বারা তারা প্রতিপালিত হয়ে থাকে। কিশোর অপরাধী হওয়ার কারণ অন্যত্র সন্ধান করতে হবে।

কিশোর অপরাধী সৃষ্টির জন্য অধুনা অভিভাবক, মাতা পিতা ও তৎসহ রাষ্ট্রকে অধিক দায়ী করা হয়ে থাকে। কয়েক ক্ষেত্রে শিশুদের অপরাধ ও অপরাধ স্পৃহা তাদের কিশোর বয়সে অবিচ্ছেদ্যরূপে সংক্রামিত হয়েছে। স্বভাব-

দুর্বৃত্ত [criminal Tribe] জাতীয় বালকদের সম্বন্ধে উহা বিশেষরূপে প্রযোজ্য। তবে অধিক ক্ষেত্রে কিশোর বয়সে উপনীত হওয়ার পর বালকরা কিশোর অপরাধী হয়েছে।

কিশোর অপরাধী হওয়ার মূল কারণ শিশুদের মধ্যেই নিহিত। দ্রব্যাদি কেড়ে নেওয়া বা লুকিয়ে রাখা এবং হিংসা লোভ ও ক্রোধ আদি শিশুদের স্বাভাবিক ধর্ম। বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত তাদের উক্ত স্বভাব পরিত্যক্ত হয়। [ঠিক বেঙাচির লেজ খসিয়ে ব্যাঙ হওয়ার মত] অপরাধী সমাজ হতে যে নিরাপরাধী মানুষের সৃষ্টি উহা তা প্রমাণ করে। শিশুদের ঐ স্বভাব আপনি হতে পরিত্যক্ত না হলে বুঝতে হবে যে তা কেন হচ্ছে না। ঐ সম্পর্কিত কার্যকারণ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে বিশদরূপে বলা হয়েছে।

কিশোর এবং শিশুদের মধ্যে নিম্নোক্ত কয়েকটি স্বভাব পরিদৃষ্ট হলে ঐগুলি যথাসম্ভব নিরাময় করা উচিত। অন্যথায় শিশুগণ স্বল্প সময়ের মধ্যে অপরাধী হতে পারে। ঐগুলি ওদের অপরাধী হওয়ার সূচনা সূচিত করে।

(১) পশুপক্ষীর প্রতি নির্দয় ব্যবহার, (২) ক্রীত নয় এমন দ্রব্যের অধিকার (৩) অতিরিক্ত অবাধ্যতা, (৪) বিদ্যালয় হতে পলায়ন, (৫) কৈফিয়ৎ-হীন ক্ষত আদি, (৬) দেরীতে গৃহে ফেরা, (৭) বিসদৃশ ও মলিন পরিচ্ছদ, (৮) অপরিচ্ছন্ন আকৃতি [অকর্তিত কেশাদি], [৯] বাড়িতে আনা হয় না এমন বন্ধু-বান্ধব, (১০) নেশা ভাঙ-করা ও উল্কি ধারণ, (১১) সন্দেহমান ব্যক্তিদের প্রতি আনুগত্য।

কিশোরদের অপরাধী হওয়া না হওয়া নির্ভর করে ওদের প্রতিরোধ সম্পর্কিত সূক্ষ্ম স্নায়ুর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া বা না হওয়ার উপর। কিশোর ও শিশুদের ঐ সম্পর্কিত গঠনোন্মুখ সূক্ষ্ম স্নায়ু তখনও নূতন [কাঁচা] থাকায় সামান্য প্রতিকূলতা তাদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া আনে। শিশুদের অপছন্দকর কোনও কার্য করা উচিত হবে না। অসৎ পিতামাতাও নিজেদের সন্তানকে সৎ দেখতে চান।

শিশুরা বাক্‌প্রয়োগশীল [suggessive], অনুকরণ প্রিয় ও কিছুটা অপরাধ প্রবণ। ফলে, পরিবেশের শক্তি তাদের উপর সহজে কার্যকরী হয়। উহাকে প্রতিহত করার মত প্রতিরোধ শক্তি ওদের মধ্যে থাকা চাই। সামান্য ভুল ভ্রান্তি কিংবা ষ্টিমিউলাস ওদের প্রতিরোধ শক্তির আধারভূত সূক্ষ্ম স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। ঐ সম্পর্কিত বিবিধ কারণ নিম্নে উধৃত করা হলো।

শিশুদের সম্মুখে মাতা পিতার কলহ অত্যন্ত ক্ষতিকর। এতে বালকরা বাড়ির বাইরে থাকা পছন্দ করে। তারা পলায়নও করে থাকে। কন্যারা বহু ক্ষেত্রে আত্মহত্যা করেছে; কিংবা স্বাস্থ্যের প্রতি তারা অমনোযোগী হয়েছে। এতে মাতাপিতার প্রতি তারা বিশ্বাস হারায়। তারা তাঁদের কখনও ভালোবাসতে পারে না। তাঁদের প্রতি তাদের আনুগত্য ও শ্রদ্ধা থাকে না। মাতা পিতার অসচ্চরিত্রতা তাদের বহু ক্ষতির কারণ হয়। ঐ সম্পর্কে জনৈক অবৈধ সন্তানের বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"আমার বয়স মাত্র সতেরো বৎসর। মাতার দুশ্চরিত্রতায় আমি ক্ষুব্ধ। আমি একটি ক্ষুরধার ছুরি সংগ্রহ করেছি। মা এবার কোনও ব্যক্তিকে উপপতিরূপে গৃহে আনলে আমি নিশ্চয়ই তাকে খুন করবো।"

[এই সব বিরূপ ইচ্ছা কারুর মনে উদয় হলেই যে সব সময় উহা কার্যকরী হয় তা নয়। কারণ—ওদের আভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ শক্তি উহার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ফলে, ওরা মনের দুঃখ মনে রেখে নিয়ত কষ্ট পায়। কিন্তু— উহা প্রদমিত হলেও চেতন ও অবচেতন মনে রয়ে যায়। দৈহিক বা মানসিক কারণে প্রতিরোধ শক্তি বিলুপ্ত হলে ওই ইচ্ছা সহসা সক্রিয় হবে।]

বহু পিতা একমাত্র পুত্রকেও হিংসা করেন। ওঁরা বহু কষ্টে নামী ও ধনী হয়েছেন। বাল্যে ও যৌবনে অর্থাভাবে তাঁরা জীবন ভোগ করতে পারেন নি। তাঁদের ওই অতৃপ্ত বাসনাকে পুত্রের করায়ত্ত দেখে তাঁরা ক্ষুব্ধ হন। তাঁর কষ্টার্জিত অর্থ তাঁর বদলে তাঁর পুত্রের ভোগে লাগছে। তাঁদের বিক্ষুব্ধ হবার এটাই প্রধান কারণ। তাঁদের এই মনোভাব তাঁরা যতই গোপন করুন, উহা পুত্রদের নিকট গোপন থাকে না। এখানে আমার তাঁদের কিছু বলবার আছে। তাঁর পিতা তাঁর জন্যে যা করে যেতে পারেন নি, তা তিনি তাঁর পুত্রের জন্য করেছেন। এইটুকুই তাঁর চরম সান্ত্বনা হওয়া উচিত। প্রকৃতপক্ষে—'পিতা তাঁর পুত্রের মধ্য দিয়ে নবজন্ম লাভ করেন। বিগত জীবন ও যৌবন তিনি তাঁর পুত্রের মাধ্যমেই নূতন করে ফিরে পান।' ঐরূপ চিত্তবিশ্লেষণ দ্বারা তাঁদের ওই মনোজট তথা কমপ্লেক্স পুত্রের মঙ্গলের জন্য স্ববাক্ প্রয়োগ দ্বারা [অটো-সাজেস্‌সন] দূরীভূত করা কর্তব্য।

মাতা ও পিতার পুনর্বিবাহ বহু শিশুই পছন্দ করে না। ঘরভাঙা সংসারে [Broken family] শিশুদের সৎ থাকা সু কঠিন। য়ুরোপে অবশ্য ওই সকল বেপরোয়া শিশুই [Tomy] যৌবনে সাম্রাজ্য বিস্তারে সহায়ক হয়েছে। কিন্তু

ঐরূপ বহির্গমনের সুযোগ সুবিধা বর্তমান যুগে নেই। বিসদৃশ গৃহ ও গৃহহীনে প্রভেদ খুবই কম। প্রায়ই দেখা গিয়েছে যে, বালক-অপরাধীদের পিতামাতা শাসন ব্যাপারে অবিবেচক ও অত্যন্ত নির্দয়। ঠাকুমা ও অন্যেরা তাদের মমতা দ্বারা উহার প্রতিষেধক রূপে কাজ করেছে। কিন্তু যৌথ পরিবারের অভাবে অধুনা উহা কার্যকরী হয় না।

মাতা ও পিতার মধ্যে একজনের উপর শাসন ভার অর্পিত হওয়া উচিত। একজন তাড়না করলে অন্যজনকে সান্ত্বনা দিতে হবে। [ক্ষতিগ্রস্ত স্নায়ু এতে পুনর্গঠিত হয়।] শাসন ভার মাতার উপর থাকলে ফল উত্তম হয়। মাতার স্নেহাধিক্য তজ্জনিত যা কিছু ক্ষতি তা তৎক্ষণাৎ পূরণ করে। বহু পিতা স্নেহে মাতার স্থান অধিকার [পূরণ] করতে চান। কিন্তু উহা সম্ভব তো নয়ই, উপরন্তু উহা বাঞ্ছনীয়ও নয়। তবে উহাকে আমি মন্দের ভালো বলবো। অপুত্রক বিধবা আত্মীয়রা শিশুদের উপকারে আসে। কন্যা পিতাকে এবং পুত্র মাতাকে পছন্দ করে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে ইহা সত্য নাও হতে পারে।

[তিনটি পরিবেশ শিশুদের উপর কার্যকরী হয়। যথা—(১) স্থানীয়, (২) স্কুলীয় এবং (৩) গার্হস্থ্য। এক স্থানে যা গড়ে অন্য স্থানে তা ভাঙে। এই ত্রয়ী শক্তির বৈপরীত্য শিশুদের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে থাকে।]

বহু পিতামাতা শিশুদের সহিত শিশুর মত ব্যবহার করতে চান। কিন্তু শিশুরা শিশুর জগৎই পছন্দ করে। তাদের পৃথিবীতে [সংসারে] বড়োদের প্রবেশ তাদের পছন্দ নয়। বহু পিতার ধারণা সর্বদা পুত্রদের সঙ্গে থাকলে মঙ্গল হবে। কিন্তু উহার ফল বিপরীতই হওয়ার সম্ভাবনা। শিশুদের কচি-কাঁচা [গঠনোন্মুখ] মনের সহিত পরিণত মনের সংঘাত ক্ষতিকর। উহা ওদের মনের সহজ গঠনের পরিপন্থী হয়। পুত্রেরা যে কক্ষে বন্ধুদের সহিত আলাপ-রত থাকে সেই ঘরে প্রয়োজন ব্যতিরেকে পিতার প্রবেশ বিধেয় নয়। এতে তারা ক্ষতিকর অস্বস্তি অনুভব করে। ওই বন্ধুরা কি প্রকৃতির তা অবশ্য তাঁদের পূর্বাহ্নে জানা প্রয়োজন।

মাতাপিতার বিবাহ-বিচ্ছেদ শিশুদের নিকট একটি নিদারুণ সমস্যা। তাদের আনুগত্য মাতা বা পিতার উপর থাকা উচিত, তা তারা ঠিক করতে পারে না। বহু ক্ষেত্রে শিশুরা মাতার মৃত্যুর জন্যে পিতাকে এবং পিতার মৃত্যুর জন্য মাতাকে দায়ী করেছে। অন্য দিকে মৃত্যুকালে তাঁদের একজন অপরজনকে যথাযথ সেবা শুশ্রূষা করছে দেখলে তারা অন্তরে তৃপ্ত

হয়। এতে সামান্য মাত্র অবহেলা পরিদৃষ্ট হলে তারা জীবিত পিতা বা মাতাকে অশ্রদ্ধা ও ভয় করে। এমন কি, তাঁরা খাদ্য দিলেও তা তারা নির্ভয়ে খেতে পারে না [অবহেলা ও পরিত্যাগ প্রায় শিশু অপরাধী সৃষ্টি করে।]

নিম্নোক্ত প্রকার পিতামাতাদের সন্তানগণ প্রায়ই শিশু-অপরাধী ও পরে কিশোর-অপরাধী হয়ে থাকে।

(১) সংসার ত্যাগী বা পলাতক পিতামাতা : এঁরা সন্তানদের রক্ষণা-বেক্ষণের ব্যবস্থা না করে পলাতক হয়েছেন। (২) অপরাধী পিতামাতা : এঁরা শিশুদের পাপের মধ্যে রেখে মানুষ করেন। কিংবা এঁদের সহায়তায় পাপ কার্য করেন। (৩) সহায়ক পিতামাতা : এঁরা শিশুদের অপরাধসমূহকে উৎসাহ দেন। (৪) অসচ্চরিত্র পিতামাতা : ওঁরা নির্বিচারে শিশুদের গোচরে যৌন-সংসর্গ বা প্রেমালাপ করেন। (৫) অযোগ্য পিতামাতা : এঁরা শিশুদিগকে প্রয়োজনীয় নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষাদানে অমনোযোগী বা অপারগ। (৬) নিস্পৃহ বা উদাসীন পিতামাতা : সন্তানদের মঙ্গলামঙ্গলে এঁদের একটুও ভাবনা নেই। পুত্রদের সম্বন্ধে ওঁরা কোনও খোঁজখবর রাখেন না। মানুষ হওয়ার জন্য এঁরা প্রায় ওদের পরাশ্রয়ে রেখেছেন।

কিশোরদের এবং শিশুদিগকে কিছু বোঝাতে হলে ওদের বুদ্ধিমত্তা অনুযায়ী সাজেস্‌শন প্রয়োগ করতে হবে। অশিক্ষিতদের সম্পর্কে যে বাক্-প্রয়োগ প্রযোজ্য, তা শিক্ষিতদের পক্ষে প্রযোজ্য হয় না। অধিকক্ষেত্রে বয়স হিসাবে বুদ্ধির তারতম্য হয়। উপরন্তু সকলের কালচার ও বোধশক্তি একপ্রকার হয় না। শিশুরা সংক্ষিপ্ত ভাষাতে কথা বলা পছন্দ করে। (f)

বিঃ দ্রঃ—অসচ্চরিত্র পিতামাতা তাদের মূক বধির, নির্বোধমন্য ও অন্ধ পুত্রকন্যাদের সম্মুখে প্রেমালাপ করেন। এ বিষয়ে তাঁরা প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করেন না। এ সকল শিশুরা বহু পরিপূরক অতীন্দ্রিয়তা লাভ করে। একটি ইন্দ্রিয়শক্তির অভাব ঘটলে ওদের অন্য ইন্দ্রিয়গুলি প্রবল হয়। এদের চাতুর্য অনুমান ও অনুভব শক্তি অত্যন্ত প্রখর। সামান্য বিচ্যুতিতে এরা অন্যদের অপেক্ষা অধিক ব্যথা পায়। অন্য শিশুদের মত ওদেরও মনে ওই জন্য পিতামাতার প্রতি ঘৃণা ও ক্রোধের উদ্রেক হয়।

(f) বিবিধ মানুষগোষ্ঠির শিশুদের অশ্রুগ্রন্থি সৃষ্টির ক্ষণ ও তাদের কষ্টহীনতার পরিমাপ থেকে সংশ্লিষ্ট মনুষ্য গোষ্ঠীও কোনটি আগে ও কোনটি পরে সভ্য হয়েছে তা বলা যায়; তদ্দারা ওদের সভ্য হওয়ার কাল পর্যন্ত নির্ধারণ করা সম্ভব।

উপরোক্ত দোষের জন্য পিতামাতাদের আইনী শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত। পিতামাতার অযোগ্যতা ও অমনোযোগিতা হতে উদ্ভূত কিশোর এবং শিশু অপরাধী হওয়ার আরও কয়েকটি বিশেষ কারণ নিম্নে উদ্ধৃত করা হল।

(১) পিতামাতার শাসনকার্য নির্দয় ও কদর্য হলে, (২) মাতা সর্বক্ষণই তাকে পথে পথে ঘুরতে দিলে এবং (৩) পরিবার সুসংহত না হলে—অর্থাৎ মাতা সর্বক্ষণ বাইরে থাকলে বা পিতা পানোন্মত্ত ও পরিবার সম্বন্ধে উদাসীন হলে দশজন শিশুর মধ্যে নয়জন শিশু তাদের আর্থিক অবস্থা, বুদ্ধিমত্তা ও জাতি নির্বিশেষে অপরাধী হতে পারে। যুদ্ধকালীন উন্মাদনা, রাষ্ট্রবিপ্লব, মাস্‌মাইগ্রেসন ও অবহেলিত উদ্বাস্তু সমাজও কিশোর অপরাধী সৃষ্টি করে। বিভিন্ন দেশ হতে সংগৃহীত পরিসংখ্যানসমূহ উহা প্রমাণ করে।

ভাঙা সংসার [Broken family] শিশু-অপরাধী সৃষ্টির সহায়ক। বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং সেপারেশন, মাতাপিতার পৃথক অবস্থান, পরিত্যক্ত ও পরিত্যক্তা স্বামী স্ত্রী, মাতাপিতার পৃথক সংসার ও বসবাস, স্ত্রী বা স্বামীর মৃত্যু অপরাধী সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু ওই মতবাদ প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। বরং অধিক কিশোর-অপরাধী সৎ ও সংযুক্ত পরিবার হতে এসেছে। সংযুক্ত পরিবার হতে ৩৫ শতাংশ এবং বিযুক্ত পরিবারগুলি হতে ৬৪ শতাংশ কিশোর অপরাধীর উদ্ভব হয়। পরিসংখ্যান ও সমীক্ষা হতে উহা প্রমাণিত। এইজন্য শিশু-অপরাধী হওয়ার অন্যান্য কারণও অনুসন্ধান করতে হবে।

প্রায়ই দেখা গিয়েছে যে প্রথম ও শেষ সন্তানদের মধ্যে অপস্পৃহা কম। মধ্যবর্তী সন্তানদের মধ্যে অপরাধমুখীতা বেশী দেখা যায়। তারা প্রায়ই এক-গুঁয়ে ও রাগী হয়ে থাকে। এরা বোধকরি অন্যগুলি অপেক্ষা কম যত্ন পেয়েছে। এদের প্রতি অধিক লক্ষ্য রাখা উচিত হবে। বহু বালক-অপরাধী অপরাধী পিতা ও আত্মীয়দের অনুগামী হয় ও তাঁদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। জনৈক খুল্লতাত তার ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে একত্রে সিঁদেল চুরি করে। ধরা পড়ার পর সে তার ওই খুল্লতাতের নাম করে নি।

[অবৈধ সন্তানরা বা পিতৃ-নামহীন সন্তানরা প্রায়ই নিজেদের ঘৃণিত মনে করে। ওই বিষয়ে অন্যের বিদ্রূপের কারণ হলে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তাদের জন্মবৃত্তান্ত তাদের জানতে না দেওয়া বিধেয়।]

ঘর বাঁধা খোকা খুকুদের সহজাত স্পৃহা। তারা পুতুলের বিয়ে দেয় ও খেলা-ঘর পাতে। তাতে তারা একনিষ্ঠা ও সুষ্ঠু বোধের পরিচয় দেয়।

পিতামাতার মধ্যে এর অন্যথা দেখলে এর বিরুদ্ধে তাদের মধ্যে এক বিরূপ প্রতিক্রিয়া আসে। পুতুল পুত্রকন্যাকে তারা যেরূপ ভালবাসে সেইরূপ ভালোবাসা তারা তাদের পিতামাতা হতেও প্রত্যাশী। পিতামাতা ও পরিজনরা অন্যরূপ হলে শিশুরা তাদের সাহচর্য এড়াতে বদ্ধপরিকর হয়।

নিউরোটিক রোগগ্রস্ত ও উন্মাদ পিতামাতা এবং ঐরূপ রোগী স্বজনদের মধ্যে জাত ও প্রতিপালিত শিশুদের প্রায়ই নিউরেটিক হতে দেখা গিয়েছে। এক্ষেত্রে অপরাধী রোগীর [Abnormal criminal] সৃষ্টি হতে পারে। তবে—শিশুর জন্মের পর পিতা বা মাতা উন্মাদ হলে তার কোনও ক্ষতি হয় না। কারণ, বীজকোষের [Germ cell] সহিত দেহ-কোষের [Somatic] কোনও সম্পর্ক নেই। মাতাপিতার উন্মাদ অবস্থায় জন্মালে বীজকোষের প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পিতা বা মাতার উন্মাদ অবস্থায় সন্তানোৎপাদন না হওয়া সম্পর্কে পিতামাতার সুস্থ জনের সতর্ক থাকা তো উচিতই; তাঁদের আত্মীয়স্বজনদেরও ওঁদের উন্মাদনা রোগ নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত উহা প্রতিরোধ করা উচিত। কারণ ঐ অবস্থায় জন্মালে শিশুর অপরাধমুখী, জড় কিংবা উন্মাদ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। [তবে—মনোরোগ এবং উন্মাদনা রোগের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ আছে।]

কিশোর ও শিশু অপরাধী এবং তাদের অভিভাবকদের বহু দোষ গুণ সম্বন্ধে বলা হলো। কিন্তু ওই সকল দোষের প্রতিটিই নিবারণযোগ্য। অভিভাবক এবং পিতামাতার অবশ্য গ্রহণীয় ও শিক্ষণীয় কয়েকটি বিষয় নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

(১) গ্রহণীয়: শিশুদের বুঝতে দিতে হবে যে তারা পিতামাতার পছন্দমত কার্য করে বলে শুধু তাদের তাঁরা ভালবাসেন তা নয়। পিতামাতার মত অনুযায়ী কার্য না করলেও তাঁরা তাদের সর্বক্ষণ ভালোবাসবেন ও পছন্দ করবেন। শিশুদের নিকট পিতামাতার প্রতিটি আচরণ গ্রহণীয় হওয়া চাই। [Acceptance]

(২) নিয়ন্ত্রণ: শিশুদের এমন শিক্ষা দিতে হবে যাতে তাদের কার্যাদি—তারা একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে নিবদ্ধ রাখে। ঐ সীমার বহির্ভূত কোনও কার্য করলে তা অন্যায়ের পর্যায়ে পড়বে। তাকে আত্মসংযম শিক্ষা দিতে হবে। তাতে হিংসা ও ক্রোধের বশীভূত তারা হবে না। নিজের ও অন্যের কোনও ক্ষতি তারা করবে না। আত্ম-নিয়ন্ত্রণ তাকে শিক্ষা দিতে হবে।

(৩) বোধনীয় : শিশুদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট নৈতিক মানের সৃষ্টি করতে হবে; যাতে সে মানবিকতা বোধ এবং দয়ামায়া সাহস সততা মহানুভবতা সুবিচার বোধে উদ্বুদ্ধ হবে। উচিত অনুচিত, ভালমন্দের প্রভেদ তাকে বুঝতে দিতে হবে।

(৪) বিশ্বাস : কোন বিষয় বিশ্বাস করা উচিত, কোনটি বা বিশ্বাস করা উচিত নয়, সেই সম্বন্ধে তাকে বুৎপন্ন করতে হবে। কাকে বিশ্বাস করা উচিত, কাকে বিশ্বাস করা অনুচিত : ঐ সবও তাকে খুলে বলা ভালো। নচেৎ তারা দুর্বৃত্তদের দ্বারা অপহৃত বা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। শিশুদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস উন্মেষ করতে হবে। সর্বক্ষেত্রে তারা যেন তাদের পিতামাতা ও অভিভাবকদের বিশ্বাস করতে পারে।

(৫) সাহায্য : নিজেদের আচরণ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যক্তি ও বস্তুর প্রতি সুষ্ঠু ব্যবহার ও সহ-অবস্থানের রীতিনীতিতে অভ্যস্ত হবার জন্য শিশুদিগকে বন্ধুজনোচিত সাহায্য করতে হবে। পিতামাতাকে প্রত্যেক শিশুর আস্থা ভাজন হতে হবে। শুধু তাই নয়। সন্তানরা যাতে নিজের ও অন্যের উপকার করবার ক্ষমতা অর্জন করে তার জন্যে তাকে সাহায্য করতে হবে। শিশুর জিজ্ঞাসু [অনুসন্ধিৎসু] মনের প্রতিটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিন। ঐ বিষয়ে তাদের বিরূপ করলে ফল অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে।

(৬) স্বাধীনতা : একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে শিশুদের পূর্ণস্বাধীনতা দেওয়া চাই। উহার বাইরে সে যেতে চাইলে তাকে বারে বারে সংশোধন করতে হবে। [শৈশবের শিক্ষার জন্যই শিশুরা আগুন ছোঁয় না।] শিশুদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশের জন্য স্বাধীনতার প্রয়োজন আছে। কোনও কিছুতে বারণ করলে উহার কারণ তাকে বোঝাতে হবে। ওরা যেন বোঝে যে, ওদের মঙ্গলের জন্য উহা বলা হলো। অপরিহার্য না হলে তাদের কোনও কার্যের প্রতিবন্ধক হওয়া অনুচিত। বড়দের যা কিছু পছন্দ তা ছোটদের পছন্দ নাও হতে পারে।

(৭) ভালবাসা : শিশুরা যেন বুঝতে পারে যে, তাদের প্রতি তাদের পিতামাতার অসীম ভালবাসা আছে। তাঁদের কাছে তাদের প্রয়োজন সর্বাধিক। সংসারে প্রত্যেকেই সকল সময়ে তার মঙ্গলামঙ্গলের জন্য চিন্তিত।

(৮) প্রশংসা : শিশুদের প্রতিটি সৎকার্যের জন্য স্বীকৃতি দিতে হবে। বা! বেশ ভালো। এইসব বলে তাদের উৎসাহ দিতে হবে। এতে তারা খুশী হয়।

বয়ঃক্রম অনুযায়ী ধাপে ধাপে ওদের মনোবিকাশ ঘটে। ওদের গ্রহণ-শক্তি ও সহ্যশক্তির একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে। তার বাইরে তাদের অভ্যস্ত করলে তারা ভেঙে পড়তে পারে। অভিভাবকরা ইহা যেন স্মরণ রাখেন। নিজ শিশু যাতে অন্যের দ্বারা প্রশংসিত হয় তার জন্যে ওদের উপর শিক্ষাদীক্ষার ও অন্যান্য বিষয়ের গুরুভার চাপানো অনুচিত।

(৯) রক্ষা-কার্য: শিশুরা যেন বিশ্বাস করে যে তাদের পিতামাতা তাদের সর্বক্ষেত্রে রক্ষা করবেন। তাদের কোনও বিপদ আপদ হতে তাঁরা দেবেন না। নিরাপত্তার জন্য তাদের কোনও চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন নেই।

(১০) স্বীকৃতি: শিশুদের সঙ্গে গৃহ নির্মাণ, শকট ক্রয়, বিদেশ ভ্রমণ, আসবাব ক্রয়, পরিচ্ছদ ও খাদ্য প্রভৃতি বিষয়ে পরামর্শ করলে ফল ভালো হয়। তাদের মতামতের উপর কিছুটা প্রাধান্য দিলে তাদের ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশ ঘটে। এতদ্বারা তাদের সুকুমার বৃত্তিগুলি সতেজ হবে।

(১১) নিরাপত্তা: শিশুরা যেন উপলব্ধি করতে পারে যে তাদের গৃহের মত নিরাপদ স্থান কোথাও নেই। প্রয়োজন হলে সাহায্য করবার জন্যে পিতা-মাতা ও পরিজনবর্গ নিকটেই আছে।

(১২) সংযম: শিশুদিগকে কয়েকটি বিষয়ে সংযম শিক্ষা দিতে হবে। কতটা পর্যন্ত এগোন উচিত, কিরূপ পরিমাণে কি কার্য করা ভাল, কখন ও কেন অতিরিক্ত কার্য এড়ানো উচিত, ভ্রমণ, ব্যবহার, কার্যাদি, খাদ্যাদি প্রতিটি বিষয়ে তৎসম্পর্কিত জ্ঞান তাকে দিতে হবে। কোন কাজ আগে করতে হবে, কোন কাজ তার পরে করতে হবে, সেই সম্পর্কে তাদের জ্ঞান দেওয়া বিধেয়।

বয়ঃপ্রাপ্ত হলে শিশু দেখবে যে এতদিন তাকে যা শিখান হয়েছে, অধিকাংশ ব্যক্তি তার বিপরীত কার্য করে। তজ্জন্য সে জীবন যুদ্ধে হেরে যাবে। তাতে সে নিদারুণ আঘাত পাবে। তাতে তার মানসিক ক্ষয় ক্ষতির প্রচুর সম্ভাবনা। এজন্য তার মনকে পূর্ব হতে প্রস্তুত করে রাখতে হবে। সেজন্য পূর্বাহ্নে তাকে সাবধান করে বলতে হবে—'খোকা! বহু ব্যক্তিকে তুমি মন্দ কার্য করতে দেখবে। কিন্তু তুমি যেন সেই মত কাজ কর না। নিজে ঠকোনা। কাউকে ঠকিয়ো না। আপন স্বার্থ তুমি নিশ্চয়ই দেখবে। কিন্তু তাতে অন্যের স্বার্থের ক্ষতি না হয়। ঐরূপ চিত্ত-প্রস্তুতির ফলে, অন্যায় পন্থানুসরণে তারা নিবৃত্ত হবে।

শিশুরা স্বল্প বাক্যে ভাবপ্রকাশের পক্ষপাতী। ওদেরই সরলীকৃত ও সংক্ষিপ্ত ভাষায় তাদের বোঝাতে হবে। বাক্যের ন্যায় ঘটনা ও দৃষ্টান্তও তাদের প্রভাবিত করে। প্রাপ্তবয়স্করা [Adolecent] ভিন্ন পরিবেশে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারে না। কিন্তু ঐ একটি বিষয়ে শিশুদের গ্রহণশক্তি অত্যন্ত বেশী। এজন্য কু ও সু পরিবেশ দ্বারা তারা সহজে প্রভাবিত হয়। কারণ— শিশুরা অনুকরণ-প্রিয় এবং বাক্-প্রয়োগশীল। [সাজেসসিভ্] শিশুদের ভূতের ভয় ও জুজুর ভয় দেখান অত্যন্ত ক্ষতিকর। এতে ওদের মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম স্নায়ু আহত হয়। ঐরূপ ভয় বারংবার দেখালে তাদের ঐ ক্ষতি স্থায়ী হবে।

বিঃ দ্রঃ এ্যাডোলেসেন্ট তথা বয়স্করা নূতন পরিবেশে বেশী সংখ্যায় মৃত্যু বরণ করলেও শিশুরা সহজে নূতন পরিবেশে নিজেদের খাপ খাইয়ে টিকে থাকে। বিবর্তনবাদী পণ্ডিতরা জীব বিবর্তনের ক্ষেত্রে ইহা স্বীকার করেন। তাই শিশুরা বিদেশে বিদেশী ভাষা সহজে শিখতে সক্ষম। পরিবেশ এদের উপর অতি দ্রুত কার্যকরী হয়।

মাদক দ্রব্য সেবন মস্তিষ্কের বিশেষ ক্ষতিকারক। উহা মানুষের অপরাধ প্রতিরোধ শক্তির হ্রাস ঘটায়। কুসঙ্গাদি, পরিবেশ ও অভাব ইত্যাদি অপ্রত্যক্ষ ভাবে এবং নেশাভাঙ্গ প্রত্যক্ষভাবে প্রতিরোধ শক্তির ক্ষতি করে। এজন্যে অপরাধীরা প্রায়ই বিবিধ নেশায় অভ্যস্ত হয়। বয়স্ক অপরাধীরা উহার সাহায্যে দলের জন্য কিশোরদের সংগ্রহ করে। অপরাধীদের ব্যবহৃত কয়েকটি মাদক দ্রব্যের স্বরূপ ও উহাদের গুণাগুণ নিম্নে উদ্ধৃত করা হল।

(১) মরিহুনা [Morihuna]: এই ঔষধ সেবনের পর অপরাধীরা ভয়-হীন, কষ্টশূন্য এবং অতিমাত্রায় বেপরোয়া হয়। মাত্রাহীন সেবনে এদের ১৮০ সেকেণ্ডে এক মিনিট হয়। মানুষের হাতগুলি ৫০ ফুট লম্বা মনে হয়। এরা ঐ সময় বহুতল বাটির ছাদ থেকে নিম্নে লাফ দেয়। ৭৫ মাইল বেগে ধাবিত শকটে ওরা উঠতে চেষ্টা করে। [রেল কামরা ভাঙিয়ে ও ওয়াগন ব্রেকারদের উপকারী ঔষধ।] উহা সেবনে যৌন স্পৃহা ও উহার ক্ষমতা অতি-মাত্রায় বাড়ে। যৌনজ অপরাধীদের উহা ব্যবহার করতে দেখা যায়।

(২) হিরোইন [Hiroin] এই ঔষধ ব্যয়বহুল। কিন্তু য়ুরোপীয় ও এ্যাঙলো ইণ্ডিয়ান অপরাধীদের উহা বেশী পছন্দ। বিদেশী স্মাগলারগণ দ্বারা উহা অবৈধ ভাবে ভারতে আনা হয়। উহা দ্রুত ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। কিশোর অপরাধীরাও ইহা ব্যবহার করে। এদেশে উহার ব্যবহারকদাচিৎ দেখা গিয়েছে।

(৩) কোকেন [Cocaine]: কোকেন ভারতীয় অপরাধীদের প্রিয় বস্তু। উহা দ্রব্য সম্পর্কিত [offence agst property] অপরাধ স্পৃহার সহায়ক। উহা বালকদের [দ্রব্য সম্পর্কিত] অপরাধ-স্পৃহা এবং বালিকাদের যৌনস্পৃহা জাগ্রত করে। চোর ও বেশ্যারা উহা অধিক ব্যবহার করে। নিয়মিত সেবন মানুষকে আশঙ্কিত করে তোলে। সর্বদাই তারা বিপদের আশঙ্কাতে আশঙ্কিত হয়। দেশলাইয়ের বাক্সতেও এরা পুলিশের উপস্থিতি অনুভব করে। নেশা টুটার পরও ঐ বোধ এরা হারায় না। উহা তাদের সাবধান হওয়ার সহায়ক হয়। কোকেন উহাদের জিহ্বাকে মসীবর্ণ করে। ওদের জিহ্বা পরীক্ষা করার পর ওদের পুরানো চোরত্ব সম্বন্ধে পুলিশের সন্দেহ থাকে না। কোকেনখোরগণ সুখকর দিবা স্বপ্ন দেখে। মনে হয় তারা সপ্তম স্বর্গে উঠেছে। ইহা পানের মধ্যে সেবনের নিয়ম। শহরের বস্তীতে বহু অবৈধ কোকেন-ডেন্ আছে। রাত্রে সেখানে পুরানো চোরদের আড্ডা জমে। চীনা ও দেশীয় গুণ্ডারা বিদেশী নাবিকদের সাহায্যে উহা আমদানী করে।

(৪) মদ্যাদি: মদ্যপায়ীরা সাধারণতঃ ব্যক্তির বিরুদ্ধে [Offence agst. Person] অযৌনজ ও যৌনজ অপরাধ করে। মারপিট ও খুন করার পূর্বে এরা প্রায়ই মদ্যপান করে। সাদা চোখে যা করা যায় না, রঙিন চোখে তা করা যায়। কিছুক্ষণের জন্য উহা অপরাধ প্রতিরোধ সম্পর্কিত স্নায়ুকে নিষ্ক্রিয় করে। তখন ওরা ভালমন্দ ও উচিত অনুচিত বিচার-শক্তি হারায়। ডাকাতির পূর্বে মফঃস্বলে তাড়ি ও ধেনো মদ ডাকাতরা সেবন করে। শীর্ণকায় ব্যক্তিরাও উহা উদরস্থ করা মাত্র দুর্ধর্ষ হয়ে ওঠে।

(৫) মরফিয়া: উহা দেহের ও মনের শক্তি বাড়িয়ে দেয়। উহা মানুষকে কষ্টহীন করে তোলে। অপকর্মে দৈহিক কষ্টহীনতার প্রয়োজন হয়। ফলে, এরা সাংঘাতিক জখম হওয়া সত্ত্বেও বহু দূর হাঁটতে পারে। সজ্ঘাতের পরে ও পূর্বে ডাকাতরা মরফিয়া সেবন করে।

বিঃ দ্রঃ—অপরাধীরা অহিফেন গাঁজা ও সিদ্ধি কম ব্যবহার করে। ওইগুলি মানুষকে অলস করে তোলে। ওদের সেবকরা ভালোমন্দ উভয়কার্য সম্বন্ধেই নিস্পৃহ। ওগুলি তারা অবসর বিনোদন কিংবা অপরাধ-বিরাম কালে সেবন করে। [অপরাধ-বিরাম কালে উহারা কিছুকাল অপকর্ম করে না।] কারাবরণ অর্থে তারা বিশ্রাম বোঝে। ওই সময় ওদের ওই হাল্কা নেশার প্রয়োজন হয়। কেউ কেউ বলে—অহিফেন ওদের রতি-কাল বর্ধক ঔষধ।

নেশাভাঙে অভ্যস্ত বালকরা ওই সকল দ্রব্যের জন্য বয়স্কদের উপর নির্ভরশীল। উহার প্রাপ্তির কারণে ওদের বয়স্ক পাপীদের অনুগত হতে হয়। অন্য দিকে—উহা বালকদের প্রতিরোধ-শক্তি কমিয়ে তাদের অপরাধী করে তোলে। ওই ক্ষেত্রে সামান্য অভাব বা প্রলোভন ওদের উপর দ্রুত কার্যকরী হয়েছে।

শিশুরা শৈশবে অপরাধ-প্রবণ হলেও তারা অপকর্ম করতে অপারগ থাকে। ওদের মোটর নার্ভ তখনও পর্যন্ত সবল না হওয়ায় উহা কার্যকরী হয় না। প্রয়োজনীয় দৈহিক শক্তি ও বুদ্ধিমত্তা না থাকাও উহার কারণ। এজন্য বুদ্ধিমত্তা আদি এবং মোটর নার্ভ সবল হওয়ার পূর্বেই ওদের ওই অপস্পৃহা প্রদমিত হওয়া প্রয়োজন। লক্ষ্য রাখতে হবে শিশুর ওই ক্ষীণ অপরাধ-স্পৃহা আপনা হতেই প্রদমিত হচ্ছে কি না। যদি তা না হয়, তা হলে বুঝতে হবে তা হচ্ছে না কেন? ওই স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রমের কারণ অবগত হতে হবে।

[শিশুরাই দৈহিক ও মানসিক বিবর্তনবাদের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বানরানুরূপী জীব হতে মানুষের সৃষ্টি। ওই জন্যে শিশুর পায়ের চেটোও বানরের পায়ের চেটোর মত ফ্লেক্সিবল। মৎস্য জীব হতে উভচর ভেক জীবের জন্ম। উহার প্রমাণ মৎস্যাকার ভেকশিশু বেঙাচি। যে দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তনের জন্য লক্ষ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, তা শিশুদের মধ্যে মাত্র কয়েক মাস বা বৎসরে সম্পূর্ণ হয়।

নিরপরাধ সভ্য মানুষ প্রাচীন অপরাধী আদি-মানুষ হতে সৃষ্ট। এ জন্য মানব শিশুদের মধ্যে আজও অপরাধ প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্তির পর ঠিক বেঙাচির লেজ খসিয়ে ব্যাঙ হওয়ার মত তাদের ওই অপরাধ-স্পৃহা আপনা হতেই পরিত্যক্ত হয়েছে।]

শিশুদের উক্তরূপে মানসিক বিবর্তন ওদের দৈহিক বিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সমাধা হয়। তিন বৎসর পর্যন্ত শিশুর বর্ধন দ্রুত। [অপরাধ-স্পৃহার ক্রমাবির্ভাব]। এর পর কিছুটা মন্দগতি। [সৎপ্রেরণার উপস্থিতি]। ছয় সাত বৎসর বয়সে আবার দ্রুততা আসে। [প্রতিরোধ-শক্তির সৃষ্টি]। এগারো বারো বৎসর পর্যন্ত ওদের বর্ধন প্রায় স্থির থাকে। পরে আবার তারা বাড়তে সুরু করে। ভাইটামিন ও হরমন আদির অভাব কিংবা বীজাণুর আক্রমণ ঘটলে দেহের বৃদ্ধি অনুযায়ী মস্তিষ্কের বর্ধন হয় না। তাতে অপরাধী-রোগীর সৃষ্টি হতে পারে।

ওদের দৈহিক বৃদ্ধি ১৪ হতে ১৫ বৎসর বয়সে পূর্ণতা প্রাপ্তির পর থেমে যায়। [কৈশোর বয়স] পুনরায় যৌবন আগমনে পরিবর্তন তীব্র হয়। ওদের তখন বয়স্ক লোক [adult] বলা হয়।

শিশুর মোটর নার্ভের বৃদ্ধি এবং তৎসহ বুদ্ধিমত্তার বিকাশও ওই অনুপাতে ঘটে। শিশু সাত মাসে বসবে। তের মাসে দাঁড়াবে। দশ বৎসর বয়সে সুসংহত কাজ করবে। গবেষণার্থে ওইগুলি বিচার করা উচিত। এমন কি শিশুর অনুকরণ-প্রিয়তারও একটি বয়স আছে। শৈশব, কৈশোর ও যৌবন পর্যন্ত একাধিক বয়ঃসন্ধিক্ষণ আছে। ওই বয়ঃসন্ধিক্ষণ গুলিতে বিবিধ রূপ ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ঘটে। ফলে, ওদের ধ্যান ধারণা ওই সময় বদলে যায়। ওই সময় তাকে প্রচেষ্টা দ্বারা ভিন্ন মানুষে পরিণত করা সম্ভব। উহা উপকারী [উর্দ্ধমুখী তথা আরোহী] হতে পারে। আবার, উহা অনুপকারী [অবরোহী তথা অধোমুখী] রেট্রোগেটিভও হতে পারে।

দৈহিক বৃদ্ধি একটি স্থানে এসে তূষ্ণীভাব লাভ করে। তাই বৃদ্ধের বয়স পুনরায় কখন বালকের মত হয় না। কিন্তু তাদের মন বালকোচিত হতে পারে। অপরাধীদের মধ্যে প্রায়ই শিশুসুলভ ভাব দেখা যায়। তাদের তখন বুড়ো খোকা [Big Boy] বলা হয়। এজন্য বয়ঃসন্ধিক্ষণগুলিতে সাবধান হওয়া উচিত।

বিঃ দ্রঃ—শৈশবে শিশুরা অত্যন্ত স্বার্থপর হয়। জন্তুদের উপর ওরা অত্যাচার করে। নিজেদের মধ্যে ওরা মারামারি করে। দ্রব্যাদি কেড়ে নেওয়া ও লুকিয়ে রাখা, ক্রোধ ও লোভ শিশুদের স্বভাবজাত ধর্ম। কিন্তু বয়োঃবৃদ্ধির সহিত তারা ধীরে ধীরে তাদের ওই স্বভাব পরিত্যাগ করে। একটি নির্দিষ্ট বয়সের পর তারা কিছুটা স্বার্থত্যাগী হয়। ওদের মধ্যে সৎপ্রেরণার ক্রমাবির্ভাবই উহার কারণ। কিন্তু ওই সৎপ্রেরণা ক্ষণস্থায়ী ও দুর্বল থাকে। আরও কিছু পরে ওরা অপরাধ-প্রতিরোধ শক্তি অর্জন করে।

আদিযুগে মানুষমাত্রেই অপরাধ প্রবণ ছিল। ধীরে ধীরে তারা পূর্ব অভ্যাস ত্যাগ করে সভ্য মানুষ হয়। উচ্চ নিম্ন-শ্রেণী নির্বিশেষে শিশুদের ঐরূপ ব্যবহার তা প্রমাণ করে। উহা প্রমাণ করে যে মানুষ প্রথমে অপরাধস্পৃহা, পরে সৎপ্রেরণা ও সর্বশেষে প্রতিরোধ শক্তি লাভ করেছে।

কু-পরিবেশ অপর্স্পৃহাকে সবল ও সৎপ্রেরণাকে দুর্বল করে। সুপরিবেশ অপরাধস্পৃহাকে দুর্বল এবং সৎপ্রেরণাকে সবল করে। কিন্তু প্রতিরোধ শক্তি

[রেসিষ্টেনস্ পাওয়ার] অধিক শক্তিশালী হলে কুপরিবেশ কারুর ক্ষতি করতে পারে না। পরিবেশ নির্বিশেষে উহা রক্ষা-কবচের মত ওদের সদা সর্বদা রক্ষা করে।

[ভৃত্যদের হেপাজতে শিশু কন্যাদের ছেড়ে দেওয়া বিপজ্জনক। এ দেশে ভৃত্যদের মধ্যে বহু কুসংস্কার আছে। এরা যৌন রোগগ্রস্ত হলে তাদের যৌন দেশ শিশুকন্যাদের যৌনদেশে ঘর্ষণ করে। তাদের ধারণা এতদ্দ্বারা তারা সত্বর নিরাময় হবে। এতে বহু শিশুকন্যা রোগগ্রস্ত হয়েছে।]

দুই প্রকারের কিশোর অপরাধী দেখা যায়। উহাদের সহিত সাধারণ অন্ধ ও জন্মান্ধদের তুলনা করা যায়। সাধারণ অন্ধদের আলোক সম্বন্ধে জ্ঞান থাকে। কারণ—পরবর্তীকালে তারা অন্ধ হয়েছে। প্রথমোক্ত শিশুরা জ্ঞানোন্মেষের পূর্ব হ'তেই অপকর্মে অভ্যস্ত হয়। পাপ-পুণ্য ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে সভ্যজনোচিত ধারণা তাদের নেই। স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতীয় [ক্রিমিনাল ট্রাইব] বালকরা ঐরূপ অপরাধী। দ্বিতীয়োক্ত বালকরা কিছুকাল সৎ জীবন যাপন করার পর অবস্থাগতিকে অপরাধী হয়েছে। ন্যায় অন্যায় ও উচিত অনুচিত সম্বন্ধে তাদের ধারণা আছে।

বয়স্ক অপরাধীদের মত কিশোর অপরাধীদের মধ্যেও, প্রাথমিক অপরাধী এবং প্রকৃত অপরাধী [শেষ পর্যায়ের অপরাধী] ও অপরাধ-রোগী প্রভৃতি দেখা যায়। ওদের মধ্যে দৈব, অভ্যাস ও স্বভাব-অপরাধীও দেখা গিয়েছে। তবে—তারা প্রায় সকলেই প্রাথমিক পর্যায়ের অপরাধী। ওই সকল অপরাধীদের স্বরূপ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে পূর্ববর্তী নিবন্ধগুলিতে বলা হয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণীর অপরাধীদের চিকিৎসা পদ্ধতি বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। কিশোর অপরাধীদের কয়েক প্রকার চিকিৎসা নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

(১) প্রশাসনিক চিকিৎসা : স্বীয় পরিবার ও সমাজ কিশোর অপরাধীকে শোধরাতে না পারলে রাষ্ট্রকে ওদের শোধরাবার ভার নিতে হয়। রাষ্ট্রীয় চিকিৎসাকে প্রশাসনিক চিকিৎসা বলা হয়।

কিশোর অপরাধীদের জন্য পৃথক আটক ঘর [হাউস অফ ডিটেনসন্] পৃথক আদালত ও পৃথক সংশোধনাগার আছে। সেখানে উর্দী পরে পুলিশের উপস্থিতি নিষেধ। তাঁরা সিভিল ড্রেসে কিশোর অপরাধীদের সংস্পর্শে আসেন। পুলিশ হেপাজতে যে তারা আছে—তা তাদের বুঝতে দেওয়া কর্তৃপক্ষের কাম্য নয়। সংশোধনাগারে ওদের লিখন-পঠন ও শিল্পকর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হয়। মুক্তির

পর ওদের উপর কিছুকাল লক্ষ্য রাখার জন্য প্রবেশন 'অফিসর' নামক একশ্রেণীর সরকারী কর্মী নিযুক্ত আছে। কিন্তু নির্দিষ্টকাল অতিক্রান্ত হলে ওদের কোন খোঁজ রাখার নিয়ম নেই। ওদের কর্মসংস্থানের জন্য কোন সরকারী ব্যবস্থা নেই।

সংশোধনাগারে ওদের মানসিক ত্রুটির কোন চিকিৎসা করা হয় না। ভালো মন্দ স্বাস্থ্য নির্বিশেষে ওদের দৈহিক প্রয়োজন যাহাই হউক না কেন, একই খাদ্য ওদের প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট থাকে। ওদের হরমন ও ভাইটামিন ডিফিসিয়েন্সী প্রতীকারের ব্যবস্থা নেই। আরও আশ্চর্য—একজন বয়স্ক ব্যক্তির সহিত সোপার্দ হলে ওদের বড়দের আদালতে বিচার হয়।

অধুনা গণ-গ্রেপ্তার [Mass arrest] প্রোটেক্‌টিভ এ্যারেষ্ট, পিউনিটিভ্ এ্যারেষ্ট, প্রিভেনটিভ এ্যারেষ্ট, স্থইপিঙ এ্যারেষ্ট [ঝাড়ুকেস্] লিগ্যাল এ্যারেষ্ট প্রভৃতির বিষয় শুনা যায়। কিশোরদের ঐরূপ অকারণ গ্রেপ্তার তাদের সর্বনাশের কারণ। স্ট্যাটিসটিক্স ঠিক রাখবার জন্য থানাগুলি ওই বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামে। [সর্বত্র সত্য নয়।] কিশোরদের উহা আত্মসম্মানের হানি ঘটায়। ফলে, তারা প্রচণ্ডভাবে সরকার বিরোধী হয়ে ওঠে। কেহ কেহ অপমানে আত্মহত্যাও করেছে। কিশোরদের তাতে আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হয়। তৎসহ উহা তাদের ক্রোধে উন্মত্ত করে। অন্যেরা এতে নিজেদেরকে অপরাধীতে পরিণত করে। সাক্ষ্য সাবুদ সংগ্রহ করার পূর্বে ওদের গ্রেপ্তার করা অনুচিত। অন্যথায় বাটিতেই তাদের জামিনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

[প্রকৃত দোষী ব্যক্তিরা পলায়ন বিশারদ হওয়াতে গ্রেপ্তার এড়ায়। কিন্তু—আত্ম বিশ্বাসী উৎকৃষ্ট তরুণরা না পালানতে নির্যাতিত হয়। তাই—না চিনে ও না জেনে কাউকেগ্রেপ্তার করা উচিৎ নয়।]

মান্ধাতা আমলের বিচার-ব্যবস্থাও অপরাধী সৃষ্টির জন্য দায়ী। প্রাইভেট মামলার কিছু মামলা মিথ্যা মামলা। সাক্ষীসাবুদ ক্রয় সামগ্রীর মত। উকিলের বাটিতে ওই জন্য রিহার্সেল বসে। [সর্বত্র সত্য নয়।] হাকিমরা স্বল্প বেতন-ভোগী ও কর্ম-ভারাক্রান্ত। মামলা শেষ হতে পাঁচ বৎসর সময় লাগে। মানী লোককে মিথ্যা মামলায় ব্ল্যাক মেইলিঙ করা সহজ। মানুষকে বেপরোয়া করতে ও আইন স্বহস্তে নিতে উহা বাধ্য করে।

পল্লী অঞ্চলে মামলাসমূহ মিটমাট করতে বাধ্য করা হয়। এতে মুহুর্মুহু উত্তেজনায় বাদী ও বিবাদী ও তাদের সাক্ষীরা অপরাধী হয় না। মিটমাট হলে দণ্ড দানের প্রয়োজন নেই। দণ্ড একদল নিম্নশ্রেণীর হীনম্মানী নাগরিক সৃষ্টি

করে। প্রতিষেধক রূপে হাকিমদের মামলা মিটমাট করানোর আইনী ক্ষমতা দিতে হবে। ছোটখাটো মামলার জন্য গ্রাম ও নগর পঞ্চায়েতের সৃষ্টি হউক। স্থানীয় ব্যক্তিদের নিকট সত্যমিথ্যা গোপন থাকে না। পাঁচ ব্যক্তির পক্ষে একত্রে অন্যায় করা সম্ভব নয়। বিচার গরীবদের বিনামূল্যে পাওয়া চাই।

বিঃ দ্রঃ প্রতি দশটি গ্রামের জন্য একটি স্থায়ী ও দুইজন মনোনীত বা নির্বাচিত স্থানীয় অস্থায়ী বিচারক সংস্থা তৈরী করে তাদের বিচার সহ তদন্ত ও মিটমাট করার ক্ষমতা দিতে হবে।

পল্লীগ্রামে বালক অপরাধীকে পড়শীয়া নিজেরা শাস্তি না দিয়ে অভিভাবকদের নিকট নালিশ জানায়। এতে ওদের আত্মসম্মানের কখনও হানি ঘটে নি। পুরুষানুক্রমে বসবাসী গ্রামীন মানুষ পরস্পরের পুত্রদের দোষগুণ সম্বন্ধে অবহিত থাকে। অন্যদের পুত্রকেও তারা নিজের পুত্রবৎ মনে করে। ওদের দোষ তারা বারে বারে ক্ষমা করে।

(২) সিম্বলিক্ চিকিৎসা : [symbol] তথা প্রতীকের সহিত ব্যবহারের সম্বন্ধ থাকতে পারে। কিশোর অপরাধীদের কোনও আচরণ ও বেশভূষার সঙ্গে তার প্রবৃত্তিসমূহের যোগাযোগ থাকা সম্ভব। বিবিধপ্রকার মানসিক এলার্জির সহিতও ওইগুলির সম্পর্ক আছে। কোনও ভুলে যাওয়া ঘটনা বা অমীমাংসিত প্রশ্নের সহিত উহার যোগাযোগ থাকে। বলবান শামসন ডায়েলামার শক্তির সহিত তার কেশের সম্পর্ক ছিল। এটি অবশ্য একটি কাল্পনিক কাহিনী। কিন্তু ওই কেশের উপর অতি আকর্ষণ থাকলে উহার অভাবে মনোবল ভেঙে যেতে পারে। এই ভাবে কোন বিষয়ে আকর্ষণ কিংবা বিরাগকে কাজে লাগানো যায়।

কোনও এক কিশোর প্রায়ই একটি বালিকাকে অনুসরণ করতো। কিন্তু বহু চেষ্টাতেও তাকে নিবৃত্ত করা সম্ভব হয় নি। তার মুখমণ্ডল গভীর ভাবে শ্মশ্রু মণ্ডিত ছিল। সে বলে যে যতক্ষণ না সে ওকে পাবে ততক্ষণ সে ওই দাড়ি কামাবে না। আমার আদেশে নাপিত ডেকে তার ওই দাড়ি বলপূর্বক ক্ষৌরীকৃত করে দেওয়া হয়। এর পর সে আর কখনও ওই কন্যার পশ্চাদনুসরণ করে নি। দাড়ির মধ্যেই যেন তার ওই রোগ ছিল।

কোনও এক য়ুরোপীয় জজ বিচারের পর জনৈক বিরল কেশ [টেকো মাথা] কিশোর অপরাধীর মস্তকে একটি টুপি পরিয়ে দেন। অন্য এক য়ুরোপীয়

জজ সাহেব একজন কিশোর অপরাধীকে জেলের বদলে দূর দেশে তার এক আত্মীয়ের বাটিতে পাঠিয়ে দেন। স্থান পরিবর্তনে সে স্থায়ীরূপে নিরাময় হয়েছিল। পরিবেশিক [এন্‌ভায়রনমেণ্টাল] পরিবর্তন মনের পরিবর্তনও ঘটায়। স্থানের ন্যায় আহারের পরিবর্তনও কার্যকরী হয়েছে। আমি একটি কিশোর অপরাধীকে যুগপৎ অখুশী ও খুশী করে তাকে নিরাময় করেছিলাম। ঐ ক্ষেত্রে তার মস্তক মুণ্ডন করে একটি সুন্দর দামী টুপি তাকে পরিয়ে দেওয়া হয়। আর সেই সঙ্গে তার হাতে তুলে দেওয়া হয় নগদ দশ টাকার একটি নোট।

(৩) দৈহিক চিকিৎসা: শিশু ও কিশোরদের রক্তের কম চাপ, স্নায়বিক দৌর্বল্য, নারভাস ব্রেকডাউন এবং হরমন ও ভাইটামিনের অভাব, অপরাধ প্রতিরোধ সম্পর্কিত স্নায়ুসমূহ দুর্বল করে। এদের হরমন ইনজেকসন, ভাইটামিন ট্যাবলেট ও পুষ্টিকর নির্ভেজাল খাদ্য এবং যথেষ্ট প্রোটীন ফুড খাওয়াতে হবে।

এই ভাবে দৈহিক চিকিৎসার পর ওদের মানসিক চিকিৎসা করা উচিত। অন্যথায় নার্ভ দুর্বল থাকাতে উপদেশ ও সাজেস্‌শন কার্যকরী হয় না। সার্প সাজেস্‌শন [তীক্ষ্ণ বাক্‌-প্রয়োগ] এবং বিষয়বস্তুর কারণ নির্ণয় দ্বারা [এক্সপ্ল্যানেটরী নোটস] বহু মনোরোগী ও অপরাধীকে নিরাময় করা গিয়েছে।

(৪) মানসিক চিকিৎসা: বহু ক্ষেত্রে বালকরা বিবিধ মনোরোগে ভুগেছে। উহাদের কয়েকটি ভুল ধারণা, লজ্জা, ভয় এবং প্রদমিত মনোজট [complex] হতে উদ্ভূত। প্রদমিত ইচ্ছা ভয় ও দুঃখের কারণ অবচেতন মন হতে চেতন মনে আনতে হবে। তথ্যানুসন্ধান এবং মনোবিশ্লেষণ দ্বারা উহা জানা যায়। অনুকূল বাক্‌-প্রয়োগ দ্বারা ওইগুলি সহজেই বিদূরিত হয়। বহু সমস্যা দ্বন্দ্বরত অবস্থায় অবচেতন মনে আশ্রয় নেয়। তখন ওই গুলির বহু আনুসঙ্গিক বিষয় ও তৎসহ মনে ভয়ের, ক্রোধের ও ঘৃণার সৃষ্টি করে। সাপ অতি ভীতু জীব। ভয় পায় বলেই সে দংশন করে। তার মনে হয় ওই বুঝি কে তার ক্ষতি করতে উদ্যত। তাই সে আগে ভাগে আক্রমণ করে। অনুরূপ কারণে বহু বালক আক্রমণাত্মক হয়েছে। চিন্তা-রোগ সহ বিবিধ মনোরোগের স্বরূপ ও উহার চিকিৎসা পদ্ধতি অপরাধ-চিকিৎসা শীর্ষক প্রবন্ধে বিবৃত করেছি।

(৫) সিমটমিক চিকিৎসা: কিশোর অপরাধীরা সাধারণতঃ প্রাথমিক

অপরাধীর পর্যায়ে রয়ে যায়। শেষ পর্যায়ের অপরাধী তাদের মধ্যে কম ক্ষেত্রে দেখা যায়। ওই জন্য প্রায়ই তাদের বহু জনের মধ্যে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হয় নি। কিন্তু ওরা শেষ পর্যায়ের অপরাধী হলে তাদের সিম্পটমিক চিকিৎসার প্রয়োজন। এখানে ওদের সামগ্রিক ভাবে চিকিৎসা না করে ওদের মধ্যে পরিদৃষ্ট প্রতিটি সিম্পটমের পৃথক পৃথক চিকিৎসা প্রয়োজন। ওই সব সিম্পটমস ও উহাদের চিকিৎসা পূর্ববর্তী প্রবন্ধে বলা হয়েছে।

(৬) ভৌমিক চিকিৎসা: পরিবর্তিত অনুকূল সমাজ ব্যবস্থা কিশোর অপরাধী সৃষ্টি করে না। ওইরূপ ভিন্নতর পরিবেশে তাদের নিরাময় করা সম্ভব। প্রায় দেখা গিয়েছে উদ্যোগ শিল্প অপরাধীদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও কৃষি-প্রধান স্থান উহাদের সংখ্যা হ্রাস করে। উহার মধ্যে মানসিক কারণও নিহিত থাকে। পূর্ববর্তী প্রবন্ধগুলিতে উহা আলোচনা করেছি। সুযোগের অভাব ঘটিয়েও উহাদের সংখ্যা হ্রাস করা সম্ভব।

পঞ্চদশ অধ্যায়

কিশোর-বিভাগ

কিশোর অপরাধীরা তথা জুভেনাইল অফেণ্ডারদের মূলতঃ কয়েকটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত করা যাবে। কিশোর অপরাধীদের স্বভাব চরিত্র সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে থাকে। নিম্নে উহাদের কয়েকটি মূল বিভাগের উল্লেখ করা হলো। বয়স্ক অপরাধীদের মত কিশোর অপরাধীদেরও বিভাজনের প্রয়োজন আছে।

(১) দুর্বোধ্য-মন্ত তথা প্রবলেম-বয় (২) আক্রমণাত্মক [এগ্রেসীভ] (৩) বিকল্পপন্থী (৪) গুড়হৈষী তথা এ্যাবনরম্যাল (৫) অপরাধ-মুখী (৬) দুর্বল-চিত্ত তথা ফিবল মাইণ্ডেড্।

উপরোক্ত বালকদের পরবর্তী কালে অপরাধী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ওই গুলিকে ওদের প্রাগ্-অপরাধী কাল বলা হয়। আত্মবিশ্লেষণ ও পর বিশ্লেষণ দ্বারা নিজেদের দোষ ত্রুটি বুঝা মাত্র তারা নিরাময় হয়। এদের সম্বন্ধে পৃথক পৃথক আলোচনা করবো। ওরা অপরাধী হলে চিকিৎসার্থে ওদের উপরোক্ত পূর্ব স্বভাব জানার প্রয়োজন হয়। [প্রাগ-বিভাজন]

(ক) দুর্বোধ্য-মন্য: ইংরাজীতে এদের প্রবলেম বয় বলা যায়। বহু বালক তারা কি চায় তা তারা নিজেরাই জানে না। লক্ষ্য বস্তুর সম্বন্ধে তাদের নিজস্ব কোনও ধারণা নেই। তাই কোনও কার্যই তাদের মনঃপূত হয় না। তারা বারে বারে একটি কর্ম বা পাঠ ছেড়ে অন্য কর্ম বা পাঠ গ্রহণ করে। পরক্ষণেই তারা বুঝে যে এইটিও তাদের মনোমত নয়। লক্ষ্যবস্তু লাভের জন্য তারা মনে অস্বস্তি অনুভব করে। দৈবাৎ মনোমত কার্য পেলে তারা বুঝে যে এইবার তারা তাদের লক্ষ্যস্থলে এসে উপনীত হয়েছে। তখন তাদের ওইসব দুর্বোধ্য আচরণ বন্ধ হয়। নচেৎ এদের অপরাধী-রোগীতে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

ওদের ওই সকল আচরণ বিশ্লেষণ করে লক্ষ্যবস্তু সম্বন্ধে ওদের অবহিত করতে হবে। প্রথমে উহা তারা মানতে চাইবে না। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নেমে তারা তৃপ্ত হবে।

(খ) আক্রমণাত্মক: এই বালকগণ ব্যস্তবাগীশ ও একরোখা হয়, লক্ষ্য ও পথ ওরা পরিবর্তন করতে চায় না। সব কিছুই ওদের তক্ষুণি চাই। ঈপ্সিত লক্ষ্য সম্বন্ধে তাদের স্পষ্ট ধারণা থাকে। কিন্তু ওদের সকলে বিনা বাধায় ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌছুতে পারে না। কাউকে কাউকে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। ওই বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে অসমর্থ হলে তাদের ভাবাভেগ রুদ্ধ হয়। প্রতিরুদ্ধ ভাবাবেগ নৈরাশ্যের সৃষ্টি করে। ওই নৈরাশ্য হতে দুই শ্রেণীর আক্রমণাত্মক বালকের উদ্ভব হয়। যথা পরঘাতী ও আত্মঘাতী।

নিজেদের ক্ষমতার উপর বিশ্বাসী বালকেরা ওই অবস্থায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। তারা তখন বাধাদানকারী ব্যক্তিদেরকে আঘাত করে। এদের পরঘাতী বলা হয়। বাধাদানকারী ব্যক্তি না হয়ে ঘটনা হলে সে মানসিক ভারসাম্য হারায় এবং উন্মাদদের মত অসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরও উপর বিরূপ হয়। ওদের কারণে-অকারণে মারমুখী হতে দেখা যায়। কোনও কারণে প্রতিরোধ শক্তির অভাব ঘটলে এদের দ্বারা হত্যা কার্য সমাধা হওয়াও সম্ভব। (f)

অন্যদিকে—নিজেদের উপর বিশ্বাসহীন ভয়াতুর লাজুকপ্রায় বালকরা ওই বাধা অতিক্রমের অক্ষমতার জন্যে নিজেদেরই দায়ী করে। তখন তাদের আক্রমণের লক্ষ্য হয় নিজেরাই। [এদের আত্মঘাতী বলা হয়]। নৈরাশ্য উগ্র হলে এরা আত্মহত্যা পর্যন্ত করেছে। অবশ্য প্রতিরোধ-শক্তির অভাব

(f) খুনের রাজনীতি কালে এদেরকে 'এ্যাকসন পার্টির' জন্য বাছা হতো।

ঘটলে উহা ঘটে। নিজেদের অক্ষমতার জন্য এরা অন্য কাউকে দায়ী করে না। বরং এ জন্য এরা নিজেদের ত্রুটির কথাই ভেবেছে এবং তজ্জন্য চিন্তিতও হয়েছে। কদাপি ওদের হিষ্টিরিয়া রোগীর মতও ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছে।

ওই উভয় শ্রেণীর বালকদেরই বোঝাতে হবে যে, সকল ব্যক্তির দ্বারা সকল কার্য সম্ভব নয়। ক্ষমতা বহির্ভূত কাজে আত্মনিয়োগ করতে হলে ওই ক্ষমতা অর্জন করা চাই। কিংবা তাকে বলতে হবে যে, সে অন্য ক্ষেত্রে আরও সম্মান জনক ও বৃহত্তর কাজের উপযোগী। লক্ষ্যের ক্ষেত্র নির্বাচনে ত্রুটি হয়েছে। তাকে এও বলা যেতে পারে যে ত্রুটি মাত্রই অক্ষমতা নয়। কোনও প্রচেষ্টাই নিষ্ফল হয় না। উহা তাকে লক্ষ্যের দ্বিতীয় ধাপে উন্নীত করলো। কিংবা তাকে সাধ্যায়ত্ত লক্ষ্যের ক্ষেত্র নির্বাচনে সাহায্য করা যেতে পারে। শুধু তাই নয়। নির্বাচিত ক্ষেত্রের কত উঁচু লক্ষ্যে তার পক্ষে পৌছানো সম্ভব তাও তাকে বলে দিতে হবে। তবে সম্ভব হলে তার উচ্চ আশা হতে তাকে নিরস্ত না করাই ভালো। সেই ক্ষেত্রে তার ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌছুতে তাকে সাহায্য করুন।

(গ) বিকল্প-পন্থী : এরূপ বালকদের লক্ষ্যস্থল খুব উঁচু বা খুবই নীচু নয়। বাধা পেলে তারা বিকল্প লক্ষ্য কিংবা পথ খুঁজে নেয়। সাধ্যাতীত লক্ষ্যবস্তুকে এরা এড়িয়ে চলে। এদের আকাঙ্ক্ষা সীমিত। নিজেদের সীমিত ক্ষেত্রে এরা প্রায়ই সফল হয়। ওই সফলতা তাদের ভয়শূন্য করে। ব্যর্থতাও এদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ হয়। উহা তারা সহজ ভাবে গ্রহণ করে। এদের নিকট ভাবাবেগ অপেক্ষা যুক্তি ও বুদ্ধি প্রধান। অভিজ্ঞতা দ্বারা এরা সমস্যার গুরুত্ব কমিয়ে আনে। বয়স্ক লোকেদের মত এদের ধৈর্য ও আত্মবিশ্বাস আছে। লক্ষ্য উঁচু না হওয়ায় এদের ব্যর্থতাবোধ কম। লক্ষ্য নীচু হওয়ায় এদের ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশ ঘটে। জীবনের পথে এরা ধীরে চলে ও ধাপে ধাপে উন্নীত হয়। কিছুতে বঞ্চিত হলে এদের আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না। মামুলী বাধা বা বঞ্চনা এরা উপেক্ষা করে। জীবনের প্রয়োজনগুলি এরা ধীরে ধীরে মিটাতে চায়।

উপরোক্ত বালকদের মধ্যে উচ্চাশার বীজ বপন করতে হবে। প্রতি-যোগিতামূলক বিষয়গুলিতে ওদের উৎসাহিত করতে হবে। ঐ প্রতিযোগিতা ওদের ক্ষমতা সম্বন্ধে ওদের অবহিত করবে। এদের মধ্যে অলসতা [নিশ্চেষ্টতা] বা নির্লিপ্ততা এলে তা প্রতিরোধ করতে হবে। এদের মধ্য হতেই শ্রেষ্ঠ

নাগরিক সৃষ্ট হয়। কারো কারো প্রতিভার বিকাশ দেরীতে ঘটে। তাদের সুপ্ত প্রতিভাকে জাগ্রত করতে হবে। প্রয়োজন হলে ওদের বিকল্প ক্ষেত্র ও পথগুলি খুঁজে দিতে হবে।

(ঘ) গুড়হৈষীক :—গুড়হৈষীক বালকগণ নানারূপ অন্তর্দ্বন্দ্বে ভোগে। প্রদমিত মনোজট [complex] উহার কারণ হতে পারে। কেউ বিচ্ছিন্ন-মনা [split-up mind] রোগে ভোগে। কারো মধ্যে দ্বৈত বা বহু ব্যক্তিত্ব দেখা যায়। সিনেমাতে কিংবা থিয়েটারে যাব কিংবা ভাত বা রুটি কোনটি গ্রহণীয়। ঐরূপ সামান্য অন্তর্দ্বন্দ্ব ক্ষতিকর নয়। ঐ দুইটি তাদের নিকট সমান প্রিয়ও হতে পারে। কিন্তু গুরুতর অন্তর্দ্বন্দ্ব বেদনাদায়ক হয়েছে। ওদের মধ্যে বহু হেতুহীন ভয় ও ক্রোধ দেখা যায়। মধ্যে মধ্যে ওরা বিমর্ষ হয়ে ওঠে। কিন্তু উহার কারণ বোঝে না। কোনও কিছুতে মনোনিবেশে অক্ষম হয়। এরা ধৈর্য-হীন ও বিস্মরণ-শীল হয়ে থাকে। প্রদমিত বহু ভয় ও ক্রোধও ওদের ঐ অবস্থার জন্য দায়ী।

শিক্ষক ও অভিভাবকদের ঐ বিষয়ে প্রখর লক্ষ্য রাখতে হবে। ঐ অহেতুক মনোরোগের বিষয়ে লজ্জায় বা স্বেচ্ছায় তারা বলে না। কাউকে সদা চিন্তিত বা বিমর্ষ-মনা দেখলে পীড়াপীড়ি করে ওদের ঐ অসুবিধা জেনে নিতে হবে।

দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রম, অন্যমনস্কতা [diversion] খাদ্য স্থান পরিবর্তন কিছুকাল ওদের নিরাময় করে। কিন্তু মূল কারণ অপসারিত না হলে উহার পুনরাবির্ভাব ঘটা সম্ভব। এদের চিকিৎসা পদ্ধতি অপরাধ-চিকিৎসা শীর্ষক পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে।

অপুষ্টি ও ভেজাল খাদ্যের মত অতি আদর অতি-পুষ্টি ও অনিয়ন্ত্রিত জীবন প্রতিরোধী স্নায়ুর ক্ষতি করে। ফলে জটিল সভ্যতার প্রাত্যহিক উত্তেজনা উহা সহ্য করতে পারে না। সীমাহীন আকাঙ্ক্ষা ওদের আরও ক্ষতি করে। ঐসব মানুষকে বিকৃত-মনা, ক্রোধী, ভীরু ও অস্বাভাবিক করে। অস্বাভাবিক মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি বর্তমান অশান্তি সমূহের কারণ।

[বহু রাজনৈতিক নেতা প্রকৃতপক্ষে গুড়হৈষীক কিংবা উন্মাদ বা উত্তেজনা রোগী থাকেন। কিন্তু বাহির হতে তাহা বুঝা যায় না। এদের জেলে না পাঠিয়ে হাসপাতালে পাঠানো উচিৎ। অতি উচ্চাকাঙ্খী ও আশাহত হলে এই উন্মাদনা রোগ আসে]

(ঙ) অপরাধ-মুখী : অপরাধ-মুখী বালকদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা কিছু

বেশী থাকে। সুযোগ ও সুবিধা পেলে অপকর্ম করার জন্য তারা সদা উন্মুখ। এদের মধ্যে লোভী বালকদের মত প্রতিহিংসাপরায়ণ বালক থাকে। এদের অপরাধ প্রতিরোধ সম্পর্কিত স্নায়ু অত্যন্ত দুর্বল। সামান্য প্রলোভন বা ক্রোধ এদের প্রদমিত অপস্পৃহাকে বহির্গত করেছে। ওদের কেউ ব্যক্তির বিরুদ্ধে [যৌনজ ও অযৌনজ] এবং কেউ সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধ করে। এরা স্বার্থপর হয় ও লাভালাভ বোঝে। এরা ভবিষ্যৎ জ্ঞান-হীন ও আশু ফল প্রয়াসী। এদের মধ্যে চিকিৎসাযোগ্য কিছু অপরাধ-রোগীও আছে। অন্য বালক অপেক্ষা এদের নিরাময়ের জন্য বেশী প্রচেষ্টা বিধেয়।

বিঃ দ্রঃ—আদি একাচারী মানুষ স্বভাবতঃই হিংস্র ছিল। কুকুরদের মত একজন অন্যের সদ্য-সংগৃহীত খাদ্য কেড়ে নিত। পরবর্তী দলবদ্ধ আদিম মানুষ তুলনাতে কম অপরাধ-প্রবণ ছিল।

পরে মানুষ নিয়ন্ত্রিত সমাজবদ্ধ জীব হয়। কিন্তু তখনও তারা কৃষিজ্ঞান-হীন শিকারী মানুষ। ওই খাদ্য সংগ্রহী শিকারীদের সঞ্চয়ে মন ছিল না। কারণ—পশুদেহ পচ্যমান হওয়াতে বেশী দিন রাখা যেতো না। কিছু অস্ত্র মাত্র তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হত। সমগ্র সম্প্রদায় বন-ভূমি ও অন্য ভূমির মালিক ছিল। ওই সময় বীরত্ব বুদ্ধি সাহস ও শক্তি তাদের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি ছিল। পুত্রেরা পিতার ঐ গুণগুলির উত্তরাধিকারী হতে সচেষ্ট হত। সংগৃহীত খাদ্য ও বস্তু [নিহত পশু] অন্যকে দান ওই কালে শ্রেষ্ঠ সম্মান ও প্রশংসা এনেছে।

আরও কিছু পরে ওরা কৃষিজীবী হলে ওদের মধ্যে সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি জাগে। ফলে,—সমাজের অলস ব্যক্তিদের কেউ কেউ পরস্বাপহারক হয়। সমাজ বিবর্তনের প্রতিটি স্তরের 'কু' ও 'সু' বৃত্তিগুলি আমাদের মধ্যে প্রদমিত অবস্থায় আছে।

কিছু অপরাধ-মুখী বালক 'আদি খাদ্য-সংগ্রহী' মানুষের প্রকৃতি [প্রবণতা] লাভ করে। ওরা প্রথমে বৈধভাবে ও পরে অবৈধভাবে অর্থ ও দ্রব্য সংগ্রহ করে। ঐগুলি তারা বন্ধুদের মধ্যে দান করে দানবীর সাজে। এরা প্রায়ই সংগৃহীত অর্থ ও দ্রব্য সঞ্চয় করে না। দৈহিক বল, বুদ্ধি ও সাহসকে এরা শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি মনে করে। এদের মধ্যে বাহাদুরী দেখানোর প্রবণতা থাকে। কোনও বালক তার বন্ধুদের সম্মুখে প্রতিদিন তার পরণের দামী জামা ছিঁড়ত। উদ্দেশ্য—তার পিতা যে দারুণ ধনী ব্যক্তি এবং সে যে এক জন বেপরোয়া লোক তা সর্বসমক্ষে প্রমাণ করা।

উপরোক্ত বালকদের তাদের প্রাচীন ভারতীয় পূর্ব-পুরুষদের ঐতিহ্য ও সৎ গুণের প্রতি আকৃষ্ট করা যায়। মন্দ গুণের বদলে ভালো গুণ তারা গ্রহণ করে গর্ব করুক। অপরাধ-মুখী বালকদের ওই সকল প্রবণতা সাবধানে অনুধাবন করুন। সময়ে ব্যবস্থা অবলম্বন করলে তাদের স্বাভাবিক করা সম্ভব। স্বল্প-মাত্রায় দৃষ্ট ওই প্রবণতাকে উপেক্ষা করা অনুচিত। সময়ে প্রতিহত না হলে উহা বর্ধিত হয়ে ওদের অপরাধী করবে। এরা উচ্চাকাঙ্ক্ষী না হয়ে দূরাকাঙ্ক্ষী হয়। দৈহিক ও মানসিক চিকিৎসার সহিত এদের অপরাধী হওয়ার সুযোগও নষ্ট করতে হবে।

(চ] দুর্বলচিত্ত : দুর্বলচিত্ত বালকদের বুদ্ধিমত্তা বয়সের তুলনায় কম থাকে। উহাকে চিত্তদৌর্বল্য বলা হয়। এরা সরলমনা ও বিশ্বাসী হয়। কিছু বিষয়ে অভিযোগমুখর হলেও এরা প্রতিহিংসাপরায়ণ না হয়ে কৃতজ্ঞতা ও কর্তব্য-বোধ দেখায়। কিন্তু—এরা সহজেই অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এদের ভুল বোঝান ও ভুল বিশ্বাস করান সহজ। ভাইটামিন প্রোটীন খাদ্য ও হরমনের ঘাটতি পূরণ এদের নিরাময় করে। বয়সের সঙ্গে ওদের অনেকেরই বুদ্ধি দ্রুত বেড়ে পূর্ব ক্ষতি পূরণ করে। মধ্যবর্তী কালে ওদের প্রতি কিছু বেশী লক্ষ্য রাখতে হবে। ওদের উৎপীড়কদের থেকে ওদের রক্ষা করতে হবে। [অবশ্য—বহু সরলমন বালকের সাধারণ বুদ্ধি প্রখর হয়।] উন্মাদ ও নির্বোধদের জন্য অবশ্য স্বতন্ত্র মানসিক ও দৈহিক চিকিৎসার প্রয়োজন।

শৈশবে অভাব-বোধ, অনাদর ও ভীতিপ্রদর্শন বালকদের মস্তিষ্কের স্নায়ুতে জট সৃষ্টি করে। ফলে, ওদের মেধা ও বুদ্ধি আটক পড়ে। ওদের কৈশোর বয়সে ওই দোষ প্রকট হয়। কিন্তু পরে অভ্যাস ও অনুশীলন ওই জট খুলে দেয়। পরিবেশ সুযোগ ও সুবিধা উহার সহায়ক হয়। ওই জন্য বয়ঃপ্রাপ্তির পর হঠাৎ ওরা বুদ্ধিমান ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ হয়।

"কোনও এক শিশু-প্রতিষ্ঠান একজন দুর্বলচিত্ত বালককে একটি কুটির শিল্পে নিয়োগ করেন। আশ্রমের রীতি মত মধ্যে মধ্যে কর্তৃপক্ষ তার খোঁজ খবর নিতেন। ওখানে তার কোনও অসুবিধা হচ্ছে কি না; তাকে তা জিজ্ঞাসা করা হলে সে অভিযোগ করে বলে যে তাকে বাড়ির গৃহিণী বাড়ির কাজে লাগান। ওঁরা তাকে অন্য এক স্থানে পাঠাতে চাইলে বালকটি বলে, এখুনি সে যেতে পারবে না। ওখানে বহু কাজ জমে গেছে। তা ছাড়া, তার মুনিব এখন খুবই অসুস্থ।"

এই বালকদের অপেক্ষাকৃত কম বয়স্ক বালকদের সহিত মেলা মেশা অধিক পছন্দ। কারণ—বয়সে না হলেও বুদ্ধিতে উভয়ের মিল আছে। বয়সের সুযোগে সে-ই ওদের নেতা হয়। এরা জেদী এবং রাগী ও অভিমানী হয়। এদের প্রতি মায়েরা সহানুভূতিশীল। তজ্জন্য এরা অতি আদরভোগী হয়। ফলে, পড়াশুনাতে এরা কিঞ্চিৎ অমনোযোগী হয়। কল-কব্জার কাজে, কৃষিতে ও পশুপালনে এরা অধিক আগ্রহী। এদের পছন্দমত কার্যে বাধা দেওয়া অনুচিত। এরা শঙ্কাহীন আনুগত্যপূর্ণ ও পরিশ্রমী। এরা উত্তম সৈনিক তৈরি হয়। দৈহিক ও মানসিক চিকিৎসা এদের নিরাময় করে। ব্যবহার ভাল পেলে বয়স বাড়ার সঙ্গে এরা নিরাময় হয়। অনাদরের মত অতি আদরও এদের পক্ষে ক্ষতিকর।

(ছ) নেতৃত্ব বিলাসী : এই সকল বালকরা অতি মাত্রায় নেতৃত্ব অভিলাষী হয়ে থাকে। এদের কেউ কেউ এ জন্য নিজেদের মধ্যে মারপিট পর্যন্ত করেছে। কিন্তু এদের সকলের মধ্যে নেতৃত্বের উপযোগী গুণ থাকে না। এদের মধ্যে কিছু শান্তিপ্রিয় কিংবা দুর্বল-দেহী বালক থাকে। এরা নেতা হওয়ার সহজ পন্থা-সমূহ বেছে নেয়। এরা বাটির কিংবা অন্যের অর্থ আত্মসাৎ করে ফুটবলআদি কিনে ক্লাব তৈরী করে নিজেই ক্লাবের ক্যাপটেন হয়। পড়াশুনা বা অন্য বিষয়ে এরা মধ্যপন্থী বালক। এদের প্রয়োজনীয় যৎসামান্য অর্থ এদের অভিভাবকরা দিলে এরা এরূপ অপকর্মে লিপ্ত হত না। ওদের ওইরূপ নেতৃত্ব আরোপিত নেতৃত্ব হলেও তারা উহার দ্বারা সুষ্ঠু ব্যক্তিত্বলাভ করে। এরা উচ্চাকাঙ্খী হওয়ায় পরবর্তীকালে [শুধরোবার সুযোগ পেলে] এদের বহু জন মানী গুণী হয়েছে।

বিঃ দ্রঃ —ব্যক্তিগত ভাবে লোকবল ও অর্থবলের অভাবে সহায়হীন বা দরিদ্রেরা উৎপীড়িত হয় বলেই তারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর প্রতিশোধ নিতে চায়। ঐরূপ সঙ্ঘ বিপথ চালিত হলে উহা প্রতিহত করতে প্রতি-বিপ্লবের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এর প্রতিকারের জন্য কর্মকৃত্যসমূহকে নূতন ভাবে নূতন শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। আইন ও প্রসিডিওর এর প্রতি-বন্ধক হলে উহা বাতিল করা প্রয়োজন।

বিঃ দ্রঃ—এক্ষেত্রে কলিকাতা পুলিশের পূর্বতন রিপোর্ট সিষ্টেমের মত নিম্ন পদী পুলিশ ও থানাদারাদির এবং বিচারক হাকিমদের মধ্যবর্তী একটি স্ক্রুটিনাইজিৎ সংস্থার প্রয়োজন। এ ক্ষমতা সর্বোচ্চপদী পুলিশ কর্মীদেরও কিছু বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা সহ দেওয়া যেতে পারে। থানাদারদের মামলা

সরাসরি আদালতে পাঠানোর ক্ষমতা রহিত করে উহা এদের অনুমতি সাপেক্ষ করতে হবে। পূর্বের মত এদের পূর্ণ তদন্ত করানোর এবং জামীন ও মুক্তি দেবার ক্ষমতা দিতে হবে।

[কোনও এক বালক সিনেমা টিকিট কিনতে পয়সা চুরি করে। কিন্তু সে অন্যান্য বিষয়ে অত্যন্ত সৎ। এদেরও জেলে পাঠিয়ে পাকাপোক্ত অপরাধী করা হয়।]

অবিচার হোক বা না হোক, অবিচার হওয়ার ধারণাটাই ক্ষতিকর। পূর্বতন রিপোর্ট সিষ্টেম জনগণ ও পুলিশের ভুল বুঝা বুঝির নিরসন ঘটাতো।(f)

কিশোরদের বাস্তব জ্ঞান প্রদান [কৈশোরোত্তর শিক্ষা] সম্বন্ধে পূর্বে প্রশ্নোত্তর দ্বারা সমাধা করতে বলেছি। ঐ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত প্রবলেমগুলি তাদের জন্য ব্যবহার করা যায়। উহা দ্বারা তারা ন্যায় ও অন্যায়ের সম্ভাব্য হার বুঝবে। এদের উত্তর অসামাজিক হলে তা ব্যাখ্যা সহ শুধরাতে হবে।

(২) ব্যবসায়ী নিদ্রাহীন রাত্রি যাপন করে দিবা রাত্র পরিশ্রমে বৎসরে এক লক্ষ টাকা উপায় করে দেখল তাকে তা থেকে পঁচাশী [৮৫] হাজার টাকা আয় কর দিতে হয়। বরং চল্লিশ হাজার টাকা বৎসরে উপায় করলে [স্ল্যাব কমাতে] তার কিছু থাকে। উপরন্তু কোনও অসাধু আয়কর কর্মীর পাল্লায় আরও হয়রানি। কম আয় করলেও তাদের উপর অন্যায় হামলাতে সময় নষ্ট হয়। এদের মধ্যে কেউ আয়কর কর্মীকে উৎকোচ দ্বারা কায়দা করল। ওদের কেউ বাড়ীর ব্যবহার্য গাড়ীকে কোম্পানীর গাড়ি বলে এবং বাড়ির ভৃত্য ও দ্বারবানকে কোম্পানীর লোক বলে এবং কোম্পানীর কাজে টুরে গেলুম বলে দেশ বিদেশ ভ্রমণে, দায়গ্রস্ত আত্মীয়দের ও পুত্রদের চাকুরী দিয়ে নিজেদের জন্য বাগান বাড়ি করে ও স্বাস্থ্যাবাসে বাড়ি করে ওগুলিকে কোম্পানীর গেষ্ট হাউস ও রেষ্ট হাউস বলে চালিয়ে স্ল্যাব কমিয়ে কিছু সাশ্রয় করল। এরূপ ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি কতটা ন্যায় কতটা অন্যায় করল? এছাড়া সে অন্য আর কি কি করতে পারত?

(৩) ফ্যাক্টরী মালিককে ফ্যাক্টরী ইন্সপেক্টার এক্সাইজ অফিসার পুলিশ প্রভৃতিকে নিয়মিত অর্থ দিতে হয়। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের অফিসে এলে দোষ ধরতে সক্ষম। টিপটপ সব কিছু ঠিক রাখা সম্ভব নয়। ছুতায় নাতায় সকলেই

(f) 'রিপোর্ট সিষ্টেম' বিষয়টি বুঝতে মৎ প্রণীত 'পুলিশ কাহিনী' [২য় খণ্ড] দ্রঃ।

সকলের ক্ষতি করতে পারে। এদের সন্তুষ্ট না করলে যারা তা করে প্রতিযোগিতায় তারাই টিকবে। উৎকোচ-গ্রহীতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুললে সময় ও শক্তি ও অর্থের বহু অপচয়। এক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে তুমি কি গবর্ণমেন্টে বা পুলিশে অভিযোগ দায়ের করবে? কিংবা তুমি ঐ অতিরিক্ত ব্যয় ওদের সাহায্যে ব্ল্যাক মার্কেট করে তুলে নেবে?

(৪) জনৈক ব্যবসায়ীর মাল বোঝাই লরী হাওড়ার পুলে অন্যায় ভাবে জনৈক পুলিশ আটকালো। সেই দিনই ডেলিভারি না দিলে চুক্তি ভঙ্গ হবে। এতে সেই ব্যক্তির বহু অর্থ ক্ষতি হবে। এদিকে ঐ পুলিশের বিরুদ্ধে ঊর্ধ্বতনদের নিকট অভিযোগ করে তাকে সায়েস্তা করা যায়। কিন্তু তা সময় সাপেক্ষ। কিছুটা অনিশ্চিতও বটে। ইতিমধ্যে দিন দুই মাল বোঝাই লরী থানায় আটকা থাকবে। কিন্তু ঐ পুলিশকে দুশ টাকা দিয়ে মুক্তি কিনলে তোমার দু' হাজার টাকা বাঁচে। এক্ষেত্রে তোমার কি করা উচিত। ওদের মাসহরা দিয়ে দৈনিক উৎপাত বন্ধ করবে? কিংবা ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে প্রতিকারার্থে মন্ত্রী হবার চেষ্টা করবে? (f)

[উপরোক্ত চারটি ঘটনাই হাইপথিটিক্যাল ঘটনা। ঐ সব এদেশে কদাচ ঘটে না। কারণ এখানে অফিসরগণ অত্যন্ত সৎ ও কর্তব্যপরায়ণ। এখানে প্রত্যেকটিতে একটি করে 'যদি' শব্দ আছে]

পাওনা টাকার দায় এড়াতে কিংবা কিছু অর্থ আদায়ের জন্য এক অসৎ ব্যক্তি জনৈক মানী গুণী ব্যক্তির বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করল। দুই টাকা কোর্ট ফি স্ট্যাম্প ও কিছু উকিলের খরচ, তাহলেই একটা শমন পাওয়া যায়। অসুবিধাতে ফরিয়াদীকে বে পাত্তা করে দিলেই হল। সত্য মিথ্যা যাচাই সকল হাকিম করবেন না। জুডিসিয়াল এনকোয়ারীতে বাদী পক্ষের বক্তব্য রাখা বে-আইনী। বন্ধুদের মধ্য হতে কিংবা অর্থ ব্যয়ে মিথ্যা [সুশিক্ষিত] সাক্ষী প্রস্তুত। ঘটনার স্থান ও কাল এমন ভাবে [বুদ্ধি করে] নির্ধারিত যে, সেখানে ডিফেন্স সাক্ষী থাকার সম্ভাবনা [বিশ্বাসযোগ্য ভাবে] নেই।

এখানে মান রাখতে হয়রানি এড়াতে ঐ নির্দোষ ব্যক্তি ঐ অসৎ ব্যক্তির বিরুদ্ধে দূর স্থানে অন্যের দ্বারা মিথ্যা মামলা কিংবা কয়েকটি কাউন্টার কেস

(f) উৎকোচের টাকা অডিট পাশ করে না। বাধ্য হয়ে ওতে হিসাবে কারচুপি করা হয়। কনটেনজেন্সী ও এন্টারটেনমেন্টের খাতে ব্যয়ের বহর বাড়ে।

দায়ের করল। ফলে,—বিপদ বুঝে সেই অসৎ ব্যক্তি প্রতিটি মামলা [উভয় পক্ষের] মিটিয়ে নিল। অন্যথায় ঐগুলি কখনও সে আদালত হতে কিছু অর্থ না পেলে তুলে নিত না। কোর্টে হার জিত সত্য মিথ্যা সাক্ষীর উপর নির্ভর করে। সত্য সাক্ষীরা [অনভ্যাসে] প্রায়ই জেরায় বিভ্রান্ত হয় ও টেঁকে না। তারা ঘাবড়ে গিয়ে মামলা বরবাদ করে দেয়। এ ক্ষেত্রে ঐ ভদ্র মানী ব্যক্তি কতটুকু অন্যায় করেছে। আত্মরক্ষার্থে সে অন্য আর কি করতে পারত ?

উত্তর দান কালে কিশোরদের বিস্ময় [অজ্ঞতার কারণে] ক্রোধ, উত্তেজনা উৎসাহ আগ্রহ বা নির্লিপ্ততা, ভাবুকতা, প্রতিকার-স্পৃহা, ঘৃণা, লোভ ইত্যাদি লক্ষ্য করতে হবে। পরে ওদের পারিবারিক বিষয় ও তার শৈশবজীবনের সংবাদ নিতে হবে।

কিশোর অপরাধী হওয়ার মূল কারণ শিশুদের মধ্যে নিহিত থাকে। ওদের গঠনোন্মুখ সূক্ষ্ম স্নায়ু দুর্বল থাকাতে সামান্য বিরূপতা তাদের প্রতিরোধ সম্পর্কিত সূক্ষ্ম স্নায়ু শৈশবেই ক্ষতিগ্রস্থ করে। বয়ঃপ্রাপ্তির পর সুপরিবেশের অভাব ঘটলে প্রলোভনাদি তাদের উপর সহজে কার্যকরী হয়। কিশোর অপরাধী হওয়া বা না হওয়ার প্রাথমিক কারণগুলি শৈশবেই সৃষ্ট হয়।

[নিরাপরাধী থাকা এবং অপরাধী হওয়ার মধ্যবর্তী কালকে প্রাগ্ অপরাধী কাল বলা হয়। এই সকল বালকরা অপরাধী পদবাচ্য না হলেও তাদের অপরাধী হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। এদের স্বভাব বিশ্লেষণ করে এদের পূর্বাহ্নে সংশোধন করা উচিৎ। উপরোক্ত ওইরূপ বালকদের শ্রেণীবিভাগকে কিশোর বিভাগ বলা হয়েছে।]

বিঃ দ্রঃ—কর্তৃত্বর ও ক্ষমতার প্রভেদ কম শিক্ষকই বুঝেন। ব্যক্তিত্বের সহিত এই কর্তৃত্বের নিবিড় সম্পর্ক আছে। পক্ষপাতপূর্ণ অজ্ঞ ভীরু ও গতানুগতিক ব্যক্তিরা সুষ্ঠু ব্যক্তিত্বের অধিকারী নন। ছাত্রদের উদ্দীপনা ফুরালে তাকে জাগাতে হবে। অতি নির্ভরশীলতা ছাত্রদের ক্ষতিকর হয়। কিশোরদের সুপথে আনতে উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচ্য।

প্রথম পর্যায়ে পিতামাতা এবং শেষ পর্যায়ে শিক্ষকরা শিশুদের চরিত্র গঠন করে। প্রায়ই দেখা যায় যে, শিশুর ক্ষতি পিতামাতা প্রথমে করেন। পরে শিক্ষকরা বাকিটুকু শেষ করে সর্বনাশ ঘটান। উভয়ের একত্র চেষ্টায় কিশোর ও শিশুদের সৎ করতে হবে। এ জন্য তাঁদের শিশু-বিদ্যার গভীরে প্রবেশ করা চাই।

শিশুদের গঠনোন্মুখ সূক্ষ্মস্নায়ু তুর্বল থাকে। স্বল্প আঁচড়েও ওদের মনে গভীর দাগ পড়ে। এ জন্য কোনও দৈহিক বা মানসিক আঘাত কিংবা কাহারও উপর সামান্য বিরূপতা [stimulas] ওদের আহত করে। উপরোক্ত কারণে ওদের প্রতিরোধ-শক্তির স্নায়ু প্রথমে আহত হয়। ঐরূপ বারংবার আঘাতে ওদের ওই স্নায়বিক ক্ষয়ক্ষতি স্থায়ী হয়। শৈশবে ওই ক্ষতি বোঝা না গেলেও কৈশোরে উহা প্রকট হয়ে ওঠে। ফলে, কু-পরিবেশ বিনা বাধায় ওদের অপরাধমুখী করে। ওদের সংযত করার মত সুপরিবেশ বর্তমান পৃথিবীতে প্রায়ই থাকে না। ওই অবস্থায় সদুপদেশ প্রভৃতি বাক্প্রয়োগ [সাজেসশন] ওদের ওপর কার্যকরী হয় না। তখন ওই প্রতিরোধ শক্তির পুনর্গঠনের প্রয়োজন হয়। বলা বাহুল্য যে উহা একটি কষ্টসাধ্য ও কঠিন কার্য।

শৈশবকালেই অপরাধ-প্রতিরোধ সম্পর্কিত স্নায়ু কি কারণে [সর্বপ্রথম] ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেই সম্বন্ধে কিছুটা বুঝিয়ে বলবো। শিশুদের চাহিদা ও ইচ্ছা-সমূহ পুরণ হওয়া বা না হওয়া এবং তজ্জনিত তাদের ক্ষুব্ধ হওয়া বা না হওয়ার উপর তাদের প্রতিরোধ-শক্তি [রেসিসটেন্স পাওয়ার] সম্পর্কিত স্নায়ুর ক্ষতি হওয়া বা না হওয়া নির্ভর করে। আনন্দ ও নিরানন্দ ওদের গঠনোন্মুখ মস্তিস্ককে যথাক্রমে সবল বা নিস্তেজ করে।

"শিশুর যখন সকল চাহিদা ও ইচ্ছা মিটে তখন সে নিজেকে সফল এবং তার চাহিদাগুলি না মিটলে সে নিজেকে অসফল [নিষ্ফল] মনে করে। নিস্ফলতা তাদের ক্রুদ্ধ, বিরূপ ভাবাপন্ন ও অসন্তুষ্ট করে। সফলতা তাদের সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত করে। সফলতা সমাজ-সম্মত প্রয়োজনবোধ ও জীবনে নিরাপত্তাবোধ জাগায়। তাদের [সীমিত] প্রয়োজন একটি গণ্ডীর মধ্যে থাকে। কিশোর বয়সে তারা সহ অবস্থানে বিশ্বাসী শ্রদ্ধাপরায়ণ ও সহনশীল হয়। কিন্তু নিষ্ফলতা, বিরোধিতা অনিশ্চয়তাবোধ ও আত্মকেন্দ্রিক প্রয়োজনের সৃষ্টি করে।"

শৈশবে সৃষ্ট ওই মনোভাব ওই সময় দৈহিক বল ও বুদ্ধির অভাবে কার্যকরী হয় না। কিন্তু তার ওই ইচ্ছা সে বিলুপ্ত না করে প্রদমিত করে মাত্র। কৈশোরকালে কুপরিবেশে ওই ইচ্ছা জাগ্রত হয়ে তাকে অপরাধমুখী করে। তখন তারা স্বার্থপর নিষ্ঠুর লোভী ভয়াতুর [সাপ ভয় পায় বলে কামড়ায়] আক্রমণাত্মক, বৈরী ভাবাপন্ন, বিশৃঙ্খল ও নিয়ন্ত্রণহীন হয়। অবশ্য পরবর্তীকালে সৃষ্ট অন্যান্য কারণও উহার জন্য দায়ী।

উপরোক্ত ক্লিষ্টাক্লিষ্ট-বোধ বা সন্তোষ অসন্তোষ শিশুদের মনোদণ্ডের শেষ দুইটি বিন্দুর মধ্যে দোদুল্যমান। মাতাপিতা এই দুইয়ের কোন বিন্দুটির নিকট পৌছবেন তার উপর সংশ্লিষ্ট শিশুর চারিত্রিক গঠন নির্ভর করে। ভুলে গেলে চলবে না যে মাতাপিতাই শিশুর একমাত্র জগৎ। মাতাপিতার প্রতি শিশুর যে মনোভাব গড়ে ওঠে সেইটেই পরবর্তীকালে তাদের জগতের প্রতি মনোভাব হয়।

[প্রথম জীবনে অসফল হওয়া ব্যক্তিগণ ঐজন্য সুযোগ পেলে প্রায়ই অপকর্ম করেছে। শৈশবে জীবন ব্যর্থ হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে মেজাজী ও পাপীর সংখ্যা অধিক। অন্যদিকে—শৈশবে জীবন সফল হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে স্বার্থত্যাগী মনীষীর সংখ্যা বেশী।]

শিশুরা মাতাপিতার উপর অধিক নির্ভরশীল। ওদের চাহিদা তাঁরা না মিটালে ওরা তা স্বাধীন ভাবে পেতে চাইবে। [পরবর্তী জীবনে উহা তাকে লোভী ও পরস্বাপহারক করতে পারে] সুন্দর খেলনা চুষিকাঠি বা দুধের বাটি তার দিকে এগিয়েনা দিলে স্বাধীনভাবে স্বকীয় চেষ্টাতে উহা সে পেতে চাইবে। ঐ সাধ্যাতীত চেষ্টায় অসফল হওয়ার পর সে ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হবে। ভবিষ্যৎ জীবনে ঐরূপ শিশুরা আক্রমণাত্মক স্বভাব প্রাপ্ত হয়। [আক্রমণাত্মক বালক দ্রঃ।]

শিশুকে যদি বোঝানো যায় যে তার যেমন পিতামাতাকে প্রয়োজন তেমনি মাতা পিতার কাছে তারও প্রয়োজন আছে, তাহলে শৈশবের ঐ পরনির্ভরতা ভবিষ্যতে পারস্পরিক নির্ভরতা বোধের সৃষ্টি [সহ অবস্থান] করে। প্রকৃত পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা কাল্পনিক ও অলীক বস্তু। পারস্পরিক নির্ভরতার উপর পৃথিবীর উন্নত সভ্যতা [নিরপরাধ সমাজ] সৃষ্টি হয়েছে। উহার বাহিরে যে স্বাধীনতা তা উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর মাত্র। দুগ্ধপোষ্য শিশুদের মধ্যে স্বাধীনতা বোধের উন্মেষ ঘটানো অত্যন্ত ক্ষতিকর। পরিপূর্ণ স্বাধীনতা-প্রয়াসী বালক অন্যের মতামত সম্বন্ধে উদাসীন থাকে। এজন্য ওদের লজ্জাসরম ও অনুতাপ বোধও কম দেখা যায়।

পৃথিবীতে কোনও ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়। অন্ততঃ তাকে তার নিজের বিবেকের অধীনে থাকতে হয়। পারস্পরিক নির্ভরতার অভ্যাস উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রিত করে। শৈশবে মাতা পিতা, যৌবনে স্ত্রী, বন্ধুবান্ধব ও পড়শীদের উপর মানুষ নির্ভরশীল। আপাতঃদৃষ্টিতে তাই মনে হয় বটে। প্রকৃত

পক্ষে কিন্তু সকলে পারস্পরিক নির্ভরতার জন্য জগতে টিকে আছে। অন্যের মতামতকেও তাদের সমীহ করতে হয়। শিশুরা বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত একটু একটু করে ঐ পরনির্ভরতা কাটিয়ে পারস্পরিক নির্ভরতার সীমানায় পৌছয়। মনুষ্য শিশু যদি কোনও কোনও জন্তুদের শিশুর মত সাবালক হয়ে জন্মগ্রহণ করত তাহলে কোনও দিনই বর্তমান উন্নত সভ্যতার সৃষ্টি হতো না। বলাবাহুল্য যে উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতা অপরাধীদের সৃষ্টি করে থাকে। উহারা সহ-অবস্থানের নীতিতে কোনও দিনই বিশ্বাসী হয় না।

[প্রাচীন বন্য মানুষের শিশুরা জন্তুদের মত দ্রুত স্বাধীন হতো এবং স্নেহও তারা কম সময়ের জন্য পেত। কারণ তখনও সুষ্ঠু পারিবারিক জীবন ও সম্বন্ধ সৃষ্ট হয় নি। তাই তারা ঐ সময় অপরাধীর মত জীবন যাপন করেছে।]

বিঃ দ্রঃ—শৈশবে মনুষ্য ভল্লুক ব্যাঘ্রশিশু নির্বিশেষে সব শিশুই সমান। সকলেই মানুষের ক্রোড়ে উঠে আদর ভোগ করে। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তারা ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি ও পথ ধরে।(f) ব্যাঘ্র ভল্লুক শিশু প্রভৃতি দ্রুত স্বাধীনতা ভোগী হয়েছে। পিতামাতার স্নেহ ওরা প্রথমে পেলেও পরে একটুও পায় না। কিন্তু মনুষ্য শিশু বহু দেরীতে স্বাধীন হয়ে থাকে। স্নেহও ওরা বহুকাল বেশী পায়। উহা দীর্ঘ-দিন পর্যন্ত অটুটও থাকে। এজন্য ওরা ওদের মত হিংস্র না হয়ে মানবিক হয়।

স্নেহের অভাব ও দ্রুত স্বাধীনতা শিশুদের ব্যাঘ্রাদির মত নিষ্ঠুর কিংবা গবাদির মত নির্বোধ করে।

কঠিন নিয়মানুবর্তিতা কিশোর ও শিশুদের ভয়াতুর ও নৈরাশ্যভোগী করে তোলে। অন্যদিকে—শৈশবে ও কৈশোরে মাতা পিতার সহিত সহজ সম্বন্ধ প্রতিভা বিকাশের সহায়ক হয়। প্রহারে ও ধমকে শিশুকে নিরস্ত করতে চাওয়া অন্যায়। পিতামাতার উহা বুঝা উচিত।

বেশী ক্ষমতা অপেক্ষা স্বল্প ক্ষমতা কিশোর ও শিশুদের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বেশী কার্যকর। পুত্র দ্বারা যে কাজ করাতে পিতামাতা কিছুতেই সক্ষম হন না, সেই একই কাজ তাদের দ্বারা শিক্ষকরা অনায়াসে করাতে পারেন। অন্যদিকে যে কাজ শিক্ষকরা তাদের দ্বারা করাতে পারেন নি, সেই একই কাজ প্রতিবেশীরা ওদের বুঝিয়ে বা ভুলিয়ে করিয়ে নিয়েছেন।

সর্পশিশু ডিমফুটে বেরুনো মাত্র স্বাধীন। তাদের কারও স্নেহ পাওয়ার কোনও প্রশ্নও নেই। তাই তারা জন্ম হতেই হিংস্র হয়ে থাকে।

শিশুদের প্রতিটি ইচ্ছা ও অভাব যথাকালে ও যথাসম্ভব পূরণ করা উচিত শিশুকে এখনই দুগ্ধ পান করানো হবে। কিংবা অর্ধঘণ্টা পরে তাকে উহা পান করালে চলবে তা মাতার পক্ষে উপেক্ষণীয় হলেও শিশুর পক্ষে তা এতটুকুও উপেক্ষণীয় নয়। এতটুকু বিলম্বই শিশুদের প্রতিরোধ সম্পর্কিত স্নায়ুকে আহত করার পক্ষে যথেষ্ট। মাতাপিতা প্রায়ই ওদের অভাব বুঝতে পারেন না। কেউ কেউ ঐগুলি বুঝবার প্রয়োজনও মনে করেন না। কিন্তু শিশুদের আচরণ থেকে ওদের প্রতিটি অভাব ও ইচ্ছা বুঝে নিতে হবে। শিশুদের একটি সুন্দর খেলনা দিলে তজ্জনিত আনন্দ তাদের সূক্ষ্ম বৃত্তিগুলিকে স্বাভাবিক কারণেই পুষ্ট করে। কিশোর-অপরাধী হওয়া বা না হওয়ার প্রাথমিক কারণগুলি শৈশব জীবনেই সৃষ্ট হয়। কোনও একটি শিশু নষ্ট হওয়া বা না হওয়া তাদের শৈশবের অভাব ও ইচ্ছাগুলি পুরণ করা বা না করার উপর নির্ভর করে। তজন্য শিশুদের জীবনের প্রথম কয় বছর তাদের প্রতিটি ইচ্ছা ও অভাব পূরণ করা উচিত।

উপরোক্ত কারণে দেশে সচ্ছল ও শান্তিপূর্ণ পরিবারের প্রয়োজন সর্বাধিক। যে পরিবারে স্বাচ্ছন্দ্য আছে ও সেই সঙ্গে শান্তি বিরাজ করে সেই পরিবারে অপরাধী প্রায়ই নেই। উপরন্তু সেখানে জ্ঞানী গুণীর সংখ্যা অধিক।(f) কিন্তু— অতি ভোগ শান্তির অন্তরায় হয়। ধনী ও ভোগী পিতামাতা নিজেরাই অশান্ত। সন্তানদের প্রতি তাঁরা প্রায়ই যত্ন নেন না।

শিশুদের চাহিদা সমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করা উচিত। ওদের বিবিধ প্রকার প্রসাধন পদ্ধতি ও প্রয়োজনীয় স্নেহের পরিমাপ সম্বন্ধেও জ্ঞানার্জন প্রয়োজন। শিশুদের দৈহিক প্রয়োজনই অধিক। ওদের মানসিক প্রয়োজন যৎসামান্য। বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত ওদের নূতন নূতন অভাবেরও সৃষ্টি হয়।

[কিশোরদের ক্ষেত্রে অবশ্য দৈহিক ও আর্থিক অভাবই একমাত্র অভাব নয়। উপযুক্ত সম্মান প্রতিষ্ঠা, স্বীকৃতি ও বিদ্যা না পাওয়াও ওদের অভাব। গণ-টোকাটুকির মূলে বিদ্যা না পাওয়ার অভাব থাকে। অপরে যা পারে তা না পারাও অন্য এক অভাব। উহা কিশোরদের হীনমন্য, রাগী, বেপরোয়া,

---

(f) [পূর্বের ওইরূপ পরিবারগুলি হতে কর্মকৃত্য সমূহে কর্মিনিয়োগ করাতে ওইগুলি তৎকালে দুর্নীতিমুক্ত থাকতো। মার্চেন্ট অফিসগুলিতে আজও কমবেশী এই পন্থা অনুসৃত হয়। অন্ততঃ— এইরূপ পরিবারগুলি হতে বধূ সংগ্রহ করলে বিবাহিত জীবন ও সংসার শান্তিপূর্ণ হবে। এদেরই সন্তানরা প্রতিযোগিতামূলক সর্বোচ্চ পরীক্ষাগুলিতে সফল হয়। বড় বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যুগে যুগে এদেরই অবদান।]

অলস ও পরঘাতী করে। ঐ অভাবসকল পূরণে উচিত পন্থা গ্রহণে কিশোরদের সাহায্য করা প্রয়োজন।]

মাতাপিতার স্নেহের অভাব কিশোর ও শিশু-অপরাধী সৃষ্টির অন্যতম কারণ। প্রায়শক্ষেত্রে ঐ স্নেহ সকল পুত্রের মধ্যে সমভাবে বণ্টন হয় না। বহু মাতা পিতার ধারণা যে তাঁরা প্রতিটি সন্তানের প্রতি সমান যত্ন নিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে প্রথমটির জগতে দ্বিতীয়টি ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয়টির জগতে প্রথমটি ছিল ও আছে। এইখানে তাঁদের সাবধানতা অবলম্বন করে প্রতিজনের প্রতি সমান যত্ন নেওয়া উচিত। ওদের পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা উৎপন্ন হয় এমন কোনও কার্য তাঁদের করা অনুচিত। সামান্য স্নেহের তারতম্য ও কিশোর অপরাধী সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে। ছোটটিকে কোনও দ্রব্য দিতে হলে উহা বড়টির মাধ্যমে দিলে ফল সর্বোত্তম হয়। মাতাপিতার স্নেহ ভাগাভাগী হলে অতি আদর কারুর ক্ষতি করে না। সম অধিকারে একত্রে বসবাস শান্তিপূর্ণ অবস্থানের অভ্যাস সৃষ্টি করে। একের অধিক পুত্রকন্যা ও একান্নবর্তী পরিবার উহার সহায়ক।

একটি সন্তান প্রায়ই গর্বিত অলস ও স্বার্থপর হয়েছে। পারস্পরিক নির্ভরতা ও স্বার্থত্যাগের সুযোগ এদের কম। কিন্তু উহা বহুক্ষেত্রে সত্যি নাও হতে পারে, কিন্তু তারা অপরাধী কম ক্ষেত্রেই হয়েছে। ধনী ও দরিদ্রের স্বনামধন্য [selfmade] ব্যক্তিরা ঐ সম্পর্কে বিবেচ্য। পরন্তু—য়ুরোপীয় ও ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থাতেও প্রভেদ আছে। এখানে এক সন্তানের পিতাদের সন্তানবৎ পোষ্য থাকে।]

বিঃ দ্রঃ—অভাবেরও একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে। যাহা মিটানো উচিত নয় এমন অভাব, অভাব নয়। অসামাজিক অভাবকে এখানে অভাব বলা হয় নি। অনুচিত অভাবকে প্রশ্রয় দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কোনও শিশু উহা কামনাও করে না। সকল ইচ্ছা পূরণ হবে তাও সে আশা করে নি। উচিৎ ইচ্ছা পূরণ হলে অনুচিত ইচ্ছা আসে না।

[কিশোর ও শিশুদের কয়েকটি পূর্ব অভ্যাস ত্যাগ করানো কালে তারা কিছুটা অস্বস্তি অনুভব করে। শিশুকে লিকুইড ফুডের স্থলে সলিড ফুড খাওয়ানো কালে তারা বাধা দেয়ই। উহা সাময়িক হওয়াতে উহা ন্যায্য অভাব নয়।]

কিশোরগণ তাদের ইচ্ছা ও অসুবিধা স্বেচ্ছায় জানায় না। পীড়াপীড়ি

করে উহা জানা উচিত। পিতামাতার সহিত সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ হলে তাঁদের কাছে তারা তাদের অভাব ব্যক্ত করে। নচেৎ মাতামহী ও বন্ধুদের মাধ্যমে উহা জেনে নিতে হবে। অভাব পূরণ না হাওয়ার জন্য তারা শুধু মাতা-পিতাকেই দায়ী করে। ফলে প্রীতির বদলে ওঁদের প্রতি তাদের বিরূপতা আসে। এজন্যে ভবিষ্যতে তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা কঠিন হয়। তখন যারা তাদের অভাব পূরণ করে তাদের তারা অনুরক্ত হয়। এ ক্ষেত্রে তারা প্রায়ই দুষ্ট ব্যক্তিদের প্রভাবে পড়ে।

[বয়স্কদের অভাব অবশ্য উদ্ভাবনী শক্তির জনক। সেই প্রশ্ন এখানে ওঠে না। তাদের অভাব তাদের কর্মঠ করে। উহা না মিটলেও তাদের নূতন কিছু ক্ষতি নেই। তাদের যা কিছু ভালোমন্দ তা তাদের শৈশবকালেই শেষ হয়ে গেছে।]

শিশুদের অপূরিত ইচ্ছা ও অভাব প্রদমিত হলে ওদের মধ্যে বহু বিসদৃশ ব্যবহার ও কদর্য আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। বারে বারে ক্ষুব্ধ হলে ওদের মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরে কৈশোর বয়সে সৃষ্ট মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বসমূহ ওই ক্ষত আরও গভীর করে।

[লোকসংখ্যার স্বল্পতা সৌহৃদ্য ও এক পরিবার বোধ, ভালবাসা ও সহানুভূতি সৃষ্টি করে। এ জন্য বড় শহর ভেঙে ছোট করলে এবং গ্রামগুলির লোকসংখ্যা কম করে দূরে দূরে স্থাপন করলে অপরাধ কমে। বড় শহর-গুলিকে প্রশস্ত রাস্তা পার্ক ও বাগিচা দ্বারা বিভক্ত করে ছোট ছোট ব্লকের সৃষ্টি করা যায়। এতে অপরাধ নিরোধ ও নির্ণয় উভয়েরই সুবিধা হবে। পুরুষানু-ক্রমে একত্রে বসবাস অপরাধ-নিরোধের অন্যতম সহায়ক। ঐ জন্য—গ্রাম সমূহে বহিরাগতদের স্বল্প সংখ্যায় আগমন বাঞ্ছনীয়। বরং বহিরাগতদের জন্য পৃথক গ্রাম গড়ে দেওয়া ভালো। একটি বৃহৎ মহীরুহ সৃষ্টি হতে বহু বছর লাগে। ওইরূপ এক-পরিবার বোধ সৃষ্ট হতেও বহু পুরুষের প্রয়োজন হয়।]

কিশোর ও শিশুদের চরিত্রগঠনে পিতামাতার দায়িত্ব সর্বাধিক। ওঁদের ভুলগুলি সংশোধন করতে হয় বলে শিক্ষকদের ঐ সম্পর্কিত দায়িত্ব আরও কঠিন। কারণ অন্যের স্পর্শ-লাঞ্ছিত [অন্যের দ্বারা প্রভাবিত] শিশু ও কিশোরদের চরিত্র গঠন তাঁদের করতে হয়। শিক্ষকদের মধ্যে কেউ কেউ ঐ সকল বিষয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকেন। কিন্তু সকল ব্যক্তিই ঐরূপ প্রতিভাবান হয়ে জন্মগ্রহণ করেন নি। এজন্য তাঁদের অপরাধবিজ্ঞান ও

শিশু-বিদ্যার মূল তত্ত্বগুলি অবগত হতে হবে। বলাবাহুল্য যে অপরাধী হওয়ার মূলবীজ শিশুদের মধ্যেই নিহিত।

শিক্ষকরা দুইপ্রকার স্বভাবের হয়ে থাকেন, যথা (১) কর্তৃত্ব-প্রয়োগবিলাসী এবং (২) প্রভাববিস্তার-কৌশলী। কর্তৃত্ব প্রয়োগবিলাসী শিক্ষকরা ছাত্রদের সহিত একমুখী এবং প্রভাববিস্তার-কৌশলী শিক্ষকরা ছাত্রদের সহিত দ্বিমুখী সংযোগ স্থাপন পছন্দ করেন। প্রথমোক্ত শিক্ষকরা ছাত্রদের উপদেশ দেন এবং তারা তা নীরবে শুনে যায়। এখানে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে কোনও মানসিক সংযোগ নেই। তারা তাঁদের ভয় করলেও ভালবাসে না। ফলে, ছাত্রদের অভাব অভিযোগ এবং মনোবৃত্তিসমূহ তাঁদের কাছে অজ্ঞাত থেকে যায়। ওদের দৈহিক ও মানসিক অসুবিধাগুলি তাঁদের কাছে প্রকাশ করা দূরে থাকুক, তাদের পাঠ্য বিষয় সম্পর্কিত প্রশ্নও মীমাংসার জন্যে তারা তাঁদের নিকট উত্থাপন করে না। দ্বিতীয়োক্ত [প্রভাব-বিস্তার-কৌশলী] শিক্ষকরা ছাত্রদের কিছু বলেন ও বাকীটা ছাত্ররা তাঁকে প্রশ্ন করে জেনে নেয়। একে দ্বিমুখী সংযোগ বলা হয়। উহাকে কথোপকথন বলাও যেতে পারে। এক্ষেত্রে উভয়ে উভয়ের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। উহা ছাত্রদের ভয়শূন্য ও আত্মবিশ্বাসী করে। এরূপ শিক্ষকরাই ওদের প্রদমিত অপস্পৃহার বীজ নির্মূল করতে সক্ষম।

কোনও শিক্ষক মনে করেন যে প্রথমে ভীতিসঞ্চার করে পরে ভালবেসে ওদের জয় করবেন। ঐ পন্থা রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে প্রযোজ্য হলেও বিদ্যালয়ের পক্ষে উহা উপযোগী নয়। কিন্তু—অতি আদরে অভ্যস্ত শিশুদের জন্য কিছুটা কঠোর হওয়ার প্রয়োজন আছে। কিন্তু পরক্ষণেই সদ্‌ব্যবহার ও আশার বাণী শুনিয়ে তার ক্ষত নিরাময় করতে হবে। ওদের ভর্ৎসনা করা শিক্ষকদের পক্ষে সামান্য ব্যাপার হলেও শিশু ও কিশোরদের পক্ষে উহা সামান্য হয় না। উহা দীর্ঘক্ষণ তাদের মনকে ক্ষুব্ধ চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন করে রাখে। ঐ জন্য পরক্ষণেই তাদের সাহস দিয়ে আশ্বস্ত করতে এবং মিষ্টিবাক্যে ভোলাতে হবে।

বিঃ দ্রঃ—শিক্ষা প্রকরণ জটিল যন্ত্রাদির সহিত তুলনীয়। মাতাপিতার কলহের মত শিক্ষকদের প্রকাশ্য বিরোধও ছাত্রদের পক্ষে ক্ষতিকর। স্বাভাবিক কারণেই ছাত্ররা শিক্ষকদের ওই সকল অন্তর্বিরোধে জড়িয়ে পড়ে।

শিশুদের মধ্যে বিচার বুদ্ধির উন্মেষ ঘটানো সর্বাগ্রে প্রয়োজন। তাড়না না করে তাকে বোঝাতে হবে ঐ কার্য করা উচিত নয় কেন। ভয়ে নিয়ম মানা এবং যথার্থ ভেবে তা মানার মধ্যে প্রভেদ আছে। ঐ সম্পর্কিত বাধা

সমূহ তার অন্তর থেকে আসা চাই। শিশুরা তিরস্কারের ভয়ে যেমন আত্ম সংযম দেখায়, তেমনি মাতাপিতাকে খুশী করার জন্যেও কদাচারে বিরত হয়। পিতামাতার প্রতি ভালবাসা ও বিশ্বাসের উহা সহায়ক। শিক্ষানুযায়ী তারা ভালমন্দ উচিত অনুচিত ও ন্যায় অন্যায়ের প্রভেদ বোঝে। ঐ ভাবে ধীরে ধীরে ওদের মধ্যে সুষ্ঠু বিবেকের উন্মেষ ঘটে। অন্যের নিকট হতে আসা বাধা তখন সে নিজেই নিজের উপরই আরোপ করে। ঐ সম্পর্কিত যা কিছু বাধা তখন তা নিজের অন্তরের ভিতর থেকে আসবে। মাতাপিতা ও শিক্ষকদের প্রভাব ও শৈশবের পরিবেশের উপর ওদের ওই বিচারশক্তির সুষ্ঠু বিকাশ নির্ভর করে।

কতকগুলি ইচ্ছা আছে যা মানসিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে না। যেমন একই সঙ্গে খাওয়ার ও শোয়ার ইচ্ছা জাগে। একই সঙ্গে পড়শুনা করা ও বেড়াতে বেরনোর ইচ্ছা মনে আসে। এই উভয় ইচ্ছাই তার কাছে সমান প্রিয় হতে পারে। ওগুলিতে ওদের মধ্যে দ্বন্দ্ব আনে না। আমরা আক্রমণ করি ও পলায়ন-পর হই। উহা বরং আমাদের উপকারে আসে। সমভাবে ঐগুলির প্রয়োজন হয়। আমরা ঘৃণা করি ও ভালবাসি। কয়েকপ্রকার পরাজয়কে আমরা জয় মনে করি। ঐ উপেক্ষণীয় দ্বন্দ্বসমূহ কিশোর ও শিশুদের বরং উপকারে আসে। উহা তাদের সহ অবস্থানের নীতিতে অভ্যস্ত করে। ঐগুলি ওরা নিজেরাই মিটিয়ে নেয়। কিন্তু—অন্য কিছু সংখ্যক বিষয় তারা নিজেরা মিটিয়ে নিতে অক্ষম হয়। ঐগুলি তাদের মধ্যে গুরুতর মানসিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। যথা, (১) অস্বস্তিকর বদ্ধভাব এবং (২) পরিপূর্ণ আশ্রয়ের তৃপ্তি। ঐ তুইটির একটিকেও সে ত্যাগ করতে চাইবে না। উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য এখানে আনতেই হবে। সন্তানদের প্রতিটি কার্যে বাধা দেওয়া ঐ জন্যে অনুচিত।

শিশুদের কার্যে অহেতুক বাধা দিলে তাদের একটির বদলে তুই প্রয়োজনের সৃষ্টি হয়। যথা (১) ঈপ্সিত দ্রব্য লাভ করা (২) সেই সঙ্গে পিতামাতার শাসন এড়ান। পরবর্তী জীবনে এদের পক্ষে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অসদুপায় গ্রহণ সম্ভব। মাতাপিতাকে ঠকাতে বা ফাঁকি দিতে অভ্যস্ত হলে ভবিষ্যতে ওরা প্রবঞ্চক [cheat] হতে পারে।

তুইটি প্রয়োজন পরস্পর বিরোধী হলে উহাদের একত্রে সিদ্ধি করার পথ কিশোরদের আমরা বলে দিতে পারি। কিংবা একটিকে পরিহার করার জন্য তার দৃষ্টিভঙ্গি আমরা বদলে দিতে পারি। এর ফলে তার ঐ প্রয়োজন

প্রয়োজনই মনে হবে না। ঐ কিশোরের ভীতির কারণ হয়তো ইতিমধ্যে বিদূরিত হয়েছে। কিন্তু তা হয়তো সে তখনও বুঝতে পারে নি। তাকে ঐ সম্বন্ধে অবহিত করলে তার চিত্তচাঞ্চল্য বিদূরিত হবে। ওদের দায়িত্ব দিলে সংগঠনী শক্তি আসে। তাতে ভাঙ্গা অপেক্ষা গড়ার কাজে সে অভ্যস্ত হবে। ওদের মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের উপশম ঐ ভাবে করা যায়।

কিশোরদের প্রত্যেকের ক্ষমতার [দৈহিক ও মানসিক] একটি নির্দিষ্ট সীমানা আছে। লক্ষ্য ঐ সীমানার নীচুতে হলে ঐ ক্ষমতা অব্যয়িত থাকে। ফলে পরিবার ও সমাজ উহা থেকে বঞ্চিত হয়। উচ্চ আশা ক্ষমতা বহির্ভূত [বেশী উঁচু] হলে তজ্জনিত অসাফল্য ওদের মধ্যে ভীতি ও নৈরাশ্য আনে। সকলের প্রতীতি ও অনুভূতিও সমান হয় না। একই উক্তিতে কেউ রাগে এবং কেউ খুশী হয়ে ওঠে। কোনও কিশোর ক্লাশে প্রথম দশটির মধ্যে স্থান না পেলে ক্ষুব্ধ হয়। অন্য দল ফার্স্ট ডিভিসনে পাশ করে সন্তুষ্ট। কারও কোনও রূপে পাশ করাই একমাত্র লক্ষ্য। উপরোক্ত উঁচু বা নীচু লক্ষ্যে পৌছতে পারলে তারা স্ব স্ব ক্ষেত্রে সফল মনে করে।

"নিমন্ত্রিত না হলে খাদ্য না পাওয়ার অভাব অনুভূত হয় না। শুধু মনে করা হয় যে তাতে তাকে উপেক্ষা করা হয়েছে। কেউ কেউ এও ভেবে নেন যে হয়তো ঐ বিষয়ে কোথাও ভুল হয়েছে। কেউ মনে করেন যে ইচ্ছা করেই সেখানে তাকে অপমান ও হেয় করা হল। কেউ ভাবে উপহার ও গাড়ি ভাড়া বাবদে অর্থ বাঁচল। সেই সঙ্গে গুরু আহার হতে স্বাস্থ্য রক্ষাও হল। কেউ ঠিক করেন ভবিষ্যতে তাঁকেও স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করা হবে না। কেউ বা তা উপেক্ষা করে ভুলে যান ও স্বগৃহে উৎসবে তাঁকে নিমন্ত্রণও করেন।"

কিশোর ছাত্রদের উপরোক্ত বিবিধ সমস্যা উত্থাপন করে জিজ্ঞাসা করা উচিত—'ঐ অবস্থায় তারা কি করত বা ভাবত?' ওদের উত্তর অসামাজিক হলে উহার ঔচিত্য বুঝিয়ে বলে তাদের চরিত্র গঠনে সাহায্য করা যায়। এইরূপ আলোচনার মধ্যে ওদের সংসার জ্ঞানে অভিজ্ঞ ও সহনশীল করা উচিত। ঐরূপ চিত্তপ্রস্তুতিতে অভ্যস্ত হলে পরবর্তী জীবনে তারা অহেতুক কষ্ট পায় না। উহাতে তারা বন্ধুকে শত্রু না করে শত্রুকে বন্ধু করবে। নিষ্প্রয়োজন বিষয়ে অযথা জড়িয়ে পড়ে শক্তি ক্ষয় করবে না। তারা ওতে বাস্তবজ্ঞান-পূর্ণ এবং ভাবপ্রবণতা-শূন্য হবে।

ঐরূপ বহু সমস্যা ছাত্রদের নিকট উত্থাপন করে বাদানুবাদ দ্বারা তাদের

চরিত্র গঠন করা সম্ভব। ঐ সম্পর্কিত ছাত্রদের মতামতগুলি যুক্তি দ্বারা সংশোধন করে দেওয়া যায়। শিক্ষকদের ঐ পন্থাটি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া উচিত।

ছাত্রকে ভুল বুঝা হল বা সমালোচনা করা হল, এমন ধারণা তাদের মধ্যে যেন না হয়। প্রথমে ওদের মতে কিছুটা সায় দিয়ে কিংবা না জানার ভান করে প্রশ্নোত্তর দ্বারা তাদের স্বমতে আনতে হবে। বহু ছাত্র শিক্ষকদের খুশী করতে ব্যস্ত। ওদের উপর স্বভাবতঃই তাঁরা খুশী। অন্যদিকে বহু আনুগত্য-হীন ছাত্র পূর্বোক্তদের অপেক্ষা বহু গুণে মেধাবী। ওদের অবহেলা করার অর্থ জাতির ক্ষতি করা। ব্যক্তিত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা সকলকে সকল সময় খুশী করতে পারে না। এখানে ওদের আচরণ উপেক্ষা করে তার মেধা ও কর্মের উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিৎ।

প্রথম জীবনে অসফল ছাত্ররা উপেক্ষনীয় বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করে। ওইগুলিকে তারা বিপদ ভেবে আত্মরক্ষার্থে প্রস্তত হল। সেক্ষেত্রে ওদের বোঝাতে ও সাহস দিতে হবে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য না বুঝে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া হয়। লক্ষ্যহীন শিক্ষা বিরূপতা ও নিক্রিয়তা আনে। ওই শিক্ষা সম্বন্ধে ছাত্রদের প্রয়োজনের তাগিদ নেই। শিক্ষকরা বৃথা জ্ঞানের বোঝা তাদের উপর চাপিয়ে দেন। তারা জানে যে এই শিক্ষাতে বিফলতা অনিবার্য। তারা অর্থোপার্জনের জন্য শিক্ষা চেয়েছে। কেউই জ্ঞানার্জনের জন্য স্কুলে আসেনি। কি প্রকারের শিক্ষা কার পক্ষে উপযোগী তা বিবেচনা করা হয় না। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে ছাত্রদের আশা আকাঙ্ক্ষা ও মনোভাব বদলেছে। কিন্তু—শিক্ষকরা অধিকাংশ প্রাচীন পন্থী হওয়ায় ঐ পরিবর্তন তাঁরা বুঝেন না। ছাত্র বিক্ষোভ ও তজ্জনিত অপরাধ সমূহের উহা মুল কারণ।

ছাত্র বিক্ষোভ কালে বহু শিক্ষক অযথা ভীত ও ক্রুদ্ধ হন। ছাত্ররা সকলে লড়াকু হয় না। ওদের স্বল্প ব্যক্তিই লড়াকু হয়। ওরাই মাত্র জোট বাঁধে। ওদের ভয়ে অন্যেরা নীরব থাকে। কিংবা তারা ওদের মতে চলে। ওদের বহুজন মাত্র নীরব দর্শক। সাহস করে এগুলে ওরা পিছুবেই। কিন্তু যিনি এগুবেন তার সম্বন্ধে ছাত্রদের ভালো ধারণা থাকা চাই। (f)

(f) উৎপীড়ক মন্যদের উপস্থিতি ছাত্রদের নিকট প্রভোকেশন তথা প্ররোচনার মত হয়।

বহু শিক্ষক ছাত্রদের উপর প্রভাব বিস্তারে অক্ষম। এজন্য ছাত্রেরা শিক্ষকদের আত্মকেন্দ্রিক ও অজ্ঞ ভাবে। অন্যদিকে শিক্ষকরা ছাত্রদের স্থূলবুদ্ধি ও দুর্বিনীত ভাবে। ওঁরা তুচ্ছ ঘটনাগুলিকে অগ্রাহ্য না করে গুরুত্ব দেন। অ-বিকেন্দ্রিত শিক্ষা নিকেতনগুলি বিশাল এক-কেন্দ্রিক হওয়াতে শিক্ষকদের সহিত ছাত্রদের দ্বিমুখী যোগাযোগ না থাকা-ই ঐ অবস্থার জন্যে দায়ী।

শিক্ষা নিকেতনগুলি বৃহৎ আকার হলে ছাত্রদের সহিত শিক্ষকদের মাত্র একমুখী সম্পর্ক থাকে। তজ্জন্য শিক্ষকরা ছাত্রদের উপর প্রভাব বিস্তারে অক্ষম হন। শিক্ষা নিকেতনগুলি ভেঙে ছোট ছোট করে ছড়িয়ে দিলে দ্বিমুখী সম্বন্ধ স্থাপন সম্ভব হয়।

কিশোর-অপরাধীদের প্রাগ-অপরাধী কালের মত বয়স্কদেরও প্রাগ্-অপরাধী কাল আছে। নিম্নোক্ত কয়টি মূল ইচ্ছা পূর্ণ না হলে এবং তৎসহ তাদের প্রতিরোধশক্তির হানি ঘটলে বয়স্করাও অপরাধী হতে পারে। নিম্নোক্ত বিষয়-গুলিকে বয়স্কদের প্রধান ইচ্ছা চতুষ্টয় তথা [মেজর উইস] বলা হয়। এগুলির অভাব ঘটলে তারা অপরাধী হতে পারে।

(১) সম্প্রীতি : [রেসপন্স তথা সংবেদন] মানুষ মাত্রই প্রেমপ্রীতি ও ভালবাসা কামনা করে। উহা তারা যথাকালে যথাযথ ভাবে না পেলে ক্ষুণ্ণ হয়। শিশু পিতামাতার নিকট স্নেহ আকাঙ্খা করে। তরুণরা ভাবী বধুর সম্প্রীতি কামনা করে। স্বামী স্ত্রী পারস্পরিক প্রেম, একনিষ্ঠা ও সেবা চায়। তাদের আপত্যের নিকট হতেও তাদের আনুগত্য কামনা। এর বিপরীত কিছু ঘটলে তারা জীবন অসফল মনে করে।

(২) প্রতিষ্ঠা : [রেকগনিশন] মানুষ মাত্রেই জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে চায়। উচ্চাকাঙ্খী-দের পক্ষে উহা বিশেষ রূপে প্রযোজ্য। শিশুরাও একটু বড় হলে স্ব-পরিবারে স্বীকৃতি কামনা করে। কিশোর বয়সে ওরা বহির্জগতেও অনুরূপ স্বীকৃতি চায়। এই স্বীকৃতি তারা স্বপরিবেশে না পেলে ওর জন্য তারা ভিন্ন পরিবেশ খোঁজে। সুযোগ পেলে তজ্জন্য তারা অসামাজিক গোষ্ঠীকে বেছে নেয়।

(৩) নিরাপত্তা : [সিকিউরিটি] শিশুমাত্রই নিরাপত্তাবোধের আকাঙ্ক্ষা করে। তারা বোঝে যে বাড়িতে পিতামাতা তাদের রক্ষক, অবিভাবকরা বা রাষ্ট্র নেতারা তাদের মান সম্মান রক্ষা করতে না পারলে তারা আত্মরক্ষার্থে বা প্রতিশোধ গ্রহণার্থে গুণ্ডা দলে যোগ দেয়। নির্বিচার গ্রেপ্তারের শিকার হলে ওরা গভর্ণমেন্ট বিরোধী হয়।

২৩

(৪) নূতনত্ব : [নভেলটি] নূতনত্বের প্রতি আকাঙ্খা মানুষের আদি স্বভাব। উহার আধিক্য তরুণদের এ্যাডভেনচার-প্রিয় করে। তারা নতুন অভিজ্ঞতা লাভ ও অজানাকে জানতে চায়। নতুনত্বের আস্বাদ গ্রহণের ইচ্ছা [নিউ এক্সপিরিয়েন্স] তাদের কিছু অসামাজিক করে। এদের সঙ্গে দেশ ভ্রমণে বেরুলে উপকার হবে। স্পোর্টস, অভিনয় ও শিকার উহার অব্যর্থ ঔষধ।

পাঠ্য পুস্তকের গুরুভারও তরুণদের মস্তিষ্কের পক্ষে ক্ষতিকর হয়। উহাতে মস্তিষ্কের সূক্ষ্মস্নায়ু ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

মস্তিষ্কের স্নায়ু-কোষ তথা স্মৃতি-কোষ নির্দিষ্ট সংখ্যায় থাকে। বৃদ্ধ বয়সে ওইগুলি স্মৃতির দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়। তখন অন্য স্মৃতির জন্য সেখানে স্থানের অভাব হয়। ওই জন্য বৃদ্ধ ব্যক্তিরা বহু প্রাচীন ঘটনা মনে করতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁরা সকালে খেয়েছেন, কিনা তা বিকালে ভুলে গিয়ে থাকেন।

[এক্ষেত্রে স্মৃতি লিখে রাখলে ঐ স্মৃতিকোষ অন্য স্মৃতির জন্য খালি হয়। এতে যৌবনের ভাবধারা বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত ধরে রাখতে মানুষ সক্ষম হয়।]

এই যুগের জ্ঞান ভাণ্ডার এত বেশী যে সর্ব বিদ্যা পয়গম্বর হওয়া সম্ভব নয়। সব কিছু মনে রাখার প্রয়োজন নেই। তজ্জন্য লিপিকা ও পুস্তকের সৃষ্টি হয়েছে। বিবিধ কোষ-গ্রন্থগুলি উহার সহায়ক হয়। জ্ঞাতব্য বিষয় কোন পুস্তকে আছে এইটুকু বলে দিতে সক্ষম ব্যক্তি জ্ঞানী লোক। পুস্তক সহ পরীক্ষা তাই কঠিন পরীক্ষা। ওই প্রথা প্রচলনে টোকাটুকি বন্ধ হবে।

শিশু মনে স্বল্প আঁচড়ে বেশী দাগ কাটে। বিদ্যাসাগরের বর্ণ পরিচয় পুস্তকে আছে : চুরি করা মহা পাপ। ঐ বাক্য কয়টি ছাপার অক্ষরে পড়ে ঐ শিশু তা মনে রাখে। উহা ইস্পাতের তুরপুনের মত তাদের মনে স্থায়ী হয়।

[দারিদ্র্যের মতন প্রাচুর্যও ক্ষতিকর। প্রাচুর্য মানুষকে অলস করে। সেই অবস্থায় তারা অপরাধমুখী হতে পারে। এজন্য মধ্যবিত্ত পরিবারগুলিই দেশের কৃষ্টি আদির ধারক। ওদের মধ্যেই পণ্ডিত, বিজ্ঞানী ও দক্ষ প্রশাসক বেশী।

বিঃ দ্রঃ—অপরাধী রোগীদের সংখ্যা কমাতে হলে গর্ভিনী মাতার প্রতিও যত্ন নিতে হবে। তাঁর সুখাদ্য ও সুচিকিৎসার সহিত পরিবেশও উন্নত করতে হবে!

এয়ারোড্রোম তথা হাওয়াই বন্দরের নিকট বসবাসকারী মাতার নবজাত শিশুর নিদ্রা এ্যারোপ্লেনের শব্দে ভাঙে না। কিন্তু দূর স্থানে বসবাসকারী কোনও

প্রসবিনীর নবজাত শিশুর নিদ্রা এ্যারোপ্লেনের শব্দশুনা মাত্র ভেঙে যায়। বিভিন্ন স্থানীয় শব্দের টেপরেকর্ডের সাহায্যে নবজাত শিশুদের উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা করে উক্ত রূপ বহু তথ্য জানা যায়। এতে গর্ভস্থ সন্তানের উপর পরিবেশের প্রভাব প্রমাণ করে।

গ্রামে শব্দহীন অবস্থায় জন্মানোর জন্য গ্রামীন বালকগণ শহরের শব্দময় স্থানের জন্মানো বালকদের অপেক্ষা বেশী অপরাধ প্রতিরোধ শক্তি অর্জন করে। এই জন্য প্রসবাগার ও হাসপাতালের নিকট শব্দ আইনে দণ্ডনীয় হওয়া উচিত।

উপরোক্ত (১) সম্প্রীতি (২) প্রতিষ্ঠা (৩) নিরাপত্তা (৪) নূতনত্ব-কে মানুষের প্রধান ইচ্ছা চতুষ্টয় [Major Wish) বলা হয়। উহাদের বহিঃ প্রকাশ সাবধানে লক্ষ্য করে ওদের শক্তি সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। ঐ সকল ইচ্ছা অদম্য হলে উহা অবৈধভাবে তারা পুরণ করতে পারে। উপরন্তু এইগুলির সহিত ওদের ভ্রান্ত মূল্যায়ণবোধটিও বিবেচনা করতে হবে।

কোনও এক ব্যক্তি তার ভৃত্যকে তার পাওনা বেতন দেয়নি। ক্রুদ্ধ হয়ে ওই বালক মনিবের বাক্স ভেঙ্গে সম পরিমাণ টাকা নেয়। [দুর্বল চিত্ত বালক] এতে আইনানুযায়ী তাকে জেলে যেতে হয়। ওটা সে তার ন্যায্য অধিকার মনে করেছিল। প্রতীত হয় যে, স্বহস্তে আইন গ্রহণ একটি আদি মানব-সুলভ বৃত্তি।

চক্ষুর দৃষ্টি, ঠোঁটের ফাঁক, ঘাড়ের বাঁক নিশ্বাসের পরিমাপ অঙ্গুলির স্থিতি ও বসার এবং বাক্যের ক্ষণ ও ভঙ্গি এবং পরিক্রমণ হতে কিশোরদের উদ্দেশ্য বুঝতে হবে। ওদের নীচু উঁচু স্বর উচ্চারণ ও কথার টানও বিবেচ্য। ভাষার উচ্চারণ হতে কিশোরদের সামর্থ্যও বুঝা যায়। একারন্ত শব্দগুলি পিছু টানে। তাই ওগুলি কার্যকরী হয় না। লোক চরিত্রের উপর উচ্চারণের প্রভাব পড়ে।

[কম বেশী স্নেহ অগ্রগামী ও পশ্চাদগামী মানসিক বিবর্তনের কারণ। বহু ক্ষেত্রে মন দেহ হতে এগিয়ে থাকে মনে হয়। কিছু আদি-মানুষের মেয়েদের করোটি পুরুষদের অপেক্ষা ক্ষুদ্র ছিল। তথাপি ঐ নারীরাই পৃথিবীতে কৃষি কার্যের আবিষ্কারক।]

[কিশোরদের দাঁড়ানোর ভঙ্গী, ঘাড়ের বাঁক, ঠোঁটের ফাঁক, চোখের দৃষ্টি, ভ্রুর কুঁচকানী, আঙুলের মুঠি ও বাক্যের তথা স্বরের আগু পিছু টান হতে তাদের উদ্দেশ্য ও মনোবৃত্তি বুঝা সম্ভব।]

বিঃ দ্রঃ—গর্ভিনী নারীর মদ্য ও ধূমপান অমার্জ্জনীয় অপরাধ। তাতে আভ্যন্তরীন সঙ্কোচনে শিশুর শ্বাস গ্রহণে কষ্ট হয়। সেই ক্ষেত্রে অপরাধ-রোগীর সৃষ্টি হতে পারে।

পিতামাতার ধূমপান নিকোটিন দ্বারা গৃহের বায়ু দূষিত করে। তাতে শিশুদের মস্তিষ্কের ক্ষতি হতে পারে। গড় গড়া ও হুকার জলে নিকোটিন দ্রবীভূত হয়ে ধূম পরিশুদ্ধ করাতে উহা ততো ক্ষতিকর নয়।

[বধূদের এ্যালসেসিয়ান ডগ ও রেসের ঘোড়া অপেক্ষা বেশী যত্ন করা উচিত। মাতার সুষম খাদ্যের উপর গর্ভস্থ শিশুর সুঠাম গঠন নির্ভর করে। বহু ব্যক্তি পোষা জন্তুকে উত্তম খাদ্য দিলেও নিজের আহারে মনোযোগী নয়। তাই বৃহৎ কার্য শেষ হবার পূর্বে বহু ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে।]

ষোড়শ অধ্যায়

॥ পদ্ধতি বিজ্ঞান ॥

পদ্ধতি বিজ্ঞান মৎসৃষ্ট একটি নূতন বিজ্ঞান। ভবিষ্যৎ গবেষকদের চেষ্টায় উন্নত হয়ে ইহা একটি পৃথক বিজ্ঞান হবে। অপরাধ-পদ্ধতির [২য় খণ্ড দ্রঃ] সহিত এর প্রভেদ আছে। প্রথমটি অন্তর্জাত তথা মনস্তাত্বিক এবং দ্বিতীয়টি বহির্জাত তথা ব্যবহারিক।

[এপ্লায়েড বিজ্ঞানগুলি য়ুনিভার্সিটিতে পঠন-পাঠনের বহু পূর্বে অপরাধীরা এর প্রয়োগ কৌশল ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আরোপ করেছে। ইহা সৎপ্রেরণাবাহী হলে লোকরঞ্জক ম্যাজিক এবং অপস্পৃহাবাহী হলে ইহা ক্ষতিকর অপরাধ। অপরাধীরা এতে হাত সাফাই বা স্লেইট অফ হাণ্ড, এ্যাটেনসন ডাইভারসন তথা চিত্ত বিক্ষপ্তি, রসায়ন বিদ্যা প্রভৃতির সাহায্য নেয়। এরা বিভিন্ন শ্রেণীর পিঁপড়ে পর্যন্ত পুষে। ভিকটিম'দের শ্রেণীভেদে বিভিন্ন বিষের পিঁপড়ে, শিশি হতে তাদের ঘাড়ে ছাড়ে। এতে তারা বিব্রত হলে ছিনতাই কর্মে সুবিধা হয়। এখন অবশ্য এজন্য ইরিটেন্ট পাউডার ব্যবহার হচ্ছে। শ্রমিকদের জন্য বেশী বিষের ও ভদ্রজনদের জন্য কম বিষের [ওদের পৃথক কষ্ট বোধ মত] পিঁপড়ে ব্যবহৃত হয়। ইলেকট্রিক তুরপুন এ্যাসিটিলিন গ্যাস আদি পুরাতন সিঁদকাটির

পাশাপাশি এরা ব্যবহার করে। চুরির জন্তে বাঁদর, কুকুর ও ভোঁদড় প্রাণীকেও এরা শিক্ষিত করে। (f) মানুষের চিত্ত-প্রস্তুতি তথা প্রিডিসপোজিসন মত রগড়া বা বচন তথা সাজেসসন দ্বারা প্রলুব্ধ করে লোক ঠকানো সহজ। পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে এগুলি বিশেষ ভাবে বিবৃত আছে। চুম্বকের সাহায্যে দ্রব্যাপসরণ ও ইলেকট্রিক ও কেমিক্যাল দ্বারাও মৃত্যু ঘটানো হয়।]

বিঃ দ্রঃ—ভারতে কর্মকার চর্মকার স্বর্ণকার কুম্ভকার, চিত্রকর তন্তবায় প্রভৃতি শিল্পভিত্তিক জাতি ও বর্ণগুলির উপর স্ব স্ব শিল্প শিক্ষণের ভার ছিল। সঙ্গীতবিদদের মত তাদের শিল্প শিক্ষার মধ্যে স্ব স্ব ঘরোয়ানা থাকতো। তৎকালে রাষ্ট্রের সহিত কর দেওয়া নেওয়া ছাড়া স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীন রিপাবলিক গুলির অন্য সম্পর্ক ছিল না। (g)

অনুরূপভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর ও উপশ্রেণীর অপরাধীরা গুরু পরম্পরায় স্ব স্ব অপকর্মে শিষ্যদের ব্যুৎপন্ন করে। এদের বহু ঘরোয়ানা অন্যদের নিকট আজও গোপন রাখার রীতি।

[নিরাপরাধীদের কর্মভিত্তিক সমাজ অধুনা না থাকলেও অপরাধীদের অনুরূপ সমাজ আজও রয়ে গিয়েছে। প্রকৃত বৃত্তিগত অপরাধীদের সম্বন্ধে ইহা বিশেষরূপে প্রযোজ্য।]

মহাপুরুষদের [সুপার-ম্যান] ব্রহ্ম বিদ্যার সহিত প্রকৃত অপরাধীদের পরাবিদ্যা তুলনীয়। ব্রহ্মবিদ্যা সৎপ্রেরণা জাত এবং পরাবিদ্যা অপস্পৃহাজাত হয়ে থাকে। এই উভয় বিদ্যাকে একত্রে মহাবিদ্যা বলা হয়। এই প্রবন্ধে আমি মাত্র প্রকৃত অপরাধীদের পরাবিদ্যা সম্বন্ধে বিবৃত করবো। ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে আমার নিজস্ব কোনও ধারণা নেই।

(f) ভোঁদড়ের সাহায্যে পুকুর থেকে মাছ চুরি হয়। বাঁদরের সাহায্যে রাজপথে কলম ছিনতাই ও কুকুরের সাহায্যে বাড়ী থেকে চুরি করে। উপোষী ক্রুদ্ধ সর্পকে বাঁশের চোঙে পুরে গবাক্ষ পথে গৃহে ছেড়ে খুন করাও হয়। পাকুড় হত্যা মামলায় বীজাণু ব্যবহারও প্রমাণিত। পূর্বে বারগীর'রা গোহাড় গিলের সাহায্যে পর্বত দুর্গে উঠতো।

(g) ব্রাহ্মণদের উপর উচ্চ শিক্ষার এবং ক্ষত্রিয়দের উপর যুদ্ধ শিক্ষার ভার ছিল। উচ্চ ক্ষত্রিয়দের মধ্য হতে উচ্চপদী ও উগ্র ক্ষত্রিয়দের মধ্য হতে নিম্নপদী সৈন্য সংগৃহীত হতো। ধানুকী ঢালি খাঁড়া, হাতী [হস্তী চমূ] ঘোঁড়া [অশ্বারোহী] রথ [রথি] আদি পদবীবাচক গোষ্ঠিগুলি পারিবারিক ঘরোয়ানায় বংশপরম্পরায় স্ব স্ব শস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষিত হতো। কেহ কেহ বলেন যে শিল্পশিক্ষাকে পরিবারের মধ্যে গোপন রাখার জন্য জাতিভেদের সৃষ্টি।

এই পরাবিদ্যাসমূহ অপরাধীদের মধ্যে দৃষ্ট অতীন্দ্রিয়তার সহিত সংযুক্ত। উহা ব্যবহারিক অপরাধ তত্ত্বের মনস্তাত্ত্বিক বিভাগের একটি অন্যতম উপাদান। এই অতীন্দ্রিয়তার উৎপত্তি ও স্বরূপ সম্বন্ধে পূর্ববর্তী প্রবন্ধগুলিতে বিবৃত হয়েছে। এই ব্যবহারিক অপরাধতত্ত্বের সাহায্যে পুলিশ কর্মীরা অপরাধ নির্ণয় ও নিরোধ করে। এই একই ব্যবহারিক অপরাধতত্ত্বের সাহায্যে অপরাধীরা সুষ্ঠুভাবে অপরাধ করতে সক্ষম। অপরাধতত্ত্বের এই বিভাগটি মনস্তাত্ত্বিক বিভাগের মত সুবৃহৎ ও পৃথক হওয়ায় উহা পুস্তকের পৃথক খণ্ডে বিবৃত হবে। ঐ শাস্ত্র সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা এখানে উপস্থিত করা হলো।

অপরাধীদের কার্যপদ্ধতি তথা অপ-পদ্ধতির মধ্যে দুইটি পৃথক ভাগ থাকে, যথা (১) মনস্তাত্ত্বিক এবং (২) ব্যবহারিক। বর্তমান প্রবন্ধে মূলতঃ ওদের মনস্তাত্ত্বিক অপপদ্ধতি সম্বন্ধে বলবো। ওদের ব্যবহারিক অপপদ্ধতি ও সজ্ঘটনাদি অন্যান্য কার্যকরণ পুস্তকের অন্য খণ্ডে ব্যবহারিক অপরাধতত্ত্ব শীর্ষক নিবন্ধে বলা হবে।

(১) পিক পকেট তথা পকেট মার'দের প্রকৃত অপরাধীরা স্পর্শ সম্পর্কীত অতীন্দ্রিয়তার অধিকারী। কারও এক পকেটে সাদা কাগজ এবং অন্য পকেটে কারেন্সী নোট থাকলে ওরা উভয় পকেটে আঙুলীর টোকাতে বলে দিতে পারে যে কোন পকেটে সাদা কাগজ এবং কোন পকেটে কারেন্সী নোট আছে। একটি স্পর্শের সহিত অন্য স্পর্শের প্রভেদ তারা বুঝতে সক্ষম। অগ্রগামী ওস্তাদ ঐভাবে টোকা মেরে তখুনি পিছিয়ে পশ্চাদগামীদের উদ্দেশ করে বলে। সব লোট মাইরী। জলদী তোরা আয়। তার নির্দেশে ওরা তাকে ঘিরে খাড়া হয়। [পজিসন নেয়।] দুই অঙ্গুলীর সাহায্যে বাঁকা ছুরি বা রেজার ব্লেড দ্বারা পকেট কেটে তারা ওই কাটার ফাঁকে ঐ দুটি অঙ্গুলীর সাহায্যে নোট বা ব্যাগ বার করে।

ওরা ব্যাঙ্ক বা পথে শিকারদের হাবভাব দেখে তার কাছে কিছু [মাল] আছে কি'না তা বুঝতে পারে। শেয়ানাদের এইরূপ ক্ষমতা থাকলে তাদের গুণী বলা হয়।

এই সকল পিকপকেটগণ পকেটাদিতে লক্ষ্য স্থল [সিট অফ এ্যাকসন] প্রথমে স্থির করে। ঐ নির্ধারিত আক্রমণস্থল হতে বেশ একটু উপরে [বগলের নীচে] ওরা বাম হাত দিয়ে একটু জোরে ধাক্কা মারে। তারপর ঐ বাম হাতের তলায় ডান হাত এগিয়ে দ্রুত পকেট থেকে ওরা দ্রব্য তুলে।

উপরোক্ত কায়দার ফলশ্রুতি এই যে প্রথমোক্ত বড় ধাকার আওতায় [Cover] পকেট মারা বা উহা কাটা রূপ ছোট ধাকাটি অনুভূত হয় না। মানুষ তখন অন্যত্র বড় ধাক্কার বিষয় ভাবে ও তাদেরকে গাল পাড়ে।

এইরূপ ধাক্কা দ্বারা তারা পরিস্থিতি তথা সিচুয়েসন তৈরী করে। উহার এক সেকেণ্ড পরে বা পূর্বে তারা পকেট মারলে [কার্যরত হলে] তারা ধরা পড়বে। ঐ বড় ধাক্কা রূপ সিচুয়েসন তৈরী করার সহিত একই ক্ষণে [সাইমালটেনাসলি] বিদ্যুৎ গতিতে তারা তাদের কার্য শেষ করে। এই ক্ষেত্রে প্রকৃত বিষয় না বুঝে ফরিয়াদী ব্যক্তি ওদের মাত্র গাল পেড়ে স্থান ত্যাগ করে। বহু পরে তারা বুঝে যে তাদের পকেট অর্থশূন্য হয়ে গেছে।

বড় ধাক্কা খাওয়া মাত্র লোকের পক্ষে তার পকেট দুই হাতে চেপে আত্মরক্ষা করা উচিৎ।]

এইখানে রিএ্যাকশন টাইম তথা প্রতিক্রিয়া-কালের প্রশ্ন আসে। মনস্তাত্বিক পরীক্ষার্থে প্রতিক্রিয়া-কাল পরিমাপের যন্ত্র আছে। ঐ যন্ত্রের উপরে একটি বাল্ব ও নিম্নে একটি বোতাম তথা নব [knob] আছে। উহার মধ্যাংশে স্টাইলাস সহ ঘুর্ণিয়মান একটি ড্রাম থাকে। এ ড্রামের উপর রেখার দ্বারা প্রতিক্রিয়া কাল বুঝা যায়। সাবজেকটকে ঐ আলো জলা মাত্র ঐ বোতাম টিপতে বলা হয়।

এইক্ষণে আলো দেখা ও বোতাম টিপার মধ্যবর্তীকালে ব্যয়িত সময়কে প্রতিক্রিয়া-কাল বলা হবে। এই প্রতিক্রিয়া-কালকে 'সিগমার' পরিপ্রেক্ষিতে পরিমাপ করা হয়। এক সেকেণ্ডের হাজার ভাগের [১/১০০০] এক ভাগকে এক সিগমা বলা হয়। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়েছে যে সাধারণ মানুষের যে ক্ষেত্রে রিএ্যাকট করতে আশী সিগমার প্রয়োজন হয়েছে, সেই ক্ষেত্রে ঐ পকেটমারের রিএ্যাকট করতে মাত্র দশ সিগমার প্রয়োজন হয়েছে।

পুলিশ অফিসর তার আততায়ীকে না চিনলেও তার আততায়ী তাকে চিনে। এখানে ঐ আততায়ী একবার পিস্তল বার করলে ঐ পুলিশ কর্মীর পিস্তল বার করা বা না করা নিরর্থক। কিন্তু ঐ পুলিশ কর্মীর প্রতিক্রিয়া-কাল আততায়ী অপেক্ষা অধিক হলে আততায়ী পিস্তল কিছুটা উপরে তুলার পূর্বে ঐ পুলিশ কর্মী তার পিস্তল বার করে উপরে তুলে তাকে নিহত করতে পারবে। [ঐ যন্ত্রের সাহায্যে অভ্যাস দ্বারা স্ব স্ব প্রতিক্রিয়া কাল বাড়ানো সম্ভব।]

দৈহিক প্রতিক্রিয়া কালের মত মানসিক প্রতিক্রিয়া কালও আছে। ইহা

ঘটনা স্থলে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার সহায়ক। স্টপ ওয়াচের সাহায্যে উহার পরিমাপ করা হয়। একটি প্রবলেম সম্পর্কীত প্রশ্ন উত্থাপন করতে হবে। এখানে শুধু ঐ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়ার বিষয় নেই। এখানে কতো শীঘ্র সেই প্রবলেম মীমাংসার জন্য উপযুক্ত উত্তর ঐ ব্যক্তি দিল। এইটি বুঝা ও জানার ওখানে প্রয়োজন হয়। প্রশ্ন করার পরে ঐ স্টপ ওয়াচ চালু করা হয় এবং উত্তর পাওয়ার পর উহা বন্ধ করা হয়। উহাদের মধ্যবর্তীকালে ব্যয়িত সময়কে মানসিক প্রতিক্রিয়া-কাল বলা হবে।

প্রঃ—একটি পুষ্করিণী দীর্ঘ নালার দ্বারা নদীর সহিত যুক্ত। ঐ পুষ্করিণী থেকে মৎস্য চুরির জন্য উহার মালিক অভিযোগ দায়ের করলো। ঐ মামলা থেফট কেসের হবে কিংবা ফিসারী এ্যাক্টে হবে?

উঃ—ওই মৎস্য ইচ্ছামত পুষ্করিণী থেকে নদীতে যেতে এবং নদী থেকে পুষ্করিণীতে আসতে সক্ষম। সুতরাং উহা কারও হেপাজতে বা অধিকারে নেই। তজ্জন্য চুরির মামলার বদলে ফিসারী এ্যাক্টে ঐ ব্যক্তি অভিযুক্ত হবে।

প্রঃ—জনৈক তস্কর বাটীতে প্রবেশার্থে সার্সীর কাঁচ ভাঙতে চাইল। কিন্তু কিভাবে কাঁচ ভাঙার ও উহার পতনের শব্দ এড়ানো যাবে? অর্থাৎ কাঁচের ভাঙন ও পতনজনিত একটুকুও শব্দ শুনা যাবে না।

উঃ—একটি ন্যাকড়া লেই আটার দ্বারা ঐ সার্সীর কাঁচে লেপ্টে দিতে হবে। তারপর তুলা জড়ানো হাতুড়ীর দ্বারা উহা ভাঙলে কাঁচের টুকরো নীচে না পড়ে ঐ ন্যাকড়ার সঙ্গে সেঁটে থাকবে। [তস্কররা এই পদ্ধতিতে ঘুল ঘুলির ও সার্সীর কাঁচগুলি ভাঙে]

পকেটমারদের চাপ জ্ঞান কাইনাইটিক সেন্সেসন প্রখর। কতোখানি চাপ দিলে জামা কাটলেও নিম্নস্থ দেহের ত্বক কাটবে না তা তারা জানে। এরা কচি নাউ এর উপর ভিজে ন্যাকড়া জড়িয়ে ব্লেড দিয়ে ঐ ন্যাকড়া কাটতে এমন ভাবে অভ্যস্ত হয় যাতে ঐ ন্যাকড়া কাটা গেলেও ঐ নাউ এর উপর এতটুকুও দাগ পড়বে না। উপরন্তু এরা নিজেদের মধ্যে পকেট মারামারি করে পকেট মারার কার্যে অভ্যস্ত হয়।

প্রঃ—কোনও এক স্যুট পরা লোক হঠাৎ ট্রাম থেকে লাফিয়ে নেমে পথচারী এক লুঙ্গি ও গেঞ্জি পরা চোয়াড়ে ব্যক্তিকে উচ্ছ্বাসে জড়িয়ে ধরলো। এইরূপ একটি দৃশ্য দেখলে ওদের সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা করা উচিৎ?

উঃ—ওরা উভয়েই বস্তিবাসী সুদক্ষ পকেটমার ব্যক্তি। পকেট মারা'র

সুবিধার জন্য ঐ লোকের পরণে স্যুট পোষাক। ঐ লোকের ঐ ব্যবহার অপরাধীদের প্রতিরোধ শক্তির অভাবে সৃষ্ট ভাবাবেগ। উহা প্রতিরোধে ওদের অক্ষমতা এবং অবিবেচনা আদি প্রমাণ করে।

উপরে পিকপকেট অপরাধীদের মনস্তাত্ত্বিক অপপদ্ধতির সম্বন্ধে বলা হলো। এইবার ওদের অপপদ্ধতির অন্যাংশ ব্যবহারিক অপপদ্ধতি সম্বন্ধে কিছুটা বলবো। এতে গবেষক ছাত্রদের অপপদ্ধতির এই উভয়াংশ সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনার্থে একটা ধারণা হবে।

'হঠাৎ পথচারী ব্যক্তির মস্তকে কেউ গোময় নিক্ষেপ করলো। জনৈক দোকানী জলের বালতি এনে বললে, আরে এ কোন কিয়া। ছো ছো। পাণি নিবেন তো আহেন। মাথাটা আউর একটু সে নিচু হোয়েন। ওরা কয়-জনে তারা মাথ ধুতে থাকলে অন্য একজন তারা পকেট সাফা করে দিল।

"হঠাৎ একটি বালক এক পথচারী ভদ্রলোকের পায়ে পা বাধিয়ে পড়ে গেল। ওদের কয়জন ছুটে এসে তাকে দোষারোপ করে তাকে চতুর্দিক হতে চেপে ধরলো। ও বললো আপনি মশাই ভদ্রলোক হয়ে এহী বাচ্ছাকো গিরিয়ে দিলেন। ওখান হতে ভীড় সরলে দেখা গেল যে ঐ ভদ্রলোকের পকেট শূন্য।"

পকেটমাররা থানার আশে পাশে ঘুরে পুলিশ কর্মীদের চিনে রাখে। তারা পলায়নে সুবিধার্থে কর্মক্ষেত্রের প্রতিটি অলিগলির সহিত পরিচিত হয়। কিছু আর্থিক দাদন দ্বারা স্থানীয় একদল সহানুভূতি-শীল ব্যক্তিদেরও সৃষ্টি করে। এরা যৎসামান্য উঁচু ঢিবির আড়ালে লুকিয়ে পড়তে সক্ষম।

এরা শহরের স্থানগুলিকে দলীয় এলাকাতে বিভক্ত করে। একদল অন্য দলের এলাকায় গেলে মারপিঠ হয়। তবে—মেলা, বাস, ট্রাম ও রেল আদি এদের এজমালী এলাকা। এদের সর্দারদের অধীন মুভিঙ অফিস আছে। সেখানে স্ব স্ব উপার্জিত অর্থ জমা দিলে সর্দার প্রত্যহ নিজের জন্য একটি হিস্যা রেখে বাকিগুলি সমান ভাবে সকলের মধ্যে ভাগ করে দেয়। এতে কোনও দিন কেউ উপার্জনে অক্ষম হলেও তার দৈনিক একটি হিস্যা কপালে জুটে।

এরা বাঁকা ছুরি জিহ্বার তলাতে লুকিয়ে রাখে। বোতল ভাঙা কাঁচ ঘসে এরা ক্ষুরধার ছুরি তৈরীতে সক্ষম। অবশ্য এক্ষণে তারা রেজার ব্লেড ব্যবহারে অভ্যস্ত। গালের কষিতে ফাঁক তৈরী করে তাতে এরা রঙ রাখে। এদের জনতা ধরে মারলে গাল বেয়ে গল গল করে রক্তমন্য রঙ ঝরে। এতে জনতা ভয় পেয়ে তখুনি সেখান থেকে দ্রুত সরে পড়ে।

[আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মনস্তাত্ত্বিক বিভাগে অবৈতনিক অধ্যাপক থাকা কালে দুই জন দক্ষ পিকপকেটকে ছাত্র ও অধ্যাপকদের নিকট উপস্থিত করি। ওঁরা একত্রে মেঝের মধ্যস্থলে দাঁড়ালে বলা হয় যে, এই দক্ষ পিকপকেট দ্বয় আপনাদের জটলা ভেদ করে বেরুবে। এদের উদ্দেশ্য থাকবে আপনাদের পকেট থেকে দ্রব্য বা অর্থ অপহরণ।' এই ভাবে তাঁদেরকে আমি সাবধান [Fore Warn] করে তাঁদের মধ্যে চিত্ত-প্রস্তুতি তথা প্রিডিসপোজিসন আনি। কিন্তু উহা সত্বেও দেখা গেল যে হার্ভাড্ য়ুনিভারসিটীর জনৈক ডকটরেট প্রফেসর এবং অন্য এক স্নাতকোত্তর গবেষক ছাত্রের পকেট খোয়া গিয়েছে। পরে—ওঁদের ওই রূপ বিভ্রান্তি সৃষ্টির রীতি নীতির মনস্তাত্ত্বিক দিকটি বুঝানো হয়েছিল।

বিঃ দ্রঃ—বলা হয় যে শহরে প্রায় জনা পনেরো মেয়ে 'পিকপকেট' আছে। কিন্তু ওদের পকেটমার না ব'লে উত্তোলক তথা লিফটার চোর বলা ভালো। এরা ট্রামে ও বাসে মহিলাদের পাশে ব'সে সুযোগ মত তাদের ব্যাগ হতে অর্থ বা বটুয়া তুলে নেয়। এরা দোকান থেকেও দ্রব্যাদি তুলে নেয়।

[মেয়েদের পকেটমারিতে অসুবিধা আছে। কারণ—ওদের সান্নিধ্য পুরুষদের সজাগ করে। মেয়েরা সাধারণত প্রাথমিক পর্যায়ভূক্ত অপরাধী। তাই এদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের কোনও পরিবর্তন নেই।]

পনেরো থেকে পঁচিশ এইটেই পকেট মারদের বয়েস। (f) বেশী বয়স হলে এদের আঙুল ঠিকভাবে খেলে না। [পকেটমারীকে এরা কাঠির কাজ বলে] বেশী বয়সে এরা দলপতি, শিক্ষক ও উপদেষ্টার কাজ করে। স্প্রীঙ্ যুক্ত কাঁচি দিয়ে যারা মেয়েদের বা শিশুদের হার কাটে তারা পিকপকেট দলের অপরাধী নয়। মেয়েদের দেমাকি ব্যাগ থেকে টাকার বটুয়া বা ছোট ব্যাগ তুলতে বাচ্চাদের শিখানো হয়।

[কিছু তরুণ অধুনা ব্যক্তিগত বা দলগত ভাবে প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ না করে অপরাধ করাতে ধরা পড়ে। ফলে—শেষ বেশ তারা গুণ্ডামী ও ছিনতাই-'এর পথ বেছে নেয়। কোনও কিছু শিক্ষা করার ধৈর্য এদের কারও নেই। সুশৃঙ্খল ও বিশৃঙ্খল ভাবে কার্য ও শিক্ষার মধ্যে প্রভেদ আছে।

(f) বেশ্যা নারীদের মত প্রত্যেক শ্রেণীর অপরাধীদেরই একটি নির্দিষ্ট বয়সকাল আছে। বেশ্যারা বৃদ্ধা হলে প্রায়ই বাড়ীউলী হয়ে থাকে। স্পোর্টসম্যানদের মত বেশ্যারা যতদিন 'ফিট্ থাকে ততোদিন মাত্র তাদের কদর।

(১) সিঁদেল চোর তথা বারগ্লারদের প্রকৃত অপরাধীরা শব্দ সম্পর্কিত অতিন্দ্রিয়তার অধিকারী। এরা অপরের অশ্রুত সূক্ষ্মাণু-সূক্ষ শব্দ শুনতে পায়। এমন কি একটি সূক্ষ্মাণুসূক্ষ শব্দের সহিত অন্য সূক্ষ্মাণুসূক্ষ শব্দের প্রভেদ পর্যন্ত বুঝতে পারে।

বিঃ দ্রঃ—শব্দ দুই প্রকারের হয়ে থাকে, যথা (১) বায়ু-বাহী তথা এয়ার কণ্ডাকসন এবং (২) অস্থিবাহী তথা বোন কণ্ডাকসন। মানুষ বায়ুবাহী শব্দ কর্ণ দ্বারা এবং অস্থিবাহী শব্দ দেহাস্থি দ্বারা শুনে।

সর্পজীবের কানের টিমপ্যানিক মেম্ব্রেন না থাকাতে তারা কানে শুনে না। কিন্তু তাদের সমগ্র দেহের সূচ্যগ্র পার্শ্ব অস্থি ভূমির সহিত লেপ্টে থাকাতে ভূমির সূক্ষ্মাণু-সূক্ষ কম্পন শুনে তারা পলায়নপর হয়; তাই সর্পজীব সাধারণতঃ লোকের নজরে পড়ে না।

[সর্পজীব গাভী আদি ও মনুষ্যের পদ শব্দের প্রভেদ বুঝে। তাই পশুদের সহবাসী হলেও ওরা মানুষের নজর এড়ায়। ইহা জীবদিগের অতিন্দ্রিয়তার অস্তিত্ব প্রমাণ করে।]

বহু পুরানো বাটীর ছাদে কাঠবিড়ালী আদি মণ্ডপাকারে জড়াজড়ি করে গড়াগড়ি করে। মানুষ রাত্রে মেঝেতে শুয়ে থাকলে তারা সমগ্র দেহের অস্থি দ্বারা উহা শুনে। কিন্তু তারা দাঁড়ানো মাত্র ঐ শব্দ আর শুনতে পায় না। ওরা ভূতের উপদ্রব ভেবে অযথা ভয় পায়।

প্রকৃত অপরাধী বারগ্লার তথা সিঁদমারিদের একজন বাড়ির নিকট ভূমির উপর উপুড় হয়ে শুয়ে থাকে। তারা দূরাগত পুলিশ বা কোনও ব্যক্তির [ভূমির কম্পন জনিত] সামান্য পদশব্দ শুনতে পায়। তখন তারা মানুষ না দেখেও মানুষের উপস্থিতি বুঝে পাখীর বা সাপের মত বা ঝিঁঝিঁ পোকার মত মুখে মৃদু শিশ তুলে দলের লোকদের সাবধান করে। ভারি বুটের শব্দ দূর হতে শুনে তারা সেখানে পুলিশের উপস্থিতি বুঝে নেয়।

সিঁদেল চোররা ছয় বা আট ব্যক্তির ক্ষুদ্র দলে কাজ করে। বড় চুরির সাত দিন পূর্বে তারা নির্বাচিত বাটীটির নিকটে যায়। ওদের একজন পাঁচিলে উঠে ছোট ছোট পাথর বা ইটের টুকরো ভিতরে ছুঁড়ে। এর পর তারা একটু একটু করে ঐ শব্দ বাড়িয়ে বাটীর লোকের মেজাজ বুঝে। তারা বুঝে যে কতটুকু পর্যন্ত শব্দ তারা উপেক্ষা করে। তদ্দারা তারা বাটির লোকের সংখ্যা মেজাজ, শিশু বা কুকুর আছে কিনা তা বুঝে।

শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে লোকে যথাক্রমে প্রথম রাত্রে বা শেষরাত্রে নিদ্রিত হয়। ওরা কোন ঘরে শেষ আলোটি নিবলো ঐটিই লক্ষ্য করে। ঐ সময়টি ঐ বাটিটির নিদ্রাক্ষণ [Sleeping point] রূপে তারা বুঝে। কিন্তু ঐ রাত্রে তারা সেখানে চুরি না করে শুধু একটা মনস্তাত্ত্বিক জরিপ করে ফিরে আসে।

প্রত্যূষে কক্ষের ভিতর, টিনের ছাদে কিংবা প্রাঙ্গনের উপর বা বারান্দায় ইঁট বা পাথর কুচি আদি বহিরাগত দ্রব্য তথা ফরেন বডি দেখলে গৃহস্থদের উহা উপেক্ষা না করে সাবধান হওয়া উচিত।

[রাত্রে পথিমধ্যে যন্ত্রসহ গ্রেপ্তার এড়াতে এরা বাটির নিকট সিঁদকাটি আদি ভাঙন যন্ত্র পুঁতে রাখে। কাজের রাত্রে ওগুলো ওই নিরালা স্থান থেকে ওরা তুলে নেবে।]

কয়েকদিন পর পুনরায় তারা গভীর রাত্রে সদলে ঐ বাটির চতুর্দিকে মোতায়েন হবে। দলের অধিকাংশ ব্যক্তি কেবলমাত্র পাহারাদারের কাজ করে। ওদের সর্বাপেক্ষা দক্ষ ব্যক্তি তখন বাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। পূর্বে এরা গ্রেপ্তার এড়াতে তৈল দ্বারা গাত্র পিচ্ছিল করতো এবং অন্ধকারের সঙ্গে মিশে যেতে কালো লেঙট কিংবা কালো গামছা পরতো। এই যুগে এরা ঐ জন্য কালো হাপ্‌প্যাণ্ট ও কালো গেঞ্জি ব্যবহার করছে।

এদের গৃহে প্রবেশকারী ব্যক্তি সেখানে ঢুকে প্রথমে বিষ্ঠা ত্যাগ করবে। প্রয়োজনীয় বিষ্ঠা ত্যাগ না হলে অকুস্থল ত্যাগ করে ওরা ফিরে যায়। প্রায়ই দেখা যায় যে সদর দুয়ার টপকে বা উহা ভেঙ্গে প্রাঙ্গনে প্রবেশ করেও ওরা উপরোক্ত কারণে আর অগ্রসর না হয়ে ফিরে গিয়েছে। বড়চুরির পর সর্বক্ষেত্রেই বাটির কোনও না কোনও স্থানে পর্যাপ্ত বিষ্ঠা দেখা গিয়েছে।

[কোনও কোনও ক্ষেত্রে স্বভাব দুর্বৃত্ত জাতীয় আদি বারগ্নারদের উপরোক্ত অপরাধী হতে পৃথক রীতি নীতি থাকে। তারা প্রত্যাগমন কালে বাটিতে কড়ি বা শিক ও সিঁদুর মাখা ন্যাকড়া বা শুখনো পাতা আদি ঘটনাস্থলে রেখে যায়। ওগুলি ওদের তুক তাক রূপ দলীয় চিহ্ন হওয়ায় ওদের দল খুঁজে বার করা সহজ। ওদের কোনও কোনও একক সিঁদেল চোর ভারতীয় বাড়ীতে রান্না ঘরে ঢুকে প্রথমে পান্তা ভাত খায় এবং য়ুরোপীয় বাড়িতে প্যাণ্ট্রিতে ঢুকে ওরা মদ্য পান করে।]

স্বভাব দুর্বৃত্ত জাতীয় চোর অপকর্মের পর ফিরে যাবার কালে তুক রূপে পায়খানা করে। ওদের দ্বারা খুব দুঃসাহসিক বড়ো চুরি প্রায়ই হয় না।

কিন্তু এই দল সংশ্লিষ্ট কক্ষে গৃহপ্রবেশের পূর্বে বাটির মধ্যে মল ত্যাগ করে। দলভেদে এরা প্রাঙ্গণ, দুয়ার, অলিন্দ প্রভৃতি [এক এক দল এক এক স্থান] বেছে নেয়। দুঃসাহসিক কার্যে ব্রতী হলে স্বভাবতঃই নারভাসনেস আসে। নারভাস ডেবিলিটিতে ভুগলে আমরাও পারগেটিভ নিয়ে থাকি। তাই মলত্যাগ মাত্র ওরা নারভাসনেস হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়। তখন তারা সাপের মত বা বেজীর মত নির্ভয়ে চলে। দুঃসাহসিক সিঁদমারীর [বারগ্লারী] পর ঘটনাস্থলে বিষ্ঠা পাওয়া গিয়ে থাকে।

বিঃ দ্রঃ—বিষ্ঠার মধ্যে বহুপ্রকার বীজাণু ও জীবাণু থাকে। উহাদের প্যাটার্নও নানারূপ হয়ে থাকে। [মাইক্রো অরগ্যানিক] তাই ঘটনাস্থলে পরিত্যক্ত বিষ্ঠা আমি পরীক্ষা করিয়ে রাখতাম। পরে সন্দেহমান ব্যক্তিদের পাকড়াও করে তাদের বিষ্ঠাও পরীক্ষা করাতাম। এইভাবে ১৯৪৪ সনে আমি কয়েকটি মামলার কিনারা করি। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ সরকার I. P. তদানীন্তন D.C. D. D.] ঐ বিষয়ে আমাকে উৎসাহ দিতেন। [অপরাধ বি ২য় খণ্ড দ্রঃ]

বাড়িতে কুকুর থাকলে এরা উগ্র ক্যাম্বেরাইডিন আদি সেণ্ট মেখে আসে। কেউ না নড়লে উহা নির্জীব বস্তু বা মানুষ তা কুকুর বোঝে না। বিশ ফুটের ওপারে ওদের দৃষ্টিশক্তি কম। ওদের মেমরীর কার্ড ইনডেক্স ঘ্রাণ শক্তির উপর নির্ভরশীল। ঘ্রাণের দ্বারা ওরা প্রভু ও অন্যান্যদের প্রভেদ বোঝে। উগ্র সেণ্টের আওতায় মানুষের সামান্য সূক্ষ্ম গন্ধ চাপা পড়ে যায়। ওরা নড়লে কুকুর ডেকে ওঠে। তখন তারা স্থির হয়। ঐভাবে একটু একটু করে তারা কুকুরকে [By-Pass] এড়াতে পারে। আলসিয়েশন ডগকে মাংস বা মাদী কুকুর দিয়ে ভোলানো যায় না। ঐজন্য কুকুরকে সব সময় নিজেদের হাতে খাওয়ানো উচিত। গাত্রে কুকুরের গন্ধ থাকলে বহু কুকুর ডাকে না। এ জন্য এদের কেউ কেউ কুকুর পুষে থাকে।

[তারপর ওদের দলপতি অন্ধকার ঘরে ঢুকে পড়ে। পরনে কালো হাফ প্যাণ্ট বা লেঙোট থাকে। কেউ কেউ গাত্রে তৈল দ্বারা পিছল করেও রাখে। অন্ধকারের সঙ্গে বেশভূষাতে তারা মিশে যায়।

এরূপ অপকার্যে পূর্বে তারা সাদা আলোচাল ও কালো রং করা চাল সঙ্গে নিতো। অধুনা তারা [হোমিওপ্যাথ গ্লোবিউলের মত] কালো ও সাদা মোজেইক পাথর দানা সঙ্গে নেয়। প্রথমে ওরা কালো গ্লোবিউল অন্ধকার কক্ষে ছড়িয়ে দেয়। উহাদের পতনের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অপরের অশ্রুত শব্দ তারা শুনতে

তো পায়ই। উপরন্তু একটি সূক্ষ্ম শব্দের সহিত অন্য সূক্ষ শব্দের প্রভেদও তারা বোঝে। ঐভাবে তারা ট্রাঙ্ক আলমারি দ্রব্যাদি ও শয্যার অবস্থান আঁধারেই বুঝে। (f) সাদা রঙের গ্লোবিউল অন্ধকারেও দেখা যায়। ঐগুলি ছড়িয়ে ওরা দ্রব্যাদির উচ্চতা বুঝে নেয়। [হাইপার সেনসিবিলিটি দ্রঃ] এরা নানারূপ দ্রব্যাদির দ্বারা একপ্রকার বিড়ি তৈরী করেছে। উবু হয়ে শয্যার নিকট বসে তা তারা ফুঁকতে শুরু করে। এ বিড়ি থেকে আগুন বার হয় না। [রাত্রে আগুন পরিদৃষ্ট হয়।] উহা থেকে মাত্র ধোঁয়া বার হয়েছে। গ্যাসীয় বিষের অপ্রত্যক্ষ প্রয়োগ কার্যকরী নয়। ইহা নিশ্চয়ই ঠিক। কিন্তু দেখা গিয়েছে যে উহা নিদ্রাকে গাঢ় করে। তজ্জন্য বড়ো চুরির পর কক্ষে প্রায়ই পরিত্যক্ত আধপোড়া বিড়ি দেখা গিয়েছে।

হিষ্ট্রিয়া রোগিণী ও দক্ষ শিকারীদের যথাক্রমে শব্দ ও ঘ্রাণ সম্পর্কিত অতীন্দ্রিয়তা দেখা যায়। প্রথমোক্তটি স্নায়বিক কারণে এবং দ্বিতীয়োক্তটি অভ্যাস দ্বারা ওরা লাভ করে। [অপরাধ-বিজ্ঞান ১ দ্রঃ] হিষ্টিরিয়া রোগিণী অন্যের অশ্রুত বাবা বা কাকার পদধ্বনির প্রভেদ বোঝে। অনুরূপ ভাবে শিকারীরা ঘ্রাণ দ্বারা দূরে কটা বাঘ বা তার বাচ্চা তা বলে দিতে পারে।

[অলঙ্কার ভারতীয় নারীদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় বস্তু। তাদের দুইটি সন্তান থাকলে একটিকে গহনার বিনিময়ে তারা বলি দিতেও প্রস্তুত। বহু বিপথগামী স্বামী ঘুমন্ত স্ত্রীর গাত্র থেকে গহনা অপহরণের চেষ্টায় ধরা পড়েছেন। কিন্তু স্বামীরা অপারগ হলেও ওই কার্য তস্কররা সমাধা করে।]

এরা লক্ষ্য করে শিকার-মগ্ন কন্যাটি কুমারী বা বিবাহিতা। কুমারী মেয়েদের দেহে দামী গহনা থাকে না। ওরা অন্যের স্পর্শে [outside touch] অভ্যস্ত নয়। এ জন্য স্পর্শমাত্র তারা [springs up] জেগে ওঠে। ব্যবসায়ীদের মত এদের মনোবৃত্তি। কম লাভে বেশী ঝুঁকি এরা নেয় না। তারা সিঁথির সিঁদুর ও দেহের ঢপ থেকে ওই নারী বিবাহিতা কি না তা বুঝে নেয়। এদিকে নিদ্রাও গাঢ় হয়েছে। তবুও এরা প্রথমেই গলার গহনায় হাত রাখে না। তারা ওই স্থান [seat of action] হতে দূরে স্কন্ধে ধীরে [caress] স্পর্শ করে। এর পর সইয়ে সইয়ে গহনাটি তুলে বা কেটে নেয়। বিবাহিতা নারীরা বাহিরের [অর্থাৎ স্বামীর] স্পর্শে অভ্যস্ত। ঘুমে অবচেতন মনে তারা উহা স্বামীর হাত ভাবে।

(f) এক একপ্রকার দ্রব্যের উপর পড়ে ওগুলির এক এক রূপ শব্দ হয়।

[পুরানো পাপীদের সমাজে হিন্দু সমাজের মত জাতি ভেদ দেখা যায়। খুনে ডাকাতরা ওদের ব্রাহ্মণ। এর পর কায়স্থ, সদগোপ, প্রভৃতির মত উহা ধাপে ধাপে নামে। ডাকাতের পর যথাক্রমে সিঁদেল চোর, সাধারণ চোর, প্রবঞ্চক, ছিনতাই আদির স্থান। নীচু ছিঁচকে জুতো চোর প্রভৃতি ওদের অস্পৃশ্য জাত। ওদের চণ্ডু ডেন্ জুয়ার আড্ডা ও বেশ্যালয় পৃথক। জাত-অপরাধীদেরও অপরাধ আছে। এরা বলাৎকার ও বিশ্বাসঘাতককে নিন্দনীয় মনে করে।]

প্রাথমিক অপরাধীদের মধ্যে অপকর্মে বহুমুখিতা তথা ভারসেটাইল ভাব দৃষ্ট হয়ে থাকে। এরা যে কোনও স্থানে, যে কোনও ব্যক্তির যে কোনও দ্রব্য সুবিধা ও সুযোগ মত অপহরণ করে।

প্রকৃত অপরাধীরা স্থান, কাল, দ্রব্য ও ব্যক্তি সম্পর্কিত একমুখিতা [স্পেশালিজেশন] এর পক্ষপাতী। জনৈক ছিনতাই মাত্র হগ মার্কেটে আটটা থেকে বারোটা পর্যন্ত মাত্র স্ত্রীলোকদের ভ্যানিটি ব্যাগ কাড়তো। ভারতীয় নারীদের ব্যাগ সে নিত না। কারণ—ওরা তক্ষুনি চেঁচামেচি সুরু করে। পুরানো য়ুরোপীয় নারীরও তারা ধারে কাছে যায় নি। যে য়ুরোপীয় মহিলা এক বৎসরের মধ্যে ভারতে আছে, তাদেরই মাত্র তারা ভ্যানিটি ব্যাগ কাড়তো। বেশী দিন [ট্রপিক্যাল] গ্রীষ্ম প্রধান দেশে থাকলে গণ্ডের লালচে ভাব অপসারিত হয়ে উহা শ্বেতাভ হয়। তারা ওদের গণ্ডের লাল ভাবের [Red patch] পরিমাপ লক্ষ্য করে ওরা কতো মাস এদেশে আছে তা বোঝে। সদ্য আগত ইউরোপীয় মহিলাদের পরিস্থিতি বুঝতে বেশ একটু সময় লাগে। ব্যাগ ছিনিয়ে নিলে তারা হকচকিয়ে যায়। ওরা না চেঁচিয়ে মুখ হতে শুধু অস্ফুট শব্দ করে। যথা, উ—উ—উ। ওই সুযোগে ওরা নির্বিবাদে ওই স্থান থেকে সরে পড়ে।

উপরে সিঁদেল চোর তথা বারগ্লারদের মনস্তাত্ত্বিক অপরাধ-পদ্ধতি সম্বন্ধে বলা হয়েছে। কিন্তু অপরাধের মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির মত ব্যবহারিক অপপদ্ধতিও আছে। বস্তুতঃ পক্ষে প্রতিটি অপরাধ পদ্ধতি দুইটি ভাগে বিভক্ত যথা (১) মনস্তাত্ত্বিক এবং (২) ব্যবহারিক। ওদের ব্যবহারিক অপরাধ পদ্ধতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছুটা বলবো।

বহু বারগ্লার অধুনা অপকর্মে মোটর গাড়ী ব্যবহার করছে। ওরা একটা পুরানো ঝরঝরে ও নড়বড়ে মোটরকার সংশ্লিষ্ট বাটির সম্মুখে দাঁড় করায়। তারপর ওরা উহা মেরামতির ভঙ্গিতে খুটখাট শব্দ করে। পথচারী ব্যক্তিরা

বা টহলদারী সিপাহীরা রাত্রে ওদের ওই মোটর গাড়ী হঠাৎ বিকল হয়েছে বুঝে সহানুভূতিশীল হয়।

এই পুরানো পাপীরা ওই মোটর গাড়ীর আড়ালে ঐ বাটিতে সিঁদ কাটে এবং অন্য আওয়াজ মোটর সারানোর খুটখাট শব্দে ঢাকা পড়ায় উহা আর শ্রুত হয় না। কেউ চেঁচিয়ে উঠলে ওরা মোটরের গ্যাস ছেড়ে এমন শব্দ বার করে যে ওদের ঐ চীৎকার বাইরের কেউ শুনতে পায় না। ওরা ঐ মোটরে অকুস্থলে এসে অপহৃত দ্রব্য সহ ঐ মোটরেই ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। সিডন বডি মোটরের ছাদে উঠে ওরা রাজপথে গ্যাস বা ইলেকট্রিক বাতি নিবোয়। ওদের দলের জনৈক একটি বালকের একটি চিত্তাকর্ষক বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত হলো।

"বাল্যকালে আমার পিতার ঘরের পাশে একটি কারখানা ছিল। ঐ কারখানায় হাতুড়ির আওয়াজ শুরু হলে আমি আমার বাবার হুকোয় তামাক খেতুম। ঐ টিনের কারখানার শব্দে হুকো টানার গুড়গুড় আওয়াজ পাশের ঘর থেকে বাবা শুনতে পেতেন না। কিন্তু ঐ কারখানায় হাতুড়ীর আওয়াজ বন্ধ হওয়া মাত্র আমি হুকোয় টান দেওয়া বন্ধ করতাম।"

সিঁদেল চোরদের দলে ঢুকার পর বাল্যকালের ঐ ঘটনা আমার মনে পড়ে যায়। আমার মতলব মত একটা পুরানো মোটরে করে সিঁদ দিতে বেরোই। বাটির দেয়াল ঘেঁসে বিকল-যন্ত্র গাড়ীটা রেখে সারাবার ছুতোয় ইঞ্জিনের আওয়াজ করতাম। ওই আওয়াজে সিঁদকাটা ও দুয়ার ভাঙার শব্দ শ্রুত হতো না।"

"সর্দার ঐ নবাগত রঙরুটিয়া ছোকরাকে চুলে ধরে তার মুখে ভীষণভাবে কিল ঘুঁসি মারলো। এতে তার চোখ মুখ নাক ফুলে ফুটবলের মত গোলাকার হয়ে উঠলো। কিন্তু এতো প্রহারেও ঐ বালকের চোখে জল না আসাতে সর্দার খুশী হয়ে তাকে আদর করে কাছে টেনে বললো—'বহুৎ খুশী। পুলিশ পিটনেভি এহী লেড়কা কুছ এক্কার [স্বীকার] করবে না। থোড়ী রোজবাদ এহী মে লোককো মাফিক শেয়ানা বানিয়ে যাবে।' ওদের দলের সদস্য হতে ঐ বালককে এইরূপ একটি নির্মম পরীক্ষা দিতে হয়। এরপর সে বগলী-সিঁদের কায়দা দ্রুত গতিতে রপ্ত করে।"

"পরীক্ষার দিন সর্দার আমাকে একটা সাবান দিয়ে উহার সাহায্যে মায়ের আঁচলের চাবির একটা ছাঁচ আনতে বলেন। আমি মা ঘুমলে তার ঐ চাবি

সাবানের মধ্যে ঢুকিয়ে তার ছাঁচ তৈরী করি। পরে মামার বাটি থেকে ফিরে শুনি যে মা'র সমুদয় গহনা সিন্দুক থেকে চুরি হয়ে গিয়েছে।"

বিঃ দ্রঃ—অলীক সিঁদমারি'তে [সিমিউলেটেড্ বারগ্লারী] ডুয়ার সিন্দুক আলমারী আদির উপর প্রয়োজনের অতিরিক্ত যন্ত্র চিহ্ন ও আঘাত দেখা যায়। অনুরূপভাবে নভিস খুনেরা বেশী আঘাতে ও পাকাপোক্তরা একটি আঘাতে বা স্বল্লাঘাতে মানুষ খুন করে। আঘাতের ধরণ হতে ঐ খুনী ওই কালে নারভাস হয়েছিল কিনা তাও বুঝা যায়। [প্রদর্শনী দ্রব্য উদ্ধারার্থে ঘটনাস্থলের কেন্দ্র স্থল হতে শুরু করে চতুস্পার্শ্বে চক্রাকারে পরিদর্শন করা বিধেয়।] (f)

[এক এক অপরাধীর যন্ত্রাদি ও যন্ত্র চিহ্ন তথা টুলস মার্কস এবং হাতের কার্য এক এক প্রকার হয়। দোকানে তৈরী মৃৎ পাত্র বা পুতুলগুলি বাইরের লোকের চক্ষে একই রূপ মনে হলেও সহকর্মীরা কোনটি তাদের কোন জনের তৈরি তা গড়নের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ধরণ দেখে বলে দিতে পারে। অনুরূপভাবে একজন সিঁদেল চোর বা তালা তোড়ের কার্য তাদের কাযের সঙ্গে পরিচিত অন্য এক সমধর্মী বলে দেয়। তাদের ওই ব্যবহৃত যন্ত্র উদ্ধার করার পর উহার খিঁচ খাঁচের সঙ্গে যন্ত্র চিহ্নের অনুক্রমিক খিঁচ খাঁচ মিলিয়ে ঐ যন্ত্রটিকে সনাক্ত করা সম্ভব।]

(৩) ছিনতাই চোরগণ দৃষ্টি সম্পর্কীত অতীন্দ্রিয়তার অধিকারী। এরা বহু দূর থেকে মহিলাদের গলদেশের স্বর্ণ-মন্য হার ও উহার বর্ণ দেখে উহা সোনার বা গিল্টির তা এক নিমেষে বুঝে নেয়। এমন কি উহা সোনার হলে উহা কতো ক্যারেডের তাও তারা বুঝবে। লাভালাভের মূল্য ও যৌক্তিকতা বুঝে তবে তারা ছিনতাই এর ঝুঁকি নেয়। মেলা আদি দোকানে মহিলাদের দূর হতে এরা রূপ দেখেনা। ওখানে তাদের গলদেশের গহনার উপরই ওদের একমাত্র লক্ষ্য থাকে।

(৪) পশ্বব-চোরগণ ঘ্রাণ সম্পর্কীত অতীন্দ্রিয়তার অধিকারী। এরা বেষ্টনী পাঁচিলের এপার থেকে মাত্র ঘ্রাণ হতে বুঝে নেয় যে ভিতরে কয়টি কতো বয়সের গাভী, হাঁস বা মুরগী বা ছাগ বা অন্য পশু আছে। এদের মধ্যে দুধওয়ালা ও

(f) বিবিধ শ্রেণীর অপরাধে ওইরূপ পরিদর্শন ও অনুসন্ধান দ্বারা পোড়া বিড়ি, পরিত্যক্ত বিষ্ঠা, বহিরাগত বা ভিতরের অস্ত্র ও যন্ত্রাদি, রক্তকণা কেশ, অঙ্গুলী ও পদচিহ্ন, বিষ, পাত্র, বমন, বস্ত্রখণ্ড ধোপী মার্ক, পত্রাদি সাবধানে সংগ্রহ করে তল্লাসী-পত্রে সাক্ষীদের দস্তখত সহ নথী ভুক্ত তথা তালিকা-ভুক্ত করতে হবে।

গাভীন পশু আছে কিনা তাও তারা বুঝতে পারে। এইভাবে সব কিছু বুঝে পশ্বব উত্তোলক চোর'রা পশু চুরির জন্য অগ্রসর হয়।

(৫) সুদক্ষ মৎস্য চোররা নিরালা পুষ্করণীতে নেমে জলে জিহ্বা স্পর্শ করে বুঝে নেয় যে জলে কতো কি কি মৎস্য আছে। নচেৎ অকারণে তারা ঐ চুরির ব্যাপারে বৃথা পরিশ্রম করবে না।

মৎস্য চোরদের কোনও কোনও দল নিরালা পুকুরে নেমে অবিরত জলে ঘাই দিতে থাকে। মৎস্যদের মধ্যেমধ্যে উপরে উঠে বায়ু হতে অক্সিজেন নিতে হয়। বেশীক্ষণ উপরে উঠতে না পেরে অক্সিজেনের অভাবে কাহিল হয়ে আধ মরা ভাবে ওরা উপরে ভেসে উঠলে ওরা শুধু হাতেই মৎস্যগুলো তুলে নিতে পারে। নিম্নোক্ত যান্ত্রিক পরীক্ষা দ্বারা উহা বিশ্বাস্তরূপে প্রমাণ করা যায়।
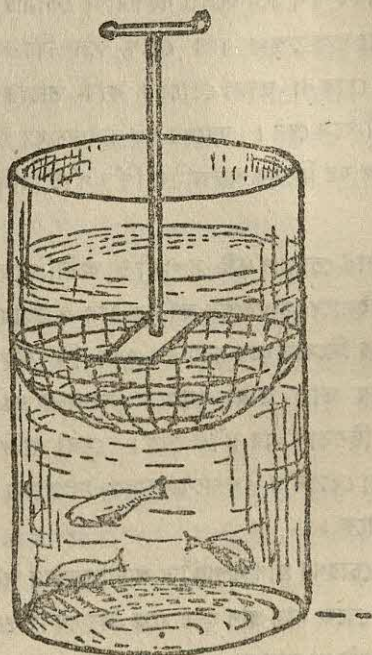
উপরের চিত্রটিতে দৃশ্যত পাত্রটির মধ্যস্থলে একটি ছাঁকনী রাখা আছে। ঐ ছাঁকনী জলপ্রবাহ বন্ধ না করলেও উহা থাকায় 'নিম্নের মৎস্য কয়টি জলের উপরে উঠে অক্সিজেন গ্রহণে অপারক। এইভাবে কিছুক্ষণ থাকলে ওরা প্রথমে নিস্তেজ ও পরে মৃত হয়।

[উপরোক্ত আখ্যানে মৎস্য চোরদের মনস্তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক এই উভয় অপরাধ পদ্ধতি বিবৃত করা হয়েছে।]

এক্ষণে বিবেচ্য বিষয় এই যে, অপরাধীদের এই মানসিক ও ইন্দ্রিয় জাত অতীন্দ্রিয়তা মস্তিষ্কের ক্ষয়ক্ষতি কিংবা অভ্যাস দ্বারা তারা লাভ করে। প্রতীত হয় যে হিষ্টিয়া রোগীরা ক্ষয়ক্ষতির কারণে শব্দ সম্পর্কীত এবং দক্ষ পশু শিকারীরা অভ্যাস দ্বারা ঘ্রাণ সম্পর্কীত অতীন্দ্রিয়তা লাভ করে।

অপরাধীরা মানুষের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করার রীতিনীতি সম্বন্ধে অত্যন্ত অভিজ্ঞ। চিত্তকে অন্যত্র বিক্ষিপ্ত করে তারা তাদের অসর্তক মুহূর্তে দ্রব্যাপহরণ করে। ব্যাঙ্কের কাউন্টারে তারা শিকার তথা ভিকটিমদের বলে: ও মশাই ঠক করে আপনার কিছু নিচে পড়লো। সেই ভদ্রলোক তার ঐ কথা বিশ্বাস করে ব্যস্তভাবে নীচু হওয়া মাত্র তারা নোটের বাণ্ডিল তুলে পালায়। বহু ছিনতাই ভিকটিমদের ঘাড়ে পিঁপড়া ছেড়ে বা ইরিটেন্ট পাওডার ছুঁড়ে তাকে বিব্রত করে। ঐ ভদ্রলোক পিছনে ফিরা মাত্র তারা তাদের দ্রব্য কেড়ে নেয়।

[প্রবঞ্চক অপরাধীরা ভিকটিমদের চিত্ত প্রস্তুতি বুঝে এগোয়। তারা ওদের অভাবাদি ও প্রয়োজন পূরণ করবে বলে। এইভাবে তাদের আশান্বিত করে তাদের প্রতিরোধ শক্তি ওরা ভাঙে। এইভাবে প্রলুব্ধ করে ওরা তাদেরকে ঠকায়। এই বিষয়ে তারা অত্যদ্ভুত মতস্তত্ব জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছে।]

উপরোক্ত তথ্য সমূহ ব্যবহারিক মনস্তত্বের বিষয়ভূত। উহাদের বিস্তারিত আলোচনা ব্যবহারিক অপরাধ-তত্ত্ব এবং অপরাধীদের কার্যপদ্ধতি শীর্ষক পরিচ্ছেদে বিস্তারিত ভাবে বিবৃত করবো।]

ঠগীদের কষ্টবোধ খুনে এবং চোরদের অপেক্ষা বেশী থাকে। কারণ, ঠগী তথা চিট'রা সাধারণতঃ অভ্যাস-অপরাধী হয়। প্রবঞ্চকদের অধিকাংশ জন বরং প্রাথমিক-অপরাধী হয়ে থাকে। তারা স্বভাব-অপরাধী প্রায়ই হয় না। প্রতীত হয় যে, শঠতা অপরাধ সভ্যতার একটি অপদান। মানুষ তাদের সাবধানতা ও বুদ্ধি দ্বারা চুরি ও রাহাজানি ও ডাকাতির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষায় সমর্থ হলে দুর্বল ও ভীরুরা প্রবঞ্চনার আশ্রয় নেয়। এতে ঝুঁকি ও সাহসের এবং দৈহিক বলের প্রয়োজন নেই। আদিম মানুষের মধ্যে প্রবঞ্চনা ও শঠতা অপরাধ কদাচিৎ দেখা যায়।

[পকেটমাররা তুলমারী, জেবকাট ও গাঁট কাটাই প্রভৃতি উপদলে এবং

বারগ্গাব'রা ঘুল ঘুলিয়া, তুরপুনি, বগলী-সিঁদি, উঠমারী আদি উপ-দলে বিভক্ত থাকে।]

কষ্ট-বোধ হীনতা আদিম মানুষ, নির্বোধ ও জড় ব্যক্তিদের মধ্যে অধিক দেখা যায়। আফ্রিকার কোনও এক আদিম মানুষ য়ুরোপীয় বুট পরার জন্য পায়ের দুটো আঙ্গুল কেটে ফেলেছিল। দৈহিক অসাড়তার জন্যে অপরাধী বিশেষ অন্যকে ফাঁসাবার উদ্দেশ্যে নিজের দেহকে সহজে ক্ষত বিক্ষত করে। ঘুমন্ত অবস্থায় বহু অপরাধীর পা দগ্ধ হলেও তারা তা জানতে পারেনা। কষ্ট-বোধ হীনতার জন্য অপরাধী বিশেষ নির্ভিক চিত্তে বেত্রাঘাত সহ্য করে। দৈহিক ও নৈতিক অসাড়তার জন্যে অপরাধীরা নিজে থেকেই হাত কড়া পরতে হাত বাড়িয়ে দেয়।

[প্রাথমিক অপরাধীরা কুকুরকে কুকুরী এবং কুকুরীকে পোষা কুকুর দ্বারা কিংবা মাংসাদি খাদ্য দ্বারা গৃহস্থদের পোষা কুকুরকে বশ করে। প্রকৃত অপরাধীরা ওদের গাত্রে উগ্র গন্ধ মেখে তার দ্বারা ওদের সূক্ষ্ম গন্ধবোধকে ঢেকে দেয়। প্রাথমিক ও প্রকৃত অপরাধীদের কুকুর নীরব তথা ডগ সাইলেন্সের রীতিনীতি পৃথক হয়।]

উপরোক্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা দ্বারা ওদের চিকিৎসার্থে কোন অপরাধ কতো পুরাতন তা বুঝতে হবে। জুভেনাইল অপরাধীরা সাধারণতঃ চৌর্যকার্য এবং [জখমাদি] হত্যাকার্য করলেও প্রবঞ্চনা অপরাধ আদি প্রায়ই করে না। কিশোর ও শিশুদের মধ্যে আদি-মানব সুলভ মনোভাবের জন্য ঐরূপ হয়। ইহা প্রমাণ করে যে প্রবঞ্চনা সাম্প্রতিক কালে মানুষের সভ্যতার সহিত সৃষ্ট। সভ্যতা মানুষকে দৈহিক ভাবে কিছুটা দুর্বল করলে প্রবঞ্চনা তাদের পক্ষে সুবিধাজনক।

বিবিধ মনুষ্যগুষ্টি তাদের স্ব স্ব কৃষ্টি ও অভ্যাস মত বিভিন্ন প্রকার প্রণালীতে জীবন নির্বাহ করে। উপরন্তু য়ুরোপীয় এবং ভারতীয় ধনী নির্ধনীদের বাসভবনের গঠন ও নির্মাণ প্রণালীও বিভিন্ন হয়। এজন্য আমরা ভারতীয় এবং য়ুরোপীয় বাটির চোরদের পৃথক দল হতে দেখি। একক চোর এবং দলবদ্ধ চোরদেরও স্বভাব বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। এমন কি মাড়বাড়ী মাদ্রাজী ও বাঙালী ভিকটিমদের দ্রব্যাপহরণের পদ্ধতিও ওদের [গোষ্ঠীদের] পৃথক ধেয়ান মত পৃথক হয়েছে। এইরূপ বিবিধ কারণে দিবা-চোর এবং রাত্র চোরের দলও আলাদা হয়েছে।

বিঃ দ্রঃ—অবলপ্রয়োগী পকেটমারদের কখনও বলপ্রকাশ করতে দেখলে বুঝতে হবে যে প্রকৃতপক্ষে ওরা রাহাজানির অপরাধী। পকেটমারী ওদের কার্য পদ্ধতির একটি বহিরাবরণ। তাই শীঘ্রই ওরা নিজ প্রয়োজনে স্ব মূর্তি ধারণ করেছে। বোম্বার প্লেনের পাহারাদার রূপে ফাইটার প্লেন নিযুক্ত থাকে। তেমনি পিটপকেটদের বলপ্রয়োগী কোনও বন্ধুর পক্ষে ওদের পাহারাদার হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু উহা কদাচিৎ প্রাথমিক অপরাধীদের ক্ষেত্রে সম্ভব হতে পারে। প্রকৃত পিকপকেটদের সহিত সবল অপরাধীদের মিলা মিশার প্রায়ই রীতি নেই। উহাদের দল, বাসস্থান ও সমাজ সম্পূর্ণ পৃথক হয়।

অপরাধ পদ্ধতির বহু উপপদ্ধতি আছে। বিভিন্ন অপরাধীদের শ্রেণীভেদে ওদের স্বভাব চরিত্রও বিভিন্ন। অনুরূপভাবে পুলিশী মূল তদন্তেরও বহু উপতদন্ত প্রণালী আছে। এইগুলি পুস্তকের পৃথক খণ্ডে বিশদরূপে বিবৃত করা হবে।

উপরে বলেছি যে অহিফেন চরস ক্যাম্ফার ও গাছের শিকড় আদি দ্রব্য দ্বারা বিশেষরূপে নির্মিত বিড়ি ফোঁকার ধোঁয়া কাউকে অজ্ঞান না করলেও তার নিদ্রাকে গাঢ় করে। এই কার্যের জন্য অধুনা [zawgactyal] নামক রসায়ন ব্যবহৃত হচ্ছে। ঐভাবে দক্ষ বারগ্লাররা কক্ষের লোকদের গভীর ভাবে নিদ্রামগ্ন করে। এইরূপ বিবৃতি বহু তালা তোড়-চোর আমার নিকট দেয়।

[ওদের ঐ সব বিবৃতিতে বুঝা যাবে যে ক্লোরোফর্ম আদির বায়বীয় বিষের অপ্রত্যক্ষ প্রয়োগ কার্যকরী হয়। কিন্তু মেডিকেল জুরিস-প্রুডেন্স তথা ডাক্তারী শাস্ত্র মতে উহা কখনও সম্ভব হয় না। আমি মনে করি উহা কাউকে অচৈতন্য না করলেও তাদের নিদ্রাকে গাঢ় করতে সক্ষম। এই বিষয়টি পরীক্ষা করার জন্য আমি নিম্নোক্ত যন্ত্রটি উদ্ভাবন করি। উহার নির্মাণ প্রণালী ঐ যন্ত্রের চিত্র হতে বুঝা যাবে।

ঐ যন্ত্রের "ক" চিহ্নিত ফানেলে ক্লোরোফর্ম সিক্ত তুলা ন্যস্ত করে উহার মেঝেতে আমি কয়েকটি শ্বেত ইন্দুর ছেড়ে দিই। এরপর ঐ যন্ত্রের বেলোটি ব্যবহার করে উহার মধ্যে আমি বায়ু প্রবেশ করাই। নিম্নের ফানেলের মাধ্যমে উপরের ফানেলে উঠে ঐ বায়ু [প্রত্যক্ষ প্রভাব এড়িয়ে] উপর দিকে বেরিয়ে আসে। এইরূপ পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, মেঝের উপরকার ইঁদুর কয়টি ঐ বায়বীয় বিষের অপ্রত্যক্ষ প্রভাবে মৃত না হলেও ঝিমিয়ে বা ঘুমিয়ে পড়েছে।

শৈত্য তথা কোল্ড সঙ্কোচন [কনট্রাকটস] এবং উষ্ণ তথা হিট্ প্রসারণ [এক্সপ্যাণ্ডস] করে। শীতকালে গন্ধকণা একীভূত ভাবে গতি পথে থাকে।

তজ্জন্য পুলিশী কুকুর অপরাধীর ব্যবহৃত পথে সহজে তার বাটিতে উপস্থিত
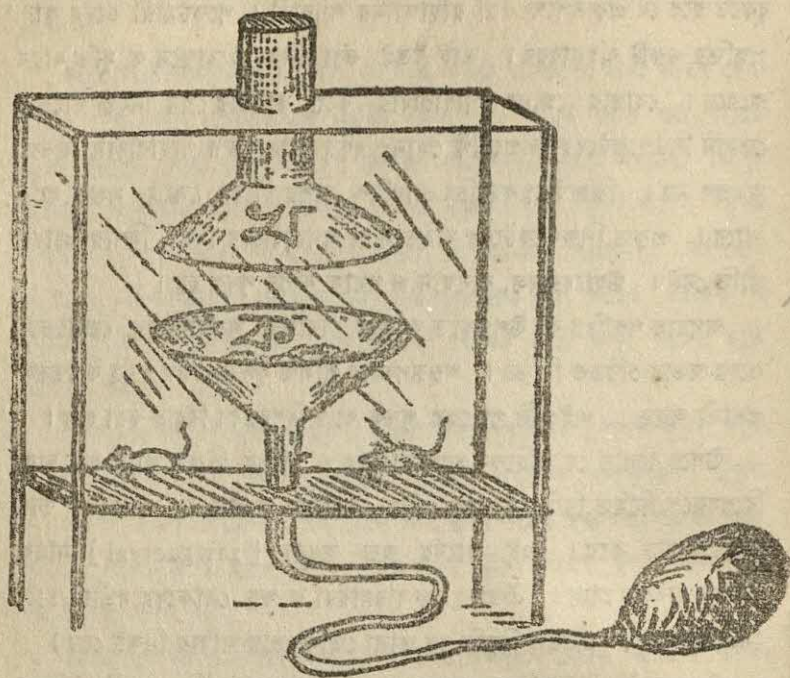
হয়। কিন্তু গ্রীষ্মকালে ঐ সকল গন্ধকণা চতুর্দিকে ছড়িয়ে ওদের ঐ পথের দুই পার্শ্বের গৃহগুলিতে ও ওখানকার মনুষ্য দেহেও সংলগ্ন হয়। সেজন্য ঐ সব গন্ধ-বিদ্ পুলিশী কুকুর আঁকাবাঁকা বা ভুল পথে অগ্রসর হয়। কিছু ক্ষেত্রে তারা ভুল গৃহে প্রবেশ করে ভুল ব্যক্তিকেও সনাক্ত করেছে। এজন্য শীতপ্রধান দেশে যা প্রযোজ্য তা প্রতিটি ক্ষেত্রে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে প্রযোজ্য হয় না। তবে এ্যালসেসিয়ান ডগগুলি গ্রীষ্মপ্রধান দেশেও প্রখর গন্ধবোধ দ্বারা অপরাধীদের সনাক্ত করতে পারে।

বিঃ দ্রঃ—য়ুরোপে কম গুরুতর অপরাধকে মিসডিমোনার এবং বেশী গুরুতর অপরাধকে ফেলনি বলা হয়। ভারতেও অন্যায় ও পাপ হতে অপরাধ পৃথক। প্রাচীন ভারতে অপরাধে অপহৃত দ্রব্যের মূল্য ও ক্ষতির পরিমাণ মত অপরাধকে লঘু ও গুরু অপরাধ বলা হতো।

উপরে চিরাচরিত [কনভেনস্যনাল] অপরাধীদের সম্বন্ধে বলা হলো। কিন্তু ওদের থেকে পৃথক অধুনাসৃষ্ট অভিজাত [হোয়াইট কলার্ড] অপরাধেরও

অস্তিত্ব আছে। ওই অপরাধ বস্তীবাসী নিরক্ষরদের অধিগত নয়। এগুলি ক্ষমতাসীন উচ্চশিক্ষিত বা ধনী ব্যক্তিদের দ্বারা কৃত হয়। বহুক্ষেত্রে প্রশাসন কর্তৃপক্ষ এদের ঘাঁটাতে সাহসী হয় না। এরা সহজে প্রতিপত্তি কিংবা অর্থাদি দ্বারা দণ্ড এড়াতে সক্ষম।

[ধনী ও দরিদ্ররা সমভাবে অপরাধ করে। কিন্তু ধনীরা আইন এড়াতে পারে; দরিদ্ররা ওতে অক্ষম হওয়ায় ওদের সংখ্যা বেশী। কম অপরাধীই গোচরে আসে। দণ্ডিত না হলে কেউ অপরাধী নয়। তাই এ সম্বন্ধে পরিসংখ্যানের প্রশ্ন অবাস্তব :]

হোয়াইট কলার্ড ক্রাইমকে অকোপেশ্যানল ক্রাইমও বলা হয়। এই অপরাধ পদাধিকার বলে ক্ষমতাসীনরা অধিক করে। প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি, অসৎ-রাজকর্মচারী সম্মানীয় য়ুনভাসিটি প্রফেসরগণ [এঁরা প্রিয় ছাত্রকে পরীক্ষায় বেশী নম্বর দেন] ধনবান ব্যবসায়িগণ, [অর্থ গ্রহণ করে] কোশ্চেন বার করে স্কুল শিক্ষক, ব্ল্যাক মার্কেট হতে দ্রব্য সংগ্রহী গৃহকর্ত্রী [এঁরা একে অপরাধ বলেন না] অসদ নীলাম ডাকা নীলামদার : এঁরা অর্থ পেলে হাতুড়ীর ঘা দেন, প্রভৃতি ব্যক্তি হোয়াইট কলার্ড ক্রাইম বেশী করে। প্রফেসরদের ছাত্র ও ছাত্রীদের মধ্যে বিভেদমূলক ব্যবহারও এইরূপ একটি ক্রাইম। নিম্নে এই অভিজাত তথা হোয়াইট কলার্ড ক্রাইমের কয়টি দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো।

(১) ফ্রডুলেন্ট সিকিউরিটি তথা অলীক আমানতী ব্যবস্থা (২) মুনফা লুঠতে নিম্ন মানের দ্রব্য তৈরী করা। (৩) অত্যাবশ্যক দ্রব্যের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে ওগুলির মূল্যবৃদ্ধি (৪) [গৃহ সাঁকো বাঁধ] নির্মাণ কার্যে ইচ্ছাকৃত ভাবে বাতিল [ডিফেকটিভ] দ্রব্য ব্যবহার করা (৫) মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কে [কর্পোরেশন সমূহের] উচ্চপদী কর্মীদের ষড়যন্ত্র (৬) ব্যাঙ্ক ও বীমা কর্তার হিসাবের কার-চুপিতে অর্থ তচ্ছ্রূপ (৭) ব্যক্তিদের দ্বারা বা তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করা (৮) স্ত্রী বা কন্যার সাহায্যে ক্ষমতাসীন কাউকে অন্যায় ভাবে প্রভাবিত করা (৯) আইন সভার সদস্যের ব্যক্তিগত স্বার্থে ভোট প্রদান বা তাদের দ্বারা কার্যোদ্ধারে অন্যকে প্রভাবিত করা (১০) পুলিশের মামলা চুরি [কিছু মামলা নথীভুক্ত না করা] ও হাকিমের কলম চুরি [সাক্ষীদের কিছু বিবৃতি না লেখা] (১১) রাজকর্মচারীদের ক্ষমতার অপব্যবহার ও নিজেদের মধ্যে প্রমোশন পেতে দলবন্দী ও লেঙ্গী মারামারি এবং তৎসহ চুকলামি ও চাটুকারিতা (১২) মন্ত্রী ও

নেতাদের ও অলীক জনদরদীদের এবং শ্রমিক সঙ্ঘটনীদের নিজেদের স্বার্থে জনগণকে ভাঁওতা ও প্ররোচনা দেওয়া।

আশ্চর্য এই যে—সাম্যবাদীরা বড় গলায় বলেন যে অপরাধ ধন-তন্ত্রের সৃষ্টি। [কিন্তু ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ বাড়ে কেন] তাঁরা এ'ও বলেন যে রাশিয়াতে পরিদৃষ্ট অপরাধ ধনতন্ত্রের ফেলে যাওয়া নোঙরা [পয়েজনাস লেফ্‌ট্‌ওভার] কিন্তু সেখানে আজ শোধনবাদিতা ও ধনতান্ত্রিকতা একটি নূতন অপরাধ। কিন্তু ওখানে চুরি-প্রবঞ্চনা আদি সাধারণ অপরাধও হয়েছে। কিশোর অপরাধীরা সেখানেও এক সমস্যা। প্রভেদ এই যে ধনতন্ত্রী আমেরিকাতে ব্যক্তির সম্পত্তি চুরি হয়। কিন্তু রাশিয়াতে ব্যক্তির বদলে রাষ্ট্রের সম্পত্তি চুরি যায়। হোয়াইট কলার্ড অপরাধ কিন্তু সেখানেও ক্রমবর্ধমানরূপে প্রকট। অপরাধীরা কখনও ধনতন্ত্রী বা সমাজবাদীর মধ্যে বাদ বিচার করে না। মানুষের অন্তর্নিহিত অদম্য অপস্পৃহার অবস্থিতি ইহা প্রমাণ করবে।

সোভিয়েট রাশিয়াতে শিল্প ও কৃষি প্রতিষ্ঠানগুলি বেতনভুক ম্যানেজারদের দ্বারা পরিচালিত। উৎপাদন বেশী হলে তাদের পুরস্কার ও উৎসাহক অর্থ [ইনসেনটিভ্‌] দেওয়া হয়। বোনাস লোলুপ ম্যানেজার'রা রাষ্ট্রীয়স্বার্থ রক্ষার্থে বহু সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী। প্রয়োজনীয় উৎপাদনে অক্ষম হলে তাঁদের পদাবনতি, অর্থদণ্ড ও মেয়াদ ঘটে। এতে ওদেশের বহু ম্যানেজার আত্মরক্ষার্থে নানারূপ অন্যায্য কারচুপির আশ্রয় নেয়। উৎপাদন সম্পর্কীত ফাঁপানো অলীক হিসাব প্রদান, উৎপাদনের সংখ্যা বাড়াতে নিম্নমানের দ্রব্যাদি তৈরি করা [অর্থাৎ—কোনও রকমে কোটা তথা প্রদেয় সংখ্যা পূর্তি] কাঁচা মাল সংগ্রহ করে তা কালোবাজারে বিক্রী। [দ্রব্য ব্যবহার সীমিত থাকায় ব্ল্যাক মার্কেট হতে লোকে ওগুলি সংগ্রহ করে] সেখানে গভর্ণমেণ্ট কর্মীদের উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করাও হয়।

উপরোক্ত কারণে আমি বলেছি যে অপরাধস্পৃহা বাধা পেলে এক পথ ত্যাগ করে অন্য পথে বার হয়। ওগুলির প্রতিটি পথ ও রন্ধ্র বন্ধ করা কষ্ট-সাপেক্ষ। এজন্য ওগুলির মূল কারণগুলি বন্ধ করতে হবে। [ভারতেও হোয়াইট কলার্ড ক্রাইম বেড়ে গেছে।]

[রাশিয়াতে ব্যক্তি স্বাধীনতার পুনঃ প্রবর্তনের হার মত ওখানে অপরাধ বেড়ে গেছে। তবে—ধনতন্ত্রী আমেরিকার মত ওখানে অপরাধ ভয়াবহ নয়। ভারত মধ্যপন্থা গ্রহণ করাতে এখানে অপরাধ তুলনায় বহু গুণে কম।]

চিরাচরিত তথা কনভেনশন্যাল অপরাধ এবং এই অভিজাত তথা হোয়াইট কলার্ড অপরাধের মধ্যবর্তী এক প্রকার অপরাধ আছে। ঐগুলি উভয়ের মিশ্রণে সাম্প্রতিক কালে সৃষ্ট। ওদেরকে অপরাধতত্ত্বে মিশ্রঅপরাধী বা চানসড্ ক্রিমিন্যাল বলা হয়। নিম্নে ওদের অপরাধপদ্ধতি সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া হলো।

বিঃ দ্রঃ—এক শ্রেণীর সাম্প্রতিক ভদ্রবেশী সিঁদেল চোর [ভূঁইফোঁড়] চান্সড বারগ্লার নামে খ্যাত। এরা প্রায়ই ভদ্রশ্রেণীমধ্য শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত। দামী স্যুট পরে দল বেঁধে বা একাকী এরা অভিজাত হোটেলে আহার করে এবং মোটর গাড়ী ও প্লেন ব্যবহার করে। এরা হত্যার জন্য ছুরি আদি অস্ত্র কাছে রাখে না। কিন্তু বিপাকে পড়লে বা বাধা পেলে এরা খুন করে। কারও মুখ বাঁধলে অপকর্মের পর তারা ঐ বাঁধন খুলে দেয়। এরা পূর্ব হতে টারগেট তথা লক্ষ্যস্থল ঠিক করে না। গৃহভৃত্য বা অন্য কারও কাছ থেকে খবর সংগ্রহও এরা করে না। ওরা ওইরূপ চুরির সিদ্ধান্ত হঠাৎ নিয়ে থাকে। কারও সঙ্গে ওদের ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত শত্রুতাও নেই। এরা অপকর্মে বেরুবার আগে পেট ভরে হোটেলে খাদ্য খায় ও মদ্য পান করে। এর পর এরা একটা মুদ্রার দ্বারা হেড্ বা টেলস করে 'অপারেশনের' স্থান বাছে। উত্তর কলকাতায় বা দক্ষিণ কলকাতায় যাবে তারা ঐ ভাবে মুদ্রা টস করে ঠিক করে। দক্ষিণ কলকাতায় এসে বালিগঞ্জে বা আলিপুরে কায হবে তাও তারা ঐভাবে টস করে ঠিক করে।

[আশ্চর্য এই যে, নিরক্ষর আদি মনোভাবী স্বভাব দুর্বৃত্ত জাতীয় কোনও দল অপকর্মে যাত্রার পূর্বে একটা খুঁটি পুঁতে তার উপর পাখী বসার জন্য অপেক্ষা করে। পরে একটি পাখী তাতে বসে যে দিকে উড়ে যায় তারা সেই দিকে অপকর্মে বেরোয়। কিছু ক্ষেত্রে ডানে শৃগাল ও বামে সাপ দেখলে তারা ফিরে এসেছে।]

এই চান্সড বারগ্লার'রা চাকুরী দেবার বা সিনেমা'তে নামাবার প্রলোভনে ভুলিয়ে কিছু তরুণীকে বশে আনে। কেউ কেউ কার্য সিদ্ধির জন্য একাধিক বিপথগামিনী তরুণী কন্যাকে বিবাহ করেছে। অভিজাত পল্লীর সুদৃশ্য ফ্ল্যাটে বাস করাতে এদের সুবিধা। এদের কেউ ভালো গান করে ও ছবি আঁকে। এদের সুসজ্জিত কক্ষে ইংরাজী ও বাঙলা বই ও বিভিন্ন বাদ্য-যন্ত্র ঠাসা থাকে। এরা ব্যবসাদার বা সিনেমা প্রডিউসার আদি রূপে নিজেদেরকে

পরিচয় দেয়। ওদের বশীভূত কন্যারা সিনেমাতে চান্স পেতে সব কিছু বিলোতে প্রস্তুত।

পুরুষদের অবর্তমানে এদের বশীভূত তরুণীরা গৃহস্থ গৃহে এসে কলিঙ বেল টেপে বা কড়া নাড়ে। একাকীনী গৃহিণী দুয়ারের ফাঁকে বা পিপ হোলে [ম্যাজিক-আই] চোখ রেখে বাইরে দুজন সুবেশী তরুণীকে দেখে নির্ভয়ে দুয়ার খুলে দেয়। এর কিছু পরে ওদের প্রেরক ওই দুর্বত্ত তরুণ ওই ঘরে ঢুকে বলপূর্বক অর্থ ও গহনা লুণ্ঠন করে যে স্বচালিত মোটরে তারা এসেছিল সেই দামী মোটরেই সকলে উধাও হয়। এরা সুদক্ষ মোটর ড্রাইভার হওয়ায় মোটর চুরিতেও দক্ষ।

[নিরক্ষর পুরানো পাপীরা কিন্তু পরিকল্পনা মত কার্য করে। তারা বাসন উলি পাঠিয়ে কিংবা ভৃত্যদের সঙ্গে ভাব করে পূর্বাহ্নে সন্ধান নেয়। কখনও বাড়ীতে মিস্ত্রী খাটলে ওদের দলে ঢুকে সুড়ুক সন্ধান নেয়। তাই মিস্ত্রী খাটা কালে গৃহস্থরা ঐ রাত্রে সাবধান হয়।]

এদের উদ্ভবের একটি বিশেষ কারণ রয়েছে। বহু ভদ্র ব্যক্তি এখন অতিরিক্ত প্রফেসন [অলটারনেটিভ] রূপে অপকর্ম করে। এদের প্রায় সকলেই পুরাপুরি প্রফেসন্যাল ক্রিমিন্যাল নয়। কিন্তু অভ্যাসগত ভাবে ধীরে ধীরে এদের অপকর্মের প্রতি আকর্ষণ বেড়ে যায়। সেই অবস্থায় এরা প্রাথমিক পর্যায় হতে প্রকৃত পর্যায়ে এসে এ্যারিসট্রোকেটিক চোর হয়। শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিদের অর্থোপায়ের কোনও সৎ উপায় না থাকাও উহার কারণ। বহু এ্যারিসক্রেটিক দালালও এইভাবে দক্ষ প্রবঞ্চক হয়। আদিম বার-গ্লারী অপরাধ এদের উদ্ভাবনী শক্তিতে আজ আর নিরক্ষর বস্তিবাসীদের একচেটিয়া অপকর্ম নয়।

শহরে সুগঠিত ও সুরক্ষিত কংক্রীট বাটি ও পিপ-হোল আদি এড়াতে এরা বারগ্লারী অপরাধকে আধুনিক করেছে। এগুলিকে প্রবঞ্চনা ও বারগ্লারী এবং প্রবঞ্চনা ও রাহাজানীর একটি মিশ্র [Punch] রূপ বলা যায়।

[গৃহস্থ মানুষ সাবধান হওয়াতে ও ব্যাঙ্কে টাকা ও গহনা রাখাতে বারগ্লারী অপরাধ কমে প্রবঞ্চনা অপরাধ বেড়ে গেছে। কিন্তু এরা বারগ্লারী অপরাধকে আধুনিক করে উহা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলো। এইভাবে এরা একটি লুপ্তপ্রায় শিল্প কর্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছে।]

বিঃ দ্রঃ অপরাধসমূহ সভ্যতার সহিত সামঞ্জস্য রেখে সৃষ্ট হয়। যথা :

বাটীর উন্নতির সঙ্গে বারগ্লারী পদ্ধতিরও উন্নতি হয়। সিঁদমারী থেকে তুরপুনী উঠমারি চাড়বাজী আদি গৃহ-নির্মাণের উন্নতির সহিত সৃষ্ট। পরে—মানুষ সাবধান হলে প্রবঞ্চনা অপরাধসমূহ সৃষ্ট হয়। [বারগ্লার'রা সিঁদকাটাকে 'গামছার কাম ও তালা ভাঙাকে চাবির কাম বলে।]

পকেটমারদের বিভাগগুলি মানুষের পরিচ্ছদের ক্রমোন্নতির সহিত সৃষ্ট। বারগ্লারী চুরি ও হত্যাদির মত উহা পুরনো অপরাধ নয়। পূর্বেকার ধুতি পরতে অভ্যস্ত মানুষ কাপড়ের গিঁটে তথা টঁ্যাকে টাকা রাখতো। ঐ গিঁট তথা খুঁট কেটে টাকা নিতে গাঁট কাটা দলের সৃষ্টি। পরবর্তী কালে মানুষ পকেট যুক্ত পাতলা কোর্তা পরলে ওরা 'পকেটমারী' রূপে পকেট হতে টাকা তুলতো। কিন্তু আরও কিছু কাল পরে মানুষ একাধিক পুরু কোর্তা দ্বারা গাত্রাচ্ছাদন করলে জেব কাট্টা দলের সৃষ্টি হয়।

[এতে ওদের ঐ পকেট কাটার প্রয়োজনে ওরা প্রথমে ছুরি ও পরে ব্লেড ব্যবহার সুরু করে। ওদের ভাষায় রেজার ব্লেডের নাম 'পাখনা'। রেজার ব্লেডের পূর্বে কাঁচ ঘসে বা বাঁশ চেঁচে ওরা ঐ ছুরি তৈরী করতো। এরা শিকার তথা ভিকটিমকে 'তোতা' বলে। উপযুক্ত তোতা চিনার জন্য এদের শিক্ষা দেওয়া হয়।

এই সব শিকার তথা তোতাদের মোহিত বা বিভ্রান্ত করার জন্য প্রযুক্ত বাক্যালাপকে পিকপকেটরা, প্রবঞ্চক'রা ও চোরেরা যথাক্রমে কিস্‌কা, রগড়া ও বাহনা বলে।]

বিঃ দ্রঃ মাড়োয়ারীদের কেহ কেহ পূর্বপুরুষদের মত আজও ধুতির গিঁটে টাকা রাখে। তজ্জন্য বড়বাজার অঞ্চলে মাত্র চার জন গাঁট্ট কাট্টাই আজও কর্মরত আছে। হায়! এতোবড় এক শিল্পীর দল শীঘ্রই লুপ্ত হবে। কিন্তু ব্যাঘ্রাদির মত এদের রক্ষা করা যাবে না।

উপরোক্ত ব্যবহারিক পরিবর্তনের মত অপরাধীদের মানসিকতার পরিবর্তনও বর্তমানে হয়েছে। পূর্বের সভ্য মানুষ ধর্মপ্রাণ থাকাতে ওদের ওপরও কিছুটা পরোক্ষ ধর্মীয় প্রভাব ছিল। কিন্তু বর্তমান সভ্য সমাজের বহু ব্যক্তি অপরাধমুখী হওয়ায় ওদের উপরও তার কু-প্রভাব দেখা যায়। তাই ওদের মধ্যেও পূর্বের মত সীমিত আদর্শও নেই। তাদের নিয়মানুবর্তিতা, নেতাদের প্রতি আনুগত্য ও প্রাচীন নিয়ম কানুনেরও হ্রাস হচ্ছে। চোরের ওপর বাটপাড়ির সংখ্যা এযুগে পূর্বাপেক্ষা বেশী

এক বন্ধুকে আমি বলেছিলাম যে ভবিষ্যতে তার পকেট কাটা বা মারা গেলে সে যেন ভাবে যে অতো বড় শিল্পী দলের শিল্প কর্মকে বাঁচাতে সে কিছু অর্থ সাহায্য করলে। সত্যই—এদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কার্যাবলী অনুসরণীয় না হলেও নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়।

পূর্বকালে [অভ্যাস] অপরাধীরা স্থানীয় ধর্মীয় প্রভাবে প্রতিটা অপরাধের শাস্তির জন্য অপেক্ষা করতো। মিথ্যা মামলায় মেয়াদ হলেও সত্যকার মামলা এড়ানোর শাস্তি তথা দণ্ড তারা পেলো বুঝে নিশ্চিন্ত হয়েছে। তজ্জন্য মিথ্যা মামলা দায়েরী রক্ষীদের প্রতি তারা ক্রুদ্ধ হয় নি।

অন্যদিকে সেই ক্ষেত্রে স্বভাব-অপরাধীরা [মধ্যম অপরাধীরাও] লৌকিক ধর্মে অবিশ্বাসী হয়েও ভেবেছে যে তার চুরি করার অধিকারের মত গৃহস্থদেরও ওর জন্য তাকে জেলে পুরার অধিকার আছে। এর জন্য মিথ্যা মামলা দায়েরী রক্ষীদের প্রতি তারা বীতরাগ হয়নি। উহা তারা তাদের অপকর্মের একটি স্বাভাবিক পরিণতি ভেবে নীরব থেকেছে।

ওই সকল বিষয়ের জন্য প্রকৃত অপরাধীরা অন্যায়কারী রক্ষীদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তা করে না। কিন্তু প্রাথমিক অপরাধীরা নিরপরাধীদের মত উৎপীড়ক ও অন্যায়কারী রক্ষীদের উপর প্রতিশোধ নিতে পারে।

অপরাধীদের মধ্যে সূক্ষ্মবৃত্তি দুর্বল ও স্থূল বৃত্তি প্রবল হওয়ায় তাদের মধ্যে লোভ ও হিংসার আধিক্য থাকে। এ জন্য হিসাব ভাগাভাগির বিষয়ে এদের কলহ হয়। তার ফলে ওদের কেউ কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করে দলের লোকদের সম্বন্ধে পুলিশে খবর দেয়। এই একই কারণে তাদের মধ্যে হানাহানি ও খুনো-খুনি ঘটে।

উপরোক্ত তথ্য প্রাথমিক অপরাধীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও প্রকৃত অপরাধীরা প্রায়ই ঐরূপ কার্য করে না। কিন্তু ওদের মধ্যে দম্ভবৃত্তি অধিক থাকায় ওরা ওই সম্বন্ধে দম্ভোক্তি করে ও তা শুনে গুপ্তচররা অর্থের লোভে তা রক্ষীদের জানায়।]

বিঃ দ্রঃ ধর্মবোধ পূর্বে অপরাধ নিবারণে সহায়ক ছিল। ভারতে ধর্ম এখন শিল্প ও রূপ চর্চা এবং মাইক পূজাতে পরিণত। ভেজাল খাদ্য ও মাইকের শব্দ মস্তিষ্কের ক্ষতি করে অপস্পৃহা আনে। কমিউনিষ্টরা ধর্ম বাতিল করেছে। কিন্তু কমিউনিজমই এখন একটা ধর্ম। ধর্মমতের মত ওদেরও [পরস্পর বিরোধী] বহু উপমত আছে।

বর্তমানে অপরাধীরা [উঠতি গুণ্ডারাও] কৌলিন্যহীন। ওদের কোনও ব্যক্তিগত বা দলীয় চরিত্র বা আদর্শ এবং নীতি নেই। কেউ কেউ পার্টটাইম তথা অবসরি অপরাধী। এরা প্রফেসন্যাল তথা বৃত্তিগত অপরাধী নয়। এদের মধ্যে একটুকুও ঔদার্য নেই। ওদের কোনও মায়া দয়ার প্রশ্ন অবান্তর। এরা কোনও কিছু ভালো করে শিখে না। তাই এরা সহজে ধরা পড়ে।

মানুষ সম্বন্ধে কনসিডারেশন তথা ভাবনা এদের নেই। ওদের কাছে মনুষ্যজীবন মূল্যহীন। [ম্যান-ডিভ্যালুয়েশন] এরা শুধু দ্রব্য ছিনতাই করে সন্তুষ্ট হয় না। সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে এরা [অকারণে] মারধর করে। এতে এদের একটি স্যাডিসটিক আনন্দ। কিন্তু পূর্বতন ও বর্তমান বৃত্তিগত অপরাধীদের ধেয়ান ও ধারণা আজও ভিন্ন রূপ। পুরানো বৃত্তিগত অপরাধীদের কয়েকটি ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত নিম্নে উদ্ধৃত হলো।

(ক) "গল্প করতে করতে বন্ধুবর আঁতকে উঠে আমাকে বললো : সর্বনাশ! টাকা শুদ্ধ ব্যাগটা খোয়া গেল। বুড়া সর্দার মোজেজ ভিড় ঠেলে এসে আমাকে বললো : বাবুসাব। সেলাম। শুনা হ্যায় আপকো পিনসিন হুয়া। লেকেন এহি বান্দা অভিভি আপকো মদতমে হ্যায়। ক্যা বোলে বাবুসাব! আজ-কাল'কো লেড়কা লোক এইসেনই। ইনে লোক আদমী চিনতা নেহী। ইজ্জুতিয়াকো ইজ্জত দেতা নেহি। হামলোককো জামানা চলা গিয়া।' পিকপকেট সর্দার মোজেজ এক ছোকরাকে ডেকে বললো : এই! ইনে বাবুকো রুপেয়া আপোষ দে'দেও।

[পরে দূর থেকে শুনলাম মোজেজ তার ওই ছোকরাকে বলছে : ইনেকো হুদ্দোমে মে লোক থে। বহুত আচ্ছা বাবু। হামলোক'সে কভি কুচ খাতা উতা নেহি।]

(খ) "পুরনো জমাদার মোহন সিং আমাকে বললো : ইনে আপকো মাষ্টার থে। তব তো—ইনকো ছাতা মিলনে চাহি। জমাদার আমার প্রাক্তন প্রফেসর ডঃ পাল'কে নিয়ে বের হলো। একটু আগে তাঁর কাঁধ হতে এক ছোকরা কলেজ স্ট্রীটে ছাতা তুলে উধাও হয়। কিছু পরে মাষ্টার মশাই ফিরলেন ও বললেন : বাবা! তোমার লোক তো বস্তীর ছোট মিয়াকে আমাকে গছিয়ে দিলে। সব শুনে ছোট মিয়া আমাকে বললো, ঠিক'সে শোচিয়ে। ধাক্কাঠোডনেমে ক্যা-বামেসে মিললো। মোড়কো পূরবনা পশ্চিম। আমারকথা শুনে সে বললো : হাঁ। ওহী হামারই এলাকা। উনে আদমী ভি হামারই। ছোট মিয়া আমাকে

একটা বস্তীর ঘরে নিলে আমি দেখলাম : সেখানে সারি সারি প্রায় কুড়িটা ছাতা। হাতীর দাঁতের বাঁধানো হাতলওলা ছাতাও আছে। আমি নির্লোভী শিক্ষক। ওসব দামী ছাতা দাবি করি নি। ওর মধ্যে আমার ছাতা ছিল না। ছোট মিয়া অভয় দিয়ে বললো : আভিতক আপকো ছাতা জমা পড়া নেহি। আধা ঘণ্টা বাদ আকে আপকো ছাতা লে' যাইয়ে।

(গ) "বড় মিয়া আমাদের অনুরোধে রাজী হয়ে বললো : হাঁ! লেকেন সাব। কেস উস নেহী হোবে। উনে কমিশনর কো দোস্ত কো দামাদ হ্যায়! বড়মিয়া মহারাজার জামাই'কে নিয়ে বেরুলো। ওঁর বিবাহের ওই ঘড়িটা ছিনতাই হয়েছিল। ওরা ওঁকে এক বস্তীতে এনে ওঁর চোখ বেঁধে এক ঘোড়ার গাড়ীতে তুললো। এপথ ওপথ ঘুরে এক ঘরে এনে ওঁর চোখের ঠুলি খুলে দিল। মাটির দ্বিবালে সারিসারি সোনার ও রূপোর ঘড়ি ঝুলানো। একটি সোনার ঘড়িতে হীরা বসানো ছিল। জামাইবাবু প্রলুব্ধ হয়ে ওই হীরার ঘড়িটি সনাক্ত করলে ছিনতাই সর্দার ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিল : ঝুটা মাৎ বলিয়ে। ওই কোনাকো ক্যারেড গোল্ড ঘড়ি আপকো। আপ হামলোকসে ভী বড়ো বদমাস। আপকো ঘড়ী নেহী মিলেগী। পুনরায় জামাইবাবুর চোখে ঠুলি পরিয়ে তাঁকে ওরা নয়া রাস্তার মোড়ে নামিয়ে দিয়েছিল।

পদ্ধতি বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতম মনস্তত্ত্বের পরিচয় বিবিধ প্রবঞ্চনা অপকর্মে পরিদৃষ্ট। এগুলি বিপুলায়তনের জন্য এই পুস্তকের পৃথক একটি খণ্ডে বিস্তারিত ভাবে বিবৃত হয়েছে। এখানেও টপক ঠগী প্রভৃতিরা নিম্নশ্রেণীর নিরক্ষরদের মধ্যে সীমিত। কিন্তু নওশেরা প্রভৃতি নিত্য নবোদ্ভব উচ্চমানের প্রবঞ্চনা মাত্র বুদ্ধিজীবীদের করায়ত্ত। অর্থোপায়ে অসমর্থ পড়তি দশাতে পুরানো ধনী পরিবারের ইহা আবিষ্কার। এই অপরাধেও কিছু ক্ষেত্রে নারীদের সাহায্য বিশ্বাস উৎপাদনার্থে নেওয়া হয়েছে।

এদেশে গৃহস্থরা পুরুষদের মত নারী হতে সাবধান হন না। অন্যদিকে—বাটির কন্যাদের প্রতি যত নজর দেওয়া হয় তত নজর বাটীর পুত্রদের প্রতি দেওয়া হয় না। অবশ্য এজন্য এদেশে পুরুষ অপেক্ষা নারী অপরাধী বহু সংখ্যায় কম। বহু জনের ধারণা দুটি কন্যাকে একত্রে পাঠালে তারা নিরাপদ। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা পরস্পরের পাহারায় ও সাহায্যে [যৌনজ] অপকর্ম করেছে। কন্যারা অন্য বিষয়ে সৎ হলেও যৌন বিষয়ে তা নাও হতে পারে। কারণ যৌনবোধ অপস্পৃহা অপেক্ষা প্রবল বৃত্তি। বহু অপরিচিতা কন্যা

সংগ্রহিকাদের সন্দেহ করা হয় না। পুত্রদের বন্ধুদের বাছাই করা হলেও কন্যাদের বান্ধবীদের বাছাই করা হয় না। কিছু ক্ষেত্রে নারীই নারীর অন্যতম শত্রু হয়।

[আলাপরত তরুণ ও তরুণীর একই সঙ্গে যৌনস্পৃহা আসে না। এক সঙ্গে এলেও তা তারা জানতে পারে না। কিন্তু উহা পরস্পরের গোচরীভূত হলে বিপদ ঘটে। তবে ওতে সুযোগ থাকা চাই। প্রতিরোধশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকলে উহা ঘটে না।

[আশ্চর্য এই যে—এদেশে সাধ্বী স্ত্রীরা প্রায়ই স্বামীদের অপকর্মে সহায়ক হয় না। বরং স্ত্রীর নিকট স্বামীরা তাদের অপকর্ম গোপন রাখে। কোনও স্বামী আপন স্ত্রীর দ্বারা বেশ্যাবৃত্তি করালেও তার দ্বারা চুরি করাতে পারে না। এদেশে বেশ্যারাও চুরিকে ঘৃণা করে। অন্যদিকে এদেশে স্বামীরা স্ত্রীর চৌর্য কার্য ক্ষমা করলেও স্ত্রীর বেশ্যাবৃত্তি ক্ষমা করে না। জনৈক চোর স্ত্রী দ্বারা গোপন সংবাদ আনতে এক বাড়ীতে পাঠায়। সেখানে ঐ স্ত্রী ঐ বাড়ীর এক পুত্রের প্রেমে পড়লে ঐ স্বামী তাকে ক্ষমা করে নি।]

"কোনও এক তরুণ ঘুমন্ত পরিচারিকার কানে কাগজ গুঁজে পালায়। গভীর রাত্রে ঐ পরিচারিকা তরুণের বন্ধ দোরে ধাক্কা দিলে ঐ তরুণ সব বুঝেও দোর খুলে নি। কারণ—প্রতিরোধ শক্তি ফিরে আসাতে সে তখন ঐ দুর্বলতা হতে মুক্ত। কৃত্রিম উপায়ে কিছু কন্যাকে যৌনস্পৃহী করা সম্ভব হয়।" [পৃঃ ২৩৬ শেষাংশ দ্রঃ] (f)

বিঃ দ্রঃ—বহু দুর্বৃত্ত যৌনজ অপকর্মার্থে নিজের [নির্দোষ] স্ত্রী বা ভগ্নীর সঙ্গে বন্ধুর আলাপ করায়। সে জানে তাহলে একদিন ওই বন্ধুও তার সঙ্গে তার স্ত্রী বা ভগ্নীর আলাপ করাবে। সুযোগ নেবার এটি একটি যৌনজ অপ-পদ্ধতি।

দুর্বৃত্ত তরুণরা এদেশের অবিভাবকদের কিছু দুর্বলতার সুযোগ নেয়। বাড়ীর কর্তাকে সিগারেট খাই বললে উনি চাকর ভিখুকে সিগারেট কেস্ আনতে বলেন। কিন্তু ঐ দুর্বৃত্ত তরুণ সিগারেট খাই না বললে উনি খুশী হয়ে বলেন: এ্যাঁ। ভেরি গুড বয়। ওরে রমা চা নিয়ে আয়।' এরূপে গিন্নীমাকে ওই তরুণ পান খাই বললে উনি ঝি কে [পরিচারিকা] পানের খিলি

[f] এখানে হস্তরেখা পরীক্ষা বা আদর করার ছলে বালিকাদের স্পর্শকাতর স্থান স্পর্শ করে তাদের যৌন স্পৃহা জাগানো হয়।

আনতে বলেন : কিন্তু ওই তরুণ 'পান খাই না' বলা মাত্র গিন্নী খুশী হয়ে বলেন। পানও খাও না ! বাবা আমার শিব। ওরে পুঁটি মশলা নিয়ে আয়। ওই গিন্নীর পায়ে ঢিপ করে প্রণাম করে মাটিতে ওই তরুণ বসলে গিন্নী মা গদ গদ হয়ে বলবেন : ওরে পুঁটি যা দাদাকে প্রণাম কর।

এখানে সামাজিক ধারণা এই যে পান বা সিগারেট খাওয়া বা না খাওয়ার উপর ওদের যা কিছু স্বভাব চরিত্র নির্ভর করে।

[বহু ক্ষেত্রে ঘর বাঁধার ইচ্ছাতে কন্যারা নিজেরাই এগোয়। কন্যাদায় গ্রস্ত মাতাদের এতে মৌন সম্মতি থাকে। কিন্তু নির্বাচনের ভুলে তারা প্রায়ই প্রতারিত হয়। কিছু ক্ষেত্রে কন্যারা অভিনয়ে ভুলে গৃহত্যাগী হয়ে কষ্ট পায়।

কোনও বাড়ীতে মেয়েদের সঙ্গে আলাপ দশ বৎসর যাতায়াতের পর সম্ভব। রক্ষণশীল অন্তপুরের মেয়েরা বাইরে বেরুলেও ঘরে ফিরলে সেটা তাদের দুর্ভেদ্য দুর্গ। বাইরে যা কিছু করলেও পুরুষরাও অন্তঃপুরের পবিত্রতা সর্বতো-ভাবে রক্ষা করে।

কিন্তু কোনও বাটিতে সকালে আলাপ হওয়ার পর পাতানো নূতন দাদাটি সন্ধ্যায় পাতানো বোনটিকে নিয়ে সিনেমাতে বেরোয়। এ বিষয়ে অবিভাবকরা সাবধান হলে অঘটনসমূহ এড়ানো সম্ভব। ভাবপ্রবণ অনভিজ্ঞ তরুণরা বধুদের বন্ধুদের সঙ্গে নির্বিবাদে আলাপ করতে দিয়ে বিপদ ডেকে এনেছে। এটা তারা একটা বাহাদুরী সহ আধুনিকতা মনে করে থাকে।]

বিঃ দ্রঃ—স্ত্রীরা জীবন ভোর মাতৃভাবের পূজারী। পতিকে দেহ দানও তারা মাতৃভাবে করে। 'আহা ! এতে উনি যদি তৃপ্ত হোন তো তা হোন।' নিজের শান্তির চাইতে তারা স্বামীর শান্তি বেশী চায়। স্বামীর অসুস্থতার চাইতে নিজের অসুস্থতা বেশী হলেও তারা অসুস্থ দেহ সহ স্বামীর সেবায় এগিয়ে আসে।

[মেয়েরা সাধারণতঃ স্বার্থত্যাগী ও সৎ হয়। কিন্তু তারা অসৎ বা মন্দ হলে উহা সীমাহীন হয়ে থাকে।]

[সামঞ্জস্য তথা খাপ খাওয়ানোতে আয়ু ক্ষয় হয়। রেজিসটেন্সের বিরুদ্ধে ভিন্নাদর্শীদের সঙ্গে তাদের বনিয়ে চলতে হয়। [ইচ্ছার বিরুদ্ধে] তাই ভালো বলে যারা নাম কেনে তেমন বধুরা [স্বামীর সংসারে] বেশী দিন বাঁচে না। কিন্তু প্রতিবাদকারী মুখরা কলহ প্রিয় বধুরা সেখানে বেশী কাল বাঁচে ও টিকে। কিংবা তাদের মধ্যকার শান্তি প্রিয়রা বহু দূরে চলে গিয়ে আত্মরক্ষা করে।]

[অনেকে ভাবেন যে দুটি মেয়েকে একত্রে বেরুতে দিলে বিপদ নেই। কিন্তু কিছুক্ষেত্রে এরা পরস্পরের পাহারাদার হয়। পরস্পরের বিরোধিতা না করে তারা সহযোগিতা করে। ওদের মধ্যে চরম নৈতিক অসাড়তা এলে ইহা সম্ভব হয়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট নিরপরাধী কন্যা একনিষ্ঠ হলে সে উহার অত্যন্ত প্রতিবন্ধক হয়। ইহারা সভ্য মনোভাবী হওয়াতে আদি মানবীর মত মনোভাবী হয় না।]

বিঃ দ্রঃ—স্বার্থত্যাগী বধুরা জোর করে [ইচ্ছার বিরুদ্ধে] স্বামীর সংসারে নিজেদেরকে 'এ্যাডযাষ্ট' করে। এইরূপ বধুরা ভালো ব'লে সুনাম কিনে বটে। কিন্তু এতে তাদের দেহের ও মনের উপর চাপ পড়ে। ফলে ধীরে ধীরে আয়ু ক্ষয় হওয়াতে শীঘ্রই তাদের মৃত্যু ঘটে। অন্যদিকে—অধিকার-প্রিয় দজ্জাল বধুদের মধ্যে আত্মপ্রবঞ্চনা নেই। মনের ক্ষোভ ও ইচ্ছা কলহের ও প্রতিবাদের মুখে বার করে তারা সুস্থ থাকে, ফলে বহুকাল তারা বাঁচে। এদের কারও কোনও রূপ বদনামী হওয়ার কোনও পরোয়া নেই।

[মাত্র স্বামী স্ত্রীর ছোট পরিবারে এই দজ্জাল বধুরা উপকারে আসে। তারা একাধারে বাজার সরকার, পাহারাদার কুকুর ও বিশ্বস্ত দ্বারবান এবং হিসেবী গৃহিণীর কাজ করে। ভবিষ্যৎ সন্তানদের আখেরের পক্ষে এরা উপকারী। কিন্তু স্বামীর পরিবারের পক্ষে এই আত্মকেন্দ্রিক বধুরা দারুণ ক্ষতিকর।]

[বুড়া বয়সে স্ত্রী "লাক্সারী' না হয়ে 'নেসেসিটি' হয়। এরা বেশী দিন বাঁচে বলে ওই কালে কাউকে পত্নী হারা হতে হয় না। কিন্তু—স্বামীর জীবন এরা অতিষ্ঠ করে তুলে। উপরন্তু একটুক্ষণও তারা স্বামী ছাড়া হতে চায় না।]

কন্যাদের মধ্যে ভালো মন্দ হওয়ার প্রবণতা দুইই থাকে। মন্দ হওয়ার সুযোগ বন্ধ করলে ফল উত্তম। কোনও বাড়ীতে অন্তঃপুর পর্যন্ত পৌঁছতে অন্ততঃ আট বছরের জানা শুনার প্রয়োজন হয়। কোনও বাড়ীতে সকালে সদ্য আলাপ হওয়ার পরই ভগ্নী সম্বোধনে বাটির বোনটিকে নিয়ে ঐ দিনের বিকালে সিনেমা যাওয়া সম্ভব।

বহু সৎ কন্যা ঘর বাঁধার জন্য প্রলুব্ধ হয়ে কোনও তরুণের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে। উপযুক্ত পাত্র বুঝলে এক শ্রেণীর অভিভাবকরা এতে মৌন সম্মতি দেন। কিন্তু

(f) য়ুরোপীয় বধুরা গৃহত্যাগের পূর্বে দুই মাসের নোটিশ দেয়। স্বামীরা সকালে বেরিয়ে বিকেলে বাড়ি ফিরে বধুকে দেখতে পেলো না : এইরূপ ঘটনা সেখানে প্রায়ই ঘটে না। সৌভাগ্য যে এ দেশে এইরূপ দুর্ভাগ্য এখনও হয় নি। এদেশে ভেবে বুঝে উভয় পক্ষ বিবাহে মত দেয়। [কুমারীদের 'আন্-কিসড্' ও 'আন্-টাচড্' থাকা উচিৎ।]

ওরূপ দ্যূতক্রীড়ার মত কার্য এড়ানো উচিৎ। ভালো রূপে না বুঝে এগুলে ব্যথা পেতে হয়। (f) মানুষের আগ্রহ ও পছন্দ ঘন ঘন পরিবর্তিত হয়ে থাকে। তাই বিবাহ বন্ধনের কার্য দ্রুত সম্পাদন করার রীতি। [উৎপীড়িত ও অসহায়রা যে কোনও একটি অবলম্বন পেতে ব্যগ্র হয়।]

তরুণদের প্রাগ-বিবাহ দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন পরিহার করা উচিৎ। উতলা না হয়ে তাদের বুঝা উচিৎ—তার ভাবী বধূ তখনও কুমারী। ইতিমধ্যে বহু বাধা বিঘ্ন ঘটতে পারে। বিবাহের পর সাড়ীতে সিঁদুরে ঝলমল নব বধুকে হাত ধরে ঘরে তুলার আনন্দ হতে নিজেদেরকে বঞ্চিত করা অনুচিৎ। এখন তাকে যতো তার ভালো লাগে বা সুন্দর মনে হয়, তখন তার চাইতে ঢের বেশী ওদের ভালো লাগবে ও সুন্দর মনে হবে। নিজেদের স্বার্থে ভাবী বধুকে তার নিষ্কলঙ্ক ও পবিত্র রাখা উচিৎ। [ওতে স্ত্রী'রা সন্দিগ্ধমনা হয়।]

বিঃ দ্রঃ—কারও প্রতি পূর্ব অনুরাগ ও সম্পর্ক থাকলে সংশ্লিষ্ট পক্ষের বিবাহের পর তা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে পরস্পরের সংস্পর্শ এড়ানো উচিৎ। দেশে ঐ একটি মাত্র পাত্র বা পাত্রী নেই। সমগুণের পাত্র পাত্রী অন্যত্রও আছে। এখানে কোনও ব্যক্তির প্রতি প্রাধান্য না দিয়ে সমপর্যায়ভুক্ত গুণের উপর প্রাধান্য দিতে হবে। [অন্যের ঘর ভাঙা মহাপাপ] রূপ ও গুণের বাইরে মানুষ একটি মূল্যহীন মাংসল পিণ্ড মাত্র।

ধৈর্যহীন ব্যক্তির দ্রুত পানাহার উদরের অন্ত্রতে বায়ু [Air] ঢুকায়। এতে প্রতিরোধ শক্তি দুর্বল হলে তারা অবল-প্রয়োগী যৌনজ বা অযৌনজ অপরাধী হতে পারে। তবে সম্মানহানির ভয় থাকাতে এরা বেশী দূর এগোয় না।

কন্যার বিবাহের রাত্রে সংশ্লিষ্ট কোনও কোনও তরুণ চিঠির গোছা ও কিছু ফটো বর পক্ষের নিকট দাখিল করেছে। এজন্য—পূর্বে পুলিশের সাহায্যে ওগুলি উদ্ধার করা ভালো। এক্ষেত্রে হঠাৎ ঠিকানা বদলে বা দূর স্থানে বিবাহ দেওয়া ভালো। ব্ল্যাক মেইলিঙের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সময়ে সাবধান হয়ে এগুলো বাড়তে দিবেন না। 'তোমাকে ঘৃণা করি বা আর তোমাকে চাই না বা তুমি দূর হয়ে যাও' কন্যাকে দিয়ে এইরূপ কিছু স্পষ্টাস্পষ্টি তাকে ডেকে বলিয়ে দেওয়া ভালো। এইরূপ অপমানে বা প্রচণ্ড আঘাতে উন্মাদরা আত্মস্থ হবে। বিতাড়িত তরুণরা প্রায়ই কন্যার বাড়ীর চতুর্দিক ঘুরা ফিরা করে। পুলিশের সাহায্যে তৎক্ষণাৎ এর প্রতিকার করা যায়।

রাজপথে অসৎ তরুণদের কোনও উক্তির প্রতিবাদ না করে উহাকে উপেক্ষা করে কন্যাদের তাদের এড়িয়ে চলে যাওয়া উচিৎ। অবিভাবকদের বললে তারা পুলিশের সাহায্যে এদের জটলা বন্ধ করেন। কন্যাদের [মজা করতে বা কোন কিছুতে] দুষ্ট তরুণদের সামান্যতম আস্কারা বা সুযোগ দেওয়া উচিত নয়।

ব্যাভিচারের পর বহু বধূ অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়। জনৈকা বধূ ওরূপ ঘটনার পর সারারাত্র [গৃহদেবতা] ঠাকুরের ঘরে মাথা ঠুকেছিল। বলপ্রকাশের ক্ষেত্রে কন্যারা ঘটনা লজ্জায় চেপে যাওয়াতে দুর্বত্তদের সাহস বাড়ে। এদেশে বলাৎকারের পরিবর্তে হত্যা বাঞ্ছনীয়। প্রেমাস্পদের সঙ্গেও না বুঝে যত্র তত্র কন্যাদের যাওয়া উচিত নয়। ওরূপ অবস্থায় অন্যেরা তাকে ছিনিয়ে নিতে পারে। [বিশ্বাস করে অজানা অন্তরঙ্গ কারও সঙ্গে কোথাও নিরালা স্থানে যাওয়া অনুচিৎ।]

[অভিযোগ পাওয়ার অপেক্ষা না করে পুলিশ কর্মীদের স্থানীয় দুর্বৃত্তদের চরিত্র ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে নিজেদেরই খোঁজ নেওয়া উচিৎ। সময়ে ব্যবস্থা নিলে বহু অঘটন এড়ানো সম্ভব। এলাকার সৎ তরুণদের ও গৃহীদের সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলে ওদের ভুলে কাউকে নির্যাতিত হতে হয় না। সৎ ব্যক্তিদের খুঁজে বার করে সর্বদা গোপনে সংবাদ সংগ্রহ করা বিধেয়। (f)

গৃহ শিক্ষকদের মত ছাত্রদের সহিত প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত সংযোগ থাকলে ছাত্ররা শিক্ষকদের সমীহ করে। তাদের বিরোধিতা করতে ওদের চক্ষু লজ্জা আসে ও ওতে তাদের বিবেক সায় দেয় না। নিদান পক্ষে পূর্বতন টিউটোরিয়াল ক্লাসগুলির মত ছোট ছোট সংস্থার পূর্ণ প্রবর্তন প্রয়োজন আছে। সপ্তাহান্তর পর্যায় ক্রমে পূর্বে ইহার ব্যবস্থা করা হতো।

সার্কাসের লোক নির্ভয়ে হিংস্র বাঘ ও সিংহের মুখের মধ্যে মাথা রাখে। ক্রমিক ভালবাসা ও বিশ্বাস উৎপাদন উহার কারণ। এইজন্য স্থানীয় চেনা জানা গুণ্ডারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উপর প্রায়ই উৎপাত করে না। এইভাবে অতি দুষ্ট ও দুর্দান্ত ছাত্রদের বশ করা সম্ভব। এক্ষেত্রে পাঠ্যবিষয়ের বাইরে ব্যবহারিক জীবন সম্বন্ধে ছাত্রদের উপদেশ দিতে তাঁরা সক্ষম হন। কিন্তু রাজনীতি করা শিক্ষকদের বিরুদ্ধ মতবাদী ছাত্ররা ভালো বিষয়েও বিরোধিতা

(f) চেম্বার বিলাসী পর্দানশীন [Chamber oriented] উর্ধতন কর্মীদের এজন্য বেরিয়ে জনসংযোগ করা উচিৎ; অধীনদের ভাল মন্দ স্বভাবের ও তাদের পাবলিক রেপিউটেশন সম্বন্ধেও খবর নিতে হবে।

করবেই। শিক্ষকরা রাজনীতি থেকে দূরে থাকলে এই সমস্যার সহজ সমাধান হবে। রাজনীতির দ্বারা মালিক শ্রমিকদের মত শিক্ষক ছাত্র সমস্যা জটিল করা অনুচিৎ।

[পত্নীদের অন্যের লেখা বে-আইনী পত্র ও বাড়তি অর্থ উদ্ধারার্থে স্বামীর পকেট হাঁতড়ানোর অধিকার আছে। চতুর স্ত্রীরা স্বামীর জামা বদলাবার সময় এই কার্য করেন। অফিস থেকে ছুটি হবার কতক্ষণ পরে স্বামী বাড়ী ফিরলো : তারও একটি প্রাত্যহিক হিসাব রাখার অধিকার স্ত্রীর আছে।

বিবাহের পূর্বে উভয় পক্ষের ডাক্তারী পরীক্ষার সার্টিফিকেট প্রয়োজন। নচেৎ রোগগ্রস্থদের সংস্পর্শে তারা বংশ পরম্পরায় বিনা দোষে ভুগে। এজন্য বাধ্যতামূলক আইন প্রনয়নের প্রয়োজন আছে। যৌনজ রোগ নিরাময়ের পূর্বে সন্তান প্রসব হলে তার অন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা।]

এক শ্রেণীর সুবিধাবাদীনীরা আপনাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে। গৃহ নাম গোত্র হীন নির্লজ্জদের বেলাল্লা জীবন যাপন সম্ভব। মান সম্মান জ্ঞানী গৃহাদির অধিকারী প্রতিষ্ঠাবানরাই ব্ল্যাক মেইলড হন। নিল্লজ্জ কর্ম ও গৃহহীন মামুলী ব্যক্তিরা কিন্তু ওদেরই উল্টে ব্ল্যাক মেইলিঙ করে। এগুলি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ভদ্রজনদের আত্মসংবরণ করে ন্যায্য পথে জীবন ভোগ করা উচিৎ। এক শ্রেণীর হিষ্ট্রিয়া রোগিনী সামান্য আস্কারাতে কিংবা বিনা আস্কারাতে নির্দোষীর পিছনে ধাবিতা হয়ে তাদের জীবন অতিষ্ট করে। [কোনও কোনও তরুণরাও এই আরোগ্য-যোগ্য রোগে ভোগে] এদের থেকে সাবধান হওয়া উচিৎ হবে। ঔষধ প্রয়োগে কিংবা বারংবার অপমানে এদের আত্মসম্বিৎ [Normal self] ফিরে।

সপ্তদশ অধ্যায়

॥ অপরাধী সমাজ ॥

পক্ষী একটি অহিংস জীব, কিন্তু কুম্ভীর একটি সহিংস জীব। কিন্তু—তা সত্বেও উভয়ের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক আছে। কুম্ভীর মুখ ব্যাদন করে ও পক্ষী

ঐ মুখ গহ্বরে ঢুকে কীট ভক্ষণ করে। এ'তে পক্ষী ক্ষুধা মুক্ত এবং কুম্ভীর কীট মুক্ত হয়।

উপরোক্ত রূপে মনুষ্য সমাজেও মধ্যে মধ্যে অপরাধী ও নিরপরাধীদের পারস্পরিক সাহায্য দেখা গিয়েছে। জীব সমাজের বহু অভ্যাস মনুষ্য সমাজে পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে। কিন্তু উহা অতি গোপনে লোক চক্ষুর অন্তরালে ঘটে থাকে। নিরপরাধী ব্যবসায়ীদের নিকট অপরাধীরা আজও অপহৃত দ্রব্যাদি বিক্রয় করে অর্থ সংগ্রহ করে। কামার প্রভৃতির সহিত এদের সহযোগিতা আজও আছে। সেদিনও কলিকাতায় জনৈক সিঁদেল চোর বোম্বাই থেকে অর্ডার দিয়ে ১০২ প্রকার ভাঙন যন্ত্র আনিয়েছিল। (f)

"পদ্মা নদীতে ষ্টিমারে ঐ বন্দীকৃত অপরাধীকে আমরা সদরে আনছিলাম। হঠাৎ সে উলম্ফনে হাত-কড়ি শুদ্ধ মাথা সহ দেহ'টা ষ্টিমারের দ্বিবালের গোল ফোকরে ঢুকিয়ে মাছের মত পিছলে নদীর মধ্যে পড়লো। আমরা বুঝলাম হাতে হাতকড়ি থাকাতে তার সলিল সমাধি হলো। কিন্তু কিছুদিন পরে ওরই মত কার্যপদ্ধতিতে জেলাতে সিঁদেল চুরি সুরু হলো।

হাতকড়ি শুদ্ধ হাতের এবং পায়ের সাহায্যে ডুব সাঁতারে সে নদীর ওপারে উঠেছিল। দূর হতে কামারের হাতুড়ীর আওয়াজ শুনে সে বুঝে যে নিকটে কামারশালা আছে। সে ছুটে কর্মশালাতে আসে ও কামারের উদ্যত হাতুড়ীর নিম্নে হাতকড়ি শুদ্ধ হাত রাখে। অগত্যা কর্মকার নীরবে ঐ লোহার হাতকড়ি কেটে দেয়। তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে এসে একটা চুরি করে সে ঐ কামারের ঋণ পরিশোধ করে স্ব কর্মের জন্য স্ব স্থানে ফিরে এসে ছিল।

এখানে বক্তব্য এই যে চিরাচরিত প্রথা মত গ্রামীণ কামার'রা অপরাধীদের সিঁদকাটি তৈরী করে দিতে ও তাদের হাতের লৌহ বলয় ছিন্ন করতে বাধ্য থাকে।

[আজও—জেলের বাইরে ও ভিতরে নিরপরাধী সমাজই অপরাধীদের ভরণ পোষণ করে থাকে। ওরা বাইরে যাদের অর্থাপহরণ করে তাদের অর্থেই জেলে ওরা জীবন নির্বাহ করে।]

ভারতীয় অপরাধী সমাজে কর্মগত জাতিভেদ প্রথা অত্যন্ত প্রকট। উহা

(f) অপরাধী ব্যবসায়ীরা আজও ভেজাল দ্রব্য তৈরিতে বিজ্ঞানী প্রভৃতি'দের সাহায্য গ্রহণ করে।

প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। এদের মধ্যে পরিদৃষ্ট কর্মগত জাতিভেদ বুঝতে হলে সভ্যসমাজে প্রচলিত জাতিভেদ সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা থাকা চাই। তাই অপরাধীদের মধ্যে প্রচলিত জাতিভেদ আলোচনার পূর্বে সভ্য সমাজের জাতিভেদ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছুটা বলবো। তবে—সভ্যসমাজের জাতিভেদ থেকে অপরাধী সমাজের জাতিভেদ সৃষ্ট হয়েছে কিনা, তা উপলব্ধি করার জন্য অবশ্য গবেষণার একটি উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র রয়েছে বলে আমি মনে করি।

অপরাধী সমাজের মত সাধারণ সমাজেও জাতিভেদ দৃষ্ট হয়। উভয় সমাজের জাতিভেদের তুলনামূলক আলোচনার জন্য সভ্যসমাজের জাতিভেদ সম্বন্ধেও অবহিত হতে হবে।

য়ুরোপের উপরের তলার মেথরদের সহিত নীচের তলায় মেথরদের খানাপিনা ও বিবাহাদি নেই। অন্যত্র অর্থনৈতিক জাতিভেদ অত্যন্ত প্রবল। কলিকাতায়—চর্মকারদের মধ্যে বুট নির্মাতাদের সহিত চটি নির্মাতাদের বিবাহাদি হয় না। ভারতে তথাকথিত কাষ্ট হিন্দুদের মধ্যে যত শ্রেণী [জাতি] আছে, সিডিউলদের তদপেক্ষা বেশী কাষ্ট দেখা যায়। তাদেরও মধ্যে আন্ত-বিবাহ খানাপিনা নেই। তবু অযথা ব্রিটিশরা হিন্দু সমাজকে বর্ণহিন্দু ও সিডিউলে বিভক্ত করেছে। মুস্লিম ও খৃষ্টানদের মধ্যে বহু 'এয়ার টাইট' শ্রেণী ও উপশ্রেণী আছে। বামুন খৃষ্টানরা আজও বিবাহার্থে বামুন খৃষ্টান খোঁজে।

পশ্চিম মুস্লিমরা পুরবীয়া মুস্লিমদের ছোট জাত মনে করে ওদেরকে তাদের হোটেলে ঢুকতে দেয় না। নিকারী মুস্লীম ও চিত্রকর উপাধীর মুস্লিমরা তারকেশ্বরে হত্যা দেয় বলে মুস্লিম সমাজে কিছুটা ছোট রূপে বিবেচ্য। কিছু গুরুবাদী মুস্লিম মুস্লিমরূপে স্বীকৃতি পায় না। পাঠান মুস্লিম ও হিন্দুরাজপুতরা নিজেদের সমগোত্রীয় ভাবে।

প্রকৃতপক্ষে কিন্তু ভারতে জাতিভেদ নেই। কোনও ব্যক্তি সন্ন্যাসী হওয়া মাত্র তার 'সারনেম' তথা পদবী থাকে না। সেই ব্যক্তি সিডিউল শ্রেণীর হলেও ব্রাহ্মণের তার পদ ধূলি নিতে বা তার উচ্ছিষ্ট প্রসাদ খেতে আপত্তি নেই। ভারতীয় প্রিন্সেস তথা রাজন্যবর্গেরও কোনও জাতি নেই। তাদের মধ্যে খানাপিনা ও আন্তবিবাহতে কোনও বাধা নেই। ভারতীয় প্রকৃত অপরাধী ও বেশ্যাদের সম্পর্কেও তাই বলা চলে। যে কোনও জাতীয় ব্যক্তি রাজা ফকীর সন্ন্যাসী অপরাধী ও বেশ্যা হওয়া মাত্র তাদের জাতিগত অস্তিত্ব থাকে না।

হিটলারের মতে আর্যদের সহিত অনার্যের রক্তের মিশ্রণের পরিমাণ মত জাতিভেদ সৃষ্টি। অতএব হিটলারের মতে ভারতে আরও একটি এরিয়ান ইনভেসনের প্রয়োজন ছিল। কাহারও মতে গৃহীত বৃত্তি অনুযায়ী উঁচু নীচু শ্রেণীর ও উপশ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয়দের জাতিভেদ কর্মগত পরিচ্ছন্নতার উপর নির্ভর করে সৃষ্ট হয়।

ব্রাহ্মণের বৃত্তি সর্বাপেক্ষা পরিচ্ছন্ন ছিল বলে তারা সর্বোচ্চ শ্রেণীরূপে বিবেচিত হতেন। বিষ্ঠা পরিষ্কারকরা পরিচ্ছন্নতার দিক হতে সর্বনিম্নে অধিষ্ঠিত রূপে বিবেচিত হতেন। (f)

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে সংখ্যালঘু ব্রাহ্মণদের কতিপয় ব্যক্তি কাকে বেশী পরিচ্ছন্ন কাকে বা কম পরিচ্ছন্ন বলেছেন তার উপর নির্ভর করে, বিশাল হিন্দু সমাজকে রাজনৈতিক কারণে কৃত্রিমভাবে ব্রিটিশরা বহু ভাগে বিভক্ত করে গিয়েছেন।

[তৎকালে বিভিন্ন শিল্পীরা পৃথক পৃথক পল্লীতে বাস করতো। শিল্প শিক্ষা ঘরোয়ানা রূপে রক্ষার্থে বিবাহাদি নিজেদের মধ্যেই করেছে। ধীরে ধীরে উহা শ্রেণী ও উপশ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছিল।]

উপরোক্ত জাতিভেদের সহিত অপরাধী সমাজের জাতিভেদের যথেষ্ট প্রভেদ আছে। অপরাধীরা তাদের স্ব স্ব কর্মে প্রযুক্ত দক্ষতা ও সাহসের ক্রম মত নিজেদের মধ্যে উঁচু নীচু জাতিভেদের সৃষ্টি করেছে। এইদিক থেকে নিরপরাধীদের জাতিভেদ অপেক্ষা অপরাধীদের এই কর্মগত জাতিভেদ উৎকৃষ্ট ও যুক্তিসঙ্গত প্রতীত হবে।

খানাপিনা মেলামিশার মধ্যে এদের জাতপাত পরিবর্তন-যোগ্য হয়ে থাকে। এদের মধ্যের জাতিভেদ ওদের কম বেশী হিম্মতমত 'প্রাপ্য সম্মানের' উপর নির্ভরশীল।

[ভারতে রাজন্যবর্গের ও সন্ন্যাসীদের কোনও জাতি নেই। এই রাজন্য-বর্গদের আন্তর্জাতিক বিবাহে কোনও বাধা নেই। অন্যদিকে—যে কোনও জাতির লোক সন্ন্যাসী হওয়া মাত্র ব্রাহ্মণরাও তাদের প্রসাদ ও পদধুলি গ্রহণ করে।

(f) মেথরদের অপেক্ষা চর্মকারদের, চর্মকারদের অপেক্ষা কুম্ভকারদের, কুম্ভকারদের অপেক্ষা কর্মকারদের এবং কর্মকারদের অপেক্ষা তন্তুবায়দের এবং তন্তুবায়দের অপেক্ষা স্বর্ণকারদের বৃত্তি তথা কর্মে পরিচ্ছন্নতা বেশী থাকাতে এক শ্রেণীর উপরে তদনুযায়ী অন্য শ্রেণীটি স্থান পেয়েছে।

অনুরূপভাবে ভারতে অপরাধী ও বেশ্যাদের কোনও জাতি নেই। অপরাধীদের শ্রেণী ও উপশ্রেণী ভেদ তাদের উঁচু-নীচু কর্ম ও কম বেশী হিম্মতের উপর নির্ভর করে।

[রাজা ও সাধুদের মত বেশ্যা ও অপরাধীরা তাদের জন্মসূত্রে প্রাপ্ত পদবী ত্যাগ করে। মনুষ্য শিশুদেরও কোনও জাতি বা বর্ণের ধারণা থাকে না।

অপরাধী-সমাজ—বিশেষ করে ভারতীয় অপরাধী-সমাজ বহুলাংশে বর্তমান হিন্দু সমাজের অনুকরণে গঠিত। এই বিশেষ সত্যটি এদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মেলামেশা করে আমি অবগত হয়েছি। হিন্দু সমাজে যেমন স্ব স্ব কর্মরীতি বা বৃত্তি অনুযায়ী উচ্চ-নীচ সম্প্রদায় নির্দিষ্ট হয়, অনুরূপ-ভাবে অপরাধী-সমাজেও অপকর্মের স্বরূপ অনুযায়ী অপরাধীসকল উচ্চ বা নিম্ন শ্রেণীভুক্ত হয়ে থাকে। সাধারণভাবে [পেশাদারী] ডাকাতগণ [বোধ করি খুনেরাও] সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মান পেয়ে থাকে। ভারতীয় অপরাধী-সমাজের এরা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। অপরাপর অপরাধীরা এদের বীরত্বের জন্য রাজার ন্যায় সম্মান করে। ফাঁসির সময় কখনও কখনও কয়েদীদের ঘাতকদের সাহায্য করবার জন্য আহ্বান করা হয়। এমন কি, যারা জল্লাদদের সাহায্য করে তাদের মেয়াদেরও কিছুদিন মকুব করা হয়। কিন্তু তা সত্বেও কোন অপরাধীই এই বিষয়ে তাদেরকে সাহায্য করতে রাজি হয় না। খুনী ডাকাতদের প্রতি অপরাধীদের অবিচল ভক্তিই এর কারণ। এই খুনে এবং ডাকাতদের পরইসিঁদেল চোর বা বারগ্লাররা সম্মান পায়। এই সিঁদেল চোরদের পর সম্মান পায় যে সকল চোর রাস্তা থেকে হার প্রভৃতি ছিনিয়ে নেয়। অপরাধী-সমাজে ছিঁচকে চোর এবং ঠগীদের স্থান সবার নিম্নে। আমি একজন তালাতোড়কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সে হাওড়ার অমুক চোরকে চিনে কি'না। প্রত্যুত্তরে তালাতোড় চোর বিরক্তির সহিত বলেছিল, 'না না। ওতো ছিঁচকে। ওদের সঙ্গে আমরা মিশি না।' এইসকল শ্রেণীর অপরাধীই [হিন্দিতে এরা বলে—ই তো বহুত ছোটা কাম] নারীর উপর তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অত্যাচারীদের অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করে। বলাৎকারক বলে কাউকে জানতে পারলেই অন্যান্য অপরাধীরা তাদের প্রায় মারধোর করে থাকে। অপরাধী-সমাজে বলাৎকারকদের কোনও রূপ সম্মান-জনক স্থান নেই। প্রকৃত অপরাধীদের সম্বন্ধে এ কথা বিশেষরূপে প্রযোজ্য। ভারতীয় অপরাধী-সমাজ সম্বন্ধে নিম্নের বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।

"কোনও এক ব্যাপারে লিপ্ত থাকায় আমি কয়েক বৎসর জেলে থাকি।

একদিন জেলের একটি উন্মুক্ত স্থানে একজন খুনে ডাকাতের সহিত আমি কথোপকথন করছিলাম। হঠাৎ আমি লক্ষ্য করলাম, সে ক্ষিপ্ত হয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। সেই সময় সামনে দিয়ে একজন ছিঁচকে চোর যাচ্ছিল। খুনে ডাকাতটি তার গালে বিরাশি সিক্কার একটা চড় কসিয়ে দিয়ে বললো,—'এঁ্যা! আমি একজন খুনে ডাকাত, বারো বছর আমি জেলে আছি। তুই বুক চিতিয়ে আমার সামনে দিয়ে যাচ্ছিস্!' এই সময় একজন সিঁদেল চোর সেখানে এসে দাঁড়াল। খুনে ডাকাতটিকে নমস্কার জানিয়ে সে বলল,—'হুজুর! দিন বেটাকে আরও ঘা কতক। ছিঁচকে বেটার বড্ড আস্পর্ধা হ'য়েছে।' এতক্ষণে আসল বিষয়টি আমার বোধগম্য হয়। ভারতীয় অপরাধী-সমাজে এইরূপ জাতিভেদের প্রভাব দেখে আমি সবিশেষ আশ্চর্যান্বিত হই।"

এই সম্বন্ধে অপর আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। কিছুকাল পূর্বে কোনও একটি ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থাকায় কোনও এক ভদ্র যুবককে হাজতে পাঠান হয়। হাজত থেকে বেরিয়ে এসে আমার নিকট সে এইরূপ একটি বিবৃতি দেয়। বিবৃতিটি নিম্নে তুলে দেওয়া হ'ল।

"হাজতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই অনেকগুলি পুরান চোর আমাকে ঘিরে দাঁড়ায়। তাদের সকলেরই বিশ্বাস ছিল যে, আমি বহু সহস্র টাকা মেরে সেখানে এসেছি। তারা অযাচিতভাবে আমাকে অনেক উপদেশ দেয় এবং পুলিশের কাছে কোনওরূপ স্বীকারোক্তি করতে এরা আমায় মানা করে দিয়ে জেলের পথ সুগম না করার জন্য তারা আমাকে সাবধান করে দেয়। আমি জানাই যে, তাদের এই সব ধারণা ভুল। কিন্তু তারা তা বিশ্বাস করে না। আমি সকলের দর্শনীয় বস্তু হয়ে উঠি। একজন এগিয়ে এসে বলে—'থোড়া পা দাবায়গা হুজুর? আপ্ বড়ি ঘরকো লেড়কা। কয়রোজ আপ্‌কো বহুৎ তখলিফ্ হোগা।' এদের মধ্যে একজন রাস্তার চোর ছিল। আলাপ করে জানতে পারি যে তার কাজ হচ্ছে হার ছিনিয়ে নেওয়া। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে কখনও কোনও বাড়ি থেকে চুরি করেছে কিনা। উত্তরে সে বলল —'না, হুজুর! ওসব বড় ছোট কাজ। ধরা পড়ে যাবো। আর লোকে মনে করবে যে আমি ঘটি-বাটি চুরি করতে গিছলাম। এতে আমার ঝুটমুট্ বদনাম হতে পারে।' সে আরও বললে যে, জুতা-চোররা তাদের সমাজের সোপানের সর্ব নিম্ন ধাপের মহাঘৃণ্য মানুষ। তাই এক জুতা-চোরও অন্য জুতা-চোরের কাছে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করে না। তাই—যেখানে এক জুতা-

চোর কাজ করে সেখানে অন্য জুতা-চোর জানা-জানি হওয়ার ভয়ে আসে না। অপরাধীদের ক্লাব-ঘর যথা,—চণ্ডুখানা, বেশ্যাবাড়ি প্রভৃতিতে এরা ঢুকতে পারে না। কোনও মহা হুল্লোড়ে এদের নিমন্ত্রণ হয় না।
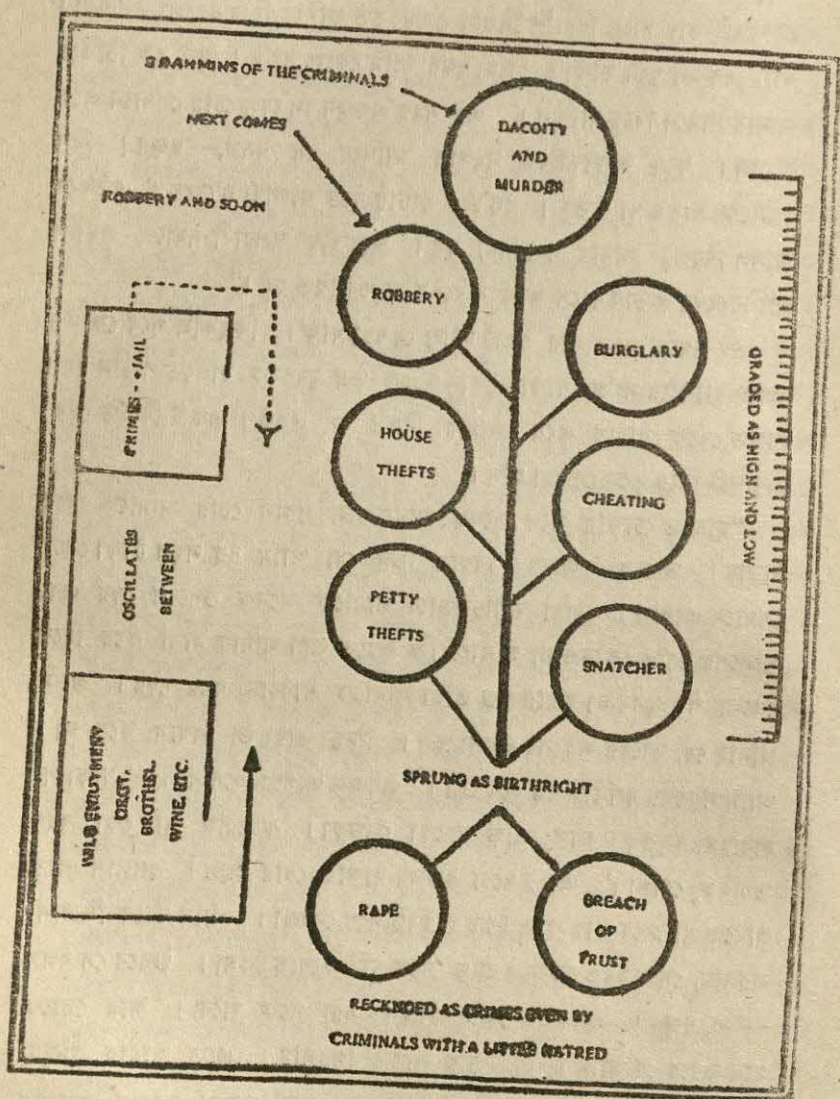
এই চোরটি চুরি করার কায়দা-কানুন সম্বন্ধে আমাকে অনেক গল্প করে ; এবং সে তার গালের দুই কষির মধ্যে দুইটি বড় বড় থলি দেখায়। গালের এই

থলি দুইটির মধ্যে সে সাময়িক ভাবে দ্রব্যাদি লুকিয়ে রেখে থাকে। গালের মধ্যে এই সব থলি চুণ মাখানো নুড়ির সাহায্যে তারা নিজেরাই তৈরি করে। এদের কেউ কেউ আবার ছোট ছোট আনি, দুয়ানি গিলে ফেলে সেগুলি পরদিন বাহ্যের পর বিষ্ঠা খুঁটে বার করে নেয়।"

এই ধরনের জাতিভেদ এদেশে আমি [প্রকৃত] অভ্যাস-অপরাধীদেরই মধ্যে অধিক দেখে থাকি। [প্রকৃত] স্বভাব-অপরাধীরা কিন্তু এইসব জাতিভেদের ধার দিয়েও যায় না। অপরাধ নিয়েই অপরাধী-সমাজ তৈয়ারি। কিন্তু অপরাধী-সমাজেও আবার অপরাধ আছে। অপরাধীদের কাছে একমাত্র অপরাধ হচ্ছে বিশ্বাসঘাতকতা এবং বলাৎকার। [বিশ্বাসঘাতকতার জন্য এদের মধ্যে ছুরি মারামারি হয়।] আমি বহু বৎসর যাবৎ বহু ভারতীয় অপরাধীর রীতি-নীতি সাক্ষাৎভাবে অবলোকন করে এই সত্যে উপনীত হয়েছি। এই কারণে এদেশের হাজতে কোনও বলাৎকারক আসামীকে আজও পুরানো পেশাদারী চোরদের সহিত রাখা যায় না। কারণ পুরানো চোররা কাউকে বলাৎকারক-রূপে জানতে পারলে প্রায়ই মারধর করে থাকে। এদেশের এক-প্রকার ডাকাতির সহিত বলাৎকার অপকার্য অবশ্য দেখা গিয়েছে। এর কারণ এই যে, এই শ্রেণীর ডাকাতরা প্রায়ই প্রাথমিক অপরাধী হয় এবং এদের ব্যক্তিত্ব থাকে সাধারণ মানুষের ন্যায়। কিন্তু এদেশের বহু তালাতোড়, চোর, প্রবঞ্চক প্রভৃতি অতিদক্ষ অপরাধীরা প্রায়ই ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনসহ প্রকৃত অপরাধী হয়ে থাকে। এইজন্য এরা বলাৎকার এবং বিশ্বাস-ঘাতকতাকে সমভাবে ঘৃণা করে। এই উভয় শ্রেণীর অপরাধীরাই এই বিশ্বাস-ঘাতকদের অত্যধিকরূপে ঘৃণা করে। বিশ্বাসঘাতকরা এদের উভয়ের কাছে সর্বদাই বধ্য ও শাস্তিযোগ্য। প্রকৃত পেশাদারী অপরাধীরা অপকর্মকে পেশা বা ব্যবসা মনে করে। এইজন্য কর্মস্থলে কোনও প্রকার নারীঘটিত বেল্লিকী কার্যে প্রশ্রয় তারা কখনও দেয় না। স্বভাব-অপরাধীরা প্রায় আদিম সমাজের মত হয়ে থাকে। এইজন্য তাদের ধর্ম-বিশ্বাসও আদিম সমাজের অনুরূপ। সকল দেশের স্বভাব-অপরাধীরা প্রায় এক প্রকারেরই হয়ে থাকে। কিন্তু বিভিন্ন দেশীয় ধর্ম-বিশ্বাস সেই সেই দেশীয় অভ্যাস-অপরাধীদের বিশেষরূপে প্রভাবান্বিত করে। এদেশের অনেক ডাকাতদলকে অপকর্মের পূর্বে কালীপূজা করতে দেখা গেছে। অনেক অপরাধীকে সফলতার জন্যে ঠাকুর-দেবতার কাছে মানত করতে কিংবা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতেও দেখা গেছে।

তাদের অন্তর্নিহিত নৈতিক অসাড়তা এবং স্বার্থপরতার জন্যেই তারা ঈশ্বরকেও তাদের অপকর্মের সহিত জড়াতে দ্বিধাবোধ করে না। কারো কারো আবার ধারণা হয় যে, অপরাধীদের ঈশ্বর এবং নিরপরাধদের ঈশ্বর—দু'জন আলাদা ঈশ্বর।

এদেশে আবার এমন অপরাধীরও সন্ধান মিলে যারা অপরাধ করে বটে,কিন্তু তাদের সেই অপকর্মের জন্যে সব সময়ই তারা শাস্তির প্রতীক্ষা করে। কোনও এক ভারতীয় অপরাধীর ধারণা হয়, তাকে মিথ্যে করে জাল মামলাতে ফাঁসান হয়েছে। কিন্তু এজন্য তাকে কিছুমাত্র দুঃখিত বা ক্রোধান্বিত দেখা যায় না। এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে সে বলে, "দেখুন, এই মামলায় আমাকে মিথ্যে জড়ান হয়েছে বটে, কিন্তু এর পূর্বে এমন অনেক অপরাধ আমি করেছি যার জন্যে আমার কোন সাজা হয় নি। যাই হোক অল্পের মধ্যে দিয়েই আমার পাপটুকু ক্ষয় হয়ে গেল।' এই ধরনের অপরাধীরা সর্বদাই শাস্তির আশঙ্কা করে এবং সেই জন্য তারা প্রস্তুতও থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সহজাত অপস্পৃহার কারণে তারা বারেবারে অপকর্মই করে থাকে। এদের দৈহিক পীড়ন করলে এরা চেঁচায় ও গালি দেয়, কিন্তু এরূপ ব্যবহার তারা করে তাদের দৈহিক পীড়নজনিত বিরক্তির জন্য। দৈহিক পীড়নের অবসান হওয়া মাত্র এরা বেশ নিশ্চিন্ত ও প্রফুল্ল হয়ে উঠে। এরা মনে করে যে, এদের যা কিছু প্রায়শ্চিত্ত বাকি ছিল তা তাদের দৈহিক পীড়নের উপর দিয়ে কেটে গেল। ভারতীয় প্রাথমিক অপরাধীদেরই মধ্যে এরূপ মনোবৃত্তি বিশেষরূপে দেখা যায়।

বিভিন্ন অপরাধীদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাস দেখা গেলেও কোন কোন অপরাধীদের—বিশেষ করে প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে ধর্মাধর্মের জ্ঞান লেশমাত্রও থাকে না। অভ্যাস-অপরাধীদের এই ধর্মবিশ্বাস ব্যক্তিগত ব্যাপার। তার সঙ্গে গোটা অপরাধী-সমাজের কোনও সম্বন্ধ নেই। কারণ প্রকৃত অপরাধীদের দলগুলি দলের জন্য জাতিধর্ম নির্বিশেষে লোক সংগ্রহ করে। এদের দলগত ধর্ম বলতে একমাত্র অপকর্মকেই বুঝায়। এই দিক দিয়ে এরা এক ধর্মাবলম্বী ও এক জাতি। অপরাধী সমাজ একমাত্র বলাৎকার, অপকর্ম ও বিশ্বাসঘাতকতাকেই অপরাধ বলে স্বীকার করে।

এই বিশ্বাস ঘাতকতা অপরাধীদের চক্ষে একটি ক্ষতিকর অপরাধ। কোনও শান্তিরক্ষক যদি কোনও দাগী চোরকে মিথ্যে কেসে ফাঁসিয়ে জেলেও পাঠায় তা সত্ত্বেও সে সেই শান্তিরক্ষকের প্রতি কোনওরূপ বিদ্বেষ

পোষণ করে না এবং অপরাধীটি সেটা তার এক স্বাভাবিক পরিণতি বলে মনে করে। কিন্তু সেইশাস্তিরক্ষকটি যদি তার কাছ থেকে ঘুষ খেয়ে পরে আবার তাকে পীড়ন করে তা'হলে প্রকৃত অপরাধীরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে তাকে গালিগালাজ করে। এমন কি, তাকে সে এ'জন্য ছুরিকাঘাত করলেও করতে পারে। কোনও সাক্ষী এদের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দিলেও এরা ক্রোধান্বিত হয় না এবং নির্বিকারচিত্তে তাদের কাণ্ডকারখানা তারা উপভোগ করে। এইরূপ ক্ষেত্রে আমি এদের কাউকে উপহাস কার বলে উঠতে শুনেছি, 'বাঃ বাঃ! বেশ! গাইছো ভালোই।' কিন্তু সত্যি সাক্ষীও যদি তাদের নিকট থেকে ঘুষ নিয়েওতাদের বিরুদ্ধে সত্য কথা বলেতা'হলে এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য এদের তারা শাস্তি দেয়। এরূপ বিশ্বাসঘাতকতার জন্য এদের নিজেদের মধ্যেও প্রায়ই খুনখারাপি হয়। এই বিশ্বাসঘাতকতা নিবারণের জন্য এরা গুপ্তচর নিযুক্ত করে। প্রকৃত অপরাধীদের কাছে কারাজীবন একটি অতি সাধারণ ব্যাপার। এইজন্য তারা কোনও অবস্থাতেই ক্রুদ্ধ বা ক্ষুব্ধ হয় না। এইজন্য জেল থেকে বেরিয়ে এসে ভারতীয় অপরাধীকে পুলিশ অফিসারকে সেলাম করতে দেখি। এইখানে ভারতীয় অপরাধীদের এবং য়ুরোপীয় অপরাধী-দের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ দেখা যায়। কলিকাতার কয়েকটি কনস্টেবল স্ট্যাবিঙ কেসের তদন্তকালে এই সত্যটি আমি বিশেষরূপে অবগত হই। এই ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে পয়সা বা ঘুষ খেয়েও ঐ সকল অপরাধীদের ধরার জন্যই তারা ছুরি-কাহত হয়েছিল। পয়সা বা ঘুষ না খেয়ে এদের যারা তাদের উপর অহেতুক উৎপীড়ন করেছে তাদের কিন্তু প্রকৃত অপরাধীরা সুবিধা পেয়েও কোনও ক্ষতি করে নি। * কারণ তারা মনে করেছে যে তারা এতদ্বারা তাদের কর্তব্য কর্মই করেছে। [ইহা অবশ্য সকল অপরাধীর সম্বন্ধেই প্রযোজ্য নহে।] প্রকৃত অপরাধীদের এই স্বভাব সম্বন্ধে নিম্নের বিবরণটি প্রণিধানযোগ্য।

"ছুটি নিয়ে মোটর বাইকে দেশে যাচ্ছিলাম! টিটাগড়ের নিকট এক জায়গায় এসে ধাক্কা খেয়ে সাইকেলটা বিগড়ে গেল। আশে-পাশে কুলি মজুরের ভিড় জমে গেছে। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম পথিপার্শ্বের একটা মাংসের দোকান থেকে মাংস-কাটা ছুরি হাতে জোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ বদমায়েস গুণ্ডা নেমে আসছে।

---

* প্রহারে এরা কখনও কখনও বিরক্ত এবং ক্রুদ্ধ হলেও দৈহিক অসাড়তার জন্য প্রকৃত অপরাধীরা কখনও কষ্টবোধ করে না] বরং এতে তারা খুব আরাম বোধ করে বহু ক্ষেত্রে খুশি মনে নীরব থেকেছে।

লোকটাকে বহুকষ্টে আমরা শায়েস্তা করি। তাকে আমরা জেলেও পাঠাই। শেষে ব্যতিব্যস্ত হয়ে লোকটা কলকাতা ছাড়ে। এই বেপোট জায়গায় তাকে দেখে আমি শিউরে উঠলাম। ভাবলাম দিল বুঝি সাবড়ে। অপরাধীটি কিন্তু আমাকে দেখে সেলাম জানিয়ে বলল, 'কেয়া বাবুসাহেব! আচ্ছা হায়?' উত্তরে আমি বললাম, 'আউর আপ্, বালবাচ্ছা?' অপরাধীটি জিজ্ঞাসা করল— 'সটিনবাবু জিন্দা হায়?' উত্তরে আমি বললাম, 'উ ত' বদ্‌লি হো গিয়া হায়। আপ্ চলিয়ে না আভি লোটকে।' অপরাধীটি উত্তর করল, 'নেহি হুজুর, আপ্‌লোক বহুত জুলুম কিয়া। হাম্ ইহিপরই আচ্ছা হায়।' এর পর অপরাধীটি নিজেই মিস্ত্রি ডেকে এনে আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে। শুধু তাই নয়। সে আমাকে পুনঃ পুনঃ আদাবও জানায়।"

প্রকৃত অপরাধীরা শেষের দিকে কি ভাবে জীবনধারণ করে তা নিম্নের উক্তিটি থেকে বুঝা যাবে। এদের ব্যক্তিত্বের আমূল পরিবর্তনের জন্যই এইরূপ হয়ে থাকে। বহু প্রকৃত অপরাধীর জীবনী পর্যালোচনা করে আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি।

'পৃথিবী তাদের কাছে বারেক কারাগমন এবং বারেক বেশ্যা-সম্ভোগ ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থাৎ পৃথিবীতে আসার তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য কিছুদিন বেশ্যা-সম্ভোগ, মদ্যপান ও জুয়াখেলার পর কিছুদিন কারাবরণ করা। তাদের কারাবরণ একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ও সাধারণ ব্যাপার। মুক্তি বা স্বাধীনতাকে তারা তাদের ছুটির দিন মনে করে। তাই এই দিন কয়টিকে তারা উপভোগ করে। সেই সঙ্গে তারা খায়দায় ও স্ফূর্তি করে। নাবিকেরা যেমন তাদের আট মাসের উপার্জিত অর্থ তিন দিনেই শেষ করে, সেইরূপ প্রকৃত উৎকট অপরাধী মাত্রেই অপকর্মের পরদিনই তা ব্যয় করে দেয়। এরা এদের এই ছুটির শেষ দিনটির জন্য উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করে। তারা জানে তাদের ছুটির দিন কয়টি একদিন শেষ হবেই এবং শীঘ্র তারা ধরা পড়ে জেলে যাবে। আমার মতে এইরূপ ধারণা নিয়েই তারা নিয়ত বাস করে।"

এইরূপ মনোবৃত্তি বিশেষ করে আমরা প্রকৃত বা উৎকট অপরাধীদেরই মধ্যে দেখে থাকি। কোনও কোনও অপরাধী জেল থেকে বার হয়ে পুনরায় অপরাধ করে, কেবলমাত্র জেলে ফিরে আসবার জন্যে। প্রাথমিক অপরাধীরা সম্ভবতঃ এইরূপ মনোবৃত্তির পরিচয় দেয় না। বরং তারা প্রাণপণে কয়েদকে এড়িয়ে কাজ চলবার চেষ্টা করে থাকে।

অপরাধীরা সমাজের মধ্যে পরগাছা-সমাজ। এ কথা আমি পূর্বেই বলেছি। মানুষের দেহ থেকে প্রতিদিন যেমন কিছু কিছু ক্ষয়িত অংশ বার হয়ে যায়, তেমনি যুগ যুগ ধরে সভ্য সমাজের নষ্ট অংশসমূহ সমাজ হতে বার হয়ে এসে অপরাধী-সমাজের সৃষ্টি করে। এই কারণে প্রতিদিন সভ্য সমাজ হতে কতিপয় পুরুষ এবং কতিপয় নারী বেরিয়ে এসে যথাক্রমে চোর ও বেশ্যা হয়। সভ্য সমাজের প্রারম্ভ হ'তে আজ পর্যন্ত সকল দেশের পক্ষে এই বিশেষ সত্যটি প্রযোজ্য। দেশ বিশেষের পরিস্থিতি ও সমাজ-ব্যবস্থা অনুযায়ী ও দেশ ভেদে এদের সংখ্যা কম বা বেশি হয়।

মধ্যযুগের কঠোর শাসন প্রকৃত অপরাধীদের প্রারম্ভেই বিনষ্ট করত। গ্রাম বহুল পৃথিবীর মধ্যযুগীয় সভ্য মানুষ প্রকৃত অপরাধীদের মানব-দানব মনে করত। কখনও কখনও বা তারা তাদের শয়তান মনে করে নিহতও করেছে। ভারতের মধ্যযুগে স্বভাব-অপরাধী মাত্রই বধ্য ছিল। এখানে অভ্যাস-অপরাধী-দেরও সাধারণতঃ হাত কেটে দেওয়া হত। এসব কারণে মানুষ সাধারণতঃ অপরাধ-মুখি হতে বাধ্য হ'ত।

কেবলমাত্র প্রাথমিক অপরাধীরা গ্রামবাসীর চোখ এড়িয়ে কোনরূপে অব্যাহতি পেত ব'লে অনুমিত হয়। এই কারণে ঐ সময় গ্রামের মধ্যে তারা বাস করতে পারে নি, আজও তারা গ্রামের মধ্যে বাস করতে পারে না; বিশেষ করে এদেশে—কারণ ভারতীয় গ্রামবাসীরা নিরক্ষর হলেও শিক্ষিত। রামায়ণ, মহাভারত, যাত্রাগান, কথকথা ও পুতুল নাচ নিরক্ষর ভারতীয় গ্রামবাসীদেরও সুশিক্ষিত করে তুলে। বলা বাহুল্য যে, এদের নৈতিক শিক্ষার তুলনা হয় না।

শহরে চোর ও বেশ্যাদের খুঁজে পাওয়া শক্ত নয়। শক্তিশালী সমাজ-ব্যবস্থার অভাবে শহরের অপরাধীরা বহুগুণে নিরাপদ। গ্রামের কঠোর সামাজিক প্রতিক্রিয়া চোর ও বেশ্যাদের তৎক্ষণাৎ বিতাড়িত করে থাকে। এইজন্য গ্রাম্য বেশ্যা ও অপরাধীরা শীঘ্রই গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়। এরা গ্রামের শেষ সীমান্তে বা জঙ্গলে বাস করে কিংবা ভ্রাম্যমাণ স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতিদের কলেবর বৃদ্ধি করে। বর্তমান যুগে বড় বড় শহর সৃষ্টির সঙ্গে অপরাধীদের সকল অসুবিধা বিদূরিত হয়েছে। গ্রামবাসীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এরা বড় বড় শহরে এসে আশ্রয় নেয়। শহরের বস্তি, বস্তিবাড়ি ও পঙ্কিল [খোলার ঘরের] বেশ্যালয়গুলি ওদের একমাত্র নিরাপদ স্থান। বর্তমান যুগে বড় শহরগুলিকে আশ্রয় করে অপরাধী-সমাজ গড়ে উঠে। ক্রমবর্ধমান উদ্যোগ-শিল্পই এ'জন্য দায়ী। শহরের চণ্ডুখানা

ও জুয়ার আড্ডাগুলি এদের ক্লাবঘর এবং বস্তি-বাড়ি, বেশ্যালয়গুলি এদের বাসস্থান। শহরের এই সব আণ্ডার-ওআর্লড বা পাতালপুরীর সহিত শহরের সভ্য সমাজের কোন সংযোগ নেই। এ'জন্য গহন সুন্দর বনের ব্যাঘ্রকুলের ন্যায় প্রকৃত [উৎকট] অপরাধীরাও শহরের পাতালপুরী বা আণ্ডার-ওয়ার্লড সমূহে নিরাপদে বাস করে।

প্রাথমিক অপরাধীরা কিন্তু পূর্ব যুগের মত আজও সভ্য মানুষের সহিতই বাস করে। এরা একদিক দিয়ে যেমন সভ্য মানুষের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে, তেমনি অন্যদিকে থেকে এদের কেউ কেউ প্রকৃত অপরাধী-সমাজের সহিতও যোগাযোগ রক্ষা করে। এদের কেউ কেউ পরিশেষে প্রকৃত অপরাধীদের পর্যায়ভুক্ত হয়ে 'আসলি শেয়ানাদের' সহিত বেমালুম মিশে যায়। সভ্য সমাজের তখন আর এরা কোনও ধারই ধারে না।

কলিকাতার পাতালপুরী অর্থাৎ কলিকাতার বস্তি, বস্তি-বাড়ি অগণিত বেশ্যালয়, চণ্ডুখানা ও জুয়ার আড্ডাসমূহ সম্বন্ধে এইবার কিছু বলা যাক। কারণ এই সকল স্থানে মুহুর্মুহু আনাগোনা করে অসংখ্য অপরাধীর জীবনী পর্যালোচনা করে আমি যা জেনেছি বা বুঝেছি তাই আমি আমার এই থিসিসে পণ্ডিতমণ্ডলীর ও জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে লিপিবদ্ধ করছি। এই সব পাতালপুরী বা আণ্ডার-ওয়ার্ড কেবলমাত্র অপরাধীদের আশ্রয়স্থল নয়। এইগুলি বিবিধ অপরাধীদের জন্মস্থানও বটে। আণ্ডার-ওয়ার্ড বা পাতালপুরীতে কোনওরূপ জাত-পচ্ [কমুন্যালিজম] বা জাত-বিচার নেই; তা জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের জন্যই উন্মুক্ত থাকে।

সম্প্রদায় মাত্রেই বহু সৎলোক থাকে। তারা বিভিন্ন গুণের অধিকারী হলেও স্ব স্ব সম্প্রদায় স্ব স্ব গুণ নিয়েই বিভোর থাকে। কিন্তু এই সব গুণের কোনওরূপ আদান-প্রদান হয় না। অর্থাৎ এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়ের কোনও গুণ বা ধর্মাচরণের ভাগী হয় না। গির্জা, মসজিদ প্রভৃতি সম্প্রদায় নির্বিশেষের জন্য খোলা নেই, কিন্তু বেশ্যালয়, চণ্ডুখানা, জুয়ার আড্ডায় সকল সম্প্রদায়েরই অবাধগতি। পাপের পথে জাত-পচ্ বা জাতি-বিচার নেই, কিন্তু ধর্মের পথে আছে। মোসলেম মেয়েরাধর্মাচরণ করে পবিত্র হারেমে, হিন্দু ললনারা দানধ্যান করে পর্দার আড়ালে—এক কথায় ধর্মাচরণের কার্য হয় লোকচক্ষুর অন্তরালে। এ বিষয়ে কেউ কারুর খবর রাখে না। কিন্তু পাপাচরণ সম্বন্ধে একথা বলা চলে না। মানুষ পরস্পরের ধর্মাচরণের খবর না রাখলেও পাপের খবর

রাখে। এই বিষয়ে তাদের মধ্যে বিশ্বমৈত্র দেখা যায়। বড় বড় শহরের বস্তি-জীবনই এর কারণ। গ্রামের অপরাধীরা গ্রাম থেকে বিতাড়িত হয়ে প্রথমে আসে মহকুমা বা জেলার ছোট ছোট শহরগুলিতে ও শিল্প-প্রধান অঞ্চলে। এর পরে অধিকতর ওস্তাদ হয়ে এরা কলিকাতার ন্যায় বড় বড় শহরে চলে এসে কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করে। শহরের বস্তিগুলিতে বিভিন্ন জাতীয় চোর-ডাকাত, ঠগ ও জুয়াচোর এক সঙ্গেই বাস করে। শুধু তাই নয়! এরা পরস্পর পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানও ঘটায়।

কলিকাতার বস্তিগুলি দুই প্রকারের হয়, যথা—খোলা-বস্তি ও বস্তি বাড়ি। কলিকাতার এক-পঞ্চমাংশ লোক বাস করে এই বস্তিতে। ২০ থেকে ৫০টি মাঠ কোঠা নিয়ে তৈরি এক-একটি বস্তি। এক-একটা মাঠ-কোঠায় ১০ থেকে ২০টি ঘর থাকে। এক-একটি পরিবার বাস করে এক-একটি ঘরে। বস্তিগুলিতে সর্বজাতীয় নর-নারীকেই এক সঙ্গে দেখা যায়। একটি ঘরে হয়ত আছে একজন বেশ্যা নারী। অথচ পাশের ঘরেই বাস করে একজন পুরান চোরের রক্ষিতা। গভীর রাত্রে এদের মিলন হয়। এদের পাশের ঘরে হয়ত আছে একজন ঝি। দিনে সে ঝি-গিরি করে, রাত্রে সে করে পেশা। এ'ছাড়া দুই-একজন সংগ্রাহিকাও এসে জুটে। অনেক সময় দুরবস্থায় পড়ে অনেক গৃহস্থ বধূও এখানে এসে বাস করে। এইরূপ কোনও এক গৃহস্থ বধুর বিবৃতি নিম্নে লিখে দিলাম। নিম্নের বিবৃতি দু'টি থেকে শহরের বস্তি-জীবন কিরূপে চোর এবং বেশ্যা সৃষ্টি করে তা বুঝা যায়।

"আমার স্বামী একজন গরিব শ্রমিক। দিন আনে দিন খায়। কোনরূপে তার সংসার চলে। আমার পাশের ঘরটায় থাকত একজন কুলটা নারী। তার আয়েসী স্বাধীন জীবন আমাকে প্রলুব্ধ করত। তার সাজগোজে আমি মুগ্ধ হই। তার কোনও কষ্টই নেই। তার চেয়ে অনেক সুন্দরী আমি অথচ ছেঁড়া কাপড়ে দিন কাটাই। আমি দিন-রাত শুধু হেঁসেলের দারোগাগিরি করি। পাশের ঘরে একজন বুড়ী থাকত। সে প্রায়ই আমাকে প্রলুব্ধ করত। স্বামীর বিরুদ্ধে সে'ই আমাকে উত্তেজিত করে। পরে জানতে পারি বুড়ী একজন সংগ্রাহিকা—কন্যা সংগ্রহের জন্য সেখানে সে ডেরা বেঁধেছিল। সে আমাকে লাখপতি হবার লোভ দেখায়। পরিশ্রান্ত স্বামী গৃহে ফিরে দেখে আমি বিরক্ত ও অমনোযোগী। ক্ষেপে উঠে স্বামী আমাকে প্রহার করে। এতে আমার বিরূপ মন আরও বিরূপ হয়। এই সুযোগে বুড়ী আমায় স্বামী ত্যাগের পরামর্শ দেয়। সে আমাকে

বহু জায়গায় লুকিয়ে রাখে, শেষে এক মাড়োয়ারীর কাছে গছিয়ে দেয়। এর পর অনেক হাঙ্গামা-হুজ্জুতের পর আমি স্বাধীন হই। পয়সা পেয়েছি, রোগ পেয়েছি, কিন্তু এতে আমি সুখ পাই নি, এতে আমি শান্তিও পাই নি। তাই মনে মনে এখন আমি মৃত্যুই কামনা করি।"

এই সকল সংগ্রাহিকারা যে শুধু খোলার বস্তিতেই ডেরা বাঁধে তা নয়, তারা বস্তি-বাড়িতেও আড্ডা গাড়ে। বস্তি-বাড়িগুলি প্রায়ই দুই বা তিনতলা কোঠা বাড়ি। এখানেও এক-একটি দরিদ্র পরিবার এক-একটি কামরায় বাস করে। অন্যান্য বহু অজ্ঞাতকুলশীল পরিবারের সহিত তারা এক কল-চৌবাচ্চা ও পাইখানা ব্যবহার করে। সংগ্রাহিকারা এইমত বস্তি-বাড়ির বধূদের ধীরে ধীরে লোভী করে তুলে এবং মুহুর্মুহু বাক্-প্রয়োগ দ্বারা স্বামীর প্রতি বিরূপ করে দেয়। এর পর কোনও এক ব্যক্তি দ্বারা আদালতে দরখাস্ত করিয়ে তাদের শুভাকাঙ্ক্ষিণীটি হাকিমকে জানায় যে মেয়েটির উপর অকথ্য অত্যাচার হচ্ছে। মেয়েটির উদ্ধারের জন্য আবেদন জানান হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট কানুনমত পরোয়ানা জারি করেন। পুলিশ মেয়েটিকে উদ্ধার (?) ক'রে আদালতে আনে। অনেক সময় সংগ্রাহিকার লোকই বধূর জামিন হয়। কোর্টে হাজির হওয়ার দিন পর্যন্ত সে কুশিক্ষাই পায় এবং তোতাপাখির মত বয়ান মুখস্থ করে। সাধারণতঃ মেয়েরা যার হেপাজতে থাকে তারই গ্রামোফন হয়ে উঠে—তার নিজের মনের মত লোক পেলে ত কথাই নেই। এই কারণে আদালতে যা হবার তাই হয়। আদালতে বধূটি অনেক কাল্পনিক অত্যাচারের কথা বলে। আদালত শুদ্ধ লোকের চোখে জল আসে। কিছুক্ষণ পরে হাকিম রায় দেন, "মেয়ে সাবাবিকা। যেখানে ইচ্ছা সে যেতে পারে।" অচিরে চোখের জল মুছে হাসতে হাসতে বধূটি বেরিয়ে আসে। কিন্তু সে কোনও দিন আর ঘরে ফেরে না।

এইখানে উপরোক্ত শ্রমিকটির একটি বিবৃতি নিম্নে তুলে দিলাম। এই বিবৃতিটি থেকে আরও একটি বিশেষ সত্য প্রতীত হয়। সত্যটি সম্বন্ধে এইরূপ বলা যেতে পারে যে, নারী সব সময়ই নারী এবং তাদের যা ভাল তা তারা কোনও অবস্থাতেই হারায় না।

"একদিন বাটী ফিরে দেখলাম স্ত্রী নেই। পাশের ঘরের পুরানো চোরটা ঠাট্টা করে জানাল—'পাখি পাইলে গেছে।' পরিশ্রান্ত আমি মাটিতে বসে পড়লাম। কাজকর্মে স্পৃহা হারালাম, মদ খেতেও শিখলাম। কিস্তিওয়ালার

কাছে টাকা ধার করলাম। টাকা শোধ করা অসম্ভব। শেষে চুরিও করলাম! চোখের সামনে দেখি স্ত্রী আমার রাজরাণী। সে ট্যাক্সি করে ঘুরে বেড়ায়। আমি অনাহারে মরি। তাই আমি চুরি করি। আমি বেশ্যাসক্ত হই। একদিন নেশার মাথায় স্ত্রীর ঘরেই ঢুকে পড়ি। আজ্ঞে না! চিন্তে পারি নি তাকে। হঠাৎ আমি শুনি স্ত্রীলোকটি বলছে,—'এতদূর অধঃপাতে গেছ, কিন্তু এতে যে অকল্যাণ হবে! বরং নাও দশটা টাকা, অন্য কারো ঘরে যাও। চলে যাও এখান থেকে। পাপের উপর আর পাপ আমার বাড়িও না।' চেয়ে দেখি আমারই স্ত্রী। আফিং খাই, কিন্তু মরি না। পরিশেষে চোরদের সঙ্গে ভিড়ে চোর হই। এখন আর আমার কোনও দুঃখই নেই। লজ্জা ও ভয়—আমার সব কিছুই আজ দূর হয়েছে।"

[বেশ্যা নারীরা প্রতি সন্ধ্যায় ওই রাত্রির উপপতির কল্যাণে সিঁদুর পরে। তারা ধূপ ধূনা দেয় ও পূজা আদি করে। ধর্ম তাদের ত্যাগ করলেও তারা ধর্মকে ত্যাগ করে না। তাদের বহুজনই পূর্ব সমাজে ফিরবার স্বপ্ন দেখে।]

উপরোক্ত তথ্য থেকে উন্নয়ন সংস্থার বস্তি উন্নয়নের অসারতা বুঝা যাবে। ওঁরা বরং পৃথক ফ্ল্যাট বাড়ী তৈরী করে ওদের মধ্যে পারিবারিক প্রাইভেসি বোধের সৃষ্টি করুন। ওদের পূর্বের আবাস বস্তিগুলি সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে দিলে ওরা আর সেখানে ফিরে আসবে না। পূর্বেকার মালিকদের মত সাধারণ সৌচাগার-গুলি পরিষ্কার করবার কেউ থাকবে না। দল বেঁধে 'কমন' বাথরুম ব্যবহার করার মত ওরা দল বেঁধে ট্যাক্স ও ভাড়াও কেউ দেবে না। পাকা শৌচাগারের বিষয় না ভেবে তাদের আলোক ও বায়ুহীন মাটির খুপরী ঘরগুলি ও পঙ্কিল সঙ্কীর্ণ অন্ধকার উপপথগুলির বিষয় ভাবুন। ইঞ্জিনিয়ারীঙ-এর সঙ্গে সমাজ ও মনোবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য বিদ্যাতেও মনোযোগী হন। [গভর্ণমেন্ট বস্তিকে দ্বিতল ও ত্রিতল করার অনুমতি দিলেও সাইড স্পেশের অভাবে সে প্ল্যান স্যাঙসন হবে না। গরীবি হটাও'র নামে গরীবি খোঁয়াড় গুলি অক্ষুণ্ণ রাখা এবং অপরাধীদের ব্রিডিং গ্রাউণ্ড নষ্ট না করা কর্জ্জ করা বিদেশী অর্থের অপচয়। ভদ্রলোকে বাধ্য হবে অর্থের অভাবে বস্তিগুলিতে আশ্রয় নিয়ে থাকে। ছেঁচা বাড়ীর শ্বেত পায়খানা গরীবের শ্বেত হস্তী। এগুলি উল্লেখ্য প্রবাদবাক্য। এগুলির মধ্যে জনগণের মানসিকতা ভালোরূপে প্রতিফলিত। রেশন সপের মত পাইখানাতে গণ লাইন দিতে কাউকে বাধ্য করবেন না। এক কল ও এক পায়খানা সকল পরিবারের ব্যবহার পারিবারিক প্রাইভেসি বোধের অন্তরায়।

অপরাধীদের সহিত বেশ্যাদের সম্বন্ধ চিরন্তন ও শাশ্বত যুগের—এ সম্বন্ধে পূর্ব পরিচ্ছেদগুলিতে বিশদরূপে আলোচিত হয়েছে। বেশ্যা ভিন্ন প্রকৃত অপরাধীদের একদিনও চলে না। অভ্যাস-অপরাধীরা সাধারণতঃ অভ্যাস-বেশ্যার সহিত এবং স্বভাব-অপরাধীরা সাধারণতঃ স্বভাব-বেশ্যাদের সহিত বাস করে। এই শেষোক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে নৈতিক এবং দৈহিক অসাড়তা অত্যধিক রূপে পরিদৃষ্ট হয়। এই স্বভাব-বেশ্যারা—নিম্নশ্রেণীর বেশ্যা এবং এরা পঙ্কিল ও জঘন্য বস্তিগুলিতে বসবাস করে। এদের দেহে অপরাধীদের ন্যায় উল্কিচিত্রও দেখা যায়। অপরদিকে অভ্যাস-বেশ্যারা সাধারণতঃ [বেশ্যাপল্লীর] কোঠা-বাড়িতে বাস করে। কোনও অপরাধীকে স্বভাব-অপরাধীরূপে জানা থাকলে তাদেরকে খোলার-বস্তিতে শান্তিরক্ষকদের খোঁজ করা উচিত। অপর দিকে অভ্যাস-অপরাধীরূপে কাউকে জানা থাকলে তাদেরকে সন্ধান করা উচিত কোঠা-বাড়ির বেশ্যাদের মধ্যে। এইরূপ অনুসন্ধানের জন্য গভীর রাত্রি এবং নিরালা দুপুরের সময়ই প্রশস্ত।

একজন অপরাধী কি প্রকৃতির অপরাধী তা তার দেহের উল্কিচিত্র হতেও জানা যায়। উল্কিচিত্র-ধারণ অপরাধী-সমাজের এক প্রিয় শখ। সৈন্য এবং আদিম মানুষের ন্যায় অপরাধীরাও উল্কি ভালবাসে। সৈন্যগণ সাধারণতঃ প্রিয়ার নাম, ফুল, নিশান, জাহাজের নঙ্গর প্রভৃতি উল্কির দ্বারা চিত্রিত করে। এই সব উল্কিচিত্রের মধ্যে কিছুটা আদর্শ ও সভ্যতার চিহ্ন দেখা যায়। কিন্তু অপরাধীদের দ্বারা চিত্রিত উল্কিচিত্রের মধ্যে কোনওরূপ আদর্শের সন্ধান পাওয়া যায় না। বরং ওসবের মধ্যে অধিক মাত্রায় নৈতিক অসাড়তার সন্ধান পাওয়া যায়। অপরাধীরা সাধারণতঃ সাপ, বাঘ, নারিকেল গাছ, রক্ষিতার নাম ইত্যাদি ধারণ করে। সবল অপরাধীরা এই সব চিত্র বক্ষ, হস্ত প্রভৃতি দেহের মুক্ত স্থানে ধারণ করে। খুব সম্ভবতঃ এতদ্বারা এরা ভীষণাকৃতি হতে চায়। নির্বল অপরাধীরা এই সব উল্কিচিত্র উরু, পৃষ্ঠ প্রভৃতি দেহের গোপন স্থানে ধারণ করে। আত্মগোপনের উদ্দেশ্যেই বোধ হয় এরা এইরূপ করে থাকে।

অপরাধী এবং সৈনিকদের উল্কি-চিত্র বিভিন্নরূপেরই হয়ে থাকে। কোনও এক সৈনিকের হস্তে আমি এইরূপ একটি উল্কি-চিত্র দেখি: হাতের উপরি অংশে একটি অশ্বের মুখ দেখা যায়। এই মুণ্ডের নিম্নেই একটি মদের গেলাস এবং তার নিম্নে একটি নারীর মুখ আঁকা দেখা যায়। এই নারীর মুখের নিম্নে আঁকা ছিল একটি চৌকা ঘর এবং ঐ ঘরেতে লেখা ছিল—'ম্যানস রুইন।' এই

ধরনের উল্কি-চিত্র আদর্শ ও সভ্যতার পরিচায়ক। এতদ্বারা সে বুঝাতে চেয়েছিল যে রেশ, জুয়া, মদ ও নারী পুরুষের সর্বনাশের পথ পরিষ্কার করে।

প্রকৃত অপরাধীদের উল্কিচিত্র সম্বন্ধে বলা হল। এইবার তাদের চাল-চলন, ব্যবহার ও সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। সবল এবং নির্বল এই দুই প্রকার অপরাধী সম্বন্ধে পূর্ব পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে। সবল অপরাধীরা সাধারণতঃ ডিঙ্গি দিয়ে চলে, নির্বল অপরাধীরা [যারা বলপ্রকাশ করে না] পায়ের চেটো মাটির উপর চেপে চলে। সবল শোণিতাত্মক অপরাধীদের [বলপ্রকাশক আঘাতকারী] চোখের পাতা অস্থির থাকে এবং তা মুহুর্মুহু উঠানামা করে। কিন্তু নির্বল অপরাধীদের চোখের পাতা প্রায়ই স্থির থাকে। নির্বল অপরাধীরা কিছুটা ভীরু প্রকৃতির হয়ে থাকে, কিন্তু সবল অপরাধীরা অতীব সাহসী, নিষ্ঠুর ও পেশীবহুল হয়ে থাকে। নৈতিক ও দৈহিক অসাড়তা, কর্মালসতা, অদূরদর্শিতা প্রভৃতি দোষ স্বভাব-অপরাধীদের মধ্যে যত অধিক থাকে, তত অধিকএইসব দোষ অভ্যাস-অপরাধীরমধ্যে থাকে না। অপরাধীদের এই আকৃতি ও স্বভাব থেকে অপরাধীদের শ্রেণী-বিভাগ নির্ণয় করা সহজ।

স্বভাব-অপরাধীরা সাধারণভাবে অভ্যাস অপরাধীদেরও এড়িয়ে চলে, কিন্তু অভ্যাস-অপরাধীরাবুদ্ধিমত্তায়শ্রেষ্ঠবিধায়তাদেরপ্রায়ই আয়ত্তে এনে তাদের দলের কাজে লাগায়। এই ধরনের মিশ্র দলের নেতৃত্বের ভার কিন্তু একজন অভ্যাস-অপরাধীই নিয়ে থাকে। সাধারণতঃ নির্বল অপরাধীদের এবং সবল অপরাধীদের দল পৃথক হয়ে থাকে। স্বভাব, মধ্যম এবং অভ্যাস-অপরাধীদের মধ্যে মিলন ঘটলেও উহাদের সবল এবং নির্বল অপরাধীদের মধ্যে মিলন প্রায়ই ঘটে না। এই কারণে সবল স্বভাব-অপরাধীরা মাত্র সবল অভ্যাস-অপরাধীদের সহিত মেশে এবং নির্বল [অবল প্রকাশক] অভ্যাস-অপরাধীরা মেশে নির্বল স্বভাব-অপরাধীদের সঙ্গে।

এই সব অপরাধীদের প্রতি সভ্য মানুষদেরও কিছুটা দুর্বলতা থাকে। মুখে তারা যা'ই বলুক না কেন! এই বিশেষ দুর্বলতা প্রত্যেক সভ্য মানুষের মধ্যেই পরিদৃষ্ট হয়। কোনও বন্দীকৃত খুনে ডাকাতের আগমন সম্বন্ধে জ্ঞাত হলে মানুষমাত্রই বিশেষ উত্তেজনা অনুভব করে এবং তাকে দেখবার জন্য রাস্তায় রাস্তায় ভিড় করে। সভ্য মানুষের এইরূপ ব্যবহার প্রখ্যাত অপরাধীদের প্রতি তাদের সহানুভূতি ও শ্রদ্ধারই পরিচায়ক। [কারণ—মানুষের প্রদমিত অপস্পৃহা।] এই মনোবৃত্তির কারণে বহুক্ষেত্রে এদের কেউ কেউ অকারণে

পুলিশ-হেপাজতী থেকে আসামীদের ছিনিয়ে নিয়েছে। মানুষের অন্তর্নিহিত অপস্পৃহাই এর জন্য বহুলাংশে দায়ী। প্রতিরোধ-শক্তির [ভয়-ভাবনার] কারণে এরা নিজেরা ইচ্ছা সত্ত্বেও অপরাধ করতে অপারক। তাই অপর ব্যক্তিকে তাদের প্রদমিত ইচ্ছাকে রূপ দিতে দেখলে তারা খুশি হয়। [মাইন্ড এপিজড্।] এই একই কারণে মানুষ ডিটেকৃটিভ্ উপন্যাস পড়তে এবং 'ক্রাইম-ড্রামা দেখতে ভালবাসে। সংবাদপত্রে কোনও দুর্ধর্ষ অপরাধীর কাহিনী প্রকাশিত হ'লে প্রায়ই দেখা যায়, শহরের বহু বালক সেই অপরাধীর আদর্শ অনুযায়ী অপরাধী হতে প্রয়াস পেয়েছে। মধ্যযুগে য়ুরোপীয় দেশে খুনে ডাকাতদের নগরের প্রকাশ্য স্থানে বধ করা হত। সেই সময় বহু নর-নারী বধ্যমঞ্চের চারিপাশে ভিড় করে স্ব স্ব রুমাল অপরাধীদের রক্তে রঞ্জিত করে নিত। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, এই সব রক্ত-রঞ্জিত রুমাল মঙ্গলকর দ্রব্য। এদেশেও অনেকে এই বিশ্বাসে চোরের বালা সংগ্রহ করে। তবে এই সব বিশ্বাসের মধ্যে কোনও যুক্তি নেই। প্রখ্যাত বা অখ্যাত যে কোনও অপরাধীই হোক না কেন! তাকে নিয়ে মাতা-মাতি করার কোনও অর্থ হয় না। অপরাধীদের মধ্যে কোনওরূপ প্রতিভার সন্ধান করা নিরর্থক, তারা নিছক রোগী ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে অপকর্মে জাতপচ বা ভেদাভেদ না থাকলেও প্রাথমিক অপরাধীরা ওইগুলিথেকে মুক্ত নয়। কারণ তারা সাধারণ মানুষের মত জনগণের মধ্যে বাস করে। বিভিন্নরূপ যৌনবোধের সহিত এই সকল অপরাধী-দের অন্তর্নিহিত অপস্পৃহার তুলনা করা চলে। এদের কেউ কেউ ব্যক্তি বা সঙ্ঘ বিশেষের বিরুদ্ধে অপকর্ম করে না। এদের কেউ কেউ একজনের পক্ষে অকৃত্রিম মহা উপকারী বন্ধু হলেও অন্যের পক্ষে হয়ত সেই একই ব্যক্তি হয় মহা শত্রু। এদের কারো কারো মধ্যে জাতপচ্ বা সাম্প্রদায়িকতা দেখা যায়। প্রকৃত অপরাধীরা দাঙ্গা-হাঙ্গামার সুযোগে সম্প্রদায়নির্বিশেষে লুটপাট করে। প্রাথমিক অপরাধীরা এইরূপ কখনও করে না। বরং এই সময় স্ব স্বসম্প্রদায়ের ধন-সম্পত্তি এরারক্ষাই করে থাকে। কোনও কোনও প্রাথমিক অপরাধী বরাবরই প্রাথমিক অপরাধী থেকে যায়। ভদ্রবংশীয় [গৃহস্থ] ঠগীদের এবং [সাধারণ ভাবে] ডাকাতদের সম্বন্ধে এই কথা বিশেষরূপে বলা চলে।

কোনও কোনও প্রাথমিক অপরাধী আবার অভ্যাসগত ভাবে প্রকৃত অপরাধী হয়ে উঠে। এই সময়ে এদের মধ্যে নানারূপ স্নায়বিক পরিবর্তনও ঘটে। প্রকৃত অপরাধীদের বন্য হিংস্র পশুর ন্যায় দূরে পরিহার করে গৃহস্থেরা

আত্মরক্ষা করতে পারে। কারণ প্রকৃত অপরাধীদের চিনে নিতে কারো অসুবিধা হয় না। কিন্তু প্রাথমিক অপরাধীরা নিরপরাধ মানুষের পরিচ্ছদে সমাজের মধ্যে বর্ণচোরা আমের ন্যায় বাস করে এবং তাদের প্রকৃত স্বরূপ চিনে নেওয়া শক্ত হয়। এই কারণে প্রকৃত অপরাধীদের অপেক্ষা তারা সমাজের অধিকতর ক্ষতি করতে সক্ষম হয়। প্রাথমিক অপরাধীদের অধিকাংশকেই আমরা ডাকাত, গুণ্ডা এবং ঠগীরূপে দেখে থাকি। এদের কাকেও চুরি-চামারিও করতে দেখা যায়, কিন্তু বড় বড় দুঃসাহসিক চৌর্যাদিতে তারা সাধারণতঃ লিপ্ত থাকে না।

অপরাধী-সমাজের সহিত বেশ্যা এবং ভিখারী সমাজের নিকট সম্পর্ক সম্বন্ধে পূর্বপরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে। অপরাধী-সমাজের সহিত বেশ্যা, ভিখারী ও হিজ্‌ড়া বা নপুংসক সমাজ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই কারণে অপরাধ-বিজ্ঞানের ছাত্র মাত্রেরই এদের সমাজগুলির সহিত বিশেষরূপে পরিচিত থাকা উচিত। অপরাধী-সমাজের সম্বন্ধে বিস্তারিতরূপে বলা হয়েছে। এইবার এই বেশ্যা, নপুংসক এবং ভিখারী সমাজ সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। অপরাধীদের সহিত এই বেশ্যাদের সম্বন্ধ চিরন্তন এবং শাশ্বত যুগের। এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। উত্তর কলিকাতার প্রখ্যাত কোনও এক খুনে গুণ্ডা বেশ্যাদের সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি করত: "ওদের ওপর কোনও অত্যাচার করিস নি। পৃথিবীতে ওরাই আমাদের একমাত্র বন্ধু। পুলিশের দল কুকুরের মত যখন আমাদের পল্লী থেকে পল্লীতে খেদিয়ে নিয়ে বেড়ায়, সেই বিপদ কালে মাত্র ওরাই আমাদের সাহায্য করে। ওরা আমাদের আশ্রয় দেয়। ওরা আমাদের আহার্য ও পানীয় দেয়। আর দেয় একজন সাময়িক পত্নী।"

সাধারণতঃ অভ্যাস-বেশ্যাগণ সমাজবদ্ধ অবস্থায় বাস করে। উচ্চশ্রেণীর অভ্যাস-বেশ্যাদের সম্বন্ধে ইহা বিশেষরূপে বলা চলে। কেবলমাত্র স্বভাব-বেশ্যা-গণই ইতস্ততঃ একক জীবন যাপন করে এবং সমাজের কোনও ধার তারা ধারে না। এই অভ্যাস-বেশ্যাগণ কলিকাতার সোনাগাছি, রূপাগাছি [রামবাগান] সিমলা ষ্ট্রীট্, ধুকুড়িবাগান, প্রেমচাদ বড়াল ষ্ট্রীট প্রভৃতি স্থানে, চিৎপুর রোডের কোনও কোনও অঞ্চলে এবং হাওড়ার ঘোড়াডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে বাস করে। এক-একটি দ্বিতল বা ত্রিতল বাটীর একটি বা দুইটি ঘর নিয়ে এক-একজন বেশ্যা নারী বসবাস করে। এক-একটি বাড়ি এক-একজন বাড়িওয়ালীর অধীনে থাকে। এইসব বেশ্যানারীরা তাদের স্ব স্ব বাড়িওয়ালীর কর্তৃত্ব স্বীকার করে এবং প্রায়শঃই তার নির্দেশ মত তারা কাজ করে। এই সব বাড়িওয়ালী

স্ব স্ব বাটীর প্রাথমিক শান্তিরক্ষার জন্য দায়ী থাকে। নিঃসহায় রূপজীবিনীদের দুর্দান্ত মাতাল বা দুর্বৃত্তদের হাত থেকে রক্ষাকরবার জন্য এই সব বাড়িওয়ালীরা সব সময়ই প্রস্তুত থাকে। এজন্য এরা অনেক সময় এক শ্রেণীর গুণ্ডাদের মাসিক মাহিনায় নিযুক্ত করে। এই সব গৃহস্থ গুণ্ডারা বেশ্যাপাড়ার সন্নিকটেই সপরিবারে বাস করে থাকে। প্রয়োজন মত বাড়িওয়ালী চাকর পাঠিয়ে তাদের ডাকিয়ে এনে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের বহিষ্কার করে দেয়।

মধ্য কলিকাতার নিম্ন-শ্রেণীর বেশ্যা-বাড়িগুলির সমাজ-ব্যবস্থাও অনুরূপ হয়ে থাকে। (f) এইখানেও এক-একটি বাড়ির জন্য এক-একটি পুরুষ ব্রথেল কিপার থাকে। এরা একাধারে এই সব বাড়িওয়ালীর দায়িত্ব বহন করে এবং তাদের নিযুক্ত গুণ্ডারূপেও কার্য করে থাকে।

মাতালের হুঙ্কার ও বীভৎস চীৎকার প্রায়ই বাড়িওয়ালীদের নিদ্রারব্যাঘাত ঘটায়। এর ফলে থেকে থেকে তাদের ত্রিতলের কামরা থেকে জিজ্ঞেস করতে শুনা যায়—"আর পারি না, বাবা! উজীর ঘরে বুঝি? যাব নাকি লা!" দ্বিতল বা ত্রিতল হতে উত্তর আসে: "না মাসী! ও কিছু নয়। তুমি ঘুমোও" ইত্যাদি।

বেশ্যা সমাজে তিন প্রকারের বেশ্যা দেখা যায় (১) বাঁধা, অর্থাৎ একজনের মাত্র রক্ষিতা। এরা প্রায়ই স্বামী-স্ত্রীর মতই বাস করে (২) টাইমের, অর্থাৎ যারা একজন, দুইজন বা তিনজন মাত্র উপপতি রাখে। একজন হয়ত আসে সোম ও মঙ্গলবার, অপর জন হয়ত আসে বুধ ও বৃহস্পতিবার এবং তৃতীয়জন হয়ত এই রূপ নিয়মে আসে শুক্র ও শনিবার। এরা যাকে তাকে বা অপরিচিত ব্যক্তিদের আদপেই আমল দেয় না। (৩). ছুটা। এরা নির্বিচারে যখন তখন এবং যাকে তাকে কক্ষে স্থান দেয়। এই তৃতীয় শ্রেণীর নারীদের কেহ কেহ রাস্তায় বা গবাক্ষ পথে দাঁড়িয়ে বাবুদের জন্য অপেক্ষা করে, কেহ আবার ১ম ২য় এবং ৩য় শ্রেণীর বেশ্যাদের ন্যায় আপন আপন কক্ষে অপেক্ষা করে।

এই বাড়িওয়ালী, পেশাদার গুণ্ডা এবং উক্তরূপ তিন প্রকারের বেশ্যা-নারী ছাড়া আরও চার বা পাঁচপ্রকারের জীব বেশ্যা-পাড়ায় বাস করে। যথা—গুর্গা বা কাহার, অর্থাৎ যারা চাকরের কাজ করে। এরা প্রয়োজন মত বাবুদের পান-সিগারেট যোগায়। এরা তাদের ফাই-ফরমাজ খাটে এবং অন্য সময় মনিবানীর গৃহকর্ম করে। (২) দালাল, অর্থাৎ যারা পর্দানশীন মেয়েদের জন্য বাবু সংগ্রহ

(f) পুলিশের সাহায্য না পাওয়ায় এরা কোন কোন সিনেমা গৃহের বালকদের মত বেতনভুক্ত গুণ্ডাদের দ্বারা এইরূপ প্রাইভেট পুলিস তৈরি করে আত্মরক্ষা করে।

করে আনে। (৩) বেশ্যাদের পুরুষ আত্মীয় বা ভাইবর্গ, যারা এদের দ্বারা প্রতিপালিত হয়। এদের উপপতিদের আগমনে এরা অন্তরালে অপেক্ষা করে। (৪) পীরিতের বাবু ; অর্থাৎ যারা রাত্রি বারটার পর বেশ্যাদের আপন প্রয়োজনে তাদের ঘরে রাত্রি যাপন করে। এই সকল বেশ্যাগণ বেশ্যা হলেও তারা নারী। এই কারণে সময় সময় তারাও কাউকে কাউকে ভাল বেসে ফেলে। ভালবাসার লোকদের তারা এই ভাবে প্রতিপালন করে। (৫) ছোট ছোট মেয়ে ; অর্থাৎ যাদের এরা ক্রয় করে বা সংগ্রহ ক'রে ভরণ পোষণ করে। পুলিশের ভয়ে এরা এই সব মেয়েদের গৃহহীন পুরান চোর বা কোন এক নির্বোধ ব্যক্তির সহিত নামে মাত্র বিবাহ দেয়। আসলে কিন্তু এদের দ্বারা ছোটবেলা থেকেই এরা বেশ্যাবৃত্তি করায়। নির্বিচার যৌন-মিলনের ফলে কৈশোর বয়সেই এদের নারীত্বের অবসান ঘটে। এই অবস্থায় এরা প্রায়ই চির বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হয়। বৃদ্ধ বয়সে অন্নসংস্থানের জন্যই বেশ্যারা এই সব কন্যা পালন করে থাকে।

উক্তরূপ সকল শ্রেণীর ব্যক্তিদেরই বাড়িওয়ালীর কর্তৃত্ব স্বীকার করতে হয়। দুপুরবেলা এইসব বাড়িওয়ালাদের পঞ্চায়েৎ বসে। এমন কি, তারা বেশ্যানারীদের অপকার্যের জন্য জরিমানা প্রভৃতিও করে থাকে। বড় বড় অপরাধে অপরাধী হলে তাদের পাড়া থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। একজনের [উপপতি] বাবু অপরজন ভাঙিয়ে নিলে বেশ্যা সমাজে উহা অপরাধরূপে স্বীকৃত হয়। এরূপ অপরাধের জন্য বাড়ীওয়ালী-পঞ্চায়েৎ বেশ্যা-নারীদের শাস্তি বিধান করে থাকে। এই বাড়ীওয়ালীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ একজনকে সমাজপতি-রূপেও স্বীকার করবার পদ্ধতি কোনও কোনও স্থানে প্রচলিত আছে। কোনও বেশ্যানারী মৃত হলে এই বাড়ীওয়ালীরা চাঁদা তুলে অপরাপর নারীদের সাহায্যে শব শ্মশানে এনে সৎকার করে থাকে। চাঁদা তুলে এদের দান-ধ্যান করতে দেখা যায়। এরা বারোয়ারী পূজা আদিও করে থাকে। অপরিণত বয়স্ক বালক-দের গৃহে স্থান দেওয়া বেশ্যানারীদের অপর আর এক অপরাধ। এজন্যেও এদের শাস্তি পেতে হয়। এদের কোনও বাবুকে অযত্ন করা বা ঠকানো বা তাদের দ্রব্যাপহরণ করাও ইহাদের নিকট একটি বিশেষ অপরাধ। পরস্পরের উপ-পতিকে ভাঙিয়ে নিজের ঘরে আনলে কিংবা পিতাকে স্থান দেওয়ার পর তার পুত্রকে ঘরে রাখলে উহা ওদের জঘন্য অপরাধ। (f)

এই বিশেষ সমাজ-ব্যবস্থা মাত্র অভাস ও মধ্যম-বেশ্যাদের মধ্যেই দেখা

(f) ওই সব অপরাধের গুরুত্ব মত বাড়ীউলী পঞ্চায়েত বিচার করে ওদের অর্থ দণ্ড করে।

যায়। স্বভাব-বেশ্যারা সমাজ বা ধর্মাধর্মের কোনও ধারই ধারে না। সাধারণতঃ এরা আবর্জনাপূর্ণ খোলার বস্তিগুলিতে বাস করে এবং অপরাধীদের দ্বারা প্রতিপালিত হয়। অ'গিস বা হুল্লোড় স্বভাব-বেশ্যাদের এক প্রিয় বস্তু। অপর দিকে অভ্যাস-বেশ্যারা একে ভয় এবং ঘৃণা করে। অভ্যাস-বেশ্যাদের নৈতিক অসাড়তা স্বভাব-বেশ্যাদের নৈতিক অসাড়তার তুলনায় অনেক কম। এই কারণে হুল্লোড় ত দূরের কথা! এরা একের অধিক পুরুষকে রাত্রে কক্ষে স্থান দিতেও নারাজ থাকে। এইজন্য এদের মধ্যে লজ্জা-সরমও দেখা যায়।

অ'গিস বা হুল্লোড় শব্দটি পূর্ব পরিচ্ছেদগুলিতে পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু কোনও স্থানেই এর প্রকৃত ব্যাখ্যা করা হয়নি। নিম্নের বিবরণটি হতে এর স্বরূপ সম্বন্ধে কিছুটা বুঝা যাবে।

"ধরুন নীচু ছাউনিওয়ালা অপরিসর একটি ঘর। বস্তিগ্রামের মধ্যকার এই বস্তি বাটীটির ঘরগুলি দিনে খালিই থাকে। কিন্তু গভীর রাত্রে এখানে পুরানো চোরদের আড্ডা বসে। অপরিসর গলির পথ দিয়ে মানুষ এখানে যাতায়াত করে। অপরিসর অন্ধকার গলির পথ—দিনের বেলাও সেখান দিয়ে লোক লম্ফ নিয়ে যাতায়াত করে। দুজন লোকের পক্ষেও পাশাপাশি পথ চলা অসম্ভব। ভাঙা জানালার নীচে একটা কলসী এবং কয়েকটি তাড়ির ভাঁড় ও গোটা দুই কেরোসিনের ডিবিয়া। এ'ছাড়া কয়েকটি দেশী ও বিলাতী মদের বোতলও সেখানে আছে। এখানে ওখানে দুই-একটা ছেঁড়া মাদুর ও চেটাই দেখা যায়। মাটির দেওয়ালে পাঁকাটির পেরেকের সাহায্যে টাঙান কয়েকটি সিনেমা নটীর ছবি। এই কাগজে-আঁকা মূর্তিগুলির উপরও দেখা যায় দংশন ও নখের দাগ।

গভীর রাত্রে এইখানে শুরু হয় পুরান চোরদের আকাজ্ক্ষিত মহাহুল্লোড়। ১০ বা ২০ জন বিভিন্ন বয়সের নর-নারীর সে এক বীভৎস তাণ্ডব। ৪৫ বৎসরের মাতার সহিত ১৭ বৎসরের কন্যাকেও সেখানে দেখা যায় একত্রে। মত্ত অবস্থায় হয়তো কোনও এক নারী তার পুং রাক্ষসের মাথায় বসিয়ে দিল একটা তবলা। পুং রাক্ষসটি প্রত্যুত্তরে তার মাথায় দিল বোতলের এক বাড়ি। গণ্ড দিয়ে হয়ত ব'য়ে পড়ল রক্ত। কিন্তু সেদিকে তার একটু মাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। জিহ্বা দিয়ে রক্তটুকু চকচক করে চেটে নিয়ে সে সোহাগভরে তার আততায়ী-কেই জড়িয়ে ধরে। অপর এক পুরুষ হয়ত অপর আর একটি নারীর ঘাড় দিল কামড়ে। প্রত্যুত্তরে নারীটি হয়ত তার চোখের মধ্যে আঙুল পুরে দিল।

ওদিকে মসীবর্ণা এক রাক্ষসী তার রাক্ষসের মুখে ধাঁই করে এক লাথি মারল। হয়ত তার একটা দাঁত ভেঙে পড়তে লাগল চাপচাপ রক্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও আহত ব্যক্তিটি কাপড় দিয়ে রক্ত মুছে তার আততায়িনীকেই আদর করে কাছে টেনে নিল।

অর্ধনগ্ন নর-নারীর এই গড়াগড়ি, কামড়াকামড়ি ও খিমচাখিমচির কোনও বর্ণনার সৎ-সাহিত্যে স্থান নেই। ইহার কদর্যতার ও বীভৎসতার কারণে অধিক বর্ণনা সম্ভবও নয়। এইখানে নারীরা নর-রাক্ষসদের অত্যাচার, উৎপীড়ন ও নিষ্পেষণ সহ্য করে বাধ্য হয়ে নয়। তারা তা সহ্য করে ইচ্ছা করে। দৈহিক অসাড়তার কারণে প্রতিটি খিমচানি ওদংশন থেকে এরা পায়অভূতপূর্ব আনন্দ। এই সময় এদের দেখলে মনে হয় এরা বীভৎস মাংসপিণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়। পৃথিবীতে যদি কোথাও নরক থাকে তো তা এইখানেই, এইখানেই, এইখানেই।"

সাধারণতঃ সবল প্রকৃত অপরাধীদেরই এইখানে অধিক সংখ্যায় দেখা যায়। এই হুল্লোড় স্থানের ন্যায় শহরের চণ্ডুখানাও অপরাধীদের একটি প্রিয় স্থান। সাধারণতঃ নির্বল অপরাধীদের এবং কোনও কোনও সবল অপরাধীদের এইখানে দেখা যায়। তবে উহারা সকলেই আদিম মনোবৃত্তি যুক্ত প্রকৃত অপরাধী। ছেঁড়া বালিশে মাথা রেখে এদের কেউ কেউ চোখ বুজে সন্ধ্যা, সকাল ও বৈকাল চণ্ডুর পাইপ টানে। কেউ কেউ আবার রাত্রের দিকে হুল্লোড়ে যোগদান করে। এইভাবে এদের পাপার্জিত সমুদয় অর্থ ব্যয়িত হয়ে শেষ হলে এরা অপকর্মের উদ্দেশ্যে পুনরায় রাস্তায় বেরোয়। পুরানো চোরদের ইহাই হচ্ছে রীতি। শেষ কপর্দকটি ব্যয়িত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কিন্তু এরা এই ভাবেই জীবন কাটায়।

এই বেশ্যাগণ সমাজের সমুদয় বিষ গলাধঃকরণ ক'রে সমাজকে পবিত্র ও অক্ষত রাখতে সাহায্য করে থাকে। পুরাকালে ইহা একটা সম্মানজনক পেশা ছিল। নগরে ধনী ব্যক্তিদের নৃত্যগীতাদি দ্বারা মনোরঞ্জন করবার জন্য এদের প্রয়োজন হতো। যুদ্ধ এবং রাজকার্যের ফাঁকে ফাঁকে এরা পূর্বকালে সেনানায়ক এবং রাষ্ট্র-ধুরন্ধরদের মন এবং দেহকে সতেজ রাখতে সাহায্য করে দেশের তথা সমাজের প্রভূত উপকার সাধন করেছে। সমাজের মধ্যে এরাই এই সময় কেতা-দুরস্ত থাকত। এজন্য আদব-কায়দা বা এটিকেট্ শিক্ষা দিবার জন্য অভিভাবকগণ নিজেরাই পুত্রাদিদের সঙ্গে করে ঐ সকল বেশ্যালয়গুলিতে বেড়াতে এসেছেন। নগর এবং গ্রামের সীমান্তে এই সকল রূপজীবিনীগণ

বসবাস করত। এদের প্রধানতম কাজ ছিল নৃত্যগীতাদি দ্বারা লোকের মনোরঞ্জন করা। সাধারণতঃ দেহ দান এদের রীতি ছিল না। এরা ছিল সে যুগের রূপশিল্পের পূজারী। এইজন্য এরা সম্মানও পেয়েছে প্রভূতরূপে। আজকালকার বেশ্যাগণ সম্বন্ধে কিন্তু এই কথা বলা চলে না। আজকালকার বেশ্যালয়গুলির সহিত বরং নরকেরই তুলনা করা চলে।

বস্তুতঃপক্ষে শিল্পের পূজারীদের কখনও মৃত্যু ঘটে না। এমন কি—এ যুগের বেশ্যানারীগণের মধ্যেও যাঁরা শিল্পের পূজারী হ'তে পেরেছেন, তাঁরা তাঁদের ঘৃণিত জীবন সত্ত্বেও লোক-সমাজে সম্মানিতই হয়েছেন। কিন্তু সাধারণ বেশ্যালয়গুলি সম্বন্ধে এই কথা বলা চলে না। এদের এখানে এসে মানুষ ভদ্রতা শেখে না। তারা এদের কাছ থেকে শেখে অশ্লীলতা। কিন্তু তা সত্ত্বেও এদেশের কোনও কোনও দূরাঞ্চলের এমন এক-একটি মূর্খ সম্প্রদায় আছে যাদের ছেলে-পুলেরা হাটবারের দিন হাটের বেশ্যালয়ে এসে আজও পর্যন্ত পূর্বপুরুষদের অনুকরণে কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত করে থাকে।

অপরাধী এবং বেশ্যা সমাজের কথা বলা হলো। এইবার ভিখারী সমাজের কথা বলা যাক। ভিখারী দুই প্রকারের হয় ; যথা,—অভ্যাসগত ও পেশাগত। এই পেশাগত ভিখারীদের নিয়েই ভিখারী-সমাজ গঠিত হয়েছে। বড় বড় শহর এবং তীর্থস্থানগুলি এদের ভরণপোষণ করে। ভিখারী থেকে হঠাৎ অপরাধী হয়ে উঠার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। ভিক্ষা না পেলে এদের কেউ কেউ গালিগালাজ করে। এমন কি, কাউকে কাউকে এ জন্যে বল প্রকাশ করতেও দেখা গেছে। এই ভিখারী-সমাজের স্থান, অপরাধী এবং নিরপরাধ সমাজের মধ্যস্থলে। এরা অপরাধীদের ন্যায়ই কর্মালস হয়ে থাকে। আমরা যেমন একক ভিখারী দেখে থাকি, তেমনি সমাজবদ্ধ ভিখারীও দেখে থাকি। এদের দলপতি থাকে। দলপতির অধীন ভিখারীরা সন্ধ্যার পর স্ব স্ব উপার্জিত অর্থ দলপতির নিকট জমা দেয়। দলপতি ঐ অর্থ অধীন ভিখারীদের মধ্যে সমান ভাবে বণ্টন করে দেয়। অবশ্য তা থেকে একটা বড় ভাগ সে নিজের জন্য সরিয়ে রাখে। আমি এরূপ একটি দলপতিকে জানতাম। সারাদিন তাকে পায়ে পুরু ন্যাকড়া জড়িয়ে ছিন্নবাসে ভিখারীদের সঙ্গে দেখা যেত, কিন্তু সন্ধ্যার পরই সে তার রক্ষিতার গৃহে ফিরে দামী "সোপের" সাহায্যে পরিষ্কার হয়ে সিল্কের পাঞ্জাবি পরে পাখার তলায় রাত্রি যাপন করত। এমন কি, তার সিনেমা দেখারও শখ ছিল। কলিকাতার স্থানে স্থানে এইরূপ ভিখারী-বস্তির অভাব নেই।

অনেকে আবার সপরিবারে শহরের ফুটপাতের উপর বসবাস করে। শহরে অপরাধীদের অনেকে রাত্রে এদের মধ্যে শুয়ে থেকে পুলিশের নজর এড়ায়। এমন অনেক ভিখারী আছে যারা এ বিষয়ে এদের সাহায্যও করে থাকে। পূর্বে এরা ছেলেগুলে চুরি করে এনে তাদের বিকলাঙ্গ করে ব্যবসায়ে লাগাত। এমন কি, এই সব ছেলেদের ছোট ছোট মানুষ-টানা গাড়ি করে জায়গায় জায়গায় বসিয়ে রাখা হ'ত। সুখের বিষয় এই প্রথা বর্তমান শতাব্দীতে প্রায় বিলীন হয়েছে। সর্দাররা এই সব ভিখারীদের ভিক্ষার এলাকা পর্যন্ত ভাগ করে দেয়। এদের ঝগড়াঝাটিও এরা মিটিয়ে দিয়ে থাকে। চোরেরা প্রায়ই এই বেশ্যা এবং ভিখারীদের মধ্যে আত্মগোপন করে। এইজন্য এই ভিখারী এবং বেশ্যাসমাজ সম্বন্ধে শান্তিরক্ষকদের অবহিত হওয়া উচিত। এমন বেশ্যাও আছে যাদের ঘরে কোনও এক দুর্দান্ত গুণ্ডা বা ডাকাত এলে তারা গর্ব অনুভব করে। শুধু তাই নয়, সে এজন্য অন্যান্য নারীর ঈর্ষারও কারণ হয়। ভিখারী সমাজেরও কোনও ব্যক্তি বড় চোর বা গুণ্ডা হলে ভিখারী সমাজও তাকে সম্মান দিয়ে থাকে।

এই বেশ্যা এবং ভিখারী-সমাজ সম্বন্ধে বলা হল। এইবার হিজ্‌ড়া বা নপুংসক সমাজ সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। নপুংসক বা হিজ্‌ড়ারাও দলবদ্ধভাবে বাস করে। মধ্য কলিকাতায় এদের নিজস্ব বস্তি আছে। কোনও কোনও স্থানে এরা এককও বাস করে। দৈহিক দুর্বলতার কারণে এদের অনেকেরই একজন করে পুরুষ রক্ষক থাকে। অনেকে স্বামী-স্ত্রীর মতই বাস করে। পুরানো চোরদের এদের রক্ষকরূপে দেখা গেছে। ইহা অপরাধীদের বিকৃত যৌনবোধের পরিচায়ক। অনেক অলস প্রকৃতির নিরপরাধ ব্যক্তিদেরও এদের রক্ষকরূপে দেখা যায়। এই হিজ্‌ড়া সমাজ সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে।

কোনও কোনও পূর্বকালীন অপরাধীদল তপ্ত শলাকা কিংবা উল্কি আদির সাহায্যে দলের প্রত্যেক ব্যক্তির দেহে একপ্রকার চিহ্ন অঙ্কিত করে দিতো। দলে ভর্তি হবার পর দলপতি নিজ হাতে এই কার্য সমাধা করতো। এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল দলের লোকদের দলত্যাগের কার্য হতে বিরত করা। ঐ সকল চিহ্ন থেকে দলত্যাগীকে ঐ ভীষণ ডাকাতদলের একজন সদস্যরূপে জনসাধারণ সহজেই চিনে নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবে। এই ভয়ে দলের লোকেরা কখনও দল ত্যাগ করতে সাহসী হতো না।

কোনও কোনও স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতি আছে যারা পুরুষদের দেহে কোনও বিশেষ প্রকার দল বা জাতিবাচক চিহ্ন ধারণ করে না, কিন্তু তাদের মেয়েরা ঐরূপ চিহ্ন ধারণ করে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দারোয়ালী কামীস নামক স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতির কথা বলা যেতে পারে। তারা তাদের নাকের বামাংশে ১ম চিহ্নের অনুযায়ী এবং তাদের প্রত্যেকটি চোখের কোণে ২য় চিহ্নের জাতিবাচক চিহ্ন ধারণ করে থাকে।

অপরাধীরা কোনও নূতন লোক অপরাধী-সমাজের অন্তর্ভুক্ত হলে অত্যন্ত খুশি হয়ে উঠে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এরা ট্যাঁক থেকে পয়সা খরচ করে নানারূপে এজন্য তাদের আপ্যায়িতও করেছে। নিম্নের বিবৃতিটি থেকে বিষয়টি সম্যকরূপে বুঝা যাবে।

"কোনও এক ব্যাপারে পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করে কয়েকদিন হাজতে রাখে। এই সময় ঐ হাজতে বহু সাধারণ অপরাধীও উপস্থিত ছিল। আমার সুন্দর ভদ্রজনোচিত দেহাবয়বের দিকে তারা কিছুক্ষণ মুগ্ধ হয়ে চেয়ে দেখে। এরপর এদের মধ্য থেকে একজন এগিয়ে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করে, 'কেয়া বাবুসাব্, আপ্ শুনতা লাখ রুপেয়া মার চুকা। ছিপাকে রাখনে শিখা তো? হাম্‌লোক বহুৎ খুশি হুয়া।' এবং তারপর তারা আমার পা দুটো তাদের কোলের উপর রেখে আমার সেবা করবার জন্য জিজ্ঞাসা করে, "কেয়া বাবুসাব্, তেনি পা আপকো দাবায়?"

এই অপরাধীরা নিজেদের দুই শ্রেণীর অপরাধীতে বিভক্ত করে থাকে, যথা,—সাধু চোর এবং অসাধু চোর। এই অসাধু চোরদের তারা বাটপাড় নামে অভিহিত করে থাকে। "চোরের উপর বাটপাড়ি" বাক্যটি এদেশের একটি প্রাচীন প্রবাদ বাক্য। অর্থাৎ যারা চোরদের নিকট থেকে চোরাই জিনিস চুরি করে কিংবা যারা নিজেদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতার কার্য করে তাদেরকে তারা অসাধু চোর বলে। নিজ ভাষায় তারা তাদেরকে লোচ্চা নচ্ছার এবং বাটপার বলে।

মঠবাসী সন্ন্যাসীদের [এক শ্রেণীর] অবিবাহিতদের ব্রহ্মচারী এবং স্ত্রী

পরিত্যাগীদের অধিকারী বলা হয়। তেমনি সংসারের সহিত সম্পর্কিত অপরাধীদের ঘরিয়ালা ও উহার সহিত সম্পর্ক-শূন্যদের শেয়ানা বলা হয়। বাদশাদের দেওয়ানী খাস ও দেওয়ানী আমের মত অপদলের আম মজলিস ও খাস মজলিস আছে। খাস-মজলিসে "শেয়ানা" না হওয়া পর্যন্ত ঘরিয়ালাদের প্রবেশাধিকার নেই।]

ভারতীয় অপরাধীরা তুকতাক প্রভৃতিতেও বিশ্বাসী। এইজন্য এদের কেউ কেউ ঘটনাস্থলে শিকড়, দড়ি, পাতা, সিঁদুর প্রভৃতিও ফেলে আসে। এদের প্রাথমিক অপরাধীরা বহু 'ধরা না পড়ার মন্ত্র-তন্ত্র'ও সৃষ্টি করে থাকে।

আমি বলেছি যে বেশ্যাসমাজের সঙ্গে অপরাধীদের শাশ্বত যুগের সম্পর্ক। এ বিষয় নিম্নশ্রেণীর বেশ্যাদের সম্পর্কে সর্বাংশে সত্য। প্রকৃত অপরাধীদের মত এরাও 'হাভনট' তথা সর্বহারা পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর বেশ্যারা বহু প্রাথমিক অপরাধীদের মত ধনীও হয়ে থাকে। এইজন্য এই ধনী বেশ্যারা বিবিধ শ্রেণীর অপরাধীদের শিকার তথা টারগেট হয়ে থাকে।

[পুলিশ এদের রক্ষণার্থে আগ্রহশীল না হওয়ায় সিনেমা মালিকদের গুণ্ডা দমনে বেতনভুক গুণ্ডা নিয়োগের মত এরাও আত্মরক্ষী প্রাইভেট পুলিশ তৈরী করেছে।] (f)

ভারতে প্রসটিটিউট ড্রাগীং মামলা একটি উল্লেখ্য অপরাধ। এখানে বিষ প্রয়োগে অচৈতন্য করে ওদের গহনা ও দ্রব্যাদি অপহরণ করা হয়। অন্যান্য সাধারণ অপরাধও উচ্চ শ্রেণীর বেশ্যাগৃহে হয়ে থাকে।

এজন্য প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রনিযুক্ত জনৈক বেশ্যাধিকর্তার [সুপারইনটেণ্ডেণ্ট] অধীনে বিশেষ রক্ষী বিভাগ ছিল। এরা বেশ্যাদের দ্বারা অতিথিদের এবং ঐ সকল অতিথিদের দ্বারা বেশ্যাদের সর্বপ্রকার ক্ষতি নিবারণ করতো। এই অধিকর্তা বেশ্যাদের আয় অনুযায়ী রাজকোষের জন্য আয়কর গ্রহণ করতো। পৃথিবীতে ইহাই সর্বপ্রথম আয়-কর বিভাগ। প্রাচীন ভারতীয় রূপজীবনীদের বিষয় মৎপ্রণীত পুলিশ কাহিনীতে [১ম খণ্ড] বিশদরূপে বলা হয়েছে।

"বারাণসী" নগরের সোমা নামে এক সুন্দরী বেশ্যা নারী উপপতিদের নিকট প্রতি রাত্রে সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করতো। ঐ রূপসী বেশ্যা নারী এক সুদেহী তস্করের প্রেমে পড়ে। সেই তস্কর তাকে ভুলিয়ে এক বাগান বাটিতে

(f) বেশ্যাদের বাড়ীউলী পঞ্চায়েতের অধীনে ওদের পল্লীর নিকটে ওদের বেতনভুক গৃহস্থ গুণ্ডারা বাস করে। আহ্বান আসা মাত্র ঐ প্রাইভেট পুলিশ সদলে তাদের সাহায্যে আসে।

এনে তাকে অচৈতন্য করে তার অলঙ্কার অপহরণ করে পালায়। [600 B'C] বারাণসীর অন্য এক সুদর্শনা বেশ্যানারী সুলতাকেও জনৈক দস্যু উপপতি সুবিধাজনক স্থানে এনে অচৈতন্য করে তার দেহথেকে যাবতীয় অলঙ্কার অপহরণ করে পালায়। ঐ সময় জনৈক বেশ্যা নারী তার ধনী বণিক উপপতিকে হত্যা করে তার সর্বস্ব আত্মসাৎ করেছিল।"

যে কোনও যুগের যে কোনও সমাজের বহুস্তর আছে। প্রতিটি স্তর পৃথক পৃথক জগতের মত। স্ব স্ব স্তরের খেয়াল মত তারা নিজ নিজ কার্য করে। মাছের জগতের সঙ্গে কীট পতঙ্গের জগতের নিশ্চয়ই প্রভেদ আছে।

উপরোক্তভাবে উৎকট অপরাধীরাও নিজেদের জন্য একটি পৃথক জগৎ সৃষ্টি করেছে। সভ্য মানুষের সহিত উহা সম্পর্কহীন। এই জগতকে আমরা অপরাধী-সমাজ বলে থাকি।

[অসহায়তা হতে এই জগতে কেহই মুক্ত নন। এজন্য প্রখ্যাত ধর্ম-প্রচারকগণ পর্যন্ত বহু জঘন্য অপরাধ সম্বন্ধে নীরব থেকেছেন। বড়ো বড়ো ধর্মপ্রচারকদের জীবিত কালে প্রতিটি দেশে ক্রীতদাস প্রথা ছিল। কিন্তু ওদের কেউই ঐ প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেননি। বহু ভালো ভালো উপদেশ বিতরণ করলেও ঐ একটি বিষয়ে তাঁরা নীরব। সম্ভবত এই যুগের ন্যায় সেই যুগেও ধনী ব্যক্তিদের সমীহ করা হতো।]

এই অসহায়তা থেকে সভ্য মানুষ মুক্ত না হলে অপরাধের বীজ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রয়ে যাবে। অপরাধী প্রদমনে সকলকেই সমানভাবে মুখর হতে হবে। লোভীরা ও ক্রোধীরা ক্রমান্বয়ে অপরাধী সমাজের কলেবর বৃদ্ধি করবে।

অপরাধীদের আণ্ডার ওয়ার্ল্ডের তথা অধস্তন পৃথিবীর মত [অলীক] এ্যারিষ্ট্রোক্রেট' দের একটি আপার-ওয়ার্লড তথা ঊর্ধ্বতন পৃথিবীও আছে। এই উভয় সমাজই ভারতের মধ্যবর্তী সমাজের পক্ষে ভয়াবহ ও সদা পরিত্যজ্য।

বস্তুতঃপক্ষে মধ্যবিত্ত পরিবারগুলিই প্রতিটি দেশে শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, রাষ্ট্রবিদ ও শিল্পীদের জন্ম দেয়। নারীদের যা কিছু সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য তা মধ্যবিত্ত পরিবারগুলিতেই দেখা যায়। তাই এদের প্রতি ওদের লোলুপ দৃষ্টি। এতে মধ্যবিত্তরা ওদেরকে সাধ্যমত এড়িয়ে চলে। [অনাহারের মত অতিভোগও ক্ষতিকর] সর্বদেশে মধ্যবিত্তরাই জাতির সভ্যতার ধারক ও বাহক।

উপরে অপরাধীদের আণ্ডার ওয়ার্লড [মহা-হল্লোড়] সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

নিম্নে [তথা কথিত] এ্যরিষ্টক্রেট তথা অভিজাতদের আপার ওয়ালর্ড সম্বন্ধে বলবো। শহরের একশ্রেণীর নাইট ক্লাব, ককটেল পার্টি ও প্রাইভেট ক্লাবগুলিতে ওদের দেখা মিলবে।

"বিলাতী স্যুট্ পরা ও মিনি পোষাকী ভদ্র নরনারীর দল। কেহ মূল্যবান শাড়ী জড়ানো শীর্ণদেহী। তার গলার কণ্ঠিতে এক'পো তেলের স্থান হয়। কারও উচ্চখোপী কেশরাজী। কারও বা কেশ বব ছাঁট। ঘাড়ে ও গলায় খড়ির গুড়া [পাউডার] ও ঠোঁটে রাঙা রঙ। চটুল। কলহাস্য। মূহুর্মুহু টা'টা ও টু'টু শব্দ ও মিহি গলার ডাক—'বেয়া-রা। চায়ের পেয়ালার ও চুড়ির টুঙ-টাঙ শব্দ। বিলাতি মদের সৌরভে হল ঘর ভরপুর। ইচ্ছা করে নরনারী একজন অন্যজনের গাত্রে ঢলে পডছে। কিন্তু তখুনি খুশী মনে বলে উঠছে : এ্যাম সরি। থ্যাঙ্ক ইউ। টেবিলের তলায় দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে যে মিঃ দত্ত মিসেস্ বেনা'র পা তাঁর পা দিয়ে চেপে ধরেছে। শুনা যায় যে এদের কেউ কেউ স্ত্রী এক্সচেঞ্জ'ও করে। মিসেস্ ভড় মিঃ মিত্রের সঙ্গে নিরালা বারান্দা থেকে ফিরলে দেখা গেল যে মিসেস্ ভড়ের মাথার সিঁদুরে মিঃ মিত্রের বুকের সার্ট রঞ্জিত। জোড়ে জোড়ে বন্ধু বান্ধবী চক্ষুর আড়ালে যাচ্ছেন। স্থূলাঙ্গিরা লাক লাইনের রশী কোমরে এঁটে সেখানে ক্ষীণাঙ্গী। বর্ষিয়সী প্রেমিকা তার তরুণ প্রেমিকের সঙ্গে স্ব-চালিত মোটরে সেখানে উপস্থিত। ক্যাবেরা ড্যান্সিনী নারী অর্ধনগ্ন নাচের পর এর ওর কোলে কিছুক্ষণ করে বসছে। উত্তীর্ণ বয়স্কা মেকআপীনি ঐ নারী হাড় বার করা হাতে কারও গলা জড়িয়ে ধরছে।

নারী বেশ্যাদের মত পুরুষ বেশ্যাও আছে। য়ুরোপে বয়স্ক পুরুষ অর্থের বিনিময়ে নারীদের যৌন তৃপ্তি ঘটায়। এই শহরে নারী বেশ্যার মত কিশোর প্যাসিভ এজেন্টদের অস্তিত্ব আছে।

'বহু কিশোর মালিশ বয় মালিশ কালে যৌন বিকার গ্রস্থ মোটর বিহারী ধনীদের খুশী করে। ওদের সাধারণ ভাষায় ময়দান-বয় বলা হয়। বাবরী চুল ওলা লম্বা চুড়ীদার পাঞ্জাবী পরা বালকেরা ঠোঁটে রঙ মেখে রাত্রে ময়দানে ঘুরা ফিরা করে। এদের হাতে জ্যামবাকের ও ভেসিলিনের শিশি থাকে। বিকৃত যৌন বোধগ্রস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে এদের অবৈধ-যৌন [Sodomy] সম্বন্ধ আছে। এদের কেউ কেউ সুবিধা মত ব্ল্যাক মেইলিঙের কাজও করে। (f)

(f) দুটি কিশোরকে একত্রে ঘরে দরজা বন্ধ করা নিবারণ করুন। যৌনজ আদরে ওদের ছোটটির ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয়। কৌশলে বড়টি কিংবা ছোটটিকে অন্যত্র সরান। তবে সহোদর ভ্রাতাদের মধ্যে এরূপ অবৈধ সম্পর্ক কখনও ঘটে না।

প্রাথমিক অপরাধীরা সভ্যসমাজের সহিত সম্পর্ক-রহিত হয় না। বরং এরা সমানভাবে সভ্যসমাজ এবং অপরাধী-সমাজের সহিত মেলামেশা করে ; প্রকৃত বা উৎকট অপরাধীরা কিন্তু সভ্য সমাজের সহিত কোনরূপ সাক্ষাৎ সম্পর্ক রাখে না। তারা পুরাপুরিভাবে অপরাধীসমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এরূপ অবস্থায় এদের নেশন উইথইন্ নেশন বা জাতির অন্তর্গত জাতিরূপে ব্যাখ্যা করা যায়। এই প্রকৃত বা উৎকট অপরাধীরা সাধারণতঃ কর্মালস হয়ে থাকে। তারা কখনও কাজকর্ম করে না। প্রকৃত অপরাধীরা তাদের অপকর্মের জন্য কোনও অবস্থাতেই অনুতপ্ত হয় না। ভয়-ভাবনাও থাকে তাদের কম। এরা সাধারণতঃ ব্যক্তিগত স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হয়। এদের মধ্যে কোনওরূপ আদর্শ বা দলগত স্বার্থ থাকে না।

কোনও কোনও অপরাধী দল বেঁধে কাজ করলেও তা তারা করে ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য। এই কারণে এদের প্রায়ই আমরা হিস্যা বা ভাগের জন্য বিবাদ করতে দেখি। এ'ছাড়া এদের মধ্যে কর্তব্য-বোধের অভাব এবং হিংসা-বৃত্তির আধিক্যও দেখা যায়। এই কারণে একজন অপরাধী অন্য আর একজন অপরাধীকে প্রায়ই ধরিয়ে দেয়।

বিঃ দ্রঃ—অধুনা খালি জমি অধিগ্রহণের প্রশ্ন উঠেছে। [মুনাফাকর ক্রয় বিক্রয় নিশ্চই নিবারণীয়] কিন্তু—বসবাসের জন্য সেখানে ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ এনে স্থানীয় শান্ত পরিবেশকে মন্দ করা অনুচিৎ। সমকৃষ্টির লোকেরা [ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে] আপন তাগিদে পৃথকীকৃত হয়ে নিজেদের উপযুক্ত পল্লী গড়েছে। অর্থ নৈতিক ও কৃষ্টিগত সমতা এক বস্তু নয়। অর্থ নৈতিক সজ্ঘাত অপেক্ষা কৃষ্টিগত সজ্ঘাত অধিক ভয়াবহ। একই পারিবারিক আচরণ এক পল্লীতে নিন্দিত ও অন্য পল্লীতে প্রসংশিত হয় [কিছু ফাঁকা জমি শহরকে স্বাস্থ্যপ্রদ করে।] কৃষ্টিগত সজ্ঘাত নূতন এক রূপ অপরাধী সৃষ্টি করে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

বুদ্ধি-বৃত্তি

বলা হয় যে বুদ্ধি বাহিরের এবং প্রতিভা ভিতরের বস্তু। আমার মতে—প্রতিভা বুদ্ধিবৃত্তি তথা [ইনটেলিজেন্স] থেকে সূক্ষ্মতর বস্তু। বুদ্ধি বহুমুখী হলেও প্রতিভা একমুখী হয়। প্রতিভা মাত্র একটি বিষয়ে অর্জিত হতে পারে।

ভারসেটাইল জিনিয়াস তথা বহুমুখী প্রতিভা একটি অলীক বস্তু। (f) সেই ক্ষেত্রে এক প্রতিভাবান অন্য প্রতিভাবানদের সাহায্য নেন।

আইনজ্ঞ ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে প্রভেদ আছে। বুদ্ধি সব কয়টিকে আয়ত্তে আনে। কিন্তু প্রতিভা মাত্র একটিতে প্রকাশ পায়। কার মধ্যে কোন বিষয়ে প্রতিভা আছে তা খোঁজা হয় না। তজ্জন্য বহু প্রতিভার অকাল মৃত্যু ঘটে। প্রতিভা প্রবণতার [ইনক্লিনেশন] পূর্ণ বিকাশ মাত্র। এজন্য প্রতিভাবান বিজ্ঞানীর মত প্রতিভাবান দস্যুও দেখা যায়। প্রতিভার সহিত নীতি বোধের কোনও সম্পর্ক নেই। উহার সহিত বংশানুক্রম [হেরিডিটি] এবং গোত্রানুক্রম [Atavism] উভয়েরই সম্পর্ক থাকে। স্বকীয় চেষ্টাতে উহা অর্জ্জন ও বর্দ্ধন করা সম্ভব। তবে ওতে বেশী পরিশ্রম ও সময়ের প্রয়োজন হয়।

বালকদের মধ্যে ভালো ও মন্দ উভয় প্রতিভাই খুঁজতে হবে। ভালো প্রতিভা ব্যবহারে বাড়বে এবং মন্দ প্রতিভা অ-ব্যবহারে কমবে। এখানে ব্যবহার ও অ-ব্যবহার [Use & disuse] থিওরি প্রয়োগে ঐ ভাবে মন্দ প্রতিভাকে নির্মূল করা যায়।

[বায়ুর উত্তাপ থেকে বৃষ্টি হবে বুঝে স্পর্শবিদ্ পিঁপড়েরা ডিম্ব মুখে করে ভূমিজ গর্ত থেকে উদ্গত হয়। অনুরূপভাবে পুরানো স্বভাব পাপীরা জন্তু জানোয়ার, আদিম মানুষ ও শিশুদের মত আবহাওয়া সম্বন্ধে সচেতন। বর্ষাকালে বৃষ্টি হলে রাত্রে চুরি করার স্থবিধা। সিঁদেল চোররা বায়ুর উত্তাপ থেকে বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা বুঝে অপকর্মে যাত্রা করে।]

সাধারণ মানুষদের বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে অপরাধীদের বুদ্ধিবৃত্তির যথেষ্ট প্রভেদ আছে। এই বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন অপরাধীরাও অপকর্মের মধ্যে যথেষ্ট করে থাকে।

কু-কাজ বা সৎকাজ-যে কোনও কাজই হোক না কেন, তা সমাধা করতে হলে স্বল্পাধিক বুদ্ধি-প্রেরণার প্রয়োজন হয়। প্রেরণা বা ইন্‌স্টিংক্টকে সহজাত বুদ্ধি বলা হয়। অন্যদিকে আসল বুদ্ধি, অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা-জাত হয়ে থাকে। অপরাধীদের মধ্যে এই বুদ্ধি-প্রেরণার সঙ্গে নির্বুদ্ধিতাও দেখা যায়। এই নির্বুদ্ধিতাও তাদের অন্তর্নিহিত জড়তা বা অলসতার সহিত এসে থাকে। এইজন্যে অপরাধীরা তাদের অপকর্ম সকলের পরিকল্পনার মধ্যে যতই কেন বুদ্ধির

(f) তবে—ভিন্ন রূপের কোনও ক্ষণজন্মা পুরুষ পৃথিবীতে কদাচিৎ থাকতে পারে।

পরিচয় দিক, তারা তাদের সেই পরিকল্পনার মধ্যে অনেক ফাঁক রেখে যায়। তার জন্যে তারা সহজেই ধরা পড়ে। অপকর্মে সফলতা জনিত উত্তেজনা ঘটলে অপকর্মের মধ্যে এরা বেশি ফাঁক রাখে। সাধারণতঃ অপকর্মের পর প্রত্যাগমন কালে ইহা অধিক ঘটে। এমন কি, অনেক সময় তারা তাদের নিজেদের অজ্ঞাতে অনেক সাক্ষ্যপ্রমাণও তৈরি করে। তাদের অন্তর্নিহিত অদূরদর্শিতা এবং নির্বুদ্ধিতাই এর কারণ বলে আমি মনে করি। আশু সাফল্যের সম্ভাবনা তাদের এমন উত্তেজিত করে যে, প্রচুর বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করা সত্ত্বেও কিছুটা নির্বুদ্ধিতাও তারা প্রকাশ করে। অপকর্মে সফল হ'লে তাদের এই উত্তেজনা শেষ সীমায় আসে। এইজন্যে এই সময় তারা কোনরূপ সাবধানতা অবলম্বন করতে অক্ষম হয়।

আমরা স্বভাব-অপরাধীদের মধ্যে $\frac{৩}{৪}$ অংশ প্রেরণা এবং $\frac{১}{৪}$ অংশ বুদ্ধি দেখে থাকি, মধ্যম-অপরাধীদের আমরা $\frac{১}{২}$ অংশ বুদ্ধি এবং $\frac{১}{২}$ অংশ প্রেরণা দেখি এবং অভ্যাস-অপরাধীদের মধ্যে আমরা $\frac{৩}{৪}$ অংশ বুদ্ধি $\frac{১}{৪}$ অংশ প্রেরণা দেখে থাকি।

আমরা স্বভাব-অপরাধীদের মধ্যে নির্বুদ্ধিতা সর্বাপেক্ষা অধিক দেখে থাকি। এরা প্রধানতঃ ইন্‌স্টিংক্ট বা প্রেরণা দ্বারা চালিত হয়। এই প্রেরণার বাইরে তাদের বুদ্ধিমত্তা কম প্রকাশ পায়। এমন বহু অপরাধী আছে যারা হাতে কটা আঙুল আছে তাও বলতে পারে না। কেউ কেউ আবার ডান হাত থেকে বাম হাতের প্রভেদ পর্যন্ত বুঝে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাদের অন্তর্নিহিত প্রেরণার সাহায্যে নানাবিধ দুঃসাধ্য অপকর্ম করতে সক্ষম হয়। মধ্যম অপরাধীদের মধ্যে এই নির্বুদ্ধিতা অপেক্ষাকৃত কম দেখা যায়, অভ্যাস-অপরাধী-দের মধ্যে এই নির্বুদ্ধিতার পরিচয় আমরা আরও কম পাই। এরূপ নির্বুদ্ধিতা বা স্টুপিডিটি এবং চতুরতা বা কানিংনেসের একত্র সমাবেশ আমরা জীব-জন্তু এবং অসভ্য জাতিদের মধ্যে দেখে থাকি। সুসভ্য মানুষের শিশুদের মধ্যেও আমি এইরূপ অবস্থা লক্ষ্য করেছি। এ'ছাড়া এদের মধ্যে আমরা কিউরিয়সিটি বা ঔৎসুক্যের অভাব দেখি। এই কিউরিয়সিটি বা ঔৎসুক্যের অভাব বিশেষ করে স্বভাব-অপরাধীদের মধ্যেই অধিক দেখা যায়। এজন্য এদেশের নিরক্ষর চাষীরা আজও পর্যন্ত যেমন ঋক্‌বেদীয় লাঙল নিয়েই সন্তুষ্ট আছে, তেমনি স্বভাব-অপরাধীরাও তাদের সেই সনাতন সিঁদকাঠিই অধিক পছন্দ করে। আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্য তারা এজন্যে নিতে চায় না। এদের মধ্যে বিজ্ঞানের বীজমন্ত্র এই কিউরিয়সিটি বা ঔৎসুক্যের অভাবই এজন্য দায়ী।

সময় সময় হাস্যকর নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ করলেও এই সকল অপরাধীরা, বিশেষ করে অভ্যাস-অপরাধীরা অত্যদ্ভুতরূপ বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করে।

এইখানে আমি অপরাধীদের মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্কীয় বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধেই অধিক আলোচনা করবো। সাধারণতঃ দেখা গিয়েছে যে প্রাথমিক অপরাধীদের শ্রেণী নির্বিশেষে প্রায়ই তাদের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে ভারসেটাইলনেস্ বা সর্বতোমুখীভাব দেখা যায়। কিন্তু প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই স্পেশালাইজড্ বা একাগ্রমুখীভাবই দেখা গিয়ে থাকে।

[বলা বাহুল্য, বারে বারে একটি বিশেষ রীতি-নীতিতে অভ্যস্ত হওয়ায় তারা এমন বিদ্যুৎগতিতে কাজ করতে সক্ষম হয় যে, ইহাদের এইরূপ অপকর্ম প্রতিরোধ করা প্রায়ই অসম্ভব হয়ে উঠে।]

প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা এক দৃষ্টে বলে দিতে পারে যে কোন লোকটি ভীরু, কোন লোকটি সাহসী, কে একা যাচ্ছে, কার সঙ্গে লোক আছে। এমন কি, কার পকেটে কত টাকা আছে তা তারা তাদের চেহারা দেখে বুঝে নিতে পারে। এই ক্ষমতার জন্য অপরাধীরা এদের গুণী বলে। যারা প্রেরণা [ইনষ্টিংক্ট] দ্বারা পরিচালিত হয় তাদেরই এরা গুণী বলে। আর যারা বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয় তাদের এরা শেয়ানা বলে। শেয়ানারা অনেক সময় ব্যাঙ্ক-কাউণ্টার, পোস্ট অফিস ও রেল স্টেশন থেকে শিকার অনুসরণ করে। এদের গুণীরা কিন্তু রাস্তা থেকেই এদের শিকার ব'লে চিনে নিতে পারে।

আমি প্রকৃত অপরাধীর পর্যায়ের পিক-পকেটদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান ল্যাবোরেটরিতে এনে তাদের উপর যান্ত্রিক পরীক্ষা করে দেখেছি যে, সাধারণ মানুষ এবং প্রাথমিক অপরাধীদের অপেক্ষা এই সকল প্রকৃত অপরাধীদের সময়ের পরিজ্ঞান তথা প্রতিক্রিয়া-কাল [রি-অ্যাকশন টাইম] বহু গুণে বেশি।

এ'ছাড়া এই সকল পিক্-পকেটদের উপর যান্ত্রিক পরীক্ষা দ্বারা আমি এ'ও প্রমাণ করেছি যে সাধারণ মানুষ অপেক্ষা এদের দেহের স্পর্শ-কেন্দ্র বা টাচ্ স্পট অত্যধিক বেশি। কিন্তু সেই অনুপাতে তাদের মধ্যে কষ্টবোধ নিরপরাধ এবং প্রাথমিক অপরাধী অপেক্ষা কম। [কিছু কষ্টকেন্দ্র নিষ্ক্রিয়]

এমন অনেক পিকপকেটকে জানি যারা ট্রাম-বাসের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ডান হাতে উপরের ডাণ্ডা এমন ভাবে ধরে যাতে তার বাহুটা শিকারমন্য ব্যক্তির

কাঁধের উপর লাগানো থাকে। এদিকে কিন্তু সে শিকারের দিকে না তাকিয়ে নিকটের সাথী ব্যক্তিদের দিকে তাকিয়ে থাকে। এর পর তার বাহুর সংযোগের জন্য শিকারের স্কন্ধের ধমনীর স্পন্দন হতে সে বুঝে নেয় ঠিক কোন সময় ঐ শিকার অন্যমনস্ক হয়ে গেল এবং ইহা বুঝা মাত্র সে ইঙ্গিত দ্বারা সাথী অপরাধী-দের জানিয়ে দেয়ঃ স্বর্ণ মুহূর্ত এইমাত্র উপস্থিত হলো।

এছাড়া এরা মানুষের মন ম্যাজিসিয়ানদের ন্যায় বিবিধ কৌশলে অন্যত্র বিক্ষিপ্ত করে; কি করে কাজ হাসিল করতে হয় তা বিশেষ করে পিকপকেট, ছিনতাই অপরাধী এবং প্রবঞ্চকরা ভালো করে বুঝে। পিকপকেট আদি বহু অপরাধী সন্দেহ এড়াতে শাল প্রভৃতি মূল্যবান পোশাক ব্যবহারও করে থাকে। বহু পিকপকেট জানে বাসে বহু ছোকরাদের মন নারী যাত্রীদের প্রতি নিবদ্ধ থাকে। এ ছাড়া যাত্রীরা নামবার সময় অন্যমনস্ক হয়। এক ব্যক্তি কাজ করলেও তার দলের লোক ভিড় করে তাকে আড়াল করে। এই উদ্দেশ্যে চাদরের সাহায্যে তারা তাদের দেহ ঢেকে রাখে। এই চাদরে অন্যের হাত ঢেকে হাতঘড়ি খুলতেও এরা ওস্তাদ। এদের চমকপ্রদ কার্যপদ্ধতিসমূহ আমি এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচনা করেছি। (f)

বস্তু বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে বলপ্রকাশে অনভ্যস্ত এই সকল পিকপকেট, প্রবঞ্চক প্রভৃতি অপরাধীদের ন্যায় সিঁদেল চোর, তালাতোড় তথা বারগ্লার প্রভৃতি বস্তুর উপর বলপ্রয়োগকারী অপরাধীরাও বহুবিধ বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করে থাকে। পূর্বোক্ত অপরাধ সকল ফরিয়াদীর চক্ষুর সম্মুখে সঙ্ঘটিত হয়। এইজন্য অপরাধীদের সহিত ফরিয়াদীদেরও বিবৃতি থেকে আমি ইহা অবগত হতে পেরেছি। কিন্তু শেষোক্ত অপরাধসমূহ লোকচক্ষুর অন্তরালে সমাধা হয়। তাই সেই সকল অপরাধীদেরই বহু তোয়াজ করে আমি এই সকল বুদ্ধিবৃত্তি সম্পর্কীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি।

পল্লী অঞ্চলে এমন বহু অপরাধী আছে যারা খড়ের আচ্ছাদন পরে খড়ের গাদায় আত্মগোপন করে থাকে। অন্য চোরেরা এই অবস্থায় মাঠে শুয়ে পড়ে গবাদি পশুকে তাদের খাদ্যের জন্য আকৃষ্ট করে। এরা গড়াতে গড়াতে ঐ সকল পশুদের প্রলুব্ধ করে নিরালা স্থানে এনে চামড়ার জন্য তাদের নিহত করেছে। কোনও কোনও চোর সুতার একমুখে বঁড়শি বেঁধে উহা তাদের

(f) কেউ ধরা পড়লে তাদের দলের লোক তাকে ভীষণভাবে মারতে থাকে ও তাকে থানায় নেবার অজুহাতে কিছু দূরে এনে মুক্ত করে।

কাপড়ে লাগিয়ে গৃহে প্রবেশ করে এবং ঐ সুতার অন্য মুখটি ওদের অপর জন ধরে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। বিপদ বুঝে সে ঐ সুতায় টান মারলে ভিতরের চোর তৎক্ষণাৎ অন্য পথে পলায়ন করে।

বোরিঙ ও ড্রিলিঙ মেসিন এ্যাসিড প্রভৃতি আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারের মধ্যেও অপরাধীদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। অপরাধীদের বিবিধ-প্রকার কার্য পদ্ধতি—বিশেষ করে ঠগীদের কার্যপদ্ধতিগুলি বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে পণ্ডিত ব্যক্তিদেরও চমৎকৃত করে। আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং অপরাধীদের বিভিন্ন কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচনা করেছি। এই বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে অপরাধীদের বিড়ির ধোঁয়ায় গৃহস্থদের নিদ্রা গাঢ় করার বিষয় বলা যায়। [ব্যবহারিক অপরাধ-তত্ত্ব দ্রঃ]

আমি হুজুর একজন বাড়ীর চোর। ঐ দিন ঐ বাড়ীটাতে আমিই চুরি করেছি। চুরির আগের দিন ঐ গৃহের নিকটস্থ এক খোলার বাড়িতে আমি আশ্রয় নিই। ওদের ঝি চাকর'দের সঙ্গে ভাব করে সুড়ুক সন্ধানও নিই। [চাকর'রাই আমাদের জন্য দরজা খুলে রাখে।] আমি ঐ বাটির একজন ঝি-এর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ছিলাম। গভীর রাত্রে অকুস্থলে গিয়ে মাটির নিচে থেকে সিঁদকাটিটা আমি উঠিয়ে নিই এবং পরে পাঁচিলের ওপর দিয়ে ভিতরের দিকে একটা মোটা দড়ি ফেলে দিই। পূর্ব ব্যবস্থা মত বাড়ীর ঝি উঠানে সজাগ ছিল। সে তৎক্ষণাৎ জলের কলের পাইপের সঙ্গে দড়ির মুখ বেঁধে দিলে ঐ দড়ি ধরে আমি ভিতরে নামি। এরপর অন্য জলের পাইপ বেয়ে আমি উপরে উঠি। ঐ পাইপের [Rain pipe] চারদিকে কাঁটা তার লাগানো ছিল। কিন্তু পায়ে কেডস জুতো পরিয়ে ও চটের থলে জড়িয়ে ওগুলো আমি এড়াতে পারি।

'আমরা দুয়ারে তুরপুণ দিয়ে ফুটা করে বাঁকা শিক ঢুকিয়ে ধীরে ধীরে ভিতরের খিল খুলে তলায় নামিয়ে দিই।' দরজার দুটি পাল্লার একটি চেপে ফাঁক করে খিল খুলাকে বলা হয় 'চাড়'-বাজী।

আজকাল আমরা নানারূপ যন্ত্রপাতির ব্যবহার শিখছি। এমন কি ইলেকট্রিক তুরপুণ ও এ্যাসিড প্রভৃতির ব্যবহার পর্যন্ত আমরা জানি। আমরা চোরাই মাল নিজেরা কখনও পাচার করি না। আমরা এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রকার চোরাই মালের গ্রহীতাদের, বিশেষ করে বড় বড় দোকানদারের সাহায্য নিয়ে থাকি।"

সাধারণতঃ যে সকল অপরাধী দল বেঁধে অপকর্ম করে তারাই বুদ্ধি-মত্তার পরিচয় অধিক দেয়। এ বিষয়ে পিক্‌পকেটদল এবং ডাকাতরা অন্যতম। পিক্‌পকেটদের মধ্যে প্রেরণা এবং ডাকাতদের মধ্যে বুদ্ধি অধিক দেখা যায়। ডাকাতদের ন্যায় পিক্‌পকেটরা অনেক সময় সর্দার বা নেতা দ্বারা পরিচালিত হয়। এই পিক্‌পকেটাদি নির্বল-চোরেরা সময় সময় অত্যদ্ভুত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে থাকে।

এদের কেউ কেউ নিম্নে একটি ইজের বা পাতলা পাণ্টুলেন পরে তার উপর একটা লুঙ্গি পরে। গায়ে পাঞ্জাবি পরে তার উপর একটা কোটও চাপায়। অপকার্যের পর ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এসে এরা তাড়াতাড়ি কোট এবং লুঙ্গিটা খুলে ফেলে অকুস্থলে ফিরে আসে। এই অবস্থায় দেখে ফরিয়াদী এবং আশে-পাশের কোন লোকই আর তাকে চিনতে পারে না। কারণ তাদের দৃষ্টি থাকে লুঙ্গি-পরা কোট গায়ে ব্যক্তিদের দিকে; পাণ্টুলেন ও পাঞ্জাবি পরা ব্যক্তিদের দিকে তারা ফিরেও দেখে না। ভারতীয় চোরদের মধ্যে এমন অনেক চোর আছে যারা তাদের গেঞ্জির উপর একটা রবারের বেল্ট এঁটে দিয়ে তার উপর একটি-শার্ট ও কোট চাপায়। দোকান থেকে বস্ত্রাদি তুলে নিয়ে নিমেষে উহা গেঞ্জির নীচে এরা ঢুকিয়ে দেয়। গেঞ্জির নিম্নাংশ রবারের বেল্ট দ্বারা বেষ্টিত থাকায় উহা আর নীচে পড়ে যায় না। এই অবস্থায় অপরাধীটি হাত দুলাতে দুলাতে প্রকাশ্যেই বেরিয়ে আসতে পারে। এই সব অপরাধীরা দলের জন্য ছেলে-ছোকরা সংগ্রহ করার মধ্যেও কম বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয় না। এ বিষয়ে নিম্নের বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।

"আমাকে হিরু সর্দার প্রথমে পানের সঙ্গে কোকেন খেতে শেখায়। নেশার খাতিরে প্রত্যহই আমি তার সঙ্গে দেখা করতে বাধ্য হই। সর্দার আমাকে বায়স্কোপ দেখার জন্য প্রায়ই পয়সা দিত। এছাড়া আমাকে সে নানারূপ কু-অভ্যাসও শেখায়। এ'ছাড়া সর্দারজী আমাদের উপভোগের জন্যে কয়েকটি মেয়েও এনে দিত। আমাদের শিক্ষার জন্যে সর্দারজী স্বগৃহে একটা স্কুল খুলে ছিল। এখানে আমরা তালার চাবি তৈরি করতে এবং খুলতে শিখি।

এই সব শহুরে চোরেদের ন্যায় পল্লীগ্রামের চোরেরাও নানারূপ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে থাকে। বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা অগ্নি সহযোগে গবাদি পশুর শিং বাঁকানো বা সোজা করা যায়। সোজা-শিং গরু চুরি সম্বন্ধে থানায় ডাইরি করা হয়েছে শুনে চোর উক্তরূপে চুরি করা গরুটির শিং বাঁকা করে দিয়ে রক্ষা পেয়েছে।

পল্লীগ্রামে এমন অনেক কাহিনী আজও শোনা যায়। এ বিষয়ে কিছুদিন আগে আমি এরূপ একটি গল্প শুনি : কোনও এক অপরাধী একটি শ্বেতকায় ছাগল চুরি ক'রে সেটা ভক্ষণ করে ফেলে' তার ছালটি জুতার কালো কালি দ্বারা পালিশ করে গৃহেই রেখে দেয়। চুরির তদন্তে এসে দারোগা-সাহেব কালো ছাগলের ছাল দেখে অপরাধীটিকে আর গ্রেপ্তার করে নি। একদা কয়েক ব্যক্তি পাঠি চুরি করে এনে অন্য এক পাঁঠার অণ্ডকোষ উহার মাংসের মধ্যে রেখে রান্না শুরু করে। দারোগা তদন্তে এসে ঐ মাংসের মধ্যে অণ্ডকোষ দেখে মামলাটি মিথ্যা মনে করেছিলেন। তদন্ত করতে করতে হঠাৎ দারোগা লক্ষ্য করলেন যে পাশের বাড়ির বিচালীর গাদাটি দাউ দাউ করে জলে উঠল। বলা বাহুল্য, এই অগ্নি-কাণ্ডের নায়ক এবং তার সাকরেদরা দারোগার পিছু পিছু ঘুরে বেড়াচ্ছিল। পরে জানা যায় যে, অগ্নিকাণ্ডের প্রধান হোতা লোক মারফৎ একটা মালায় করে জলসহ কিছুটা ফসফরাস বিচুলী গাদায় বহু পূর্বেই রেখে আসে। মালাটায় হিসাব মতই জল রাখা ছিল। জলের ভিতর থাকায় ফসফরাসের টুক্‌রাটুকু সঙ্গে সঙ্গে জলে উঠে নি। ঘণ্টাকয়েক পরে এই জল শুকিয়ে গেলে ফরফরাসটিও জলে উঠে। দারোগার সামনে হাজির থাকায় অগ্নিকাণ্ডের জন্যে এদের কাউকেই আর দায়ী করা যায় নি। অপরাধীদের এই বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে একটি বিলাতি উদাহরণ দিয়ে বর্তমান পরিচ্ছেদটি শেষ করা যাক।

"চোরদের রিপাবলিকে জোনাথন্ ছিল একজন ডিক্‌টেটার। শেষ বরাবর সে লণ্ডনের চোরদের একচ্ছত্র সম্রাট হয়ে উঠে। একদিক দিয়ে যেমন সে চোরের রাজা ছিল, অন্যদিকে সে পুলিশকে চোর ধরতে সাহায্যও করেছে। বলা বাহুল্য, যে সকল বিপক্ষ পক্ষীয় চোরেরা তার অবাধ্য হত, জোনাথন্ মাত্র তাদেরই পুলিশে ধরিয়ে দিত। অন্য সকলকে রক্ষা করার জন্যে কিন্তু সে চেষ্টার কোনও রূপ ত্রুটি করেনি। এদের কেউ কেউ দৈবাৎ কারারুদ্ধ হলে জোনাথন্ তাদের পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ করত এবং তাদের রক্ষিতাদের খবরাদি রাখত। পরিশেষে জোনাথন্ লণ্ডন শহরে চোরাই মাল উদ্ধারের জন্য একটি অফিসও খুলে। হৃতসর্বস্ব নাগরিকরা এই অফিসের কানুনমত কিছু টাকা দিয়ে দরখাস্ত করত। এদের কেউ কেউ তাদের অপহৃত দ্রব্যাদির কিয়দংশ ফিরেও পেত। এইভাবে সে নগরবাসীদের ও সরকার বাহাদুরের বিশ্বাস ভাজন হয়ে উঠে। জোনাথন সমগ্র ইংলণ্ডকে কাজের জন্যে কয়েকটি জিলাতে ভাগ করে এবং সে এক-এক দল অপরাধীকে এক-এক স্থানে কার্যে নিযুক্ত করে। এই

সব অপরাধী তাদের সর্দারের মারফৎ চোরাই মাল জোনাথনের কাছে পাঠিয়ে দিত। ঐ সব চোরেরা কেউ 'কমিশন বেসিসে', কেউ বা মাসিক মাহিনায় জোনাথনের অধীনে কাজ করত। জোনাথন্ অপকার্যের জন্যে এদের পুরস্কৃত করত, জরিমানাও। এমন কি, চোরাই মাল পাচারের জন্যে জোনাথন্ ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে এজেন্ট নিযুক্ত করত। কেবলমাত্র ফেরারী আদমীদেরই সে তার দেহরক্ষী নিযুক্ত করত, কারণ তার বিশ্বাস ছিল, এই সব ব্যক্তি ইচ্ছা সত্ত্বেও তার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।"

এই ধরনের অত্যদ্ভুত বুদ্ধির পরিচয় অপকর্মের মধ্যে দেখা গেলেও অপরাধীরা তাদের অন্তর্নিহিত নির্বুদ্ধিতার এবং অদূরদর্শিতার জন্যে এমন বহু ফাঁক তাদের অপকর্মের মধ্যে পূর্বাপরভাবে রেখে যায় যা অভিজ্ঞ শান্তিরক্ষকদের নজর এড়ায় না। এইজন্য প্রভূত বুদ্ধিমত্তার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও নির্বুদ্ধিতার জন্যে অপরাধীরা পরিশেষে ধরা পড়ে তাদের অপরাধ-জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটায়।

অপকর্মের সময় অপরাধীরা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠে। সাফল্য লাভের পর এদের উত্তেজনা শেষ সীমায় উপনীত হয়। এই উত্তেজনার জন্যেও এদের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে। কোনও কোনও অপরাধী তাদের দাম্ভিকতার জন্যেও প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করে না। এইজন্যে অপরাধীরা সময় সময় এমন অনেক চিহ্ন অকুস্থলে রেখে আসে যে-সব চিহ্ন বা সূত্রের সাহায্যে সহজেই তারা ধরা পড়ে। তাদের দাম্ভিকতার জন্যে কেউ কেউ অকুস্থলে নাম লেখা কার্ডও রেখে আসে। দলগত সংস্কারের জন্যেও কেউ কেউ অকুস্থলে নানাবিধ চিহ্ন রেখে আসে, যথা—খড়, দড়ি ইত্যাদি।

এদেশের অপরাধীরাও সংগঠনের দিক থেকে কম বুদ্ধি প্রকাশ করে না। এদেশের রঘু ডাকাত, গৌর বেদে প্রভৃতি ডাকাতেরা এ বিষয়ে অন্যতম ছিল। এ প্রসঙ্গে এই বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।

"আমাদের জুয়ার আড্ডাটা ছিল তেতলার ছাদের উপর। বাড়িটার বিভিন্ন ফ্লাটে বহু লোকই বাস করত, তাদের অনেককেই আমরা জুয়াড়ী করে তুলি। আত্মরক্ষার জন্য আমরা চারিদিকে পাহারা রাখতাম, ছোকরা পাহারাই রাখতাম আমরা বেশি। অদূরে রাস্তার মোড়ে আমাদের নির্দেশ মত দুটা ছোকরা মারবেল খেলত। পুলিশের হাল্লা দেখলেই মারবেল খেলতে খেলতে এগিয়ে এসে সে অন্য আর একটি ছেলেকে খবর দিত, যে কিনা সেখানে লাট্টু ঘোরাচ্ছে।

লাট্টুওয়ালা ছেলেটি লাট্টু ঘুরাতে ঘুরাতে এগিয়ে এসে মোড়ের মাথায় এক যুবককে খবর দিত। এই যুবকটি খবরের অপেক্ষায় ঘুড়ি ও লাটাই হাতে বাড়ির কাছেই অপেক্ষা করত। খবর পাওয়ামাত্র বাড়ির একতলার পানের দোকানে সে দৌড়ে আসত। এই দোকানটায় একটা ইলেক্‌ট্রিক স্থইচ থাকত। এই স্থইচের সঙ্গে দোতলার একটা কলিং বেলের সংযোগ ছিল। কলিং বেলটা বেজে উঠা মাত্র দোতলার পাহারাদার তেতলার ছাদে এসে আশু বিপদ সম্বন্ধে খবর জানাত এবং আমিও নালের টাকাগুলো উঠিয়ে নিয়ে সরে পড়তাম। অপর দিকে জুয়াড়ীরাও এধারে-ওধারে ছড়িয়ে পড়ত। এরপর পুলিশ ছাদে এসে না পেত টাকাকড়ি, না পেত কোনও যন্ত্রপাতি বা লোকজন। গোয়েন্দাকে গাল দিতে দিতে তারা ফিরে যেত বিফল মনোরথ হয়ে।"

"কোনও ক্ষেত্রে পুলিশ এলে আমরা ছোট জল চৌকিতে একটা গণেশ ঠাকুর ও কিছু ফুল রেখে গজল গান ধরেছি।"

অপরাধীদের বুদ্ধি-প্রেরণার আরও প্রমাণ স্বরূপ [মৎ স্থাপিত ও সম্পাদিত] কলিকাতা পুলিশ জার্নেলে প্রকাশিত "পাগলা হত্যার কাহিনী" থেকে কিছুটা অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

"২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬—আমরা খবর পাই খাঁদা হাওড়ার একটা বাড়িতে লুকিয়ে আছে। তৎক্ষণাৎ আমরা হাওড়া রওনা হই এবং সেই সমগ্র বাড়িটি সিপাহীদের দ্বারা ঘেরাও করাই। খাঁদা নামে লোকটা ধরা পড়ে। লোকটা বিনাযুদ্ধে ও বিনা বলপ্রয়োগে ধরা দেয়। তাকে দেখেই আমাদের ইনফরমার কাঁপতে শুরু করে। এর পর অনেকেই তাকে খাঁদা বলে সনাক্ত করে। খাঁদার ফটোগুলির সহিত তার চেহারা অবিকল মিলে যায়। খাঁদার ঠোঁট ও ভ্রূর উপর কাটা দাগ ছিল, এই লোকটিরও সেরূপ দাগ দেখা যায়। খাঁদার বুকে উল্কি দ্বারা বেঙ ও ফুল প্রভৃতি এবং ডান হাতে নারিকেল গাছ, সাপ, "প্রাণের খেঁদা" প্রভৃতি আঁকা ছিল। এই লোকটির দেহেও সেরূপ প্রতিকৃতি দেখা গেল। বুকের মাপ এবং দৈর্ঘ্যও তার একরূপ দেখা যায়। সনাক্তি সম্বন্ধে অনেকেই নিঃসন্দেহ হ'লেও আমি তাকে খাঁদা বলে বিশ্বাস করি নি। কারণ খাঁদা বিনা রক্তপাতে ধরা দিতে পারে না। পরে তদন্তে জানা যায় যে, এই ব্যক্তিটি খাঁদা নয়। সে খাঁদার একজন সাকরেদ মাত্র। হুবহু অনুরূপ দেখতে এই ব্যক্তিটিকে খুঁজে বার করে সে দলে ভর্তি করে। একে তারা ডুপ্লিকেট খাঁদা বলে অভিহিত করে। খাঁদার নির্দেশে সে খাঁদার

অনুরূপ উল্কিচিত্র এবং আঘাতের চিহ্নাদি নিজ দেহে ধারণ করে এই উদ্দেশ্যে যে সে খাঁদার নামে সময় বিশেষে জেল খাটবে, যাতে খাঁদা বাইরে থাকলেও লোকে মনে করতে পারে সে জেলে আছে। টিপের কাগজ থেকেও আমাদের এই ভুল আমরা ধরে ফেলি।"

আত্মরক্ষার কারণেও অপরাধীরা নানারূপ বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় দেয়। নানা প্রকার মিথ্যা ভাষণের মধ্যে আমরা ইহার পরিচয় পাই। ধরা পড়ার পর এরা নিম্নোক্তরূপ বহুবিধ মিথ্যা ভাষণের সাহায্য নেয়।

"আমি মশাই একজন নিরপরাধ ব্যক্তি। আমি অপরাধী বটে, কিন্তু চোর নই। ফরিয়াদীর যুবতী কন্যার সঙ্গে আমার প্রেম হয়। আমি গোপনে রাত্রি-যোগে কথিত কন্যার ঘরে যেতাম, কিন্তু কাল আমরা ধরা পড়ে যাই। ক্রুদ্ধ হ'য়ে ফরিয়াদী এই ঘটিটা হাতে দিয়ে আমাকে পুলিশে দেয়। লোকলজ্জাবশতঃ আসল বিষয়টি ফরিয়াদী গোপন করেছেন। ফরিয়াদীর স্ত্রীও আমার এই প্রেম সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। তিনিও আমাকে গোপনে বাটি বাটি দুধ খাইয়েছেন।"

চাকর চোরেদের প্রায়ই এই ধরনের মিথ্যা বিবৃতি থানায় দিতে দেখা যায়। সাধারণতঃ অভ্যাস-অপরাধীরা [প্রাথমিক অপরাধীরা] এরূপ মিথ্যার আশ্রয় নেয়। কোনও এক চাকর-চোর গহনা শুদ্ধ ধরা পড়ার পর এইরূপ উক্তি করে, 'ও ত গিন্নী-মা আমাকে কর্তাকে না জানিয়ে চুপি চুপি বাঁধা দিয়ে বা বিক্রি করে টাকা আনতে বলেছেন।' অন্য আর এক নারী অপরাধী এরূপ অবস্থায় নিম্নোক্তরূপ উক্তি করে, 'দাদাবাবুর সঙ্গে আমার প্রেম হয়। তিনিই আঙটিটা চুরি করে আমায় উপহার দেন। এখন ভয়ে ও লজ্জায় উনি এ কথা অস্বীকার করছেন।'

আমি বিগত মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধের তাগিদে ভারতে আগত কয়েকজন য়ুরোপীয় অপরাধী এবং তৎসহ কলিকাতা মহানগরীর স্থায়ী বাসিন্দা এমন কয়েকটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও য়ুরোপীয় অপরাধীদের বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে ওয়াকি-বহাল হবার সুবিধে পাই। ভারতীয় অপরাধীদের সহিত তুলনায় এদের বুদ্ধিমত্তা নিতান্ত নগণ্য ব'লেই মনে হবে।

সাধারণতঃ দেখা গিয়েছে যে, বস্তুতান্ত্রিক য়ুরোপীয় অপরাধীরা যন্ত্রের উৎকর্ষতার উপর অধিক নির্ভরশীল, কিন্তু রক্ষণশীল ভারতীয় অপরাধীরা অধিক নির্ভরশীল তাদের যন্ত্রের ব্যবহার-চাতুর্যের উপর। এই কারণে অধিকাংশ ভারতীয় অপরাধী সাধারণ তথা সিম্পল্ যন্ত্রপাতি ব্যবহার পছন্দ করে, কিন্তু,

বস্তুতান্ত্রিক য়ুরোপীয় অপরাধীরা আধুনিক জটিল তথা কমপ্লেক্স যন্ত্রপাতি ব্যবহারের পক্ষপাতী। অবশ্য ভারতের শহুরে অভ্যাস-অপরাধীরা এক্ষণে য়ুরোপীয় অপরাধীদের ন্যায় জটিলযন্ত্রপাতি ব্যবহার শুরু করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পল্লী অঞ্চলের ভারতীয় অপরাধীরা তাদের প্রাচীন সিঁদকাটিইবেশি পছন্দ করে। এই উভয় মহাদেশের অপরাধীদের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির তুলনা করলে দেখা যাবে যে, এদের মধ্যে যারা স্বভাব ও মধ্যম অপরাধী তারা সাধারণতঃ সকল দেশেই সাবেকী অতি সাধারণ যন্ত্রাদিই ব্যবহার করে থাকে। বলা বাহুল্য যে, এদেশের সিঁদকাটি এবং য়ুরোপের জিমির গঠন-প্রণালী প্রায় একই রূপের হয়ে থাকে। কিন্তু এই উভয় দেশের অভ্যাস-অপরাধীদের কয়েক শ্রেণী এক্ষণে জটিল যন্ত্রপাতি ব্যবহার শুরু করেছে।

মৎ সংগৃহীত ভারতীয় এবং য়ুরোপীয় অপরাধীদের ব্যবহৃত বহু যন্ত্রপাতি ভারত গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠিত কলিকাতার সর্বভারতীয় ডিটেক্‌টিভ্ কলেজের মিউজিয়ামে পৃথক পৃথক ভাবে আমি স্থাপন করেছি। ইহা দ্বারা তুলনামূলক ভাবে ইহাদের ব্যবহৃত যন্ত্রাদি সম্বন্ধে আলোচনা করা সম্ভব হবে। অনুরুদ্ধ হয়ে এই ক্রাইম মিউজিয়ামটি আমি নিজ সংগৃহীত বহু দ্রব্য দ্বারা অরগানাইজ করে দিয়েছি। এই মিউজিয়াম থেকে ঐ সকল যন্ত্রপাতির কয়েকটি ফটো এখানে পৃথক পৃথক ভাবে উদ্ধৃত করা হলো। 'ক' চিহ্নিত চিত্রে বাঙালী [প্রকৃত] অপরাধীদের ব্যবহৃত সাবেকী যন্ত্রাদি দেখানো হয়েছে। এবং 'খ' চিহ্নিত চিত্রে মহীশূরের [প্রকৃত] অপরাধীদের ব্যবহৃত সাবেকী যন্ত্রপাতি দেখানো হয়েছে। এই দুইটি প্রদেশের দূরত্বের ব্যবধান হাজার মাইলের উপর। তা'হলেও দেখা যায় যে, এই উভয় প্রদেশের [প্রকৃত] অপরাধীরা প্রায় একই প্রকারের সাধারণ [সিম্পল] অস্ত্র ও যন্ত্র ব্যবহার করে থাকে।

এক্ষণে 'গ' চিহ্নিত চিত্রে কলিকাতার আধুনিক [প্রাথমিক] অপরাধীদের দ্বারা ব্যবহৃত যন্ত্রাদি, 'ঘ' চিহ্নিত চিত্রে মাদ্রাজ শহরের ঐরূপ অপরাধীদের দ্বারা ব্যবহৃত যন্ত্রাদি এবং 'ঙ' চিহ্নিত চিত্রে আধুনিক বিলাতী অপরাধীদের দ্বারা ব্যবহৃত জটিল [কমপ্লেক্স] যন্ত্রাদি দেখানো হয়েছে। এইবার বুঝা যাবে যে, এই তিনটি স্থানেরই আধুনিক অপরাধীরা প্রায় একই প্রকারের যন্ত্রাদি ব্যবহার করে থাকে। এই সকল যন্ত্রাপাতির তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা আমি আরও জেনেছি যে, সকল দেশের স্বভাব-অপরাধীরাই সাধারণ ও মামুলী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে থাকে। এদেশীয় সিঁদকাটি এবং

বিলাতী জিমির গঠন পর্যালোচনা করলেই এই সত্যটি উপলব্ধি করা যাবে।

ভারতীয় পল্লী-অঞ্চলের অপরাধীদের সম্পর্কে এই কথা বিশেষ রূপে সত্য। এদেশের চাষীরা যেমন ঋগ্‌বেদের সময়কার লাঙল আজও পর্যন্ত আঁকড়ে ধরে আছে, তেমন ভারতীয় অপরাধীরাও আজও তাদের প্রাচীনতম সিঁদকাটি পরিত্যাগ করে নি। এর কারণ ভারতীয় নিরপরাধ মানুষদের ন্যায় এরা একান্তরূপেই সংরক্ষণশীল। এই সম্বন্ধে অধিক জ্ঞান অর্জন করতে হলে উপরোক্ত মৎ স্থাপিত ক্রাইম মিউজিয়ামটি পরিদর্শন করা উচিত। এক্ষণে ইহা পৃথিবীর অন্যতম ক্রাইম-মিউজিয়াম রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে। (f)

প্রতিরোধার্থে নিরপরাধীরাও বাধ্য হয়ে বহু বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্য নেয়। কিন্তু—কিছুক্ষেত্রে এগুলি অপরাধ বা অন্যায় তা বুঝা দুষ্কর। ফল ও দ্রব্য চুরি রুখতে বহু গৃহস্থ মরণ ফাঁদ পাতে। [ইলেকট্রিক কারেণ্ট যুক্ত তার রাখে] নিম্নে ওইরূপ একটি তথ্য দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ধৃত করা হলো।

কোনোও এক ব্যক্তির শস্য ক্ষেত্রে এক দুষ্ট ব্যক্তি নিজের প্রচুর জমি থাকা সত্বেও বেড়া ভেঙে গরু ঢুকাতো। উদ্দেশ্য ওই জমি ওই ভাবে অলাভ-জনক করে তাকে তা বিক্রয় করতে বাধ্য করা। পুলিশ ও আদালত ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ। গুণ্ডাদের দ্বারা গুণ্ডাদের প্রতিহত করাতেও বহু ঝঞ্ঝাট। ওই লোক তখন গুড় ও খড়ে'র সঙ্গে ফলিডল মেখে তার ঐ ঘেরা জমিতে ছড়ালো। এতে ওই উৎপীড়কের গরুগুলির মৃত্যু ঘটে।

[এখানে নিজের ঘেরা জমিতে কীটনাশ করার অধিকার তার নিজেরই আছে। তবে এখানে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে ও পুলিশকে পূর্বাহ্নে জানানো ভালো]

কোনও এক গৃহস্থ আলমারীর গোপন গহ্বরে স্বর্ণ অলংকার রেখে উহার সুমুখের দিকে ঝুটা মণি মুক্তা ও পিতলের তৈরী গহনা রাখলো। সিঁদেল চোর সমুখে অতো গহনা পেয়ে আর ভিতরে কিছু না দেখে ওগুলি নিয়েই পালালো। কারণ ওই কার্যে ভয় ও উত্তেজনায় ও সময় রক্ষার্থে স্বভাবতঃই তাদের বুদ্ধি ভ্রংশ ঘটবে।

(f) ভারতে ক্রাইম মিউজিয়াম না থাকায় আমি উহার সাজাবার কায়দা এবং কাষ্ঠের ও লৌহ নির্মিত ধারক ষ্ট্যাণ্ডগুলি ও টেবিলগুলি নিজ ব্যয়ে তৈরী করে ভারত গভর্নমেণ্টের ওই প্রতিষ্ঠানে প্রদান করি।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

॥ সাক্ষ্য-প্রমাণ ॥

একমাত্র পুলিশ কর্মী ব্যতীত অন্য কারও পক্ষে অপরাধ-তত্ত্ব সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ সম্ভব নয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় এদের মধ্যে বহু গবেষক ও লেখক এখনও তৈরী হন নি। পূর্বতন কয়জন ইংরাজ উর্ধতন পুলিশ কর্মী মাত্র স্বভাব দুর্বৃত্ত জাতিদের সম্বন্ধে যৎসামান্য তথ্য সংগ্রহ করে দিলেন।

সাধারণতঃ অপরাধ-বিজ্ঞান সম্পর্কীয় গবেষণার জন্যে পরিসংখ্যার উপর অধিক নির্ভর করা হয়। বলা বাহুল্য যে, ভারতবর্ষে অপরাধ-সম্পর্কীয় তথ্য-তালিকা সম্যকরূপে সংগৃহীত হয় নি বললেই চলে। যেটুকু সংগ্রহ করা হয়েছে তার মূল্য কতটুকু তা আর কেহ না বুঝলেও আমি বুঝি। এর কারণ আমি নিজে এইরূপ পরিসংখ্যা অতীতে সংগ্রহ করেছি। একজন বৈজ্ঞানিকরূপে আমি বলতে চাই যে, এই সকল পরিসংখ্যার উপর নির্ভর করে অগ্রসর হলে ভুল সিদ্ধান্তেই আসা হবে। এ'দেশে যত অপরাধী আছে তার মধ্যে খুব কমই কর্তৃপক্ষের নজরে এসেছে। এদের মধ্যে যারা আদালত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে তাদের পরিসংখ্যার মধ্যে ধরা হয় নি। অপর দিকে খাদ্যে ও ঔষধে ভেজাল প্রদানকারীদের এবং কালোবাজারীদের এই সকল পরিসংখ্যার মধ্যে ধরা হয় না। অথচ যে অপস্পৃহা সাধারণ অপরাধীদের মধ্যে দেখা যায়, সেই একই অপস্পৃহা তাদেরও পরিচালিত করে থাকে। তদুপরি মনস্তত্ত্বের ভিত্তিতে আজও এদেশে অপরাধীদের কোনও পরিসংখ্যা সংগৃহীত হয় নি। এইজন্য পরিসংখ্যার ভুল তথ্যের উপর নির্ভর না করে আমি গবেষণার কারণে সরাসরি পরিদর্শন ও পর্যালোচনের উপর নির্ভর করেছি। এক হাঁড়ি ভাতের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক অন্ন পরীক্ষা করে যেমন বলা যায় যে হাঁড়ি শুদ্ধ ভাতই একই রূপে সিদ্ধ হয়েছে, তেমনি প্রতিটি শ্রেণী ও উপশ্রেণীর অপরাধীদের মধ্য থেকে ত্রিশ-চল্লিশটি ব্যক্তিকে মুক্ত অবস্থায় অবলোকন করে তাদের রীতি-নীতি সম্বন্ধে বহু তথ্য সঠিকভাবে জানা সম্ভব হয়ে থাকে ব'লে আমি মনে করি।

যারা জেলের বন্দীকৃত কায়েদীদের পর্যালোচনা করে অপরাধ-বিজ্ঞান গড়তে চেয়েছেন তাদের কোনও সিদ্ধান্ত আমি মানতে প্রস্তুত নই। কারণ পোষা 'খাঁচার' পাখি ও বনের পাখির পর্যালোচনা একরূপ হ'তে পারে না। আমার

মত গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ [এখনও] শত শত অপরাধীদের মুক্ত অবস্থায় ঘাঁটা-ঘাঁটি করে কেহ কোনও পুস্তক আজ পর্যন্ত এদেশে লিখে যান নি। তাই ভারতীয় অপরাধ বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমার পূর্ববর্তী কোনও পণ্ডিতের অর্জিত কোনও জ্ঞান আমার সাহায্যে আসেনি। তাই আমাকে একাই বহু ভারতীয় অপরাধীকে পর্যালোচনা করে আপন ধারণা অনুযায়ী বিবিধ সিদ্ধান্তে আসতে হয়েছে।

এ'কথাও ঠিক যে জৈব-বিজ্ঞানের কষ্টি পাথরে বিচার না করলে অপরাধ-বিজ্ঞানের মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্কীয় গবেষণালব্ধ কোনও এক সিদ্ধান্ত সত্য কি'না তা বুঝা অসম্ভব। এর কারণ এই যে, দেহকে বাদ দিয়ে মনকে কল্পনা করা আজও সম্ভব হয় নি। দেহের সহিত মনের যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ তা আধুনিক পণ্ডিত মাত্রেই স্বীকার করে থাকেন। পূর্ব পরিচ্ছেদগুলিতে অপস্পৃহা, শোণিতস্পৃহা, ভাবপ্রবণতা প্রভৃতি বিষয়গুলির প্রমাণ স্বরূপ বহু কাহিনীর উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এ'সম্বন্ধে আরও কয়েকটি প্রমাণের উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমে শোণিতস্পৃহার প্রমাণ স্বরূপ কলিকাতায় সঙ্ঘটিত আরও একটি কাহিনীর উল্লেখ করা যাক।

"তদন্তকারী অফিসারের বিশ্বাস ছিল যে, হত্যাকারী ঘটনাস্থলে ফিরে আসবে। [কারণ,—শোণিতস্পৃহা জনিত মনোবিকার।] এই জন্যে অকুস্থলের জনসাধারণকে তিনি অপরাধীর হুলিয়া সম্বন্ধে অবহিত করেন এবং এরূপ চেহারার কোনও লোককে অকুস্থলে ঘুরাঘুরি করতে দেখলে তাকে আটকে রাখতে অনুরোধ জানান। দুই দিন পরই ঐরূপ একটি লোককে আমরা এইখানে ঘুরাঘুরি করতে দেখি। চ্যালেঞ্জ করার সঙ্গে সঙ্গেই সে দৌড় দিলে আমরাও তাকে অনুসরণ করি।"

অপরাধীদের অন্তর্নিহিত ভাবপ্রবণতা সম্বন্ধে অপরাধ-বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত ডস্টয়ভস্কি এরূপ লিখে গেছেন, 'জেলে থাকাকালীন এমন অনেক অপরাধীকে জানতাম যারা আসলে নির্দয় পশু ছিল। অন্তরের সঙ্গে আমি তাদেরকে ঘৃণা করতাম। কিন্তু এঁদের মধ্যেও সময়ে সময়ে অভাবনীয়রূপে আমি ভাবপ্রবণতা দেখেছি।' এই সম্বন্ধে লম্ব্রোসো সাহেব এরূপ লিখে গেছেন, 'কোনও এক অপরাধী গলায় দড়ি দেয়। আত্মহত্যার পূর্বে বিছানার উপর কুশ নির্মিত একটি ক্রসের দুই ধারে সে তার জুতা দুইটি সাজিয়ে রাখে। এতদ্বারা সে এরূপ বলতে চেয়েছিল—ওগো, আমি চললাম। তোমরা আমার জন্যে প্রার্থনা কর।" ভাব-প্রবণতার ইহা একটি অপূর্ব দৃষ্টান্ত।

এই সম্বন্ধে নিম্নে আমার নিজের একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করা হলো। এই বিষয়ে আমার এই বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।

"রক্ষীরূপে কর্মবাহাল হবার পর সর্ব প্রথম আমি সরযূ তেয়ারী নামক একজন পুরোনো চোরের মামলার তদন্ত করি। ঐ অপরাধী যখন জানলো যে আমার হাতের ইহা প্রথম মামলা, তখন সে খুশি হয়ে আমাকে বলে উঠলো, হুজুর! আপনার আর কষ্ট করে আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে না। আমি এইবারকার মত আদালতে অপরাধ স্বীকার করে নেবো। আমার এই মামলা আপনার কর্মজীবনে প্রথম মামলা। এই থেকেই রক্ষীজীবনে আপনি বহু উন্নতি করবেন। এ কথা এখনই আমি জানিয়ে রাখছি। আপনি পরে মিলিয়ে দেখবেন, আমার এই কথা সত্য হ'ল কিনা?" [সত্য হয়েছে—লেখক।]

অপস্পৃহা সম্বন্ধে পূর্বে বহু দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হয়েছে, এ সম্বন্ধে আরও সাক্ষ্য প্রমাণ দেওয়া উচিত। ইহার প্রমাণ স্বরূপ হাভলক্ এলিস উল্লিখিত কয়েকটি বিলাতী এবং মৎসংগৃহীত এদেশী উদাহরণ বর্তমান পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা যাক্।

"অপরাধীদের স্বভাবগত ইচ্ছার দুর্দমনীয় শক্তি সত্য সত্যই বিস্ময়কর। সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয়েছে। এজন্য ইহা আর অবিশ্বাস্য নয়। ঠগী ক্যাসানোভা তার ঠকামীর সুচতুর মতলবগুলি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হ'লে সে এরূপ উক্তি করেছিল: "আমার অত্যদ্ভুত মতলবগুলির কোনটিও কিন্তু পূর্ব-কল্পিত নয়। উহা সব সময় আমার নিজের অজ্ঞাতেই এসে যায়। আমি যখন আমার এই মতলব সকল কাজে লাগাই, আমার মনে হয় কোনও এক অজ্ঞাত শক্তিমান হস্ত জোর করে আমার দ্বারা অপকর্ম সকল করিয়ে নিচ্ছে।" বহু পকেটমার লম্ব্রোসোর কাছে এরূপ বিবৃতি দেয়—"মশাই! আমাদের মধ্যে প্রেরণা [স্পৃহা?] এলে আমরা কিছুতেই নিজেদের ঠিক রাখতে পারি না। এই জন্যে চুরি তখন আমাদের করতেই হয়!" অন্য আর এক অপরাধী আমার নিকট এরূপ উক্তি করে: আমার অপরাধ কি? চুরি না করার জন্যে আমি প্রাণপণ চেষ্টা করেছি। কিন্তু চুরি না করে আমি কিছুতে ঠিক থাকতে পারি নি। এ'জন্য আমি, স্যার, এতে দোষী নই। কারণ, সেই ইচ্ছা দমনে আমি চেষ্টা করেছিলাম।"

জো ব্রাগ ওরফে আলবার্ট বোরক্ নামক কোন এক [অভ্যাস?] অপরাধী

স্বকীয় চেষ্টা দ্বারা কিছুকাল নিরপরাধ থেকে পরে আবার অপরাধী হয়ে যায়। এর কারণ সম্বন্ধে সে নিম্নোক্তরূপ একটি স্বীকারোক্তি করে। সে এরূপ বলে "আমার পিছনে এক ব্যক্তিকে আমি ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে পাই। আমি উঠে বসে তার দিকে তাকাতে থাকি। নিকটে কেউই ছিল না। হঠাৎ আমার তার পকেটের দিকে লক্ষ্য পড়ে। পকেটটাকে ফোলা দেখাচ্ছিল। কৌতূহল হ'ল পকেটে কি আছে দেখবার জন্যে। পকেটে আমি দশটি স্বর্ণ মোহর পেলাম। নয়টি মোহর পুনরায় তার পকেটে ফেলে দিয়ে মাত্র একটি মোহর তুলে নিলাম। এই সময় আমার অর্থের বড় টানাটানি চলছিল। মনে হ'ল, না-বলে এইটা কর্জ নেওয়া যাক্। পরে ওটা ওকে ফিরিয়ে দিলেই হবে। তাকে চিনে রাখবার জন্যে তার মুখটা ভাল করে দেখে রাখলাম। কিছুক্ষণ পথ চলার পর হঠাৎ আমাকে আমার পূর্ব প্রেরণায় পেয়ে বসল। আমি বাইবেলখানাকে পথিপার্শ্বে নিক্ষেপ করে নৃত্যরত হলাম। তারপর আমি পুনরায় অকুস্থলে ফিরে এসে লোকটার বাকি নয়টি স্বর্ণ মোহর সহ তার অন্য পকেটের রৌপ্য মুদ্রা কয়টিও অপহরণ করলাম। এমন কি, হতভাগার নূতন বুট জোড়াটাও আমি অপহরণ করতে দ্বিধা করলাম না। সুবিধা হ'লে আমি তার পেন্টুলেনটাও খুলে নিতাম।"

এই সব কাহিনী থেকে অপস্পৃহার অবস্থিতি এবং তার অত্যদ্ভুত শক্তি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হ'তে হয়। মানুষের অভাব, প্রয়োজন, লোভ প্রভৃতির জন্যে কিরূপে এই অপস্পৃহার আবির্ভাব হয় সেসম্বন্ধে পূর্ব পরিচ্ছেদগুলিতে আলোচনা হয়েছে। স্বাভাবিক মানুষের মধ্যে ইহার শক্তি থাকে অত্যন্তরূপ মৃদু। তাই সব সময় আমরা সেটা অনুভবও করি না। কিন্তু প্রয়োজনাদির জন্য যে কোনও মুহূর্তে তার আবির্ভাব ঘটতে পারে।

কোনও এক পকেটমার মারো সাহেবের কাছে এইরূপ উক্তি করে— "আমি কোনও ভদ্রলোকের পকেটে যদি দামী ঘড়ি দেখি, ত আমার অর্থের কোনও প্রয়োজন না থাকলেও আমার মনে হয় ঘড়িটি আমার নিতান্ত প্রয়োজন।" ডস্টয়ভস্কি সাহেব কোনও এক দুর্দান্ত চোর সম্বন্ধে নিম্নোক্তরূপ বিবৃতি দেন। অপরাধীটি দুর্দান্ত হ'লেও নানা কারণে সাহেবের অনুরক্ত ছিল।

"সে প্রায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমার দ্রব্যাদি অপহরণ করেছে, কিন্তু কখনও আমার সম্মতি সত্ত্বেও আমার দান নেয় নি; আমার কাছ থেকে কোনও কিছু

ধারও সে চায় নি। সে চুরি করত অর্থের প্রয়োজনে নয়। তার অপইচ্ছার উপশমের জন্যেই সে চুরি করত। একদিন আমার নিত্য প্রয়োজনীয় বাইবেল পুস্তকটা চুরি করে সে মদ কেনবার জন্যে উহা বিক্রি করে দেয়। অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় নাকি যে ঐরূপ করে। হয়ত মদ খাবার জন্যে সেদিন তার একটা দুর্দমনীয় ইচ্ছা আসে। যে কোনওরূপ ইচ্ছাই হোক তার উপশম বা নিবৃত্তি সে ঘটাবেই। [কারণ,—প্রতিরোধ-শক্তির অভাব।] আমি তাকে এ'জন্য ভৎর্সনা করি। সে আমার ভৎর্সনায় বিরক্ত হয় না ; বরং ধীর ভাবেই সে তা শুনে স্বীকার করে যে বাইবেল আমার কাছে অতীব প্রয়োজনীয় সামগ্রী। আমার দুঃখে সে দুঃখিতও হয়। কিন্তু এ'জন্য তাকে অনুতপ্ত বা লজ্জিত দেখা যায় না। [কারণ,—স্থূলবৃত্তির প্রভাব।] তার ধারণা ছিল এরূপ গালিগালাজ দ্বারা আমার মনের শান্তি ফিরে আসবে এবং আমার বাইবেল হারানোর ক্ষতি-জনিত সকল দুঃখ আমি ভুলে যাব। তার ওরূপ ধারণা থাকার জন্যেই সে আমার এই সব ভৎর্সনা আনন্দের সহিত সহ্য করে। [কারণ,—সাময়িক ভাবপ্রবণতা।] মনে মনে কিন্তু সে আমাকে একজন নির্বোধ বালকের মত মনে করে। আমি যেন একজন মস্ত মূর্খ এবং পৃথিবীর হাল-চাল সম্বন্ধে আমি একেবারেই অনভিজ্ঞ। চুরি করা রূপ একটা সাধারণ ব্যাপারের জন্যে আমি যে কেন এতটা মাথা ঘামালাম তা তার হৃদয়ঙ্গমই হ'ল না।"

এই তো গেল বিদেশী পণ্ডিতদের উক্তি। এ সম্বন্ধে আমাদেরও অনেক অভিজ্ঞতা আছে। এ সম্বন্ধে কয়েকটি দেশী উদাহরণ দিব। কোনও এক পকেটমার জিজ্ঞাসিত হয়ে এইরূপ উক্তি করে—"মিট্টুর সঙ্গে যাচ্ছিলাম মশাই! হঠাৎ দেখলাম এক ছোকরাবাবু নেলাক্ষেপার মত পথ চলেছে। পাতলা পকেটের মধ্যে নোট কটা বার থেকেই দেখা যাচ্ছিল। এই কি মোদের সহ্য হয় বাবু? [উহার কারণ,—অন্তর্নিহিত নিষ্ঠুরতা।] এই রকম একটা বুড়বাক্ শহরে ঘুরে বেড়াবে, আর আমরা চুপ করে তা দেখবো?" ধরা পড়ার পর অপর আর একটি অপরাধীকে বলতে শুনেছিলাম—"কি করব মশাই! যাচ্ছিলাম ত অন্য বরাতে [কাজে]। হঠাৎ দেখলাম বাইরের ঘরে মেঝের ওপর চেয়ারটা রাখা হয়েছে! চেয়ারের ওপর রয়েছে একটা রূপার ভাস্। রাস্তার ধারের দরজাটাও খোলা, অথচ সেই ঘরে কেউ নেই। এ সব ছোট কাজে আমি হাত দিই না। কিন্তু ঐ অসাবধানী বুড়বাক্ লোকটার উপর আমার রাগ হ'ল। আমি ফিরে এসে চেয়ারখানা নিয়ে সরে পড়লাম। [কারণ,—অপস্পৃহার হঠাৎ

আগমন।] কিন্তু মশাই ! আমি ত চেয়ার চোর নই। তাই দু পা এগিয়েই ধরা পড়ে যাই।" অপরাধীদের নিষ্ঠুরবৃত্তির অন্তর্গত ক্রোধ ও হিংসার সংমিশ্রণের জন্যেই এইরূপ ঘটে থাকে বলে মনে হয়। কোনও এক ভদ্র চীনা চোর ধরা পড়ার পর আমার নিকট এইরূপ উক্তি করে : "যাচ্ছিলাম ত ট্রামে। হঠাৎ জানি না কেন ফুটের এই সাইকেলটা নিয়ে চম্পট দিতে ইচ্ছে হ'ল।" তদন্তে দেখা যায়, চীনা ভদ্রলোকটি একজন ধনী ব্যক্তি ! অপরাধী-বিশেষের এই সকল উক্তি "অপস্পৃহার" অবস্থিতি প্রমাণিত করে।

এ সম্বন্ধে অপর আর একটি দেশী উদাহরণ দেওয়া যাক। বাঙলার কোন এক গ্রামের একটি বালক হঠাৎ দুর্ধর্ষ অপরাধী হয়ে উঠে। গ্রামের লোকেরা তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তাকে খুন করতে চায়। এই সময় কোনও এক ব্যক্তি দয়াপরবশ হয়ে তাকে গৃহে স্থান দেন। বাড়ির যা কিছু দ্রব্য তিনি বালকটির কাছেই গচ্ছিত রাখেন। সকালে উঠে ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসা করেন, আজ কিছু চুরি করেছ ?" মাথা চুলকে দিয়েছে উত্তর সে "আজ্ঞে রাত্রে বাগান থেকে একটা শশা নিয়েছি।" আশ্চর্যের বিষয় ভদ্রলোক সেই দিনই দুপুরে তাকে পাঁচটা শশা খেতে দেন। শশা কটা তখনও পর্যন্ত ঘরেই মজুত ছিল। ভদ্রলোকের কাছে শুনেছি, সারারাত ধরে এঘরের জিনিস ওঘরে এবং ওঘরের জিনিস এ ঘরে করত। দিনের বেলায় কিন্তু তার অপস্পৃহার আবির্ভাব কখনও হয়নি। [কারণ,—অভ্যাস্‌জাত রাত্রস্পৃহা।] ভদ্রলোকের মতে ছেলেটিকে তিনি আশ্রয় না দিলে সে শহরের বস্তিতে আশ্রয় নিত এবং সেই সঙ্গে সভ্য সমাজের শেষ স্মৃতিটুকু ভুলে গিয়ে সে উৎকট অপরাধী বা মানব-দানবে পরিণত হ'ত। এ সম্বন্ধে আরও একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। উদাহরণটি সচরাচর লোকের নজরে পড়ে। এটা অত্যল্প অপস্পৃহার একটি উদাহরণ। নিম্নের বিবৃতিটিপ্রণিধানযোগ্য।

"আমি আমার এক বন্ধুর সহিত ট্রামে যাচ্ছিলাম। কন্‌ডাক্‌টার সামনে আসতেই আমরা টিকিট কেনার জন্যে প্রস্তুত হলাম। কিন্তু কন্‌ডাক্‌টার টিকিট না নিয়ে চলে গেল। এরপর বিনা টিকিটে আমরা গন্তব্য স্থানে পৌছলাম। হঠাৎ কন্‌ডাক্‌টারকে নিকটে আসতে দেখে আমার বন্ধু আমাকে ফেলেই গাড়িটা থামবার আগেই নেমে গেলেন। এই সময় আমারও মন তাঁকে অনুসরণ করতে চাইল। কিন্তু আমি জোর করে মনটাকে ঠিক করে নিই এবং আমার ও বন্ধুর উভয়ের টিকিটই কিনে নিই।" (f)

(f) বহু ট্রাম ও বাসযাত্রী কনডাকটার নিকটে এলে জানলার দিকে মুখ করে বসে থাকেন।

অপস্পৃহা সম্বন্ধে কোনও একটি প্রাথমিক অপরাধী আমার নিকট এইরূপ একটি বিবৃতি দেয়। কোন ঘটনাও যে কিরূপে বাক্-প্রয়োগের কার্য করে তা ইহা হ'তে বুঝা যাবে।

"দুই বৎসর পূর্বে আমি এক জমিদার বাটীতে কাজ করতাম। একদিন কাছারী থেকে একটি হাজার টাকার নোট চুরি যায়। জমিদার আমাকে সন্দেহ করে ধমকা-ধমকি করেন। কিন্তু তা'হলেও তিনি আমাকে বরখাস্ত করেন নি। বস্তুতঃ আমি ঐ দিন নোটটি চুরি করি নি। কিন্তু সেইদিন হ'তে আমার মনে অপস্পৃহা বাসা বাঁধে এবং আমি সুবিধা ও সুযোগ মত চুরি করতে শুরু করি।"

অপরাধীদের বুদ্ধি প্রেরণার মিথ্যা ভাষণের দিকটি ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। এই সম্বন্ধে আরও একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। আসামীর প্রতি পূর্বাহ্লেই সহানুভূতিশীল হ'লে কিরূপ বিপদে পড়তে হয় তা নিম্নের বিবৃতিটি হ'তে বুঝা যাবে।

"দোকান থেকে কাপড় চুরির অপরাধে একজন সপ-লিফ্‌টারকে আমার কাছে ধরে আনা হয়। অপরাধ সম্বন্ধে বাষ্পরুদ্ধস্বরে সে এরূপ সাফাই দেয়, 'দেখুন! আমি রিপনে বি, এ, পড়ি। সংসারে আমরা তিনজন—দাদা, বৌদি এবং আমি। বৌদি বেথুনে থার্ড ইয়ারের ছাত্রী, রেকর্ডে তাঁর গান শুনে থাকবেন। বৌদির জন্য দোকানে শাড়ি কিনতে এসেছিলাম। সাতখান শাড়ির মধ্যে পছন্দসই একটাও পাই নি। তাই ঐ শাড়ির একটাও আমি কিনি না। দোকানদার এতে বিরক্ত হয়ে বলে, 'বটে! শাড়িগুলোর পাট ভেঙ্গেচো। এখন কিনবে না মানে?' কিছুক্ষণ বাক্‌বিতণ্ডার পর দোকানদার এই শাড়িখানা হাতে গুঁজে দিয়ে আমাকে ধরে এনেছে।' আমি এই শিক্ষিত ছেলেটির ও তার পরিবারবর্গের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠি। বি, এ, পড়া বৌদির দেবরের এই দুর্দশা আমার অবচেতন মন পছন্দ করে নি। তা' ছাড়া যুবকটির দেহে প্রহারেরও চিহ্ন ছিল। আমি তৎক্ষণাৎ তাকে হাসপাতালে পাঠাই এবং তার হাতের হাতকড়ি খুলে দিতে বলি। এর পর পথিমধ্যে পুলিশের হেপাজত থেকে যুবকটি ফেরার হয়। তদন্তে জানা যায়, তার কাহিনীটি সর্বৈব মিথ্যা এবং সে একজন গৃহহীন পুরান দাগী চোর। সঙ্গীতজ্ঞ শিক্ষিতা কোনও বৌদি তার নেই এবং কখনও ছিলও না।"

জুয়াড়ীরা এই ধরনের মিথ্যাচরণের মধ্যে বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়।

আত্মরক্ষার জন্যেই এরা এরূপ করে থাকে। "সাধারণতঃ ঘরের মধ্যে ঢালোয়া সতরঞ্চি পেতে এরা জুয়া খেলে। আত্মরক্ষার কারণে এরা মাঝখানে একটা গ্রামোফোন এবং কিছু রেকর্ড রেখে দেয় এবং সেই সঙ্গে বিশ-ত্রিশ থালি খাবারও। কিছু ফুল এবং আতরও তারা সেখানে মজুত রাখে। পুলিশের হাল্লা এসে দরজায় ধাক্কা দেওয়া মাত্র তারা জুয়া খেলার সাজ-সরঞ্জাম এবং নালের টাকা বাক্সবন্দী করে রেকর্ড বাজাতে শুরু করে। পুলিশ ঘরে ঢুকে দেখে বিশ-ত্রিশ জন লোক মালা ও সিঁদুর পরে খাবার খাচ্ছে। কেউ কেউ বাক্সের উপরকার ফুলে ঢাকা গণেশ ঠাকুরকে প্রণাম জানিয়ে বলছে,—ঠাকুর—"

এ ছাড়া এমন অপরাধীও [এরা প্রাথমিক অপরাধী] আছে যারা দৈহিক পীড়নের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে বিপক্ষ-পক্ষীয় চোরদের ধরিয়ে দেয় নিজের দলের লোক বলে। অর্থাৎ এক ঢিলে তারা দুই পাখি মারে এবং বিরোধীদলকে ঘায়েল করে।

কোনও কোনও অপরাধী আবার গোয়েন্দা সেজে পুলিশকে খবর দেয় এই বলে যে, কোনও একটি বিশেষ বাটিতে রাত্রে ডাকাতি হবে। পুলিশ সদলবলে কথিত বাটিতে পাহারায় নিযুক্ত হয়। এই ভাবে তারা পুলিশবাহিনীকে একটি বিশেষ জায়গায় আটক রেখে অন্য এক জায়গায় ডাকাতি করে আসে।

অপরাধীদের আত্মরক্ষামূলক বুদ্ধিমত্তার আরও প্রমাণ স্বরূপ নিম্নে অন্য আর একটি বিবৃতি তুলে দেওয়া হ'ল।

"আড্ডাখানায় তখন ভাগ-বাঁটরা চলছিল। এমন সময় পুলিশ এসে দরজায় ধাক্কা দেয়। ব্যাপার দেখে কিষ্‌ণিয়া জিজ্ঞেস করে, 'কেয়া সর্দার, লড় যায়?' উত্তরে সর্দার বলে, 'কেয়া ফয়দা, দশ মিনিটকে বাস্তে লড়নে। আনে দেও শালে লোককো।' এর পর সর্দারের নির্দেশে তবলা এবং করতাল ক'টা নামিয়ে এনে আমরা গান শুরু করি। পুলিশ ঘরে ঢুকে দেখে আমরা গজল গাচ্ছি 'ভজ গোবিন্দম্ ভজ গোপালম্ ইত্যাদি।"

অপরাধীদের মধ্যে বিভিন্নরূপ অপরাধ-স্পৃহা বা অপরাধ-স্পৃহার অংশ বিশেষ, যথা—কাম-স্পৃহা, দ্রব্য-স্পৃহা প্রভৃতির পৃথক বা একত্র অবস্থিতির প্রমাণ স্বরূপ নিম্নে একটি বিশেষ বিবৃতি তুলে দিলাম।

"কর্মজীবনে আমি বহু প্রকারের লোক দেখেছি। এদের কেউ কেউ জীবনে কখনও ঘুষ নেয় নি। বরং তাকে তারা ঘৃণাই করে এসেছে। কিন্তু এদের স্ত্রীলোক দিয়ে ভুলানো গেছে। অন্যদিকে এমন লোকও দেখেছি যাদের নৈতিক

চরিত্রের দিকটা অতিশয় উন্নত, কিন্তু অযৌনজ দিকটা একেবারে যাচ্ছেতাই। পয়সা-কড়ির ব্যাপারে তারা নিকৃষ্ট চরিত্রের লোক। আবার এমন লোকও দেখেছি যারা অর্থ এবং নারী কোনও কিছুই চায় না, অথচ মিথ্যাভাষণ এবং পরপীড়নের দিক থেকে তাদের মানব-দানব বললেও চলে। জীবনে উন্নতি করার জন্যে তারা সব কিছুই করতে পারে।"

[আমি ভারতীয় অপরাধ-বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য যে সকল যান্ত্রিক পরীক্ষার ফলাফল এবং অন্যান্য পরিসংখ্যার সাহায্য নিয়েছি নমুনা স্বরূপ তাহাদের কয়েকটি তালিকা "পরিশিষ্ট" শীর্ষক নিবন্ধে পৃথক পৃথক পত্রে উদ্ধৃত করেছি। তবে স্থানাভাবের কারণে উহার সব কয়টিই এইখানে উধৃত করা সম্ভব হয় নি।]

এ ছাড়া আমি বহু পুরানো চোরকে কারখানায় ভর্তি করে দিয়ে দেখেছি যে তাদের একজনও সেখানে টিকে থাকে নি। [পরে অবশ্য অন্য প্রকার চিকিৎসা দ্বারা তাদেরকে ধীরে ধীরে শিল্পকার্যে আমি অভ্যস্ত করতে পেরেছি।] এদের কেহ কেহ ঐ স্থান থেকে চুরি করেও পালিয়ে এসেছে। কিন্তু এদের মধ্যে বহু ব্যক্তিকে আমি কুটির-শিল্পে ও কৃষিকার্যে নিয়োগ করে সুফল পেয়েছি। তাদের মাত্র দু'জন ছাড়া বাকি সকলে সেখানে সৎভাবে জীবন যাপন করছে।

প্রাথমিক অপরাধীরা পূর্ব হতে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পরে রাত্রে সুবিধামত চুরি করেছে। কিন্তু প্রকৃত অপরাধীরা তাদের অধৈর্যতার জন্য এইরূপ কালক্ষেপ করে নি। তারা সাধারণতঃ অতি অল্পক্ষণের মধ্যে কাজ হাসিল করার পক্ষপাতী। তা'ছাড়া এদের নিয়মিত স্নান-আহার করার বা পর্যাপ্ত আহার্য গ্রহণের ইচ্ছা থাকে না। এইজন্য ভিটামিন সহ পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান করে ও নিয়মিত জীবন যাপন করিয়েও এদের নিরাময় করা গিয়েছে। নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্যে এনে ফেলতে পারলে প্রাথমিক অপরাধীরা নিরাময় হয়ে উঠে।

এক্ষণে আমি বলতে চাই যে ১৯৩১ সালে আমি যখন কলিকাতার আরক্ষ বাহিনীতে প্রথম ভর্তি হই, তখন জনৈক অফিসারকে উৎকট অপরাধীদের উপর প্রায়ই দৈহিক পীড়ন করতে দেখতাম। কিন্তু ঐ সকল উৎকট প্রকৃত অপরাধীদের কষ্ট-বোধ কম থাকায় তারা এতে কষ্ট না পেয়ে বরং আরাম অনুভব করতো। এই উপায়ে তাদের কোনও স্বীকারোক্তি না করাতে পেরে তিনি পরে এক অভিনব ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। তিনি চাঙড়া চাঙড়া বরফ

ট্যাঙ্কের জলে ফেলে সেই ঠাণ্ডা জলে তাদের চুবিয়ে ধরতেন। এই অবস্থায় তারা শীতে কাঁপতে কাঁপতে কেঁদে কোঁকিয়ে তৎক্ষণাৎ স্বীকারোক্তি করে অপহৃত দ্রব্য-সমূহ বার করে দিতো। এই থেকে আমি সর্বপ্রথম বুঝতে পারি যে এই সকল উৎকট বা প্রকৃত অপরাধীদের কষ্টবোধ কম এবং শৈত্যবোধ অত্যধিক বেশি।

আমি কয়েকটি অপরাধীর বেওয়ারিশ মৃতদেহের পোস্টমর্টেম পরীক্ষা করিয়ে জেনেছি যে বহুকাল যাবৎ তারা উৎকট রোগে ভুগছিল। কিন্তু কষ্টবোধ না থাকায় তারা তা আদপেই জানতে পারে নি। এইরূপ বহু জীবন্ত প্রকৃত অপরাধীকে য়ুনিভারসিটি বিজ্ঞান কলেজে এনে পরীক্ষা করে আমি দেখেছি যে স্বাভাবিক মানুষের তুলনায় উহাদের কষ্টবোধ ও উষ্ণতাবোধ বহুগুণে কম এবং শৈত্যবোধ ও স্পর্শ-বোধ বহুগুণে বেশি।

অপরাধীদের নিষ্ঠুরতা এবং জিঘাংসা সম্বন্ধে মামলা সংক্রান্ত কয়েকটি প্রমাণ নিম্নে উধ্বৃত করলাম। ঘটনাগুলি [পুলিশ জার্নাল Vol I] পাগলা হত্যা মামলার নথী হয়ে গৃহীত হয়েছে। এই উল্লেখ্য মামলাটি আমি স্বয়ং তদন্ত করেছিলাম।

বিচারে মূল হত্যাকারী খাঁদার ফাঁদি হয় এবং তার সহকারী হত্যাকারীদের হয় দ্বীপান্তর। খাঁদা আজ আর ইহজগতে নেই। কিছুদিন হ'ল মলিনাও গত হয়েছে। কিন্তু উত্তর কলিকাতার ঘরে ঘরে এদের কাহিনী আজও আলোচিত হয়। যে গলিটায় এই হত্যাকাণ্ড সমাধা হ'য়েছিল, জনসাধারণ তার নাম দিয়েছে, 'গলাকাটা গলি।' শোণিতাত্মক অপরাধীদের এই কাহিনীটুকু পাঠকদের উপভোগ্য হবে। এই সম্পর্কে নিম্নের রোমহর্ষক বিবৃতিটি পড়ে দেখুন।

"হঠাৎ সেদিন দলের নেতা খাঁদা ওরফে খোকা এসে জানাল, 'জানিস্! একটা কাণ্ড হয়ে গিয়েছে।' ছোট-খাট কাণ্ড আমাদের গা সওয়া। এতে আমাদের আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না। তাই ওস্তাদের এরূপ ব্যবহারের কোনও হদিস্ না পেয়ে শুধোলাম, 'এ্যাঁ। কিসের কাণ্ড? কেউ ধরা পড়ল নাকি?' উত্তরে খাঁদা জানাল, 'না, তা নয়। শোন বলি। কাল মলিনার ঘরে বসেছিলাম, হঠাৎ দেখি দরজার বাইরে পুলিশ!' উদ্‌গ্রীব হয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'বলিস্ কি রে, তারপর?' খাঁদা উত্তরে বলল, 'তারপর? হাঁ, বলছি শোন। মলিনাকে দরজাটা বন্ধ করতে বলে এক লাফে জানালা গলে আমি দেওয়ালের খড়া ব'য়ে রাস্তায় নামি এবং পিছনের সরু গলিটার ভিতর দিয়ে সট্‌কান দিই।

আমি চলে আসার পর মলিনা দরজা খুলে দিলে পুলিশ ভিতরে এসে কাউকে না পেয়ে অপ্রস্তুত হয়ে চলে যায়। কিন্তু এ সবই পাগলা বেটার কাণ্ড। সেই এই ব্যাপারে পুলিশের ঘরে খবর দিয়েছে।'

'এই পাগলা ছিল, হুজুর, মলিনা সুন্দরীর শিক্ষক। মলিনাকে সে গান শিখিয়েছে। মাঝে মাঝে মলিনার ঘরে এসে সে তবলাও বাজাত। বেচারা পাগলা মলিনাকে খুবই ভালবাসত। মলিনারও পাগলার প্রতি অঢেল ভালবাসা ছিল। কিছুদিন আগে হঠাৎ একদিন বে-টাইমে খাঁদা আর আমি মলিনার ঘরে আসি। আমরা পাগলাকে মলিনার ঘরে বসে থাকতে দেখে অবাক হই। খাঁদা ক্রুদ্ধ হয়ে চেঁচিয়ে উঠে, 'আমি শা—প্রতি মাসে ৩৫০ করে টাকা গুনব, আর তুমি শা—তার ফলভোগ করবে! বেরো শা—, এখান থেকে।' পাগলা তখন বেরিয়ে যেতে যেতে জানিয়ে যায়, 'বেটা, জেলা খারিজ [এক্সটার্নড] গুণ্ডা, কে না জানে তোকে? দাঁড়া, সব কথা থানায় জানিয়ে দিচ্ছি।'

'হাঁ, হুজুর, এ সত্যি কথা। পরে আমরাও শুনেছি পাগলা থানায় খবর দেয়নি। সে সাহসও তার ছিল না। পুলিশ আকস্মিক ভাবে সেদিন মলিনার ঘরে হানা দিয়েছিল। কিন্তু সে যাই হোক, আমাদের হুজুর, ধারণা হয়েছিল যে পাগলাই আপনাদের ঘরে খবর পাঠিয়েছে। আমরা সকলেই পাগলার উপর প্রতিশোধ গ্রহণের মনস্থ করি। আমাদের নেতা খাঁদা ওরফে খোকাবাবুর মতে মলিনার এতে কোনও দোষ ছিল না। কারণ মলিনা সব সময়ই বেশ্যানারী মলিনা। ওদের ওসব পেশা ত জানা কথা, ও-ত বিশ্বাসঘাতকতা করবেই। কিন্তু পাগলা সব জেনে-শুনে পরের ভাগে ভাগ বসায় কেন? এ'ছাড়া খাঁদার মতে পুলিশে এইজন্য খবর দেওয়াটা ছিল তার পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ। হন্যে কুকুরের মত এক পাড়া থেকে আর এক পাড়ায় তাড়িয়ে নিয়ে আমাদের অতিষ্ঠ করে তুলবে পুলিশের দল। এ পৃথিবীতে আমরা না পারব বাঁচতে, না পারব জীবনটা ভোগ করতে। বাবু! এ আমাদের কাছে অসহ্য। সব দিক বিবেচনা করে আমাদের জীবনের পথের কাঁটা এই পাগলাকে আমরা "ট্যাপ্" করাই মনস্থ করলাম।'

'৪ঠা সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার সময় আমরা দশ জন মিলে পাগলাকে সোনাগাছির ভিতর পাকড়াও করি। সে একজন বন্ধুর সঙ্গে পথ চলছিল। খাঁদা পাগলার গলা ধরে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, 'জানিস আমি কে? আমি আর কেউ নয়, আমি স্বয়ং খোকাবাবু! আমি তোর নাক কেটে দেব।' খাঁদার এই হুঙ্কারের উত্তরে

পাগলা ভীত হয়ে তাকে বললে, 'এবারের মত মাপ কর ভাই, আমি কক্ষনো আর তার ওখানে যাব না।' ইতিমধ্যে পাড়ার মুরুব্বি মণীন্দ্রবাবু সেখানে এসে উপস্থিত হন। সব কথা শুনে মণীন্দ্রবাবু অনুরোধ জানালেন, 'যাক্! এবারের মত ওকে যেতে দাও। ওঁর মধ্যস্থতায় পাগলাকে যেতে দেওয়া হয়, কিন্তু কিছু দূর সে চলে আসার পরই আমি খাঁদার আদেশে তাকে পুনরায় চেপে ধরি এবং গো-বাবু একটা ট্যাক্সি নিয়ে আসে। ব্যাপার দেখে পাগলার বন্ধুটি সরে পড়ছিল। গো-বাবু তাকে চেপে ধরে বলে উঠে, 'যাচ্ছিস্ কোথায় রে শা—', কিন্তু খাঁদা ও-দিনের মত তাকে রেহাই দিতে বলায়, গো-বাবু তাকে ছেড়ে দেয়। এর পর আমরা সকলে মিলে পাগলাকে ট্যাক্সিতে তুলি। ট্যাক্সিখানা গরানহাটার একটা শিব মন্দিরের পাশ দিয়ে চলছিল। এমন সময় হঠাৎ পাগলা চেঁচিয়ে উঠল, 'ওগো তোমরা আমায় বাঁচাও। এরা আমাকে মেরে ফেলবে।' পাগলাকে চেঁচাতে শুনে ড্রাইভার মন্দিরের সামনেই গাড়িটা রুখে দেয়। সত্য গোয়ালা নামে একজন ব্যক্তি সেই সময় মন্দিরে প্রণাম জানাচ্ছিল—'বাবা তারকনাথ!' হঠাৎ ট্যাক্সিখানা থেমে যাওয়ায় ক্যাঁচ করে একটা আওয়াজ হয়। আওয়াজ শুনে সত্য আমাদের দিকে ফিরে দেখে। আমাদের সেখানে দেখে সে ট্যাক্সির কাছে ছুটে আসে। ইতিমধ্যে গোঁসাই নামে অন্য আর একজন পথচারীও অন্যান্য অনেকের সঙ্গে সেখানে এসে ভিড় করে। এই দুই ব্যক্তিই প্রতিবেশী হওয়ায় আমাদের পূর্ব পরিচিত ছিল। এদের মধ্যে গোঁসাইজী এগিয়ে এসে আমাদের শুধালেন, 'আরে! ব্যাপার কি? পাগলা অমন করে চেঁচায় কেন?' পাগলাকে ওরা আমাদের তবলচি বলে জানত। সেজন্য কেউ আমাদের অভিসন্ধি সম্বন্ধে কোনওরূপ সন্দেহ করে নি—যদিও তারা আমাদের প্রকৃতি এবং স্বরূপ সম্বন্ধে ভালরূপেই জানত। যে কারণেই হোক, পাগলা কিন্তু এদের নিকট কোনও কিছু নালিশ জানায় নি। তার দুই চোখ দিয়ে তখন ঠিক বর্ষার ধারার মত জল গড়াচ্ছিল। নিঃশব্দে সে ট্যাক্সির উপর বসে রইল। ঐ মুখ দিয়ে তাঁর একটি রা'ও বার হয়নি। কিন্তু তাদের প্রশ্নের উত্তর দিল খাঁদা নিজে। হেসে ফেলে সে তাদেরকে অভয় দিয়ে জানাল, 'আরে! আপনারাও যেমন! আমরা মদটা খেয়েছি, একটু নেশাও হয়েছে। এখন যাচ্ছি আর এক জায়গায় খেতে, একটু ফুর্তি করতে, হে হে—।' কয়েক মিনিটের মধ্যেই ট্যাক্সি-খানা আমাদের নির্দেশ মত গঙ্গার ধারে এসে দাঁড়াল। ট্যাক্সিটাকে বিদেয় দিয়ে আমরা আরও কিছুটা মদ খেলাম। সেই সঙ্গে আমরা পাগলাকেও মদ

খাওয়ালাম। শেষ পর্যন্ত পাগলার বোধ হয় ধারণা হয়েছিল যে আমরা তাকে দুই-একটা চড়-কাপড় দিয়েই ছেড়ে দেব। এজন্যই বোধ হয় সে আমাদের সকল কথাই শুনে চলছিল! এরপর আমরা ধীরে ধীরে গঙ্গার ধার দিয়ে অগ্রসর হই। রাত তখন হবে আটটা। ইতিমধ্যে গঙ্গা পার হয়ে আমাদের পরিচিত গৌরী সেখানে এসে হাজির হ'ল। গৌরীরা ছিল একজন চোরাই মালের ক্রেতা। চুরি-টুরি বা খুন-খারাপের মধ্যে সে কখনও থাকে নি। তাকে সেখানে দেখে খাঁদা বলল, 'একে এখানে এনেছি ট্যাপ করব বলে। আসবি আমাদের সঙ্গে?' ট্যাপ্ করার প্রকৃত অর্থ গৌরী জানত। সে আমাদের সঙ্গ নিচ্ছিল চোরাই মালের আশায়। খুন-খারাপিকে সে বড্ড ভয় করে। ট্যাপের কথা শুনে সে যেমন নিঃশব্দে এসেছিল, তেমনি নিঃশব্দেই সেখান থেকে সরে পড়ল। বিনানুমতিতে সরে পড়ায় গৌরীর উপর খাঁদা ভীষণ চটে গেল। খুনের নেশায় তাকে ততক্ষণ পেয়ে বসেছে। ক্ষেপে উঠে খাঁদা জানাল, 'আচ্ছা শা— তোকেও দেখে নেব আমরা।' এরপর খাঁদা পাগলাকে কঠিন কণ্ঠে আদেশ করল, 'যা, নেমে যা গঙ্গায়, স্নান করে আয়।' আবিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় পাগলা গঙ্গায় নেমে চান করে এল। পাগলা উপরে এলে খাঁদা জিজ্ঞেস করল, 'কিরে! গঙ্গাজল পান করেছিস?' উত্তরে পাগলা তাকে জানাল, 'না ভাই পান করি নি।' ধমকে উঠে খাঁদা আদেশ করল, 'যা, শীঘ্রি গঙ্গা জল খেয়ে আয়।' পাগলা পুনরায় জলে নেমে অঞ্জলি ভরে গঙ্গোদক পান করে এল। আমরা শুনেছি পাগলা ভালরূপ সাঁতার জানত। সে বহুবার সাঁতরে গঙ্গার এপার-ওপারও হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সে একবারও পালাবার চেষ্টা করে নি। এরপর খাঁদার নির্দেশে আমরা তাকে নিকটের এক কালভৈরবের মন্দিরে নিয়ে আসি। খাঁদা পূর্বের মত তাকে আদেশ জানায়, 'যা, নমস্কার করে আয়।' ঠাকুরকে প্রণাম জানিয়ে ফিরে এলে খাঁদা পাগলাকে শুধোয়, 'চরণামৃত একটু খেয়েছিস তো?' উত্তরে পাগলা তাকে বলে, "না ভাই, খাই নি তো।' খাঁদা আবার ধমকে উঠে বলে, 'খাস্ নি! যা শীঘ্রি খেয়ে আয়।'

'আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পাগলা মন্দিরের পুরোহিতকে বা আর কাউকে তার এই আশু বিপদের সম্বন্ধে কোনও নালিশ জানায় নি। এমন কি, মন্দিরের দরজা বন্ধ করে আত্মরক্ষার চেষ্টাও সে করে নি। চরণামৃত পান করে সুবোধ বালকের মতই সে ফিরে আসে। এরপর আমরা পাগলাকে কুমারটুলির একটা শূয়ার্ড ডিচের [মেথর-গলি] মধ্যে টেনে আনি। অপরিসর জনপ্রাণীহীন

গলির পথ। একমাত্র মেথররা সেই পথে যাতায়াত করে। সেখানে চারিদিক অন্ধকার—নিঃশব্দ অন্ধকার। হঠাৎ খাঁদা আস্তিনার তলা থেকে হাতির দাঁতে বাঁধান তার শখের ছুরিখানা বার করে সেটা ডান হাতে উঁচিয়ে ধ'রে, বাম হাতে পাগলার জামার কলারটা চেপে ধ'রে জিজ্ঞেস করল, 'বল, বল দিকিনি পাগলা এটা কি ?' আমাদের আসল উদ্দেশ্যটা ততক্ষণে পাগলার কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। সে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে উত্তর দিল, 'ওটা ভাই, ছুরি! তোরা তো আমাকে মেরেই ফেলবি, আমি কিন্তু ভাই নির্দোষ।' তার এই কাতরোক্তির উত্তরে খাঁদা তার মুখটাকে বীভৎস করে বলল, 'ও সব কথা আর নয়। বিচার হয়ে গেছে, এইবার শাস্তির জন্য প্রস্তুত হ। হাঁ, একটা কথা। তোর কোনও শেষ ইচ্ছা আছে ?' হঠাৎ পাগলার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, 'মলিনাকে একবার দেখব।' পাগলার কথায় আমরা অবাক হয়ে গিছলাম। এ্যা! পাগলা বলে কি ? যে মলিনার জন্য এত কাণ্ড, সেই মলিনাকেই সে দেখবে! হঠাৎ লক্ষ্য করলাম খাঁদার চোখ ছুটো জ্বল জ্বল করে জ্বলে উঠল। তখন ঘটনাস্থলের চারিদিকে সেখানে শুধু মসীঘন অন্ধকার। দেখা যায় শুধু খাঁদার ছুটো চোখ, আর তার হাতের ধারালছুরিখানা। এরূপ অবস্থায় খাঁদা প্রায়ইহয়ে যেত একটা নির্দয় পশুর মত। এমনকি, তার চেহারাও যেতপরিপূর্ণরূপে বদলে। এই সময় আমরাও পর্যন্ত তাকে ভয় করতাম। হিংস্র পশুর মত এগিয়ে এসে খাঁদা হুকুম করল, 'ধর বেটাকে ভাল করে।' আমি আর গো-বাবু, ছ'জনে তার ছ'টো হাত জোর করে চেপে ধরি—খাঁদার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর ছিল না। অন্ধকারের মধ্যেও আমরা লক্ষ্য করি, পাগলার চোখ ছুটো ভয়ে বুজে গেলো। দেহ-বিজ্ঞানের সম্বন্ধে খাঁদার কিছু জ্ঞান ছিল। তার ঘরে আমি অ্যানাটমির কয়েকটি চার্টও টাঙান দেখেছি। হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস্ প্রভৃতির অবস্থিতি তার অজানা ছিল না। হঠাৎ আওয়াজ হ'ল—ফ্যাচ্, ফ্যাচ্, ফ্যাচ্। হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য করে খাঁদা তিন-তিনবার তার ছুরিখানা পাগলার বুকের ভিতর বসিয়ে দিলে। বিনা প্রতিবাদে পাগলার দেহটা রক্তাপ্লুত অবস্থায় মাটির উপর লুটিয়ে পড়ল। ব্যাপারটা দেখে আমরা একটু ভয় পেয়েছিলাম, হাজার হোক পাগ্‌লা আমাদের পরিচিত ছিল। আমাদের মনের এই দুর্বলতা খাঁদার চোখ এড়ায় নি। সে আমাদের সাহস দিয়ে বলে উঠে, 'কি রে! তোরা ভয় পেয়েছিস ? এই কি আমাদের প্রথম কাজ ?' এর পর ধীর স্থির মস্তিষ্কে খাঁদা গো-বাবুকে আদেশ জানায়, 'যা তোর ডলিকে নিয়ে হাওড়ার দিকে সরে

পড়, আমিও মলিনাকে নিয়ে কোলকাতা ছাড়ব।' গো-বাবু চলে গেলে খাঁদা আমাকে নিয়ে তার কুমারটুলির বাটীতে আসে। সামনের রকটার উপর বসে পাড়ার দেবেনবাবু হাওয়া খাচ্ছিল। আমাদের জামা-কাপড়ে রক্তের দাগ দেখে সে শুধাল, 'কিরে! তোদের জামা-কাপড় রাঙা কেন?' খাঁদা আস্তিনার ভিতর থেকে তার ছুরিখানা বার করে ইশারায় তাকে চুপ করতে বলে। দেবেন ভয় পেয়ে চুপ করে যায় এবং সেই সুযোগে আমরা বাটীর ভিতর এসে জামা-কাপড় ছাড়ি। এর পর খাঁদার আবার অন্য এক খেয়াল হলো। সে আমাকে নিয়ে পুনরায় অকুস্থলে ফিরে আসে। আসবার সময় একটি ভোজালিও জোগাড় করে। ভোজালিটি দিয়ে সে পাগলার গোড়ালির শিরা দুটো কেটে দেয় এবং তার পর পাগলায় মুণ্ডটাও এক কোপে বিচ্ছিন্ন করে আমাকে একটা বোরা আনবার জন্য আদেশ জানায়। আমি বোরা নিয়ে ফিরে এসে দেখি খাঁদা মুণ্ড হাতে দাঁড়িয়ে আছে। ঐ সময় গর্বভরে খাঁদা আমাকে জানায়, 'জানিস্! ন্যাকড়ায় জড়িয়ে মুণ্ডটা মলিনাকে দেখিয়ে এলাম। আর সেই সঙ্গে তাকে জিজ্ঞেস করে এলাম, আর কাউকে সে ভালবাসবে কি না? এর পর খাঁদা বোরাটার মধ্যে মুণ্ডটা পুরে নিয়ে গঙ্গার ঘাটে আসে। ঘাটের উপর খাঁদার পিতার এক বন্ধু একটা পোষা কুকুর নিয়ে বসে ছিল। খাঁদাকে মুণ্ডটা জলে ফেলতে দেখে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করল, 'কিরে খাঁদা, কি ফেল্‌লি জলে?' নির্বিকারভাবে খাঁদা উত্তর দিলে—'আজ্ঞে! ও কিছু নয়, একটা মরা বেড়াল।' সব কাজ ফতে করে আমরা একটা সরু গলির পথ ধরে ফিরে আসছিলাম, এমন সময় আমরা লক্ষ্য করলাম খাঁদার জুতা দুটো রক্তে ভিজে গেছে। জুতা দুটো খাঁদা একটা গর্তের মধ্যে গুঁজে দিয়ে শুধু পায়ে চলে আসে। হাঁ হুজুর, জুতা দুটো আমি আপনাদের বার করে দেব। এর পর খাঁদার বাটিতে পুনরায় ফিরে এসে আমরা উভয়ে আর একবার জামা-কাপড় ছাড়ি। এইজন্যেই আপনারা আমাদের দু'প্রস্থ রক্ত মাখা জামা-কাপড় পেয়েছিলেন। এর পর খাঁদার কি মনোরোগ হয়েছিল জানি না; সে আমাদের নিষেধ সত্ত্বেও অকুস্থলে বারবার ফিরে যেত। যাকে তাকে সে নিজের এই বীরত্ব সম্বন্ধেও ফলাও করে গল্প বলত। ব্যাপার দেখে আমি খাঁদাকে নিয়ে দেওঘরে আসি। সেইখানে খাঁদা 'রাজা অফ্ কুমারটুলি' এই নামে পরিচয় দেয় এবং এর ফলে আমাকে খাঁদার দেওয়ান সাজতে হয়। আমরা এখানে দানধ্যান শুরু করি, ভিখারিদেরও খাওয়াতে থাকি। আমাদের রাজোচিত ব্যবহারে দেওঘরবাসীরা মুগ্ধ হয়ে উঠে। এই সময় খাঁদার খেয়াল

হয় তার রানীকে—অর্থাৎ কি'না মলিনাকে সে সেখানে আনবে। আমরা শুনে ছিলাম যে আপনারা মলিনার বাটীতে পাহারা বসিয়েছেন। হাঁ হুজুর! আপনি ঠিকই জেনেছিলেন যে মলিনাকে না দেখে খাঁদা কিছুতেই থাকতে পারে না। মলিনার ওখানে সে আসবেই। আমরা কোলকাতায় ফিরে মলিনার বাটী আসি। খাঁদা দেওয়ালের থড়া বেয়ে উপরে উঠে, জানালা ভেঙে মলিনার ঘরেও ঢোকে। খাঁদা ঘরে ঢুকে মলিনাকে ক্লোরোফর্ম করে দড়ি বেঁধে নীচে নামিয়ে দেবে এবং আমি নীচে থেকে মলিনাকে লুফে নিয়ে তাকে ট্যাক্সিতে বসিয়ে দেব —এরূপ আমাদের বন্দোবস্ত ছিল, কিন্তু মলিনা হঠাৎ খাঁদাকে দেখে ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠে। চেঁচামেচি শুনে পুলিশ এবং আশপাশের দোকানদারেরা ছুটে আসে। ইতিমধ্যে খাঁদাও উপর হতে নীচে লাফিয়ে পড়ে। পুলিশ এবং রাস্তার লোকেরা আমাদের তাড়া করে। খাঁদা এইবার পকেট থেকে তার গুলিভরা পিস্তলটা বার করে উপর্যুপরি গুলিবর্ষণ শুরু করে। ফলে লোকজনেরা পিছিয়ে পড়ে এবং আমরাও সরে পড়তে সক্ষম হই। যাই হোক, ঈশ্বরের দয়ায় সে যাত্রা আমরা ধরা পড়ি নি, কিন্তু এ যাত্রায় আমি ধরা পড়লাম। হাঁ হুজুর, খাঁদার দেওঘরের আস্তানা আপনাকে আমি বাৎলে দেব। সে এখনও সেখানেই আছে এবং আমার জন্য সেখানে সে অপেক্ষা করছে। কিন্তু দেখবেন হুজুর! আমার এই স্বীকারোক্তির কথা সে যেন না জানে। এ'কথা জানতে পারলে তার হাতে আমারও মৃত্যু নিশ্চিত। হাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। পাগলাকে হত্যা করার পরদিনই খাঁদা আমাকে নিয়ে প্রতিশ্রুতি মত গৌরীর খোঁজে শেওড়াফুলি যায় এবং সেখানে তাকে না পেয়ে তার বন্ধুদের মারপিট করে আসে। আসলে খাঁদা কাউকে কখনও ক্ষমা করে নি, আমাকেও সে ক্ষমা করবে না। দেখবেন হুজুর, আমাকেও সে হত্যা করবে। আপনিও খুব সাবধানে থাকবেন হুজুর! দেওঘরের রাস্তায় যদি একবার সে আপনাকে দেখে ত তৎক্ষণাৎ সে আপনাকে গুলি করবে।"

উৎকট শোণিতাত্মক অপরাধীরা যে কিরূপ ভীষণ নিষ্ঠুর এবং ভয়ঙ্কর হ'তে পারে; তা উপরের ঐ পাগলা-হত্যা মামলা কাহিনীটি থেকে বুঝা যায়। য়ুরোপে এমন অনেক অপরাধীর কথা শুনা গেছে, যারা কিনা কয়েক জন মানুষ হত্যার পর, পরিশেষে মানুষের অভাবে কয়েকটা গরু-বাছুর নিহত করেছিল। হ্যাভলক্ এলিস সাহেবের "ক্রিমিনাল" নামক পুস্তকে এই ধরনের কয়েকজন অপরাধীর

উল্লেখ আছে। কলিকাতার বিগত সাম্প্রদায়িক মহাদাঙ্গার সময় আমি নিজেও এইরূপ বহু ঘটনা লক্ষ্য করেছি। এই সময় জনৈক ব্যক্তি তিন চার ব্যক্তিকে হত্যা করার পর কাতান [খাঁড়া] হাতে ছুটাছুটি করতে থাকে। কিছুতেই তাকে নিরস্ত করতে না পেরে তার স্ব-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা তাকে উপর্যুপরি লাঠির আঘাত করে তাকে অজ্ঞান করে ফেলে তবে তার হাত থেকে ঐ অস্ত্র কেড়ে নিতে পেরেছিল। তা' না হলে ঐ ব্যক্তি ভিন্ন সম্প্রদায়ের ন্যায় স্ব-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদেরও নিহত করে ফেলতো। উৎকট ও অত্যধিক শোণিত-স্পৃহার অবস্থিতির জন্যই এরূপ হয়ে থাকে। এ সম্বন্ধে নিম্নে উদ্ধৃত অন্য আর একটি বিবৃতিও প্রণিধানযোগ্য।

"আমার ইন্‌ফরমার শিউচরণ ওরফে শিউচরণিয়া এসে আমাকে জানায়, 'হুজুর! জেলা খারিজ গুণ্ডা খাঁদা কোলকাতায় ফিরে এসেছে।' আমি উৎফুল্ল হয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে চিৎপুরের একটা তেতলার ঘরে উপস্থিত হই। বেশ্যা-বাটীর সেই ঘরের ভিতর তখন তাদের গান-বাজনা চলছিল। দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকতেই খাঁদা জানালা গলে লাফিয়ে পড়ে। আমরা তাড়াতাড়ি নীচের ফুটে নেমে এসে কিন্তু খাঁদার কোনও চিহ্নও দেখতে পাই না। ফুটের পাশের দোকানে একটা পানওলা বসেছিল। হঠাৎ লক্ষ্য করি তার গাল দু'টো টকটকে লাল এবং তার চোখ দিয়ে জল বেরুচ্ছে। পানওয়ালা নাকি খাঁদাকে ফুটের উপর বার দুই-তিন ভল্ট খেয়ে লাফিয়ে পড়তে দেখে। নীচে নেমে সে নিজে নিজেই তার হাত-পা টেনে সোজা করে। তারপর পানওয়ালার গালে ঠাস্ করে একটা চড় কসিয়ে বলে উঠে, 'দে শালা একটা সিগারেট দে।' পানওয়ালা ভয়ে তাড়াতাড়ি একটা সিগারেট বার করে দেয়। এরপর খাঁদা তাকে আর একটা চড় দিয়ে হুকুম করে, 'দে শালা, শীগ্‌গির ধরিয়ে দে।' এরপর পানওয়ালা তার সিগারেটটা ধরিয়ে দেয়। খাঁদাও গুরুগম্ভীর চালে শিস্ দিতে দিতে সরে পড়ে। আমরা পানওয়ালার এই সব কথা বিশ্বাস করি না এবং তাকে খাঁদার কোনও বন্ধু বলে সন্দেহ করি। এর কয়েক দিন পর শিউচরণের নির্দেশমত আমি খাঁদার গোপন ডেরায় হাজির হই এবং সেখান থেকে খাঁদাকে সাইকেল চড়ে বেরিয়ে যেতে দেখি। আমি এবং শিউচরণ তাকে তাড়া করি কিন্তু তাকে আমরা ধরতে সক্ষম হই না। এর দুই দিন পরেই সন্ধ্যার দিকে খবর আসে যে শিউচরণিয়া নিহত হয়েছে। যথাসম্ভব অকুস্থলে হাজির হয়ে দেখি যে শিউচরণের বিগতপ্রাণ দেহ রক্তাপ্লুত অবস্থায়

একটা রকের উপর পড়ে রয়েছে। পাগলা হত্যাকাণ্ডের প্রায় এক বৎসর পূর্বে এই শিউচরণ হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়েছিল।"

মৎ-সম্পাদিত ও প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা পুলিশ জার্নাল Vol-1, Part 1 পুস্তকে সুন্দরী মলিনা, প্রখ্যাত খাঁদা ওরফে খোকাবাবু এবং তাহার সহকারীদ্বয়, গো-বাবু এবং কে-বাবুর প্রতিকৃতি দেওয়া আছে। এদের এই প্রতিকৃতিগুলির মধ্যে সূক্ষ্মভাবে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হ'তে দেখা যায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলি আকৃতিগত না হলেও উহারা প্রকৃতিগত হয়ে থাকে এবং সচরাচর উহারা সাধারণ মানুষের নজরে পড়ে না। মানুষের অন্তর্ভাব বাইরেও কিছুটা পরিস্ফুট হ'তে বাধ্য। উহা বিশেষ করে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী, মুখের ভাব এবং চাল-চলনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। অভিজ্ঞ মানুষ তার অভিজ্ঞ দৃষ্টি তথা ইনষ্টিংক্ট দ্বারা ব্যক্তি বিশেষের এই সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য সকল জেনে নেয়। অভিজ্ঞ পুলিশের চোখে এই সকল বৈশিষ্ট্য সহজেই ধরা পড়ে। এর কারণ, প্রত্যেক প্রফেশনের লোকেদের স্ব স্ব প্রফেশন বা ব্যবসায় সম্বন্ধীয় ব্যাপারে পৃথক পৃথক ইন্‌ষ্টিংক্ট জন্মায়। স্ব স্ব ব্যবসায় ক্ষেত্রে বুদ্ধির চেয়ে অনেক বেশি সাহায্যে আসে এই প্রেরণা। মানুষের এই ইনষ্টিংক্ট বা এই প্রেরণার মধ্যে যুক্তি কিংবা তর্ক থাকে না। এ সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন করলে তার একটি মাত্র উত্তর হয়—"জানি না কেন, আমার মন বলছে—তাই।" আসলে এই সকল প্রকৃতিগত অতি সূক্ষ্ম পরিবর্তন সকল অভ্যাসজনিত শান্তিরক্ষক এবং লোকচরিত্র-অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের চক্ষে অতি সহজেই ধরা দেয়। এই দৈহিক পরিবর্তন এত সূক্ষ্ম যে উহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। উহা মাত্র অভিজ্ঞ দৃষ্টি দ্বারা অনুভব করা যায়। এই স্বভাবজাত ইন্‌ষ্টিংক্ট বা প্রেরণা মেয়েদের এবং শিশুদের মধ্যে অন্য কারণে দেখা যায়। এর কারণ এদের অনুভূতি আদিম মানুষের মত অতীব সূক্ষ্ম থাকে। অধিকাংশ শিশুকেই একটি চোরের এবং একটি ভাল লোকের ফটো দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলে দিতে পারে কোনটি চোর এবং কোনটি বা ভাল লোক। [কিন্তু বড় হলে তাদের আদিম মানুষ সুলভ সূক্ষ্ম দৃষ্টি তারা হারায়।] কোনও এক বালিকা একজন খুনীর ফটো দেখে ভয়ে কেঁদে ফেলেছে—প্রত্যক্ষরূপ পরীক্ষা দ্বারা এমনও দেখা গিয়েছে ; অথচ ফটোটি যে একজন খুনীর তা তাকে পূর্ব হ'তে বলে দেওয়া হয় নি।

যে সকল আত্মহন্তারক ছুরিকা বা পিস্তল দ্বারা আত্মহত্যা করে তা তারা

করে অ্যাকটিভ ভাবে এবং যে সকল আত্মহন্তারক প্রায়োপবেশন দ্বারা তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করে, তা তারা করে প্যাসিভ্ ভাবে।

এর ফলে বিবিধ বৃত্তির উৎপত্তির মূল হেতু একই থাকাতে যে কোনও মুহূর্তে ইহাদের একটি থেকে অপরটির উদ্ভব হতে পারে। ইহার প্রমাণ স্বরূপ নিম্নে একটি চিত্তাকর্ষক বিবৃতি উধ্বৃত করে দেওয়া গেল।

"আমার স্বামী ক্রুদ্ধ হয়ে পিত্রালয় থেকে আমাকে নিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু পিতা তাঁর মত পশুকে বিশ্বাস করে তাতে মত না দেওয়ায় তিনি আমাদের দুয়ারে বসে বিষ পান করে অচৈতন্য হয়ে পড়েন। বলা বাহুল্য তাঁকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল। ঐখানে চিকিৎসার পর তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে এবং ধীরে ধীরে তিনি সুস্থও হয়ে উঠেন। এই দিন রাত্রে তিনি অলক্ষ্যে হাসপাতাল থেকে পলায়ন করে ছুরি হাতে আমাদের বাড়িতে ঢুকে আমাকে খুন করবার চেষ্টা করেছিলেন। সহসা জেগে উঠে চীৎকার করে লোক জড় না করলে সেই রাত্রে তাঁর হাতে নিশ্চয়ই আমাকে প্রাণ হারাতে হতো।"

মানুষের ক্রোধ, ক্ষোভ, হিংসা প্রভৃতি উত্তেজনার কারণ ঘটলে স্বভাবতঃই তাদের সুপ্ত শোণিতস্পৃহা জাগ্রত হয়ে বেগে বহির্গত হয়ে আসে। তখন উহা কখনও অপরের শোণিত পাত করে, কখনও বা উহা নিজেরই শোণিত পাত করতে চায়। এই অবস্থায় উহা প্রায়ই আত্মহত্যা রূপ প্যাসিভ বা নিষ্ক্রিয় স্পৃহা কিংবা হত্যা রূপ সক্রিয় বা অ্যাকটিভ্ স্পৃহাতে পর্যবসিত হয় বা তা হতে পারে। এই সম্বন্ধে প্রমাণ স্বরূপ অপর আর একটি বিবৃতি আমি নিম্নে উধ্বৃত করে দিলাম।

"অমুক থানার বাবু অকারণে আমাকে গ্রেপ্তার করে সর্বসমক্ষে আমাকে বিনাদোষে অপমান করলেন। জামিনে মুক্ত হয়ে এসে আমি ক্ষোভে ও ক্রোধে রাত্রে ঘুমাতে পারি নি। হঠাৎ ভবযন্ত্রণা হতে মুক্ত হবার জন্য আমি গলায় দড়ি দিতে প্রস্তুত হলাম। এই উদ্দেশ্যে ঘরের কড়িতে দড়িটি টাঙিয়েই কিন্তু আমার ভাবান্তর উপস্থিত হলো। আমার মনে হলো এম্নি না মরে ওকে মেরে মরাই ভালো। ঐ সময় রাত্রে অমুক বাবু রাউণ্ডে বার হন তা আমি জানতাম। আমি তৎক্ষণাৎ বাক্স থেকে আমার ধারালো ছুরিখানা বার করে বেরিয়ে পড়ছিলাম। কিন্তু এর পর আমার মনে হলো, 'থাক দরকার নেই, আমি ভেবে চিন্তে কালকে কর্তব্য নিরূপণ করবো।' কিন্তু পরের দিন আর আমি একটুও

নিজেকে সংযত করতে পারি নি। তাই প্রতিশোধার্থে এইরূপ এক অপকার্য আমি করে বসলাম।"

এইখানে দেখা যায় যে প্রতিরোধ-শক্তির হ্রাস বা বৃদ্ধি বারে বারে আমাদের মধ্যে এসে যায়। অর্থাৎ উহাদের আধারভূত সূক্ষ্মস্নায়ুর ভাঙাগড়া বারে বারে আমাদের মস্তিষ্কে ঘটে থাকে। ক্রোধ বা ক্ষোভের উগ্র প্রবাহ দ্বারা এই সূক্ষ্ম-স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত বা স্তিমিত হলে এই প্রতিরোধ শক্তির অবসান ঘটে এবং তৎজনিত অপস্পৃহার অংশ বিশেষ শোণিতস্পৃহা [কিংবা দ্রব্য স্পৃহা] তার অ্যাকটিভ বা প্যাসিভ রূপে প্রকাশ পায়। কিন্তু প্রতিরোধ সম্পর্কীয় সূক্ষ্মস্নায়ু পুনরায় সবল হলে বা পুনর্গঠিত হলে উহা পুনরায় সুপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

আমার বিশ্বাস এই, ক্রোধ ও ক্ষোভ উহার উগ্র প্রবাহের দ্বারা মানুষের শোণিত-স্পৃহাকে এবং লোভ, অভাব প্রভৃতি উহাদের হাল্কা প্রবাহের দ্বারা তাদের দ্রব্য-স্পৃহাকে উদ্বেলিত করে থাকে।

[কোনও এক ব্যক্তি আত্মহত্যা করতে বাটীর কক্ষের কড়িতে দড়ি ঝুলালো কিন্তু হঠাৎ তার মনে হলো এটি শয়ন কক্ষ। সন্তানরা এতে ভয় পাবে। তাই ওই কক্ষটি নষ্ট না করতে সে বাগানে একটা গাছের ডালে দড়ি টাঙালো। উদ্দেশ্য—সে গলায় দড়ি দিয়ে মরবে। সেই সময় একটা গোখুরা সাপকে ফণা তুলে আসতে দেখে সে প্রাণ ভয়ে পালিয়ে গেল।]

আদালতের মরা কাগজ ও নথীপত্র থেকে এবং জেলে বন্দী অবস্থায় অপরাধী-দের দেখে তাদেরকে বুঝতে চেষ্টা করা বৃথা। ওই গুলিকে 'কুকড ফুড' এর সহিত তুলনা করা চলে। জেলে থাকাকালীন কোনও অপরাধী প্রয়োজনীয় ইনট্রসপেকসন [অবিভ্যক্তি] দেবে না।

আমি ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হেতু প্রাথমিক অপরাধ থেকে প্রকৃত অপরাধীদের সৃষ্টির বিষয় বহুবার বলেছি। এক্ষণে নিম্নে উহার প্রমাণ স্বরূপ একটি বিবৃতি উধ্বৃত করলাম।

"প্রায় এগার বৎসর পূর্বে একজন ভদ্রবংশীয় ছোকরা অপরাধীকে আমার কাছে ধরে আনা হয়। বলাবাহুল্য, ছেলেটি একজন দৈব-অপরাধী ছিল। তার অপকর্মের কৈফিয়ৎ স্বরূপ সে একটি বিবৃতি দেয়—'কি করব বলুন! হঠাৎ সেদিন স্ত্রী বলে উঠল, "লজ্জা করে না তোর, না দিয়েছিস দু'টা গহনা, না দিতে পারিস ভাল করে খেতে। এর উপর আবার কথা।' ঐ দিনই আবার আমি পিতার নিকট থেকে একটি পত্র পাই। পত্রটিতে এরূপ লেখা ছিল 'তুমি

আমার কুসন্তান। আজ পর্যন্ত দশটি টাকাও পাঠালে না। তোমার মরাই ভাল,' ইত্যাদি। পারিপার্শ্বিক অবস্থা আমাকে পাগল করে তুললে আমি তহবিল তছরুপ করে বসি।' ছেলেটির প্রতি আমার মন সহানুভূতিতে ভরে উঠে। আমি তার সঙ্গে নানা বিষয় আলোচনা করি। সুসভ্য মানুষের মধ্যে দৃষ্ট প্রত্যেকটি সূক্ষ্ম ও স্থূল বৃত্তিরই সন্ধান তার ভিতর আমি পাই। দয়া, মায়া, স্বদেশপ্রেম, জনহিতৈষণা কোনও কিছুই তার মধ্যে অভাব দেখি না। কিন্তু তা সত্বেও আমি সেই দিন তার কোনও সাহায্যে আসি নি। এই ঘটনার প্রায় চার বৎসর পর পুনরায় লোকটির সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমি জানতে পারি ইতিমধ্যে সে আরও চারবার জেল খেটেছে। সে আমাকে দেখে কাঁদতে থাকে এবং প্রকাশ্যে আমার পা জড়িয়ে ধরে। আমি বুঝতে পারি যে, তার মধ্যে আত্মসম্মান, লজ্জা প্রভৃতি বোধের চিহ্নমাত্রও আর নেই। ইতিমধ্যেই তার মধ্যে নৈতিক-অসাড়তার আগমন শুরু হয়েছে। আমি পূর্বের ন্যায় তার সঙ্গে নানা বিষয় আলোচনা করতে চাই, কিন্তু আলোচনার বিষয়-বস্তুগুলি সে বুঝেও বুঝতে পারে না। কোনও বিষয়েই তাকে আর আগ্রহশীল দেখা যায় না। আমি বেশ বুঝতে পারি যে স্বদেশপ্রেম, লোকহিতৈষণা প্রভৃতি সূক্ষ্ম বৃত্তিগুলি সে হারিয়ে ফেলেছে। এর প্রায় পাঁচ বৎসর পর পুনরায় তার সঙ্গে আমার দেখা হয়। এই সময় সে আমাকে চিনেও চিনতে পারে না। তাকে আমি অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করতে ও সেই সঙ্গে লক্‌আপ-এর দরজার গায়ে মাথা খুঁড়তেও দেখি।

উপরে বর্ণিত অলসতা, ভাববৃত্তি, দম্ভবৃত্তি এবং নিষ্ঠুর বৃত্তি ছাড়া আর কোনও সূক্ষ্ম বা স্থূল বৃত্তির সন্ধান আমি তার মধ্যে পাই না। তাকে কতকটা অলস প্রকৃতির এবং বোকার মত দেখায়। তার ভাষার মধ্যে কোনওরূপ বাঁধন দেখা যায় না। আমি বুঝতে পারি যে, ইতিমধ্যে সে একটি মানব-দানবে পরিণত হয়েছে।"

[অপরাধতত্ত্ব গবেষণা ব্রেনের সহিত মনের সম্পর্ক স্থাপনের উপর বেশী নির্ভরশীল।]

মাছ, উভচর সরীসৃপ পক্ষী, নিম্ন স্তন্যপায়ী লেমুর বানর গরিলা ও মানুষের মস্তিষ্কগুলি পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে ওগুলি ক্রমশঃ ছোট হতে বড় হচ্ছে। [প্রবন্ধের পূর্বাংশ দ্রঃ]

মানুষের উদ্ভবের পরও বহুকাল এর ব্যতিক্রম হয় নি। পৃথিবীতে পর

পর তিন শ্রেণীর মানুষের উৎপত্তি। যথা (১) আদিযুগীয় [সিনান-থ্রোপাস] (২) মধ্যযুগীয় [নিয়ানডারথাল] (৩) এবং আধুনিক মানুষ [ক্রো ম্যাগনান আদি।]

আদিযুগীয় মানুষের মুখমণ্ডলের নিম্নাংশ, মধ্যযুগীয় মানুষের মুখমণ্ডলের মধ্যাংশ এবং আধুনিক মানুষের মুখমণ্ডলের উপরি অংশ বেশী প্রশস্ত। ক্রম বর্ধমান মস্তিষ্কের স্থান সঙ্কুলনের জন্ম ইহা ঘটে। উপরন্তু—মানুষের মস্তিষ্কের বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ওদের ব্যবহৃত প্রস্তরাস্ত্র গুলিও ক্রমোন্নত হয়েছে। [বুদ্ধি ও জ্ঞানের সঙ্গে মস্তিষ্কের বর্ধন অবশ্যম্ভাবী।] বর্তমান মস্তিষ্ক-বিদ্‌দের ধারণা মস্তকে দুইটি মগজ আছে। উহাদের কর্মধারা পৃথক হলেও উহাদের একটি অন্যটির পরিপূরক। ১৯৫০ খৃঃ—১৯৬০ খৃঃ মধ্যে মার্কিন ও রুশ মস্তিষ্ক বিশেষজ্ঞরা দুই মস্তিষ্কের পৃথক কাজ কর্ম আবিষ্কার করেন। ১৯৪০ খৃঃ আমিও ওইরূপ ব্যাখ্যা সহ একটি প্রবন্ধ মুদ্রিত করেছিলাম। কিন্তু—তাতে প্রতিবাদ আসতে উহা বাতিল করতে হয়। মাইণ্ডের আউট অফ গিয়ার এবং উহার উইথ ইন গিয়ার সম্বন্ধেও আমি ওই প্রবন্ধে লিখেছিলাম। সেই ক্ষেত্রে দুই মস্তিষ্কের ভারসাম্য নষ্ট হলে অঘটন ঘটা স্বাভাবিক।

আরও কয়েক প্রকার অপরাধ-তত্ত্ব সম্পর্কিত সাক্ষ্য প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"শৈশবে সাউথ স্বারবন স্কুলে বৃষ্টিতে ভিজে এলে জনৈক শিক্ষক রাম-পেয়ারী বাবু কাপড়ের খুঁট দিয়ে মাথা মুছিয়ে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে বহু শিক্ষকের নাম ভুলে গেলেও তাঁর নাম মনে আছে।" "শৈশবে এক থানায় এক দারোগা বাবুকে জনৈক নারীর চুলের মুঠি ধরে পিঠে কিল মারতে দেখি। সেই দিনের সেই পুলিশের উপর বিতৃষ্ণা আমার নিজে পুলিশে ঢুকেও যায় নি"।

[ইহা শিশুমনে স্বল্প আঁচড়ে যে অধিক দাগ পড়ে তা প্রমাণ করে। এজন্য —শিশুদের সুমুখে সাবধানে ব্যবহারাদি করতে হবে। পূর্বে বিদ্যাসাগরের বর্ণ পরিচয়ের "চুরি করা মহাপাপ" বাক্যটির মুদ্রিত অক্ষরের প্রথম পাঠ শিশুমনে ইস্পাতের যন্ত্রের মত গভীর দাগ কাটতো। এটির পঠন বন্ধ অপরাধীদের সংখ্যা বাড়ার একটি কারণ।]

"বাল্যে গ্রামে থিয়েটারের জন্য খাটা খাটুনী করেছি। কিন্তু সন্ধ্যায় উহা দেখতে না দিতে আমাকে কলকাতায় আনা হয়। পরে জীবনে বহু ভালো থিয়েটার দেখেছি। কিন্তু সেদিনকার ওই না দেখা রূপ ক্ষোভ আজও রয়ে গিয়েছে। মনে হয় জীবনের একটা বড় সাধ অপূর্ণ রয়েছে।"

"কোনও এক সত্ব বিবাহিতা স্ত্রীকে একটা উপহার কিনে দিতে তার স্বামী একটি দোকানে আনলো। স্বল্প বিত্তভোগী স্বামী কম দামের এবং তরুণী স্ত্রী বেশী দামের দ্রব্যের দিকে যেতে চায়। শেষে ঐ স্ত্রী একটি মূল্যবান হীরের নেকলেশ কিনতে চাইলে স্বামীর আর্থিক অক্ষমতার জন্য সেদিন তাদের কিছুই কেনা হলো না। কয়েক বৎসর পর স্বামী বহু অর্থের মালিক হলে স্ত্রীকে কিছু উপহার দিতে সেই একই দোকান এলো। কিন্তু—বর্ষীয়সী হিসেবী গৃহিনী স্ত্রীর তখন কম দামের এবং ধনী স্বামীর বেশী দামের দ্রব্যের দিকে মন। পরে—সেই স্বামী সেই একই হীরার নেকলেশটি স্ত্রীকে কিনে দিতে চাইলে স্ত্রীর পূর্ব বিষয় মনে পড়ে গেলে সে বলে ছিল—'ওঃ বুঝেছি। কিন্তু সেদিনকার সেই মন আজ আমার নেই। সেদিন ওটা পেলে যা আনন্দ হতো তা আজ আর হবে না।"

[ইহা প্রমাণ করে যে জীবনে ইমিজিয়েট সেভিঙ কখনও কাম্য নয়। মানুষের ব্যক্তিত্ব সময়ে বদলে যায়। তাই বিবাহের আনন্দ পেতে বিবাহ সময়ে করা উচিত। যে সময়ের যা তা ঋণ করে করাও ভালো। যৌবনের ও কৈশোরের প্রয়োজন বয়সকালে মেটে না। আজ যা হারানো যায় তা কাল ফিরানো যায় না।]

"কোনও এক ইতালীয় সাধ্বী পত্নী স্বামীর অনাগ্রহে ব্যথিত হয় বললো—এখন আমাকে তোমার ভালো লাগে না। বেশ! তাহলে আমাদের ডাইর্ভোস হোক। তুমি যাকে ইচ্ছে পুনর্বিবাহ করো। একমাত্র ফ্রান্সে পাঠরতা আমার সুন্দরী ভগ্নী নীনাকে বিয়ো করো না। তাহলে ওতে আমার বড্ড কষ্ট হবে। এইরূপ একটি সাজেসসন তার মনে ঢুকিয়ে দিয়ে ঐ স্ত্রী প্যারিসে এসে মেক আপ করে নীনা সেজে রইল। পরে—তার স্বামী প্যারীতে এসে নিজের স্ত্রীকে না চিনে তাকেই নীনা ভেবে পুনর্বিবাহ করেছিল।

[ইহা পুরুষদের নূতনত্ব প্রিয়তা ও সাজেস্‌সনের অসীম ক্ষমতা প্রমাণ করে। এজন্য স্ত্রীদের স্বামীর মন জয় করতে ভঙ্গিমা বদলে এবং বাক্যের স্বর পাল্টে প্রতিদিন নূতন মেক আপ ও সাজগোজ করা উচিত।]

বিঃ দ্রঃ—পত্নীরা নূতন নূতন শাড়ী কিনুন ও প্রতিদিন ওগুলোর রঙ বদলান। প্রসাধন ও খোঁপা বাঁধার ধরণও মধ্যে মধ্যে বদল করুন। অর্থ ও সময়ের বিষয় ভাবলে বিপদ হতে পারে। আনমনা স্বামীকে এইভাবে ঘরোয়া চিকিৎসা করে নিরাময় করা যায়। ডায়েট কন্ট্রোল ও কিছুটা ব্যায়াম ও

কাজকর্ম করে কখনও স্থূল ও কখনও শীর্ণ হন। পুষ্টিকর খাদ্য খেয়ে ও মনে ফুর্তি এনে বয়সকে ধরে রাখা যায়। শুধু চোখের জল ফেলে ফল হয় না।

পতিরা ব্যায়াম ও কম আহারে ভুঁড়ী কমান ও প্রোটিন আহার দ্বারা ফিট থাকুন। স্ত্রীকে মধ্যে মধ্যে উপহার দিন। প্রতি বছর বিবাহের দিনটি মনে রেখে উপহার আনুন। বাইরে কোথাও বেরুলে সদা স্ত্রীকেও সঙ্গে নিন। সাময়িক আনন্দের জন্য সংসারে অশান্তি আনবেন না। অযথা ব্ল্যাক মেইলড্ বা এক্সপ্লয়েটেড হবেন না। (f)

আশ্চর্য এই যে, স্বভাব অপরাধীরা আদি যুগের [কঠোর জীবন সংগ্রামী] শিকারী মানুষের মত স্বল্পকাল বাঁচে এবং তাদের ওদের মত এক কপর্দক'ও সঞ্চয়ের স্পৃহা নেই। কিন্তু আদিকালের কৃষিজীবী মানুষের [এদের জীবন সংগ্রাম কম ছিল] মত অভ্যাস অপরাধীরা তুলনায় বেশীকাল বাঁচে এবং দ্রব্য ও অর্থ সঞ্চয়ে মনোযোগী হয়।

[ইহা প্রমাণ করে যে কোনও কিছু একবার সৃষ্ট হলে তা হারায় না। উহা জীবনের মাধ্যমে সুপ্ত থেকে কিছু ব্যক্তিতে জাগ্রত হয়।]

"এক যুবক তার বন্ধু আসামাত্র তার স্ত্রীকে রেখে ফ্ল্যাট থেকে অন্যত্র যেতো। একদিন ওই যুবক চিৎকার করে পড়শীদের ডাকলে তারা এসে দেখলো যে তার স্ত্রী বিষ পানে অচৈতন্য। পড়শীদের জেরায় ওই যুবক বলেছিল যে সে তার স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালবাসতো। বন্ধুকে পেলে তার স্ত্রী সুখী হবে বুঝে তাকে শান্তি দিতে সে বাইরে যেতো। [পৃঃ ৩০৭ দ্রঃ]

আমরা তদন্তে এলে ওই আত্মহত্যার কারণ স্বরূপ তদন্তার্থে নিম্নোক্ত দুইটি থিওরী ভেবে নিই। [প্রথমটি মৃতার শেষ উক্তি ছিল] উপরন্তু ওই পর্দানশীন নারীর পক্ষে বাইরে থেকে বিষ সংগ্রহ সম্ভব নয়।

(১) ওই উপপতি তার ওই বান্ধবীর স্বামীকে পৃথিবী থেকে সরানোর জন্য ওই বিষ এনে তাকে তার স্বামীকে তা খাওয়াতে বলেছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সে তা না পেরে অনুশোচনায় নিজেই তা খেয়েছিল। [পৃঃ ৩০১ দ্রঃ]

(f) রাইস ইটিং নেশনদের অসুবিধা এই যে ভুঁড়ী ইল্যাসটিক না হওয়ায় উহা একবার বাড়লে পূর্বানুরূপ হওয়া কঠিন। তাতে আহার পূর্বানুরূপ বেশী না হলে হজম গ্রন্থী হতে হজমী রস নির্গত হয় না। তাই বেশী আহার বেশী বয়সে উভয় দিক হতেই ক্ষতিকর। তাই কিশোর বয়স থেকে ভুঁড়ী না বাড়ার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। ভাত উদরে মাদকতা এনে মানুষের মধ্যে কিছুটা আলস্য আনে। তাই মধ্যে মধ্যে সকলের রুটি আহারে অভ্যস্ত হওয়া উচিত।

(২) ওই উপপতি হয়তো অন্যত্র নিজের বিবাহের অভিলাষ ওই নারীকে জানানোয় ওই নারী দুঃখে ও ক্ষোভে আত্মহত্যা করেছে।

ওই উপপতিকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসবাদ করলে প্রকৃত বিষয় প্রকাশ পাবে বুঝে আমরা ওই নারীর উপপতিকে খোঁজাখুঁজি সুরু করে দিই। (f)

কলকাতায় কয়েকটি তরুণ প্রত্যেকে দশটাকা মাসিক চাঁদায় একটি ক্লাব করে। ওই চাঁদায় তারা মাসিক মাহিনাতে একটি ঘটক নিযুক্ত করে। পর্যায়ক্রমে এদের একজন পাত্র ও অন্যেরা পাত্রের বন্ধু সেজে বিভিন্ন পাত্রীর বাড়ীতে পাত্রী দেখতে যেতো। উদ্দেশ্য—প্রতি সন্ধ্যায় বিনা খরচায় জল খাবার খাওয়া ও পাত্রীদের একটি করে গান শুনা। এতে তাদের প্রতি-মাসের চাঁদার টাকা উসুল হয়ে যেতে। আশ্চর্য এই যে, ওদের একজন একটি কুরূপা কন্যার প্রতি দয়াপরাবশ হয়ে তাকে বিয়ে করেছিল।

[ইহা প্রমাণ করে যে অনুকম্পা হতে স্নেহ, স্নেহ হতে ভালবাসা এবং ভালবাসা হতে প্রেম আসে।]

কোনও কন্যা তার কনিষ্ঠ ভগ্নীর সাহায্যে কয় বছর পাশের মেসের এক তরুণের সঙ্গে প্রেম করে। তার ভগ্নী পত্রাদির বাহক ছিল। ঐ কনিষ্ঠ ভগ্নীর পীড়াপিড়ীতে সে ওই কন্যার পিতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করাতে প্রস্তুত হলো। ওই কনিষ্ঠ ভগ্নী তখন ওই তরুণকে বললো : জামাই বাবু! তুমি পুরুষ না। যাও দিদিকে নিয়ে যাও। সে তার দিদিকে বললো : দিদি তুই সতী নস। যা জামাই বাবুর সঙ্গে চলে যা। এরপর ওই তরুণ বিবাহের লগ্নের দুইঘণ্টা আগে পুরুত ও টোপর সহ ট্যাকসি করে ওই বাড়ীর দুয়ারে রাত দুইটায় এলো। কনিষ্ঠাভগ্নী তার দিদিকে বেনারসীর সাড়ী পরিয়ে কপালে চন্দনের কোঁটা দিয়ে ট্যাকসির নিকট পৌছিয়ে দিয়ে ছুটে বাড়ীতে এসে মাকে বললো : মা শীঘ্র এসো। দিদি পালিয়ে যাচ্ছে। মা বেরিয়ে এসে জ্যেষ্ঠ ভগ্নীর চুলের মুঠি ধরে বাড়ীতে নিয়ে এসেছিল। [মামলা থানা পর্যন্ত পৌছয়।]

[ইহা প্রমাণ করে যে মেয়েদের হিংসা বৃত্তি তাদের ত্যাগ করে না। দিদিকে সাহায্য করতে গিয়ে সেও তরুণকে ভালবেসেছিল। হঠাৎ প্রতিরোধ শক্তি হারানোয় সে দিশেহারা হয়ে উঠে। ইহা আরও প্রমাণ করে যে মেয়েরা যে কি চায় তা তারা নিজেরাই জানে না।]

(f) শহরে অর্থলোভে বহু দরিদ্র স্বামী এই ভাবে স্ত্রীর দেহ বিক্রয় করে। এই ক্ষেত্রে চরম নৈতিক অসাড়তার জন্য এরূপ এদেশেও সম্ভব হয়। কিছু দরিদ্র কন্যাও এই ভাবে সংসার পালন করে ভাইগুলিকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে পরে নিজে বিবাহ করে সুখী হয়েছে। [তবে এদের সংখ্যা অত্যল্প] কারও কারও মতে মনকে শুদ্ধ করা গেলেও দেহকে শুদ্ধ করা যায় না।

বিংশ অধ্যায়

॥ অপরাধ-সাহিত্য ॥

মানুষের সভ্যতার ক্রমিক ইতিবৃত্ত অপরাধ সাহিত্য থেকে বুঝা যায়। প্রথমাবস্থায় মানুষ জন্তুদের অনুকরণে বিবিধ ডাক দ্বারা কথোপকথন করতো। পরে কিছুটা উন্নত হলে তারা রেখা চিত্রের সাহায্যে ভাবের আদান প্রদান করেছে। এর পর কিছুটা সভ্য হলে তারা ভাষার অগ্রদূত রূপে কয়েকটি শব্দ সৃষ্টি করে ঐ গুলির সাহায্যে জীবন যাত্রা নির্বাহ করে। আরও পরে অধিকতর উন্নত জীবনের অধিকারী হলে মানুষ ভাষা সৃষ্টি করে সুসভ্য মানুষে পরিণত হয়। অপরাধ সাহিত্য উপরোক্ত রূপ মানব সভ্যতার ক্রমিক বিকাশ প্রমাণ করে।

নানান প্রকারের অপরাধীদের দ্বারা রচিত সাহিত্যকে বলা হয় অপরাধ-সাহিত্য। সভ্য মানুষের অজ্ঞাতে এই সাহিত্য আবহমান কাল থেকে রচিত হয়ে আসছে। অপরাধ এবং অপরাধীদের প্রকৃত মনোভাব সম্বন্ধে বহুবিধ বিষয় এই সাহিত্য থেকে জানা যায়। শুধু তাই নয়—অপরাধী হওয়ার কারণ এবং অপরাধীদের বিভিন্ন সংস্কার ও নিয়ম-কানুন সম্বন্ধেও জ্ঞাত হওয়া যায়। বিভিন্নরূপ ডাক বা শব্দ, চিত্রলিপি, গান, মন্ত্র, কবিতা, উক্তি, খেউড় প্রভৃতি দ্বারা এই অপরাধ-সাহিত্য গঠিত হয়েছে। আমার মতে নিরপরাধ সাহিত্যের ন্যায় অপরাধ-সাহিত্যেরও একটি বিশেষ ধারায় ক্রমবিকাশ হয়েছে। সভ্যতার সহিত সংঘাতের ফলে এই সাহিত্যের স্বরূপ কিছুটা পরিবর্তিত হলেও মূলতঃ উহাকে অপরাধ-সাহিত্যই বলা যেতে পারে। কেবলমাত্র য়ুরোপীয় এবং ভারতীয় অপরাধীদের দ্বারা রচিত সাহিত্য নিয়ে একটি মহাভারত রচনা করা যায়। বর্তমান প্রবন্ধে অপরাধ-সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের মাত্র কয়েকটি করে উদাহরণ দেওয়া হবে। অর্থাৎ কি'না মনস্তত্ত্ব বুঝবার জন্য যেটুকুর প্রয়োজন মাত্র সেটুকুর কথাই বলা হবে। সাধারণতঃ প্রকৃত অপরাধীরা তিন ভাগে বিভক্ত। যথা—স্বভাব, মধ্যম ও অভ্যাস। দৈব-অপরাধী ও অপরাধ-রোগীদের প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে ধরা হয় না। স্বভাব-জাত অপরাধীদের স্বভাব-অপরাধী এবং অভ্যাস-জাত অপরাধীদের অভ্যাস-অপরাধী বলা হয়। কিছু অপরাধীর ব্যবহার

কতকটা স্বভাব ও কতকটা অভ্যাস অপরাধীর মত হয়। এদেরকে মধ্যম-অপরাধী বলা হয়। স্বভাব-জাত অপরাধীরা হয় অনেকটা আদিম যুগের মানুষের ন্যায়, তাদের মধ্যে সাহিত্য বলে কোনও জিনিস থাকে না বললেই চলে। এদের যা কিছু সাহিত্য তা জন্তু-জানোয়ারদের অনুকরণে ডাক বা শব্দের মধ্যে নিবদ্ধ থাকে। [আদি মানুষ জন্তুদের মত শব্দের মাধ্যমে ভাবের আদান প্রদান করতো।] প্রয়োজন মত অভ্যাস ও মধ্যম-অপরাধীরাও, বিশেষ করে মধ্যম-অপরাধীরা এই সব ডাক বা শব্দের সাহায্য নিয়ে থাকে। বস্তুতঃ অপ-রাধীদের প্রথম সাহিত্যের সন্ধান পাওয়া যায় এই সব বিভিন্নরূপ ডাক বা শব্দের মধ্যে। [কারণ—উহারা আদি মানুষের স্বভাব প্রাপ্ত হয়েছে।] এই সকল ডাক বা শব্দ পশু-পক্ষীদের ডাকের অনুকরণে সৃষ্ট হয়েছে। আমি প্রমাণ স্বরূপ নিম্নে কয়েকটি ডাকের নমুনা তুলে দিলাম।

পেঁচা—কঁ্যাচ ক্যা-য়্য এ্য ক্যা ক্যা-য়্য।
বেরাল—মিউ-উ ম্যাও-ও ম্যা এ্যা-ও।
কুকুর—ভোক্ ভেউ-উ ভোক্ ভোক্।
শিয়াল—হুয়া-য়া-য়া হুয়া হুয়া হু-উ-উ।

পল্লী-অঞ্চলে অপরাধীরা জঙ্গল বা বাগিচার মধ্যে আত্মগোপন করে এই সকল জন্তুর ডাকের অনুকরণে ডাক ডেকে পরস্পরকে পরস্পরের অবস্থিতি জানিয়ে দেয়। দলপতিরা এর দ্বারা দলের লোকদের কোনও এক নির্দিষ্ট স্থানে জড়ো হবার জন্যে নির্দেশ দেয়। এমন অনেক স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতি আছে যারা আজও এই ধরণের ডাক ডেকে অপকর্ম করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বাঙলার বাউরী জাতির কথা বলা যেতে পারে। এদের কেউ কেউ জঙ্গলের মধ্যে রাত্রে জন্তুদের মত চার পায়ে দৌড়য়। ইহার প্রমাণ স্বরূপ নিম্নের বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।

"আমার বাস ছিল বর্ধমান জিলার এক পল্লীগ্রামে। বহু বৎসর পূর্বের কথা। আমি তখন বালক। বাইরের ঘরে বসে পিতা ঠাকুর পাড়ার মুখুয্যে মশাইয়ের সঙ্গে পাশা খেলছিলেন। রাত তখন প্রায় সাড়ে বারো'টা। হঠাৎ একটা শিয়ালের ডাক শুনা গেল ঃ হুয়া-য়া-য়া- হু-উ-উ হুয়া। মুখুয্যে মশাই চমকে উঠে বাবাকে শুধালেন ঃ 'উহুঁ বাঁড়ুয্যে, গতিক সুবিধের নয়'। এ'যে এক শিয়ালের ডাক।' এক-শিয়ালীর ডাক না কি এক ভয়াবহ ব্যাপার। সাধারণতঃ কখনও একটা মাত্র শিয়াল ডাকে না। একটা ডাকলেই সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক শিয়াল এক সঙ্গে ডেকে উঠে। আসলে কোনও ডাকাত দলের সর্দার শিয়ালদের

ডাকের অনুকরণে তার লোকদের কোনও একটি নির্দিষ্ট স্থানে জমা হতে বলছিল। মুখুয্যেমশাই-এর কথায় বাবা তাড়াতাড়ি উপরে উঠে চাপা সিঁড়ি বন্ধ করলেন। মুখুয্যেমশাই আর দেরি না করে বাড়ির দিকে রওনা হলেন। সকালে উঠে শুনতে পেলাম যে গাঁয়ে ডাকাতি হয়ে গেছে। ডাকাতরা পাড়ার মনো স্যাকরাকে কেটে দু'খান করে তার সর্বস্ব লুটে নিয়েছে।"

এই সকল ডাক বা শব্দই অপরাধীদের আদি সাহিত্য। এই শব্দ সাহিত্যের পরই চিত্র-সাহিত্যের স্থান। চিত্র-সাহিত্যের প্রথম সন্ধান পাওয়া যায় মধ্যম-অপরাধীদের মধ্যে। স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতিদের মধ্যেই বহুসংখ্যায় মধ্যম-অপরাধী দৃষ্ট হয়। এদের সভ্যতা যেন সবে মাত্র শুরু হয়েছে। এদের মধ্যে চিত্রদ্বারা লিখন-পদ্ধতি আজও পর্যন্ত প্রচলিত আছে। এইরূপ লিখনপদ্ধতি অপরাধের জন্যই তারা প্রয়োগ করে। অপরাধ ও নিরপরাধ উভয় সাহিত্যেরই প্রথম উন্মেষ হয় এই-রূপেই। সভ্য মানুষের প্রথম সাহিত্যের সন্ধান মেলে না। কিন্তু অপরাধীদের অপরাধ সাহিত্যের আজও সন্ধান মেলে। যে সকল বংশ-পারম্পরিক অপরাধীদের আমরা স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতি বলি, তারা আজও পর্যন্ত তাদের সেই সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বের পুরানো কৃষ্টিকে ধরে রেখেছে। নমুনা স্বরূপ ভারতীয় স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতি কর্তৃক ব্যবহৃত একটি ছত্র তুলে দেওয়া হলো।

কোনও বাড়িতে চুরি বা ডাকাতি করার প্রয়োজন হলে দলের সর্দার বাড়িটির কাছাকাছি কোনও একটি পাঁচিল বা গাছের গায়ে উপরিউক্ত সাঙ্কেতিক চিত্রটি এঁকে দেয়। উপরের চিত্র-সঙ্কেতের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে এই-রূপ: "যে তারিখে চাঁদ দেখা যাবে চিত্রের ফালির ন্যায়, সেই তারিখের রাত্রে দুই প্রহরে তীর দ্বারা প্রদর্শিত পথের তৃতীয় বাড়িটাতে কাজ হবে। অতএব বন্ধুগণ। তোমরা সেই রাত্রে অনুরূপ সময়ে অকুস্থলে হাজির হবে। ইহাই আমার আদেশ এবং নির্দেশ।"

যে অনুজ্ঞা সভ্য মানুষ উপরের অতগুলি ছত্রের দ্বারা প্রকাশ করে থাকে, অপরাধীরা সেই কথাগুলি মাত্র চিত্রের কয়েকটি রেখা দ্বারা গত তিন-চার হাজার বৎসর ধরে প্রকাশ করে আসছে। ওটা তাদের কাছে লিপিবদ্ধ সাহিত্যেরই সামিল। এরূপ সহস্র সহস্র চিত্রলিপি বিভিন্ন স্বভাব-দুর্বৃত্ত

জাতিরা আবহমান কাল ধরে ব্যবহার করে এসেছে। অনেক সময় দেখা যায় ভারতের কোনও এক স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতির মধ্যে যে বিশেষ চিত্রলিপির প্রচলন আছে, সেই বিশেষ চিত্রলিপি য়ুরোপের কোনও এক স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতিও ব্যবহার করে, যদিও অধুনাকালে তারা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে ও বিভিন্ন পরিচ্ছদ পরিধান করে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে উভয় জাতিই একই বংশ হতে উদ্ভূত হয়েছে এবং কোনও এক সদূর প্রাচীন যুগে তাদের বিভিন্ন শাখা পৃথিবীর বিভিন্ন দিকে গমন করে। এই সব চিত্রলিপির পরিপূর্ণতা ও অসম্পূর্ণতা থেকে এদের কোন শাখাটি কত পুরাতন এবং কোন দেশটি ছিল তাদের প্রথম আবাসস্থল, সেই সম্বন্ধেও একটি নিভু´ল ধারণা আমরা করে নিতে পারি। শুধু তাই নয়। কোন সময় ও কবে কোন শাখাটি কোন দেশে গমন করে তা'ও বলা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ জিপসী বা বেদে'দের বিষয় বলা যেতে পারে, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই এরা দৃষ্ট হয়। দেশ ভেদে এদের চেহারা, ভাষা ও পরিচ্ছদের অদল বদল হয়েছে। কিন্তু মূলতঃ ভাষা সঙ্কেত ও আচার ব্যবহারের দিক থেকে তারা আজও একই আছে। এই সব চিত্রলিপির স্বরূপ ও প্রসার থেকে স্বভাব দুর্বৃত্ত জাতিগুলির কোন বংশটি কত পুরাতন ও কোন কোন সভ্য জাতির সহিত তাদের পৌরাণিক সম্বন্ধ আছে, সেই সম্পর্কেও নিভু´ল একটা ধারণা করা যেতে পারে। বিষয়টা তথ্যান্বেষী গবেষক ছাত্র ও অধ্যাপকদের বিবেচ্য।

বাংলা দেশের স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতিদের মধ্যে বাউরিয়া জাতি অন্যতম। স্মরণাতীত কাল থেকে সভ্যদেশে বাস করা সত্ত্বেও তারা তাদের আদিম অভ্যাস ত্যাগ করে নি। চুরি ও ডাকাতি প্রভৃতি অপরাধ দ্বারাই তারা জীবিকা নির্বাহ করে। এই জাতির লোকদের মধ্যে বহু প্রকার সাঙ্কেতিক লিপির প্রচলন আছে। নিম্নে উদাহরণস্বরূপ উহাদের কয়েকটি মাত্র উদ্ধৃত করা হলো।
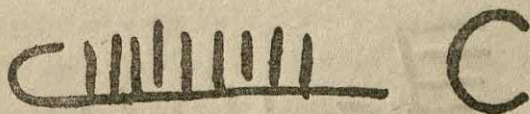
গন্তব্য পথের পাশের গাছ বা পাথরে এই সব স্বভাব-দুর্বৃত্তরা উপরিউক্ত চিত্রলিপি লিখে রাখে। পশ্চাদাগতরা এই সব লিপি দ্বারা পূর্বগামীদের খুঁজে বার করে। উপরিউক্ত লিপিকার অর্থ হয় এইরূপ ঃ

(১) বন্ধুগণ! আমরা আঁকড়ির উল্টো দিককার সরল রেখার দিকে যাত্রা করছি। (২) আমাদের দলে ৯ জন লোক আছে। সকলেই আঁকড়ির উল্টা দিককার সরল রেখার দিকে চলেছি। (৩) আমরা গ্রামে ছাউনি ফেলব। আমরা ফিরে চলেছি।

আঁকড়ির রেখার উপর অবস্থিত নয়টি সরল রেখার দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে দলে কত লোক আছে। গোলকটি দ্বারা বোঝা যায় যে তারা গ্রামে রাত্রি-যাপন করবে। গোলকের ডান দিকে ফাঁক থাকলে বোঝা যাবে তারা ফিরে যাচ্ছে। কিন্তু বাম দিকে ফাঁক থাকলে বুঝতে হবে যে তারা অপরাধ করার জন্য অগ্রসর হচ্ছে। আঁকড়ির সরল রেখাটি দিক-বাচক। আঁকড়ির ঐ রেখাটির দিকেই তারা চলেছে।
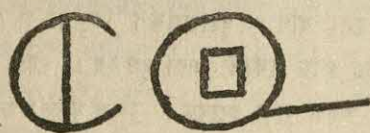
উপরে আরও দুইটি চিত্রলিপি উদ্ধৃত করা হলো। গ্রামের ছাউনি উঠিয়ে অগ্রসর হবার পূর্বে পূর্ব লিপিকার জের স্বরূপ বর্তমান লিপিকাটি লিখা হয়। পশ্চাদাগতরা এই চিত্রলিপি পাঠে পূর্বগামীদের গন্তব্য স্থান সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়। চিত্রলিপিটির প্রকৃত অর্থ হয় নিম্নোক্তরূপ।

'বন্ধুগণ! আমরা গোলকের ফাঁকের মুখেই [দিকেই] চলেছি বটে, কিন্তু আমরা এখন দুই দলে বিভক্ত হয়েছি। আমাদের সঙ্গে চোরাই মাল আছে এবং আমরা গোলক সংলগ্ন সরল রেখার মুখে [দিকে] প্রস্থান করছি।'

উপরের প্রথম চিত্রটি থেকে দেখা যাবে একটি সরল রেখা গোলকটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে দলটি দুইভাগে বিভক্ত হয়েছে।
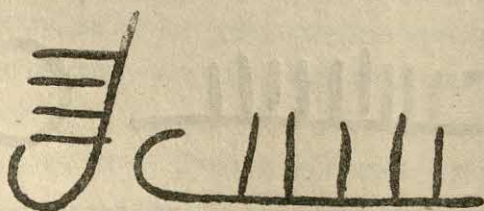
কিন্তু উভয় দলই গোলকের ফাঁকের দিকে চলেছে। শুধু তাই নয় তারা সকলেই ফিরে চলেছে। দ্বিতীয় চিত্রের গোলক মধ্যস্থ চৌকা ঘরটি থেকে বুঝা

যায় যে, তাদের সঙ্গে লুণ্ঠিত দ্রব্যও আছে। এ'ছাড়া ঐ গোলক সংলগ্ন সরল রেখাটি তাদের যাত্রার দিক নির্ণয় করে।

শেষ নির্দেশ জানিয়ে দেওয়া হয় পূর্ব পৃষ্ঠায় চিত্রটি দিয়ে। এর দ্বারা তারা জানিয়ে দেয় যে তাদের একটি দল উত্তর মুখে চলেছে। এবং এই দলে লোক আছে চারিজন। অপর দলটি চলেছে পূর্ব দিকে। এই দলে লোক আছে পাঁচজন।

স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতিরা এইরূপ বহু প্রকার লিপিকা ব্যবহার করে। এইসব লিপিকা একই অর্থে তারা বংশপরম্পরায় ব্যবহার করে আসছে। এই সব লিপিকা এই শ্রেণীর অপরাধীদের প্রাচীন সাহিত্য।

এই সব চিত্রলিপি ছাড়া বহু প্রকার সাঙ্কেতিক শব্দ ও ভাষাও এই সব স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতিরা আবহমানকাল ধরে ব্যবহার করে আসছে। তবে এই সব ভাষা-সংকেত পরবর্তী কালে সৃষ্টি হয় বলে আমি মনে করি। এক-একটি স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতি এক-এক প্রকার ভাষা-সঙ্কেত ব্যবহার করে। কোনও একটি বিশেষ স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতি কর্তৃক ব্যবহৃত ভাষা-সঙ্কেত যদি কোনও এক আধুনিক সভ্যজাতির ভাষার মধ্যে বেশি-সংখ্যায় দেখা যায় তা'হলে সেই সভ্য ও অর্ধসভ্য বা অসভ্য জাতিকে একটি বংশোদ্ভূত বলে মনে করা যেতে পারে। এ সম্বন্ধে অপরাধ-বিজ্ঞানবিদ্‌দের অবহিত হওয়া উচিত।

ডাক বা শব্দের পর চিত্রলিপি এবং চিত্রলিপির পর সঙ্কেতাদি অপরাধ-সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে। এই ভাষা সঙ্কেতের স্বরূপ থেকে কোন সঙ্কেতটি কতো পুরাতন এবং কোন সময় ও কি কারণে তা সৃষ্ট হয়, সেই সম্বন্ধেও একটি ধারণা করা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ পুলিশ শব্দটি সম্বন্ধে বলা যেতে পারে। অধুনা কালে—এই পুলিশ তথা রক্ষী বুঝাবার জন্যে বিভিন্ন দল কর্তৃক বিভিন্ন সঙ্কেতিক শব্দের সৃষ্টি হয়েছে। প্রাচীন ভাষা সঙ্কেত অধিক সংখ্যায় মধ্যম অপরাধীরা ব্যবহার করে এবং আধুনিক ভাষা সঙ্কেত অধিক সংখ্যায় ব্যবহার করে অভ্যাস অপরাধীরা। ভাষা সঙ্কেতের শব্দবিন্যাস থেকে তার প্রাচীনতা ও আধুনিকতা বুঝা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি প্রাচীন ও আধুনিক ভাষা সঙ্কেতের কয়েকটি নমুনা নিম্নে উধ্বৃত করা হলো। বাংলাদেশে তুঁতিয়া মুসলমান নামক এক স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতি আছে। ডাকাতির সময় বিপদের সূচনা হলে তাদের দলপতি চীৎকার করে অপর সকলকে সঙ্কেতিক ভাষায় আদেশ জানায়। সাঙ্কেতিক ভাষাটি এইরূপ—"মাছি ঘন জাল গুঁট"।

অর্থাৎ মাছি উড়ছে দলে দলে, এইবার জাল গুটিয়ে নাও। অর্থাৎ ফিরে চল বা সরে পড়ো।

এই সাঙ্কেতিক ভাষা দুই প্রকারের হয়। নিম্নশ্রেণীর সঙ্কেতকে বলা হয় খেউড় বা শ্ল্যাং এবং উচ্চশ্রেণীর সঙ্কেতকে বলা হয় সাইফার বা সঙ্কেত। প্রথমে অপরাধীদের খেউড় বা শ্ল্যাং সম্বন্ধে বলা যাক।

এই খেউড় বা শ্ল্যাং অপরাধ-সাহিত্যের একটি প্রধান স্থান অধিকার করে। প্রত্যেক দেশের অপরাধীদের মধ্যেই নিজস্ব খেউড় বা শ্ল্যাং দেখা যায়। ইংরাজিতে একে ব'লে শ্ল্যাং এবং ফরাসীরা একে ব'লে আরগট্, ইতালীয়রা একে বলে গারগো এবং ভারতীয়েরা একে বলে খেউড়। এই সব খেউড়ের সাহায্যে অপরাধীরা পরস্পরের সহিত পরস্পর কথোপকথনের কাজ চালায়। এক-এক দল বা গোষ্ঠীর অপরাধী এক এক প্রকার খেউড় ব্যবহার করে। বংশ পরম্পরার ন্যায় গুরু পরম্পরায় এই খেউড় সম্পদের অনেক শব্দ যুগ যুগ ধরে নেমে এসেছে। অপরাধীদের এই খেউড় সম্পদ ভাষাতত্ত্ব ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অতীব প্রয়োজনীয়। এই সব খেউড়ের শব্দগুলি অনুধাবন করলে এক দেশীয় অপরাধীর সহিত অপর দেশীয় অপরাধীর প্রাচীন সম্বন্ধ জানা যায়। আমরা সকল দেশের অপরাধীদের খেউড়ের মধ্যে অনেক বিদেশী শব্দের সন্ধান পাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ জার্মান অপরাধীদের কথা বলা যেতে পারে। এদের খেউড়ের শব্দগুলির মধ্যে আমরা হিব্রু শব্দের প্রাচুর্য দেখি। তেমনি ইতালীয় খেউড়ের মধ্যে আমরা জার্মান ও ফ্রেঞ্চ, ফরাসী খেউড়ের মধ্যে জার্মান ও ইংরাজি এবং ইংরাজি খেউড়ের মধ্যে ইতালীয় ও রোমান শব্দের প্রাচুর্য দেখি। হরস্‌লি সাহেব কয়েকটি ইংরাজি খেউড়ের শব্দের মধ্যে অনেক জিপ্‌সী এবং বিকৃত সংস্কৃত শব্দেরও সন্ধান পান। ভারতীয় অপরাধীদলের খেউড়ের মধ্যে হিব্রু, জার্মান, আরবি এবং চৈনিক শব্দও পাওয়া যায়। এই সকল খেউড় থেকে অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্বের কথাও জানা যায়। যথা, ইতালীর অপরাধীরা মাতালকে বলে "ফরাসী", ভিখারীকে বলে "স্প্যানিয়ার্ড", তেতাস খেলোয়াড়-দের বলে "গ্রিক"। স্পেনীয় অপরাধীরা চোরদের বলে মরক্কো। ভারতীয় অপরাধীরা 'চিট'দের বলে—উড়ে, নওসেরা। ডাকাতদের তারা বলে—বর্গী দেশবালী। বাঙ্গালীদের তারা বলে বোম্বেটে ইত্যাদি। ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বন করেও অনেক খেউড়ের সৃষ্টি হয়েছে। যথা,—Julilletiser অর্থে ফ্রান্সে "ডিগ্রোন" বুঝায়। ডিউক অব বাগুসির ব্যাপারের সহিত য়ুরোপীয়

অপরাধীদের দ্বারা ব্যবহৃত কুপ-ডে-রোগুসি শব্দটির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এই সব খেউড়ের কতকগুলি শব্দ দেশের প্রচলিত শব্দগুলির অপভ্রংশ বা সংক্ষিপ্ত-সার মাত্র। কিন্তু অধিক ক্ষেত্রে এই সকল খেউড়ের শব্দসকল অতীব প্রাচীন হয়। কেবলমাত্র অভ্যাস-অপরাধীরাই প্রতিদিনই নূতন নূতন খেউড়ের সৃষ্টি করে—সাঙ্কেতিক কথোপকথনের সুবিধার জন্য। আমরা অনেক খেউড়-শব্দের সম-অর্থে ব্যবহার দেখতে পাই। মিঃ বিগনি ও মিঃ কগনেট সাহেব য়ুরোপীয় অপরাধীদের দ্বারা সম-অর্থে ব্যবহৃত নিম্নোক্তরূপ বহু খেউড়ের সন্ধান পান। ভারতীয় খেউড় শব্দগুলি সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা চলে। এই সম্পর্কে নিম্নের বিলাতি তালিকাটি অনুধাবন করুন :—

(১)	পুলিশ বুঝাইতে	১৭	টি	শব্দ
(২)	সোডমি "	৯	"	"
(৩)	ডাকাতি "	৭	"	"
(৪)	মাতলামি "	৪৪	"	"
(৫)	মদ্যপান "	২০	"	"
(৬)	মদ "	৮	"	"
(৭)	জল "	১৯	"	"
(৮)	টাকাকড়ি "	৩৬	"	"

এদেশের স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতিদের মধ্যে এরূপ বহু খেউড়ের প্রচলন আছে। এ'ছাড়া শহর ও গ্রাম্য অপরাধীরাও বহুবিধ খেউড় ব্যবহার করে। এই সকল খেউড়ের মধ্যে বিদেশী ভাষার সহিত ভারতীয় আদিম জাতির অনুন্নত ভাষার আভাষও পাওয়া যায়। কলিকাতা পুলিশের দপ্তরখানায় আমি এরূপ বহু সংখ্যক খেউড় শব্দ সংগ্রহ করেছি। য়ুরোপীয় অপরাধীদের খেউড়গুলিও বিভিন্ন পুস্তকে সন্নিবেশিত হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সব ভারতীয় ও বিদেশী খেউড়গুলির তুলনামূলক আলোচনা এদেশে আজও হয়নি। সাধারণতঃ বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে প্রাচীনকাল থেকে এক দেশের অপরাধীদের সহিত অপর দেশের অপরাধীর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে আসছে। এই সকল খেউড় শব্দগুলির প্রাচীনত্ব অনুধাবন করে এই সব বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য বিস্তারের সময় ও কাল পর্যন্ত বলে দেওয়া যায়। নিম্নে বর্তমানকালীন ভারতীয় অপরাধীদল কর্তৃক ব্যবহৃত কয়েকটি খেউড় শব্দ উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত হলো। এই খেউড়ের

শব্দগুলি অনুধাবন করলে বুঝা যায় যে, কতকগুলি শব্দ অতি প্রাচীন। উহাদের আবার কতকগুলি শব্দ আধুনিক বা অতি-আধুনিক। প্রয়োজন বিধায় এই-সকল অপরাধীদের দ্বারা আধুনিককালে ঐগুলি সৃষ্ট হয়েছে। মৎ সংগৃহীত কয়েকটি এদেশীয় স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতির সাঙ্কেতিক ভাষা বা খেউড় নিম্নে লিপি-বদ্ধ করা হলো :—

মুজাফাপুর সোনার	ইরানী দল
রুমাল—সিঁদকাটি	লেপেই—পুলিশ
কাজলি কৈ—আঁধার রাত	ডামরি—টাকা
খাউ—চোরাই মালের গ্রহীতা	টিন—পকেট
বেব্রো—শীঘ্র যাও	সানি—টাকার থলি
বিয়েনয়া—এখানে এস	ব্রো—যাও
	ঝিঝা দোসাদ
কাকা—ভাই	থাম—দারোগা
নামিদান—না	খোহট—সিপাই
বিবিসি—এস, খানা খাও	কেটরী—সিঁদকাটি
কৈ লো বিকোশ—ধুম পান করো	ভোমরা—ঘটি
চিসিমিকেবা—কি জন্যে	পানাপিয়া—গেলাস
আস বাকোব—ভাত খাও	সিলচার—গহনা
ধুর—মানুষ	পিসাকো—কাপড়
বকুল চিন থি—বুক পকেট	চিকান—থালি
লেপোক—নাও	কাটনি—কাঠের বাক্স

এই সকল শব্দ থেকে আমরা প্রাচীন যুগে প্রচলিত বহু সামরিক শব্দও উদ্ধার করতে পারি। যথা, "ব্রে", অর্থাৎ কি'না যাও, ইহা ইংরাজিতে কুইক মার্চ। "বে ব্রো", অর্থাৎ কি'না শীঘ্র যাও, ইহা ইংরাজিতে ডবল মার্চ। শব্দ দুইটি যে সংস্কৃত ব্রজ ধাতু থেকে সংগৃহীত হয়েছে তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই। পুরাকালের ভারতীয় সামরিক সম্প্রদায়গুলির সহিত আধুনিক স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতিদের পূর্বপুরুষগণ যে প্রায়ই মিলিত হতেন তা এই সংস্কৃতবাচক সামরিক শব্দ থেকে আমরা অনুমান করে নিতে পারি। কিংবা প্রাচীন সামরিক গোষ্ঠীর এরা অধঃপতিত বংশধর।

যাঁরা এদেশীয় স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতিদের ইতিহাস সম্বন্ধে আগ্রহশীল, তাঁরা

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশীয় স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতিদের সম্বন্ধে লেখা পুস্তকগুলি পড়ে দেখতে পারেন। তবে এদের ভাষা-সঙ্কেতসমূহ বিভিন্ন প্রদেশীয় পুলিশ কর্তৃক এতদিনে সংগৃহীত হচ্ছে। আমি নিজেও উপরোক্তরূপ বহু ভাষা-সঙ্কেত সংগ্রহ করেছি। ভারতবর্ষে বাউরিয়া নামক একটি স্বভাব-দুর্বৃত্ত উপদল আছে। উহারা মুজঃফরপুর, হায়দ্রাবাদ, সিন্ধু ও ভাগলপুরে বাস করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই উপদল কর্তৃক ব্যবহৃত মৎ-সংগৃহীত কয়েকটি ভাষা-সঙ্কেত নিম্নে তুলে দিলাম।

"তুক—রুটি। ডিকরা—পুত্র। দিকরি—কন্যা। সাগো—পিতা। দাখো—শালা। খে—চুল। খৈ—ঘুম। গোডা—পা। বাকো—মুখ। থাহুন—পুলিশ। বোরো—চিনি। চোরিনোমাল লেবোও—চোরাই মালের ক্রেতা। গোটো বা মোধানো—হাকিম। মাঙখো খে এনভেচে—অপরিচিত লোক আসছে। মালকাটিগাবো—মাল লুকোও। থারখেনিপেটি দেখিও—মাল মাটিতে পুঁতে ফেল। গণ্টাভামেন হাতো নাকো—থলির মধ্যে মাল লুকোও। কাঁহা কাতেও—লুকোলে কেন? তেরিনিও হোনেই ভামেশি—সন্দেহ হয় লোকটা পুলিশ। থারথাট যাডাথি ডাকসিই—পুলিশ আমাদের খুঁজবে। তবরিয়ানি ঘাওখি খেদিও—ছেলেটিকে মালটি দিয়ে দাও। ছুদো নামকো ভতবানো—তোমার আসল নাম বলো না। ভিজো লেদাভিদেই—মিথ্যা নাম বলো। খো ডেরো হিরা হোসেই থকন অভীন রাদিষভি—তুমি পরিশিষ্ট দলে এখুনি যোগ দাওগে। খো টেরো বন্দোসী লাখিজাড—রক্ষীরা অসতর্ক, এইবার পালাও। আর অর্থ নেই। থাহাড অহন হুতো থাহন—আমি ছাউনির কাছে মাল পুঁতে রেখেছি। খরখর খারীইন বাথীইন কৈহীদহো—আচ্ছা পুলিশের কাছে স্বীকার করো।

"স্মাগলারগণ নিষিদ্ধ পণ্যদ্রব্যকে সাধারণতঃ সওদা নামে অভিহিত করে। কেহ কেহ এই ব্যবসাকে বলে "কাম" বা কাজ।" * বিবিধ নিষিদ্ধ-দ্রব্য সম্বন্ধেও তাদের নিজস্ব পরিভাষা আছে। সাধারণ ব্যক্তিদের দ্বারা এই সকল শব্দ সহজ অর্থে ব্যবহৃত হ'লেও অপরাধীদের নিকট উহারা বিশেষ বিশেষ গুপ্ত

* অপরাধীমাত্রেই অপরাধকে কাজ বা কাম বলে থাকে। এদের কাউকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, "আচ্ছা ঐ দিনকার ঐ চুরিটা তুই করেছিস?" তাহলে সে বিরক্ত এবং ক্রুদ্ধ হবে। কিন্তু তাকে যদি বলা যায়, "হ্যাঁ রে ঐ দিনকার ঐ কাজটা কি তোরা করেছিলি," তাহলে তারা নিজেদের সম্মানিত মনে করে এবং খুশি হয়ে অপরাধ সম্পর্কে স্বীকারোক্তিও করে বসে।

অর্থ বহন করে। বহু অপরাধীর বাটী খানাতল্লাস করে আমিও ঐরূপ পরিভাষাযুক্ত চিঠিপত্র, হিসাব-বহি, টেলিগ্রাম প্রভৃতি উদ্ধার করেছি। এইসব কাগজপত্র আদালতে উপস্থিত করে অভিজ্ঞ অফিসারগণ উহাদের প্রকৃত অর্থ ব'লে দিয়েছেন এবং আদালত তাহা মেনেও নিয়েছেন। নিম্নে উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি বিশেষ বিশেষ সঙ্কেত শব্দ উধ্বৃত হলো।

(১) রেশমথান—কোকেন। (২) এক নম্বর চিড়িয়া মার্কা—জাপানে প্রস্তুত কোকেনের ট্রেডমার্ক। (৩) কম্বল—আফিম। (৪) নম্বরী মাল—ট্রেজারির চোরাই আফিম। (৫) টিকিয়া—একপ্রকার চৌকা ও চেপ্টা চোরাই আফিম। (৬) ঘোড়া বা লাট্টু—চোরাই রাইফেল। (৭) খাউ—চোরাই মালের গ্রাহক (৮) খোকী—পিস্তল। (৯) খাবার—গুলি। (১০) যমুনা—আফিম। (১১) গঙ্গা—মদ [প্রথমটির রঙ কালো ও দ্বিতীয়টির রঙ সাদা।]

এই সকল সাঙ্কেতিক শব্দের সাহায্যে কিভাবে অপরাধীরা কথোপকথন চালায় নিম্নের প্রশ্নোত্তর থেকে তার কিছুটা আভাষ পাওয়া যাবে।—

১ম ব্যক্তি—খাঁ সাহেবের কারবারের খবর কি ?

২য় ব্যক্তি—মন্দ নয়। কিন্তু আপনার সঙ্গে ত অনেক দিন পর্যন্ত কোনও কাজই হয় নি। নূতন সওদা আছে ?

১ম ব্যক্তি—এক জাপানী ব্যাপারীর হাতে দুইশ রেশমী থান (১) আছে। কি দর বলব ?

২য় ব্যক্তি—এক নম্বর চিড়িয়া মার্কা (২) মাল ত ? ৩০ টাকা হিসাবে দিতে পারি। নমুনা দেখাবেন ?

১ম ব্যক্তি—আর কম্বলের (৩) দর কি দেবেন ? নম্বরী মাল (৪) বিশটা আছে। এ'ছাড়া এক গোয়ালিয়রের ব্যাপারী কিছু টিকিয়া (৫) মালও এনেছে। এরই বা কি দর দেবেন ?

২য় ব্যক্তি—আসল নম্বরী হয় ত ৮০ টাকা পর্যন্ত দিতে পারি। টিকিয়া মাল হলে ৬৫ টাকা পর্যন্ত দেবো। নমুনা দেখলে আমি পাকা কথা দেব। কম্বল (৩) অনেক জমেছে। রেশমী থানেরই (১) চাহিদা বেশি। দানাদার মাল পেলে দরে আটকাবে না।

১ম ব্যক্তি—ঘোড়ার (৬) কি দর ? আপনার কাছে কিছু সওদা করতে চাই।

আদিম-সমাজের ব্যক্তিরা সঙ্কেত ব্যবহার করে না। সেইস্থলে তারা ব্যবহার

করে খেউড়। এই সকল খেউড়ের সাহায্যে তারা আজও সভ্য লোকের অগোচরে কথোপকথন করে থাকে। এই সব খেউড় দুই প্রকারের হয়ে থাকে। যথা,—সরল এবং উল্টা। সরল খেউড়ের ন্যায় অপরাধীদের মধ্যে আমরা উল্টা খেউড়ও দেখে থাকি। প্রচলিত সরল শব্দগুলিও উল্টারূপে ব্যবহার করা অপরাধী-সমাজের একটি বিশেষ রীতি। প্রমাণস্বরূপ উল্টা খেউড়ের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক: "দেখ আমাদের একটা লোক দেখছে।" ইহার উল্টা খেউড় হবে এরূপ—"খ্যাদ, কেয়টা কোল মাআদের খেদছে।" এর যদি সরল উত্তর হয় এইরূপ, "সত্যি। চেনা লোক, ও কিছু নয়," তা'হলে এর উল্ট খেউড় হবে এইরূপ, "তস্যি? নেচা কোলু, ও ছিকু অএন।" উল্টা খেউড়ের দুই অক্ষরের বেশি কথাগুলির আদ্যাক্ষর দুইটির স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ উল্টাইয়া এবং শেষের বর্ণগুলি ইচ্ছামত সোজা বা উল্টা রাখিয়া কথা বলা হায়। এদেশে 'চি' আদ্যবর্ণ এবং 'ফ' মধ্যবর্ণ দিয়া কথা বলার পদ্ধতি প্রচলিত আছে, যথা—(১) "চিতু, চিমি, চিযা, চিও" অর্থাৎ কি'না, "তুমি যাও।" (২) তুরফপা কিরফপা করফরছ" অর্থাৎ কি'না "তুমি কি করছ?" ইয়ুরোপীয় অপরাধীরাও এইরূপে বাক্যালাপ করে থাকে। প্রমাণস্বরূপ নিম্নে দুইটি ইংরাজি উল্টা খেউড় উদ্ধৃত করা হ'ল।

"Hi boy! look at that fine girl with the laen moke [donkey]. Pass her a pot of beer and a bit of tobacco." এই সরলইংরাজি বাক্যটির উল্টা খেউড় ইংরাজ অপরাধীরা এইরূপে বলে—'Hi yob! Kool that enif olrig with the nael ekom. Sap her a top O' reeb and a tib of occabot.

অনেক সময় সরল খেউড়েরও উল্টা খেউড় দেখা যায়, যথা—Islema! ogda the oppcrca! এই উল্টা খেউড়ের সরল খেউড় এইরূপ—'Misle! Dog the copper!' এর প্রকৃত অর্থ হবে এইরূপ "Vanish! See the policeman."

উল্টা খেউড়ের প্রথম সন্ধান পাই আমরা বৈদিক সাহিত্যে। বৈদিক ঋষিগণ এইগুলিকে "বর্ণ-বিপর্যয়" নামে অভিহিত করতেন। এই "বর্ণ-বিপর্যয়" বা উল্টা খেউড় সহ বহু শ্লোক আমরা বিভিন্ন বৈদিক গ্রন্থে পেয়ে থাকি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মাত্র একটি শ্লোক আমি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম:—

"যকাঽসকৌ শকুন্তিকাঽহলগিতি বঞ্চতি।
আহন্তি গভে পসো, নিগল্‌গলীতি ধারকা॥"

[শ্লোকটি শুক্লযজুর্বেদ ২৩।২২ অশ্বমেধ যজ্ঞে নিহত অশ্ব-সম্পর্কে উক্ত হয়েছে। শ্লোকটিতে, "গভে" রূপ একটি শব্দ দেখা যায়। আসলে ঐ শব্দটি "গভে" নয়, উহার আসল রূপ "ভগে"। 'ভগে' শব্দ দ্বারা ঐ যুগে স্ত্রীযোনি বুঝাতো। অশ্লীলতা বিধায় ঐ "ভগে" শব্দটি মন্ত্র উচ্চারণের সময় "গভে" বলিয়া উচ্চারিত হতো। এই মন্ত্রটি একটি যাদুমন্ত্র। অশ্বের কর্তিত লিঙ্গটি মন্ত্রপূত করে বন্ধ্যা স্ত্রীগণ যোনির মধ্যে স্থাপন করে মন্ত্র উচ্চারণ করলে না'কি তাঁরা সহজেই সন্তানসম্ভবা হতে পারতেন।]

এই সব খেউড়ের কতকগুলি আবার বিকৃত ও কদর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা, স্ত্রীলোক, মদ প্রভৃতিকে অপরাধীরা বলে "মাল" এবং দেহকে এরা বলে corpse বা লাস। শব্দমাত্রকেই অপরাধীরা Vulgarise করে নেয় অর্থাৎ কি'না খেউড়ে পরিণত করে।

স্বভাব ও মধ্যম-অপরাধীরা নিম্নশ্রেণীর এবং অভ্যাস-অপরাধীরা উচ্চশ্রেণীর খেউড় ব্যবহার করে। উচ্চশ্রেণীর খেউড় বা শ্ল্যাংকে ভাষার বিশুদ্ধতার জন্য আমরা সঙ্কেত বা সাইফার প্রভৃতি বলে থাকি। শিক্ষিত অপরাধীরা বহুল পরিমাণে সাইফার বা সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যবহার করে। এদের কেউ কেউ সাঙ্কেতিক ভাষা সকল ভ্যানিসিং ইঙ্ক দ্বারা লিখে পরস্পর পরস্পরের সহিত পত্রালাপ করে। কেউ কেউ ব্যক্তিগত পত্রের নির্দোষ ছত্রসমূহের মধ্যে অর্থাৎ প্রতি দুই ছত্রের মধ্যদেশে বা ফাঁকে ফাঁকে এই কালি দিয়ে পৃথক অপর আর একটি পত্রও লিখে রাখে। সাঙ্কেতিক শব্দগুলির প্রকৃতার্থ নিরূপণার্থে সকল দেশেই রাজ-সরকার "সাইফার এক্সপার্ট" বা সঙ্কেতবিদ্ পণ্ডিত নিযুক্ত করেন। [ডিসাইফার করার রীতি সম্বন্ধে পুস্তকের অন্য খণ্ডে আলোচনা করবো।] এদেশীয় ভাষা সঙ্কেতের নমুনা স্বরূপ নিম্নে একটি লিপিকার কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করলাম।

"জ্যেঠা মহাশয়ের অপঘাত মৃত্যু হইয়াছে। মেজজ্যেঠা কাশীতে ব্রেক্ জার্নি করিবেন। চাচা আজ রওনা হইয়াছেন। তিনি বেলুড়ে নামিবেন। টুপির নম্বর ৮৮১, কিন্তু গাড়ি পাঠাইবেন।"

লিপিকাটির প্রকৃত পাঠ হইবে এইরূপঃ "জ্যেঠা মহাশয়" রাশভারী সম্রান্ত ব্যক্তি অর্থাৎ যাহাতে ভারী বা বেশি মাল [আফিম] আছে। "অপঘাত মৃত্যু হইয়াছে" অর্থাৎ পার্সেলটি শোচনীয় ভাবে পুলিশ ধরিয়াছে। "মেজজ্যেঠা" —যে পার্শেলে মাঝারি ওজনের মাল আছে; "ব্রেক জার্নি করিবেন" অর্থাৎ

উহা এখন ঐ পর্যন্ত আসিবে। পরে আবার পাঠানোর বন্দোবস্ত হইবে। "চাচা"—ছোট পার্সেল। "টুপির নম্বর"—রেল কোম্পানির পুলিন্দায় দেওয়া নম্বর।

নিম্নে অপর আর একটি লিপিকার কিছুটা অংশ তুলে দেওয়া হলো। "কালা মিয়া রওনা হইয়াছে, লাল মিয়া শীঘ্রই আসিবেন। এই ব্যাপারে হিসাব-নিকাশ যেন ঠিক থাকে। না হলে ওরা আমাকে গ্যাপ করে [খুঁজে বার করে] "ট্যাপ" করবে" [ছুরি মারবে]।

ইহার প্রকৃত অর্থ হইবে এইরূপ : কাল মিয়া অর্থে আফিম বুঝায়। অর্থাৎ আফিম পাঠান হয়েছে। কোকেনের রঙ সাদা হয়ে থাকে। কিন্তু সাদা মিয়া ব'লে কোন নাম নেই। এই কারণে কোকেনকে বলা হয় লাল মিয়া। অর্থাৎ কি'না কোকেন শীঘ্রই সংগৃহীত হইবে। স্মাগলাররা অহিফেনকে যমুনা এবং মন্তকে গঙ্গা বলে, কারণ যমুনার রং কালো এবং গঙ্গার রং সাদা। ট্যাপ্ করার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে ছুরি মারা। লিপিকাতে বলা হয়েছে যে টাকাকড়ির হিসাব যেন ঠিক থাকে। সময় মত দাম না দিলে অপর স্মাগলাররা তাকে ছুরি মারতে পারে, ইত্যাদি। এইরূপ ভাবে এদেশের অপরাধীরা পিস্তলকে বলে খোকী, গুলি বা টোটাকে বলে খাবার। রিভলভারকে এরা বলে ঘোড়া, ইত্যাদি। বিগত যুদ্ধের সময় এট্যাব্রিন ট্যাবলেট কেবলমাত্র সামরিক বিভাগই ব্যবহার করত, সাধারণের নিকট উহা থাকা আইনতঃ অপরাধ হতো। এই কারণে স্মাগলাররা ও চোরেরা এই দুষ্প্রাপ্য ঔষধের নাম দিয়েছিল হলদে বড়ি। বলা বাহুল্য, এই ট্যাবলেটের রঙ হরিদ্রা বর্ণের ছিল।

অপরাধীরা অনেক সময় উচ্চাঙ্গের সাহিত্যও সৃষ্টি করে থাকে। অপরাধীদের "ডাইরি" বা "রোজনামচা" লেখার কথা পূর্ব পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে। অনেক অপরাধীকে কারাগারে ও হাজতের দেওয়ালে বহুবিধ গান ও কবিতা কয়লা বা ইটের টুকরা দিয়ে লিখতে দেখা গেছে। অপরাধীদের অন্তর্নিহিত ভাবপ্রবণতার কারণে অপরাধীরা এইরূপ করে থাকে। অভ্যাস-অপরাধীদের পত্রালাপ প্রভৃতির মধ্যেও অনেক সাহিত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। আমি কোন এক ঠগী অপরাধীর ভাষার মধ্যে একটি সুন্দর শিশু-সাহিত্যের সন্ধান পাই। অপরাধীটিকে আমার নিকট আনা হলে, হঠাৎ সে আমাকে উদ্দেশ করে বলে উঠে, "রস্তম্ নমস্কারম্ ধনক্কোটিম্ মহারাজম্"। আমাকে অপরাধীটি এইভাবে সম্বোধন করায় আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করি, "এর মানে কি ?" অপরাধীটি

তখন এর এইরূপ ব্যাখ্যা করে, "অর্থাৎ কি না হে ধনুষ্কোটির মহারাজ! তোমাকে আমি রম্ভা [কলা] দিয়ে নমস্কার করছি।" বেশ বুঝতে পারি অপরাধীটি আমাকে হনুমান বলছে। ক্ষেপে উঠে আমি জিজ্ঞাসা করি—"এ্যা! তার মানে?" উত্তরে অপরাধীটি বলে, "বুঝতে পারলেন না, শুনুন তবে বলি। ধনুষ্কোটি হচ্ছে কিষ্কিন্ধ্যার সামার ক্যাপিটেল বা গ্রীষ্মকালীন রাজধানী। হিজ ম্যাজেষ্টি সুগ্রীব দি গ্রেট, হিজ্ এক্সেলেন্সি হনুমান, এবং হিজ্ রয়েল হাইনেস্ অঙ্গদকে নিয়ে এইখানে—।" আমি এইবার তাকে থামতে বলে জিজ্ঞাসা করি, "থাক কোথায় তুমি?" "উত্তরে অপরাধীটি বলে, "এই যে অ্যাড্রেস্ দিচ্ছি। আমার ঠিকানা হচ্ছে: দিশেহারা পার্ক, আকাশ-পাতাল রোড। ফোন নম্বর—বড়বাজার ০০০০ [ডবল ও ডবল ও]।" এরপর তার নাম জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তরে বলেছিল, 'সর্বনাম'। এইরূপ বাক্যালাপ হতে অপরাধীদের অন্তর্নিহিত শিশুসুলভ মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কোনও একটি চোরকে ধরে এনে জিজ্ঞাসা করা হয়, "তোমার নাম কি? তুমি থাকো কোথায়?" উত্তরে সে বলে, "আজ্ঞে ছিঁচকে। বিচিকাটা গলিতে থাকি।"

এই ধরনের উত্তর অপরাধীদের বেপরোয়া ভাব, ভাবপ্রবণতা, শিশু-সুলভ ব্যবহার এবং নৈতিক অসাড়তার পরিচায়ক। অপরাধীদের সাধারণ সাহিত্য সম্বন্ধে বলা হলো। এইবার তাদের উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সম্বন্ধে বলা যাক। সাধারণতঃ অভ্যাস-অপরাধীরা এই সকল সাহিত্য রচনা করেছে। প্রাথমিক অপরাধীদের দ্বারা বিশেষ করে এই সকল সাহিত্য রচিত হয়। অপরাধ-সাহিত্য দ্বারা তারা তাদের অপস্পৃহার নিষ্কাশন ঘটায়। শুধু তাই নয়! অপরাধ-সাহিত্য কারারুদ্ধ থাকাকালীন তাদের নিঃসঙ্গ জীবনেরও সাথী হয়।

অপরাধীরা অনেক সময় উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টি করে থাকে। এদের অনেকেই কোন প্রকার বিদ্যা শিক্ষা করে না। এমন কি অনেকে উচ্চ বা নিম্ন কোনও প্রকারের বিদ্যালয়েও প্রবেশ করে নি। এদের অধিকাংশই লিখতে বা পড়তেও জানে না। বর্তমান লিখন বা পঠন-পদ্ধতি সম্বন্ধে এরা অজ্ঞ। কিন্তু এ সত্ত্বেও এই সকল অপরাধী বহু চমৎকার চমৎকার গীত ও মন্ত্রাদি রচনা করে থাকে। বহুদিন পূর্বে কোনও এক পুলিশ অফিসার একটি চুরির তদন্ত ব্যপ-দেশে জয়নগর থানার অন্তর্গত মণিরতট নামক গ্রামে যান। সেখানে কোনও এক পুরানো চোরের বাটী থেকে নিম্নলিখিত একটি তালা-ভাঙ্গার মন্ত্র তিনি

উদ্ধার করেন। মন্ত্রটির মধ্যে সংস্কৃত ও বাঙলা ভাষার সংমিশ্রণ দেখা যায়। কথিত চোরটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে জানায় যে সে সেটা তার নিরক্ষর ওস্তাদের নিকট মুখে মুখে শিক্ষা করে। অপরাধীটি অশিক্ষিত হলেও সে কিছু কিছু লেখাপড়া গ্রামের পাঠশালে শিখেছিল। এই কারণে মন্ত্রটি সে এক টুকরা কাগজে টুকে রাখতে পেরেছে। তার বিশ্বাস মতে এই মন্ত্র পাঠে অতি সহজে তালা ভাঙা বা খুলা যায় এবং অর্থলাভ দ্বারা ভাগ্য প্রসন্ন হয়। এইরূপ বহু মন্ত্র আমি বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করেছি। উহাদের একটি মাত্র নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো। মন্ত্রটিতে তিনটি বিষয় লক্ষ্য করবার আছে। যথা—(১) বাঙলার সঙ্গে সংস্কৃত শব্দের সংমিশ্রণ, (২) তালা-চাবি খোলা জনিত শব্দের অনুরূপ শব্দ-বিন্যাস, (৩) দেবদেবীর প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি অথচ কুকর্মে তাদের নিকট থেকে সাহায্য প্রার্থনা।*

"অং ফট্ সাহা অং ফট্ সাহা অং ফট্ ফট্ সাহা
কিং কট কিং কট কিং কটং কট কট কটং সাহা
যং যাহা অং যং অং তাহা পকেটং তট তট্ সাহা
মা কালী দেহিং টাকা নোট ক্লিং তব্লিঙ হাতা
শ্বাং ভয় ভূতেষু মাং মাতাষু দীনেষু ফট্ ফট্ সাহা।"

উপরের শ্লোকটিতে আমরা "পকেট" এবং "নোট" রূপ দুইটি ইংরাজি শব্দ পাই। ইহা ছাড়া "ক্লিং"রূপ একটি বিদেশী শব্দের ন্যায় একটি শব্দও দেখি। ইহা কোন্ ভাষা থেকে নেওয়া হয়েছে তা নির্ধারিত করা দুরূহ। বোধ হয় উক্ত শব্দটি কোনও একটি আদিম ভাষা থেকে নেওয়া হয়েছে। স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতির লোকেরা ঐরূপ অনেক শব্দ ব্যবহার করে। এ'ছাড়া আরও একটা শব্দ লক্ষ্য করবার বিষয়। শ্লোকটিতে "দীনেষু" রূপ একটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে আরও বলা হয়েছে—হে মা কালী, আমি দীন ও দরিদ্র এবং সেই হেতু আমার টাকার প্রয়োজন। অতএব, হে মা কালী, আমাকে ধনীর অর্থে ভাগ বসাতে সাহায্য করো।

পূর্ব পরিচ্ছেদগুলিতে আমি বলেছি যে—'সকল দেশের অপরাধীদের স্বভাব-চরিত্র মূলতঃ এক হলেও দেশ বিশেষের সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার,

---

* এদেশে গ্রামাঞ্চলে কোনও কোনও গৃহস্থ বাটী-বাঁধন মন্ত্রকে চুরির বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ মনে করে। বলা বাহুল্য যে ইহা কুসংস্কারপ্রসূত হয়ে থাকে।

ধর্ম-বিশ্বাস এবং আবহাওয়াও তাদের বহুল পরিমাণে প্রভাবান্বিত করে।' এই বিশেষ সত্য উপরের শ্লোকটির শব্দবিন্যাস থেকে বিশেষরূপে প্রমাণিত হয়। অপরের কষ্টার্জিত অর্থে ভাগ বসিয়ে কর্মালস জীবন-যাপন করার যে মনোবৃত্তি পৃথিবীর সকল অপরাধীদের মধ্যেই দেখে থাকি, সেই বিশেষ মনোবৃত্তির সন্ধান আমরা উপরের শ্লোকটিতে দেখতে পাই। য়ুরোপের ন্যায় বস্তুতান্ত্রিক দেশের অপ-রাধীদের মধ্যে যে আত্মনির্ভরতা আমরা দেখে থাকি, শ্লোকটির মধ্যে সেইরূপ আত্ম-বিশ্বাস ও আত্ম-নির্ভরতার বিশেষ অভাব দেখা যায়। শ্লোকটির রচয়িতাকে এ বিষয়ে নিজের উপর পুরাপুরি বিশ্বাস না রেখে মা কালীকে তাদের সাহায্যের জন্য আহ্বান করতে দেখি। ভগবৎ-বিশ্বাসী গ্রামবাসীদের সন্নিধানে বাস করার জন্যেও অবশ্য এইরূপ বিশ্বাস এদেশের কোনও কোনও অপরাধীদের মধ্যে এলেও আসতে পারে। শ্লোকটির মধ্যে একটি বিশেষ সত্য লক্ষ্য করবার আছে। অপরাধীরা 'অপরাধ করা' তাদের একটা জন্মগত অধিকার বলে মনে করে। এই কারণে তারা তাদের মন্ত্রে-তন্ত্রে সহজ ভাবে ঈশ্বরকেও তাদের সাহায্যের জন্য আহ্বান করে থাকে। যাহা যোক এই সকল মন্ত্র ও গান থেকে দেশ-বিদেশের অপরাধীদের স্বভাব-চরিত্রের সাদৃশ্য ও পার্থক্য সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়। কলিকাতাবাসী একটি অপরাধী রচিত দুইটি গান নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো। গীত দুইটি দুইজন দেশবালী অপরাধী দ্বারা হাজত-ঘরে গীত হতে শোনা গিয়েছিল।

"ম্যাতোয়ালা নন্দলালা, মেরি চোর বালা
আরে-এ, জানসে কা পরোয়া মে—
যব্ তক্ তু রহো হামেরা-আ।
মেরি পিয়ারা, মেরি পিয়ারা॥
খানা দানা রেইশ করনা ছোড়ত্ মে না যানা।
তু হামেরি তুহর হামা রঙমে তু, তু মে গানা॥
মেরি চোর বালা, মেরি মাতোয়ালা
নন্দলালা, মেরি হামেলা-আ।"

"দো জাড়া যাওত চলি, লোটত আওত মে।
তব তক্ তুহ না রহত উবাত মে জানে-এ॥"

উপরের গান দুইটিতে অপরাধীদের অন্তর্ভাব পরিষ্কাররূপে পরিস্ফুট

হয়েছে। সত্যকার অপরাধী বোঝে শুধু খাওয়া-দাওয়া এবং স্ফূর্তি করা। সুরা এবং নারী থাকে তাদের নিত্য সঙ্গী। প্রথম গীতটিতে আমরা "হামেলা', রূপ একটি শব্দ পাই। হামেলা শব্দটির প্রকৃত অর্থ "হুল্লোড়" বা "অঁগিস" বলেই মনে হয়। স্বভাব, মধ্যম [প্রকৃত] এবং উৎকট অভ্যাস-অপরাধীরাই হুল্লোড় ভালবাসে। এই কারণে তারা স্বভাব এবং মধ্যম-বেশ্যাদেরই পছন্দ করে বেশি। কারণ এই ধরণের বেশ্যারাও হুল্লোড় পছন্দ করে। উহা তারা সানন্দে সহ্যও করে। এই ধরণের অপরাধীরা যে কোনও নারীর নিকট এক-নিষ্ঠতা আশা করে না, তা দ্বিতীয় গীতটিতে সম্যকরূপে বুঝা যায়। গীতটিতে স্পষ্টই বলে দেওয়া হয়েছে—"দুজাড়া [দুশীত] অর্থাৎ দু বছরের জন্যে আমার জেল [মেয়াদ] হয়েছে। জেল থেকে দু'বছর পর ফিরে তোমায় আমি দেখতে পাব না। সেই বিষয় আমি ভালরূপেই জানি।" স্বভাব, মধ্যম এবং শেষের দিকে [উৎকট]—অভ্যাস-অপরাধীদের মতবাদ কতকটা এই ধরনেরই হয়ে থাকে। এই সকল বিশেষ মতবাদ সর্বদেশের উৎকট অপরাধীদের মূল মতবাদ। আদিম মানুষগোষ্ঠীর মতবাদও অনেকটা এই ধরণের হ'ত। মনের দিক থেকে আদিম মানুষের সঙ্গে [প্রকৃত] অপরাধীদের বহুল পরিমাণে মিল থাকে। কারণ আধুনিক অপরাধীরা তাদের পিতৃপুরুষ আদিম মানুষের মনের উত্তরাধিকারী। এ সম্বন্ধে পূর্ব পরিচ্ছেদগুলিতে আলোচিত হয়েছে। এস্থলে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

উপরের গান দুইটিতে হিন্দির সহিত কিছু কিছু বাংলারও সংমিশ্রণ দেখা যায়। এর কারণ সম্বন্ধে এইরূপ বলা যেতে পারে। আরবী এবং হিন্দির সংমিশ্রণে যেমন উর্দু ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল, তেমনি কলকাতার বস্তিগুলিতে হিন্দি এবং বাংলার সংমিশ্রণে একটি বিশেষ ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণতঃ বড় বড় শহরে অপরাধীরা এইরূপ ভাষায় কথোপকথন করে। নমুনা স্বরূপ এইরূপ কয়েকটি বাক্য নিম্নে উধ্বৃত করা গেল।

(১) আরে রহেন রহেন। হাপনার সে তবিয়েৎ আচ্ছা আছে ত? (২) হাপনি একটু লিচে দাঁড়িয়ে থাকেন, হামি উপরে খোবর ভেজিয়ে দিচ্ছি। (৩) আরে রহেন রহেন! হামি ভি কেতনা থানাদার দেখিয়েছি। তুহর জান তো হামি আগে লিব। হামি সে তোকে জানসে মারিয়ে দিবে। (৪) বড়বাজারে মরিনবাবু আইয়েছে, হামি সে খবর ভেজিয়ে দিচ্ছি। (৫) কেন নেহি বাবুর কথা শুনছে! বাবুর কথা নেহি শুনবে ত ধরিয়ে লিয়ে যাবে, এমন মার মারবে

যে মরিয়ে যাবে। (৬) তু শা—! হেনে এয়েছিস ? যা শা—তোর মির্জাপুরের মোড়ে। (৭) কহত কা, কা কুরু, না মিলি—।

কলিকাতায় মিশ্রভাষা যেমন বাঙলা এবং হিন্দির সংমিশ্রণে তৈরি হয়, বোম্বের মিশ্রভাষা তেমনি তৈরি হয় মারাঠা এবং হিন্দির সংমিশ্রণে। শিক্ষিত অপরাধীরা নিখিল ভারত বা আন্তঃপ্রাদেশিক অপকার্যে পরস্পরের সহিত ভাষায় আদান-প্রদান করে ইংরাজির সাহায্যে এবং অশিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিত অপরাধীরা অনুরূপ কার্যের জন্য সাহায্য নেয় [ভাঙা ও মিষ্টি] হিন্দির। এ থেকে আন্তঃ-প্রাদেশিক ক্ষেত্রে হিন্দির উপযোগিতা এবং দাবী প্রমাণিত হয় বলে মনে করি।

উপরের দ্বিতীয় গীতটিতে প্রচারিত মতবাদ অপরাধী মাত্রেরই মর্মকথা। কারণ য়ুরোপীয় অপরাধীরাও তাদের সাহিত্যের মধ্যে অনুরূপ মতবাদ প্রকাশ করে। নিম্নের পদ্যানুবাদটি এ বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য। মিঃ ডেভিড নিউগেটে একটি হস্তলিখিত পুস্তক পান। পুস্তকটিতে কোনও এক অপরাধী শ্লোকটি তার প্রিয়তমার উদ্দেশে লিখে রেখেছিল। শ্লোকটির ভাবার্থ মাত্র নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

"ওগো—ও প্রিয়তম লুসি গ্রে আমার! সাত বছরের তরে আমি চলিলাম তোমায় ছেড়ে। আর সকল মেয়েরা যেমন হয়ে থাকে তুমি যদি হও তাদের মতই একজন মেয়ে, তা হলে হয়ত, হয়ত কেন ? না না নিশ্চয়ই, তুমি আমার জন্যে ফেলবে দীর্ঘনিশ্বাস আর সেই সঙ্গে কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রুর কণাও এবং তারপর আমার বন্ধুদের মধ্যে থেকেই তুমি খুঁজে নেবে, আমার মত একজন অ্যালফ্রেড গ্রেকে এবং তাকে তুমি আপন করে নেবে যেমন তুমি নিয়েছিলে আমাকে, কয় বৎসর আগে। ইতি—"

কয়েক বৎসর পূর্বে কোনও এক ভারতীয় অপরাধীর বাক্স তল্লাস করে আমিও একটি নোটবুক্ পাই। নোটবুক্টিতে উর্দু ভাষায় একটি কবিতা লেখা ছিল। সেই কবিতাটির সহিত উপরের শ্লোকটির তুলনা করা চলে। উর্দু শ্লোকটির হুবহু ভাবার্থ নিম্নে তুলে দিলাম।

"হাঁ আমি ফিরব এবং তোমার জন্যই ফিরব। তিনটা বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে। কিন্তু ফিরে এসে আমি কি তোমায় দেখতে পাবো ? হয়ত পাব। ফিরে এসে তোমায় আমি দেখতে পাব। কিন্তু তোমায় খুঁজে পাব না। বুঝব এ পার্বতী সে পার্বতী নয়। আমি জানব আমার পার্বতী গত হয়েছে তিন বছর আগে। সেইদিন—যেদিন আমার জেল হয়েছিল। তোমার ঐ দ্বিতল কুঠি হতে

আমি ফিরে এসে তোমায় খুঁজতে যাব। খুঁজতে যাব সেই বস্তিতে। যেখানে তোমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিলো। ইতি তোমারই—"

সারা পৃথিবীতে অপরাধীরা নারীদের সম্বন্ধে নানা প্রকার উক্তি ক'রে থাকে। কোনও এক এ্যাঙলো অপরাধী নারী সম্বন্ধে নিম্নোক্তরূপ একটি উক্তি করেছিল।

"নারীজাতির ভালবাসা এবং ইজ্জত-জ্ঞানে আস্থাবান বেচারা হতভাগ্য পুরুষদের মূর্খ ছাড়া আর কি-ই বা বলা যেতে পারে!"

এই সকল উক্তি থেকে একটি বিশেষ সত্য প্রমাণিত হয়। পূর্ব পরিচ্ছেদে আমি বলেছি, নারীরা সাধারণতঃ চোর হয় না। নারীজাতি সাধারণ ভাবে চোর হলে চোরেরা তাদের সমব্যবসায়ীরূপে শ্রদ্ধা করত। সাহিত্যের মধ্য দিয়ে তাদের প্রতি এইরূপ শ্লেষোক্তি তা'হলে তারা কখনও করত না।

নারীরাও এই সব শ্লেষোক্তির যথোচিত উত্তর দিয়ে থাকে। কোনও এক ঠগী অপরাধীর বাঙালী রক্ষিতার লেখা একটি পত্রের এক জায়গায় এইরূপ লেখা ছিল: "পুরুষের একনিষ্ঠার অপর নাম অনন্যোপায়িতা।" অপর এক অপরাধী এইরূপ লিখে রেখেছিল—'ভগবৎ ভক্তির অন্য নাম অসহায়তা'।

অপরাধী-সমাজের মেয়েরা এবং বিশেষ করে স্বভাব এবং মধ্যম-বেশ্যারা অপরাধী পুরুষদের উক্তরূপ মনোবৃত্তি সম্বন্ধে সবিশেষ সচেতন। কিন্তু তা সত্বেও তাদের অন্তর্নিহিত নারীত্ব মাঝে মাঝে তাদের ভালবেসে গোল বাধায়। অপরাধী পুরুষদের উক্তরূপ মনোবৃত্তি সম্বন্ধে কোনও এক শিক্ষিতা-নারী নিম্নোক্তরূপ একটি লিপিকা রচনা করে। লেখিকা একজন এ্যাঙলো ব্যেঙলো নারী।

"আমাদের এই পৃথিবী ঝটিকাপীড়িত সমুদ্রের ন্যায়ই বিপদসঙ্কুল স্থান। নয় কি? মরীচিকা এবং হতাশা তাদের সমুদয় নিষ্ঠুরতা নিয়ে এখানে মানুষকে নিয়ত কষ্ট দেয়। দৈবাৎ যদি আমি কখনও একবার কিছুক্ষণের জন্য সুখ বা শান্তি পাই, তা'হলে পর মুহূর্তেই এই সুখ ও শান্তির মূল্য দিতে হয় তিক্ত চোখের জলে। পুরুষের ভালবাসায় যেন কেহ কখনও বিশ্বাস না করে। তাদের কাছে প্রেম মানে সুযোগের সদ্ব্যবহার মাত্র। তোমার সম্মান, ধর্ম, পরিবার, সুখ-শান্তি এবং যৌবন তাদের জন্যে নিঃশেষে উৎসর্গ করেও তুমি তাদের ধরে রাখতে পারবে না। পুরুষ এমনিই একপ্রকার জীব। তোমার এই সকল অমূল্য দ্রব্যের বিনিময়ে তারা তোমায় দেবে অবহেলা এবং

অবজ্ঞা। শুধু তাই নয়। তারা খুঁজতে বের হবে তোমারই সুমুখ দিয়ে তোমার মত অপর আর একজন মূর্খা নারীকে। তোমার প্রতি ফিরে দেখার প্রয়োজনও তার আর তখন হবে না।"

উপরের উক্তিটি একজন য়ুরোপীয় ভাবাপন্ন নারীর হলেও উহাতে তিনি ভারতীয় মেয়েদেরও প্রাণের কথা বলেছেন। অধিকাংশ স্বার্থত্যাগিনী ভারতীয় ললনারা প্রতিদিন এইভাবে ঠকে থাকেন। আমি আমার স্বকীয় অভিজ্ঞতা থেকেই এ'কথা বলছি। ভারতীয় কবিরা কিন্তু অন্য কথা বলেন, যথা :

'আমারি বধূয়া আন বাড়ি যায়
আমারই আঙিনা দিয়া।'

নানাভাবে অপরাধ-সাহিত্যের বেশি নমুনা বর্তমান পুস্তকে উধ্বৃত করা সম্ভব নয়। মৎসংগৃহীত বিবিধ দেশী-বিদেশী অপরাধ-সাহিত্য এবং শিল্প ও চিত্র-কলা অপরাধ-তত্ত্বের একটি পৃথক খণ্ডে সন্নিবেশিত হবে। এক্ষেত্রে কেবলমাত্র মনস্তত্ব বুঝাবার প্রয়োজনে কয়েকটি নমুনা মাত্র উধ্বৃত করা হলো। এক্ষণে কোনও এক এদেশী যুবক [প্রাথমিক] অপরাধীর রচনার কিয়দংশ নিম্নে উধ্বৃত করে বর্তমান পরিচ্ছেদ শেষ করব। এই রচনাটি প্রশ্নোত্তর দ্বারা লিখিত হয়েছে। উহারা সারাংশ মাত্র নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো।

"কয়েদী-জীবন দাসত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়,' : এ কথা অতীব মিথ্যা। 'জেল-জীবনকে সকল অবস্থাতেই দাসত্ব বলা যায় না।' 'অন্যায় কার্যের জন্য কারারুদ্ধ হওয়ার একমাত্র অর্থ হচ্ছে দাসত্ব-জীবন : কারুর এইরূপ ধারণা ভুল। ইচ্ছার বিরুদ্ধে একজনের পক্ষে অপর আর একজনের আজ্ঞাধীন হতে বাধ্য হওয়াকে দাসত্ব বলা হয়। কিন্তু অপরের ইচ্ছাধীন না হয়েও নিজেরই কোনও ইচ্ছা বা বৃত্তি বিশেষের ইচ্ছাধীন হতে যে মানুষ বাধ্য হয় তাকে তুমি কি বলবে ? বহু স্পৃহা বা ইচ্ছার উপর মানুষের নিজের কোনও হাত নেই। এইরূপ কোনও এক শক্তি বা স্পৃহার দ্বারা যে মানুষের প্রতিটি কার্য নিয়ন্ত্রিত হয়, সেই মানুষকে যদি আমরা অপরাধী বলি তা'হলে অপরাধী মাত্রেই ক্রীত-দাস। সে অপরের ক্রীতদাস না হোক, সে নিজের ক্রীতদাস। অপরাধীরা দ্রব্য অপহরণ করে, 'সেই সকল দ্রব্য' সহজে পাবার জন্যে। অপরাধীদের মধ্যে কতকগুলি স্পৃহা আছে ; যথা—লালসা, চৌর্য, স্পৃহা ইত্যাদি। এই স্পৃহা উপশমের জন্য তারা চুরি করে। অর্থাৎ কি'না অপরাধীরা এই সকল স্পৃহা বা বৃত্তির ক্রীতদাস মাত্র। এই কারণে যারা অপরাধীকে তাদের

উক্তরূপ বৃত্তি বা ইচ্ছার অধীনতা থেকে মুক্ত করে, অর্থাৎ যারা অপরাধীদের চৌর্যাদি কার্য থেকে নিরস্ত করে, তারা অপরাধীদের দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে না, বরং তাদের দুর্দমনীয় বৃত্তি বা স্পৃহার অধীনতা থেকে তারা তাদেরকে মুক্ত করে দেয়। এই কারণে জেলে আবদ্ধ অপরাধীদের ক্রীতদাস বলা যায় না। বরং তাদের স্বাধীন মানুষ বলা যায়। আমার মতে মানুষের উত্তম বৃত্তি সমুদয়ের তাদের অধম বা স্থূল বৃত্তিগুলির উপর জয়যুক্ত হওয়ার নামই প্রকৃত স্বাধীনতা। মানুষ যখন তার ধারণা অনুযায়ী সর্বাপেক্ষা সৎ বা উত্তম বৃত্তি দ্বারা তার প্রতিটি কার্য সর্ব অবস্থাতেই নিয়ন্ত্রিত করতে থাকে তখনই তাকে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন মানুষ বলা যায়। সত্যকার সৎব্যক্তি মাত্রই জেলের ভিতর থাকলেও সে একজন স্বাধীন মানুষ। যে সকল মানুষ উচিত ও সৎকার্যের জন্য ধন, সম্পত্তি বা জীবন দান করে এবং যে সকল ব্যক্তির কার্যাদি ভয়, অসূয়া এবং অপবৃত্তি-আদির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ঃ এই উভয় শ্রেণীর মানুষের মধ্যে তুমি কাকে স্বাধীন বলবে? মনে রেখ, হস্ত-পদ বদ্ধ অবস্থায় কবরের মধ্যে থেকেও মানুষ থাকতে পারে স্বাধীন। অপরদিকে সেই একই মানুষ রাজবেশে ভূষিত হয়ে রাজপ্রাসাদে বাস করেও ক্রীতদাসের মতই জীবন যাপন করতে পারে।"

উপরের উক্তিটি একজন অপরাধীর লেখনী থেকে বার হলেও উনি ভারতীয় দর্শনেরই মূল কথা বলে গিয়েছেন। যদিও ভারতীয় উপনিষদের মত কোনও সৎগ্রন্থ পড়ার সুযোগ এরা কখনও পায় নি।

উপরিউক্ত প্রশ্নোত্তরগুলি কথিত অপরাধীটি তার অপরাধ-বিরাম অবস্থাতেই লিখেছে মনে হয়, কারণ এইগুলির মধ্যে আমরা কিছুটা অনুতাপ এবং কিছুটা সৎ-প্রেরণারও সন্ধান পাই। এ'ছাড়া অপরাধীটি যে একজন অভ্যাস-অপরাধী এইসব প্রশ্নোত্তর হতে এও বুঝা যায়। তবে এইরূপ আত্মবিশ্লেষণ অপরাধীরা [অপরাধ-বিরাম অবস্থাতেও] কদাচিৎ করে থাকে। এইরূপ আত্মবিশ্লেষণ অধিক সংখ্যায় লিপিবদ্ধ হলে অপরাধ-বিজ্ঞানের অনেক দুরূহ সমস্যার সমাধান হত।

এদেশের প্রকৃত অপরাধীদের নামগুলিও অদ্ভুতরূপ হয়ে থাকে। ঐ নামের মধ্যে একটি শিশুসুলভ ভাবও পরিলক্ষিত হয়ে থাকে ; যথা কিষনিয়া, মদনিয়া, রুক্মিনীয়া, হনুমানিয়া, রহমনিয়া ইত্যাদি।

প্রাথমিক অপরাধী ও প্রকৃত অপরাধীদের দ্বারা রচিত কহনীয়ার বচন-

বিন্যাসের মধ্যে প্রভেদ আছে। প্রাথমিক অপরাধীরা তাদের সাহিত্য লিপিবদ্ধ করে। কিন্তু প্রকৃত অপরাধীরা তাদের রচনা মুখে মুখে প্রচার করে। নিম্নে জনৈক অ্যাঙলো [প্রাথমিক] অপরাধীর খাতায় পাওয়া একটি রচনা উদ্ধৃত করা হলো।

'এ' উওম্যান অফ্ সিক্সটিন ইজ অ্যাজ [as] মিসটিক্ অ্যাজ্ এশিয়া। 'এ' উওম্যান অফ টোয়েন্টি ইজ্ অ্যাজ্ প্রাউড্ অ্যাজ আমেরিকা। এ' উওম্যান অফ্ টোয়েন্টি-ফাইভ ইজ্ অ্যাজ্ হট্ অ্যাজ্ আফ্রিকা। এ' উওম্যান অফ্ থারটি [৩০] ইজ্ অ্যাজ্ ইউসড্ আপ [used up] অ্যাজ্ ইয়োরোপ। এ' উওমান অফ্ থারটি-ফাইভ্ ইজ অ্যাজ ইউস্‌লেস অ্যাজ অস্ট্রেলেসিয়া।'

এবার নিম্নে প্রকৃত অপরাধীদের দ্বারা রচিত একটি কাহিনীর শেষাংশ উদ্ধৃত করলাম। এই সব কাহিনী [আড্ডাঘরে] সর্দাররা সাকরেদদের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সারমন্ রূপে প্রচার করে। ইহা বাক্‌প্রয়োগেরও [সাজেস্‌শন] কার্য করে।

"তব্ পঞ্চায়েত বুড়বাক আদমীকে বললে,—'আরে! মোড়ল তুহসে এক হাজার টঙ্কা কর্জ নিলে। তু' এ বাত্ কহো। লেকেন ইসকো প্রমাণ কি আছে?' ইসমে ওহি বুড়বাক আদমী শুনালে: 'এ বাত সাচ্চা না হোবে তো হাম ঘর পর লোটকে দেখবে কি মেরি একমাত্র পুত্র মর গিয়া।' এহি কহকে বুড়বাক পঞ্চায়েত কো লেকে আপনা ঘর যায়। কিন্তু আপনা ঘর পর যাকে উনে দেখে কি আপনা পুত্র তো মর গিয়া। তব্ বুড়বাক রোনে লাগে অউর কহে—হো ভগবান! হাম তো সাচ্চা বোলে থে। তভি হামার লেড়কা কাহে মরে। উসকো ডাকে'মে ভগবান উগবান তো হুঁয়া কোহি না এলো। থোড়া বাদ আঁধার বনাকে বিজলী চমকায়ে আপনা ছাঁতিমে নখোসে খুন নিকালকে শয়তান মহারাজ উঁহা আসে গেলো আউর উনে বললো—'আরে। ভগবানকো রাজ তো কব খতম হলো। আভি তো হামার রাজ চলছে। তু' কাহে সাচ্চা কহকে বোলা তুহোর নিকট মোড়ল এক হাজার রুপেয়া কর্জ নিলো। তুহকো ঝুটা বোলকে কহনে চাহি থে কি উনে তুসে দো' হাজার রুপেয়া কর্জ নিলো। তব্ ওহি বুড়বাক শেয়ানা বনকে ফিন পঞ্চায়েতকো পাশ গেলো, আউর বললো —'ধন দৌলত ছিপানেকো বাস্তে হামে ঝুটা বলে ছিল। ওহি বাড়ে মেরি লেড়কা মরে। ওহি আদমী হামসে দো হাজার রূপেয়া কর্জ নিলে। আভি তো হাম সাচ্চা বোলে। মেরি লেড়কা আভি জিন্দা হোবে। তব পঞ্চায়েত

কো সাথ ওহি বুড়বাক আপনা ঘরমে লোটে আউর দেখে কি উনকোপুত্র জিন্দা হয়ে গিছে। তব্ পঞ্চায়েত কো হুকুমৎ' মে মোড়ল'কে উসকো ঝুট মুট দো'হাজার রূপেয়ে দিতে হলো।

[অপরাধ শিল্প]

অপরাধ-শিল্প এবং অপরাধ চিত্র অপরাধ-বিজ্ঞানের একটি উল্লেখ্য পরিচ্ছেদ। পকেট মার'রা বোতল ভাঙা কাঁচের সাহায্যে এমন সুন্দর ভাবে ছুরি বা খুর তৈরী করে যে, তাতে দাড়ি পর্যন্ত কামানো যায়। রেজার ব্লেডের প্রচলনের পূর্বে পকেট ও জেব কাটতে ওরা ঐ কাঁচের ছুরি ব্যবহার করতো। হাউস ব্রেকিঙ ইন্সট্রুমেণ্ট বা ভাঙন যন্ত্রপাতি গুলির নক্সা তৈরী ও উহাদের নির্মাণ কৌশলের মধ্যে এরা অদ্ভুত শিল্প জ্ঞানের পরিচয় দেয়। চোরেরা তালা গুলি কায়দায় ভেঙে কিংবা উহা ল্যাম্প দ্বারা গরম করে বা এ্যাসিড্ দ্বারা গলিয়ে, করাত দিয়ে কেটে বা লৌহ দণ্ড দ্বারা ভেঙে বা কিছু দ্বারা নেড়ে ওগুলো খুলে। কিন্তু ওদের একজনের আবিষ্কৃত লকগার্ড দ্বারা তালা আবৃত থাকলে উহা সহজে ভাঙা বা খুলা যায় না। অপরাধীদের তালা সিন্দুক ও দ্বিবাল ভাঙার যন্ত্রপাতিগুলি সম্বন্ধে পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে বিশেষরূপে আলোচিত হবে। কোনও এক কর্মকার অভ্যাস দ্বারা অপরাধী হয়। অপরাধ বিরামের সময় তার সে জন্য প্রায় অনুতাপ হতো। এই অবস্থায় গৃহস্থদের উপকারের জন্য সে এমন একটি তালা নির্মান করে যা চতুর চোরেরাও ভাঙতে পারতো না।

এইরূপ অপরাধ শিল্প ব্যতীত তাদের অঙ্কিত অপরাধ-চিত্রও দেখা যায়। এই সব চিত্র অপরাধীরা কয়লা বা ইটের টুকরোর সাহায্যে খেয়াল মত জেলের দ্বিবালে হাজত বা লক-আপ এর গায়ে প্রায়ই এঁকেছে।

টিস্থ পেপারের সাহায্যে এইরূপ বহু অপরাধ-চিত্র আমি সংগ্রহ করেছি। স্থানাভাবে সবগুলি উধ্বৃত করা হলো না। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি মাত্র চিত্র বর্তমান পরিচ্ছেদে সন্নিবেশিত হলো। এই পাখীর ছবিটির নাম দিয়েছি 'গতিশীল পক্ষী বা ডায়োনমিক বার্ড। এই চিত্রটি অপরাধীদের অব্যবস্থিত চিত্তের পরিচয় দেয়।

[অপরাধীদের দ্বারা কিংবা তাদের নির্দেশে সৃষ্ট বহু সংখ্যক ভাঙন যন্ত্রপাতি,

সিঁদকাটি, দড়ির মই, কপিকল ও ত্রিকণ্টক যুক্ত মই, উপরে উঠবার জন্য রবার বা চামড়া আবৃত শিকল, তার বা শিক কাটা কল, গবাক্ষের রড্ বাঁকানোর যন্ত্র, বিবিধ বোরিঙ ইনষ্ট্রুমেণ্ট, বিবিধ প্রকার তুরপুন, করাত, লৌহ কর্তক, জ্যাক, মোটরের টায়ার ফাটানোর পেরেক যুক্ত বল, স্বর্ণমন্ড পিতলের বাট ও বালা, ইত্যাদি, মদ চোলাই এর যন্ত্র এবং কোল্ড পাইপ আদি সংগ্রহ করে তাদের বৈজ্ঞানিক পন্থায় শ্রেণী বিভাগ করে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা ট্রেনিঙ কলেজের মৎ-সৃষ্ট মিউজিয়মে আমি সাজিয়ে রেখেছি। ভারতের সুগঠিত ক্রাইম মিউজিয়মগুলি আমিই আমার সংগৃহীত কয়েক শত দ্রব্যের সাহায্যে সর্ব প্রথম স্থাপন করি।]

উপরের চিত্রটি প্রাথমিক অপরাধীদের দ্বারা অঙ্কিত হয়েছে। তাই ওটির সহিত নিরাপরাধী চিত্র-শিল্পিদের আঁকা ছবির সাদৃশ্য আছে। তা সত্ত্বেও ওই অপরাধীর দোদুল্যমান অব্যবস্থ মনের পরিচয় ওতে আছে। কিন্তু-স্বভাব আদি-মনোভাবী অপরাধীর আঁকা চিত্রের সহিত আদি মানুষদের পর্বত গুহাতে
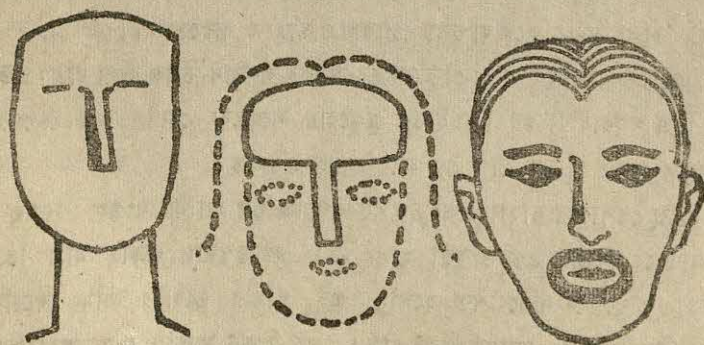
আঁকা চিত্রের সাদৃশ্য থাকে। কারণ, তাদের দৃষ্টি-শক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গী বহুলাংশে আদি মানুষের মত হয়। তাই তারা ওদের চিত্রে বক্ররেখা ঘেরা কপাল ও

নাকের উপর অধিক প্রাধান্য দেয়। মাথার কেশও তারা গুচ্ছাকারে না দেখে ক্ষীণ বক্র রেখাকারে দেখে। পূর্ব পৃষ্ঠায় নব্য প্রস্তর যুগের দুইটি এবং বর্তমান মানুষের একটি মুখোসের চিত্র উধ্বৃত করা হলো।

১ নং চিত্রের মুখোসে শুধু কপাল ও নাক সুস্পষ্ট। শিশুর চক্ষুতে ওটাই নিখুঁত মানুষ। ২নং চিত্রে প্রস্তর যুগের একটি মানুষকে তাদের দৃষ্টিতে ফুটানো হয়েছে। [পৃঃ দ্রঃ] ৩ নং চিত্রে এযুগের মানুষের ওষ্ঠাংশ স্পষ্টভাবে চিহ্নিত। ছোট শিশুর দৃষ্টিতে এটা ঠিক মানুষ নয়। আদি যুগের বয়স্ক মানুষের দৃষ্টি ও সভ্য মানব শিশুদের দৃষ্টি কম বেশী সমতুল।

কারাগারের ও হাজত ঘরের দ্বিবালে অপরাধীরা ইটের টুকরা ও কয়লা আদির দ্বারা বহু চিত্র ও নক্সা আঁকে। ওই গুলির স্বরূপ থেকে ওদের শ্রেণী ও উপশ্রেণী, প্রকৃতি, স্বভাব এবং অপস্পৃহার পরিমাপ বুঝা যায়।

গৃহস্থরাও অপরাধীদের মত বহু অপরাধ সাহিত্য সৃষ্টি করেছে। অসহায় অজ্ঞ ব্যক্তিদের ওলাই চণ্ডীর [কলেরা ও বসন্ত নিবারণে] উপাসনা এবং ব্যাঘ্র দেবতা 'দক্ষিণা রায়ের' পূজার মত চোরেদের হাত থেকে রক্ষা পেতে বহু বাড়ী-বাঁধা মন্ত্রাদিও ওরা সৃষ্টি করেছে। এইগুলি সংগ্রহ করলেও স্থানাভাবে উল্লেখিত হলো না। গৃহস্থদের সৃষ্ট নিম্নোক্ত প্রবাদ-সাহিত্য বিজ্ঞান ভিত্তিক হওয়ায় কয়েকটি এখানে উধ্বৃত করলাম।

"চোরে কামারে দেখা নেই। সিঁদ মোহনায় চুরি।"

চোর ভোর রাত্রে [প্রথামত] সিঁদুর মাখানো গামছা, পাঁচটি সিকা মুদ্রা কামারশালার বদ্ধ দুয়ারের সুমুখে রেখে যায়। প্রত্যুষে কামার ঔগুলি গ্রহণ করে একটি লৌহ সিঁদকাটি তৈরী করে রাত্রে ওখানে রেখে গৃহে ফেরে। গভীর রাত্রে চোর এসে ঐ সিঁদকাটি উঠিয়ে নেয়। এই লেনদেন সত্ত্বেও ওদের পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ নেই। তাই বিপাকে পড়লেও কেহ কাউকে সনাক্ত করতে পারে না।

"চোরের এক পাপ ও গৃহস্থের সাত পাপ।" "চোরের সাত দিন আর গৃহস্থের একদিন।

"স্যাকরা মায়ের কানের সোনা চুরি করে ঃ পুলিশ বাপের কাছ থেকে ও ঘুষ নেয়।" ছাগল ঘাস খায় না ঃ পুলিশ ঘুষ খায় না। এ'কথা কেউ বিশ্বাস করবে না।"

তাৎপর্য চোর চুরি করে মাত্র একবার পাপ করলো। কিন্তু তাতে গৃহস্থ

নির্দোষী বহু জনকে সন্দেহ করে বহু পাপে পাপী। চোর বহুবার চুরি করলেও একদিন সে ধরা পড়বেই। সেইদিন গৃহস্থের হাতে তার দুর্গতির একশেষ হবে।

(১) চোরের মায়ের কান্না (২) চোরের মার বড় মার (৩) চোরের মন বোঁচকার দিকে। (৪) চোরের দেখা পুঁই আদাড়ে (৫) চোরের উপর রাগ করে ভুঁয়ে ভাত খাওয়া (৬) চোরের উপর বাটপাড়ী (৭) ডাকাতের জিরগা হাঁক : চৌকীদারের হাঁক ডাক (৮) ডানপিঠের মরণ মগডালে (৯) চোরা ন শুনে ধর্মের কাহিনী (১০) চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা : যদি না পড়ে ধরা (১১) বর্ণ চোরা আম ঠগী বাবুর নাম (১২) মনের শয়তান বড় শয়তান (১৩) যেই রক্ষক সেই ভক্ষক (১৪) শেয়ানায় শেয়ানায় কোলাকুলি (১৫) ধর্মের কল বাতাসে নড়ে (১৬) চোরকে বলে চুরি করতে : গৃহস্থকে বলে সাবধান হতে (১৭) বরের ঘরের পিসি : কনের ঘরের মাসী (১৮) তোর বাড়ীতে মামলা ঢুকুক (১৯) মরার বাড়া গাল নেই (২০) সাবধানের মার নেই (২১) সাত চড়ে রা' নেই। (২২) দৈত্য কুলেও প্রহ্লাদ জন্মায়। (২৩) যার জন্যে করি চুরি সেই বলে চোর। (২৪) চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।

উপরোক্ত বিভিন্ন যুগের প্রবাদ বাক্যগুলি তৎ তৎ কালের জনগণের অপরাধ-তত্ত্ব সম্পর্কে চিন্তা ভাবনার পরিচয় বহন করে।

সভ্য মানুষের মধ্যে অপরাধীদের সম্বন্ধে একটি দুর্বলতা আছে। তাই তাদের ভাষায় প্রায়ই অপরাধী সম্পর্কিত উক্তি থাকে। নিম্নের দৃষ্টান্তগুলি থেকে বক্তব্য বিষয় বুঝা যাবে।

"ওসব ছেঁদো কথায় মারো গুলি। 'দাদা! এসব ভাবের ঘরে চুরি। বাতাসার হরির লুঠ। এ্যাসেম্বিলিতে—অপোজিসেন বোম্বার্ডেড্। উনি রেগে বা হেঁসে খুন। ব্যবসায়েতে দারুণ [চোট] মার খেলো। বাবা, এতো দাম। এ যে দিনে ডাকাতি। ওকে লটকাও। [ঝুলাও] প্রস্তাবটি স্ম্যাসড্। পিশ টক র‍্যাপচার্ড। হ্বাট ইস্ কিলড্। ভায়লেন্টলি অপোজড্। কথার চাবুক। খরচা করে ঠকে গেলাম। বন্ধুর বাটিতে হামলা করবো। ওর বক্তৃতা তোপে ওড়াবো। মার দিয়া কেল্লা [উল্লাস ধ্বনি]।

"উপবাসী রেখো না দেহরে। দেহ যা চায় তাকে তা দেবে। এমন কি প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও উহার কোষ অনুকোষ যা চায় তাও তাকে দিতে হবে। যে মুহূর্তটি তুমি উপভোগ করবে না, সেই মূহূর্তেই সেটি তোমার কাছে

হারিয়ে যাবে। এই পৃথিবীতে এক পুরুষের ভুল পরবর্তী পুরুষ ভোগ করে।"

ব্যবসায়ীর নরম : জমিদারীর গরম। ইমারতীর মেরামতি : জমিদারীর মাল গুজরাতী।

[রাজনীতিকরা সমস্যার সমাধানের বিষয় বলে না, বরং মূলধনরূপে ওগুলি জিইয়ে রাখার তাঁরা পক্ষপাতী।]

"প্রত্যহ প্রত্যুষে আমাদের ওই একটিই প্রার্থনা। হে করুণাময়। করুণা করে তুমি করুণা করো না।

তোমাদের পক্ষে যা ভালো, আমাদের পক্ষে তা ভালো নয়। তোমরা আমাদের পল্লীকে উন্নত করলে আমরা বুঝি যে ট্যাক্স বাড়বে। সাধ্যাতীত ওই ট্যাক্স এক মাত্র কালোবাজারীরা'ই দিতে পারে। তাই বারে বারে আমাদের বাস্তুভিটা ত্যাগ করতে হয়। ভয় পিছন পিছন আবার ওখানেও না তোমরা যাও। তোমরা মেটে রাস্তা তৈরী করলে ওই পথে গুণ্ডারা ও পুলিশ আসে। ওদের দৌরাত্ম্যে গাছে একটা ফল পর্যন্ত থাকে না। ওই পথ পিচের হলে মোটর ডাকাতি আরম্ভ হয়। গ্রামের দ্রব্য অন্যত্র যাওয়ায় দ্রব্য মূল্য বাড়ে। পথের অভাবে জল কাদা ভেঙে কষ্ট করে এতো দিন ওরা আসে নি। অন্যদিকে— অভ্যস্ত থাকায় কষ্ট আমাদের নিকট কষ্টই নয়। এতোদিন আমাদের শান্তি ও নিরাপত্তা অক্ষুন্ন ছিল। [গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আমাদেরও গুণ্ডা হতে হয়েছে।]

"আমাদের পকেট কাটবার জন্য তোমাদের কাউকে আমরা ভোট দিই নি। উন্নতির নামে তোমরা ট্যাক্স বাড়িয়ে কর্মচারীর মাইনে বাড়াও। কিন্তু—ট্যাক্স দাতাদের পুত্রদের তোমরা একটা চাকরিও দাও না। তাই আমরা ছিনতাই ও ডাকাতি করি। আয়ের ব্যবস্থা না করলে ট্যাক্স কোথা থেকে দেবো। বরং উন্নয়নের অর্থে তোমরা মোদের লগে ফ্যাকটরী বানাও না কেন? দুশো টাকা আয় থেকে দুশো টাকা ট্যাক্স দেওয়া সম্ভব নয়। গরীবি হটানো অর্থে নিশ্চয়ই গরীব তাড়ানো নয়। তার চাইতে মোদের সব কিছু নিয়ে আমাদের অন্ন বস্ত্রের ভার নাও। কিন্তু সেই সাহসও তো তোমাদের নেই। [জনৈক দৈব অপরাধীর খাতা হতে উদ্ধৃত।]

"অসহায় গুলি ছোঁড়ে অসহায় মরে। এটি উপলব্ধি করে ওদের ক্ষমা করো।" "যেখানে বিয়ে করবে সেখানে প্রেম করবে না। যেখানে প্রেম

করবে সেখানে বিয়ে করবে না।" "ওপরের লোককে টেনে নীচে না নামিয়ে [সমতার জন্য] নীচের লোককে ঠেলে উপরে তোলো।" "ষ্টিল কণ্ট্রোলারকে ফিসারী এক্সপার্ট এবং ফিসারী এক্সপার্টকে ষ্টিল কণ্ট্রোলার করা ক্ষতিকর।

বিঃ দ্রঃ—রোগী নারীরা অচেতন মন উজাড় করে অশ্লীল গালিগালাজ করলে তাকে আমরা ভূতে পাওয়া [Possessed] বলি। কিন্তু ওই রোগে তারা দেব দেবী সম্বন্ধে উচ্চাঙ্গের কথা বললে তাকে আমরা ভর হওয়া [Inspired] বলি। মূলতঃ ওগুলি থাকে প্রদমিত যৌনস্পৃহা সম্ভূত এক প্রকার হিষ্টিয়া রোগ। তাই পুরুষকে পেত্নীতে এবং নারীদের [বিধবাদের বেশী] ভূতে পায়। [ব্রাহ্মনীদের ব্রহ্ম দৈত্য]

[ভূত ঝাড়ার মন্ত্রে বহু অশ্লীল শব্দ থাকে। তাই রোঝাদের ঝাড় ফুঁক মন্ত্রের অশ্লীল শব্দ শুনে যৌন-রোগিনী নিরাময় হয়। অন্যমনস্করা অন্য শব্দ না শুনতে পেলেও বা উহা তারা অগ্রাহ্য করলেও দূরের অশ্লীল শব্দ স্মেলিঙ সণ্টের ঘ্রাণের মত তাদেরকে সজাগ করে।]

কিছু সাহিত্যিক তাদের পাত্রপাত্রীদের দ্বারা বহু অপরাধ করালেও ওগুলিকে সমর্থন না করে গ্রন্থে নিন্দা করেছেন। অন্য সাহিত্যিক পাত্রপাত্রীদের দ্বারা জঘন্য অপরাধ করিয়ে অলীক যুক্তি তর্ক দ্বারা ওগুলিকে সমর্থন করে থাকেন। অন্যেরা সাবধানে অপরাধস্পৃহাকে দূরে রেখে শুধু নীতিবোধের বিষয় বলেছেন। [সাহিত্যে অপরাধ সম্পর্কীত গবেষণার একটি ক্ষেত্র আছে।] কিছু সাহিত্যিক যে সমস্যা সমাজে নেই তাই এদেশে আমদানী করেন। প্রত্যেক কাহিনীর একটা প্রতিপাদ্য বিষয় থাকা উচিত। সমস্যার বিষয় বললে তার সমাধানের উপায়ও বলে দিতে হবে।

কিছু দুষ্ট শক্তিশালী সাহিত্যিক অর্থের বিনিময়ে গোপনে বে-নামীতে দুষ্ট প্রকাশকদের পর্ণোগ্রাফিক লিটারেচার লিখে দেন। এগুলি গোপনে পড়ে উঠতি বয়সী তরুণদের উত্তেজনায় জর এসে গেছে। তবে [মানসিক] ইমপোটেন্সী চিকিৎসায় এগুলি ডাক্তার'রা ব্যবহার করলে ক্ষতি নেই। [এই শহরে কিছু অশ্লীল 'ব্লু' ফিলিমও গোপনে দেখানো হয়।]

রুচিহীনতা ও অশ্লীলতায় প্রভেদ আছে। প্রথমটিতে পুস্তকটির বিরুদ্ধে [প্রোসক্রাইব করে] এবং দ্বিতীয়টিতে লেখকের বিরুদ্ধে [মামলা করে] ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কিছু ব্যক্তি বলেন 'টু কিল এ বুক ইজ মোর দ্যান কিলিঙ এ ম্যান। অন্যেরা বলেন যে 'প্রসটিটিউসন অফ পেন ইজ ওয়ার্ষ্ট দ্যান

দি প্রসটিটিউসন অফ বড়ি'। অধুনা বাইরে র' [RAW] মেটিরিয়ালের প্রাচুর্যের জন্য বই পড়ে কেউ বকে না। এ বিষয়ে 'সেন্স অফ আনড্রেসিঙ এবং লাইনস অফ ভালগারিটি বিবেচ্য। দেখতে হবে এইগুলিকে কি ভাবে [কতো লোকে] গ্রহণ করছে। লাইট এণ্ড সেডে আঁকা সম্পূর্ণ নগ্ন নারী মূর্তি একটি উৎকৃষ্ট আর্ট। কিন্তু বিবস্ত্রা নারীর দেহে গহনা বা তার পায়ে মোজা থাকলে উহা অশ্লীল ছবি।

উলঙ্গ পুরুষদের গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ও হাতে রুদ্রাক্ষের বালা থাকলে উনি সাধুবাবা। ওই ক্ষেত্রে শুধু লেঙোট থাকলে তিনি কুস্তিগীর পালোয়ান। কিন্তু এক পায়ে অর্ধ প্যাণ্ট পরিহিত নগ্ন পুরুষের চিত্র অশ্লীল। এইগুলিতে জনগণের সংস্কার ও ভাবনা প্রতিফলিত হওয়ায় উহারা ভিন্ন ভিন্ন অর্থবহ।

বহু ক্ষেত্রে সাহিত্যিকদের স্বকীয় স্বভাব চরিত্র ও মানসিক ইচ্ছা তাদের প্রণীত সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়।

যুদ্ধের সময় ও মহাদাঙ্গাকালে উত্তেজনায় অপরাধীদের, হত্যাকারীদের ও আত্মহন্তারকদের সংখ্যা বৃদ্ধি হতে দেখা গিয়েছে।

একবিংশ অধ্যায়

॥ অপরাধ দর্শন ॥

অপরাধী জীবন থেকে সভ্য নিরাপরাধী জীবনে উঠার কালে এবং নিরপরাধী থেকে অপরাধী জীবনে নামার কালে অপরাধীরা তাদের উঠানামার স্তর মত অপরাধ-দর্শন সৃষ্ট করে। এতে কিছু কিছু পারভারসিটি তথা বিকৃত মানসিকতার পরিচয়ও পাওয়া যায়। অপরাধ-দর্শনের মধ্যে অপরাধী হওয়ার কারণেরও সন্ধান মিলবে। ওদের বিবিধ রূপ চিন্তা ধারার সহিত পরিচিত হলে ওদেরকে চিকিৎসার দ্বারা সহজে নিরাময় করা যায়।

অপরাধীদের নিজস্ব দর্শনের নাম অপরাধ-দর্শন। বাক্-প্রয়োগ বা উপদেশাদির দ্বারা তাদের এই দর্শন যে ভুল তা প্রমাণ না করলে অপরাধীদের নিরপরাধ করা অসম্ভব। এই কারণে অপরাধ-বিজ্ঞানের ছাত্রদের অপরাধ-দর্শন সম্বন্ধে অভিহিত হওয়া উচিত।

অপরাধ-দর্শনের মধ্যে আমরা অনুতাপ ও লজ্জার অভাব এবং নৈতিক অসাড়তার আধিক্য দেখে থাকি। অপরাধীদের বিভিন্ন উক্তি থেকে অপরাধ-দর্শন সংগৃহীত হয়েছে। অপরাধীরা সাধারণতঃ অপরাধসমূহ অস্বীকার করে, কিংবা নানা যুক্তিতর্ক দ্বারা তাদের অপকর্ম সমূহকে সমর্থন করে। অপরাধ তাদের কাছে থাকে একটা অধিকারের সামিল। প্রকৃত অপরাধীদের দর্শন এইরূপই হয়ে থাকে। অপর দিকে সমাজ বা রাষ্ট্র তার অপকর্মের জন্য তাকে শাস্তি দিলেও সে দুঃখিত হয় না। তার মতে তার যেমন চুরি করবার অধিকার আছে, গৃহস্থদেরও তেমনি এই চুরির জন্য তাকে শাস্তি দিবার অধিকার আছে—অবশ্য যদি তাকে তারা ধরে ফেলতে সক্ষম হয়। এ বিষয়ে তাদের মনোবৃত্তি যুদ্ধরত সৈনিকদের মতই হয়ে থাকে। উভয় পক্ষীয় সৈন্যরা কেহ কাহারও উপর বিরাগ রাখে না, কিন্তু তবুও তারা এ'জন্য জীবনপণ করে। কারণ, যুদ্ধ যুদ্ধমাত্রা। ভারতীয় অপরাধীদের মতে নিজেদের দলের লোকের প্রতি কোনও রূপ অপরাধ করলে তা অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু এই অপরাধ ধনী গৃহস্থদের বিরুদ্ধে করলে তা অপরাধ হয় না।

অপরাধীদের এই বিশেষ মনোবৃত্তির প্রমাণস্বরূপ নিম্নে অপরাধীদের বিবিধ প্রকার উক্তি এবং লিখনসমূহ উদ্ধৃত করা হলো।

"বুদ্ধিভ্রংশের জন্যই আমরা ধরা পড়ি। অপর সকলের মত আমিও একজন নির্বোধ। তাই আমাকেও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হতে হ'য়েছে। এই উক্তিটি কোনও এক য়ুরোপীয় অপরাধী কারাগৃহের গাত্রে লিখে রেখেছিল। "আমি ভিন্নপ্রকৃতির মানুষ নই : ঈশ্বরের ইহা অভিপ্রেত হলে তিনি আমাকে ভিন্ন প্রকৃতির মানুষই করতেন।" গোদে সাহেবের এই উক্তির অনুরূপ উক্তি অপরাধ-দর্শনের মধ্যেও দেখা যায়। কোনও এক অপরাধী আমার নিকট এইরূপ বলেছিল, 'যে ঈশ্বর আমাদের মধ্যে [অপকর্মের জন্য] এই কুকাজের লালসা [অপরাধ-স্পৃহা] দিয়েছেন সেই ঈশ্বরই আমাদের হাজতে পুরবার অধিকার গৃহস্থদের দিয়েছেন। সুতরাং দাদু ! এজন্য দুঃখ করবার কি আছে ?" কোনও এক ফরাসী ডাকাত ফাঁসি মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে এইরূপ উক্তি করে।—"আমি একজন নির্দোষ বলে নিজেকে মনে করি। কারণ আমি কখনও গরিবের দ্রব্য অপহরণ করিনি। আমি কেবল ধনীর বাড়তি সম্পদের ভাগ নিয়েছি মাত্র। ডাকাতের উপর ডাকাত এই ধনীদের দ্রব্য অপহরণের মধ্যে আমি কোনরূপ দোষ দেখিনি।" অপর এক অপরাধী ফাঁসির সময় বলে

উঠে, "আমরা গরীব অসহায় অপরাধী। তাই আমাদের ফাঁসি হবে কিন্তু যে সব নেতা অন্য দিক দিয়ে আমাদের চেয়েও বড় অপরাধী তাদের ফাঁসি দেবে কে ?" "আইন গরিবের জন্য, উহা ধনীর জন্য নয়"। কোনও এক ইংরাজ অপরাধী পাঁচিলের গায়ে এই বাক্যটি লিখে রেখেছিল। নিম্নে অপরাধীদের আরও কয়েকটি লিখন ও উক্তি উধ্বৃত করা হলো। বলা বাহুল্য, এদের সব কয়জনই অভ্যাস-অপরাধীই। "আইনজীবি এবং ব্যবসায়ীরা যে রীতিতে গরিব মূর্খ ব্যক্তিদের অর্থাদি অপহরণ করে আমরা জনসাধারণের সর্বনাশ সেই রীতিতে করি না। এইজন্যই কি আমরা অপরাধী ?" "জগতের ৪/৫ অংশ পুণ্য কাজ প্রকারান্তরে ভীরুতাসূচক পাপ কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়।" "বাক্‌চাতুর্য সহকারে উপকারের ভাণ করে অপরের অপকার করা অপেক্ষা সোজাসুজি তাকে আঘাত হানার মধ্যে ঢের বেশি পুণ্য আছে।" "আমি আমার অপকার্যের জন্য গর্ব অনুভব করি। তাই আমি কখনও সামান্য অর্থের জন্য চুরি করি না।" "আমার মতে পৃথিবীতে দুই প্রকারের সুবিচার আছে ; যথা : স্বভাব-সুবিচার এবং কৃত্রিম সুবিচার। ধনীর অর্থ অপহরণ করে যদি কেউ দরিদ্র পড়শীদের খাদ্য-সংস্থান করে দেয় তাহলে তাকে বলা যায় স্বভাব-সুবিচার। আইনদ্বারা ধনীর অর্থ কেউ যদি এমন ভাবে রক্ষা করে যাতে তা দরিদ্রেরা না পেতে পারে, তা'হলে তাকে বলা হয়ে থাকে কৃত্রিম সুবিচার।" কোনও এক ইতালীয় কারাগার থেকে লম্ব্রেসো সাহেব নিম্নোক্তরূপ লিপিকাটি সংগ্রহ করেছিলেন। "মাত্র অর্ধ ডজন ডিম চুরির জন্যে আমার মেয়াদ হল, অথচ দেশের মন্ত্রীরাপ্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মুদ্রা অপহরণ করেও সাধু রইলেন। হায় রে আমাদের জন্মভূমি, দুর্ভাগ্য ইতালী দেশ !" কোনও এক ডাকাত-সর্দার বিচারকদের উদ্দেশে এইরূপ একটি দম্ভোক্তি করে "পৃথিবীতে আমাদেরও প্রয়োজন আছে। ঈশ্বর আমাদের পাঠিয়েছেন লোভী ধনী সম্প্রদায়কে শাস্তি দেবার জন্যে। আমরা ঈশ্বর প্রেরিত দূত মাত্র। এ'ছাড়া আমরা না থাকলে জজ সাহেবরাই' বা কিরূপে দিন গুজরান করবেন ?" মধ্যম অপরাধী-সমাজে নিম্নোক্তরূপ একটি গীত গাওয়া হয়ে থাকে। গীতটির ভাবার্থ মাত্র নিম্ন তুলে দিলাম। গীতটির রচয়িতা তাঁর অন্তর্নিহিত কর্মালসতাকে সমর্থন করে সাফাই গেয়েছেন মাত্র ! "আমার যদি খাদ্য না থাকে তা হলে কি আমি অপরের খাদ্য থেকে কিছুটা নিতে পারি না ? নিশ্চয়ই পারি। যদি তোমার খাদ্যের অভাব ঘটে এবং তুমি যদি উহা আয়ত্তের মধ্যে পেয়েও অপহরণ না কর তাহলে তুমি একজন বোকা।"

"প্রয়োজনের সময় প্রত্যেক জিনিসই প্রত্যেকের : এই বিশেষ সত্যটি অনুধাবন কর এবং সুখী হও।" "ধর্ম, আইন, দেশপ্রেম এবং দৈহিক রোগসমূহই মানুষের একমাত্র শত্রু। অপকর্ম বা চুরি মানুষের শত্রু নয়, বরং সেটা একটি সম্মানজনক ব্যবসায়। ধর্ম মানুষের স্বাধীন চিন্তা এবং স্বাধীন আত্মাকে অপহরণ করে এবং সামাজিক রীতিনীতি মানুষের স্বাভাবিক ইচ্ছা বা স্পৃহাকে দমন করে মানুষকে অমানুষ করে তুলে। দেশপ্রেমকে আদর্শের ক্ষেত্রে পুতুল-পূজা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। এই দেশপ্রেমের নামে ভণ্ড ও স্বার্থপর রাষ্ট্র নায়কেরা পৃথিবী শুদ্ধ মানুষের সর্বনাশ করে মাত্র। অপকর্ম বা চুরি দ্বারা মানুষ কখনও কি উক্তরূপে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে? কক্ষণ হয়নি। বরং এই চুরি বা অপকর্ম ধনসম্পদ বণ্টন করে সমাজের উপকারই করে থাকে।" "যে দেশে চোরের সংখ্যা কম থাকে, সেই দেশকে সুশাসিত দেশ বলা যেতে পারে। দেশের অভাব ও দারিদ্র্য যে পরিমাণে কমে যাবে, সেই পরিমাণে দেশে চোরের সংখ্যা কমবে"। কোনও এক অভ্যাস অপরাধী আমার কাছে উক্তরূপ এক উক্তি করেছিল। অপর এক অপরাধী আমার কাছে এইরূপ আর একটি উক্তি করে। এই উক্তিটির মাত্র কিছুটা অংশ উধ্বৃত করা হলো। "বিদ্যাবুদ্ধি এবং সাধুতা মানুষের উপকারে আসে না। মানুষের উপকারে আসে মাত্র তাদের অসাধুতা। তা না হলে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যারা কাজ করে তারা এতো কষ্ট পায় কেন?" কোনও এক শিক্ষিত ভারতীয় অপরাধী আমাকে একদিন বলেছিল, "বারে বারে অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করে মানুষ সফলতা লাভ করে। অর্থাৎ, যে পরিমাণে আপনি অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করেছেন, সেই পরিমাণে আপনি জনপ্রিয়তা ও কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। এই ভাবে আপনার জীবন আপনি অতিবাহিত না করলে এতোদিন আপনাকে অক্ষমতার গ্লানি নিয়ে কর্মক্ষেত্র থেকে বিদায় নিতে হতো। আচ্ছা! এইবার আপনি আপনার বুকে হাত দিয়ে বলুন দিকি এ'কথা সত্য কি না?" অনুরূপ ভাবে অপর এক শিক্ষিত বাঙ্গালী অপরাধী আমাকে বলেছিল—'যুক্তির বিষয় তুলবেন না। যুক্তি হচ্ছে এক প্রকার উকিল : যাকে আমরা আইনজীবী বলি। এই যুক্তি নিজে কিছু বুঝে না। সে শুধু অপরকে বুঝায় মাত্র।"

নিম্নে অপরাধীদের দ্বারা লিখিত আরও কয়েকটি উক্তি উধ্বৃত হলো।

"আমাদের চৌর্য-ব্যবসায়ের জন্য আমরা কারো উপর নির্ভরশীল নই। আমাদের অভিজ্ঞতা ও শক্তি অনুযায়ী আমরা ফলভোগ করি মাত্র। আমি

জানি কালই এ'জন্য আমার জেল হতে পারে। মহা-নগরীর ১৮,০০০ চোরের এক-দশম অংশকেও তোমরা জেলে পাঠাতে পারনি। আমরা দশ বছরের মধ্যে মাত্র এক বছর জেল খাটি এবং নয় বছর বাইরে থেকে জীবন উপভোগ করি। শ্রমিকদের মত আমরা বেকার জীবন অতিবাহিত করি না। কিংবা দ্রব্যাদি বন্ধক দিয়ে আহার সংগ্রহ করি না। আমরাই একমাত্র পৃথিবীত চিন্তাহীন মুক্ত এবং স্বাধীন মানুষ।

"আমরা গ্রেপ্তারের সময় ভীত বা দুঃখিত না হয়ে বরং নিশ্চিন্ত হই। বাইরে থাকাকালীন যাদের দ্রব্যাদি আমরা অপহরণ করতাম, তাদের উপার্জিত অর্থের দ্বারাই জেলে থাকা কালীন আমাদের ভরণপোষণ সাধিত হয়। যারা আমাদের অপকার্যের জন্য বারে বারে জেলে পাঠায়, বাহিরে বা ভিতরে তারাই আমাদের ভরণপোষণ করে। জেলে থাকাকালীন পরবর্তীকালের জন্য অপকর্মের নূতন নূতন পরিকল্পনা আমরা নিশ্চিন্ত মনে উদ্ভাবন করতে পারি। এ'ছাড়া পাকাপোক্ত অপরাধীদের সহিত মিশবার সুযোগও এইখানে আমরা পেয়ে থাকি। এদের কাছ থেকে আমরা এই সময়ে অপকর্মের নূতনকায়দা-কানুন শিখে নিই। এইজন্য মাঝে মাঝে আমরা ইচ্ছা করেও জেলে এসে থাকি। অপরাধীদের কাছে জেল একটি বিরাট বিদ্যা-পীঠ বা বিশ্ব-বিদ্যালয় ছাড়া আর কিছুই নয়।"

"নারীদের কেহ দেহ বিক্রয় করে অর্থ সংগ্রহ করলে তাদের আমরা বেশ্যা বলি। কিন্তু যারা অর্থের জন্য মস্তিষ্ক, বাহু ও সামর্থ্য বিক্রয় করে তাদের আমরা কি বলব? এক দিক দিয়ে শ্রমিক, চাকুরে প্রভৃতির সহিত এই বেশ্যা নারীদের কোনও প্রভেদ নেই। আমরা এই বেশ্যাবৃত্তি পছন্দ করি না, তাই আমরা চাকুরিকে ঘৃণা করি। আমাদের মতে চুরিই পৃথিবীতে একমাত্র সম্মানজনক পেশা। তাই এই ভাবে আমরা অর্থোপার্জন করি। আমরা সাধারণতঃ ধনীর অর্থ অপহরণ করে থাকি। দৈবাৎ কখনও দরিদ্রের অর্থ অপহরণ করলে তার জন্য আমরা গর্ব অনুভব করি না। কারণ আমরাও গরিব, গরিবের দুঃখ আমরা বুঝি। আমরা জেলের ভয় করি না। কিন্তু 'জীবন-কয়েদের তুলনায় আমরা প্রাণদণ্ডই কামনা করে থাকি।"

এইবার এদেশীয় অন্য অপরাধীদের কয়েকটি উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করা যাক। উক্তি কয়টি "পাগলা হত্যার মামলা" শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে। মৎপ্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত প্রথম কলিকাতা পুলিশ জার্নেল Vol I Part I. এই বিষয়ে দ্রষ্টব্য।

"ঈশ্বরের কৃপায় বিনা রক্তপাতে দেওঘরের রাস্তায় খাঁদাকে আমরা গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হই। হঠাৎ পুলিশের সঙ্গে তার রাস্তায় দেখা হয়ে যায়। আশ্চর্যের বিষয়, এই সময়, উভয় পক্ষের কাছেই আগ্নেয় অস্ত্র ছিল না। খুন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে সব-কিছুই প্রথমে অস্বীকার করে। কিন্তু পরে কথঞ্চিৎ শান্ত হয়ে সে উত্তর দেয়: আপনারা বুঝতেই ত পারছেন সব। তবে কি জানেন! আপনারা বাপের ব্যাটা কিংবা আমি বাপের ব্যাটা তা প্রমাণ হলো না। এই যা! যা হবার তা ত হয়ে গেছে। এখন একটা বিড়ি ত খাওয়ান।' আমরা খাঁদাকে তার অনুরোধ মত একটা সিগারেট দিই। এই সময় খাঁদাকে বেশ প্রফুল্লচিত্ত দেখা যায়। তার কাছ থেকে এই সুযোগে আমি কথা বার করবার চেষ্টা করি। আমি এইবার তাকে জিজ্ঞেস করি: 'হাঁরে! একটা লোককে যে জলজ্যান্ত তুই মেরে ফেললি, এতে তোর একটু ভয় বা মায়া হ'ল না? জানিস ওপরে একজন ঈশ্বর আছেন?' 'আজ্ঞে! ঈশ্বরের কথা বলছেন? জানি না তিনি আছেন কি না। যদি থাকেন তা'হলে আপনার ঈশ্বর আলাদা ব্যক্তি। ঈশ্বর মানুষেরই গড়া একটি বস্তু বা ব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। আপনি যখন একটা ইঁদুর মারেন তখন কি আপনি ঈশ্বরের কথা চিন্তা করেন? এই পাগলা আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। সে আমার মনের শান্তি ত অপহরণ করেই ছিল: তা ছাড়া সে আমার মলিনাকেও সরাতে চেয়েছিল। এক পৃথিবীতে আমাদের উভয়ের স্থান হওয়া অসম্ভব দেখা যায়। তাকে হত্যা করার জন্যে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নই। অন্যথায় সেও যদি আমাকে এ'জন্য হত্যা করত বা হত্যা করতে পারত তা'হলে এ'জন্যও আমি দুঃখিত হতাম না। কারণ বাঁচবার অধিকার কেবলমাত্র শক্তিমানদের আছে। তা ছাড়া জীবনটা একটা মটোরকার মাত্র। পেট্রোল ফুরিয়ে গেলেই জীবন অচল হয়। মৃত্যু বা মরণ মেকানিকেল স্টপেজ অব্ হার্ট মাত্র। এপারেও কিছু নেই, ওপারেও না। এর পর খাঁদা উচ্চহাস্য করে উঠে। অবাক হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করি,: 'এ্যাঁ, 'হাসছিস তুই? ভয় করছে না তোর! এতে যে তোর ফাঁসি হতে পারে!' উত্তরে খাঁদা আমাকে বলে, 'কি ভয়? মরতে? না না! ভয় করবে কেন? আমি মরব আর সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের সঙ্গে মিশিয়ে যাব। অবশ্য ভগবান ব'লে যদি কোনও বস্তু সত্যিই থাকে। এইজন্যে মরতে আমি কোনও দিনই ভয় পাই নি।' আমি পুনরায় তাকে প্রশ্ন করি, 'বলিস কিরে, এ্যাঁ? কি এমন পুণ্য করেছিস যে তুই মরার সঙ্গে সঙ্গেই ঈশ্বরের সঙ্গে

মিশিয়ে যাবি!' আমার প্রশ্নে খাঁদা বিচলিত হল না। বরং স্মিতহাস্যেই সে উত্তর দিল: দেখুন, আমি আত্মাকে কখনও কষ্ট দিই নি। লাইফের ইঞ্চি বাই ইঞ্চি আমি ভোগ করে নিয়েছি। মন যা চেয়েছে আমি তাই তাকে দিয়েছি। তাই মরতে আমার ভয় নেই। সেজন্য আমার কোনও দুঃখও নেই। কিন্তু আপনারা কষ্টের মধ্যেই মরবেন। আপনাদের মনে হবে যে, এটা হল না। আহা! আমি আয়ত্তের মধ্যে পেয়ে ওটা করলাম না। অনেক অতৃপ্ত বাসনা নিয়েই আপনারা মরবেন। হয়ত এ'জন্য আবার আপনাদের জন্মাতে হবে।' এরপর হঠাৎ খাঁদার চোখ সজল হয়ে উঠে। একটু চুপ করে থেকে সে উত্তর দেয়: 'দেখুন। একটা আমি অন্যায় কাজ করে ফেলেছি। তার জন্যে যদি আবার আবার জন্মাতে হয়। আমি চন্দননগরে একটা বিয়ে করে ফেলেছি। তবে শালীকে ৪০ হাজার টাকা দিয়ে এসেছি। আর আমি তাকে বলে এসেছি: 'দেখ শালী! আমি মরার পর ওই টাকা নিয়ে এন্তার ফুর্তি করবি।' সে যদি আমার কথা মত কাজ করে তাহ'লে আমার আত্মা স্বর্গে চলে যাবে। কিন্তু সে যদি হিঁদুর বিধবার মত তুলসী পাতার রস দিয়ে ভাত খায় এবং নিরামিষ খেতে থাকে কিংবা উপসী ছারপোকার মত একাদশী করে তা'হলে আমার আত্মা শান্তি পাবে না।' খাঁদার এই পত্নীপ্রীতি আমাকে মুগ্ধ করে দেয়। এই প্রীতির মধ্যে পত্নীপরায়ণতা বা একনিষ্ঠা নেই। কিন্তু তার মধ্যে পত্নী-প্রীতি আছে। এরপর আমি মলিনার কথা তুলি। উত্তরে খাঁদা আমাকে বলে: 'দেখুন! চোরেরা মরে মেয়েদের ভালবেসে, আর মেয়েরা মরে চোরদের বিশ্বাস করে। ওর আর দোষ কি! দোষ হ'চ্ছে শুধু আমার।' এরপর খাঁদার সহিত নানা বিষয়ে আমি আলোচনা করি। কথোপকথনের মধ্যে খাঁদা আমাকে এইরূপ উপদেশ দেয়: 'দেখুন! লোকে বেশি ছেলে-পুলে হলে ভয় পায়! কিন্তু কেন? আমি বুঝতে পারি না যে এতে ভয়ের কি আছে! আমার মতে মাত্র একটি ছেলেকে মানুষ করা উচিত। বাকিগুলোকে এক-একখানা ছুরি আর চার আনা পয়সা হাতে দিয়ে, 'যা লুটে খেগে যা,' বলে অভিভাবকদের তাড়িয়ে দেওয়া উচিত। কিংবা তাদের গাঁয়ে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত লাঙ্গল চষবার জন্যে। বাঙলাদেশে বামুন কায়েতদের মধ্যে লাঙল-ধরা চাষী নেই। তারা পরগাছার [প্যারাসাইটের] মত জীবন যাপন করে। কিন্তু এ আমাদের বড় লজ্জার কথা। হোক না কেন দশটা বা বারোটা ছেলে-পুলে। তাদের মধ্যে মাত্র দুটা লেখাপড়া করুক। বাকিগুলো ছেলেবেলা থেকে

চাষীদের সঙ্গে বাস করে সৃষ্টি করুক বামুন, বৈদ্য ও কায়েত চাষী। কিংবা তারা বিলাতি টমিদের অনুকরণে দেশের জন্য নিরেট দুর্ধর্ষ সৈন্যদল তৈরী করুক। একটার বেশি ছেলে যারা মানুষ করতে চায় তারা কোনটাকেই মানুষ করতে পারে না।" [এই ধরনের অপরাধ-দর্শন অপরাধীদের অব্যবস্থিত চিত্ততার পরিচয় দেয়।]

কোনও এক দুর্দান্ত ভারতীয় শোণিতাত্মক অপরাধীকে আমি নানারূপ জিজ্ঞাসাবাদ করি। অপরাধীটি শিক্ষিত থাকায় তার মধ্যে আদর্শমিশ্রিত নৈতিক অসাড়তা ছিল। নিম্নের উক্তিটি এ বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য। অপরাধীটিকে তার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করায় সে অবিচলিতভাবে উত্তর দেয়ঃ "আমার মা যাঁর নামও জানেন না, তাঁকে আমি কোথায় পাব? কিন্তু এজন্য আমি একটুও দুঃখিত নই। বরং এজন্য আমি গর্ব অনুভব করি। আমি একজন ভারতীয় টমিই। দেশের টমিরাই দেশকে বড় করে সাম্রাজ্য গড়ে দেয়। আমাদের মত টমিরাই রাষ্ট্রের জন্য বেপরোয়া ভাবে জীবন দিতে পারে। আপনাদের মত ভদ্র সন্তান ভাল অফিসার হ'তে পারেন, কিন্তু আমাদের মত লড়াকু হতে পারেন না। আমাদের মধ্যে যাঁরা অ্যাফোর্ড করতে পারেন, তাঁদের উচিত একজন করে ডুপ্লিকেট রাখা। অরিজিন্যাল সাইডের ছেলেরা হবে অফিসার এবং ডুপ্লিকেট সাইডের ছেলেরা হবে প্রাইভেটঃ বিশেষতঃ বাঙলাদেশে যেখানে জলবায়ু সবল দেহ সৃষ্টির অনুকূল নয়। এদেশে আর্টিফিসিয়ালি সৈন্য তৈরি করা ভিন্ন গত্যন্তর নেই। আমার মত ঘর-ছাড়া টমিদের স্টেটের মানুষ করা উচিত সেনা বাহিনীর জন্যে। এতদ্বারা দেশের প্রভূত উপকার হবে এবং চুরি-ডাকাতিও বন্ধ হবে।" এই সম্পর্কে দৃষ্টান্তস্বরূপ অপর আর এক আদর্শ-মিশ্রিত নৈতিক অসাড়তার কথা বলা যাক। কোনও এক মোসলেম অপরাধী হিন্দুর নাম নিয়ে অপরাধ করে। ধরা পড়ার পর এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হলে সে এরূপ উত্তর দেয়, "আপনারা শিক্ষিত হয়ে এই সব প্রশ্ন তুলেন কেন? সাতশ বছর পূর্বে পাঠানরা যখন ভারত আক্রমণ করে তখন আমাদের উভয়েরই হিন্দু পূর্বপুরুষ কি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দেশ রক্ষা করে নি? আমরা ধর্মে মুসলমান হ'লেও জাতিতে আমরা সকলেই হিন্দু। আমি মোসলেম হওয়ার জন্যে গর্ব অনুভব করি। কারণ মোসলেম ধর্ম সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমাদেয় দেশকে সমৃদ্ধ করেছে। ঠিক যেমন করে বৌদ্ধধর্ম সমৃদ্ধ করেছে চীন দেশকে। এই ধর্ম দ্বারা হিন্দু-মোসলেম সমভাবে লাভবান হয়েছে।"

উপরের এই উক্তিটির মধ্যে আমরা লেশমাত্রও নৈতিক অসাড়তা পাই না। বরং উহার মধ্যে পুরাপুরি আদর্শের সন্ধান পাই। অপরাধ-বিরামের সময় অপরাধীরা উচ্চ ধরনের সাহিত্যের ন্যায় উচ্চাঙ্গের দর্শনও সৃষ্টি করে থাকে।

অযৌনজ অপরাধীদের ন্যায় যৌনজ অপরাধীদের উক্তির মধ্যেও নানারূপ অপরাধ-দর্শনের সন্ধান পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ জনৈক ভারতীয় নিষ্ক্রিয় যৌনজ-অপরাধীর কয়েকটি উক্তি উধৃত হলো। উক্তিগুলির মধ্যে আমরা নৈতিক অসাড়তার সন্ধান পাই।

"সমাজে কতকগুলি বখা মেয়ে থাকলে, তাদের ধরে রাখবার জন্যে কতকগুলি বখা ছেলেরও প্রয়োজন আছে। আমি যদি মেয়েটির সহিত ভাব না করি তা হলেও কি সে সতী-সাধ্বী থাকবে? না। কখ্‌খনও তা সে থাকবে না। তখন অপর আর একটি ছেলের সহিত সে ভাব করবে। নিজেকে বঞ্চিত করে অপর আর একটি ছেলের সুযোগ আমি করে দিই নি। এইজন্যেই কি আমি অপরাধী?' "আমার অন্তরাত্মা আমাকে বার বার এই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আমরা জীবন-ধর্মী। জীবনকে পরিপূর্ণরূপে উপভোগ না করে আমরা মরতে চাই নি। এইজন্যেই কি আমরা ঘৃণ্য?" "কি করব বলুন! আমি ত আমার মনটাকে গলা টিপে মেরে তথাকথিত ভাবে সৎ বা সাধু থাকতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তখন আমি জানতাম না যে মনের তলায় অপর আর একটা মন আছে। সেই মনকে বলা হয় অবচেতন মন এবং এই উপরের মনকে দাবাতে পারলেও অবচেতন মনকে দাবান অসম্ভব। শেষে নাচার হয়ে মন যা চায় আমি তাই তাকে দিতে থাকি।" "আজ আমার জীবন-যৌবন চলে গেলে আপনি কি তা আমাকে ফিরিয়ে দিতে পারবেন? সে ক্ষমতা কি আপনার আছে? আপনার আজ যা গেছে তা কি আর কোনও দিন ফিরবে'।

কোনও এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হয়, "তুমি যে তাকে এমনি করে ফাঁকি দিলে, এতে কি তোমার ভাল হবে? উত্তরে ভদ্রলোক বলেছিলেন, "কেন? উভয়েই ত আমরা ঈশ্বরের জীব। সে না ভোগ করে, না হয় আমিই ভোগ করলাম: কোনও এক ক্রুদ্ধ অপরাধীকে আমি শোনা কথায় আস্থা স্থাপন না করতে উপদেশ দেওয়াতে সে এইরূপ এক অদ্ভুত উক্তি করেছিল: 'মশাই! কেন শোনা কথায় বিশ্বাস করা যাবে না? মা বলেছেন যে উনি তোমার বাবা। এই [শোনা] কথা আমরা সকলে কি বিশ্বাস করে থাকি না?

কোনও এক বিবাহিত কন্যা দুই বৎসর বিবাহিত জীবন অতিবাহিত করে অবশেষে তার পূর্ব প্রেমাস্পদের কাছে ফিরে আসে। এই অপকার্যের জন্য তাকে পাপীয়সী বলে সম্বোধন করায় সে এইরূপ উক্তি করে। আমার মতে ইহা অপরাধ-দর্শনের একটি চূড়ান্ত নিদর্শন।

"এত দিন আমি পাপ করে এসেছি। কারণ আমি দেহটা দিয়েছি একজনকে, কিন্তু মন দিয়েছি অপর জনকে। আজ আমি দেহ ও মন উভয়ই মাত্র একজনকে দিচ্ছি। তাই আমি আর পাপ করছি না। ভালবাসায় পাপ নেই। উহাতে পুণ্য আছে। উহা জীবমাত্রেরই জন্মগত অধিকার।

"প্রত্যেক কর্মক্ষম পুরুষ মাত্রেরই প্রতি দশ বৎসর অন্তর একটি করে পত্নী সংগ্রহ করা উচিত। তা না হলে তার দেহ ও মন সুস্থ থাকতে পারে না। আধুনিক সভ্যতা ও সমাজ-ব্যবস্থা একাধিক বিবাহের পক্ষপাতী নয়। এই কারণে অধুনাকালে অন্য উপায়ে আমরা আত্মাকে পরিতৃপ্ত করি। এর দ্বারা আমরা দেহ ও মনকে সুস্থ রাখি এবং মেধাশক্তিও আমাদের এর দ্বারা অক্ষুণ্ণ থাকে। এই কারণে অপর দিক দিয়ে আমরা সমাজের ও দেশের বহুবিধ উপকার করতে সক্ষম হয়ে থাকি, যা কিন্তু মনের দিক থেকে উপবাসী ব্যক্তিরা কদাচ পারে না।"

বলা বাহুল্য, এই ধরনের উক্তিসকল মানুষের বিকৃত মনোবৃত্তির পরিচয় দেয়। ভুল পথে চিন্তাধারা প্রবাহিত হওয়ার জন্যেই এরূপ হয়ে থাকে। এই সকল উক্তির মধ্যে সম্ভবতঃ কোনরূপ বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত নেই। কিন্তু কোনও কোনও অপরাধ-সাহিত্যে কিছু কিছু নীতিজ্ঞানও পরিস্ফুট হতে দেখা যায়। কোনও এক অ্যাঙলো প্রাথমিক অপরাধী আমাকে এইরূপ একটি বাণী দিয়েছিল—হি লাফস্ [laughs] বেস্ট্, হু লাফল্ লাস্ট্।

কোনও এক নীতিভ্রষ্ট শিক্ষিত প্রাথমিক অপরাধী আমার নিকট এইরূপ এক উদ্ভট অর্থনীতি শুনিয়েছিল : চুরি হচ্ছে একনমিক্ ব্যালেন্স। অর্থাৎ ডিষ্ট্রিবিউশন্ অফ মনি। দশ ব্যক্তি একটি বাটী লুঠ করলে তোমরা বলো উহা ডাকাতি। কিন্তু ঐরূপ এক হাজার লোকে একশত বাটী লুঠ করলে তোমরা তাকে বলে থাক : জন-বিক্ষোভ। ছিঃ। তোমাদের নীতিজ্ঞানে ধিক!

অপস্পৃহা পৃথিবীতে মানুষ মাত্রেরইমধ্যে বিদ্যমান। পুস্তকের প্রতিটি পরিচ্ছেদে ইহা বিশেষরূপে বুঝান হয়েছে। কিন্তু এই অপস্পৃহা থেকে মানুষ কি কোনদিনই মুক্ত হতে পারবে না? প্রশ্নটি আমি এক সাধক বন্ধুর নিকট উত্থাপন করি।

উত্তরে সাধক বন্ধুটি আমাকে এইরূপ বলেন : "একমাত্র প্রেম দ্বারাই এ সম্ভব।" তিনি বলেন, যে "বিজ্ঞান যেখানে নিরুত্তর, সেইখানে আরম্ভ হয় দর্শন। দর্শন মানুষের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম হলে মানুষের মন ছুটে চলে অনাদৃত ধর্মের দিকে। ধর্ম যেখানে নিরুত্তর হয়, সেইখানে আরম্ভ হয় প্রেম। কিন্তু এও অভ্যাসসাপেক্ষ। এজন্য বহু পুরুষের সাধনার প্রয়োজন। প্রথমে ভালবাসতে হবে নিজেকে, তারপর ভালবাসতে হবে পরিজনবর্গকে, দেশবাসীকে তথা বিশ্ববাসীকে। এরপর ভালবাসতে হবে জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ ও বৃক্ষাদিকে। এমন কি পাহাড়-পর্বত, চেয়ার-টেবিলকেও ভালবাসতে হবে। কিন্তু এ'ও কি সম্ভব? পৃথিবীতে আমি দেখেছি অনাচার ও অবিচার। আমি দেখেছি উপকারী বন্ধুর লালসাদৃষ্টি। আমি দেখেছি পদস্থ ব্যক্তির যৌনজ ও অযৌনজ ব্যাভিচার। আমি দেখেছি নৈতিক অসাড়তার নির্লজ্জ অভিব্যক্তি। কিন্তু আমি দেখিনি স্বার্থহীন কামনাহীন প্রেম। স্বার্থহীন কামনাহীন প্রেম? এ পৃথিবীতে কি তা আছে?"

কিন্তু একটি বিষয় মনে রাখা উচিত যে আমাদের এই পৃথিবীতে হারায় নাক কিছু। এইজন্য পৃথিবীতে অপরাধীদেরও প্রয়োজন আছে। তথাকথিত মহামানবেরা সমাজের কোনও ক্ষতি না করলেও উপকারও করে না : বরং তারা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে পরগাছা বা নিউরেটিক জীবন যাপন করে থাকে। কিন্তু অপরাধীরা সভ্যমানুষের সৃষ্ট সমাজের অপকার করে। এই কারণে অপরাধীদের সম্বন্ধে আমরা সর্বদাই সচেতন থাকি। ত'বলে অনাবিল শান্তি কখনও কাম্য হতে পারে না। কিছুটা বিঘ্ন বাধা না থাকলে মানুষ অলস প্রকৃতির হয়। এইদিক থেকে এরা শান্তিপ্রিয় পৃথিবীর উপকারই করে। মনস্তত্ত্বের ছাত্র মাত্রেরই জানা আছে যে সামান্যরূপ বিঘ্ন না থাকলে মানুষ একাগ্রচিত্ত হতে পারে না। নিঃসাড় নিস্তব্ধতার [পিনড্রপ সাইলেন্স] মধ্যে একাগ্রচিত্ত হওয়া যায় না। এই দিক দিয়ে অপরাধীরা মানুষের উপকারই করে থাকে : বিশেষ করে তা তারা করে শান্তির সময়ে। অন্তঃশত্রুরূপে এরা মানুষকে কর্মঠ রেখে তাকে সভ্যতার পথে এগিয়ে দেয়। ঈশ্বর কাউকে অনাবিল অপকারের জন্য সৃষ্টি করেন নি। এ'কথা সত্য যে বিষ থেকেই অমৃত তৈরি হয়। এইজন্য স্বল্প মাত্রায় ব্যবহার করলে বিষও হয়ে উঠে উপকারী ঔষধ। তবে সমাজ তথা পৃথিবীর উপকারের জন্য এদের সংখ্যা আরও কমান দরকার। তবে চিরকাল কেউ অপরাধী থাকে না। সৎপ্রেরণার ক্রমাবির্ভাবে সে পুনরায় নিরপরাধ হয় বা হতে পারে।

অত্যাচারী দস্যুসর্দার বাহুবলে যদি স্থান বিশেষে পূর্ণ অধিকার বিস্তার ক'রতে পারে তা'হলে প্রায়ই দেখা যায় যে, সে সময় সময় তাঁবেদার ব্যক্তিদের উপর নিজে অত্যাচার করলেও অপর কোনও ব্যক্তিকে তাদের উপর অত্যাচার করতে দিতে নারাজ থাকে। কিন্তু পরে এইরূপ কাজের দ্বারা ধীরে ধীরে সে সৎপ্রেরণা লাভ করে এবং পরিশেষে সে নিজেও তাদের উপর আর অত্যাচার করে না। সে তখন হয়ে উঠে প্রজাপালক রাজা বা সৎ জমিদার। সৎপ্রেরণার ক্রমাবির্ভাবের এ একটি বড় প্রমাণ। পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

নিরপরাধ সৎ ব্যক্তিদের অপরাধ-তত্ত্ব একটি জীবন-বেদ। জীবন জিজ্ঞাসার প্রতিটি প্রশ্নের সদুত্তর এতে আছে। ভবিষ্যৎ বংশীয়দের সুনাগরিক করতে ও নিজেদের সুখী ও নিরাপদ করতে এই গ্রন্থ সহায়ক হলে পরিশ্রম সার্থক হবে।

তবে অপরাধ-তত্ত্ব পড়ে কেউ অপরাধী হবে না। বরং অপরাধ হতে তারা আত্মরক্ষা করবে। এর সাহায্যে আত্ম-বিশ্লেষণ দ্বারা তারা নিরপরাধী থাকবে। কোনও অপরাধীর দ্বারা অপরাধীর ভূমিকা যেমন অভিনয় করানো সম্ভব নয়ঃ [তারা ষ্টেজ ফ্রি নয়] যেমন বই পড়ে ছেলে মানুষ করা যায় না। [ওতে দরদ চাই] তেমনি অপরাধ-তত্ত্ব পাঠে কেউ নিরপরাধী থেকে অপরাধী হতে পারে না।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

॥ অপরাধ গবেষণা ॥

সমাজনীতি রাজনীতি অর্থনীতি ও আইনী গঠনের [সোসিও-পলিটিকো-ইকোনোমিক্যাল ষ্ট্রাকচার] সহিত অপরাধী সৃষ্টির সম্পর্ক সম্বন্ধেও গবেষণা করা প্রয়োজন। নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয় ওই সম্বন্ধে অনুধাবন করতে হবে।

"কোনও স্থানীয় লোক দেখলো যে বহিরাগতদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে তারা প্রায় নিজভূমিতে পরবাসী। তাদের চাষের জমি নষ্ট করে কারখানা উঠলো। ফলে—ইণ্ডাসট্রিয়াল ক্রাইম ও চরিত্রহীনতা বাড়লো। স্থানীয় বায়ু ও জল

দূষিত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু যে চাকুরীর জন্য এই বিড়ম্বনা সেই চাকুরী থেকে স্থানীয়রা বঞ্চিত। এতে সেইস্থানে খাদ্যের উপর চাপ বাড়ছে। বহিরাগতরা নিজেদের প্রদেশেও চাকুরী পাচ্ছে এবং এই প্রদেশেও তারা চাকুরি পাচ্ছে। সীমিত ব্যবসায় ও চাকুরিতে একস্থানে অতো লোকের স্থান পাওয়া সম্ভব নয়।"

এইরূপ অবস্থায় বহিরাগতদের নিয়ন্ত্রণ না করলে উভয় দলেই পারস্পরিক ঈর্ষাজনিত অপরাধী তৈরী হবে। ত্বরিতে এই সকল স্থান প্রবলেম প্রভিন্স তথা সমস্যা প্রদেশ হয়ে উঠে। সেখানে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয় অপরাধের প্রাদুর্ভাব ঘটে। এই লোকেরা ফিজিওলজিক্যালি ও সাইকোলজিক্যালি অশান্ত থেকেছে। সাম্রাজ্যবাদীদের কালে ওদের নিজের দেশে ক্রাইম কমতো ঃ কিন্তু তাদের কলোণীগুলিতে ক্রাইম বাড়তো। বহিরাগতদের স্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে স্বল্প সংখ্যায় ছড়িয়ে দিলে তাদের মধ্যে একীভূত বন্ধন গড়ে উঠবে। দলবদ্ধভাবে এক স্থানে তাদের রাখা উভয় পক্ষেরই ক্ষতিকর। [অবশ্য পপুলেশন হোমজেনাস হলে উহা স্বতন্ত্র বিষয়।]

এসব ক্ষেত্রে স্থানীয় তরুণ'রা তাদের দেশের নেতৃত্বের উপর প্রথম বিক্ষুব্ধ হয়। স্বাভাবিক কারণেই সেখান থেকে বাধা আসে। তারা তখন ভ্রান্ত নেতৃত্বের স্বীকার হয়। তারা তখন আত্মহত্যার বিকল্প রূপে খুনের রাজনীতিতে মত্ত হয়। তাদের বিশ্বাস হয় ধ্বংশ স্তূপের উপর নূতন জগৎ সৃষ্ট হবে। কিন্তু তাদের কতটুকু ক্ষমতা তা তারা তারুণ্যের জন্য বুঝে না। কেউ ভাবে যে তারা যা ভোগ করতে পারেনি, তা তারা অন্যদেরও ভোগ করতে দেবে না। পরিশেষে তারা পশুর মত বধযোগ্য হয়ে উঠে। [এদেরকে সেনা ও নৌবাহিনীতে এনে নিয়মতান্ত্রিক করা উচিৎ।]

শিল্পসমৃদ্ধ সমাজে বালকরা তাদের ঈপ্সিত ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে একটি ধারণা তৈরী করে। সেই ধারণা মত পূর্ব হতেই তাদের ব্যবহার প্রকট হয়। ওই ঈপ্সিত ভবিষ্যত জীবনের স্বরূপ ও তাদের ব্যবহারের সম্পর্ক সম্বন্ধে গবেষণা করলে কিছু নূতন তথ্য উদ্ঘাটিত হবে।

[অপরাধীদের একটি জীবন-রেখা তথা ক্রিমিন্যাল কার্ভ গবেষণার্থে তৈরী করতে হবে। কতো বৎসর বয়সে সে প্রথম অপরাধ করলো। তাদের প্রত্যেক অপরাধের সময়ের ব্যবধান সাবধানে লিপিবদ্ধ করে জগতে হবে যে, কতো বছর অন্তর তাদের ব্যক্তিত্বের কিরূপ পরিমাণ পরিবর্তন হয়েছে।]

বিঃ দ্রঃ—কিছুকাল পূর্বেও কোনও হাকিম কোনও গৃহস্থ বধু বা কন্যার

বিরুদ্ধে শমন পাঠাতেন না। [মামুলি অপরাধে] তা আইনে যাই থাকুক। ভারতীয় সংস্কৃতির বিরোধী কোনও কার্যে তাঁরা অনিচ্ছুক হতেন। এমন কি ভদ্রপুরুষদের বিরুদ্ধেও মামুলি অপরাধে পল্লীর কোনও বিশ্বস্ত ব্যক্তির দ্বারা সত্য মিথ্যা যাচাই করার রীতি ছিল। এখন নির্বিচারে গৃহস্থ নারীদের বিরুদ্ধেও শমন পাঠানো হয়। [কোর্টে মামলা প্রায় পাঁচ বৎসর চলে] এটা ভদ্রকন্যাদের পর্যন্ত নির্লজ্জ ও বেপরোয়া করার পক্ষে যথেষ্ট। ব্রিটিশদের ভালো ব্যবস্থাগুলি অন্তর্হিত। কিন্তু ওদের মন্দ ব্যবস্থাগুলি বাতিল হয়নি। এ গুলির ফলাফলও গবেষকদের বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিৎ।

কয়েকটি পূর্বতন ব্যবস্থার পুন প্রবর্তনের প্রয়োজন হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কলিকাতা পুলিশের রিপোর্ট সিস্টেম বিষয়ে বলা যায়। পূর্বে পুলিশের ডিপুটি কমিশনর'রা পদাধিকার বলে জাষ্টিস অফ পিস্ হতেন। তাঁরা জামীনদানে ও মুক্তিদানের অধিকারী ছিলেন। কোনও থানাদার ওইকালে ওদের হুকুম ব্যতিরেকে আসামীকে কোর্টে পাঠাতে অক্ষম ছিলেন। সন্দেহ হলে ওই ডিপুটি কমিশনরগণ ঘটনা যাচাই করে পুর্নতদন্ত করতেন। ব্যয়বহুল আদালতে তাদের একটুকুও হয়রান হতে হয়নি।

পুস্তকটির বৈজ্ঞানিক ভাষা আমাকে সৃষ্টি করতে হয়েছে। বলাবাহুল্য বৈজ্ঞানিক ভাষা সংক্ষিপ্ত গুরুগম্ভীর ও অর্থবোধক হতে হবে। এজন্য সংস্কৃত বহুল ভাষা ব্যবহার অপরিহার্য। সংস্কৃত বহুল বাক্য ব্যবহারে প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে পরস্পরের বোধগম্য করবে। বৈজ্ঞানিক ভাষা ও রম্য রচনার ভাষা এক হতে পারে না। তবে উল্লেখিত বিবৃতিগুলির ভাষাগুলি শুদ্ধ করে নিতে হয়েছে। বাঙলাতে এই বিজ্ঞানের উপযুক্ত ভাষা সৃষ্টিও একটি গবেষণা-সাপেক্ষ বিষয়।

সংবাদপত্রও কিছু ক্ষেত্রে অপরাধ সৃষ্টির জন্য দায়ী। অপরাধ সম্পর্কিত ঘটনাসমূহ 'ফলাও' করে তারা মুদ্রিত করেন। এতে মনে হয় যেন দেশশুদ্ধ লোক অপরাধী হয়েছে। এতে অপরাধমুখী ব্যক্তিকে অপরাধী এবং সৎ নাগরিকদের ভীত করে। ইংরাজী ক্রাইম পিকচারগুলির শেষে পর্দাতে ফুটে উঠে: ক্রাইম ডাজ নট পে। কিন্তু ওটুকু দেখার পূর্বেই কিশোররা প্রেক্ষাগৃহ ত্যাগ করে।

[কিছু রিপোর্টা'র কিছুটা ধর্মের ষাঁড়ের মত। এরা সকলকেই গুঁতোয়। কিন্তু ওঁদের কেউ গুঁতোতে পারবে না। লোকের চরিত্র হননও অপরাধের পর্যায়ভুক্ত। সংবাদপত্র জনমত গঠন করে তাদের সুপথে বা বিপথে নিতে সক্ষম। অন্যদিকে এটিও স্বীকার্য যে জনগণের স্বার্থরক্ষার্থে এঁরা অতন্দ্র প্রহরী।

বিঃ দ্রঃ—আদিযুগে মানুষ একাচারী ছিল। পরে মানুষ দলবদ্ধ হয়। এই একচারী মানুষ বেশী হিংস্র ও অপরাধপ্রবণ ছিল। এজন্য অপরাধের সূত্র খুঁজতে দলবদ্ধ মানুষ অপেক্ষা প্রাচীন একাচারী মানুষই উপযুক্ত।

বিঃ দ্রঃ—অর্থনৈতিক ভেদাভেদের সহিত সম্পর্কশূন্য কৃষ্টিগত শ্রেণী বিভাগ আছে। এদেশে গ্রাম ও পল্লীভেদে সমকৃষ্টির লোক বাস করে। উপযুক্ত পরিবেশ না পেলে ভদ্র পরিবার কোথাও বাসের জমি কেনে না বা বসবাসের বাড়ী ভাড়া করে না। কৃষ্টিগত সমস্যা মেটাতে ও শান্তিতে থাকতে লোকে এক পল্লী থেকে অন্য পল্লীতে উঠে যায়। এদেশের গ্রাম ও শহরের বিভিন্ন অঞ্চল এই ভাবে গঠিত। সমকৃষ্টির লোকেদের মধ্যে কৃষ্টিগত সজ্যাত [কালচারাল কণ্ট্রাষ্ট] থাকে না। কালচারাল কণ্ট্রাষ্টে স্বামী স্ত্রীর মধ্যেও বিভেদ আনে। ধর্মের অপেক্ষা সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা বেশী কাম্য [এতে গড়া জিনিস ভাঙে না] ইহার অভাবে পরিবেশগত অপরাধীদের সৃষ্টি হয়।

[এদেশের গ্রামগুলিতে ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি ও মধ্যবিত্ত অন্যান্য শিক্ষিত পরিবারের সহিত কুম্ভকার রজক সূত্রধর পরামাণিক, কর্মকার দুলিয়া আদি বিভিন্ন শ্রেণীর লোক বিভিন্ন অংশে বাস করে। এদের সংস্কৃতি কিন্তু কম বেশী প্রায় একই রূপ থাকে। কলোনীগুলি স্থাপনে গর্ভমেণ্ট এই জাতীয় মানসিক সেট আপ্ অগ্রাহ্য করাতে বহু স্থানীয় উপনিবেশ সফল হয় নি।

আন্দামানে জনৈক নমো চাষী আমাকে বলেছিল : বাবু। আপনারা কেউ আমাগো সঙ্গে রণ না কেন ? কে আমাদের হয়ে দরখাস্ত লিখে দেবে। পরামর্শ করবো কাদের সঙ্গে। ভদ্রলোক ভিন্ন আমরা কি কোথাও থেকেছি। বুঝলাম যে এই একটি কারণে দলে দলে লোক উপনিবেশ ত্যাগ করে। সৌভাগ্য যে সেখানে কয়জন শিক্ষিত স্কুল মাষ্টারও ছিল।]

মুহুর্মুহু উত্তেজনা ভেজাল খাদ্য, অপুষ্টি ও নৈরাশ্য ও মাইকের কর্কশ শব্দ মস্তিষ্ককে ক্ষতিগ্রস্থ করে মানুষকে অপরাধস্পৃহী করে। এতে আদর্শবান তরুণদের দ্রব্যস্পৃহার বদলে শোনিত স্পৃহা বহির্গত হয়। আদর্শবান হওয়াতে এরা খুন করলেও লুঠ করে নি। ব্যক্তিগত ও জাতিগত ব্যর্থতা মেধাবী ছাত্ররা আগে বুঝে। [এই বিষয়ে নকল বিপ্লবপন্থীদের বাদ দিতে হবে।]

[শোণিতস্পৃহা একবার বার হলে উহা অন্তর্মুখী করা কঠিন। এজন্য হত্যাকারী বারে বারে অবচেতন মনে শোণিত দর্শনার্থে হত্যাস্থলে ফিরেছে। হত্যা করেও তৃপ্ত না হয়ে এরা মৃতের গোড়ালী ও যৌনাঙ্গও কেটেছে।

শোণিত স্পৃহাকে উদ্বেলিত করার কুফল আমরা খুনের রাজনীতিতে দেখেছি।]

বিঃ দ্রঃ—গবেষণার্থে অপরাধের কিছু 'ছাড় দিতেও হবে। যথা: মিথ্যা-চারণ একটি অপরাধ। কিন্তু নিজের ও পরের জীবন রক্ষার্থে ও স্ত্রীর মনো-রঞ্জনার্থে মিথ্যাতে দোষ নেই। দাঁতের ডাক্তার বললো দাঁত তুলতে কষ্ট হবে না। দোকানী বললো যে সে কেনা দরে দ্রব্য বিক্রয় করে। সুন্দরী মেয়েটি বললো যে কেউ প্যাট প্যাট করে তার দিকে চায় তা তার পছন্দ নয়। [যে বলে জীবনে মিথ্যা বলেনি : সে সব চাইতে বড় মিথ্যাবাদী]

কিছু শ্রেণীর লোকদের তাদের স্ব শ্রেণীর লোকরাও বাটী ভাড়া দেয় না। কারণ তাদের জাতীয় চরিত্রের অবনতি ও অধোগতি। একদল অলস লোকের ইচ্ছা শুধু মেরে ও লুঠে নেওয়া। এদের নিকট নারীর বা দেবতার কোন মর্যাদা নেই। সৎলোকেদের সৎভাবে জীবিকা অর্জনে এরা প্রতিবন্ধক হয়। এদের উৎপাতে ক্ষেত্রে শস্য ও বৃক্ষে ফল থাকে না। অথচ এদের বাসভূমি থেকে দূর গ্রামে বৃক্ষে বৃক্ষে ফল দেখা যায়। এদের বেঁচে থাকার অধিকার আছে কিনা বিবেচ্য। মনে হবে এই শ্বাপদকুলকে গুলি করে মারা হোক।

কিন্তু ব্যাঘ্রদের রক্ষার জন্য ব্যাঘ্র প্রকল্প আছে। এই অলস ব্যক্তিদেরও নির্মম কঠোরতার সহিত সুপথে আনতে হবে। আদিবাসীদের মত এই অলস ও মনো দুর্বল শ্রেণীকেও রক্ষা করতে হবে। কিশোর বয়সের কালে ওদের এরূপ অবস্থা ঘটে। কিন্তু যাঁদের দ্বারা ওদের নিরোধ করা হবে তাঁদের প্রথমে বিশুদ্ধ করা চাই।

উপরোক্ত বিশ্লেষণসাপেক্ষ বিষয়গুলি সম্বন্ধে গবেষণার ক্ষেত্র আছে। কোন শ্রেণীর ব্যক্তিদের মনে উহার ঠিক কিরূপ প্রতিক্রিয়া তা বুঝা প্রয়োজন।

ব্রেন ওয়াস তথা মগজ ধোলাই এবং ব্রেন রি-ওয়াস তথা উহার পূর্ন-ধোলাই সম্পর্কিত বিষয়ে অপরাধ সম্পর্কিত গবেষণার একটি ক্ষেত্র রয়েছে। রাজনৈতিক অপরাধীদের চিকিৎসার্থে ইহার প্রয়োজন সর্বাধিক। ভুল পথের পথিক কিছু তরুণদেরও এই ভাবে চিকিৎসা করা সম্ভব।

এইখানে কোনও বিষয় না জানার ভান করে উহা জানাবার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রশ্ন করে উত্তর দিতে বলা হয়। এইভাবে ব্যাখ্যার জন্য পুনঃ পুনঃ প্রশ্নোত্তরে তাকে কোণঠাসা করতে হবে। একস্থানে এসে সে সেই প্রশ্নের কোনও সদুত্তর দিতে না পেরে নীরব হবে। এই ভাবে তাকে কোণঠেসা

করলে সে নিজের জালেই জড়িয়ে পড়বে ও বুঝবে যে এতাবৎ কালের বিশ্বাস তার একান্তরূপেই ভুল। এখন হতে তাকে পূর্ব মত বদলে নূতন পথে চিন্তা করতে হবে। আমি মাত্র পরীক্ষার্থে বিভিন্ন মতবাদে বিশ্বাসী কিছু তরুণের মগজ ধোলাই নিম্নোক্তরূপে করেছিলাম।

বিবিধ রাজনৈতিক অপরাধ সম্বন্ধে পুস্তকের অন্য একটি খণ্ডে বিশদ আলোচনা করবো। এই পুস্তকে অযৌনজ এবং যৌনজ অপরাধী ও তৎসহ কিশোর অপরাধীদের পৃথক পৃথক চিকিৎসা পদ্ধতি বিবৃত হয়েছে। ওই একই কারণে রাজনৈতিক অপরাধীদের চিকিৎসা পদ্ধতিও বিভিন্ন হয়ে থাকে। এই পুস্তকের বর্তমান খণ্ডে সকল প্রকার অপরাধীদের পৃথক পৃথক চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধে গবেষক ছাত্রদের সুবিধার্থে কিছুটা ধারণা দেওয়া হলো]

প্রথমে বাকজাল দ্বারা মগজ ধোলাই করে অ্যাঙ্গলো আমেরিকার পক্ষে ও পরে ওইরূপ ভাবে মানুষকে রুশীয় ও চীনের পক্ষে আনার রীতি নীতি বলা হবে। এই বিতাগুগুলিতে মতবাদ প্রচারের কোনও উদ্দেশ্য নেই। এগুলি ন্যায্য বা অন্যায্য ভাবে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য মাত্র সৃষ্ট।

(১) "ব্রিটিশরা সমুদ্রপথে এবং রুশীয়রা স্থল পথে সাম্রাজ্য বিস্তার করে ছিল। এজন্য পূর্বতন ব্রিটিশ বা রুশীদের বংশধরদের কি দায়ী করা উচিত হবে। অষ্ট্রেলিয়া, মার্কিন ও রুশ দেশের প্রত্যেক'টিতে ২৩০ কোটি লোকের স্থান হতে পারে। কিন্তু ঐ দেশগুলির কোনটিতেই ২০ কোটির বেশী লোক নেই। [অষ্ট্রেলিয়াতে উহা নগণ্য] ঐ সকল দেশে দুই লক্ষ মাত্র লোক ট্রাকটার দ্বারা ভূমি চষে ও এ্যারোপ্লেন থেকে বীজ ছড়িয়ে ২০ কোটি লোককে খাওয়াতে সক্ষম। কারণ ওখানে ভূমি বেশী ও লোক সংখ্যা কম। প্রবাদ এই যে, পেটে খেলে পিঠে সয়। ওখানে কমুনিজিম বা ক্যাপিট্যালিজম সম ভাবে ভালো চলবে। কিন্তু জনবহুল চীন ও ভারত থেকে বাড়তি জন সংখ্যাকে আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়া বা রুশ দেশে বসতি করতে পাঠালে ওরা তাতে রাজী হবে? তা তারা না হলে আন্তর্জাতিক কমুনিজিম বাক্যটি কি নিরর্থক নয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হলেও রুশী ও চীন সাম্রাজ্য কি অন্য নামে আছে। ওই দেশে বিভিন্ন ভাষা ভাষী জাতিগুলি কি সম্পূর্ণ স্বাধীন?

(২) জমির পরিমাপ বৃহৎ না হলে চাষবাসে লাভ কি সম্ভব? দুই চার কাটা করে জমি চাষীদের মধ্যে ভাগ করলে ওইটুকু জমির জন্য কি তাদের পক্ষে বলদ ও লাঙল রাখার খরচ পোষাবে। রেল ষ্টেশনের কুলি মজুর ও শিল্পের শ্রমিক

ও সেনাবাহিনীর জন্য ভূমিহীন স্থানীয় ব্যক্তিদের প্রয়োজন। ওদের সকলকে ভূমিতে আটকে রাখলে বহিরাগতদের দ্বারা শ্রমিকের কার্য কি বাঞ্ছনীয়। এই দিক থেকে ভূমিহীন শ্রমিক বরং দেশের সম্পদ। অতএব জবর দখলী ভূমি বণ্টন প্রদেশের পক্ষে ক্ষতিকর।

(৩) দুইটি বিশ্বযুদ্ধে কি আমেরিকার সাহায্যে মিত্রপক্ষ জয়লাভ করে? ঐ দুইটি যুদ্ধে আমেরিকা কি নিজেরা কারও কোন ভূমি দখল করেছে? সাম্রাজ্য বিস্তার না করে আমেরিকা ফিলিপাইন ও কিউবাকে স্বাধীনতা দিল কেন? একনমিক এক্সপ্লয়টেসনের জন্য যারা টাকা ধার করে ও ইচ্ছা করে এক্সপ্লয়েটেড্ হয় তারাই কি দায়ী নয়? আমেরিকা ধনতন্ত্রী রাষ্ট্র হয়েও রাশিয়া সহ পৃথিবীর বহু দেশকে খাদ্য সরবরাহ করার মত পর্যাপ্ত ফসল উৎপাদন কি করে করে? [কোনও ব্যক্তির ক্রীতদাস হওয়ার মত রাষ্ট্রের ক্রীতদাস হওয়া কি বাঞ্ছনীয়?]

(৪) পুলিশ দ্বারা সহিংস আন্দোলন দমন করতে হলে পুলিশকে কিছু আস্কারা দিতেই হবে। এই রূপ অবস্থায় সহিংস আন্দোলনকারীরাই কি দায়ী নয়? প্রতীত হয় কি যে দুর্নীতির মূল হেতু ঐ সকল অহেতুক আন্দোলনের মধ্যে নিহিত রয়েছে। ঐরূপ আন্দোলন না থাকাতে ব্রিটিশরা প্রথম দিকে শাসন ভার গ্রহণ করে দেশে নিরাপত্তা আনতে কি সক্ষম হয়েছিল? দেশে শান্তি না থাকলে কি কোনও উন্নতিসাধন সম্ভব? সব রাজনৈতিক দল যদি দেশকে ভালোবাসে তাহলে তাদের মধ্যে এত রেষারেষি ও অন্তর্দ্বন্দ্বে শক্তি ক্ষয় কেন?

[এখানে উল্লেখ্য এই যে মিথ্যাকেও সত্য রূপে বার বার বললে উহা কিছু পরে সত্য মনে হয়। কোনও ভুল ও ভ্রান্তি বুঝার মত বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞান কম ব্যক্তির আছে। স্মরণ রাখতে হবে যে—"যুক্তি হচ্ছে এক প্রকার উকিল। যে নিজে কিছু বুঝে না। সে অপরকে বুঝায় মাত্র"।]

এতোক্ষণ অ্যাঙলো আমেরিকার পক্ষে শুধু যুক্তি অবতারণ করা হলো। কিন্তু—যুক্তির'ও প্রতিযুক্তি আছে। ওদের দোষগুলি এখানে গোপন রাখার রীতি! একনমিক এক্সপ্লয়টেশন আদি সূক্ষ্মতত্ত্ব সাধারণ মানুষ বুঝে না। এই ভাবে রুশিয়ার পক্ষেও যথেষ্ট যুক্তির অবতারণ করা যাবে। নিম্নে মগজ ধোলাই ও পূর্ণ ধোলাই সম্পর্কিত আরও কয়েকটি যুক্তি তর্কের রীতিনীতি উদ্ধৃত করা হলো।

"রুশদেশ আন্তর্জাতিক সমমর্যাদাতে সহ-অবস্থানের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

ওটি একটি ভবিষ্যত যুদ্ধ বিগ্রহ হীন ওয়ার্লর্ড স্টেটের প্রতীক। এখানে প্রত্যেক জাতি পরস্পর সহযোগিতার ভিত্তিতে নিজেদের ভাষা ও কৃষ্টিসহ নিরাপদে আছে। আর্মেনিয়ান রাজ্যটি যুগ যুগ ধরে বহিঃ-আক্রমণে বিক্ষত হতো। আজ এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রটির কোনও অসুবিধা নেই। রাষ্ট্র পরিশ্রমের বিনিময়ে প্রত্যেক মানুষের ভার নিলে বিবিধ ট্যাক্সের ভাবনায় উত্যক্ত হতে হয় না। পারস্পরিক বিদ্বেষের ও অপরাধের সাম্যবাদী রাষ্ট্রে স্থান নেই। বৃদ্ধ রুগ্ন ও অক্ষম এবং শিশুদের সেখানে রাষ্ট্র পালন করে। সুখ ও স্বস্তি এবং নিরাপত্তা সেখানে আছে। সম্পত্তি রক্ষার ও চাকুরীর ভাবনা সেখানে নেই।

[প্রত্যুত্তরে বলা যেতে পারে যে ওখানে মানুষ কোনও ব্যক্তির স্লেভ না হয়ে রাষ্ট্রের স্লেভ। পুত্র কন্যার ভবিষ্যত তাদের নিজের বা তাদের পিতামাতার ইচ্ছার বদলে রাষ্ট্রের প্রয়োজন ও খেয়ালের উপর নির্ভরশীল। জন্তুদের সন্তান যেমন প্রকৃতি পালন করে। তেমনি সেখানে মানুষের সন্তান রাষ্ট্র পালন করে। সকল মানুষের সৃজন শক্তি, মনোভাব, শ্রম ক্ষমতা, ইচ্ছা ও মেধা এক হতে পারে না। এতে পরিশ্রমীদের পরিশ্রমের ফল অলস ব্যক্তিরা পাওয়াতে তারা পরিশ্রমী হবে না। এর ফলশ্রুতি এই যে—রুশিয়া ও চীনকে প্রতি বৎসর ধনতন্ত্রী আমেরিকা থেকে খাদ্য শস্য আমদানী করতে হয়।

আমেরিকা, রুশীয়া ও অষ্ট্রেলিয়াতে লোক সংখ্যার তুলনায় শত গুণ বেশী জমি আছে। সেখানে ধনতন্ত্র ও সমাজ-তন্ত্র দুই-ই সমভাবে চলবে। কিন্তু ভারতের ন্যায় জনবহুল দেশে জমির অভাবে এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রভাবে সাম্যবাদ অচল। তাই এখানে মধ্যপথ অবলম্বন বিধেয়। সমান সুযোগ ও সুবিধা এখানে সকলেই পায়।

উপরোক্ত তথ্য প্রমাণ করে যে কোনও রাষ্ট্র জাতীয়তাবাদের উর্ধে নেই। [অবশ্য—ওই সম্পর্কিত কিছু মনোরোগীও আছে।] জাতীয়তাবাদে মানুষের আনুগত্য উর্ধগামী হয়ে বৃহৎ ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত হয়। এতে [প্রয়োজনীয়] পরি-বারিক বন্ধন ও গ্রামীণ আনুগত্যের হানি ঘটে।

[ভারতীয় সভ্যতার ফলশ্রুতি এই যে ভারতে বিজিত রাজগণকে অধীন উপরাজ করা হতো। কিন্তু জয়ী রাজারা তাদের সবংশে হত্যা করতো না। ব্রিটিশরা এই বিষয়ে বহুলাংশে ভারতীয়দের প্রথা অনুকরণ করেন। ফ্রান্সের ও রুশের রাজ পরিবার হত্যার মত কিছু এদেশে অকল্পনীয় ছিল।] (f)

(f) রূশীয় জার বংশ ওদের জন্য বহু স্থান দখল করাতে রুশ আজ বিরাট দেশ। বুর্জুয়া না বলে ওদের প্রতি রুশদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

অপরাধ চিকিৎসা কিছু ক্ষেত্রে প্রশ্নোত্তর দ্বারাও করা সম্ভব। এই প্রশ্নোত্তর প্রকরণের প্রকারভেদ পিতা ও পুত্রের নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তর থেকে বুঝা যাবে।

(ক) পুত্র: কাল সুবোধকে পুলিশে ধরে আদালতে আনলো ও পরে তাকে ওরা জেলে পুরলো কেন? পিতা: কারণ সে মধুর টাকা ছিনতাই করেছিল। তাই বিচারের পর দণ্ড দিয়ে তাকে জেলে পাঠানো হয়।

(খ) পুত্র: লোককে ওরা ধরে ও পরে তাকে ওরা জেলে পাঠায় কেন? পিতা: অসৎলোকের উৎপাত থেকে সৎ লোককে রক্ষা করতে তা করা হয়। তা নাহলে আমরাও রাত্রে নিশ্চিন্তে ঘুমতে পারবো না।

[অপরাধী গ্রেপ্তার ও সম্পত্তি উদ্ধার দ্বারা মানুষের মনের ভীতি ও অনিশ্চিত ভাব নিরসন হয় না। তাই অপরাধ নির্ণয় অপেক্ষা অপরাধ-নিরোধ বেশী প্রয়োজন। সেই জন্য অপরাধীর সংখ্যা যেরূপে হোক কমাতে হবে।]

বিঃ দ্রঃ—এদেশে মেয়েরা বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত এবং ছেলেরা চাকুরী না হওয়া পর্যন্ত য়ুনভার্সিটিতে পড়াশুনা করে। পড়াশুনা মুখ্য উদ্দেশ্য না হওয়ায় এই [ভবিষ্যৎবোধ-হীন] তরুণরাই সুবিধামত রাজনৈতিক আসরে মত্ত হয়। এদের সম্বন্ধেও একটি গবেষণার ক্ষেত্র আছে।

অপরাধ সম্পর্কিত গবেষণায় সমাজের বিভিন্ন স্তরের বালকদের স্বভাব চরিত্র বিশেষ রূপে পর্যালোচনা করতে হবে। কারণ অপরাধীদের মূল বীজ শিশুদের মধ্যেই নিহিত আছে।

[মস্তিষ্কের ক্ষয়ক্ষতি অপরাধী সৃষ্টির একমাত্র কারণ নয়। তা হলে দৈহিক চিকিৎসা ব্যতিরেকে মাত্র মানসিক চিকিৎসা দ্বারা কিছু শ্রেণীর অপরাধীকে নিরাময় করা সম্ভব হতো না। কেবল মাত্র উন্নততর পরিবেশে এনে এক শ্রেণীর অপরাধীকে নিরাময় করা গিয়েছে। দৈহিক চিকিৎসা এক শ্রেণীর অপরাধী রোগীদের উপর কার্যকরী হলেও সকল প্রকার নীরোগ অপরাধীর উহা খুব উপকারে আসে না। ক্ষয়ক্ষতি দৈহিক ও মানসিক উভয় কারণে হলে এই উভয়বিধ চিকিৎসার প্রয়োজন হবে। কু পরিবেশ ও অভাব আদি নিরোগ অপরাধীদের জন্মের কারণ হলেও উহার দ্বারা অপরাধ-রোগীর সৃষ্টি হতে পারে না। ক্লিপটোম্যানীয়করা সৎ ও ধনী বংশে জন্মে সৎভাবে বর্ধিত হয়ে অপরাধ স্পৃহার কারণে অপরাধ করে।]

[ভারতের দেশীয় রাজারাও বিদেশীদের কবল থেকে জনগণের সংস্কৃতি ও মান সম্মান একদিন সার্থকভাবে রক্ষা করেছিল। এক্ষণে এদেরকে সামন্ততান্ত্রিক বলে উপহাস করা অকৃতজ্ঞতা।]

জাতিগত ও সাম্প্রদায়িক হিংসা দ্বেষ আরওদ্রুত অপরাধ স্পৃহার বহির্গমনের সহায়ক। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকালে পূর্বদিন যারা গলাগলি করে বেড়িয়েছে পরদিন তাদেরই শহরে হানাহানি করতে দেখা গিয়েছে।

দেহের সঙ্গে মনের তথা মনোজগতের কিছু প্রভেদ আছে। দেহ পরিবর্তিত হলে তা আর সহজে পূর্বাবস্থায় ফিরে না। কিন্তু মনকে তার পূর্বাবস্থায় বিশেষ ক্ষেত্রে ফিরানো সম্ভব। অতি বৃদ্ধদের দেহ বালকদের মত হয় না। কিন্তু মন তাদের বালকের মত হয় বা তা হতে পারে। এই সম্বন্ধে পরে আমি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবো। তবে ইহা জেনে রাখা উচিত যে, মন সব সময়েই জলবৎতরলম্। উহা যেমন আগাইতে পারে তেমনি উহা পিছিয়ে যেতেও পারে।]

বস্তুতঃপক্ষে আধুনিক যুগের মানব শিশুদের মধ্যে সুস্পষ্ট অপরাধ-স্পৃহার অবস্থিতি এই মতবাদের সবচেয়ে বড় প্রমাণ। শিশু ও বালকদের আমরা প্রায়ই স্বার্থপর, নিষ্ঠুর, মিথ্যাবাদী ও অপরাধী হ'তে দেখি। অপরাধীদের মতই ইহাদের ধূর্ত এবং নির্লজ্জ হ'তে আমরা দেখে থাকি। এর ওর জিনিস কেড়ে নেওয়া বা লুকিয়ে রাখা বা সরিয়ে ফেলা বালকের কাছে একটা বাহাদুরি সূচক খেলা মাত্র। অযথা সমবয়স্কদের বা অন্যান্য কাউকে মারধর করা কিংবা বিড়াল প্রভৃতি দুর্বল জীবদের উপর অত্যাচার করা তাদের কাছে একটি দৈনন্দিন ব্যাপার। নানাভাবে নানারূপে তারা প্রতিদিন বহু অত্যাচার ও অপরাধমূলক কার্য করে, কিন্তু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা এবং সুপরিবেশের মধ্যে পড়ে তারা নিজেদের অতি সহজে শুধরে নিয়ে সাধু হয়ে উঠে। কিন্তু মূল অপরাধ-স্পৃহা তাদের অন্তঃস্থল কখনও পরিত্যাগ করে না। উহা তাদের মধ্যে ধীরে ধীরে সুপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হয় মাত্র। অসৎ আয়ার কোলে মানুষ হলে কিংবা সংস্কৃতিগত আওতার বাইরে বড় হলে তাদের মধ্যে এই অপরাধমুখী ভাব প্রকটতর ভাবে দেখা যায়। কদর্য বস্তিবাসী বালকদের মধ্যে এই অপরাধ-স্পৃহা আমরা অধিকতর ও সুস্পষ্টরূপে দেখে থাকি। অপরদিকে পরিবার বিশেষ যত কালচার্ড বা শিক্ষিত হয়, তাদের বালকরাও তত কম অপরাধমুখী হয়ে থাকে। ইহা হ'তে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, মানুষ সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে তাদের এই আদিম স্পৃহা পরিত্যাগ করেছে। ইহা ছাড়া আধুনিক অপরাধীদের প্রকৃতি ও স্বভাব বিচার করলে তাদের বৃহৎ বালক বা বিগ্‌বয় ব'লেই মনে হবে। ভাদের অন্তঃস্বভাব প্রায় বালকোচিতই হয়ে থাকে।

বালকদের মতই তারা অব্যবস্থিতচিত্ত, বোকা অথচ ধূর্ত, মিথ্যাপ্রিয়, কখনও কখনও বা কর্মবিমুখ, অলস এবং সরল প্রকৃতির হয়ে থাকে। বালকদের ন্যায়ই তাদের যা কিছু কর্মতৎপরতা ও ধূর্ততা তা অসৎ এবং অপকার্যেই ব্যয়িত হয়ে থাকে। বালকদের মত ইহাদের কর্মতৎপরতা [এনার্জি] উগ্রভাবে এলেও উহা মাত্র স্বল্পস্থায়ী হয়ে থাকে। উপরন্তু বালকদের মত ইহারা দীর্ঘকালীন পরিশ্রমে অক্ষমতা প্রকাশ করে থাকে।

আমি আমার এই থিসিসে প্রমাণ করতে চাই যে, মানুষের অন্তর্নিহিত অপস্পৃহাই বিবিধ প্রকার অপরাধী সৃষ্টির কারণ। কিন্তু বহু য়ুরোপীয় পণ্ডিত আছেন যাঁরা এইরূপ জৈব কারণে প্রাপ্ত অপরাধ-স্পৃহার অবস্থিতিই স্বীকার করেন না। এঁদের কেহ কেহ বলেন একমাত্র ক্ষয়ক্ষতির [Degeneration] কারণে মানুষ অপস্পৃহা প্রাপ্ত হয় এবং এঁদের কেহ কেহ বলে থাকেন যে কেবলমাত্র পরিবেশগত কারণে মানুষ অপরাধী হয়। কিন্তু অপরাধী হওয়ার মূল কারণ অপস্পৃহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে এঁরা নীরব থাকেন, কিংবা যুক্তি তর্ক ব্যতিরেকে উহার অস্থিত্ব তাঁরা অস্বীকার করেন। কিন্তু এদের বুঝা উচিৎ যে বীজ ব্যতিরেকে যেমন জীবের জন্ম হয় না তেমনি অপরাধ স্পৃহা ব্যতিরেকে অপরাধীর জন্ম হতে পারে না।

অপরাধ-বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য কোনও লেবোরেটরির প্রয়োজন নেই। একমাত্র প্রয়োগীয় বিদ্যা তথা ফোরেন্সিক সায়েন্সের গবেষণা লেবোরেটরিতে করা যেতে পারে। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক অপরাধ-বিজ্ঞানের স্থান লেবোরেটরি নহে। কলিকাতা ও বোম্বাই-এর মত পাঁচ-মেশালী শহরের পঙ্কিল বস্তি, চণ্ডুখানা ও জঘন্য বেশ্যাবাড়ি এবং গ্রামাঞ্চলের অপরাধী অধ্যুষিত স্থান এবং পুলিশি থানাসমূহ ঐরূপ গবেষণার জন্য প্রয়োজন। এ কারণে এক-মাত্র বিজ্ঞানী পুলিশ কর্মীদের দ্বারা [তদন্তকারী] এই কার্য সুষ্ঠুভাবে সমাধা হতে পারে। এছাড়া স্থানের প্রশ্ন বাদে সময়ের প্রশ্নও এর সঙ্গে জড়ানো আছে। কয়েক বিষয়ে গবেষণার্থে বিশ বৎসর বা ততোধিক কালেরও প্রয়োজন।

আমি ১৯৩১ সনে ৪০টি বালক অপরাধীকে বেছে নিই। এদের মধ্যে ১৬ জন [১৯৫০ সন] শেষ দিন পর্যন্ত তাদের অপরাধ-জীবন অব্যাহত রেখেছিল। ফিঙ্গারপ্রিন্ট বুরোর বন্ধুরা ওরা কোথাও ধরা পড়লেই আমাকে খবর দিত। এছাড়া আমি নিজেও এদের বারে বারে খুঁজে বার করতাম। এইভাবে

পরীক্ষার্থে বিশ বা ততোধিক বৎসর এদের উপর আমি নজর রেখেছি। এই-ভাবে প্রতি ছয় বৎসর অন্তর আমি এদের উপর [অপজীবনের কারণে] দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তন সম্পর্কিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারি। ১৯৩১ সনে বিজ্ঞান কলেজে ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসুর সাহায্যে ওদের ওপর আমি যান্ত্রিক এবং অন্যান্য পরীক্ষা করে এদেরকে স্বাভাবিক মানুষ দেখি। প্রায় বার বৎসর পর তাদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ধীরে ধীরে শুরু হয়। তবুও এদের বহু জনকে বহু কাল আমি প্রায় স্বাভাবিক মানুষের মত দেখেছিলাম। এই পরীক্ষায় [বিজ্ঞান কলেজে] ডাঃ সুহৃদ মিত্র আমাকে প্রভূত সাহায্য করেছেন। ১৬ বৎসর পরে পুনরায় এদের পরীক্ষা করে দেখি যে এদের মধ্যে [মানসিক ও স্নায়বিক] ব্যক্তিত্বের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। মানসিক এবং স্নায়বিক পরিবর্তন সহ 'চেঞ্জ অফ্ পারসোনেলিটি' তখন এদের মধ্যে কমপ্লিট। এরা তখন গৃহস্থ মানুষের সহিত সম্পর্কশূন্য [পঙ্কিল বস্তিবাসী] আদি-মানুষ সুলভ চরিত্রের অধিকারী। এদের অনেকেরই তাদের পূর্ব সভ্য জীবন সম্বন্ধে তখন খুব বেশি ধারণা নেই। [এদের মধ্যে কেউ 'একাচারী' হলে পূর্ব জীবন স্মরণ পর্যন্ত করতে পারে নি।]

এইরূপ গবেষণা দ্বারা আমি প্রমাণিত করেছি যে, অপস্পৃহা আমাদের প্রদমিত আদি স্পৃহা। বহু পরে আমরা সৎপ্রেরণা লাভ করি। প্রথমাবস্থায় সৎপ্রেরণা অপস্পৃহাকে আদপে দমন করতে পারে নি। সেই সময় এই ভালো ও মন্দ দুই বৃত্তিই তাদের মধ্যে ছিল। আরও পরে মানুষ [অপস্পৃহার দমনার্থে] প্রচেষ্টা দ্বারা প্রতিরোধ-শক্তির সৃষ্টি করে। এই প্রতিরোধ শক্তির অপসরণ না হলে অপস্পৃহা সৎপ্রেরণাকে বিতাড়িত করতে অপারক।

[এই প্রতিরোধ-শক্তি—(১) ভয়-ভাবনা, (২) শিক্ষা-দীক্ষা, (৩) জন্মগত সংস্কার—এই ত্রয়ী শক্তির দ্বারা সৃষ্ট। উহাদের বায়বীয় চাপ, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এবং ভূমি-বন্ধনীর সঙ্গে যথাক্রমে তুলনা করা যেতে পারে। নিম্নের প্রদমিত স্থূল বৃত্তিবাহী অপস্পৃহাকে এই প্রতিরোধ-শক্তিকে ছিন্নভিন্ন করে উপরের সঞ্চরণ-শীল সূক্ষ্ম বৃত্তিবাহী সৎপ্রেরণাকে বিদূরিত করতে হয়। এই তিনটির শক্তি প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সমান থাকে না। উহারা কম-বেশি হলেও উহাদের সম্মিলিত শক্তি থাকে একই। কিন্তু ঐ তিন বস্তুর শক্তির মধ্যে অধিক প্রভেদ হলে ভারসাম্য নষ্ট হয়। এরূপ অবস্থায় উহারা অপরাধ প্রতিরোধে অসমর্থ।

বিঃ দ্রঃ—বহুলোক বলে থাকেন যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি কারুর না থাকলে অপরাধ কম হয়। কিন্তু, কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলিতে তাহলে আদালত, থানা-পুলিশ ও কয়েদখানার প্রয়োজন হয় কেন? এ' বিষয়ে ক্যাপিটেলিস্ট গণতন্ত্রী ও কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একটুও প্রভেদ দেখা যায় না। তবুও আমি মনে করি যে সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা অপরাধী সমাজের উপর কিছুটা প্রভাব বিস্তার করে। এই সম্বন্ধে ঐ সব বিভিন্ন দেশে অনুসন্ধান করা দরকার।

[গবেষণার্থে এইজ-গ্রুপিং একটি বড়ো উপাদান তথা ফ্যাকটর। জুভিনাইল শিশু এবং বয়স্ক তথা অ্যাডোলেসেন্টের প্রভেদ আছে। এডোলেসেন্ট স্টেজে নূতন শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করা শক্ত হয়। ১৪ হতে ২০ বৎসর বয়সের মধ্যে বালক-বালিকারা ভাবপ্রবণ আদর্শবাদী ও বাক্‌প্রয়োগশীল হয়। এজন্য ঐ সময় সহজে পরিবেশ এদের উপর প্রস্তাব বিস্তার করে। এই বয়সে এরা না বুঝে প্রেমে পড়ে ও বিপ্লবী হয়। এই বয়সের মেয়েদের মনে যে প্রথম দাগ কাটে তারই জিত হয়। এখানে সুন্দর যুবকও বৃদ্ধদের সঙ্গে এ'বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হার মানে। এই বয়সের বালকরা পিতৃ-অন্নভোজী হওয়ায় অর্থাভাব নেই। তবুও এদের কেহ কেহ গুণ্ডামী প্রভৃতি অপরাধ করে।

এই বয়সের বাদ-বিচার বাদে গবেষণার্থে স্ত্রী-পুরুষদের বিভিন্ন স্বভাবও বিচার করতে হবে। বহুপতিত্ব নারীর আদিম স্বভাব। কিন্তু সভ্য নারী উহা প্রদমিত করেছে। এই নারী যার হেপাজতে থাকে তারই মুখপাত্র হয়ে উঠে। এইজন্য বলা হয় নারী জাতির জাত নাই। তবুও এরাই জাতীয় সংস্কৃতির বিশ্বস্ত ধারক ও বাহক হয়। বালকদের মত গৃহস্থ নারীরা বিদেশী ভাষা মুখে মুখে সহজে শিখে। নূতন পরিবেশে উহারা শিশুদের মত নিজেদের-কে খাপ খাওয়াতে পারে। যৌনস্পৃহা পুরুষের চেয়ে বেশি হলেও উহার দমন করার ক্ষমতা পুরুষ অপেক্ষা নারীর বেশি। যৌন বিষয়ে রতিকালে মাত্র পুরুষের সুখ লাভ হয়। কিন্তু নারীদের উহার স্মৃতিতেও সুখ শিহরণ আসে। যৌন সম্পর্কিত মনোরোগেরও অস্তিত্ব আছে। ইহা আদি স্বভাবের পরিচায়ক। কিছু পুরুষের বেত্রাঘাতে নারীর রক্ত দর্শন না করলে সেই নারীর প্রতি কামনা আসে না। বেত্রাঘাতের বদলে প্রায়ই এই কারণে এরা নারীর উপর অত্যাচার করে। বহু নারী আবার প্রস্তুত না হলে যৌন আবেদনে সাড়া দেয় না এবং সুখী হয় না। এ'জন্য তারা ইচ্ছাকৃত ভাবে কলহ করে প্রস্তুত হতে চায়।

অবশ্য এইগুলির প্রতিটি হচ্ছে মনোরোগ। গবেষণার সময় নর-নারীর এই সব রোগগুলি সম্বন্ধেও সচেতন থাকতে হবে।]

এক এক দেশে বা সমাজের মধ্যে এক এক প্রকার অপরাধীদের আধিক্য দেখা যায়—কারণ অনেক সময় সামাজিক অবস্থা ও ব্যবস্থা বহু অপরাধী গড়ে। বিশেষ করে অভ্যাস-অপরাধীদের সম্বন্ধে এ কথা বিশেষরূপে প্রযোজ্য। এই অভ্যাস-অপরাধীদের সংখ্যাই সকল দেশে সর্বাপেক্ষা অধিক দেখা যায়। দেশের অপরাধীদের প্রায় ৳ অংশেরও অধিক থাকে এই অভ্যাস-অপরাধী। বলা বাহুল্য এই যে অপরাধীদের প্রাথমিক পর্যায়ের অপরাধীদের সংখ্যা প্রতিটি দেশে সর্বাপেক্ষা বেশি হয়ে থাকে। সমাজের বিধিব্যবস্থা এদের সংখ্যা বাড়িয়ে বা কমিয়ে দিতে পারে। এই কারণে এক য়ুরোপীয় অপরাধ-বিজ্ঞান সব সময় ভারতীয় অপরাধীদের উপর সকল বিষয়েই প্রযোজ্য হয় না। য়ুরোপীয় অপরাধীদের মাপকাঠিতে ভারতীয় অপরাধীদের বিচার করা মূর্খতা মাত্র। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতীয় অপরাধ-বিজ্ঞান এখনও গড়ে ওঠেনি। ভারতীয় অপরাধ-বিজ্ঞান এদেশের পুলিশ বিভাগ এবং য়ুনিভারসিটির নৃতত্ব ও মনস্তত্ব বিভাগের সমবেত চেষ্টায় গড়ে উঠতে পারে।

বিঃ দ্রঃ—ভারতীয় স্বভাব দুর্বৃত্ত জাতিগুলির মধ্যে গবেষণার প্রয়োজন ছিল। প্রাগ স্বাধীনতা কালে ব্রিটিশ পুলিশ সাহেব ও ম্যাজিষ্ট্রেটরা ওদের ইতিবৃত্ত কিছু কিছু সংগ্রহ করেন। কিন্তু তাঁরা শত চেষ্টাতেও তাদেরকে নিরপরাধী করতে পারেন নি।

সৌভাগ্য এই যে সাম্প্রতিক কালে কলিকাতা য়ুনিভারসিটির নৃতত্ব বিভাগের প্রধান ডঃ প্রবোধ কুমার ভৌমিক একক উদ্যমে এই অসাধ্য কার্য সমাধা করতে সচেষ্ট। লোধা প্রভৃতি কয়েকটি অপরাধপ্রবণ জাতি জনগণের বিভীষিকা ছিল। ওই সাহসী বিজ্ঞানী কৌশলে ওদের আয়ত্তে এনে ওদের জন্য মেদিনীপুরে বিদিশা নামে একটি বিরাট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বড় গ্রাম স্থাপন করে সেখানে বৈজ্ঞানিক পন্থায় নৈতিক ও কার্যকরী শিক্ষা দ্বারা তাদেরকে সুপথে এনেছেন। পৃথিবীতে এই সম্পর্কিত প্রথম অনবদ্য প্রথম সার্থক উদ্যমের জন্য তাঁকে পদ্মভূষণ করা উচিত।

পূর্বকালীন ইংরাজ উচ্চপদী সরকারী কর্মীদের মত পুলিশের বর্তমান ইনেস্পেক্টর জেনারেল শ্রীরণজিৎ গুপ্ত এই বিষয়ে এঁর অন্যতম সহায়ক। উল্লেখ্য এই যে পুলিশের জনৈক ইংরাজ উচ্চপদী ওই মেদিনীপুরেই কন্ঠি-কোকিল

নামক স্বভাব দুর্বৃত্ত জাতিটিকে আবিষ্কার করেন। এই বিদিশা কলোনী সম্বন্ধে পরবর্তী খণ্ডে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হবে। সর্বভারতীয় গবেষক ছাত্রগণের জন্য এই একমাত্র শুধারা কলোনীটি প্রভূত উপকারে আসবে।]

ইংরাজিতে একটা কথা আছে, "টু স্টাডি বার্ডস ইন কেজ এণ্ড বার্ডস ইন্ ওয়াইল্ড স্টেট্ ইজ ডিফারেন্ট থিঙ।" এই কথাটি ধ্রুব সত্য। তাই বন্দী অবস্থায় ওদের নিকট থেকে আশানুরূপ ইন্ট্রসপেকশন তথা অভিব্যক্তি পাওয়া যায় না। এই কারণে জেলে আবদ্ধ অবস্থায় অপরাধীদের উত্তমরূপে স্টাডি করা অসম্ভব। গবেষণার্থে ওদের নিজেদের ডেরাতে গিয়ে ওদের সঙ্গে মূলাকাৎ করা দরকার। আমরা এ বিষয়ে ভারতীয় পুলিশ বিভাগকে অবহিত হতে বলি। অপরাধীদের প্রতিটি "ব্যবহারই" তাদের "ন্যাকামি" বা "বজ্জাতি", প্রারম্ভেই এইরূপ মনে না করে, তাঁদের উচিত এদের এই সব ব্যবহারের মধ্যে কোনওরূপ বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত আছে কিনা তা অনুসন্ধান করা। কিরূপ প্রণালীতে এবং ধারায় এইরূপ অনুসন্ধান করা চলে, তা আমি এই পুস্তকটির বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বিবৃত করেছি।

অপরাধ-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় অনুসন্ধান-পদ্ধতি সম্বন্ধে এইখানে আরও কিছু বলা যাক। তিনটি বিশেষ পদ্ধতি দ্বারা এই অনুসন্ধান কার্য সাধিত হয়। উহাদের যথাক্রমে—(১) পরিদর্শন, (২) আগম এবং (৩) অনুমান বলা হয়। প্রথমে পরিদর্শন সম্বন্ধে বলা যাক। চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে প্রত্যক্ষভাবে বিষয়বস্তু পরিজ্ঞাত হওয়ার নাম পরিদর্শন। চোরেদের কেউ কেউ সর্বাঙ্গ তৈলসিক্ত করে কালো হাফ প্যাণ্ট বা ল্যাঙ্গট পরে চুরি করতে বার হয়। তৈলসিক্তজনিত দেহের পিচ্ছিলতার কারণে কেউ তাদের ধরে রাখতে পারে না। কাল ল্যাঙ্গট বা হাফ্ প্যাণ্ট পরার উদ্দেশ্য অন্ধকারের সহিত বেমালুম মিশে যাওয়া। এক্ষণে কেউ ঐরূপ অবস্থায় কোনও চোরকে প্রত্যক্ষভাবে পরিদর্শন করে তাদের বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে কোনও উক্তি করলে ঐরূপ উক্তিকে বলা হবে "পরিদর্শন"। পরিদর্শন সম্বন্ধে বলা হলো। এইবার "আগম" সম্বন্ধে বলা যাক। বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকট থেকে শুনা কাহিনীর উপর নির্ভর করে মানুষের জ্ঞান লাভ করার নাম "আগম"। আমার কাছে কোনও এক অপরাধী এইরূপ এক উক্তি করেছিল, "হাঁ মশাই! আমরা অলস প্রকৃতিরই বটে! আমরা জানি যে এ এক লজ্জাকর ব্যাপার। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা অলস জীবনই যাপন করি। এই অলসতা দূর করার জন্য আমরা মদ

খেয়ে থাকি, ইত্যাদি।" কিংবা কোনও এক ভারতীয় পুরান পাপীর কাছে শুনা গেল যে, তারা ছোট ছোট নুড়িতে চূণ মাখিয়ে সেগুলি গালের কষিতে পুরে কষির মধ্যে ফুটো করে। চূণের দ্বারা গালের ভিতরকার ছাল ক্রমান্বয়ে ক্ষয়িত হয়ে ছিদ্র তৈরি হয়। তারপর এই ছিদ্রের মধ্যে আরও বড় বড় নুড়ি পুরে ছিদ্রটি বড় হতে আরও বড় ক'রে তারা গহনা ও অর্থাদি অনায়াসে তাতে লুকিয়ে রাখে। সাধারণ ভাবে মনে হয় দ্রব্যগুলি তারা গিলে ফেল্‌ল। আসলে কিন্তু তা তারা গিলে ফেললো না। [কেউ কেউ সিকি, দু-আনি গিলে খেয়ে পরে জোলাপ নিয়ে তা বাহ্যের সঙ্গে বার করে নেয়] এই সকল বিশ্বস্ত বিবৃতির উপর নির্ভর করে যদি কেউ অপরাধীদের অন্তর্নিহিত অলসতা বা বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে কোনও মতামত প্রকাশ করেন ত তাকে বলা হবে "আগম"। পরিদর্শন ও আগম সম্বন্ধে বলা হলো। এইবার অনুমান সম্বন্ধে বলা যাক। ধরুন অদূরবর্তী কোনও এক পর্বত শিখর থেকে ধূম নির্গত হচ্ছে। এইক্ষেত্রে নিশ্চিতরূপে অনুমান করা যায় যে, অদূরবর্তী পর্বত-শিখরে আগুন আছে। কারণ আগুন থেকেই ধূম নির্গত হয়। বিষয়বস্তুর তিনটি গুণাগুণ আগম এবং পরিদর্শন দ্বারা জ্ঞাত হওয়ার পর তার চতুর্থ গুণটি না দেখেও নির্ভুলরূপে উহা অনুমান করা যায়। এইরূপ রীতিতে অনুসন্ধান করার নাম অনুমান।

এইরূপ পরিদর্শন, আগম ও অনুমানের মধ্যে অনেক ভুল বা ত্রুটিবিচ্যুতিও থেকে যায়। এই ভুল বা ত্রুটিকে বলা হয় "বিকল্প"। অনুসন্ধানের সময় এই সব বিকল্প সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। বিকল্প দুই প্রকারের হয়, যথা—(১) বহির্বিকল্প এবং (২) অন্তর্বিকল্প। রজ্জু-সর্প, শুক্তি-মুক্তা, মায়া-মরীচিকা প্রভৃতি বহির্বিকল্পে ভুল চিত্র চক্ষু থেকে মস্তিষ্কের দিকে প্রবাহিত হয়। অপর দিকে অন্তর্বিকল্পে কোনও রূপ বিষয়বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না। অন্তর্বিকল্পের বিষয়বস্তু চিন্তার দ্বারা মস্তিষ্কের মধ্যে জাত হয় এবং পরে তার ছবি মস্তিষ্ক থেকে চক্ষুর দিকে প্রবাহিত হয়। এইরূপ অবস্থায় আমরা ভূত, বিভীষিকা প্রভৃতি দেখে থাকি। অর্থাৎ প্রথম ক্ষেত্রে রজ্জুকে সর্প বলে ভ্রম হয়, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে রজ্জু বা সর্প কোনটিরও অস্তিত্ব থাকে না, অথচ মানুষ সম্মুখে ঐ সর্প বা রজ্জু দেখে থাকে। মস্তিষ্ক-বিকারের কারণেই এইরূপ ঘটে। [হ্যালুসিনেসন] এই ধরনের ভুল পরিদর্শনকে আমরা অন্তর্বিকল্প বলি। ঠগী অপরাধীরা সাধারণ মানুষের এইসব স্বভাবগত বিকল্প সম্বন্ধে অবহিত থাকে এবং তারা প্রায়ই কখনও বাক্-প্রয়োগ দ্বারা কখনও বা হাতসাফাই বা ম্যাজিকের সাহায্যে দুর্বলচিত্ত

মানুষের মধ্যে বিকল্পের সৃষ্টি করে নানারূপে তাদের ঠকিয়ে থাকে। অপরাধ-বিজ্ঞানের ছাত্র-মাত্রেরই মনোবিজ্ঞানের এই বিশেষ দিকটি সম্বন্ধে অবহিত থাকা উচিত।

বিঃ দ্রঃ—বিকল্প তথা ভ্রান্তির দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে বিগত মহাযুদ্ধ কালে কলিকাতায় বাঙালী মেয়েদের [মাথায় এয়োস্ত্রীর চিহ্ন] লাল সিঁদূর দেখে আমেরিকানরা বুঝেছিল যে তারা সব লাল চিহ্ন ধারী কমিউনিষ্ট হয়ে গেছে।

নিম্নোক্ত চিত্রটি থেকে বহিবিকল্প [ইলিউসন] সম্পর্কিত বিষয়টি বুঝা যাবে। বহির্মুখীতা ও অন্তর্মুখীতা যথাক্রমে রেখার দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি বা হ্রাস করে। নিম্নের চিত্রের সরল রেখা দু'টি দৈর্ঘ্যে সমান হলেও একটি বহির্মুখী বাহুদ্বয়ের জন্য দীর্ঘ এবং অন্যটি অন্তর্মুখী বাহুদ্বয়ের জন্য হ্রস্ব প্রতীত হয়। (f)
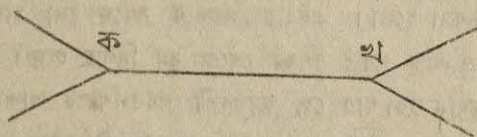
অপরাধ-বিজ্ঞান অনুসন্ধানের রীতি বা পন্থাগুলি সম্বন্ধে বলা হলো। এইবার এই অপরাধ-বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় অনুসন্ধানের ক্ষেত্রগুলি আমরা কিরূপে বেছে নিতে পারি সেই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। আমরা প্রত্যহ বহু কিছু দেখি, পড়ি বা শুনি এবং তার ফলে আমাদের মনে নানারূপ প্রশ্ন জাগে—বিশেষ করে একটি প্রশ্ন, "কেন?" কিন্তু এই "কেন?" প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টা আমরা প্রায়ই করি না। কিন্তু আমরা যদি তা করি তা'হলে আপনা আপনিই এদেশে অপরাধ-বিজ্ঞান গড়ে উঠতে পারে। ভেজাল খাদ্য ও মাইকের 'নন্ ষ্টপ, ধ্বনি দ্বারা মস্তিষ্কের সূক্ষ্মস্নায়ু ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় প্রদমিত অপস্পৃহার বহির্বিকাশ ঘটে কি না ইহাও আমাদের বিবেচনা করা উচিত। বহু মনোরোগী পুরুষ যৌনজ অপকর্ম না করেও তারা তা করেছে বলে নিজের ও অন্যের নামে অপবাদ রটায়। কিন্তু এই অদ্ভূত আচরণ তারা কেন

(f) উপরন্তু কোনও কিছুর ইনটেন্‌সিটি বেড়ে গেলে উহার টাইম স্পেশ কমে যায়।

করে? কোনও কোনও ভারতীয় অপরাধী ছোট কাজ বা অপরাধে* লিপ্ত হতে লজ্জা বোধ করে। তারা মনে করে এর দ্বারা তাদের গুরুর অবমাননা হবে। অপকর্মের মধ্যেও এই ধরনের আভিজাত্য-বোধ দেখা যায় কেন? কলিকাতার পুরান চোরদের প্রায়ই একটি করে ছোকরা পুষতে দেখা যায়। এই সব ছোকরাদের দখল নিয়ে তারা মারপিঠও করে থাকে। অথচ সকল ক্ষেত্রে এই সব ছোকরারা অপকর্মের জন্য নিয়োজিত হয় না। তা'হলে এর প্রকৃত কারণ কি? এই সব 'কেন'র উত্তরের জন্য যদি অনুসন্ধান করা যায় তা'হলে দেখা যাবে যে, এই সব ছোকরাদের সহিত এই শ্রেণীর পুরান চোরদের অবৈধ সম্বন্ধ আছে। অবশ্য বহু ক্ষেত্রে এই সব বালকেরা ঘুলঘুলি নর্দমার পথে ঢুকে বড়োদের জন্য দুয়ারের খিল খুলে দেয়। কলিকাতা শহরের বহু অপরাধী একাধারে হিন্দু, মুসলমান এবং খৃস্টান নামে আত্ম-পরিচয় দেয়, যথা—(১) সেখ করিম ওরফে হরিচরণ দাস ওরফে জে, ডেভিড ওরফে সাধন চাটুয্যে ওরফে সেখ নবী, ইত্যাদি। বাপের নামও যথাক্রমে অনুরূপ ভাবে তারা পাল্‌টিয়ে দেয়। সব সময় কি এরা আত্মরক্ষা বা আত্ম-গোপনের জন্য এইরূপ করে? প্রকৃত অপরাধীরাই সাধারণতঃ এইভাবে নাম পাল্‌টিয়ে থাকে, না প্রাথমিক অপরাধীরাও এইরূপ করে থাকে? ইহা কি প্রকৃত অপরাধীদের একজাতিত্ব বোধের পরিচায়ক? মিথ্যা করে পিতার নাম বলার জন্য ভৎর্সিত হলে কোনও অপরাধী আমাকে এইরূপ বলেছিল: 'বাপ ছেলের নাম রাখে। এ ক্ষেত্রে আমি বাপের নাম রেখেছি। মশাই! বাপ তো আমার একজন ছিল? নাই বা আমি বা আমার মা আমার পিতার নাম জানলাম।' আত্ম-পরিচয় দেবার সময় কেউ কেউ আমীন ভট্‌চায, সুধাময় সেখ ইত্যাদি যুক্ত নাম বলে। কিন্তু কেন? এইরূপে প্রতিটি প্রশ্ন মনের মধ্যে জাগ্রত হওয়া মাত্র যদি আমরা পরিদর্শন, আগম এবং অনুমানের সাহায্যে অনুসন্ধান শুরু করি তা'হলে এদেশেও অপরাধীদের রীতি-নীতি, সমাজ-ব্যবস্থা ও চরিত্রাদি সম্বন্ধে বহুবিধ তথ্য জানা যায়।

এদেশের শান্তিরক্ষক, আইন-জীবী এবং বৈজ্ঞানিকরা এইভাবে অনুসন্ধান

---

* কোনও এক অপরাধী আমাকে বলেছিল, "না মশাই, ও সব ছোট কাজে আমি হাত দিই না। শেষে ধরা পড়ে যাব আর লোকে মনে করবে আমি বুঝি সেখানে ঘটি-বাটি চুরি করতে গিয়েছিলাম।" অন্য এক অপরাধী আমাকে এইরূপ বলেছিল—'আজ্ঞে! ও তো ছিঁচকে। ওদের সাথে আমরা মিশি না।'

চালালে ভারতীয় অপরাধ-বিজ্ঞান গড়ে উঠতে পারে। ভারতীয় অপরাধীদের সংখ্যা কমাতে হলে ভারতীয় অপরাধ-বিজ্ঞানের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা বেশি। মস্তিষ্কের মধ্যে কি হচ্ছে কিংবা তাতে কি আছে বা না আছে—এই সব বিষয় ঠিক ভাবে বলা আজও কঠিন। [শরীরকে চেরাই করা গেলেও মনকে ঠিক ঐ ভাবে তা করা যায় না।] কিন্তু অপরাধীদের অভিব্যক্তি ও কার্যকারণ অনুধাবন করে আমরা আগম, পরিদর্শন ও অনুমান দ্বারা উহার কারণ নির্ভুলরূপে অনুমান করতে পারি।

ভারতীয় অপরাধ-বিজ্ঞানের সহিত, পাশ্চাত্য অপরাধ-বিজ্ঞানের তুলনামূলক আলোচনা অপরাধ-বিজ্ঞানের অপর আর একটি দিক। কি ভাবে এইরূপ তুলনা করা যেতে পারে সেই সম্বন্ধে কিছু বলবো। দৃষ্টান্তস্বরূপ অপরাধী বিশেষের (১) হৃদয়ের প্রসারতা ও (২) হৃদয়ের উদারতা—এই দুইটি বিষয় সম্বন্ধে বলা যেতে পারে। দেশ-বিশেষের সমাজের ব্যবস্থা এবং ধর্ম-বিশ্বাস প্রকৃত অপরাধীদের সামান্য-মাত্রায় প্রভাবান্বিত করে, কিন্তু প্রাথমিক অপরাধী-দের উপর অত্যধিকরূপে উহা প্রভাব বিস্তার করে। কোনও কোনও অপরাধীর মধ্যে সময় সময় কমবেশি সংপ্রেরণা* বর্তিয়ে থাকে। বস্তুতান্ত্রিক য়ুরোপে আংশিক সংপ্রেরণা অপরাধীদের মধ্যে হৃদয়ের প্রসারতা আনে এবং ধর্মপ্রাণ ভারতবর্ষের অপরাধীদের মধ্যে এই আংশিক সংপ্রেরণা সৃষ্টি করে হৃদয়ের উদারতা। এই প্রসারতা এবং উদারতার প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে একটু বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন আছে। কোনও এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের রোম নগরে পকেট কাটা যায়। অপহৃত ব্যাগটিতে ৩০০্ টাকার নোট্, জাহাজের একখানি টিকিট ও পাশপোর্ট ছিল এবং সেই সঙ্গে খানকতক ঠিকানা-লেখা কার্ডও তার ছিল। কয়েকদিন পরে ভদ্রলোক তাঁর লণ্ডনের ঠিকানায় একটি রেজিস্টার্ড লেফাপা পান। লেফাপাটির মধ্যে পাশপোর্ট ও জাহাজের টিকিট-খানি ন্যস্ত ছিল। ইহা একটি হৃদয়ের প্রসারতার দৃষ্টান্ত। ভারতীয় অপরাধীরা এইরূপ ক্ষেত্রে দ্রব্যগুলি নষ্ট করে ফেলত। কিন্তু এই ভারতীয় অপরাধীরা হৃদয়ের প্রসারতা না দেখালেও তারা সময় সময় হৃদয়ের উদারতা দেখিয়ে থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এইরূপ বলা যেতে পারে: বাঙলার কোনও এক স্থানে

* অপস্পৃহার সহিত কম-বেশি সংপ্রেরণাও কোনও কোনও অপরাধীর মধ্যে মিশ্রিত দেখা যায়। এই সংপ্রেরণার মাত্রা অনুযায়ী অপরাধের মধ্যেও তারা ভালো মন্দের জাত-বিচার করে থাকে।

জনৈক গৃহস্থ একদল ডাকাত দ্বারা আক্রান্ত হলেন। এই অবস্থায় গৃহস্বামী তাঁকে একেবারে সর্বস্বান্ত না করার জন্যে অনুরোধ জানান। ডাকাত দলের সর্দার এইরূপ অবস্থায় কিছু অর্থ গৃহস্বামীকে ফেরৎ দেয়। এইরূপ দয়া কোনও য়ুরোপীয় ডাকাত দেখাবে কি'না সন্দেহ আছে। এইরূপ উদারতা ভারতীয় অপরাধীদের দ্বারাই সম্ভব।

সৎপ্রেরণা বিকৃত ভাবে কিংবা আংশিকরূপে অপরাধীদের মধ্যে বর্তালে তাদের ব্যবহারাদিও অত্যদ্ভুত হয়ে থাকে। সৎপ্রেরণার স্বল্পতার জন্যে তারা একেবারে অপরাধ-বিমুখ না হলেও এই ধরনের প্রসারতা বা উদারতা এদের অপকর্মের মধ্যেও এরা দেখিয়ে থাকে। কোনও কোনও প্রাথমিক অপরাধীদের সম্বন্ধে ইহা বিশেষরূপে প্রযোজ্য।

এইরূপ তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা অপরাধ-বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন করা যায়। এ'ছাড়া অপরাধ-বিজ্ঞানের ছাত্রদের অপরাধীদের প্রতি বিশেষ দরদ বা সহানুভূতি থাকা উচিত, তা না হলে নিরপেক্ষভাবে তাদের কার্য-কলাপ বিচার করা অসম্ভব। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কোনও এক বাহ্যতঃ যৌনজ অপরাধীর কথা বলা যাক।

ধরুন, বিশ্বস্তভাবে জানা গেল বা শুনা গেল যে কোনও এক গৃহস্থ-কন্যা একজন ধনী যুবকের সঙ্গে অবৈধভাবে প্রেম বিনিময় করছে। বিষয়টি জ্ঞাত হওয়া মাত্র কন্যাটির উপর ক্রুদ্ধ হয়ে ঘৃণাতে নাক সিট্‌কালাম। অথচ কিরূপ অবস্থায় কন্যাটি এইরূপ পন্থা অবলম্বন করেছে তা জানবার একবার চেষ্টাও করলাম না। ইহা অত্যন্ত অন্যায়। নিম্নের বিবৃতিটি পড়লে বিষয়টি উত্তম-রূপে বুঝা যাবে।

"প্রৌঢ় বয়সে আমার পিতা কর্মচ্যুত হন। এ বয়সে চাকুরি পাওয়া যায় না। সাত-আটটি পুত্র-কন্যা নিয়ে পিতা আমার ভীষণ দুরবস্থায় পড়েন। পাওনাদার ও বাড়িওয়ালার তাগাদায় আমরা অস্থির হয়ে উঠি। ঠিক এই সময় দেবুদার সঙ্গে আমার বাবার আলাপ হয়। তিনি প্রায়ই আমাদের বাড়ি আসতেন এবং আমাদের কিছু কিছু অর্থ-সাহায্যও করতেন। দেবুদার কিন্তু লক্ষ্য ছিল আমার উপর। বাবা এই সব যে না বুঝতেন তাও নয়। কতবার তিনি আমাকে সাবধানও করে দিয়েছেন। কিন্তু মুখে তিনি কোনও কিছু বলতে সাহস করেন নি। একদিন ঘরে বসে গল্প করতে করতে দেবুদা আমাকে বুকের কাছে টেনে নিলেন। প্রতিবারের ন্যায় এবারও আমি প্রতিবাদ করতে

যাচ্ছিলাম। এমন সময় আমার কানে এল বাড়িওয়ালার বীভৎস চীৎকার। জন চার-পাঁচ দেশওয়ালী গুণ্ডার সাহায্যে বাড়িওয়ালা জোর করে বাড়ি দখল করতে চায়। কিছুক্ষণ বাক্‌বিতণ্ডার পর পিতাঠাকুর নাচার হয়ে ঘরে ঢুকলেন। তখনও আমি দেবুদার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করছি। বাবা এ অবস্থায় আমাদের দেখেছিলেন কিনা জানি না। তিনি ঘরে ঢুকে দেবুদাকে বললেন, 'বাবা দেবু! গোটা ৫০ টাকা দিতে পার?' তাড়াতাড়ি সরে বসে দেবুদা উত্তর দিল, 'নিশ্চয়ই পারি। এতক্ষণ বলেননি কেন? কারা ওরা?' পঞ্চাশটি টাকা দেবুদা আমার হাতে গুঁজে দেয়। আমি ক্ষুব্ধ মনে নোট-কটা ধীরে ধীরে তক্তপোশের উপর নামিয়ে রাখি। পিতাঠাকুর ছোঁ মেরে টাকাক'টা তুলে নিয়ে বেরিয়ে যান। ততক্ষণে আমিও উঠে দাঁড়িয়ে ছিলাম। দেবুদা পথ আগলে বলে উঠেন—'পালাচ্ছ যে, ইয়ারকি নাকি! দাঁড়াও। কাকীমাকে বলে দিচ্ছি। খুকী আমার কথা শুনছে না। যাও, বসো ওখানো।' বাপ-মার দুঃখ-দুর্দশা বোঝবার আমার বয়স হয়েছে। তাই চোখের জল মুছে আমি দেবুদার পাশে গিয়ে বসি। আমি তাকে বাধাও দিই না, নিজেকে এলিয়েও দিই না। আমার নিস্পন্দ দেহটা নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে দেবুদা বেরিয়ে যায়। ঘর থেকে শুনতে পাই মা বলছেন—'আবার আসবে ত বাবা!' বিছানায় শুয়ে আমি কাঁদতে থাকি, হঠাৎ শুনতে পাই মা শুধাচ্ছেন 'কাঁদছিস্ নাকি তুই?' উত্তরে আমি বলি—'না মা কাঁদিনি ত!' এর আগে আমার গলার রুক্ষ আওয়াজ শুনে মা দুয়ারের কাছে এসে একবার জিজ্ঞেস করেছিল—কিরে? তোরা দুটোতে ঝগড়া করছিস্ বুঝি!"

এই ধরনের পরিবারের কলিকাতায় অভাব নেই। আমি এমন পরিবারের খবর রাখি যেখানে মাতা লজ্জার খাতিরে কুমারী কন্যার গর্ভজাত কন্যাকে নিজের কন্যা বলে পরিচয় দিয়ে লজ্জা ঢেকেছেন। ক্ষুধার জ্বালার ন্যায় আর জ্বালা নেই। নিজে অনাহারে মরলেও কেহ পুত্র-কন্যাকে অনাহারে মরতে দিতে রাজি হয় না। এই অবস্থায় স্ত্রী-কন্যাকে বিক্রয় না করে কেউ যদি আহার সংস্থানের জন্য অপরাধ করে তা'হলে আমরা তাকে স্ত্রী-কন্যা বিক্রয়কারীদের অপেক্ষা কি কম ঘৃণা করি না?

(f) বহু লম্পট যুবক অভিযোগ এলে মিথ্যা করে এরূপ বলে—"ঐ মেয়ে অমুকের সাথে প্রেম করছিল বা বেরিয়ে যাচ্ছিল। আমি দেখে ফেলাতে ও ওদের ঐ কাজে বাধা দেওয়ায় ঐ মেয়ে আমার বিরুদ্ধে উল্টো মিথ্যা অপবাদ দিলে।"

আবার আমি এমন কন্যাকেও জানি যে অতি সংগোপনে যৌনজ বৃত্তির দ্বারা অর্থোপার্জন করে বৃদ্ধ পিতামাতাকে ভরণপোষণ করেছে। শুধু তাই নয় ছোট ভগ্নীদের বিবাহ দিয়েছে এবং একমাত্র ভাইটিকে বি-এ পাশ করিয়ে, পরে একজন ভাল ছেলেকে নিজে বিবাহ করে স্থখী হয়েছে এবং বিবাহের পর সে একনিষ্ঠভাবেই জীবনযাপন করেছে। তার বিগত দিনের অপকার্যের জন্য সে সারা জীবনই অনুতপ্ত ছিল।

এই ধরনের অপরাধীদের শ্রেণী-বিভাগ কিরূপ প্রণালীতে করা উচিত তাহা বিবেচ্য। সাধারণভাবে এদের দৈব-অপরাধী বলা উচিত কি'না তাহাও বিবেচ্য। নিম্নে এই ধরনের একজন অযৌনজ অপরাধীর বিবৃতি উদ্ধৃত করা হলো। বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।

"সামান্য মাইনের এক খাজাঞ্চির চাকরি করি। কিন্তু পোষ্যবর্গের অভাব নেই। ভাইয়ের সংসার এবং বোনের সংসার সবই আমার ঘাড়ে। বন্ধু-বান্ধবদের কাছে টাকা ধার করি। ভিক্ষাও করি। প্রতিদানে উপকারী বন্ধুরা আমার বয়স্থা কন্যা এবং স্থন্দরী স্ত্রীর উপর স্থবিধা নিতে চায়। আমি এক দিনেই শুভাকাঙ্ক্ষীদের বিদায় দিয়ে অর্থের সন্ধানে বার হই। শেষে নাচার হয়ে আফিসের ক্যাশ থেকে কিছু টাকা না বলে আমানত নিই। কিন্তু শোধ দিতে পারি না। বরং ক্ষেপে ক্ষেপে আরও বহু টাকা নিয়ে ফেলি। অডিট্ হবার মাত্র একদিন বাকি। আগের দিন সন্ধ্যার পরও একা ক্যাশ ঘরে বসে ভাবতে থাকি। সকল কর্মচারীই বাটী চলে যায়। কিন্তু আমি যাই না। হঠাৎ আমার মাথায় এক বুদ্ধি আসে। আমি 'চোর চোর' বলে চেঁচিয়ে উঠি। লোকজন জড় হলে আমি জানাই—'হঠাৎ পিস্তল হাতে একটা লোক আসে। লোকটা কুড়ি হাজার টাকা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ঐদিকে পালিয়ে গেল।"

এইসব অপরাধ ছাড়া, কুসংস্কার, কুপ্রথা এবং দাম্ভিকতাপ্রসূত অপরাধ সম্বন্ধেও অপরাধ-বিজ্ঞানের ছাত্রদের বিবেচনা করা উচিত। প্রভুর আদেশে প্রভুভক্ত ভৃত্যের দ্বারা কৃত অপরাধকে আমরা কিরূপ শ্রেণীর অপরাধ বলব? আদর্শ প্রণোদিত হয়ে পিতার আদেশে মাতৃহত্যা এবং ধর্মীয় কারণে সাগর-বক্ষে কন্যা নিক্ষেপ, বংশের স্থনাম রক্ষার্থে ভ্রূণ হত্যা প্রভৃতিও এই শ্রেণীর অপরাধ। কারণ, এই সকল অপরাধ কখনও ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা প্রণোদিত হয়নি। এ'ছাড়া ভয় বা লজ্জা এড়াবার জন্য অনেকে অপরাধ করে। পাঞ্জাবের কোনও

পরিবারে জন্মাবা মাত্র কন্যাগণকে হত্যা করা হত। কারণ, কন্যাগণকে বিবাহ করে বাটীর কর্তাকে কেহ "শ্বশুর" সম্বোধন করবে তা ঐ সব পরিবারের কর্তা-ব্যক্তিরা পছন্দ করত না।

আমি এমন এক উচ্চ বংশোদ্ভব ভদ্র ডাকাত সর্দারের বিষয় শুনেছি, যে একটা উত্তেজনা উপভোগ করবার জন্য বা রোম্যান্সের কারণে ডাকাতি করত। অপহৃত অর্থাদি সে নিজে গ্রহণ না করে সেগুলি সে প্রায়ই গরিবদের বিলিয়ে দিত। এ'ছাড়া অপহৃত দ্রব্যাদির ½ অংশ অকুস্থলেই গৃহস্থদের সে ফিরিয়েও দিয়েছে। এ সম্বন্ধে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে এইরূপ উক্তি করত—'মনে করুন, কোনও এক গভীর রাত্রে—হা-রে-রে-রে করে সদলে পাঁচিল টপকে কোনও এক ধনী জমিদারের বাটী আক্রমণ করলাম। তারপর আরম্ভ হলো আক্রমণ, প্রতি-আক্রমণ ও আর্তনাদ এবং গৃহস্থ বধূদের আকুল মিনতি। আমি বিজয়ী বীরের মত তাদের অভয় দিচ্ছি। এর চেয়ে বড় রোম্যান্স কি আপনারা কল্পনা করতে পারেন" ইত্যাদি। এই ধরনের অপরাধ-রোগীদের আমরা অপরাধ রোগী বলব কি না তাও বিবেচ্য।

এইসব যৌনজ এবং অযৌনজ অপরাধীদের অপরাধীরূপে ধরা উচিত কিনা তা বিবেচ্য। কারণ ওরা এক প্রবল ইচ্ছার বশীভূত হয়ে অপরাধী হয়েছে। অনুরূপ অপর আর একপ্রকার অপরাধী আছে যাদের অপরাধী বলা যায় না। এইসব অপরাধীদের বাক্‌প্রয়োগ দ্বারা অপরাধী করা হয়। অন্যের দ্বারা-অন্যায় ভাবে প্ররোচিত না হলে সুস্থ অবস্থায় এদের অপস্পৃহা জাগ্রত হয় না। এইখানে কৃত্রিম উপায়ে অন্তর্নিহিত অপরাধ-স্পৃহা বাহির করা হয়ে থাকে। নিম্নের বিবৃতিটি থেকে বক্তব্য বিষয়টি বুঝা যাবে।

"মেয়ে কয়টিকে আমি বোনের মতই দেখে এসেছি। হঠাৎ একদিন আমার এক বন্ধুকে বলতে শুনি, মেয়ে কয়টি নাকি দুষ্টা প্রকৃতির। বন্ধুটি বলে যে, সে মেয়েগুলিকে প্রায়ই আদর করে। শুধু সে নয়। তার অপরাপর বন্ধুরাও তাদের আদর করেছে। সাক্ষীস্বরূপ তার ঐ সব বন্ধুদেরও আমার কাছে সে হাজির করে দেয়। বন্ধুবর সুযোগের সদ্ব্যবহার করার জন্য আমাকে অনেক উপদেশ দেয়। ধীরে ধীরে আমার মধ্যে [অপরাধ-স্পৃহা মিশ্রিত] যৌনস্পৃহা জাগ্রত হয়। বন্ধুবর আমাকে বুঝায় যে দুষ্ট মেয়েদের সহিত দুষ্টুমী করলে দোষ নেই। তখনও আমি জানতাম না যে এদের সকল কাহিনীই কল্পিত এবং তারা আমাকে ফাঁদে ফেলবার জন্যে মিথ্যে গল্প ফেঁদেছে। বলা বাহুল্য, আমি

সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে গিয়ে অপদস্থ ও প্রহৃত হই এবং তৎসহ আমার এতদিনের সমস্ত সুনামও নষ্ট হয়ে যায়।"

এই ধরনের এজেণ্ট প্রোপগেটর বা প্রলুব্ধকারী * চরদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে যারা অপরাধ করে তাদের অপরাধী বলা উচিত কিনা তাহাও বিবেচ্য। আমার মতে মানুষের স্বাভাবিক অপরাধ-স্পৃহা যারা জাগ্রত করে তারাই প্রকৃতরূপ অপরাধী।

[বিড্ গ্যাবলিং, টপকা ঠগী দোনাখেল ও নওসেরা প্রভৃতি অপরাধে দেখা গিয়েছে যে বাক্-প্রয়োগ দ্বারা ফরিয়াদীকে প্রলুব্ধ করে অপরাধীর পর্যায়ে উপনীত করা হয়। সে তখন অপরকে ঠকাতে গিয়ে নিজেই প্রবঞ্চিত হয়। মানুষের মনে অপস্পৃহার অবস্থিতির ইহা এক অন্যতম প্রমাণও বটে।] (f)

অপরাধ-বিজ্ঞানের ছাত্রদের প্রথমে উচিত, কারা আসল অপরাধী নয় তা অনুধাবন করে বুঝে নেওয়া। এরপর কারা নীরোগ অপরাধী এবং কারা বা অপরাধ-রোগী—তা তাদেরকে চিনে নিতে হবে। এরপর তাদের উচিত প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে যারা দৈব-অপরাধী তাদের পৃথক করা। এরপর তাদেরকে নীরোগ-অপরাধীদের অন্তর্গত স্বভাব, অভ্যাস ও মধ্যম অপরাধীদের চিনে নিতে হবে। এইখানেই তাদের সকল কর্তব্য শেষ হলো না। ঐ তিন প্রকার অপরাধীদের মধ্যে কে কে প্রাথমিক পর্যায়ে [প্রাথমিক অপরাধী] এবং কে কে শেষ পর্যায়ে [প্রকৃত অপরাধী] আছে—তাও তাদেরকে বুঝে নিতে হবে। এরপর তাদের উচিত হবে এদেরকে শোণিতাত্মক, সাম্পত্তিক প্রভৃতি উপ-শ্রেণীতে বিভক্ত করা। পরিদর্শন, আগম, অনুমান অনুসন্ধান এবং সংগৃহীত বিবৃতি আদি দ্বারা আমরা তা করে থাকি। এই থিসিসটির মধ্যে প্রমাণস্বরূপ বহু বিবৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় আমার বলা উচিত হবে।

এই পুস্তকে যে সকল বিবৃতি সন্নিবেশিত হয়েছে সেগুলির ভাষাগুলি সংশোধন করে সাহিত্যের উপযোগী করেছি। এই কারণে প্রত্যেকটি বিবৃতি একই ভাষায় লেখা হয়েছে। বহু লিডিং কোশ্চেন্স্ এবং তার উত্তরও এইসব

* ভারতীয় পুলিশরা এইসব প্রলুব্ধকারী চরদের আন্তরিকভাবে ঘৃণা করে এবং সাধারণত এদের সাহায্য তারা কখনও নেয় না। ভারতীয় পুলিশ মাত্র সংবাদবাহী চরদের সাহায্য নিয়ে থাকে। কিন্তু তা'ও তারা বিশেষ যাচাই করে তবে গ্রহণ করে থাকে।

(f) এইভাবে সৎ জনগণও সস্তাতে চোরাই-মন্দ সোনা কিনতে গিয়ে পিতলের দানা বহু অর্থ ব্যয়ে কিনে ঠকে।

বিবৃতির মধ্যে সন্নিবেশিত আছে। এই বিবৃতিগুলি সংক্ষিপ্ত করে লিপিবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে এরূপ করা হয়েছে। এ'ছাড়া এই সকল পুরাতন চোরেরা প্রায় গৃহহীন ও বিবধ নামে পরিচিত। এজন্য এদের নাম-ধাম দেওয়ার কোনও প্রয়োজন আমি মনে করি নি। অন্যদিকে গৃহী ও শিক্ষিত [প্রাথমিক] অপরাধীদের নাম-ধাম প্রকাশ বাঞ্ছনীয়ও নয়।

[এদের একজনের অমৃত-বাণী আজও আমার মনে পড়ে—'দশজন ব্যক্তি একটি বাটী লুঠ করলে তোমরা বল ডাকাতি। কিন্তু একশজন মিলে একশ বাটী লুঠ করলে উহাকে বলা হবে জন-বিক্ষোভ। এই সংখ্যাগুলি আরও বাড়ালে তাকে বলা হবে যুদ্ধ। প্রথমটির ক্ষেত্রে তোমরা আমাদের গলায় আইনের ফাঁস গলাবার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্ষেত্রে অসহায় ভাবে দূরে দাঁড়িয়ে তোমরা ভাবো এবার এরা বিচারের নামে ঐ মরণ ফাঁস তোমাদের না গলায় পরায়।' এইরূপ অন্য এক সুবিজ্ঞ অপরাধীরও এক সুচিন্তিত সুভাষণ আমার বারে বারে মনে পড়ে—'গণ-দেবতাকে জাগানো বড়ো শক্ত। ও' সব কাজ [প্রকৃত] মহাপুরুষদের জন্য রেখে রাজনীতিক নেতারা অন্যত্র সরে পড়ুন। কিন্তু গণদানবকে সহজে জাগানো যায়। জনতাকে জাগানোর নামে তাদের অন্তর্নিহিত অপস্পৃহাকে জাগাবেন না।' আমি স্বীকার করি যে, এদের এই সব প্রশ্নের সদুত্তর আজও খুঁজে পাই নি।]

মানুষ কি করে অপরাধী হয় এবং অপরাধী থেকে মানুষ পুনরায় কি করে নিরপরাধ হ'তে পারে তা আমি এই পুস্তকে বলেছি, কিন্তু তা তারা কেন হয় তা আমি বলতে পারি নি। মানুষ মরে কেন, পাগল হয়ে কেন, অপরাধী হয় কেন? অনাদিকাল থেকে মানুষের মনে এইসব প্রশ্ন জাগলেও বিজ্ঞান আজও এ সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে নি। এই বিজ্ঞান আমাদের বলে দিয়েছে যে এক এবং একে দুই হয়, দুই পরিমাণ হাইড্রোজেন এবং এক পরিমাণ অক্সিজেন মিলে জল হয়। অর্থাৎ উহা কি করে বা কেমন করে এরূপ হয় বিজ্ঞান তা বলে দিয়েছে; কিন্তু কেন তা হয় বিজ্ঞান আমাদের তা বলে দিতে পারে নি। তাই এই কেন-র উত্তর আমিও দিতে পারিনি। অঙ্ক শাস্ত্রের সাহায্যে যদি কেউ মানুষের মন মাপতে চান তা'হলে তিনি নিশ্চয়ই ভুলই করবেন। তবে কি ভাবে বা কি উপায়ে অপরাধীরা অপরাধী হয় তা আমি বলেছি; যেটুকু বলেছি বা বলতে পেরেছি তা থেকে সমাজ কতটুকু উপকৃত হবে তা পাঠকবর্গের বিবেচনার উপর ছেড়ে দিয়ে নিম্নের বিবৃতির মধ্যে আমার শেষ নিবেদন

জানিয়ে এখন আমি আপনাদের নিকট থেকে এইবারকার মত বিদায় গ্রহণ করবো।

"দেশের বরণ্যে মনীষীরা যাঁরা অনাগত কালে আইনজীবী, জেল-কর্তৃপক্ষ, পুলিশ অফিসার, ডাক্তার, নৃতত্ত্ববিদ্ ও মনস্তত্ত্ববিদ্দের একত্র করে গঠন করবেন একটি "সংস্থা"—যে "সংস্থা" অপরাধ ও অপরাধীদের সম্বন্ধে চিন্তা করবেন প্রভুত সহানুভূতির সঙ্গে বিজ্ঞান-সম্মতভাবে, নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে যাঁরা প্রচলন করবেন বিধিব্যবস্থা, যাঁরা জেলসমূহকে রূপান্তরিত করবেন শোধনাগারে ও চিকিৎসাগারে, তাঁদের স্মরণ করে আমি থিসিসের এই প্রথম খণ্ডটি শেষ করলাম।"

৫০টি নিরপরাধ মানুষের সেনসেশন্ বা ইন্দ্রিয়-বোধ সম্পর্কীয় স্পট্ বা কেন্দ্রের অ্যাভারেজ সংখ্যার তথ্য-তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো। এদের মধ্যে পরিদৃষ্ট স্ট্যানডার্ড ডিভিয়েশন সামান্য বিধায় উহাদের সংখ্যা পৃথকীকৃতরূপে উধ্বৃত করা হয় নি। এই পরীক্ষার জন্য প্রায় একস্কোয়ার পরিমিত স্থান সাবজেক্টের শরীরের উপর আমি বেছে নিয়েছিলাম।

উষ্ণস্পট্	কষ্টস্পট্	শৈত্যস্পট্	স্পর্শস্পট্
১৪	১২	৮'৪	৬'৩

৫০টি প্রাথমিক অপরাধীদের সেন্সেশন বা ইন্দ্রিয়বোধ সম্পর্কীয় স্পট্ বা কেন্দ্রের অ্যাভারেজ সংখ্যার তথ্য-তালিকা নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

উষ্ণস্পট্	কষ্টস্পট্	শৈত্যস্পট্	স্পর্শস্পট্
১৩'৭	১২'২	৯'২	৬'৯

[উপরের তথ্য-তালিকা ও পরিসংখ্যা সংগ্রহের সময় আমি দেখি যে নিরপরাধ ব্যক্তি, অপরাধ-রোগী এবং প্রাথমিক অপরাধীদের উপরোক্ত বোধসমূহ প্রায় একই রূপের হয়ে থাকে। এইজন্য কেবলমাত্র প্রকৃত বা [উৎকট] পেশাদারী-অপরাধীদেরই এইরূপ পরীক্ষার জন্য আমি বেছে নিয়েছিলাম।]

৫০টি প্রকৃত অপরাধীদের সেনসেশন বা ইন্দ্রিয়বোধ সম্পর্কীয় স্পট্ বা কেন্দ্রের অ্যাভারেজ সংখ্যার তথ্য-তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো। এদের মধ্যে পরিদৃষ্ট স্ট্যান্ডাড ডিভিয়েশন সামান্য বিধায় উহাদের সংখ্যা পৃথকীকৃত রূপে উধ্বৃত করা হয় নি।

উষ্ণস্পট্	কষ্টস্পট্	শৈত্যস্পট্	স্পর্শস্পট
৫'৬	৬'২	১৫'৩	১২'২

এই পরীক্ষা থেকে বুঝা যায় যে ব্যক্তিত্বের আমূল পরিবর্তনের জন্য এদের মধ্যে উষ্ণতাবোধ ও কষ্টবোধ কম এবং শৈত্যবোধ ও স্পর্শবোধ বেশি থাকে। এই পরিবর্তন দেহের ইন্দ্রিয়-কোষ এবং মস্তিষ্কের অনুক্রমিক বোধ-কোষ : এই উভয় প্রকার বোধ-কেন্দ্রে সমভাবে দেখা যায়।

ইহার পর আমি এই সকল প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে থেকে ১০টি স্বভাব, ১০টি মধ্যম এবং ১০টি অভ্যাস অপরাধীদের বেছে নিয়ে আমি তাদের উপর পৃথক পৃথক ভাবে পরীক্ষা চালিয়ে নিম্নোক্তরূপ ফলাফল প্রাপ্ত হই। এই সকল ফলাফলের অ্যাভারেজ সংখ্যাসমূহ নিম্নোক্ত তালিকায় উদ্ধৃত করা হল।

বোধ স্পট্	স্বভাব-অপরাধী	মধ্যম-অপরাধী	অভ্যাস-অপরাধী
উষ্ণ	৫'৩	৭'২	৯'৩
কষ্ট	৬'৪	৬'৫	৯'২
শৈত্য	১৪'১	১২'৫	১০'২
স্পর্শ	১২'৫	১১'৪	১১'৩

এইরূপ পরীক্ষা থেকে বুঝা যায় যে উপরোক্তরূপ বিবিধ বোধের কম-বেশী হার এবং মাত্রা : স্বভাব, মধ্যম এবং অভ্যাস-অপরাধী এবং তৎসহ প্রাথমিক ও প্রকৃত [উৎকট] অপরাধী ভেদে কম বা বেশি হয়ে থাকে।

ইহার পর আমি ১৫টি বারগ্লার, ১৫টি সাধারণ চোর, ১৫টি পিকপকেট ও ১৫টি প্রবঞ্চক এবং তৎসহ তিনটি ক'রে খুনে, ডাকাত, ছিন্নক এবং রবারকে বেছে নিয়ে তাদের প্রতিটি গ্রুপের কেবলমাত্র অ্যাভারেজ স্পর্শ স্পট্ সম্পর্কে নিম্নোক্তরূপ তথ্য-তালিকা সংগ্রহ করে নিই।

পিকপকেট্	চোর	তালাতোড়	প্রবঞ্চক
১৪'২	৮'৩	৭'১	৫'৩
ডাকাত	খুনে	ছিন্নক	রবার
৫'৮	৫'৪	৭'১	৭'৪

উপরের তথ্য-তালিকা থেকে বুঝা যাবে যে সাধারণ মানুষ, প্রাথমিক অপরাধী এবং অন্যান্য প্রকৃত অপরাধীদের তুলনায় পিকপকেটদের স্পর্শজ্ঞান অত্যধিকরূপে বেশি। আমি এই হ'তে ইহাও উপলব্ধি করি যে এদের কেউ কেউ তাদের জন্মগত এই স্পৃহাকে অভ্যাস দ্বারা বাড়িয়ে নিয়ে তারা স্পর্শ জ্ঞান সম্পর্কে অতীন্দ্রিয়তা (Hyper sensibility) লাভ করেছে।

৫০টি করে নিরপরাধ এবং প্রাথমিক অপরাধী এবং তৎসহ প্রকৃত অপরাধীদের অন্তর্গত ৫০টি করে পিকপকেট, বারগ্লার ও সাধারণ চোরদের বেছে নিয়ে এদের উপর আমি হিপস্‌যন্ত্রের সাহায্যে তাদের শব্দ, আলোক, স্পর্শ, উষ্ণতা এবং শৈত্য-বোধ সম্পর্কীয় রি-অ্যাকশন টাইম সম্বন্ধে বিবিধরূপ পরীক্ষা করি। এইরূপ পরীক্ষার জন্য আমি ইচ্ছা করেই ভারনিয়ার যন্ত্র ব্যবহার করি নি। এর কারণ এই যন্ত্রটির দ্বারা প্রাপ্ত ফলাফল সঠিক তথা অ্যাকিউরেট হয় না। নিষ্প্রয়োজন বিধায় এদের কোনও "ন্যাচারাল' রিডিঙ্‌ আমি গ্রহণ করি নি। আমি কেবলমাত্র উহাদের মাস-কুলার এবং সেনসেরিয়াল রিডিঙ্‌ই গ্রহণ করেছি। নিম্নে এই সকল রিডিঙ্‌ সম্পর্কীয় উহাদের অ্যাভারেজ সংখ্যার তালিকা পৃথক-রূপে উধ্বৃত করা হলো। নিম্নোক্ত সংখ্যাগুলির পার্শ্বের 6 চিহ্নর নাম সিগমা। ইহার দ্বারা এক সেকেণ্ডের এক হাজার ভাগের এক ভাগ বুঝানো হয়ে থাকে।

শব্দ-জ্ঞান সম্পর্কীয় প্রতিক্রিয়া-কাল [রি-অ্যাকশন টাইম] বা সময়ের পরিজ্ঞানের সংগৃহীত তথ্য-তালিকা—

সাবজেক্ট্‌	মাসকুলার	সেনসেরিয়াল
সাধারণ মানুষ	১২৮ 6	২২৯6
প্রাথমিক অপরাধী	১২৭ 6	২৩০6
পিকপকেট	১২৪ 6	২২৭6
তালাতোড় (বারগ্লার)	১২০ 6	২২০6
গৃহচোর	১২২ 6	২২১6

উপরের তথ্য থেকে প্রমাণিত হয় যে গৃহচোর এবং তালোতোড়দের শব্দজ্ঞান সাধারণতঃ খুবই বেশি দেখা যায়।

আলোক-বোধ সম্পর্কীয় সময়ের পরিজ্ঞানের বা রি-অ্যাকশন টাইমের সংগৃহীত তথ্য-তালিকা—

সাবজেক্ট	মাসকুলার	সেনসেরিয়াল
সাধারণ মানুষ	১৭৭ 6	২৭২6
প্রাথমিক অপরাধী	১৭৫ 6	২৭০6
পিকপকেট	১৭৩ 6	২৬৮6

সাবজেক্ট	মাসকুলার	সেনসেরিয়াল
তালাতোড়	১৭০ 6	২৬৫6
সাধারণ চোর	১৭২ 6	২৬৭6

স্পর্শবোধ সম্পর্কীয় সময়ের পরিজ্ঞান বা রি-অ্যাকশন টাইমের সংগৃহীত তথ্য তালিকা—

সাবজেক্ট	মাসকুলার	সেনসেরিয়াল
সাধারণ মানুষ	১১২ 6	২১১ 6
প্রাথমিক অপরাধী.	১১১ 6	২১০ 6
পিকপকেট্	১০৫ 6	২০৪ 6
তালাতোড়	১০৯ 6	২০৮ 6
সাধারণ চোর	১১০.6	২০৯ 6

উষ্ণতাবোধ সম্পর্কীয় রি-অ্যাকশন্ টাইম বা সময়ের পরিজ্ঞানের সংগৃহীত তথ্য-তালিকা—

সাবজেক্ট্	মাসকুলার	সেনসেরিয়াল
নিরপরাধ	১৩২ 6	১৯০ 6
প্রাথমিক অপরাধী	১৩০ 6	২৮৭ 6
পিকপকেট্	১৩৭ 6	১৯৪ 6
তালাতোড়	১৪০ 6	১৯৭ 6
সাধারণ চোর	১৩৮ 6	১৯৬ 6

এই পরীক্ষায় আমি দেখতে পাই যে প্রকৃত অপরাধীদের উষ্ণতাবোধ সম্পর্কীয় সময়ের পরিজ্ঞান [প্রতিক্রিয়া-কাল] অধিক সময় হয়ে থাকে। এর কারণ এই যে প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে উষ্ণতাবোধই কম দেখা যায়। এই পরীক্ষার সময় কয়েকজন প্রকৃত অপরাধী সাড়া পর্যন্ত দেয় নি। এইজন্য অ্যাভারেজ করার সময় আমাকে এদের বাদ দিয়ে দিতে হয়েছে।

[এই সকল পরীক্ষা এক দুরূহ কার্য। সফলতার জন্য প্রাথমিক এবং অভ্যাস-অপরাধীদের আমাকে বুঝাতে হয়েছে যে ঠিক ঠিক উত্তর দিতে পারলে আমি বুঝবো যে তারা নিরপরাধ। এই ক্ষেত্রে তাদের আমি মুক্তি দেবো কিংবা তাদের রক্ষিতাকে দেখতে দেবো। কিন্তু এই ক্ষেত্রে স্বভাব এবং মধ্যম-অপরাধীদের নেশার দ্রব্য প্রদান করবার লোভ আমাকে দেখাতে হয়েছে।]

শৈত্যবোধ সম্পর্কীয় রি-অ্যাকশন টাইম [প্রতিক্রিয়া-কাল] বা সময়ের পরিজ্ঞানের সংগৃহীত তথ্য-তালিকা—

সাবজেক্ট	মাসকুলার	সেনসেরিয়াল
নিরপরাধ	১১৭6	১৫৩6
প্রাথমিক অপরাধী	১১৮6	১৫০6
পিকপকেট্	১১২6	১৫৬6
তালাতোড়	১১০6	১৪২6
সাধারণ চোর	১১৩6	১৪৪6

উপরের পরীক্ষা থেকেও প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে শৈত্যবোধ অত্যন্ত বেশি দেখা যায়। অন্য হরমন প্রভৃতি সৃষ্টির কারণে স্নায়বিক ক্ষয়ক্ষতিই যে ইহার কারণ তাহা আমি ইতিপূর্বে বলেছি।

এরপর আমি বিশেষ করে দশটি রাত্রের [প্রাথমিক] বারগ্লারদের [তালা-তোড় বা সিঁদেল চোর] বেছে নিয়ে তাদের উপর স্পর্শ-বোধাত্মক Tactual পরীক্ষা সমাধা করি। আমি সাধারণভাবে দেখেছি যে এদের দৃষ্টি ও স্বাদবোধ কম থাকে। এইজন্য রাত্রে সঠিকভাবে অন্ধকারের মধ্যে কক্ষ হতে কক্ষে যাতায়াতের জন্য এরা এদের শব্দ এবং [কয়েক ক্ষেত্রে] স্পর্শ-বোধাত্মক সেন-সেশনের উপর অধিক নির্ভরশীল। আমি এই বিশেষ সত্যটি অনুধাবন করবার জন্য তাদের উপর স্পর্শ-বোধাত্মক সেনসেশন সম্পর্কে নিম্নোক্তরূপে কয়েকটি পরীক্ষা করি। আমি এদের এবং পিকপকেটদের চক্ষু বেঁধে দিয়ে তাদের বাম হাতের সম্মুখভাগে সিকি, টাকা, চৌকা দু'আনি ও চার আনি, ডবল পয়সা, পুরাতন পয়সা, পুরাতন আনি, ফুটো নয়া পয়সা প্রভৃতি রেখে তাদের একটি কাগজে উহাদের সাইজ বা মাপ অনুযায়ী রেখা-চিত্র ডান হাতে আঁকতে বলি। আশ্চর্যের বিষয় এই সকল রাত্রির চোরদের দুই-একজন ছাড়া সকলেই প্রায় সঠিকভাবে উহাদের মাপ সহ চিত্র এঁকে দিতে পেরেছিল। কিন্তু দিবা-চোরদের অধিকাংশই ঐরূপ কোনও চিত্র সঠিকভাবে আঁকতে সক্ষম হয় নি। এই থেকে প্রমাণিত হয় যে এক শ্রেণীর রাত্রের চোর তাদের অপকার্যের জন্য স্পর্শ-বোধাত্মক সেনসেশনের উপর বিশেষরূপে নির্ভরশীল। কিন্তু ওরূপ অন্য পরীক্ষা দ্বারা আমি জেনেছি যে রাত্রের [প্রকৃত] সবল [বারগ্লার] চোররা

অতি মাত্রাতে শব্দ সম্পর্কিত অতীন্দ্রিয়তার অধিকারী। এইজন্য এরা দিবাভাগে কখনও কোনও চৌর্য কার্যে সাধারণতঃ লিপ্ত হয় নি।

[তাদের রক্ষিতাকে দেখিয়ে আনবো বলে কিংবা মুক্তির প্রলোভন দেখিয়ে এবং নেশার দ্রব্য প্রদান করবো বলে ও অপরাপর চতুরতাপূর্ণ বাক্য-বিন্যাসের দ্বারা অতি কষ্টে আমি এইরূপ আঁকাআঁকি করতে তাদেরকে রাজি করাতে পেরেছিলাম।]

এরপর আমি ১০টি করে সাধারণ মানুষ এবং প্রাথমিক অপরাধীদের বেছে নিয়ে স্টপ্ ওয়াচের সাহায্যে তাদের শ্রুতিশক্তি সম্বন্ধে পরীক্ষা করে নিম্নোক্ত-রূপ অ্যাভারেজ ফল পাই।

নিরপরাধ মানুষ : প্রায় দুই ফিট দূরত্ব
প্রাথমিক অপরাধী : প্রায় আধ ফুট দূরে

এরপর আমি ১০টি করে প্রকৃত অপরাধাদের অন্তর্গত তালাতোড়, পিক্‌-পকেট্, প্রবঞ্চক এবং সাধারণ চোরদের বেছে নিয়ে স্টপ্ ওয়াচের সাহায্যে তাদের শ্রুতি সম্পর্কীয় অতীন্দ্রিয়তার (Hyper Sensibility) কম-বেশি সম্বন্ধে নিম্নোক্তরূপ অ্যাভারেজ ফলাফল প্রাপ্ত হই।

তালাতোড় ... প্রায় পাঁচ ফিট দূরত্ব
পিকপকেট্ ··· প্রায় তিন „ „
সাধারণ চোর··· প্রায় চার „ „
প্রবঞ্চক··· ··· প্রায় দুই „ „

এইরূপ আরও বহু প্রকার পরীক্ষা আমি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অপরাধীদের উপর তো করেছিই, এ'ছাড়া একই অপরাধীদের উপর তার বিভিন্ন বয়সকালে এই সকল পরীক্ষা আমি সমাধা করেছি। এই ক্ষেত্রে উহাদের কয়েকটি নমুনা মাত্র এইখানে উধৃত করা হলো।

অপরাধী	১৯৩২	১৯৩৬	১৯৪০
ক	স্বাঃ ভাঃ	স্বাঃ ভাঃ	অঃ স্বাঃ
খ	„	অঃ স্বাঃ	„ „
গ	„	স্বাঃ ভাঃ	„ „
অপরাধী	১৯৩২	১৯৩৭	১৯৪৯
ঘ	স্বাঃ ভাঃ	স্বাঃ ভাঃ	অঃ স্বাঃ
ঙ	„ „	অঃ সাঃ	„ „

এইরূপ পরীক্ষা দ্বারা আমি দেখেছি যে প্রাথমিক অবস্থায় এই সকল অপরাধীদের দৈহিক ও নৈতিক অসাড়তা প্রায়ই স্বাভাবিক [স্বাঃ ভাঃ] মানুষের মত দেখা যায়, কিন্তু উহাদের শেষ অবস্থায় উহাদের মধ্যে এই সম্পর্কে [পরিবর্তিত ইন্দ্রিয়বোধ এবং মানসিক অবস্থা সহ] তাদের ব্যক্তিত্বের আমূল পরিবর্তন ঘটে থাকে এবং ইহার ফলে তারা অস্বাভাবিক [অঃ স্বাঃ] মানুষে পরিণত হয়ে যায়।

আমি এইরূপ বিবিধ পরীক্ষা এদেশের বেশ্যা নারীদের উপরও করেছি। এই পরীক্ষার জন্য আমি মাত্র পাঁচটি করে স্বভাব, মধ্যম এবং অভ্যাস বেশ্যা বেছে নিতে পেরেছিলাম। এইজন্য প্রথমে আমাকে এদের জীবনধারা পর্যালোচনা করে এরা অভ্যাস, স্বভাব বা মধ্যম-বেশ্যা তা অবগত হতে হয় এবং তারপর তাদের উপর অনুরূপ পরীক্ষার জন্য তাদের ভয় ও লোভ দেখিয়ে এতে রাজি করতে হয়েছে। এইরূপ কার্য এক দুরূহ ব্যাপার হওয়ায় অধিক বেশ্যা নারীর উপর এইরূপ পরীক্ষা আমি করতে পারি নি। তাদের উপর এইরূপ পরীক্ষার অ্যাভারেজ পরিসংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হলো।

বোধ-স্পট্	স্বভাব-বেশ্যা	মধ্যম-বেশ্যা	অভ্যাস-বেশ্যা
উষ্ণ	৭.৩	৮.২	১০.১
কষ্ট	৮.২	৯.৪	৯.৭
শৈত্য	১২.১	১২.৪	১৩.২
স্পর্শ	১১.৪	১২	১৩.১

উপরের তালিকা থেকে বুঝা যাবে যে অপস্পৃহা বা যৌন-স্পৃহা প্রভৃতি— যে কোনও উগ্র স্পৃহা জনিত পুনঃ পুনঃ আলোড়ন দেহাভ্যন্তরে [অন্ত] হরমন জাতীয় রসের সৃষ্টি ক'রে এবং উহা ধমনীর মাধ্যমে মস্তিষ্কের সূক্ষ্মস্নায়ুকে প্রভাবান্বিত ক'রে তৎতৎ সম্পর্কীয় স্থান সহ উহাদের আশেপাশের অন্যান্য বোধ সম্পর্কীয় স্থানকেও ক্ষতিগ্রস্ত ক'রে উহাদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের বিবিধরূপ পরিবর্তন আনয়ন ক'রে থাকে। তবে এই সম্বন্ধে অপর একটি বিষয়ও বলে

রাখার প্রয়োজন আছে। আমার মতে অপরাধীদের ত্বকের উপর অবস্থিত বিবিধ বোধের আনুক্রমিক যে সকল স্থান উহাদের মস্তিষ্কে আছে তাদের আংশিক ক্ষয়ক্ষতির কারণেও তাদের ত্বকে অবস্থিত ঐ সকল বোধ-কেন্দ্রের সবকয়টিই কার্যকরী হয়ে উঠতে পারে না। এইজন্য মস্তিষ্কের সূক্ষ্মস্নায়ু পুনর্গঠিত হওয়ার পর পুনরায় ওরা নিরপরাধ হলে ওদের ত্বকস্থিত প্রায় প্রতিটি বোধ-কেন্দ্র পুনরায় সতেজ হয়ে উঠে থাকে। এই থেকে আমি আরও মনে করি যে, যে সকল বোধ-কেন্দ্র বা কণা নিরপরাধদের ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় বা সক্রিয় থাকে অপরাধীদের ক্ষেত্রে উহাদের কয়েকটি বিপরীতভাবে সতেজ বা নিস্তেজ হয়ে উঠে। এ'ছাড়া উগ্র স্পৃহা সহযোগে অভ্যাস দ্বারাও উহাদের সক্রিয়তা বা নিষ্ক্রিয়তা যথাক্রমে বাড়িয়ে বা কমিয়ে নেওয়া যায়।

[অভ্যাস-বেশ্যাদের এবং স্বভাব-বেশ্যাদের ক্ষেত্রেও পরবর্তীকালে তাদের কাউকে আমি পুনরায় স্বাভাবিক মানবীতে পরিণত হতে দেখেছি। প্রাথমিক অবস্থার বহু অভ্যাস-অপরাধী বেশ্যাকে আমি সাধারণ মানুষের মত দেখেছি।]

তথ্য-তালিকা সংগ্রহ করে আরও দেখেছি যে প্রকৃত অপরাধী মাত্রই দরিদ্র। এর কারণ এরা কখনও অর্থ সঞ্চয় করার কথা ভাবে নি; বরং নিমেষেই সমুদয় 'অপহৃত অর্থ' মদে, হুল্লোড়ে ও নারীতে ব্যয় করে ফেলতে এরা বদ্ধপরিকর। [আদিম মানুষ এইরূপ ছিল।] এ'ছাড়া অপহৃত দ্রব্য নাম-মাত্র মূল্যে এরা বিক্রয় করে এবং এ'জন্য এরা কখনও দরদস্তুর করতেও অভ্যস্ত নয়। এই থেকে বুঝা যাবে যে এরা দারিদ্র্যের কারণে অপরাধ করে না। বরং এরা দারিদ্র্যকে ডেকে আনারই পক্ষপাতী।

কিন্তু অপর দিকে প্রাথমিক অপরাধীদের সম্বন্ধে এ'কথা [পুরোপুরি] বলা যায় না। প্রথম অবস্থার প্রাথমিক অপরাধীরা টাকা চেনে ও বুঝে এবং তা কখনও কখনও তারা সঞ্চয় করবারও চেষ্টা করে। প্রাথমিক এবং প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে এটিও একটি প্রভেদ।

তথ্য-তালিকা সংগ্রহ করে আমি আরও জেনেছি যে প্রকৃত অপরাধীরা সাধারণতঃ অযৌনজ অপরাধী হয়ে থাকে। পঙ্কিল বস্তিবাসী নিম্ন শ্রেণীর বেশ্যাদের সঙ্গে তাদের যা কিছু সম্পর্ক। এদের ভদ্রনারী এবং অনিচ্ছুক নারীদের প্রতি [কদাপি] কামনা আসে না। এদেশে একপ্রকার ডাকাতি কার্যের সময় ঐ দলের দুই-একজনের দ্বারা বলাৎকার অপরাধ সাধিত হয়েছে।

(f) কিন্তু ঐ সকল ডাকাতরা প্রায়ই প্রাথমিক অপরাধী এবং তারা সভ্য-সমাজের মধ্যেই বসবাস করে। বারগ্লার প্রভৃতি অপরাধীরা প্রায়ই প্রকৃত অপরাধী হয়ে থাকে। এইজন্য অপকর্মের সময় তারা নারীর প্রতি কখনও অত্যাচার করে না। এ'ছাড়া এরা এদের অন্তর্নিহিত অলসতার জন্য অপকর্মের স্থলে অধিক সময় নিয়োগ করতেও অক্ষম।

আমেরিকায় একপ্রকার রেপাইন বারগ্লারদের কথা শুনা গেছে। কিন্তু এদের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে বলাৎকার করা। আমার মতে এরা একপ্রকার শোণিতাত্মক যৌনজ অপরাধী মাত্র। এইজন্য এরা প্রতিটি ক্ষেত্রে ভীষণ নিষ্ঠুরতার সহিত এই সকল অপকর্ম সমাধা করেছে। প্রথমে প্রহারে প্রহারে জর্জরিত করে এরা একাকিনী নারীদের অচৈতন্য-প্রায় করে। তারপর তাদের উপর বলাৎকার অপরাধ এরা সমাধা করে থাকে। এইসব যৌনজ অপরাধীরা কতকটা অভ্যাস-অপরাধীর মতই থাকে। কিন্তু এদের মধ্যে কমব্যক্তিই প্রাথমিক অপরাধীদের ন্যায় সভ্যসমাজের মধ্যে বসবাস করে। অবশ্য এদের কেউ কেউ অপরাধ-রোগী হওয়াও অসম্ভব নয়।

[এই রেপাইন বারগ্‌লারী এখনও এদেশে দেখা যায় না। এরা দ্রব্য অপহরণের উদ্দেশ্যে দুয়ার ভেঙে বা সিঁদ কেটে বাড়ি ঢোকে না। গৃহে প্রবেশের জন্য যা কিছু ভাঙা ভাঙি তা তারা নারীদের বলাৎকার করার জন্যে করে। ইহা এক প্রকার যৌনজ শোনিতাত্মক অপরাধ। প্রথমে ভীষণ প্রহার করে নারীকে ত্বরিতে রক্তারক্তি ও অচৈতন্য করে তার উপর বলাৎকার করে। কোনও দেশে বেশ্যাবৃত্তি অবৈধ করে পঙ্কিল স্বভাব ও অভ্যাস বেশ্যাদের উৎখাত করলে ঐ দেশে কালক্রমে এই রেপাইন বলাৎকারক সিঁদমারী বারগ-লারদের সৃষ্টি হয়।

মানুষের মস্তিষ্কের দুটি মগজের [পৃঃ ৪৫২] একটি অন্যের মত সুগঠিত না হ'লে তাদের মধ্যে পরিণত ও অপরিণত : এই উভয় মন একত্রে দেখা যায়। মনোরোগীদের মনোরোগ সম্পর্কীত ষ্টিমিউলাস তথা কারণ হতে দূরে রাখলে উহা তারা ভুলে গিয়ে নিরাময় হয়। [ওই সুযোগে সূক্ষ্মস্নায়ু পুনর্গঠিত হয়।] মানুষের স্বল্পদোষ থেকে উগ্র দোষের উদ্ভব হয়। যথা : বেশী বেতন ছাত্রদের

(f) বহু প্রাথমিক বলাৎকারক অভিযুক্ত হলে মিথ্যা করে বলে—'ওই মেয়ের কাছে আমার বহু কালের যাতায়াত। আজ জানাজানি হয়েছে : তাই ও চীৎকার করলো' 'কিংবা' এ মাসে এদের পয়সা দিতে পারি নি, তাই"—

নিকট থেকে নিলে অবিভাবক'রা উহা যোগাতে দুর্নীতির আশ্রয় নেয়। মদ্য ও নারী ভোগীরাও ওই বাবদে অর্থ পেতে অপরাধ করে। পুরুষের 'বারটান' অথবা বদনাম আনে ও লোকের শ্রদ্ধা হারায়। [পৃঃ ৪৫৪] মিতব্যয়ীরা অর্থ জমিয়ে বৃত্তবান হয়। কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলরা তা না করে দরিদ্র থাকে। পরে ওরাই সাম্য-বাদের বুলি আওড়ায় এবং মিতব্যয়ী ও পরিশ্রমীদের হিংসা করে। উৎপাদন না বাড়িয়ে দ্রব্যের নিয়ন্ত্রণ নূতন শ্রেণীর অপরাধী সৃষ্টি করে। উপরন্তু উহা দমনকালে কিছু রক্ষীও উৎকোচগ্রাহী হয়। একটা বিষয়ে অপরাধী হলে তারা অন্যান্য অপরাধও করে।

কোনও এক বালক এক আফিমের দোকানে আফিম কিনতে আসে। দোকানির সন্দেহ হওয়াতে তাকে আফিমের বদলে আমসত্বের দুটো গুলি বিক্রয় করে। ওই বালক দুয়ারে খিল দিয়ে দুটি গুলি জলের সঙ্গে গলাধঃকরণ করে। কিন্তু—কিছু পরেই সে চিৎকার করে তার প্রাণ রক্ষার্থে লোক ডাকে।

[পৃঃ দ্রঃ] মাল্টি ষ্টোরিড বিল্ডিঙের জানালায় বা জলাশয়ের ধারে উঁকি দিলে লোকের লাফাতে ইচ্ছা করে। কিন্তু হঠাৎ প্রতিরোধ শক্তির হানি ঘটলে তাদের লাফিয়ে পড়া সম্ভব।

'গোময়াৎ বৃশ্চিকা জায়তে' অর্থে গোময় হতে বৃশ্চিকার জন্ম নয়। বৃশ্চিকা গোময়ে বীজ রাখলে উহা জন্মে। কিন্তু অন্যত্র উহা জন্মে না। এখানে গোময় পরিবেশের সহিত তুলনীয়। ওইরূপে অপস্পৃহা বা সৎপ্রেরণা রূপ-বীজের স্ফুরণের জন্যও অনুরূপ অসৎ বা সৎ পরিবেশের প্রয়োজন।

বিঃ দ্রঃ—হিংস্র জন্তুরা তাদের শিকার ধরবার পূর্বে বিকট হুঙ্কার দেয়। তাতে শিকারীরা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে চলৎশক্তিহীন হয়। ওই সব জন্তুদের অনুকরণে ডাকাত দলও কোনও বাটিতে চড়াও হবার কালে ওদের জির্গা হাঁক হেঁকে গৃহস্থদের ভীত করে তাদের প্রতিরোধ শক্তি নষ্ট করে। ডাকাতরা ঢেঁকিশালা হতে ঢেঁকি [Battery Ram] এনে দরজা ভাঙে।

[জজসাহেবরা খাওয়ার পর আদালতে এসে বেঞ্চে বিচারে বসেন। তৎকালে তাঁদের বুঝাতে পারলে সহজে 'ষ্টে' অর্ডার ও স্বপক্ষে রুল পাওয়া যায়। কিন্তু —ঐ আপীল বা মোশন দুপুরে বা বিকালে উঠলে আশানুযায়ী হুকুমৎ পাওয়া যায় না। ইহা পূর্বোক্তরূপে মস্তিষ্ক হতে রক্ত নেমে উদর পরিচালনাতে প্রতিরোধ শক্তির হানি সম্পর্কীত থিওরী প্রমাণ করে।]

অপরাধীদের বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে আরও দৃষ্টান্তরূপে উটের পেট চিরে তার

উদরে আফিঙ রেখে উহা দূর স্থানে পাচারের বিষয় বলা যায়। উপরন্তু চীনা স্মাগলাররা জীবন্ত-মন্য নকল শিশু তৈরী করে তার পেটে দ্রব্য পুরে দেয়। ঐ পুতুলটি যান্ত্রিক কারণে কাঁদে ও তাকে কোলে করে এক নারী জাহাজ থেকে নামে। স্মাগলাররা গোপন কুঠরী, দ্বিবালে অদৃশ্য দরজা ও দ্রব্যাদির মধ্যে গোপন ফোঁকর তৈরীতেও সক্ষম।

মূলসূত্র

স্থূল বৃত্তি এবং সূক্ষ্ম বৃত্তি যথাক্রমে অপরাধ স্পৃহা ও সৎ প্রেরণার ধারক ও বাহক। অপরাধ স্পৃহা বা সৎ প্রেরণার সহিত বিপরীত-ধর্মী স্পুটনিক তথা উপগ্রহের সঙ্গে এবং স্থূল বৃত্তি বা সূক্ষ্ম বৃত্তির সঙ্গে বিপরীত-ধর্মী রকেটের তুলনা করা যায়। উহারা স্ব স্ব স্পুটনিককে উৎক্ষিপ্ত করে। অপস্পৃহা ও সৎ প্রেরণা সভ্য মানুষ মাত্রের মধ্যে আছে। উহাদের আগমন ও প্রত্যাগমন উহাদের স্ব স্ব রকেটের শক্তির উপর নির্ভর করে।

স্নেহ দয়া সুবিচারিতা আদি সূক্ষ্ম বৃত্তি এবং কাম ক্রোধ মোহ লোভ আদি স্থূল বৃত্তি বিবিধ অংশে বিভক্ত। এইজন্য উহাদের সঙ্গে বহু-ইঞ্জিন যুক্ত যন্ত্রশকটের তুলনা করা চলে। উহাদের যে কোনও একটি ইঞ্জিনের সাহায্যে উহারা সামগ্রিক ভাবে পরিচালিত হয়। এজন্য মনেরএকটি কু-দিক জাগ্রত হলে উহার অন্য কুদিকটাও মোউকা পেলে জাগ্রত হয়।]

মনোদণ্ড

[মানসিক]

সৎপ্রেরণা—	উল্টো	অপস্পৃহা
সূক্ষ্ম-বৃত্তি—	”	স্থূল বৃত্তি
তৎপরতা—	”	অলসতা
অ্যাকটিভ্—	”	স্ট্যাটিক

[ঐন্দ্রিক]

হিটস্পট্—	উল্টো	কোল্ড্ স্পট্
পেইন স্পট্—	”	টাচস্পট্
লাল রঙ—	”	সবুজ রঙ
হলদে রঙ—	”	নীল রঙ
আত্মহত্যা	”	পরহত্যা

বিঃ দ্রঃ—এইগুলি একই মনোদণ্ডে উল্টো-উল্টো স্থানে অবস্থিত। উহারা বিপরীতধর্মী হওয়াতে একটির তিরোধানে অন্যটির আবির্ভাব ঘটে। যে পরিমাণে একটি বাড়বে সেই পরিমাণে অন্যটি কমবে। এই পরিবর্তন দীর্ঘস্থায়ী বা স্থায়ী হলে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ঘটে। স্বল্পস্থায়ী ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনও ঐ ভাবে হয়ে থাকে।

মৎসৃষ্ট পরিভাষা

১। ক্রিমিনোলজি তথা অপরাধ-বিজ্ঞান ২। ক্রিমিন্যালিটি [ইভিল্ প্রপেনসিটি] তথা অপরাধ-স্পৃহা ৩। ক্রিমিন্যাল তথা অপরাধী ৪। গুড্-প্রপেনসিটি তথা সৎ-প্রেরণা ৫। ইনিসটিঙ্কটিভ্, হ্যাবিচুয়েল, ইনটারমিডিয়েট, চান্সড্ বা অকেশন্যাল ক্রিমিন্যাল অর্থে স্বভাব, অভ্যাস, মধ্যম ও দৈব অপরাধী ৬। মর‍্যাল ইনসেনসিবিলিটি অর্থে নৈতিক অসাড়তা ৭। ফিসিক্যাল ইনসেনসিবিলিটি অর্থে দৈহিক অসাড়তা ৮। নরম্যাল সেলফ্ অর্থে স্বাভাবিক সত্তা ৯। রেট্রোগেটিভ অর্থে অবরোহী। [আরোহীর উল্টো] ১০। ডিজেনারেশন অর্থে ক্ষয়ক্ষতি [ক্ষতিগ্রস্ত] ১১। রিজেনারেশন অর্থে পুনর্গঠন ১২। টাচ্ পেন্, হিট্ ও কোল্ড স্পট অর্থে স্পর্শ, কষ্ট, উষ্ণ, শৈত্য কেন্দ্র [বোধ] ১৩। হাই-পার সেনসিবিলিটি অর্থে অতীন্দ্রিয়তা ১৪। কমপ্লেক্স অর্থে মনোজট ১৫। সাজেসশন অর্থে বাক্-প্রয়োগ ১৬। সাজেস্‌সিভ্ অর্থে বাকপ্রয়োগশীল ১৭। ব্লাশ অর্থে ব্রীড়ানম্র ১৮। অটো-সাজেস্‌শন অর্থে স্ব-বাক্-প্রয়োগ ১৯। আউট-সাইড সাজেস্‌ন তথা পর-বাক্-প্রয়োগ ২০। ফাইনার নার্ভ অর্থে সূক্ষ্ম স্নায়ু ২১। ফাংশন্যাল নার্ভ অর্থে সাধারণ স্নায়ু ২২। ফাইনার সেন্টিমেন্ট অর্থে সূক্ষ্মবৃত্তি ২৩। বেসার সেন্টিমেন্ট অর্থে স্থূলবৃত্তি ২৪। ইনহেরেন্ট লেজিনেস অর্থে [স্থায়ী] কর্মালসতা ২৫। অ্যাকটিভিটি অর্থে [কর্ম] তৎপরতা ২৬। ইমোশন্যাল ইনস্টেবিলিটি অর্থে চিত্ত-বিক্ষোভ ২৭। মেনটাল প্রসেস অর্থে মনোদণ্ড [বোধদণ্ড] ২৮। নরম্যাল ক্রিমিন্যাল তথা নীরোগ অপরাধী ২৯। অ্যাব-নরম্যাল ক্রিমিন্যাল অর্থে অপরাধ-রোগী ৩০। প্রাইমারী ক্রিমিন্যাল তথা প্রাথমিক অপরাধী ৩১। হার্ডেণ্ড ক্রিমিন্যাল—প্রকৃত অপরাধী [লাস্ট স্টেজ] ৩২। বডি রিথিম অর্থে কর্ম-তাল [দেহ-তাল] ৩৩। ক্রিমিন্যাল ট্রিট্‌মেন্ট অর্থে অপরাধ-চিকিৎসা ৩৪। সুপার-কোয়ালিটি, ভ্যানিটি, সেন্টিমেন-

ট্যালিটি, ক্রুয়েল্‌টি এবং লেজিনেস্‌ অর্থে প্রেমবৃত্তি, দম্ভবৃত্তি, ভাবপ্রবণতা, নিষ্ঠুরতা এবং অলসতা ৩৫। ষ্টিলনেস তথা জড়তা ৩৬। হেরিডিটি তথা বংশানুক্রম ৩৭। ফিয়ার অফ্‌ কনসিকোয়েন্স্‌ অর্থে ভয় ভাবনা, টেনডেনসি [প্রপেনসিটি] তথা প্রবণতা [অপরাধ] ৩৮। রেসিসটেন্স পাওয়ার অর্থে প্রতিরোধ-শক্তি ৩৯। মাস্‌ সাজেস্‌শন অর্থে গণ-বাক্‌-প্রয়োগ ৪০। রেসালটেণ্ট পাওয়ার তথা সম্মিলিত শক্তি ৪১। এনভায়রন্‌মেণ্ট্‌ অর্থে পরিবেশ ৪২। সোমাটিক এবং গেমেটিক সেল অর্থে দেহকোষ এবং বীজকোষ ৪৩। সেক্স অ্যাপিটাইট তথা যৌন-স্পৃহা [সেক্সুয়ালিটি] ৪৪। সেক্সুয়াল ক্রিমিন্যাল অর্থে যৌনজ-অপরাধী। ৪৫। হ্যালুসিনেশন তথা অন্তর্বিকল্প ৪৬। ইলিউসন অর্থে বহির্বিকল্প ৪৭। প্রিমিটিভ্‌ হ্যাবিট তথা আদি-স্পৃহা ৪৮। মেনট্যাল ডিপ্রেশন অর্থে [মনো] অবনমন ৪৯। সুপার-ম্যান [saint] অর্থে মহা-পুরুষ ৫০। স্লাম অর্থে পঙ্কিল বস্তি ৫১। মালটি পারসোন্যালিটি অর্থে বহু ব্যক্তিত্ব, ও ডবল পারসোন্যালিটি অর্থে দ্বৈত-ব্যক্তিত্ব ৫২। ক্রিমিন্যাল ক্ল্যাসিফিকেশন অপরাধ-বিভাগ ৪৩। বিস্ট-ম্যান তথা মানব-দানব ৫৪। ক্রিমিন্যাল ক্যারেকটার তথা অপরাধ-চরিত্র ৫৫। রিসিভিঙ্‌ সেনটার অর্থে গ্রহণ-কেন্দ্র ৫৬। অ্যাকয়ার্ড [Acquired] ক্যারেকটার অর্থে সংগৃহীত বৈশিষ্ট্য ৫৭। আসেক্সুয়েল ক্রিমিন্যাল অর্থে অ-যৌনজ অপরাধী ৫৮। অফেন্স এগেনেস্ট্‌ প্রপারটি [প্রপারটি ক্রিমিন্যাল] অর্থে সাম্পত্তিক অপরাধী [সম্পত্তির বিরুদ্ধে] ৫৯। অফেন্স এগেনস্ট পারসন [পারসন ক্রিমিন্যাল] অর্থে শোণিতাত্মক অপরাধী [ব্যক্তির বিরুদ্ধে] ৬০। অ্যাডালটারি অর্থে ব্যাভিচার ৬১। রেপ অর্থে বলাৎ-কার ৬২। সবল অপরাধী [বস্তুর উপর আঘাত হানক সিঁদেল চোর] অর্থে সবল চোর ৬৩। নন-ভায়লেণ্ট [উইদাউট ভায়োলেন্স] অর্থে নির্বল অপরাধী [সাধারণ চোর—যারা ব্যক্তি বা বস্তুর উপর আঘাত হানে না] ৬৪। হাউস-ব্রেকিঙ্‌ কমপ্লেক্স ইনস্‌ট্রুমেণ্ট অর্থে জটিল ভাঙন যন্ত্র ৬৫। সিম্পল হাউস-ব্রেকিঙ ইনস্‌ট্রুমেণ্ট অর্থে সাধারণ তথা সরল ভাঙন যন্ত্র [সিঁধ-কাটি আদি] ৬৬। রি-অ্যাকশন টাইম অর্থে প্রতিক্রিয়া-কাল ৬৭। লুসিড ইনটারভ্যাল [অপরাধের] অর্থে অপরাধ-বিরাম ৬৮। ভাইস অর্থে পাপ ৬৯। সিন্‌ [sin] অর্থে অন্যায়। ব্রেন ওয়াস অর্থে মগজ ধোলাই। ৭০। ফোরেন্সিক সায়েন্স অর্থে প্রয়োগীয় বিদ্যা ৭১। এপ্লায়েড ক্রিমিনলজীঅর্থে ব্যবহারিক অপরাধ তত্ত্ব। ৭২। ক্রিমিন্যাল সাইকোলোজী অর্থে মনস্তাত্ত্বিক অপরাধ-তত্ত্ব

৭৩। প্যাথোলজিক্যাল লাইস অর্থে মিথ্যাবাদীতা রোগ। ৭৪। ইনটরসপেকশন অর্থে অভিব্যক্তি ৭৫। রিসার্চ অর্থে গবেষণা।

ভ্যাকিওল [vacuole]ঃ অন্থ-গহ্বর ৭৬। ক্রমোজম অর্থে গুণ-দণ্ড, ৭৭। জিন অর্থে গুণ-বিন্দু, ৭৮। জাইগোট অর্থে যৌন পিণ্ড, ৭৯। ক্লিভেজ অর্থে ক্রম বিভক্তি, ৮০। নিউট্রেলাইজ অর্থে সমীকরণ, ৮১। অন্ দি স্পট্ অর্থে সরজেমিন, ৮২। ডেলিনকোয়েন্সী অর্থে কদাচার, ৮৩। জুভেনাইল ক্রিমিন্যাল অর্থে কিশোর অপরাধী ৮৪। স্পিুট আপ মাইণ্ড অর্থে বিছিন্নমনা, ৮৫। ওয়ার্ক স্পেল ও রেষ্ট পজ্ অর্থে কর্মকাল ও শ্রমবিরতি, ৮৬। এক্সিডেণ্ট প্রোননেস অর্থে দুর্ঘটনা প্রবণতা ৮৭। নার্ভপ্লেট অর্থে স্নায়ুমুখিতা ৮৮। অনটোজনি ও ফাইলোজনী অর্থে ব্যাষ্টি-ধারা [জীবন] ও গোষ্ঠী-ধারা [জীবন] কনভারজেন্স ও ডাইভারজেন্স অর্থে অন্তর্মুখিতা ও বহির্মুখিতা। (f)
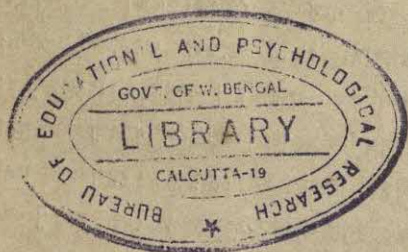
(f) মানুষ যথাক্রমে (১) খাদ্য সংগ্রহী (২) পশুপালক (৩) কৃষিজীবি ও (৪) শিল্প কর্মী হয়। কারও মধ্যে আদি খাদ্য সংগ্রহী শিকারী আদি মানুষের স্বভাব দেখা গেলে চিকিৎসার্থে প্রথমে তাদেরকে পশু পক্ষী পুষতে ও পরে কৃষি কার্যে নিযুক্ত করে নিরাময় করে পরে শিল্পকর্মে নিযুক্ত করতে হবে। [রিপিটেশন]

গ্রন্থকার পরিচিতি

[নীহারকুমার বর্দ্ধন I. P.S. M. Sc. B.L]

বাঙলার অপরাধ-বিজ্ঞানী রূপে পরিচিত ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল I. P. S [Rtd] M. Sc, D Phil, J. P. আমার বাল্যবন্ধু ও একদা সহকর্মী। তাই প্রকাশকের অনুরোধে আমাকেই তাঁর সংক্ষিপ্ত 'বায়ো-ডাটা' লিখতে হচ্ছে। অবশ্য এর পূর্বে মাসিক বসুমতী ও অন্যান্য পত্রিকায় ওঁর জীবনী বের হয়েছিল। ঋষি বঙ্কিমের মাতামহ বংশীয় (f) পুরানো জমিদার বংশোদ্ভব এই দীর্ঘদেহী সাহসী লোকটি একাধারে দক্ষ প্রশাসক, সুবক্তা, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবী।

ছাত্রাবস্থায় কল্লোলে ওঁর প্রথম গল্প 'নীচের সমাজ' বার হয়। পরে ভারতবর্ষ, বসুমতী, প্রবাসী, প্রকৃতি, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, শনিবারের চিঠি, বিচিত্রা, অভ্যুদয়, রোচনা, ছন্দা, যুগান্তর, আনন্দবাজার, অর্চ্চনা, পাঠশালা, মৌচাক, রামধনু, বাতায়ন, দীপালী, বেতার জগৎ, সোনার বাঙলা, রঙমশাল প্রভৃতি প্রায় প্রত্যেক পত্রিকাতেই ওঁর বহু রচনা মুদ্রিত হতো।

আমার জ্ঞাতসারে উনি রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্র রায়, যামিনী রায়, নরেনদেব, রাধারাণী দেবী, যতীন বাগচী, নজরুল, কালিদাস রায়, সজনীকান্ত, তারাশঙ্কর, শৈলজানন্দ, সত্যেন বোস, স্যার পি সি রায়, গুরুসদয় দত্ত প্রভৃতি বহু সাহিত্যরথীর স্নেহভাজন ছিলেন। কর্মজীবনে সাহিত্যিকদের নানাভাবে উনি সেবা ও সাহায্য করতেন।

ওঁর বহু বক্তৃতা রেডিওতে ও বহু সেমিনারে ও অন্যত্র আমরা শুনেছি। বিখ্যাত ভারত কোষ গ্রন্থে ওঁর অপরাধ বিজ্ঞানের ছয়টি এক্সপার্ট প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়েছে। বহু সুবোধ্য বাঙলা বৈজ্ঞানিক পরিভাষার উনি স্রষ্টা। ওঁর হিন্দি, উড়িয়া, ইংরাজী ও বাঙলায় বহু পুস্তক আছে। উপরন্তু কয়েকটি 'বিজ্ঞান' বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকেরও উনি প্রণেতা।

উনি আট খণ্ড অপরাধ-বিজ্ঞান, দুই খণ্ড হিন্দু প্রাণী বিজ্ঞান, [ডঃ কালিদাস নাগের ভূমিকা সহ] দুই খণ্ড 'পুলিশ কাহিনী [পুলিশের ইতিহাস] দুই খণ্ড শ্রমিক বিজ্ঞান, [ডঃ নব গোপাল দাশের ভূমিকা সহ] তিন খণ্ড অপরাধ-তত্ত্ব,

---

(f) ঋষি বঙ্কিম ঐ ঘোষাল বংশের দৌহিত্র বংশোদ্ভব। উনি অন্য সম্পর্কে ডঃ ঘোষালের পিতামহের মাসতুতো ভ্রাতা।

কিশোর অপরাধী [জুভেনাইল], চার খণ্ড বিখ্যাত বিচার ও তদন্ত কাহিনী এবং রক্ত নদীর ধারা, [তারাশঙ্কর ব্যানার্জির ভূমিকা সহ] অন্ধকারের দেশ, খুনরাঙা রাত্রি, আমি যাদের দেখেছি, আমার দেখা মেয়েরা, পকেটমার, একটি অদ্ভুত মামলা, অধস্তন পৃথিবী, মেছুয়া হত্যা, অধ্যাপকের বিপত্তি, একটি নারী হত্যা, একটি নির্মম হত্যা, নগরীর অভিশাপ, মুণ্ডহীন দেহ, জাগ্রত ভারত, দুই পক্ষ প্রভৃতি প্রায় ৫০ খানি জনপ্রিয় পুস্তকের লেখক।

উপরোক্ত পুস্তকের কয়েকটি রেডিও'তে, যাত্রায়, থিয়েটারে গৃহীত ও অভিনীত হয়েছে। ওঁর একটি গ্রন্থ সিনেমার জন্য গৃহীত হয়েছে। ক্রাইম উপন্যাস ও গোয়েন্দা উপন্যাসে প্রভেদ আছে। উনি ভারতীয় ভাষায় ডাইরি সাহিত্য [ডাইরীর ফর্মে উপন্যাস] এবং প্রকৃত ক্রাইম উপন্যাস [অপরাধীদের সমাজজীবন] প্রভৃতির প্রবর্তক।

কলিকাতা য়ুনভার্সিটিতে [নিয়মিত], বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতন [ষ্টাডি-সার্কেল], টাটা ষ্টাফ ইনিষ্টিটিউট [জামসেদপুর], টিচার্স ট্রেণীং, ক্যালকাটা ডেফ এণ্ড ডাম্ব স্কুল [নিয়মিত], কেন্দ্রীয় [I.P.S.] পুলিশ ট্রেণীং কলেজ, মাউন্টআবু, ষ্টেট পুলিশ ট্রেণীং স্কুল ও কলেজ বারাকপুর [নিয়মিত], কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা পুলিশ শিক্ষণ কেন্দ্র [নিয়মিত], ইণ্ডিয়ান ল' ইনিষ্টিটিউট [ধারাবাহিক] ও বিভিন্ন রোটারী ক্লাব, রামকৃষ্ণ মিশন ইনিষ্টিটিউট ও অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠানের উনি এখনও ওঁর নিজ বিষয়ে ভিজিটিং লেকচারার। (f)

ভারতের [ক্রিমিন্যাল সাইকোলজী]একমাত্র ডক্টর হওয়ায় য়ুনভারসিটির বহু ছাত্র প্রতি বৎসর ওঁর অধীনে অপরাধ-তত্ত্বে সার্থক গবেষণাতে সফল।

পাবলিক সার্ভিস কমিশনেরও উনি অপরাধ বিজ্ঞানে পেপার সেটার ও এক্সামিনার ছিলেন। গভরমেণ্ট ওঁকে কলিকাতায় জাষ্টিশ অফ্ পিস্ নিযুক্ত করেছেন। অপরাধতত্ত্বে পৃথিবীতে কয়েকটি নূতন থিওরী সৃষ্টি করায় পুলিশ মিনিষ্টার কালিপদ মুখার্জির সভাপতিত্বে এবং ইন্সপেক্টার জেনারেল ও পুলিশ কমিশনার ও বহু গুণীজনের উপস্থিতিতে একটি মহতি জনসভায় ওঁকে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল।

পুলিশ শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে তিনটি সুসংহত ক্রাইম মিউজিয়াম [ভারতে এগুলি প্রথম] উনি ওঁর সংগৃহীত শত শত ভাঙনযন্ত্র, প্রদর্শনী-দ্রব্য এবং নিজ সৃষ্ট চার্ট চিত্র ও মডেল দ্বারা উনি স্থাপন করেন। এগুলির কিছু কিছু গভরমেণ্ট

(f) ইণ্ডো জার্মান সোসাইটি ম্যাক্সমুলার ভবন ও এয়ার ইণ্ডিয়া ক্লাব প্রভৃতিতে ওঁর সাম্প্রতিক বক্তৃতা উল্লেখ্য। সুদূর পোল্যাণ্ড থেকেও উনি বক্তৃতা দিতে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন।

ও পুলিশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বহু পাবলিক এক্সিবিসনে প্রদর্শিত হলে ওগুলি য়ুরোপীয় ও ভারতীয় পণ্ডিত ও জনগণ দ্বারা উচ্চ প্রশংশিত হয়। সহজে ভেজাল দ্রব্য ঔষধ ও খাদ্য নিরূপণে এবং অপরাধ মনস্তত্ত্ব পরীক্ষার্থে উনি কয়েকটি উল্লেখ্য এপারাটাস উদ্ভাবন ও নির্মাণ করেছেন।

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল কলিকাতা পুলিশের জনপ্রিয় ডেপুটি পুলিশ কমিশনার ছিলেন। পরে—ওঁকে EB (হোম) এ্যন্টিকরাপসনের স্পেশাল অফিসর করা হয়। এন্টি-রাউডি তথা গুণ্ডা দমন বিভাগ, এনফোর্সমেণ্ট ও গোয়েন্দা ও থানা পুলিশেও বহাল ছিলেন। [এতে তাঁর অপরাধ গবেষণার সুবিধা হয়।] দুর্নীতি দমনার্থে কলিকাতা সহ হাওড়া ২৪ পরগণা ও হুগলীতেও ওঁকে ক্ষমতা দেওয়া হয় [এটি পুলিশে প্রথম ঘটনা] কর্মকৃত্যে দক্ষতা ও সাহসিকতার স্বীকৃতি স্বরূপ ওঁকে পুলিশ মেডেল, সেবা মেডেল প্রভৃতি বহু পদকে ও অন্য পুরস্কারে গভরমেণ্ট ভূষিত করেন। পুলিশ এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন রিপোর্টে ওঁর নাম বহুবার সপ্রশংস রূপে উল্লেখিত।

কলিকাতা পুলিশে ১৯৩৮ খৃঃ পর্যন্ত ভারতীয় কর্মীদের য়ুরোপীয় কর্মীদের ক্লাবে, লাইব্রেরীতে এবং বাথরুম ও প্রিভিতে ঢুকতে দেওয়া হতো না। উপরন্তু য়ুরোপীয় ও এ্যাঙলোদের বহু অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। তরুণ পঞ্চানন ঘোষাল এই বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-মুখর হন। এ বিষয়ে আমি ও সত্যেন্দ্র মুখার্জি একত্রিত হই। এতে গভরমেণ্ট ভারতীয় কর্মীদের জন্য তৎকালে অনুরূপ সুবিধা দানে বাধ্য হয়েছিলেন। এঁর ও আমার প্রতিবেদনে ও চেষ্টায় ইংরাজ আমলে থানা বাড়ীগুলির ও পুলিশ য়ুনিফর্মের কিছু কিছু উন্নতি করা হয়।

প্রখ্যাত কলিকাতা পুলিশ জর্নালের উনি ফাউণ্ডার এডিটার ছিলেন। ওঁর এই জার্নালে স্যার যদুনাথ সরকার প্রখ্যাত য়ুনভারসিটি প্রফেসর গণ, ও সি গাঙ্গুলী, ডঃ নরেন্দ্র লাহা, ডঃ বিমল লাহা ও ডঃ সত্যেন লাহা ও বহু য়ুরোপীয় মণীষীও প্রবন্ধ পাঠাতেন। পুলিশ এ্যাসোসিয়েসনেরও উনি প্রেসিডেণ্ট হন। কলিকাতা পুলিশ এ্যাম্বুলেন্সেরও উনি একজন অন্যতম [Corp supdt] অধিকর্তা ছিলেন। দিল্লীতে কয়েকটি সর্বভারতীয় প্রশানিক ও সোসিয়াল কনফারেন্সে ষ্টেট্ গভরমেণ্টের প্রতিভূরূপে উনি উল্লেখ্য বক্তৃতা দেন। গর্ভমেণ্ট ওঁকে অধিগৃহীত প্রিসনার্স এইড সোসাইটির এক্সিকিউটিভ মেম্বার করেছিলেন।

উনি মাদরাল রেসিডেন্সিয়াল হাই স্কুল ও মডেল গার্লস হাই স্কুলের ফাউণ্ডার প্রেসিডেন্ট এবং B T. কলেজ ও কয়টি প্রাইমারী স্কুল ও লাইব্রেরী ও একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের উনি সংস্থাপক। ওঁর স্কুলগুলির জন্য উনি নিজ বৃহৎ পৈতৃক বাটিগুলি ও বহু জমি নিঃশর্তে দান করেছেন। মাদরাল সর্বজনীন [হরিজন আদির] বৃহৎ মন্দির ও বিস্তীর্ণ রুরাল [RURAL] পার্ক, ক্রীড়ার মাঠ প্রভৃতির উনি স্থাপয়িতা। নৈহাটী মাদরাল চার মাইল রাজপথ ওঁরই দানকৃত পৈতৃক জমিতে তৈরী। কলিকাতাতেও উনি কয়েকটি হাই স্কুলের ও একটি প্রস্থতিসদনের সংগঠক। কলিকাতার বেশ্যা পল্লীতে ওদের পুত্র কন্যাদের জন্য স্কুল স্থাপন করতে দেখে একদা আমরা অবাক হই। বেকার ও অপরাধী-মন্য যুবকদের জন্য উনি একটি টেপ্ লুম ফ্যাকটারী স্থাপন করেন। স্বগ্রামে ওঁর নিজস্ব কৃষি খামারে মধ্যবিত্তদের দ্বারা ওঁর চাষ করানোর পরীক্ষা উল্লেখ্য।

হাওড়া হনুমান হসপিটলের উনি একজন অন্যতম এক্সিকিউটিভ্ মেম্বার। সেখানে নিজের অধীনে একটি সাইকো থেরাপী ইউনিটও উনি খুলেছিলেন। অল ইণ্ডিয়া ইনডাসট্রিয়াল সাইকোলজিষ্ট এ্যাসোসিয়েশনের উনি প্রেসিডেন্ট এবং উহার মুখপাত্র ইংরাজী রিভিউ পত্রিকাটির উনি সম্পাদক।

পূর্ব কলিকাতা সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির ও অন্যান্য বহু জনকল্যান ও সাহিত্য সভার উনি সভাপতি। তরুণদের বহু সাংস্কৃতিক সভায় ওঁকে সভাপতি হতে হয়। সেন্ট্রাল ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাবের উনি প্রতিষ্ঠাতা কাউন্সিল মেম্বার ছিলেন। এ্যাণ্ডামান কো-অপারেটিভ সোসাইটিরও উনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন। প্রাণাচার্য স্বশীল সেনের জীবিতকালে গণনাথ সেন প্রতিষ্ঠিত আয়ুর্বেদ হাসপাতালের ও তৎসহ সিটি ডেন্টাল কলেজের উনি কার্যকরী সদস্য ছিলেন।

ওঁর পুস্তকগুলি স্বপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডঃ বিজন মুখার্জি, গর্ভনর ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি, গর্ভনর ডঃ কৈলাস নাথ কাটজু, ডঃ স্বনীতিকুমার চ্যাটার্জি, ডঃ কালিদাস নাগ, ভাইস চান্সেলার ডঃ প্রমথ ব্যানার্জি, চিফ জাষ্টিস শঙ্কর প্রসাদ মিত্র, ডঃ প্রতুল গুপ্ত প্রভৃতি বহু মনীষীর দ্বারা উচ্চ প্রশংশিত।

আমি ওঁর ছাত্রাবস্থায় ওঁকে সরোজনলিনী এ্যাসোসিয়েসন ও স্কুলের এবং এ্যান্টি ম্যালেরিয়াল সোসাইটির এক্সিকিউটিভ মেম্বার ও অন্যতম সংগঠক রূপে দেখেছি। ওই সময় উনি পড়াশুনার সহিত গ্রামে গ্রামে ওগুলির শাখা সমিতি

স্থাপন করতেন। ওই কালে ডিরেক্টর অফ্ পাবলিক হেলথ ডঃ বেণ্টলের সহায়তায় গ্রামে দাইট্রেনিং স্কুল ও কালাজ্বর চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করেন। ওঁর নিজ কলেজের প্রথম ষ্টুডেন্টস য়ুনিয়নের ও ব্যায়ামাগারের উনি প্রথম সেক্রেটারী ছিলেন।

স্নাতকোত্তর কলেজের ছাত্ররূপে বিজ্ঞান প্রদর্শনীর উনি সংগঠক ও প্রবর্তক ছিলেন। পুলিশে ঢুকার আগে উনি ডঃ গিরীন্দ্রশেখর বসুর অধীনে এ্যাবনরম্যাল সাইকোলজিতে কয়েক মাস রিসার্চ্চ করে উহার পদ্ধতিগুলি আয়ত্ত করেন।

বিগত মহাদাঙ্গাকালে [১৯৪৬] উনি হিন্দু মুশ্লীম নির্বিশেষে সকলের রক্ষা কর্তা ছিলেন। [আমরাও তখন ওঁর সঙ্গে] আমরা তখন শত শত বিপদাপন্ন পরিবারকে উদ্ধার করে তাদের মান ও প্রাণ রক্ষা করি। যুদ্ধকালীন দুর্ভিক্ষ কালে ক্ষুধার্তকে অন্ন দিতে চাঁদা তুলে আমরা দাতব্য লঙ্গর খানা খুলে বহু জনের প্রাণ বাঁচিয়েছিলাম। আমাদের জনপ্রিয়তার জন্য আমাদের দ্বারা কর্তৃপক্ষ সিভিক গার্ড, ফায়ার ফাইটীং আদি সংস্থার কর্মী সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। স্বাধীনতার পর আমরা ওঁর সাহায্যে পরিভাষা তৈরী করে থানায় ডাইরী ও কোর্টের চালান বাঙলাতে লিখতে কর্মীদের শিখাই। কিন্তু পরে—আদালতের ভাষা তখনও ইংরাজী ঃ এই অজুহাতে কর্তৃপক্ষের নিষেধে উহা বন্ধ হয়।

বর্তমানে ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল এতো কর্মের মধ্যেও বিখ্যাত ফ্রেজার কোম্পানী [পূর্বতন ম্যাকলীন বেরী] ও কয়েকটি চা বাগীচা ও চা কোম্পানীর ডিরেকটার পদে আছেন। সেই সঙ্গে ছুটির দিনে তাঁর নিজের খামারে তাঁর পূর্বতন কৃষি প্রজাদের সঙ্গে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন ও তাঁর নিজের কয়টি স্কুল ও কলেজের তত্ত্বাবধন কার্য করেন। উপরন্তু—উনি বিনা পারিশ্রমিকে মানসিক চিকিৎসা করে প্রতিবৎসর বহু মনোরোগীকে নিরাময় করেন।

কর্মকৃত্যে থাকা কালে কোন স্থানে বদলী হলে জনগণ ওঁকে সভা করে বিদায় জানাতো। উনি নিজের এলাকার বাড়ী বাড়ী ঘুরে জনগণের অসুবিধা শুনতেন। গুণ্ডাদমনে বহুবার তিনি সাঙ্ঘাতিক আহত হয়ে হাস-পাতালে অপারেটেড্ হয়েছেন। পুলিশের বহু বিখ্যাত মামলার কিনারা ওঁর সার্থক তদন্তের জন্য সম্ভব হয়েছিল। ক্রিমিন্যাল হেরিডিটি রিসার্চের জন্য উনি আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে যান। ফিরে এসে উনি ওখানে রিফিউজী বসবাসের উপযোগীতা সম্বন্ধে ডঃ রায়কে বলেছিলেন। দেশ বিভাগের পর আমরা দুজনে ফ্যাকটারীগুলিতে বহু রিফিউজীর কর্ম সংস্থান করাই। স্থানীয় তরুণদের বেবী

ট্যাক্সী প্রদান বিষয়ে প্রতিবেদন আমরা দুজনে লিখেছিলাম। [ইচ্ছা থাকলে কারও সময়ের কথনও অভাব হয় না।]

উল্লেখ্য এই যে উনি পুলিশে থাকা কালে কলিকাতা য়ুনিভারসিটি থেকে ডকটরেট হন।

ওঁরা পুরুষানুক্রমে উচ্চশিক্ষত খেতাবধারী ও উচ্চপদী ও জনসেবী। ওঁরা দু ভাই ও এক ভগ্নী ডকটরেট্ এবং অন্য ভ্রাতা ভগ্নীরা স্নাতকোত্তর। ওঁর চেষ্টায় ইহা সম্ভব হয়। পড়াশুনায় ও সাহিত্য কর্মে উনি বহু তরুণকে সাহায্য করেছেন।

ডঃ ঘোষালের এই অপরাধতত্ত্ব পুস্তকটি ভারতীয় ভাষায় একমাত্র পুস্তক। উপরন্তু য়ুরোপীয় ভাষাতেও এরূপ একটি গ্রন্থ বিরল। [ইংরাজী বহু পুস্তক এ বিষয়ে আমি পড়ে ইহা বলছি।]

গবেষণাতেই ওঁর এই সকল জ্ঞান উনি সীমা বদ্ধ রাখেন নি। অমনোযোগী বালকদের জন্য কলিকাতার অনতিদূরে ওঁর নিজস্ব পৃথক রিফরমেটারী স্কুল ও পরীক্ষার্থে কৃষি ক্ষেত্র ও হাল্কা শিল্প আছে। ওঁর স্কুলগুলিতে স্ক্রিনিং করে মেধাবী ছাত্র না নিয়ে অন্যত্র বহুবার ফেল করা ছাত্রদের অগ্রাধিকার দিয়ে ভর্তি করে শেষ পরীক্ষায় পাশ করানো হয়। [প্রতিটিই জন হিতার্থে] বর্তমানে আমরা উভয়ে একত্রে অন্য এক বৃহৎ সেবামূলক কর্মে নিযুক্ত আছি।

[ইংরাজ শাসনকালে বিপদের ঝুঁকি নিয়েও আমরা ভারতীয় কর্মীদের জন্য পৃথক পুলিশ ক্লাব লাইব্রেরী ও গেষ্ট হাউস এবং পুলিশ এ্যাসোসিয়েশন স্থাপন করি। কলিকাতা পুলিশে দেশীয়দের স্পোর্টস ও অভিনয় ব্যবস্থারও আমরা পথিকৃৎ। ডঃ ঘোষাল কলিকাতা পুলিশের মেডিকেল ইউনিটেরও সেক্রেটারী ছিলেন। কয়েকটি নূতন পুলিশ ফাঁড়িও ওঁর প্রতিবেদনে স্থাপিত হয়। কিন্তু এতে আমাদের দ্রুত পদোন্নতি ব্যাহত হয় নি। আমরা নিজেরা অনেষ্ট থেকে অন্যদেরও অনেষ্ট করেছি। থানাগুলিতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রাখতে আমরা মিলাদ সরিফের ব্যবস্থা করি। যুদ্ধকালে বিষবাষ্প ব্যবহারের সম্ভাবনায় আর্মীর সাহায্যে পুলিশ ক্লাবে গ্যাস-মাস্ক স্কোয়াড উনি স্থাপন করেন। তৎকালে রেড-ক্রশে আমরা এক লক্ষ টাকা চাঁদা তুলে দিয়েছি। জন হিতার্থে ফ্যাংসন করে আমরা অতীতে প্রচুর টাকা তুলে উহা দান করেছি।